নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

তৃতীয় খণ্ড—১২৯২।

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

তৃতীয় খণ্ড নব্যভারতের সূচিপত্র।

তখন সেই সকলকে গুণন করিয়া মানুষের মস্তক আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না, তখন সকলই অনন্ত বলিয়া মনে হয়। যে একবার এ পথে চলিয়াছে, সেই মজিয়াছে। যে কখনও কিছুই জানিতে চেষ্টা করে নাই, সেই ভাল আছে; কিন্তু যে একবার জানিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই, নিউটনের ন্যায় শেষে অনন্তের তীরে বসিয়া, নিরাশার সঙ্গীতে জগৎকে ডুবাইয়া, অনন্তে আত্মশরীরকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে। তুমি আমি কোন ছার জীব! গণিবার সাধ থাকে, একবার এস, নিশ্চয় তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। ঐ আকাশে চাহিয়া বলত, কত নক্ষত্র আকাশে,—প্রত্যেক নক্ষত্রে কত জীব,—প্রত্যেক জীবে কত পরমাণু! পৃথিবীর পানে চাহিয়া বলত, এখানে কত বৃক্ষ, এক বৃক্ষে কত পত্র,—এক এক পত্রে কত কীট। পরিমাণ করিবে?—গণনা করিবে? হা! বালক মানুষ, তোমার অহঙ্কার আর কতক্ষণ! গণিতে আরম্ভ করিয়া দেখ অমনি অনন্ত তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে! মানুষ অনন্তের অনন্তে বসিয়া ডুবিতেছে,—সকলের আশা, সকলের অহঙ্কার, অনন্ত কাল সাগর গ্রাস করিতেছে!

গণিতে বসিয়া আমরা মজিয়াছি। এক বৎসর গেল, দুবৎসর গেল,—কত দিন গেল,—কত সময় কাটিয়া গেল—এক দুই করিয়া, অনন্ত কালের সংখ্যাই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে সময় গেল বা যে সময় আসিল, সে সকলই অনন্তে মিশিয়া রহিল। পৃথিবীর মৃত্তিকা হইতে বিন্দু বিন্দু বাষ্প কত কি তুলিয়া যেমন পাহাড়ের গায়ে কোও মেঘ হইয়া লাগিয়া থাকে, আমাদের জীবন-মৃত্তিকা হইতে দিন, মাস, বৎসর-ব্যাপক সময়, কত কি লইয়া অনন্তে মিশিয়া থাকিল, আমরা তাহা কিছুই গণিতে পারিলাম না। গত বৎসর কি ঘটিল, কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কি পাইলাম,—কি বলিতে পারি? যাহা গেল—সে সকলই অনন্তে মিশিল। গত বৎসর, কত কি উপার্জ্জন করিয়া, অনন্তের অনন্তত্ব বৃদ্ধি করিল। প্রত্যেক বৎসরই করিতেছে। আমরা অবাক হইয়া অনন্ত-শক্তি-সাগরের ক্রীড়া দেখিতেছি, আর বিস্ময়ে নিমগ্ন হইতেছি।

কি জানি যে, অহঙ্কার করিব? ক্ষুদ্র হইয়া জন্মিয়াছি—ক্ষুদ্রই রহিয়াছি, অনন্ত-তত্ব কিছুই ত জানি না, তবে কিসের অহঙ্কার করিব! অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। ভাই, বিজ্ঞ মনুষ্য-সন্তান, সামান্য জ্ঞানবালির বাঁধে অসীম সময়-সাগরকে পরিমাণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার শক্তি তোমার ভাণ্ডারে কিছু থাকে, তুমি অহঙ্কার কর,—হাসাও, মাতাও, কাঁদাও। আমাদের কিছুই নাই—অনন্তের নিকট আমরা যেন কিছুই নাই। কিছুই নাই বটে, কিন্তু আবার কিছু হই। একবার নাই,—আবার আছি। অনন্তের সহিত তুলনায় আমরা যেন নাই, সীমার সহিত তুলনায় আছি। "নাই নাই" মিশিয়াই অনন্ত "হই হই" উৎপন্ন হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিলিয়াই অনন্ত হইতেছে। অণু অণু মিলিয়াই মহা সাগর হইতেছে। এ এক গভীর শাস্ত্র। অনন্তের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র কীটের অস্তিত্ব কে স্বীকার করিতে চায়?—বড় বস্তুর কথা বিস্মৃত হইয়া, কে ছোট বস্তুর নাম লইতে চায়? চন্দ্রকে ভুলিয়া কে জোনাকীকে গণিতে চায়?—বড়র কাছে ছোটর আদর নাই। অনন্তের নিকট ক্ষুদ্রের আদর নাই বটে,

কিন্তু ক্ষুদ্র না থাকিলেও অনন্ত থাকে না, অনন্তত্ব পূর্ণ হয় না। পরমাণু না থাকিলে জড় হয় না,—আমি না থাকিলে তুমি হও না,এবং আমি ও তুমি,সকলে না থাকিলে সমাজ হয় না,—সমাজ না থাকিলে দেশ হয় না, দেশ না থাকিলে রাজ্য হয় না, রাজ্য না থাকিলে প্রকৃতি সুধুই শূন্য—কল্পনা—ছায়া। এক সময়ে যাহা অনাদৃত, আর এক সময়ে তাহারই আদর হইতেছে। এই প্রকারে 'নাই' সময়ে 'হই' হইতেছে। মূল কথা, আমরা অতি ক্ষুদ্র হইলেও,—'নাইর' মত বোধ হইলেও,আমরা আছি। কেন আছি,জানি না, কত দিন থাকিব, জানি না,—তবুও আছি। আছি বলিয়াই আমাদের কার্য্যও আছে, গতিও আছে। উদ্দেশ্যবিহীন কিছুই প্রকৃতির ভাণ্ডারে নাই। সকলই উদ্দেশ্যপূর্ণ। আমাদের জীবনও উদ্দেশ্যপূর্ণ। কি উদ্দেশ্য আমাদের, তাহা আমরা কি জানি? তুমি বড়, তোমার গৌরবে জগৎ অহঙ্কৃত, তোমার কাছে আমাদের অস্তিত্ব অনাদৃত, কিন্তু তুমি অগ্রে যাইবে কি আমরা যাইব, তাহা কিছুই আমরা জানি না। জানি না, তুমিই অধিক কার্য্য করিবে,না আমরা করিব?—এইমাত্র জানি, বড় ছোট সকলই উদ্দেশ্যপূর্ণ, সকলেরই কার্য্য আছে। কাহার দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হইতেছে, জানি না,—ও অনন্ততত্ত্ব বুঝিতে যাইয়া আমরা বিস্ময়ে ডুবিয়া গিয়াছি—ও গভীর শাস্ত্রের কুল কিনারা পাই না। আমরা যাহা জানি, তাহা এই,—বড় ছোট সকলই আছে—কেবল অনন্তত্ব প্রচার করিতে!—তোমরাও করিতেছ, আমরাও করিতেছি। হিংসা বিদ্বেষ করিলে ভাই কি হইবে? তোমার পার্শ্বে আমি না থাকিলে, সৃষ্টির গভীর উদ্দেশ্য সফল হয় কই? বড়র ধারে ছোট না থাকিলে চলে কই? বড় জীবিত থাকিলে, ছোট মরিবে, যে মনে করে, সে মূর্খ! মহাগৌরব-স্ফীত ইংলণ্ড আছে বলিয়া ভারত-সমাজ মরিয়া যাইবে, তুমি ভাবিতেছ? ইংরাজি ভাষার সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির নিকটে সামান্য বাঙ্গালা ভাষা নিবিয়া যাইবে, মনে ভাবিতেছ!—হ্যাট কোটের তাড়নায় ধুতি চাদর উড়িয়া যাইবে, ভাবিতেছ;—সুসভ্য ইংরাজের অস্তিত্বে বাঙ্গালী বিলুপ্ত হইবে, মনে করিতেছ? তোমার ন্যায় মূর্খ আর কে আছে। ইংলণ্ডের যদি প্রয়োজন থাকে, তবে ভারতেরও আছে, ইংরাজি ভাষার যদি আবশ্যকতা থাকে, তবে বাঙ্গালা ভাষারও আছে; হ্যাট কোটের প্রয়োজন থাকিলে ধুতি চাদরেরও প্রয়োজন আছে। জ্ঞান চাইত প্রেমও নাই—বীর্য চাই ত কোমলতাও চাই;—কার্য্য চাই ত শান্তিও নাই। মানুষ কেবল যুদ্ধ করিবে না, যোগসাধনও করিবে। মানুষ কেবল কার্য্য করিবে না,বিশ্রামও করিবে। মানুষ কেবল শীতে মজিবে না, গ্রীষ্মও ভোগ করিবে। একের অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব যায় না,—তা বড়ই হউক, আর ছোটই হউক। শীত-প্রধান রক্তপিপাসু ইংলণ্ডের হ্যাটকোট, গ্রীষ্মপ্রধান যোগধর্ম্ম-লালায়িত ভারতে কখনই চির-আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। ইংলণ্ড যদি বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকে তবে ভারত আধ্যাত্মিক বলে পারিবে। এক উদ্দেশ্য কখনই দুইয়ের হইতে পারে না। যাহা ভারতের অদৃষ্টে নাই—তাহা কখনই হইবে না। কখনই হইবে না, —রক্তপিপাসা কখনই ভারতের প্রেমপূর্ণ

চিরশান্তিময় বুকে স্থান পাইবে না। ভারতের বীরত্ব হৃদয়ে ;—ভারতের শক্তি হৃদয়ে। ভলণ্টিয়ার শ্রেণীতে যাইবার জন্যই ব্যস্ত হও, আর গৃহে বসিয়া কুস্তিই কর,—হৃদয়-শূন্য পশুর বৃত্তি ভারতের নহে। হ্যাটকোট ভারতে টিকিবে না—শুধু বাহুবলে ভারত কখনই জয় লাভ করিতে পারিবে না। ভারতের শক্তির রাজ্য—হৃদয়ে। কেন ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছ?—কেন হৃদয়শক্তির স্থানে পাশবশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছ? ও আকাশকুসুম সদৃশ বাসনা কখনই পূর্ণ হইবে না। বিশেষত্ব ঘুচিবে না—একের অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না। ভারত থাকিবে—ভারতের জাতি থাকিবে, ভারতের ধর্ম্ম থাকিবে—ভারতের ভাষা থাকিবে। ভারতকে ঘৃণা করিয়া ইহার প্রতি কেহ চাহিও না, ভারতের ধর্ম্মকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখ,—ভারতের অভিনব ভাষাকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখ, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, বৈচিত্র্য যদি সৃষ্টির লক্ষ্য হয়,—সকল বস্তুতেই যদি অভ্রান্ত সত্য থাকে,—সকল সত্যই জয়যুক্ত হওয়া যদি বিধির নিয়ম হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, একদিন এইপরপদদলিত ভারতের ধর্ম্ম,—পুণ্য-পবিত্রতা, শান্তি ও প্রেম, জগৎকে জয় করিতে পারিবে,—ভারতের মলিন ভাষা, এক দিন আপন ক্রোড়ের লুক্কায়িত সত্য-রত্নের দ্বারা জগৎকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে। বৃহতেও সত্য আছে, ক্ষুদ্রেও সত্য আছে ;—শীত-প্রধান দেশেও আছে, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেও আছে,—সকল মিলিয়াই সৃষ্টি-সিন্ধু। তুচ্ছ করিলে চলিবে কেন?—ঘৃণা করিলেই বা হইবে কেন? বৃহৎ ক্ষুদ্র, ছোট বড়—সকল মিলিয়াই—অনন্ত। অনন্তেরই লীলা—ক্ষুদ্রে ; অনন্তেরই লীলা—বৃহতে। আবার ক্ষুদ্র বা কে, বৃহৎ বা কে? সময় ভেদে, উদ্দেশ্য ভেদে, ক্ষুদ্রই বৃহৎ ; বৃহৎই ক্ষুদ্র ; যাহার যে কার্য্য, তাহাতেই সে বৃহৎ। লেখক, লেখার জন্য বৃহৎ ; বক্তা, বক্তৃতার গুণে বৃহৎ। রাজা, রাজ্য শাসন করিবার শক্তিতে বৃহৎ ; প্রজা, কৃষি কার্য্যের জন্য বৃহৎ। এক জনের কার্য্য অপরের দ্বারা সংসিদ্ধ হয় না যখন, তখন কাহাকে ছোট, কাহাকে বড় বলিবে? আপন আপন রাজ্যে, সকলেই বৃহৎ। বৃহৎ হইয়াও, অনন্তের সহিত তুলনায় সকলই অতি ক্ষুদ্র। তারতম্য, ভেদাভেদ, এ সকল কেবল কূট বুদ্ধিপরিচালনার ফল। যাহার হৃদয়ে বল আছে, সেও আদরের, যাহার বাহুতে বল আছে, সেও আদরের। জ্ঞানী, জ্ঞানীকেই বড় মনে করে, প্রেমিক প্রেমিককেই বড় দেখে। যোদ্ধা যোদ্ধাকেই অধিক পূজা করে, ধার্ম্মিক ধার্ম্মিককেই অধিক ভালবাসে। যাহার মন যে দিকে, সে তাহাকেই বড় দেখে। গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলে,—বড় ছোট এ ভেদাভেদ বিশেষ ভাবাপন্ন বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের চিন্তার বিকৃত ফল মাত্র ;—বাস্তবিক বড় ছোট, এ ভেদাভেদ আর থাকে না—সকলকেই আপন আপন বিশেষত্বে প্রধান বলিয়া বোধ হয়। সকলই যেন অনন্তের কণা। অনন্তের নিকট বৃহৎও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রও ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র বাদে অনন্তত্ব পূর্ণ হয় না, বৃহৎ বাদেও হয় না। কাহার দ্বারা কি কার্য্য হইবে, কে জানে, কাহার কি উদ্দেশ্য, কে জানে? সকলকেই আদর করিতে হইবে। সকল বস্তুতেই শক্তির ক্রীড়া। শক্তি মাত্রই আদ্যাশক্তি-প্রসূত। [illegible]

বিদ্যমান। পরস্পরকে আদর করিতে করিতে, অনন্ত শক্তিসাগরে যাইয়া অস্তিত্বকে ডুবাইতে হইবে।—যাইতে যাইতে, পাইতে পাইতে, অনন্তত্বে নিমগ্ন হইতে হইবে। আমরা সকলেই অনন্তের পথে খেলা খেলিতেছি। আমরা যাহা করিতেছি, এ সকলই অনন্তের কণা। তোমার ভিতরে এক অনন্ত রাজ্য, আমার বুকের ভিতরে আর এক অনন্তের রাজ্য। ভাবিয়া, চিন্তা করিয়া, কে শেষ করিতে পারে? গভীরভাবে যখন প্রকৃতিতত্ব চিন্তা করিতে বসি, তখন একেবারে বিস্ময়ে নিমগ্ন হই। একটী বালুকণা বা একটী ক্ষুদ্র সামান্য কীট হইতে, সুবৃহৎ পর্ব্বত বা মহান মানুষ-সাগর, এ সকলের ভিতরেই এক অনন্ত রাজ্য। জড়কেও সীমাবদ্ধ ভাবা যায় না,—অণু হইতে পরমাণুতে যাও,—যাইয়া বুঝিবে,—সেখানেও অনন্ত, আর কূল কিনারা নাই। মানুষ বুঝিতে যাইয়া, ধরিতে যাইয়া, শেষে পরাজয় স্বীকার করে। কোন তত্বেরই শেষ তত্ব মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞান, বিদ্যা বা শক্তি ধরিতে পারে না। মানুষ আপন তত্ব জানে না, পরতত্বও জানে না। কিসের বা অহঙ্কার, কিসের বা আত্মাভিমান! আত্মবোধ বা পরবোধ, কোন বোধেরই শেষ নাই! হায়, মানুষ কত ক্ষুদ্র! হায়, মানুষ যাহা জানিয়াছে বা জানিবে, তাহা কত সঙ্কীর্ণ! মানুষ অনন্ত শক্তি-সাগরে অবশেষে অবশ অঙ্গকে ভাসাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে। যখনই মানুষের প্রাণে এ বোধ জন্মিতেছে যে, কিছুই জানা বা বুঝা হইল না, তখনই শরীর অবশ হয়;—তখনই দেহকে ভার বলিয়া বোধ হয়;—মানুষ তখন ইচ্ছা করিয়া অনন্তে ঝাপ দিয়া মরে। পতঙ্গ তখন ইচ্ছা করিয়া অগুনে শরীরকে পোড়াইয়া সুখী হয়। যত দিন অনন্তত্ব বোধ না হইতেছে,;—যত দিন মানুষের প্রাণ বিশাল-বিস্তৃত আকাশে না উঠিতেছে,—যত দিন উদারতার বিশ্ব-বিস্তৃত ক্ষেত্রতত্ব হৃদ্‌বোধ না হইতেছে;—ততদিন ক্ষুদ্র শরীর-বাহনে ক্ষুদ্র মানুষ চলিতেছে, ফিরিতেছে,—উঠিতেছে, বসিতেছে। তাহাই বা কত দিন? অনন্তের সহিত তুলনায় এক মুহূর্ত্ত মাত্র। মানুষ-পতঙ্গ এক মুহূর্ত্ত জীবন লইয়া মাতামাতি করিতেছে—পরে জীবনকে ডুবাইয়া দিতেছে! একজন যাইতেছে, তাহার পশ্চাতে আর একজন আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে আর একজন,—এমনি করিয়া অনন্তের চক্র পূর্ণ হইতেছে! এক, দুই, তিন, গণিতে গণিতে শেষে অনন্ত হইয়া যাইতেছে। যত দিন এই গভীর অনন্ততত্ব হৃদ্‌বোধ না হইবে, তত দিনই অহঙ্কার বা সঙ্কীর্ণতা, এবং ততদিনই মানুষের পৃথিবীতে স্থিতি। তত্বজ্ঞান জন্মিলে—মানুষ আর থাকিতে চায় না—অমনি মাথা হেট করিয়া ঝাপ দিয়া পড়িয়া মরে। জ্ঞানী নিউটন এমনই করিয়া মরিয়াছেন, প্রেমিক নিমাই এমনই করিয়া ঝাপ দিয়াছেন। অনন্তত্ব বুঝা ভার, অনন্ত কার্য্য সম্পন্ন করা কঠিন, অনন্ত কর্ত্তব্য পালন করা অসাধ্য, এ বোধ জন্মিলে মানুষ আর টিকিতে পারে না। যে ক্ষুদ্র বালক নিমাই বাহু দিয়া মাতাকে বাল্যকালে কত আদরে বুকে পূরিতে চাহিত, সেই প্রেমিক-গৌরাঙ্গ যুবক হইয়া কত জনকে কোল দিয়া কৃতার্থ হইলেন! কিন্তু যখন বুঝিলেন—কোলকে অনন্তে প্রসারিত না করিতে পারিলে আর চলে না,—সীমাবদ্ধ ভালবাসাতে যখন আর

তাঁহার তৃপ্তি হইল না, তখন তিনি অনন্তে শরীরকে বিসর্জ্জন দিলেন! কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ?—বলিয়া সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত নরনারী কত কাঁদিতেছে, কিন্তু সোণার চাঁদ আর নদিয়ায় ফিরিলেন না,—নীলাচলে যাইয়া অনন্ত নীলিমায় মিশিয়া গেলেন। পবিত্রাত্মা যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশকাষ্ঠ হইতে নামিলেন না কেন?—তোমরা জান কেহ? অনন্ত কর্ত্তব্য শেষ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি অনন্তে মিশিলেন, ফিরিলেন না। আশা ততক্ষণ মানুষকে ভুলাইতে পারে, যতক্ষণ মানুষ সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ। আশা যখনই কল্পনা বলিয়া বোধ হয়,—আত্মা মন যখনই অসীমে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন আর স্বার্থপূর্ণ বাসনা থাকে না,—তখন কেবল বিস্ময়, কেবলই নিরাশা—কেবলই হতাশ-সঙ্গীত মানস-সরোবর হইতে উত্থিত হইতে থাকে। মানুষ ততদিনই শরীরের যত্ন করে, যতদিন শরীরের অতীত কোন তত্ত্ব সে জ্ঞাত না হয়;—মানুষ ততদিনই পরিবার প্রতিপালন করে, যত দিন জগতের অন্য কোন কিছুর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের দ্বার অবরুদ্ধ থাকে। আপন শরীর এবং পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে, যখন মানুষের আত্মা আরো বিস্তৃত হয়,—তখন মানুষ আর শরীর-গৃহে বদ্ধ থাকিতে পারে না। শরীরের প্রেম পরিবারে যায়, পরিবারের প্রেম দেশ দেশান্তরে যায়;—শেষ যখন অনন্ত কর্ত্তব্য হৃদ্‌বোধ হয়, তখন মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া, নিরাশ অন্তরে, ঝাপ দিয়া মরে। মানুষ এমনই করিয়া কত উল্লাসে পথ ধরিতেছে,—কত নিরাশায় পলায়ন করিতেছে। আশা ভরসা—কালে সকল মহা আঁধারের কোলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। যত দিন সে অনন্ত-বোধ না হইতেছে, তত দিন ইচ্ছা করিলেও কেহ মরিতে পারে না। জীবন মায়া বিষম মায়া;—কেহই পরিত্যাগ করিতে চায় না। মরিতে কাহার সাধ? সকলেই জানেন, সকলেরই মরিতে অসাধ;—কিন্তু এক সময়ে আবার সকলেই মরিতেছেন! এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াও মানুষ মরিতে পারে না,—আর এক সময়ে বাঁচিয়া থাকিতেই আর ইচ্ছা যায় না। সীমা বোধ যতদিন, ততদিন মায়া, ততদিন মোহ;—অনন্ত বোধ যখন, তখনই মহাবৈরাগ্য—তখনই দেহ-বিসর্জ্জন! আমরা আজও যে আছি, তাহার কারণ আজও আমাদের অনন্তত্ব-বোধ জন্মে নাই। আজও যেন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে হইতেছে;—আজও যেন পাইতে ইচ্ছা হইতেছে,—দিতে ইচ্ছা হইতেছে;—আজও ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিতে ইচ্ছা হইতেছে;—আজও ভারতকে একপ্রাণে বাঁধিতে ইচ্ছা হইতেছে। যখন এভাব থাকিবে না,—ভারত হইতে কর্ত্তব্য প্রসারিত হইয়া যখন জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে—তখন নব্য ভারত কূলকিনারা ভুলিয়া অকূল অনন্তকাল-সাগরে বিলীন হইয়া যাইবে;—কেহ চিহ্নও দেখিবে না। তোমার ইচ্ছাতেই আমরা মরিব না,—কেহই মরিবে না। মরিবার পথ আপনা হইতেই পরিষ্কার হইয়া আসিবে। ভয় নাই—অনন্ত কাল এ জীবন-লীলা থাকিবে না;—এক অবস্থায় পৃথিবীর কিছুই থাকিতে পারে না। সকলই ক্রম-বিকাশের অধীন, সকলেই উন্নতির যাত্রী। আজ আছি বলিয়া অনন্ত কাল এখানে এ ভাবে থাকিব না। আজ সীমার পূজা করিতেছি বলিয়া চিরকালই করিব না।

আবার অনন্ত কাল থাকিব না বলিয়া, আজই মায়া ছিন্ন করিতে পারি না। জীবন-মহাশাস্ত্র এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। এক ক্ষুদ্র জীবনেই কত উদ্দেশ্য—কত অনন্ত ভাব। অথবা ক্ষুদ্রই অনন্তের দর্পণ স্বরূপ। ক্ষুদ্র-বোধ আছে বলিয়াই অনন্ত-বোধ হইয়াছে—বিস্ময়পূর্ণ ভক্তিতে মানুষ পূর্ণ হইয়া, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, অনন্তে ডুবিতে ছুটিতেছে। ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য লইয়া, সামান্য কর্ত্তব্য পালনের জন্য, অতি ক্ষুদ্র আমরা যে আজও রহিয়াছি, এ অনন্তের লীলা বই আর কিছুই নহে। অনন্তের লীলা প্রচার করিবার জন্য, নব সময়-সাগরে সূক্ষ্ম বারিবিম্ব আবার মাথা তুলিল। যখন আশা কল্পনায় পরিণত হইবে—বিশ্ব-সৃষ্টির অনন্তত্ব বোধ হইবে—অনন্ত কর্ত্তব্যের প্রশস্ত দ্বার খুলিয়া যাইবে, —প্রেম-উদ্বেলিত হৃদয় যখন সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের চিন্তায় অবশ হইবে,—বুদ্ধি বা জ্ঞান যখন কূলকিনারা নির্ণয়ে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িবে;—কর্ত্তব্য-পালন যখন অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে, তখন এ ক্ষুদ্র বারি-বিম্ব পুন অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া যাইবে;—কেহ চিহ্নও দেখিবে না। ক্ষুদ্র শক্তি তখন অনন্তে মিলিবে,—এক তখন শত, শত তখন অনন্ত হইয়া যাইবে। যত দিন সে দিন উপস্থিত না হইতেছে, তত দিন আমাদের অস্তিত্ব অনিবার্য্য।

জাতিভেদ

জাতিভেদ কোন না কোন আকারে সকল দেশেই প্রচলিত আছে। কোন দেশে ইহা বংশগত, কোথাও কর্ম্মগত এবং কোন কোন দেশে এই উভয় আকারেই বিদ্যমান আছে। ইউরোপীয় সমাজে সাধারণত কর্ম্মগত জাতিভেদ প্রচলিত, কিন্তু পিয়ারদিগের মধ্যে এখন উহা বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। যখন সমাজের সকল লোক এক অবস্থায় ছিল, অর্থাৎ যখন প্রকৃত সমাজ গঠিত হয় নাই, সেই আদিম অবস্থায় সকল দেশেই এক একটী মণ্ডলী ছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। যখন সমাজ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং কর্ম্মের বিভাগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িল, সেই সময় হইতেই জাতির সৃষ্টি হইল। প্রথমে যেমন ব্যবসায় অল্প ছিল, সেইরূপ জাতির সংখ্যাও অল্প ছিল। ভারতবর্ষে কেবল চারিটী মাত্র ছিল। এই চারি মূল জাতি হইতে বর্ত্তমান "উন-ষষ্টি" জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। অনুলোম বিবাহ, প্রতিলোম বিবাহ, ব্যবসায়, গুণ ও ধর্ম্ম হইতে এই সমস্ত জাতির উৎপত্তি।

সমাজ গঠন করিতে হইলে, ব্যবসায় ও কর্ম্মের বিভাগ করা অনিবার্য্য। প্রথমে যখন ব্যবসায় বিভাগ হইবে, তখন তাহা বংশগত হইবেই হইবে। অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় আরম্ভ হইলে, তাহা এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর বা শাখার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, তখন বিনিময় হওয়া অসম্ভব। যদি এক একটী মণ্ডলী নিজ নিজ ব্যবসায় পুরুষানুক্রমে না করে, তাহার উন্নতি হওয়া কঠিন।

যখন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন ব্যবসায়ের বিনিময় ও স্বাধীনতা হইতে পারে। ভারতবর্ষে যখন আর্য্য জাতি আসিলেন, তখন তাহারা সকলে এক জাতি ছিলেন, এবং আদিম নিবাসীগণ একজাতি হইলেন। ক্রমে আর্য্যগণ আবার তিন জাতিতে আপনাদিগকে বিভক্ত করিলেন। এই তিন জাতির ভিতর প্রথমে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও ভোজ্যান্নতা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মণ জাতির আধিপত্য বিস্তার হওয়ায়, ব্রাহ্মণ কন্যাকে অন্য সকল জাতির বিবাহাধিকার রহিত হইল, কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণ অপর সকল জাতির কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন। প্রথমে এদেশে জাতিভেদের সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রব ছিল না, উহা ধর্ম্মানুশাসিত ছিল না। যেমন অপরাপর উন্নত শ্রেণীর লোক অন্য সকল লোককে আপনাদিগের অধীনে রাখিতে চেষ্টা করিত, ভারতবর্ষেও ঠিক সেইরূপ ছিল। রোমে যেমন প্লিবিয়ান ও পেট্রিসিয়ান দুই শ্রেণী ছিল, ভারতবর্ষেও সেইরূপ আর্য্য ও অনার্য্য। আর্য্যগণ আপনাদের বংশমর্য্যাদা রাখিবার জন্য কঠোর নিয়ম সকল করিলেন। নিজের শত শত দুষ্ক্রিয়ার কোন দণ্ড নাই, শূদ্রের সামান্য অপরাধের গুরুতর দণ্ড।

ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত এই সকল নিয়মশাস্ত্র আমাদের দেশে ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত, সেই জন্য জাতিভেদ ক্রমে ধর্ম্মানুশাসিত হইয়া পড়িল। ঐ নিয়ম-শাস্ত্রের আর সংশোধন বা পরিবর্ত্তন হইবার উপায় নাই। উহাকে মানিতেই হইবে। তবে ইংরেজদিগের শাসনাধীনে কতকগুলি নিয়ম এখন অব্যবহার্য্য হইয়াছে। কাহাকেও কোন অপরাধের জন্য আর শারীরিক দণ্ড বিধান করিবার ক্ষমতা নাই। শূদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি কোন অপরাধ করিলে আর তাঁহার শিরশ্ছেদন, বা অঙ্গচ্ছেদন করিবার যো নাই। কেবল সামাজিক দণ্ড গুলি এখনও প্রদত্ত হইতে পারে। শূদ্র এখন ব্রাহ্মণের অপমান করিলে রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে হয়। এবং যদি কোন সামাজিক দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা থাকে, যথা প্রায়শ্চিত্তাদি, তাহা বিহিত হইতে পারে। কিন্তু যদি শূদ্র সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে অসম্মত হয়, ব্রাহ্মণদিগের তাহা বলপূর্ব্বক করাইবার ক্ষমতা নাই। ইংরেজ-জাতি ভারতে না আসিলে বোধ হয় আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রকারগণই এদেশের শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। কোন নিয়ম যে যুগব্যাপী হইয়া অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকিতে পারে, ইহা আর কোন দেশে দেখা যায় না। রোমে আর এখন 'পেট্রিসিয়ান নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ আছে। ইহার কারণ বড় অধিক অনুসন্ধান করিতে হয় না। ব্রাহ্মণেরা এমনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, শূদ্রজাতি কেবল দাস্যবৃত্তি করিবে, তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা করিবার অধিকার নাই। তাহাদের শাস্ত্রবাক্য-উচ্চারণের অধিকার নাই। তাহাদের গৃহানুষ্ঠানের সময় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, আর শূদ্রকে বলেন, "নম নম" বল। অনেক বিদ্যাভিমানীরাও ঐ "নম নম" বলিয়া থাকেন। অনেক সময় অশিক্ষিত, দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ, সাধু সুশিক্ষিত শূদ্রের উপর এই প্রকার আধিপত্য করিয়া থাকে। এখন যাহা কিছু সংস্কার হইয়াছে, তাহা কেবল ইংরাজদের প্রতাপে।

এখন ভারতবর্ষে পূর্ব্বের ন্যায় জাতিভেদ আছে কি না? আমরা এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারি—নাই। স্মৃতি শাস্ত্র সেই আছে, ব্রাহ্মণের পদ সর্ব্বত্র সেরূপ নাই। কতকগুলি মৃত ক্রিয়া কর্ম্মে কেবল ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় এবং তাহাতেই তাঁহাদের যাহা কিছু গৌরব রক্ষিত হইয়াছে। নতুবা এখন শূদ্র সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে, ব্রাহ্মণ বেদ জানেন না, শূদ্র তাহার অর্থ পর্য্যন্ত করিতেছেন। এখন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে শূদ্র বলিব না ব্রাহ্মণ বলিব? আর শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিব না শূদ্র বলিব? ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহা মহা সভাতে সভাপতির আসন লাভ করিবেন, কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণ সে সভাতে প্রবেশ করিতেই পারিবেন না। শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এখন জাতির মর্য্যাদা নাই, কেবল গুণের মর্য্যাদা। পূর্ব্বের জাতিভেদে যে এখন আর বিশ্বাস নাই, তাহা এই কয়েকটী বিষয় দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে।

১। শাস্ত্রালোচনা সম্বন্ধে এখন জাতির বিচার নাই। শত শত শূদ্র এখন বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। কেহ কেহ বলিবেন যে, পূর্ব্বেও বিশ্বামিত্রাদি শাস্ত্রালোচনা করিতেন। কিন্তু সেরূপ লোকের সংখ্যা কত? অত্যন্ত বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ কারণে পুরাকালে শূদ্র বেদাদি অধ্যয়ন করিতে পাইতেন, কিন্তু এখন ঐ অধিকার সকলেরই আছে এবং সমাজ তাঁহাদিগকে স্মৃতি-নিরূপিত দণ্ড বিধান করিতে অক্ষম। যাঁহারা এই জাতিভেদকে রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সম্প্রতি যে ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য এক খানি মাসিক পত্র প্রচার হইতেছে, তাহা একজন শূদ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং তাহার নিয়মিত লেখকদিগের মধ্যে ১৮ জন ব্রাহ্মণ এবং ৯ জন শূদ্র।

২। শূদ্র এখন শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ধর্ম্মনীতি রচনা করিয়া প্রচার করিলেন; এবং শিক্ষিত লোকেরা তাহার বিধানমত আমিষ ভক্ষণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কত শূদ্র সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রণয়ন করিতেছেন।

৩। কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, যাঁহার যুক্তি সারগর্ভ, তিনি শূদ্র হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

৪। শূদ্র জমীদার, ব্রাহ্মণের নিকট কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পূর্ব্বকালে কর গৃহীত হইত না। ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের জন্য পূর্ব্বের রাজারা ভূমি ও ধনাদি দান করিতেন। এখন আমাদের ভূম্যধিকারীরা ব্রাহ্মণের সম্পত্তি হরণ করেন এবং তাঁহাকে কেবল মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করেন। অনেকেই অবগত আছেন যে, শূদ্র ভূম্যধিকারীরা ব্রাহ্মণের দণ্ডবিধান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

৫। এখন ব্রাহ্মণ শূদ্রের কার্য্য করেন, শূদ্র ব্রাহ্মণের কার্য্য করেন, ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণও পতিত হন না এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণের অধিকার অপহরণ করায় দণ্ডিত হন না। ব্রাহ্মণ ভূমিকর্ষণ করিতেছেন, বাণিজ্য করিতেছেন, দাসত্ব করিতেছেন, কিন্তু পতিত হন না।

৬। খাদ্য বিচার ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। তবে প্রকাশ্যে কেহ সাহস করিয়া

অন্য জাতির সহিত আহার করিতে পারে না, কিন্তু তাহাতে আপত্তি নাই। শত শত লোক ইংরেজদিগের হোটেলে সকল প্রকার খাদ্য (ও অখাদ্য) ভোজন করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃত্রিম অনৈসর্গিক জাতিভেদ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া, স্বাভাবিক ও কল্যাণকর জাতিভেদ-প্রথা অলক্ষিত ভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজ কত দিন চলিতে পারে? অনিষ্টকর অত্যাচার-মূলক কোন প্রথা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। আমাদের দেশের প্রাচীন জাতিভেদ-প্রণালী এক্ষণকার ন্যায় অস্বাভাবিক ছিল না। তখন যাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারাই জ্ঞান ধর্ম্ম সমন্বিত ছিলেন; শূদ্রেরা অজ্ঞ পশুপ্রকৃতি বিশিষ্ট ছিল, সুতরাং তখন অন্যায় পূর্ব্বক কেহ উচ্চ পদ গ্রহণ করে নাই। শূদ্র জাতির তখন কোন গুণ ছিল না, সুতরাং তাহারা দাসত্ব বরিত। কিন্তু যে সকল শূদ্র জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইত, তাহাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করাও হইত।

বংশগত জাতিভেদ সমাজের পক্ষে কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম বলিয়াই একজন চিরকাল ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে পারে না। "দুঃশীলোপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়" এই ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ, অস্বভাবিক, অনিষ্টকর মত কতকাল কার্য্যত প্রতিপালিত হইতে পারে? ইহা সমস্ত ধর্ম্মনীতি ও সমাজ-তত্ত্বের বিরুদ্ধ; মনুষ্য-স্বভাব কখনও ইহাকে সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্য হিন্দুসমাজ এ মতকে অধিক দিন পোষণ করিতে পারে নাই। যত দিন রাজদণ্ডের ভয় ছিল, তত দিন দুঃশীল ব্রাহ্মণ পূজ্য ছিল। কিন্তু দণ্ডভয় এখন আর নাই, এখন বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্র পূজ্য হইতেছে এবং দুঃশীল দ্বিজ ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। বংশগত জাতিভেদ থাকিলে গুণের মর্য্যাদা থাকে না। ব্রাহ্মণ যদি দুঃশীল হইলেও মর্য্যাদা পাইতে পারে, তাহা হইলে সে ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিতে ও জ্ঞানার্জ্জনে বিরত হইতে ভীত হইবে না। যে আপনার প্রকৃতিকে নীচ করে, যে ব্যক্তি জ্ঞান ধর্ম্মার্জ্জনে বিমুখ হয়, সে আপনার কর্ম্মদোষেই আপনার মহত্ত্ব হারাইতেছে, প্রকৃতি তাহার প্রতিকূল, ধর্ম্মনীতি তাহার বিপক্ষ। যাহার মহত্ত্ব নাই, তাহাকে কেবল স্মৃতি-শাস্ত্র বলিয়াছে বলিয়া কি কেহ মহৎ করিতে পারে? জনসমাজ মৃত শক্তির দ্বারা কখনও চালিত হইতে পারে না। জীবন্ত নীতি ও ধর্ম্ম, সমাজের নেতা। বটবৃক্ষ যদি স্বজাতীয় উন্নতি লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে কে আদর করে? তবে কেহ এরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, এক এক বংশের এক একি প্রকার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলে সে কার্য্যের উন্নতি অধিক হয়, এবং সে বংশের লোক তৎকার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করে। এ যুক্তিতে কিছু সার নাই। জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা কোন বিশেষ ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে পারে না, ইহা সকলেরই পক্ষে সমান কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বভাবত জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে ব্যগ্র হয়, শাস্ত্রবিধি দ্বারা তাহাকে বাধ্য করিতে হয় না। যদি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোক কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে, তবে সকলের সে অধিকার থাকিলে যে সে প্রকার হইবে না কেন, তাহার কোন কারণ

নাই। ঈশ্বর কোন বিশেষ জাতিকে কোন বিশেষ শক্তি ও অধিকার দিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সকলে একই ইন্দ্রিয়, একই বৃত্তি ও একই ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কেবল পরিচালনার অভাবে, কাহার শক্তি গুলি অপরিস্ফুট থাকে এবং সম্যক পরিচালনা দ্বারা কাহারও বা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কার্য্যত দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণের শাস্ত্রালোচনা ও জ্ঞানোপার্জ্জন ও সদাচার কুলধর্ম্ম হইলেও, অনেক ব্রাহ্মণ তাহাতে হীন-কর্ম্ম, কিন্তু শূদ্রের পক্ষে ঐ সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেক শূদ্রকে শাস্ত্রজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশে শাস্ত্রানুশীলন অথবা বাণিজ্যাদির বদ্ধভাব নাই। তথায় জ্ঞানোন্নতির পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাত দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং স্বাধীনতা থাকায়, অধিক উন্নতি হইতেছে। অল্পলোকের মধ্যে কোন কার্য্য বদ্ধ থাকিলে তাহার উন্নতির পক্ষে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হয়।

জাতিভেদ সেই জন্য জ্ঞান ধর্ম্মোন্নতিমূলক হওয়াই স্বাভাবিক। যিনি যে পরিমাণে জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নত হইবেন, তিনি সেইরূপ পদমর্য্যাদা লাভ করিবেন। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি যদি গুণহীন হন, তিনি ব্রাহ্মণত্ব হারাইবেন এবং শূদ্রাদিরাও যদি গুণবিশিষ্ট হন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই প্রণালীতে এখন সমাজ চলিতেছে। কেবল বিবাহ ও ভোজনাদিতে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু গুণহীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা গুণান্বিত শূদ্র সমাজে অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন। ধর্ম্মনীতির উচ্চতম আদর্শে সমাজ সংগঠিত না হইলে, সে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। স্বার্থপরতা দ্বারা যে সমাজ পরিচালিত, তাহার পরিণাম দুঃখ। উচ্চতম ধর্ম্মনীতির আদর্শ কোন সমাজেই সম্পূর্ণ রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্ম, সকল পদার্থ ও প্রাণীকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া প্রচার করে,* কিন্তু কার্য্যকালে এই মত সমাদৃত হয় না। জাতিবিশেষকে স্পর্শ করিলে হিন্দুগণ আপনাদিগকে অশুচি মনে করেন, এমন কি, তাহাদের ছায়াস্পর্শ করিলে স্নান করা বিধেয় বলা হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম সকল মনুষ্যকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করিতে আদেশ করে, কিন্তু খ্রীষ্টানেরাই আফ্রিকা ও আমেরিকাতে দাস ব্যবসা করিত এবং এখানো ভারতবর্ষে আমাদিগকে কোনও বিষয়ে সমান অধিকার দিতে প্রস্তুত নহে। স্বার্থপরতাতে মনুষ্য অন্ধ হইয়া, অন্যের অধিকার অপহরণ করে। অতএব দেখা যায়, যদিও মতে আমরা জাতিভেদ অস্বীকার করি, কিন্তু কার্য্যে তাহা কোন কোন স্থলে রক্ষা করিয়া থাকি। যাঁহারা সকল মনুষ্যকে ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরের সন্তান বলেন, তাঁহারাও সকলকে সমান অধিকার প্রদান করেন না। আমরা যদিও নিকৃষ্ট জাতির শিক্ষিত লোকদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করি, কিন্তু ঐ সকল জাতির লোক যদি অশিক্ষিত হয়, অথবা যদি নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে আর তাহাদের সহিত উপবেশন করি না। একজন সূত্রধর বা গোপ, অথবা রজক যদি ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে

* নবজীবন—বৈশাখ—১২৯২—"সোহং" প্রবন্ধ দেখ।

কোন উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়, আমরা তাহার সহিত সভাতে একত্রে উপবেশন করিয়া থাকি, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষা না পাইয়া থাকে, অথবা গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন উচ্চপদ লাভ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত উপবেশন করা দূরে থাকুক, তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাও কহি না। ভৃত্যের সহিত কেহ একাসনে উপবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন না, একজাতি হইলেও তাহার সহিত আহারাদি করেন না।

আমরা উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম, তদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে—

১। যাঁহারা জ্ঞান ধর্ম্মোপার্জ্জন দ্বারা আপনাদিগকে সমুন্নত করিবেন, স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহারা সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিবেন। তাঁহারা যে বংশ বা জাতি হইতে উৎপন্ন হউন, তাঁহাদিগের গুণের মর্য্যাদা করিতেই হইবে।

২। যাঁহারা গুণবিশিষ্ট হইতে পারিবেন না, তাঁহারা সে মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ভদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া কেহ তাঁহাদিগকে সমাজে উচ্চাসন দিতে সম্মত হইবে না।

৩। শাস্ত্রের ব্যবস্থা যদি অন্যায় হয়, তাহা লোকে কার্য্যকালে প্রতিপালন করে না। শাস্ত্রে শূদ্রাদির বেদ পাঠ নিষেধ কিন্তু লোকে তাহা অগ্রাহ্য করিতেছে। শাস্ত্রকারেরা বিশেষ বংশের যে বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও ব্যবসা নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, লোকে তদনুসারে চলিতেছে না।

৪। কার্য্য বিষয়ে স্বাধীনতা আবশ্যক। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবেন; যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেইরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিতে অধিকারী হইবেন।

৫। সকল নিয়মের যেমন পরিবর্ত্তন হয়, আমাদের স্মৃতি ও অন্যান্য ব্যবস্থা শাস্ত্রেরও সেইরূপ, সংশোধন হওয়া আবশ্যক। সমাজের যেমন উন্নতি হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কোন শাস্ত্র অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে না।

এখন আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি যে, যখন জাতিভেদ প্রথাতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, এবং কার্য্যত তাঁহারা প্রাচীন প্রথা সকল পরিত্যাগ করিতেছেন, তখন প্রকাশ্যে কেন আপনাদের বিশ্বাস জ্ঞাপন না করেন। আমাদের প্রাচীন নিয়ম সকলের সংস্কার করিবার জন্যও উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের দেশের জাতিভেদ ধর্ম্ম শাস্ত্রানুগত, এবং তাহা প্রতিপালন না করিলে ধর্ম্মাংশে পতিত হইতে হয়। এইরূপ কঠোর নিয়ম থাকায় লোকে সহসা তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু কেহ বিশ্বাস করেন না যে, ইংরেজদিগের অন্ন গ্রহণ করিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, অথবা অন্য জাতির সহিত বিবাহ প্রচলিত করিলে নরকস্থ হইতে হয়। কিন্তু কেহ সাহস করিয়া সেই প্রাচীন প্রথা সকল প্রকাশ্যে উল্লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। গোপনে সকল কার্য্যই হইতেছে। কিন্তু এই কপটাচরণ দ্বারা সমাজের বিষম অনিষ্ট হইতেছে। ইহা দ্বারা লোকের ধর্ম্মনীতি দূষিত, মানসিক সাহস খর্ব্ব, কুক্রিয়া বৃদ্ধি, এবং জাতীয় চরিত্র কলুষিত হইতেছে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

নববর্ষ।

(১)

আয় আয়, মৃত প্রাণ, আমার অন্তরে,
আয় আয় অনন্ত-মন্দিরে।
বহিছে সুসমীরণ,
ছুটিছে নক্ষত্রগণ,
আয় আয় অনন্তে ছুটিয়া,
আয় আয় মৃত প্রাণ, আঁধার ছাড়িয়া।
বসন্ত আমার সাথে;
শরত্ মিলিবে পথে,
শিশির, বরষা, মেঘ মিলিবে কালেতে,
আয় আয় মৃত প্রাণ! পরাণ লভিতে।

(২)

ধীরে ধীরে ডাকি, আয় আয় আয়,
তেজিয়া মরণ, প্রাণ! আয় আয় আয়;
নবীন আলোক আমি,
নবীন পুলক আমি,
নবীন প্রাণের সিন্ধু আমার অন্তরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে আজি আইনু সংসারে।
নব আশা, নবতৃষা,
নবীন নবীন উষা,
চাহিলেই পলকে মিলিবে;
পুরাণ ভুলিয়া যাও,
পুরাণে বিদায় দেও,
পুরাণ ভাবিয়া কি হইবে?
আয় আয়, নবীন আহবে।
থাকিওনা, থাকিওনা মরণে মরিয়া,
ডাকিতেছি যতন করিয়া;
আমি গেলে ফিরিব না আর,
আমি গেলে কি হইবে তোর!

(৩)

মর নাই,—কেবল মূর্চ্ছিত,
তুই চিরদিন অক্ষয় অমর।
বিস্মৃতির বশে আপনা ভুলিয়া,
কাল-সিন্ধুনীরে রহিলি পড়িয়া।
যাহা গেল, তাহা তোর নয়,
যাহা নীল কাল, তাহা কিছু নয়;
অশোক, অজড়, অমর, অব্যয়,
ধ্রুব নিত্য তুমি, তুমি আত্ম-ময়।
একটীও ক্ষত নাই তোমার অন্তরে,
তবুও পড়িয়া কেন মৃত্যুব আঁধারে?
দেব আশা, দেব তৃষা,
দেবের অনন্ত ভাষা,
আছে নাকি সুষুপ্ত অন্তরে?
—তাই ডাকি অনন্ত-মন্দিরে!

(৪)

ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনোরথ লইয়া বুকের কালে,
রহিলি পড়িয়া তুই অনন্ত-মৃত্যুর ঘরে!
মরা মরা আশাগুলি, রাখিয়া কি হবে আর,
আর তো জীবিত নাই, আর কি হইবে তোর?
মৃত শব বুকে করি, কেন ভাস অশ্রু জলে?
একেলা বসিয়া আছ বিষাদের উপকূলে!
অতীত সিন্ধুর জল কল্লোলিয়া যায় ওই,
ভাসাও গলিত শব, ভাসাও প্রাণের ধন!
মৃত্যুর নিশ্বাস বিষ, লাগিলে মরিবি তুই,
দেও দেও ভাসাইয়া হারাধন, হারাজন!
আপনার বাড়ীঘর কোথায় ফেলিয়া দূরে,
বাঁধিয়া শোকের ভার, ডুবিবি অগাধনীরে?
আছে দূরে ভবিষ্যত,
আছে দূরে মনোরথ,
কাঁদিওনা, ডুবিওনা, আয়রে আপন ঘরে,
অনন্ত-মন্দিরে যাহা, সকলি সঁপিব তোরে।

(৫)

আজি ধন্য আমি বিধাতার বরে,
লও লও যাহা আছে আমার অন্তরে,—

নব নব আশা, নব নব তৃষা,
নব নব আকাশের উষা;
নবীন প্রভাতী, নবীন ঝঙ্কার,
নব নব গতি, নবীন সংসার;
নবীন তরঙ্গ,—প্রাণের উদ্দাম,
নব নব সিন্ধু,—প্রাণের বিরাম।
নবীন জগত,
নব ছায়া পথ,
নব নব লক্ষ্য সুপ্রভাত;
নব রণতরী,—বিজয়ী নিশান,
নব তোপধ্বনি,—বিজয়ী সঙ্গীত;
নব জয় মাল্য,—শির-সুশোভন,
নব নব জ্যোতি, উৎসাহে জ্বলিত।
নব তীর্থ, নব মাঠ,
নব নব পুণ্য তট,
নব নব পুণ্য অবগাহ;
নব কল্পতরুকুল, নব মন্দাকিনী,
নব নব অকথিত অনন্ত কাহিনী।

(৬)

আজি ধন্য আমি বিধাতার বরে,
লও লও যাহা আছে আমার মন্দিরে;—
নবীন নয়ন, নবীন কিরণ,
নবীন সন্ধান, নবীন মিলন;
নবীন প্রণয় কথা,
নবীন প্রণয় ব্যথা,
নব মোহ মায়া ভয়, নবীন বন্ধন,
নবীন আলোক, নবীন আঁধার,
নবীন কৌতুক স্রোত,—অনন্ত অপার
নবতরু, নবলতা, নবীন শৃঙ্খল,
নবীন বিবাহ-গীতি উৎসব মঙ্গল।

৭

উড়িছে ভারতী বীনা,
নবীন কবি-কল্পনা,
নব নব কাব্যের ঝরণা;
নব বেদমাতা, নব বেদ গান,
নব নব ছন্দ ভাবের পরাণ;
নবীন রমণী কাব্যের সৃজন,
নব পুণ্য ক্ষেত্রে জ্বলন্ত বর্ণন;
নব কুঞ্জ শোভা ওই,
নব শ্যাম আভা ওই,
নবীন কালিন্দী তট নবীন বাঁশরী,
নব নব্যভারতের অমৃত লহরী।

৮

আয় আয় ক্ষুদ্র প্রাণ! আয় রে অনন্ত ঘরে
কত যে কি দিব তোরে, কে আজি বলিতে
পারে!
অনন্ত ভাণ্ডার আছে,
অক্ষয় জীবন আছে,
এর চেয়ে বর কিছু আছে কি মৃত্যুর ঘরে?
তড়িতের স্রোত ধরি ঢালি দিব তোর হৃদে,
অক্ষয় অনন্ত স্তম্ভ উড়িবে বিমান পথে।
কত সুমঙ্গল ধ্বনি,
কত মহা মহা বাণী,
শুনিয়া শুনিয়া তুই চলিবি আপন পথে;
মহা মহা জীবনের অমৃত লহরী,
মহা মহা জগতের অনন্ত কাহিনী।

৯

নূতন করিয়া তোরে রাখিয়া যাইব আমি,
নূতন আলোকে বিশ্ব আবার লভিবে তুমি,
নব তিথি পক্ষবার,
কাল চক্র অনিবার,
শুভ রাশি শুভ তারা,
শুভ চন্দ্র, শুভ ধরা;
শুভ দিন, শুভ সংবৎসর,
শুভ শুভ গ্রহের সঞ্চার।
সকলি আনিয়া দিব,
সকলে ডাকিয়া দিব,
তবু কেন নেহারিয়া বিষাদে অতীত পানে?
মিলিল নবীন জন্ম আজি নব শুভক্ষণে।

১০

যদি বা অতীত পানে চাহিতে বাসনা তোর,
তাহাও আমাতে আছে তাহাও হইবে তোর।
সোদর "অতীত" যাহা মরণে সঁপিয়া গেল,
সে গাণ্ডীব সে তুনীর আছে ঘরে সমুজ্জল।
সেই ভীষ্ম, সেই দ্রোণ, সে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির,
সেই কবি, সেই গাথা, অক্ষয় অমৃতনীর।

১১

দেখরে চাহিয়া তোর আঁধার ভবন পানে,
কি শোভা ফুটিয়া আজি মরুময় সে শ্মশানে,
কুসুম পল্লব কত, রহিল ফুটিয়া দ্বারে,
মঙ্গল কলসী কত চলিল ডাকিতে তোরে,
পথে ঘাঠে মাঠে ফুল,
প্রাণে আজি ফোটে ফুল,
কাঙ্গাল দরিদ্র ধনী আনন্দে বিহ্বল,
ছুটিছে তরঙ্গে বঙ্গে প্রাণের কল্লোল।
আছে লোক দ্বারে দ্বারে,
বরিয়া লইতে মোরে,
চারি দিকে দেব-আত্মা অজ্ঞাত ছুটিয়া যায়,
আমি যে আইনু ঘরে, কোথা তুই, আয় আয়।

১১

আয় আয় আজি জীব! আয়রে অনন্ত-ঘরে,
কোটী কোটী কোটী চন্দ্র-কিরণে তোষিব তোরে।
বিদ্যুৎ ধরিয়া আজি রাখি দিব পথে পথে,
সোণার সংসার কত ফুটিবে অনন্ত-পটে।
নব নব দ্রব্য গুণ উপহার দিয়া,
বিশ্ব-বক্ষ দিব সাজাইয়া,
প্রকৃতি-রহস্য-তত্ত্ব যেখানে যা পাই,
যতন করিয়া আনি দিব তোর ঠাঁই;
নবীন সংযোগ কথা,
নবীন বিজ্ঞান-প্রথা,
নব নব বিশ্লেষণ, নব সমবায়,
দিক কাল ক্ষিতি তত্ত্ব চেতনা মিলয়
বহু শক্তি একটী করিয়া,
তড়িত আলোক তাপ একে মিলাইয়া;
একটী তরঙ্গ,—ইথারের গতি,
একটী প্রবাহ, একে অনুভূতি,
এক ধাতা, এক বিশ্ব, একটী সংসার,
একতা পরম ধর্ম্ম করিব প্রচার।
নিস্তব্ধ সুদূর হতে,—ব্যোমের অন্তরে,—
একটী কিরণ ধরি আনিব সংসারে,
বুঝি সেই আলোবিন্দু পশেনি ধরায় আর,
বুঝি সেই দেবদূত আইল লইয়া,
একটী তারার বাণী অনন্ত-অম্বরে।
আহা! এ মিলন আমার লাগিয়া,
আহা! কত তারা ফুটিয়া,
কালের সঙ্গীতে বিমান-পথে!
আকাশ হাসিল আজি মিলিতে ধরার সাথে,
কোথা তুই, আয় আয়, মিলাই, বিশ্বের-চিতে।

১২

ভবিষ্যৎ দূত আমি,
কাল-স্রোতে আইনু সংসারে,
বহিয়া অনন্ত বাণী অনন্ত বারতা;
খুলি দিয়া যাই অনন্ত-মন্দির,
গাহিয়া গাহিয়া অনন্ত সঙ্গীত;
অনন্ত সাগর, অনন্ত প্রদেশ,
আছে নাকি তোর লাগিয়া কোথায়?
আয় আয় ক্লান্ত জীব তবে আয় আয়।
চলিতেছি পথ দেখাইয়া,
আয় আয় চকিত হইয়া;
জীব জন্তু পশু পক্ষী জানে না যে দেশ,
চল যাই লভিতে সে দেশ!
চন্দ্র সূর্য্য যেথা যায়,
গ্রহ তারা যেথা লয়,
দিক্ কাল ক্ষিতি ব্যোম যেথা হে বিলয়,
চল সেই অজ্ঞাত আলয়!—
—মহাতীর্থ, মহাধাম মহাপরস্থান!
মিলিবে অনন্ত বাণী, অনন্ত নির্ব্বাণ!

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

আমাদিগের বিবাহ প্রণালী।

প্রথম অবস্থায় আর্য্য-সমাজে কোন রূপ বিবাহ প্রথা ছিল না। নর নারীগণ পশুবৎ ব্যবহার নিরত ছিল। মহাভারতে লিখিত আছে—"পূর্ব্বকালে রমণীগণ অবারিতা ছিল, তখন তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া সম্ভোগ সুখাভিলাষে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত। তাহারা কৌমার কাল অবধি ব্যভিচারে রত থাকিত. তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। কারণ ইহাই সেই সময়ের সনাতন ধর্ম্ম ছিল। (স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ)। অল্প কাল হইল এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" এই পরিবর্ত্তন উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু দ্বারা হইয়াছিল। একদা শ্বেতকেতু তাহার পিতা মাতার সহিত আসীন ছিলেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতাকে লইয়া গেল। পুত্র মাতাকে অন্য পুরুষের সহিত গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পিতা পুত্রকে বলিতে লাগিলেনঃ—

"মা তাত কোপং কার্ষোস্ত্বমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃ স্থিতাস্তথা সে সে বর্ণা তথা প্রজাঃ॥

অর্থ।—বৎস রাগ করিও না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলে সর্ব্ব বর্ণের অঙ্গনাগণ অবারিত। হে তাত! গো গণের ন্যায় প্রজাগণও স্ব স্ব বর্ণে ব্যবহার করিয়া থাকে

শ্বেতকেতু পিতার বচনে শান্ত না হইয়া বলিলেন, এইরূপ পশ্বাচার কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। অদ্য হইতে যে নারী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া অন্য পুরুষে অনুরক্ত হইবে, ভ্রূণহত্যা রূপ মহাপাতক তাহাকে স্পর্শ করিবে।

ইহাদ্বারা এরূপও বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, মহর্ষি শ্বেতকেতুর দ্বারা সর্ব্ব প্রথম আর্য্য-সমাজে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আধুনিক পণ্ডিতগণ বিবাহ শব্দের অনেক অর্থ করিতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন কালে ইহার অর্থ অন্যরূপ ছিল। স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সহবাসে সম্মত হইয়া স্ত্রীর অভিভাবকের জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাত মতে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইত বলিয়া ইহার নাম বিবাহ বা পরিণয় হইয়াছিল।* সমাজের কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতির পর যে বিবাহ প্রথা প্রথমাবস্থায় প্রচলিত হয়, তাহাই উত্তর কালে "গান্ধর্ব্ব" ও "রাক্ষস" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন কার্য্যই এক কালে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। বিবাহের ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় ও সেই রূপ কুদৃশ্য। কোন পুরুষ কতকগুলি স্ত্রীকে বিবাহ করিতেন। আবার কোন কোন স্ত্রীও কতকগুলি পুরুষকে বিবাহ করিতেন। কোন কোন মহাত্মা অন্য রমণীকে হৃদয়ে স্থান দান করিতে অক্ষম হইয়া সহোদরাকে বিবাহ করিয়া ফেলিতেন। মাতুল, পিতৃস্বসা প্রভৃতির কন্যা বিবাহের কোন বাধা ছিল না।

ঋগ্‌বেদ প্রথম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে পুরুষের বহু বিবাহের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক স্ত্রীর সহিত বহু পুরুষের বিবাহের

* অদ্যাপি কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এই রূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

সামান্য প্রমাণ ঐ বেদের ১১৯ সূক্তের পঞ্চম ঋকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতে এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ আছে, "প্রচেতা" নামে দশজন ঋষি ভ্রাতা এক মুনী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জটিলা নামে গৌতম গোত্রীয়া ধর্ম্ম-পরায়ণা এক তাপসী সাত জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতাভগ্নীতে বিবাহের কথা হিন্দুদিগের লিখিত কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ যখন ইহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তখন এ প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অধিকন্তু বৌদ্ধদিগের লিখিত গ্রন্থে এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাহার দুই একটী এ স্থলে উল্লেখ করিব। সিংহল দেশীয় ইতিহাস "মহাবংশে" লিখিত আছে যে, বিজয় সিংহ নামে যে বাঙ্গালি প্রায় ২৪ শত বৎসর পূর্ব্বে সিংহল দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহার জনক জননী এক পিতামাতার সন্তান।*

ব্রহ্মা রাজ বংশের ইতিহাস "মহারাজোয়াং" গ্রন্থে শাক্য বংশের ইতিহাস অধ্যায় লিখিত আছে, কপিলবাস্তুর স্থাপয়িতা—(কাশীরাজার) ৪ জন রাজ পুত্র তাঁহাদিগের সহোদরাগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। †

প্রাচীন শাসন পত্রানুসন্ধান করিতে যাইয়া সে দিবস আমরা দেখিলাম যে, খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতেও জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা তাহার মাতুল কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। এই প্রথাটী অদ্যাপি মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত আছে।

আর্য্যজাতির উন্নতির প্রথমাবস্থায় বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে, তথাপি পশুবৎ ব্যবহার লোপ হইতে পারে নাই। অসাধারণ জ্ঞানী পূজ্যপাদ আর্য্যঋষিগণের পাশবাচারের কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সময় সাধারণের অবস্থা যে কি ভয়ানক ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পশুবৎব্যবহার দ্বারা যে সকল সন্তান হইত তাহারা অনিন্দিতভাবে সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ প্রপাটক চতুর্থ খণ্ডে লিখিত সত্যকামজাবাল ঋষির জন্ম বিবরণ ইহার একটী বিশেষ প্রমাণ। কানদ, বশিষ্ঠ, দ্বৈপায়ন, শুক, দীর্ঘতমা প্রভৃতি ঋষিগণের জীবনচরিতই আমাদের বাক্যের পোষণোপযোগী প্রমাণ। বিশেষত কৌমার্য্যাবস্থায় যে সকল স্ত্রীলোক ব্যভিচার দ্বারা সন্তান প্রসব করিতেন, পুনর্ব্বার তাহাদের বিবাহ হইত। মৃচ্ছকটিক নাটক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বেশ্যা বিবাহ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। বৈদিক কালে বিধবা বিবাহে কোন রূপ আপত্য ছিল না ‡। বরং বিধবাদিগকে

* টর্ণার সাহেব প্রকাশিত মহাবংশ।

† ফেয়ার সাহেব লিখিত ব্রহ্মারাজবংশের ইতিহাস।

‡ বৈদিক কালে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকার প্রমাণ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের একটী প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ—

"A younger brother of the dead, a disciple, or a servant, should then proceed to the pyre, hold the left hand of the woman, and ask her to come away, saying "Rise up woman thou liest by the side of the lifeless; come to the world of the leaving, away from thy husband and become the wife of him who holds thy hand and

পর পুরুষ সংযোগে সন্তান লাভ করিবার জন্যও আত্মীয়গণ অনুমতি প্রদান করিতেন। ধনী ব্যক্তিগণ স্বয়ং অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইলে অন্যকে ধন দ্বারা কিম্বা বিনয়ে বাধ্য করিয়া স্বীয় স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করাইতেন।

উপনিষদের সময়েই আর্য্যদিগের প্রকৃত উন্নতি। বোধ হয়, এই সময়েই ব্যবস্থা-শাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। মনু আট প্রকার বিবাহ ও দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্ব পক্ষে অধম পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ।*

১। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আহ্বান ও অর্চ্চনা-পূর্ব্বক বসনাচ্ছাদিত কন্যাদান করাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলা যায়।

২। কন্যাকে বসনালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া, যজ্ঞেবৃত্ত পুরোহিতকে যজ্ঞ সম্পাদন কালে দান করিলে দৈব বিবাহ বলে।

৩। বর হইতে ধর্ম্মার্থে এক বা দুই গো মিথুন (গাভী ও বৃষ) গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান করিলে তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে।

৪। তোমরা উভয়ে গার্হস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন কর, এই কথা বলিয়া কন্যাদান করার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ।

৫। কন্যার ও তাহার পিতা প্রভৃতিকে সাধ্যানুসারে ধন দ্বারা বিবাহ করিলে তাহাকে আসুর বলা যায়।

৬। বর ও কন্যার ইচ্ছানুসারে পরস্পর সম্মিলনের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এই সম্মিলন কামাসক্ত ভাবে হইয়া থাকে।

৭। বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিলে তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে।

৮। নিদ্রাভিভূতা, মদ্য পানে বিহ্বলা

is willing to marry thee."* * * That the remarriage of the widows in vedic times was a national custom can be well established by a variety of proofs and arguments, the very fact of the Sanscrit language having, for ancient time such words as *didhishu* "a man that has married a widow" *Parapurva* "a woman that has taken a second husband" *Punarbhava*, "a son of a woman by her second husband" are enough to establish it. Dr Rajendra Lall Mittra's Funeral Ceremonies of the ancient India."

* ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥
মনু ৩। ২১॥

১। আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মনু ৩।২৭॥

২। যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥
মনু ৩। ২৮॥

৩। একং গো মিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥
মনু ৩। ২৯॥

৪। সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃস্মৃতঃ।
মনু ৩।৩০।

৫। জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণংদত্বা কন্যায়ৈচৈব শক্তিতঃ
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥
মনু ৩।৩১।

৬। ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃকন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়োমৈথুন্যঃ কাম সম্ভবঃ।
মনু ৩।৩২।

৭। হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীংরুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥
মনু ৩।৩৩।

৮। সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥
মনু ৩।৩৪।

অথবা অনবধানতা যুক্ত রমণীকে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ।

ভগবান মনু কেবল ক্ষত্রিয় জাতির জন্য আর একটী বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নাম মিশ্র-গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস। (৯) সুতরাং মনু যে সময়ে ব্যবস্থা প্রণয়ণ করেন, তখনও তিনি অনেক বাদ দিয়া ৯টী বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মনু বলেন, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব, এই ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্মজনক; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ ধর্ম্ম জনক; বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ বিবাহ ধর্ম্ম জনক। যে সমাজের ব্যবস্থা কর্ত্তা রাক্ষস ও পৈশাচের ন্যায় কদর্য্য বিবাহকেও ধর্ম্ম জনক বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সমাজের অবস্থা যে কত দূর শোচনীয় ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে না।

মনু, গান্ধর্ব বিবাহের প্রতি একটুকু বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ইহা একটা উৎকৃষ্ট বিবাহ, শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের, শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতির, গান্ধর্ব্ব প্রণালীতে বিবাহ হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, স্ত্রী ও পুরুষের হৃদয় ও মনের যে মিলন, তাহাই প্রকৃত বিবাহ, যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে গান্ধর্ব্বকেই প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে "সর্ব্ব প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ।"

অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার ও কৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর পরিণয় মিশ্র গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস প্রণালীতে হইয়াছিল। বীরচূড়ামণি ভীষ্ম কাশীরাজের কন্যা অম্বা ও অম্বালিকাকে হরণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কর্ণ অনেকবার বিবিধ দেশের রাজকন্যাকে হরণ করিয়া দুর্য্যোধনের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল বিবাহকে রাক্ষস শ্রেণীতে গণনা করা যাইতে পারে। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে আর এক প্রকার বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম স্বয়ম্বর। স্বয়ম্বর—দুই প্রকার। কতকগুলি বর এক সভায় উপস্থিত হইতেন, কন্যা তন্মধ্যে একজনকে স্বীয় পতিত্বে নির্ব্বাচন করিতেন। ইহাও এক প্রকার গান্ধর্ব্বই বটে। দ্বিতীয় প্রকার স্বয়ম্বরে কোন একটা পণ থাকিত, বিবাহার্থিদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি পণানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেন, কন্যা তাহাকেই বরণ করিতেন। এই নিয়মানুসারে সীতা ও দ্রৌপদীর বিবাহ হইয়াছিল।

ভগবান মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী মহাভারত-কর্ত্তাও দ্বাদশবিধ পুত্রের বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন। তাহাও এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। স্বীয় পারণীতা পত্নীতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে ঔরস বলে। পুত্র শ্রেণীতে ইহারাই শ্রেষ্ঠ। (মনু ৯।১১৬।)

২। পুত্রহীন মৃত ব্যক্তির, নপুংসকের কিম্বা শক্তিহীন ব্যক্তির স্ত্রী, ধর্ম্মানুসারে নিযুক্ত হইয়া অন্যের দ্বারা যে পুত্র উৎপন্ন করে, তাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলে। (মনু ৯।১৬৭।) ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডুপুত্রগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৩। স্বজাতীয় কোন ব্যক্তির পুত্র-

হীনস্বরূপ আপৎকালে, পিতা মাতা প্রীতি সংযুক্ত হইয়া যাহাকে দান করে, তাহাকে গৃহীতার দত্তক পুত্র কহে। (মনু ৯।১৬৮।)

৪। দোষ ও গুণ বিচার সক্ষম, পুত্রোচিত গুণ সংযুক্ত, স্বজাতীয় কাহাকেও গ্রহণ করিলে তাহাকে কৃত্রিম পুত্র কহে (মনু ৯।১৬৯।)

৫। আপনার ভার্য্যাতে উৎপন্ন, কিন্তু কাহার দ্বারা জন্মিয়াছে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় না; এমতাবস্থায় ঐ পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলে। (মনু ৯।১৭০।) ইহার অপর নাম কুণ্ড বা জারজ।

৬। পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথবা পিতার অভাবে মাতা কর্ত্তৃক কিম্বা মাতার অভাবে পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুত্র গ্রহণ করিলে তাহাকে ঐ গ্রহীতার অপবিদ্ধ পুত্র বলা যায়। * (মনু ৯।১৭১।)

৭। পিতৃ গৃহে অবস্থানকালে, কন্যা গোপনে যে সন্তান উৎপাদন করে, সেই কন্যাকে যে ব্যক্তি বিবাহ করে, পূর্ব্ব প্রসূত সন্তান তাহার কানীন পুত্র। (মনু ৯।১৭২)। এই বিধি অনুসারে ব্যাসদেব সান্তনুর ও কর্ণ পাণ্ডুর কানীন পুত্র হইতেছেন। কিন্তু পরাশরের সহিত মৎস্যগন্ধার গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এজন্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পরাশর পুত্র বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

৮। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত গর্ভা রমণীকে যে বিবাহ করে, ঐ গর্ভজ সন্তান তাহা সাহোঢ় নামে উক্ত হয়। (মনু ৯।১৭৩।)

৯। মাতা পিতার নিকট হইতে মূল্য দ্বারা ক্রয় করিলে, সে ক্রেতার সদৃশ হউক বা না হউক, তাহাকে ক্রীত পুত্র বলা যায়, (মনু ৯।১৭৪।)

১০। পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কিম্বা বিধবা রমণী অন্য পুরুষের ভার্য্যা হইয়া তদ্দারা যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে পৌনর্ভব বলা যায়। (মনু ৯।১৭৫।)

১১। স্বয়ং দত্ত। মনু ৯।১৭৭।)

১২। পারশাব বা হীন যোনিধৃত। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রা রমণীতে উৎপন্ন পুত্র। (মনু ৯।১৭৮।)

অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা দেখাইব যে, বিধবা বিবাহ কোন প্রকার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ছিল না। তদ্ব্যতীত জ্ঞাতসারে গর্ভবতী রমণীকেও বিবাহ করা হইত। মনু সাহোঢ় পুত্রের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দারা জ্ঞাত গর্ভা রমণীর বিবাহ প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথবা বিধবা রমণীর বিবাহের প্রমাণ, "পৌনর্ভব" পুত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। মনু আনুষঙ্গিক ভাবে বিধবা বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন।

মনুর সময়ে আর একটী কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাহাকে নিয়োগ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ পুত্রহীনা রমণী অন্য পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়া পুত্রোৎপাদন করিতেন। মনু নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, "সন্তানের অভাবে যথা বিধানে নিযুক্তা স্ত্রী দেবর বা সপিণ্ড দ্বারা অভিলষিত পুত্র লাভ করিবে। নিযুক্ত ব্যক্তি ঘৃতাক্ত ও মৌনাবলম্বী হইয়া রাত্রিতে সেই বিধবার গর্ভে এক মাত্র পুত্র উৎপাদন করিবে। কিন্তু এক পুত্র দ্বারা ধর্ম্মতঃ নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন

* ইহার অপর নাম স্বয়ং দত্ত।

হইল না বিবেচনা করিলে, নিয়োগ শাস্ত্রজ্ঞ মুনীগণ বিধবা স্ত্রীতে দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দিয়াছেন। * কিন্তু মহাভারতে দেখা যায়, এই ঘৃণিত নিয়োগ প্রথানুসারে বীর পত্নী সারদণ্ডায়ণী এক ব্রাহ্মণ দ্বারা তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। † বলি রাজ পত্নী এই বিধি অনুসারে নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘতমা নামক ব্রাহ্মণ দ্বারা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পৌণ্ড্র ও সূহ্ম নামে ৫ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ‡ পাণ্ডু রাজ-পত্নী কুন্তি এই বিধি অনুসারে জগদ্বিখ্যাত তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং নিয়োগ প্রথা যে প্রাচীন কালে বিশদ রূপে প্রচলিত ছিল, এবং তুইটীর অধিক সন্তান উৎপাদন করা হইত, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

মনু আর তুই একটী শ্লোক পরেই লিখিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য পুত্রোৎপাদনার্থ বিধবা রমণীকে অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিবেক না, করিলে সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়।" মনু পূর্ব্বে নিয়োগের বিধি দিয়াছেন। এবং তদনুসারে আর্য্যসমাজ বিশেষ রূপে নিয়োগ প্রথা প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু যৎকালে সান্তনু মহিষী সত্যবতী ভীষ্মদেবকে তাঁহার ভ্রাতার বিধবা পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিতে অনুরোধ করেন, সেই সময় অসাধারণ জ্ঞানী ধার্ম্মিক চূড়ামণি গাঙ্গেয় বলিয়াছেন "মাত! আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ধর্ম্ম বটে, কিন্তু আপনার জন্য আমি পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে লঙ্ঘন করিতে পারি না। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধন দ্বারা বাধ্য করুন; তিনি বিচিত্র বীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবেন।" এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে, নিয়োগ প্রথার উন্মূলন-কারী শ্লোক পশ্চাৎ মনু সংহিতায় সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসীগণ হয়ত কুল্লুক ভট্টধৃত বৃহস্পতির বচন অবলম্বন করিয়া বলিতে পারেন যে, ভগবান মনু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের জন্য নিয়োগ প্রথা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কলিকালের জন্য তিনি ইহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ তর্ক না করিয়া ইহাই বলিতে পারি যে, প্রাচীন কালে এই ঘৃণিত প্রথা আর্য্য-সমাজে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। এবং বোধ হয় মনু সংহিতার সঙ্কলন কর্ত্তা মহর্ষি ভৃগু এই ঘৃণিত বিধির প্রতিরোধ মানসে বিরুদ্ধ উক্তি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

মনু সংহিতা হইতে আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, ইহা দ্বারা তদানীন্তন সমাজিক চিত্রের প্রতিবিম্ব পাঠকগণের হৃদয়ে সামান্য আকারে পতিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। প্রাচীন সময়ের পরিবর্ত্তনে পরবর্ত্তী সময়ে তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং অন্যান্য ঋষিগণ মনু সংহিতার কিয়দংশ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন ব্যবস্থা শাস্ত্র লিখিতে লাগিলেন, আমরা সেই সকল আলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এস্থলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব।

ঋষি প্রবর অত্রি, বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ

* মনু সংহিতা। ৯। ৬০, ৬১ শ্লোক।
† মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়।
‡ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল একটী শ্লোক বলিয়াছেন যে—

"ক্রয় ক্রীতা চ কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতস্তেষাং পিতৃ পিণ্ডং ন বিদ্যতে॥"

এত দ্বারা মহর্ষি অত্রি মনু কথিত আসুর বিবাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ভগবান বিষ্ণু স্বীয় সংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা —"ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব আসুরো রাক্ষসঃ পৈশাচ শ্চেতি।" বিষ্ণু. মনুর পদানুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং মনু বিবাহ সমূহের যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি বিষ্ণু বাল বিধবার পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন।

"অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ।"

অর্থাৎ অক্ষত যোনি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হইলে তাহাকে পুনর্ভ বলে। (বিষ্ণু সংহিতা ১৫। ১৭।)

বিষ্ণু ঋষি মনুর ন্যায় দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের বর্ণনায় কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। মনু পৌনর্ব্বভ (অর্থাৎ বিধবার পুনর্ব্বিবাহ জাত) পুত্রকে নিকৃষ্ট বা দশম স্থানীয় লিখিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণু বলেন, ঔরস প্রথম, ক্ষেত্রজ দ্বিতীয়, পুত্রিকাপুত্র তৃতীয়, পৌনর্ব্বভ চতুর্থ, কানীন পঞ্চম, গূঢ়োৎপন্ন ষষ্ঠ, সহোঢ় সপ্তম, দত্তক অষ্টম, ক্রীত নবম, স্বয়ং উপগত দশম, অপবিদ্ধ একাদশ, পারশব দ্বাদশ। "এতেষাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেয়ান" অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্র পরবর্ত্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ-জাত পুত্রকে উপরে উঠাইয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি তাহার উপযুক্ত স্থান হয় নাই। কারণ ঔরসের পরেই ইহার স্থান দান করা উচিত। মহাভারতে তাহাই হইয়াছে। ভীষ্ম-পর্ব্বে লিখিত আছে—"নাগরাজ ঐরাবতের এক কন্যা ছিল। সুপর্ণ কর্তৃক সেই কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ ঐ দুঃখিতা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলে, পার্থ তাহার পানি গ্রহণ করিলেন। নাগরাজ কন্যার গর্ভে অর্জ্জুনের যে পুত্র হইয়াছিল, মহাভারতকার তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে "পুত্রমৌরসম" লিখিয়াছেন। ঘৃণিত ক্ষেত্রজ পুত্র অপেক্ষা যে এই প্রকারের পুত্র কতদূর শ্রেষ্ঠ, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকগণ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে। অধিকন্তু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেনঃ—

"অক্ষতা বা ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
(১ম অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক।)

অর্থাৎ " অক্ষত কিম্বা ক্ষত যে রমণী, তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলে।" সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

উশনা ও অঙ্গিরা বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই, সুতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতে বিনা বাক্যে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি।

মহর্ষি যম বিবাহ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। কারণ তিনি বিবাহে কন্যার বয়ক্রম সম্বন্ধে অতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন।

ঋষিপ্রবর আপস্তম্ব বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সম্বর্ত্ত ও কাত্যায়নও ঐরূপ।

বৃহস্পতি সংহিতায়ও বিবাহ সম্বন্ধে কিছু লিখিত হয় নাই।

ত্রেতাযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকার গৌতমঋষি দায়ভাগ প্রকরণে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পৌনর্ভব পুত্রের ধনাধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভগবান বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন—"যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য অন্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি।"

বশিষ্ঠ সংহিতা—১৭ অধ্যায়।

অর্থাৎ যে স্ত্রী ক্লীব, পতিত, অথবা উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অথবা পতির মরণান্তে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।" দ্বাদশ প্রকার পুত্রের গণনায় বশিষ্ঠ ঋষি পৌনর্ভবকে চতুর্থ স্থান প্রদান করিয়াছেন। যথা- "পৌনর্ভব শ্চতুর্থ।

দ্বাপরের ধর্ম্মশাস্ত্রকার শঙ্খ ও লিখিত বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। দক্ষঋষিও তাহাই করিয়াছেন। মহর্ষি সাতাতাপ স্বীয় সংহিতায় কেবল কতকগুলি প্রায়শ্চিত্তের কথা লিখিয়াছেন। মহর্ষি ব্যাসপ্রণীত সমুদ্র সদৃশ মহাভারত পরিত্যাগ করিয়া গোস্পদ সদৃশ ক্ষুদ্র "ব্যাস সংহিতার" আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের বিংশতি খানা সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে আমরা ১৯ খানার কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া ঋষিগণ দ্বারা কথিত হইয়াছে। এক্ষণ দেখা উচিত এ কলিকালের জন্য কোন সংহিতা লিখিত হইয়াছিল কি না?

"কৃতেতু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতম স্মৃতঃ। দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পরাশর স্মৃতঃ॥"

পরাশর সংহিতা ১।২৩।

কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষি পরাশর বিবাহ সম্বন্ধে অন্য কোন কথা না বলিয়া কেবল বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ—

"নাষ্টমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্বনারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

পরাশর সংহিতা। ৪।২৭।

স্বামী নিরুদ্দেশে, মরণান্তে, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে, ক্লীব স্থির কিম্বা পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপদে রমণীর অন্য পতি গ্রহণ বিধিসঙ্গত। * ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

* গত বারের ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত "বিধবা বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি।

প্রায় তিন বৎসর গত হইল, আমরা যখন রাজা রাজবল্লভের জীবনচরিত লিখি (বান্ধবে) তখন বলিয়াছিলাম যে, উক্ত রাজা তাহার বাল বিধবা কন্যাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়ার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। সেই সময় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় চক্রান্ত করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইতে দেন নাই। তৎপরেই আমরা মন্তব্য স্থলে বলিয়াছিলাম যে—"প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণচন্দ্র প্রেতপুরে গমন করিয়াছেন। এই কাল মধ্যে সমাজের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সময় শিক্ষিত ভূম্যধিকারিগণ মনোযোগ করিলেই হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও মতে যাঁহারা বিধবা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সমাজচ্যুত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা দ্বারা বিশেষ ফল লাভ হয় নাই। আমরা বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিতেছি, শিক্ষিত ভূম্যধিকারিগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করুন।"

জ্যোৎস্নাময়ী।*

জ্যোৎস্নাময়ি!
স্বর্গের জ্যোৎস্না তুই,—কিন্তু কোন্ পাপে
ভারতে রমণী জন্ম করিলি গ্রহণ?
আকাশের তারকাটী, কেন রে ছুঁইলি মাটী;
নিবিতে পবিত্র জ্যোতি বাকী কতক্ষণ?

ইহার কিছু কাল পরেই আমরা দেখিতে পাইলাম যে, নলডাঙ্গা-পতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায়বাহাদুর এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহা দর্শনে আমাদের হৃদয়ে অপার আনন্দ সঞ্চার হইল। আমাদের হৃদয়ের সহিত রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। হৃদয়ের পবিত্র আসনে বসাইয়া প্রমথভূষণকে পূজা করিতে লাগিলাম।

এক্ষণে নড়ালের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার রায়ের আচরণে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হইতেছে, চন্দ্র কুমার বাবু রাজা বাহাদুরের পরিশ্রম ও যত্ন পণ্ড করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। তিনি কাশী নিবাসী পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধ-ব্যবস্থা আনাইয়াছেন। বোধ হয়, অনেকে জানেন যে, উকিলের "অপিনয়ন" ও পণ্ডিতের ব্যবস্থা লওয়া কিছুই কঠিন কার্য্য নহে। বিক্রমপুরের পণ্ডিতসমাজ অর্থ লোভে ত্রিপুরার জল-তরঙ্গে কিরূপ ঘোল ঢালাইয়াছেন, তাহা কে না জানে? সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোন মহাত্মা এই ব্যবস্থা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য অবশ্যই পণ্ডিতদিগকে কিঞ্চিৎ বিশেষ দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছে।

নড়ালের জমীদারদিগের পূর্ব্ব পুরুষ কালীশঙ্কর রায় কিরূপে এই অতুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ লোকে না জানিতে পারেন। কিন্তু ইতিহাস-লেখকের হৃদয়ে তাহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ রহিয়াছে। কোথায় চন্দ্র কুমার বাবু সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া সেই কালীশঙ্করের কুকার্য্য ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি অর্থ ব্যয় করিয়া হিন্দু সমাজের প্রকৃত শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছেন, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। চন্দ্র কুমার বাবু অর্থ ব্যয় করিয়া কাশী হইতে ব্যবস্থা আনাইয়াছেন।

চন্দ্র কুমার বাবু পণ্ডিতদিগকে লিখিয়াছিলেন যে, "কলিযুগে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ কিনা, বিধবা বিবাহ-কর্ত্তা, তৎপ্রয়োজক, অনুমতি দাতা, ও মন্ত্রপাঠক পাপগ্রস্ত হয়েন কিনা, বারম্বার ঈদৃশ অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা পতিত হয়েন কিনা, ইহারা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ইহাদের বীজান ও অন্ন ভোজনে অন্যের পাপ স্পর্শ করে কিনা, প্রমাণ ও যুক্তিসহ এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর দানে আমাকে কৃতার্থ করিবেন।"

তদুত্তরে পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন যে, "কলিযুগে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, বিধবা বিবাহ-কর্ত্তা, প্রয়োজক আদি সকলেই পাপভাগী ও বারম্বার অনুষ্ঠানে পতিত হইবেন এবং তাঁহাদের সংসর্গকারীগণও পাপযুক্ত হইবেন, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের অভিমত।

পণ্ডিতগণ যে সকল বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে সংগৃহীত। কিন্তু পুরাণ অপেক্ষা ধর্ম্ম শাস্ত্র যে প্রবল, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে তাহাদের মত পোষণোপযোগী বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যে দুই একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসংলগ্ন ও অকর্ম্মণ্য। এই সকলের বিরুদ্ধে পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। চন্দ্রকুমার বাবু এই ব্যবস্থা পত্রের সহিত যদি একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ পরস্পর তুলনা করিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণ নিতান্তই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পণ্ডিতগণ পরা-

* কোন সম্ভ্রান্ত বান্ধবের শিশু-কন্যা।

ও বালিকা ! ও সরলা ! লাগিলে মাটীর মলা,
দেবেরো হৃদয়ে বসে কলঙ্ক ভীষণ !

ও জ্যোতিতে ও কিরণে, স্বর্গীয় হৃদয় মনে,
পবিত্র মাধুরীময় সরল অমন,—
ঘৃণা লজ্জা হিংসা দ্বেষে, ছিন্নভিন্ন হবে শেষে,
বসিবে বাসনা-দাগ পাপ প্রলোভন ;
স্বর্গের জ্যোৎস্না ছবি মলিন এমন !

১

এমন জ্যোৎস্না রাশি —এমন সরল,
এত স্বচ্ছ পরিষ্কার, কোথাও দেখি না আর,
এমন দর্পণ সম শুভ্র নিরমল !
হৃদয়ের গুপ্ত ঠাঁই, আপন হৃদয় নাই,
পর প্রতিবিম্বে উহা সতত উজ্জ্বল !
এমন আপনা-ভোলা, এমন অন্তর খোলা !
নয়নে নন্দনবন হাসে অবিরল,
দেখিনে কোথাও আর, এত স্বচ্ছ পরিষ্কার,
এমন দর্পণ সম হৃদয় নির্ম্মল !
এত কাছে২ থাকি, এত কোলে কাঁকে রাখি,
তথাপি ভরেনা প্রাণ সতত পাগল !
যেন মাখনের দলা, মধুভরা গলা গলা,
ছুঁইতে উন্নুয়ে আহা উঠে পরিমল !

শর সংহিতার বচন গুলির, নিতান্ত কূট অর্থ করিয়াছেন। কোন একটী বিতর্কিত বিষয়ের বিচার করিতে হইলে মূল শ্লোকের সরল অর্থ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের জটিল ও বিকৃত ব্যাখ্যা করা কখনই সঙ্গত কার্য্য নহে। এক সময়ে ভারতের এমনই দুর্দ্দিন ছিল, যখন সাধারণ মানবগণ ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করা দূরে থাকুক, দর্শন করিতেও পাইত না। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় এইক্ষণ সেই অভাব বিদূরিত হইয়াছে। এক্ষণ অধিকাংশ বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে বৈদিক সময়ের "সূত্র" গ্রন্থ ও পরবর্ত্তী কালের বিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্র বিরাজ করিতেছে। এক্ষণও কি আমাদিগকে অজ্ঞের ন্যায় সে কালের মত কেবল পণ্ডিতদিগকে বলিতে হইবে, "মহাশয় এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম শাস্ত্রে কি লিখিতে আছে, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিন।" আমরা কি অন্ধ, আমরা কি ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিতে জানি না যে, এক জন পণ্ডিত সর্পকে ভেক বলিলে তাহাই স্থির করিয়া রাখিব ? তাই চন্দ্রকুমার বাবুকে বলিতেছি, তিনি কূট বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরল ভাবে ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখুন, তিনি অর্থ ব্যয় করিয়া কাশী হইতে যে ব্যবস্থা পত্র আনাইয়াছেন, তাহা কখনই প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রের সম্পূর্ণ পোষণোপযোগী নহে।

আর একটী কথা স্বীকার করা যাউক যে, দুই এক জন শাস্ত্রকার বিধবা বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ৪ সহস্র কিম্বা ২ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে সেই শাস্ত্র কখনই স্থির থাকিতে পারে না। এক সময়ে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের দাসত্ব করা দূরে থাকুক, জল গ্রহণও করিতে পারিতেন না ; করিলে তাঁহারা পতিত হইতেন। এক্ষণ যে ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতেছে, কে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিতেছেন ? চন্দ্রকুমার বাবুর বাটীতে কি ব্রাহ্মণ চাকর নাই ? তাঁহাদিগকে কি সমাজ-চ্যুত হইতে হইয়াছে ? ইহা আমরা চন্দ্রকুমার বাবুর নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন হইবে। সেই সঙ্গে ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিবেন ? তোমার আমার কিঞ্চিৎ সুবিধার জন্য আমরা ধর্ম্ম শাস্ত্রের শিরে অকুণ্ঠ হৃদয়ে পদাঘাত করিতে পারি, কিন্তু দুর্ব্বলা অবলাদিগকে নির্যাতন করিবার সময়ে "ধর্ম্ম শাস্ত্র, ধর্ম্ম শাস্ত্র" বলিয়া চীৎকার করা কি কাপুরুষের কর্ম্ম নহে ? আমরা বিধবাদিগকে জোর করিয়া বিবাহ দিতে বলিতেছি না, কিন্তু যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিতীয় বার স্বামী গ্রহণ করিবেন, ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভাণ করিয়া তাঁহাকে নির্যাতন করিতে তোমার আমার কি অধিকার আছে? ৮০ বৎসরের সময় পত্নী-বিয়োগ হইলে তুমি আমি (বৈতরণী পার হওয়ার জন্য) পুনর্ব্বার একটী ৯।১০ বৎসরের বালিকা বিবাহ করিব ; আর ৯।১০ বৎসরের একটী বালিকা, যে ইহ জীবনে স্বামী কি তাহা জানিতে পারিল না, তাহাকে জোর করিয়া চিরকাল বিধবা রাখিতে হইবে, ইহা কি কাপুরুষের কার্য্য নহে ?

কোন্ চন্দ্রমার তুই জ্যোছনা এমন?
যে করে ধরণী আলো, সেত রে কলঙ্কে কালো,
সেত অতি অপবিত্র রাহুর বমন,
কোথা তার এ সুহাসি, স্বর্গীয় এ ভাব রাশি,
তাহার লাবণ্যে এত নাহি ভোলে মন!
অবনীর কুবলয়, শিশিরে মলিন হয়,
শারদ সুষমা আর থাকে না তখন,
কিসে হবে পঙ্কজাত, পঙ্কজেতে মধু এত?
সামন্য পতঙ্গ ও'তে করে গুঞ্জরণ!
কোন্ ত্রিদিবের শশী হইতে পড়িলি খসি,
সুন্দর সরল স্নিগ্ধ জ্যোছনা এমন?
কোথারে মানস-সরে, সে কমল শোভাকরে,
যাহার সুষমা তুই সুরভি কাঞ্চন?

জ্যোৎস্নাময়ি!
স্বর্গের জ্যোৎস্না তুই,—কিন্তু কোন্ পাপে,
ভারতে রমণী জন্ম করিলি গ্রহণ?
পুরুষেরা অত্যাচারে, এদেশে রমণী মারে,
এদেশে কঠিন বড় পুরুষের মন!
এদেশের বাপ ভাই, দয়া নাই মায়া নাই,
অকরুণ ব্যাধ বধে কুরঙ্গী যেমন!
গঙ্গা যমুনার মত, রমণী জীবন কত,
দুঃখের সাগরে সদা করে আলিঙ্গন!
পাষাণের বাপ ভাই, দেখিয়া না দেখে তাই,
অচল অটল রহে হিমাদ্রি যেমন!
আহা হা স্বর্গের মেয়ে, তোর পানে চেয়েং,
প্রতিদিন ভাবি তোর কপাল কেমন!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

নভেলের শিল্প বা কবিত্ব।

আমরা পূর্ব্বে উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রের কথা বলিয়াছি, কিন্তু চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথার বিশেষ উল্লেখ করি নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, চরিত্র অসংখ্য প্রকারের হইতে পারে। বলিতে কি, যেমন প্রত্যেকের মুখাবয়ব ও আকৃতি বিভিন্ন, তদ্রূপ প্রত্যেকের চরিত্র বা প্রকৃতিও বিভিন্ন। চরিত্র যে এত বিভিন্ন হয়, তাহার প্রধান কারণ এই যে, চরিত্র-সংগঠনী শক্তিগুলি নানা প্রকার। মনে কর, যদি চরিত্র-সংগঠনী শক্তি সংখ্যা বিংশতি হয়,—আর তন্মধ্যে দশটী মাত্র শক্তি দ্বারা প্রত্যেক চরিত্র সংগঠিত হয়, তাহা হইলে বীজগণিতের সংমিশ্রণী (Combination) নিয়মানুসারে প্রায় বিংশতি লক্ষ বিভিন্ন চরিত্র সংগঠিত হইতে পারে। তবে যদি চরিত্র-সংগঠনী শক্তি সংখ্যা আরও অধিক হয়, (এবং তাহাদেরও ন্যুনাধিক পরিমাণ থাকে, বিবেচনা করা যায়) তবে অসংখ্য বিভিন্ন চরিত্র সংগঠিত হইবার কারণ আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। সে যাহা হউক, আমারা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এই সমস্ত চরিত্র-সংগঠনী শক্তি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। এক বাহ্যিক বা আধিভৌতিক শক্তি, আর এক আন্তরিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি। এই আধ্যাত্মিক শক্তিই চরিত্র স্ফূর্ত্তি করে, আধিভৌতিক শক্তি সেই স্ফূর্ত্তির সাহায্য করে মাত্র। অতএব চরিত্রের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিমাণ অনুসারে, আমরা চরিত্রের সমষ্টি শক্তির পরিমাণ করিতে পারি।

উল্লিখিত আধ্যাত্মিক শক্তিকে আবার প্রধানত তিন ভাগে বিভাগ করিতে পারা যায়। মনোবিজ্ঞান বলে যে, আমাদের মন তিন প্রকার বৃত্তির সমষ্টি মাত্র। প্রথমত,

বুদ্ধি ও চিন্তা বৃত্তি, ইংরাজীতে ইহাকে Intellect বলে। ইহার সহিত আমরা কল্পনা বৃত্তিকে(Imagination)এক শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি। দ্বিতীয়ত,আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, (Feeling) ইহাকেই প্রকৃত চিত্ত-বৃত্তি বলা উচিত। তৃতীয়ত, ইচ্ছা-বৃত্তি বা বাসনা (Willing) ইহার দ্বারাই আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। প্রথম গুলি আমাদের জ্ঞান ও চিন্তা বৃত্তি,দ্বিতীয় গুলি আমাদের চিত্তবৃত্তি, আর শেষ গুলি কার্য্য-কারিণী বৃত্তি। যাহার এই বৃত্তিগুলির পূর্ণ মাত্রায় স্ফূর্ত্তি হয়, সেই সর্ব্ব প্রধান চরিত্র। চিত্ত-বৃত্তি গুলিকেও আবার সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,কতকগুলি আমাদের আত্মপর (selfish বা egotistic) বৃত্তি। ইহাতেই আমাদিগকে স্বার্থপর করে--সংসারকে তাচ্ছল্য করিয়া, অন্য লোকের ক্লেশ বা দুঃখ অবহেলা করিয়া, আমরা এই বৃত্তি বলেই স্বকার্য্য সাধনের জন্য যত্ন করি। অন্য গুলি অনাত্মপর বৃত্তি ; ইহা দ্বারাই আমরা পরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করি এবং পরহিত ব্রতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করি।

অতএব যে চরিত্রের জ্ঞান-বৃত্তি ও কার্য্য-কারিণী বৃত্তির চরম উন্নতির সহিত অনাত্মপর বৃত্তি গুলির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই আমাদের আদর্শ (Ideal) চরিত্র। কিন্তু যাঁহাদের অনাত্মপর বৃত্তির পরিবর্ত্তে আত্মপর বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তাঁহারা প্রধান চরিত্র হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা সংসারে অধম ও অত্যন্ত ভয়ানক চরিত্র। সাধারণ চরিত্র এই দুই সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে—কখন অতিক্রম করিতে পারে না। মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, চিত্তবৃত্তিই আমাদের কার্য্য-কারিণী বৃত্তির উত্তেজক। সুতরাং এই চিত্ত-বৃত্তি যত প্রবল হয়,—সেই পরিমাণে আমাদের ইচ্ছাবৃত্তি গুলির কার্য্য স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। চিত্ত বৃত্তি আত্মপর হইলে, সে চরিত্রের কার্য্যও অত্যন্ত অসৎ ও সমাজের অমঙ্গলকর হইবে।

সে যাহা হউক, মহাপুরুষদের বা আদর্শ চরিত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, যেমন, সমাজের ও জগতের উন্নতি কল্পে তাঁহারা যে পরিমাণে শক্তির স্ফূর্ত্তি করিয়াছিলেন, তাহার পর্য্যালোচনা করি—যে পরিমাণে সংসারের উন্নতির জন্য কার্য্য করিয়াছেন, তাহার শক্তি (Momentum) পরিমাণ করি ; চরিত্র উপলব্ধি করিতে আমরা সেরূপ শুধু কার্য্যের পরিমাণ না করিয়া, তাহার সমুদায় বৃত্তিরই শক্তি স্থির করিয়া থাকি। অতএব নভেললেখকের চরিত্র চিত্র সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি? তিনি চরিত্র-সংগঠনী শক্তি গুলি যতদূর পারেন, বুঝাইয়া দিবেন। সংগঠিত চরিত্রের শক্তি, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির পরিমাণ, তাহার আত্মপর ও অনাত্মপর চিত্ত-বৃত্তির পরিণাম, এবং কার্য্য-কারিণী শক্তি গুলির পরিণাম বুঝাইয়া দিবেন। কি করিয়া বৃত্তি গুলির এরূপ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা যতদূর পারেন, দেখাইয়া দিবেন। তাহার পর তিনি এরূপ চরিত্রের কার্য্য প্রণালী বুঝাইয়া দিবেন। অতএব নভেল-লেখকের প্রধান কর্ত্তব্য, মনোবিজ্ঞান সহজে পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া,—মনোবৃত্তি গুলির গতি, শক্তি ও ক্রিয়া দেখাইয়া দেওয়া। কোন্ বৃত্তি ভাল, কোন্ বৃত্তি মন্দ, কোন্ কার্য্য সৎ, কোন্ কার্য্য অসৎ—কোন্ চরিত্র উত্তম, কোন্ চরিত্র অধম, তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার

ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। তাঁহার নীতি শাস্ত্র বুঝাইবার তত প্রয়োজন নাই, --মনোবিজ্ঞান বুঝানই প্রধান কর্ত্তব্য। পণ্ডিত টেন সাহেব বলিয়াছেন,—

"What is a novelist? In my opinion he is a psychologist who naturally and involuntarily sets psychology at work; he is nothing else, nor more. He loves to picture feelings, to perceive their connections, their precedents, their consequences: and he indulges in this pleasure. In his eyes they are forces, having various directions and magnitudes. About their justice or injustice he troubles himself little." History of English Literature, vol. II. p. 390.

সুতরাং নভেল-লেখকের কাজ বড় সহজ নহে। এই চরিত্র-চিত্রেই তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্প-নৈপুণ্য বা প্রকৃত কবিত্ব কি? যেমন চিত্রকর প্রকৃত ঘটনা অনুকরণ করিয়া তাহার প্রতিচিত্র অঙ্কিত করেন,—যেমন ভাস্কর একখণ্ড শিলা খোদিত করিয়া তাহাকে জীবিত-কল্প মনুষ্যে পরিণত করিতে পারেন, সেইরূপ সাহিত্য-জগতে যথার্থ শিল্পকর যিনি, তিনি স্বভাব অনুকরণ করিয়া চরিত্রের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। এই স্বভাবের অনুকরণই শিল্পের প্রাণ। যেখানে একটু মাত্র অস্বাভাবিক হইল, সেই খানেই শিল্প-কৌশল সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। চিত্রকরের কাজ সহজ, কেন না তিনি কোন বিশেষ অবস্থার, বিশেষ সময়ের বা বিশেষ ঘটনার চিত্র মাত্র অঙ্কিত করেন। তাঁহার চিত্রে যাহা অঙ্কিত থাকে, তাহা অতি পরিষ্কার রূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় সত্য, কিন্তু সে চিত্র দেশ কাল বা পাত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রকৃত কবি শিল্পীর কাজ বড়ই গুরুতর। তিনি কোন বিশেষ অবস্থা, বিশেষ ঘটনা বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের কার্য্য অঙ্কিত করেন না, দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ নহে, তাঁহাকে এরূপ অনেক ঘটনা চিত্র করিতে হয়,—তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইতে হয়, —তাহাদের ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবি শিল্পী যিনি, তিনি সর্ব্বকালিক, সর্ব্বদেশীয় এবং সর্ব্বজনীন একই নূতন সংসার সৃষ্টি করেন। তাঁহার সৃষ্ট এই নূতন জগৎ,প্রকৃত সংসারের সম্পূর্ণ অনুকরণে হওয়া আবশ্যক। সৎ অসৎ,ভাল মন্দ,সুনীতি দুর্নীতি তিনি কিছুই দেখিবেন না, সংসারে যাহা পাইবেন,তাহাই চিত্র করিবেন। চিত্রের ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা করিতে পাইবেন না। সুধু তাহাই নহে, তিনি বাহ্য-জগতের সুধু উপরিভাগ—সুধু আবরণ দেখিয়া তাহাই চিত্র করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। জগতের মূলকারণ মধ্যে—তাহার মূল সত্য মধ্যে—অন্তর্জগতের গূঢ়তম স্থানে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। সাধারণে যাহা দেখিতে পায় না—যাহা দৈবশক্তি বলে কেবল কবির জ্ঞান-চক্ষে প্রকাশ পায়, —তাহা সাধারণকে দেখাইতে হইবে—তাহার যথার্থ মর্ম্ম বুঝাইতে হইবে। যাহা লোকে দেখিয়াও দেখে না--বুঝিয়াও বুঝে না— তাহাই প্রকৃত কবিকে দেখাইতে হইবে। মুহূর্ত্তের বাহ্যিক ভঙ্গিতে আমাদের মনের যে গূঢ়তম লুক্কায়িত ভাব সকল প্রকাশ পায়, তাহা চিত্রকর কেমন সুন্দর রূপে আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। স্বভাবের রত্নভাণ্ডারের মধ্যে চারিদিকে কত অপূর্ব্ব শোভা বিরাজিত রহিয়াছে—সংসারের কঠোর তাড়নায় আমরা তাহা দেখিতে পাই না, বুঝি সে শোভা দেখিবার বৃত্তি

উপরের কঠিন আবরণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে,যে জীবন,যে আত্মা,যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তাহা মহাপুরুষেরা দেখিতে পান—তাহা কবি শিল্পীও উপলব্ধি করেন। সুধু উপলব্ধি নহে—শিল্পী তাহা আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত, স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিয়া, তাহা জগৎকে দেখাইয়া দেন, এই খানেই তাঁহার কবিত্ব, এই খানেই তাঁহার শিল্প।

প্রসিদ্ধ জর্ম্মন দার্শনিক ফিক্তে (Fichte) শিল্প সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—"There is a Divine Idea pervading the visible Universe; which visible universe is indeed but its symbol and sensible manifestation, having in itself no meaning, or even true existence independent of it. To the mass of men this divine Idea of the world lies hidden. * * Literary men are the appointed interpreters of this divine Idea; a perpetual priesthood, we might say, standing forth, generation after generation, as dispensers and living types of God's everlasting wisdom—to shut it in their writings and actions. . . . . . He may lay hold of the whole Divine Idea, in so far as it can be comprehended by man, or perhaps a special portion of this its comprehensible part." Carlyle's essays vol. I. P. 49

এমারসন এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"So, in art that aims at beauty, must the parts be subordinated to Ideal Nature and everything indi dual abstracted, so that it shall be the production of the universal soul."

অতএব কবি যে পরিমাণে এই মূলতত্ব উপলব্ধি করিবেন, সেই পরিমাণেই তিনি প্রকৃত কবি। পণ্ডিত এমারসন বলিয়াছেন, "The universal soul is the alone Creator of the useful and the beautiful, therefore to make anything useful or beautiful, the individual must be submitted to the universal mind."

আরও বলি—এ সংসারের উন্নতি কিরূপে সাধিত হয়? জগৎ যে অনন্তগতিতে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহার গূঢ় অর্থ কি? জড়জগতে শক্তি কোথায় যে, তাহা হইতে কার্য্য হইবে, তাহা হইতে গতি হইবে—বা তাহা হইতে স্বতঃই জগতের উন্নতি হইবে? এই জড়ের মধ্যে যে আত্মা আছে—তাহা হইতে যেমন জগতের পরিণতি, প্রকর্ষ পর্য্যন্ত, আদর্শ কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াই,সেইরূপ সংসারের উন্নতি। এই আদর্শ-কল্পনা পথ-প্রদর্শক হইয়া, অনন্ত জগতের জ্যোতি হইতে ঈষৎ মাত্র প্রতিফলিত ক্ষীণালোক দেখাইতে দেখাইতে, অগ্রসর হইতে থাকে—সংসার সেই কল্পনা-রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে—তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে করিতে, অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাতেই ত আমাদের উন্নতি। অনন্ত আত্মা হইতে যেমন জড়জগৎ, শক্তি হইতে যেমন গতি, তেমনি আদর্শ কল্পনা হইতে উন্নতি। এই কল্পনা ও জড়ে যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া, (rhythm) এই কল্পনা হইতে যে কার্য্যের প্রসব, তাহাই সংসারকে ত তাহার উন্নতির পথে লইয়া যায়। মহাপুরুষেরা ও প্রকৃত কবিরাই এই কল্পনা-রাজ্যের অধিকারী। তাঁহারা এই কল্পনাকে—a local habitation and a name"—দিয়া,—তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সম্ভাবনা দেখাইয়া দেন,—পরবর্ত্তী লোকে তাহাকে যতদূর পারে, কার্য্যে পরিণত করে।

সে যাহা হউক, শিল্পীর এই আদর্শ কল্পনা, এক মহান্ সত্তা। ইহা এক ক্ষুদ্র জগৎ—ইহা এক প্রকাণ্ড (organisation) জৈবনিক। যিনি ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া, ইহার অংশ মাত্র দেখিতে পান, বা অংশ করিয়া দেখিতে চান, তিনি, ইহার মধ্যে যে জীবন, যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা দেখিতে পান না—তাহার প্রকৃত কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না। তিনি আই বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হইতে পারেন বড় জোর, মৃতপশুশালার (museum) বৃত্তান্ত বুঝিতে পারেন—কিন্তু জীব জগতের কিছুই বুঝিবেন না। সেইরূপ, শিল্পীর শিল্পকে যিনি এইরূপ এক মহা রাজ্য বলিয়া না বুঝেন—যিনি তাহার এখানের অলঙ্কার, সেখানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া শান্ত থাকেন, তিনি কবিত্ব বুঝেন না—শিল্প রাজ্যে প্রবেশের প্রকৃত অধিকারী হয়েন নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, কবি শিল্পীর মহান্ চিত্র মধ্যে বড় অধিক লোক প্রবেশ করিতে পারে না। সেক্ষপীয়রের অনন্ত সৃষ্ট রাজ্যের মহত্ব সে দিন মাত্র জর্ম্মাণ পণ্ডিতেরা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কালিদাসের আশ্চর্য্য কবিত্ব,—তাঁহার উচ্চতম শিল্প-চাতুর্য্য প্রথমে গেটে বুঝিয়াছিলেন—আমাদের দেশশুদ্ধ পণ্ডিত বড় জোর বুঝিতেন "উপমা কালিদাসস্য।" তাই বলি, কবির সৃষ্ট রাজ্যে প্রবেশ করা বড় সহজ নহে। সেই জন্য কারলাইল বলিয়াছেন,———"To take in the fair relations of the whole, to see the building as one object, to estimate its purpose, the adjustment of its parts and their harmonious co-operation towards that purpose, will require the eye and the mind of a Vitruvious or a Palladio."

Essays, Vol. I p. 219.

এই খানেই আমরা প্রকৃত সমালোচকের কাজ জলন্তভাবে দেখিতে পাই। প্রকৃত সমালোচক যিনি, তিনি কবির সৃষ্ট রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিবেন তাহার সৌন্দর্য্য দেখিবেন, দেখিয়া তাহা সাধারণকে দেখাইতে চেষ্টা করিবেন। সকলে কিছু কবির সৃষ্ট জগৎ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারা উপরিভাগ দেখে মাত্র—বাহিক কঠিন আবরণ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে মাত্র। সমালোচকই তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া—তাহার সৌন্দর্য্য,—তাহার মধ্যে নিহিত গূঢ় সত্য,—তাহার চমৎকার (organisation) সৃষ্টি কৌশল,—সাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। কারলাইল বলিয়াছেন,—"Criticism stands like an interpreter between the inspired and the un-inspired." অতএব সমালোচকের কাজও বড় সহজ নহে। যিনি শুধু শব্দের মাধুর্য্য, উপমার সৌন্দর্য্য বা ভাবের গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া ক্ষান্ত হন, তিনি প্রকৃত সমালোচক নহেন—তিনি কাব্যের উপরের আবরণ—তাহার বাহ্য 'পোষাক' (garment) দেখেন মাত্র। যিনি কাব্য মধ্যে কবির মন বুঝিতে চান, প্রকৃত কবি শিল্পীর সৃষ্টিতে তিনি তাহা দেখিতে পাইবেন না। কারণ,—"* * As hard to discover in his writings what sort of spiritual construction he has, what are his temper, his affections. For all lives freely within him. All characters are alike indifferent or alike dear to him, he is of no sect or caste, he seems neither this man, nor that man, but a man" Carlyle on Goethe p. 212.

কারণ, বলিয়াছি, প্রকৃত কবিশিল্পীর সৃষ্টি সর্ব্বকালীন, সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বজনীন। যাহারা এরূপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা শিল্পের বাহ্য আবরণ (body) দেখেন। অত-

এর প্রকৃত সমালোচককে কবির সৃষ্টির অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত কবি নহেন—যাঁহারা প্রকৃত শিল্পী নহেন—সমালোচকেরা তাঁহাদের সমালোচনা করিবেন না। অথবা যে সকল শিল্পী সুধু জীবিকার জন্য তাঁহাদের শক্তির অপব্যবহার করেন(ইংরাজীতে যাহাদিগকে Bread-artist বলে) তাঁহাদের বিকৃত শিল্পও সমালোচকের দেখিবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা এরূপ শক্তির অপব্যবহার করেন—সমালোচক তাঁহাদের জন্য তাঁহার লেখনী কলুষিত করিবেন না। কারলাইল্ বলেন,—তাঁহারা "lie without the limits of criticism, being subject not for the Judge of art but for the Judge of POLICE."

সে যাহা হউক, আমরা এস্থলে শিল্প সম্বন্ধে যে এত কথা বলিলাম,তাহার কারণ এই যে, শিল্পই নভেলের প্রাণ। যে নভেলের শিল্প নাই, তাহার আর সব গুণ থাকিলেও তাহা নভেল নহে। লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ভাস্কর যদি উৎকৃষ্ট জীবিত-কল্প মনুষ্য খোদিত করেন—এবং তাহাকে মূল্যবান্ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করেন—তাহা যতই কেন জীবিত মনুষ্যের মত বোধ হউক না কেন—তাহা কখনই মনুষ্য নহে। তাহাতে প্রাণ নাই। তাহার সহিত প্রস্তরের যত দূর সম্বন্ধ আছে জীবিত মনুষ্যের সহিত তাহার কিছু সম্বন্ধই নাই। অতএব নভেলের আর সমস্ত গুণ থাকিলেও যদি তাহাতে শিল্প না থাকে—যদি সে কবি সৃষ্টির মধ্যে প্রাণ না থাকে—যদি তাহা জীবনীযুক্ত structure না হয়—তবে তাহাকে নভেল বলা যায় না।

সংসারে যেমন জড় ও জীবন, দুই দেখিতে পাই, কবি সৃষ্টিতেও সেইরূপ বাহ্য জগতের চিত্র—মনুষ্য চরিত্রের চিত্র, দুইই থাকিবে। নভেলের এই দুইটাই অঙ্গ। তবে কেহ জীবন ও সংসার উভয়কেই এক অনন্ত আত্মার মধ্য দিয়া দেখেন, কেহ বা বাহ্য জগতে চরিত্রকে ডুবাইয়া দেন—যেন তাহার সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যেন বাহ্য-জগৎ হইতে তাহার অন্য অস্তিত্ব নাই। আবার অনেকে চরিত্রগুলিকে অনন্ত আত্মার ছায়ায় অঙ্কিত করিয়া তাহারই মধ্যে সমস্ত বাহ্য জগৎ ডুবাইয়া রাখেন। সুধু স্বভাব বর্ণনা, সাধারণ কবির কাজ। সুধু চরিত্র বর্ণনা, নাটক লেখকের কাজ। কিন্তু যিনি প্রকৃত শিল্পী, তিনি, কাব্যেই হউক আর নাটকেই হউক, বাহ্য ও অন্তর্জগতের যে মাখামাখি, মিশামিশি ভাব—উভয়ের সম্মিলনে যে অদ্ভুত সৃষ্টি, তাহারই গূঢ় রহস্য দেখাইয়া দেন। নাটক অপেক্ষা নভেলে শিল্পীর কার্য্যক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত। ইহাতে যেমন বাহ্য ও অন্তর্জগৎ, স্বভাব ও চরিত্রে পরস্পরের সম্বন্ধ, ঘাত প্রতিঘাত, মিশামিশি দেখান যায়, নাটকে তত সুবিধা নাই—কারণ নাটকে বাহ্যজগৎ প্রবেশ করাইতে গেটের মত শিল্পীর কৌশল আবশ্যক,—সেক্ষপীয়রের মত কবিত্বের প্রয়োজন। নতুবা এক খানি "ফষ্ট" বা একখানি "হাম্লেট্" রচিত হইত না। অনন্তের ভীষণ ভাব—অনন্তের অজ্ঞাত ভাব—অনন্তের মহান ভাবে, বাহ্য ও অন্তর্জগতের সম্মিলনে,—ফষ্টের সৃষ্টি। অন্তরের কাছে ইহাদের ক্ষুদ্রত্ব দেখাইতে গিয়াই বুঝি হাম্লেটের সৃষ্টি। আর মধুরিমা ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডারে বাহ্য ও অন্তর্জগৎকে ডুবাইয়া বুঝি কালিদাসের শকুন্তলার সৃষ্টি। কিন্তু কি বলিতেছিলাম?—

আজ কাল নভেলই কবির শিল্প-চাতুর্য্য দেখাইবার প্রধান অবলম্বন। এখন কাব্য নাটকের সময় গিয়াছে। কঠোর বিজ্ঞানের সময় আসিয়া—(age of analysis) আসিয়া কল্পনার রাজ্য তাড়াইয়া দিতে বসিয়াছে,—জগৎকে, মনুষ্যকে এখন জড়ভাবাকৃষ্ট (material) করিয়া তুলিতেছে। এই কল্পনা ও জড়ের কতকটা সংমিশ্রণে, এই জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের সংযোগে কবি-শিল্পীর নভেল সৃষ্টি। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রে ইহার পূর্ণ প্রচার। সে যাহা হউক, শিল্পই নভেলের প্রাণ। শিল্প-কৌশল না থাকিলে নভেলের নভেলত্ব কোথায়? কারলাইল বলিয়াছেন, "Novels . . . are entities. They must leave on us the impression of a perfect, homogeneous, indivisible whole. * * * (Being a) true work of art, it requires to be *fused* in the mind of its creator, and as it were poured forth from his imagination at one simultaneous gush." Carlyle on T. Richter p. 18.

অতএব নভেল লেখা বড় সহজ নহে। এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সেই জন্য বোধ হয়, প্রকৃত কবি শিল্পীর সৃষ্টি হয় নাই। শিল্পাংশে বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ ব্যতীত আর এক খানি নভেলও বাঙ্গালায় নাই। নাটক ও কাব্যে ত শিল্পের কথাই নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে আজিও প্রকৃত কবি-শিল্পী জন্মায় নাই, নতুবা বাঙ্গালীর এত দুর্দ্দশা কেন? এক জন সেক্ষপীয়র, কি কালিদাস, কি গেটে জন্মিলে এক জাতির কত গর্ব্ব হয়;—সংসারের সে জাতি কত বড় হয়, যিনি বুঝিতে পারেন, তিনিই বুঝিবেন, বাঙ্গালায় কেন একজন প্রকৃত শিল্পী জন্মায় নাই। বঙ্কিম বাবুর নভেল গুলির মধ্যে প্রথমকার দুই এক খানিতে অনেকটা শিল্প-চাতুর্য্য আছে,—তাই বঙ্কিম বাবুর নভেল বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ নভেল;—শুধু নভেল নহে, কি নাটক, কি কাব্য, কি নভেল, প্রকৃত সাহিত্য মধ্যে সেই গুলিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালায় আর এক খানি প্রকৃত শিল্প-প্রসূত কাব্য আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বাল্মীকির জয়" কাব্যাংশে ও শিল্পাংশে এত উৎকৃষ্ট যে, বাঙ্গালায় তাহার তুলনা মিলে না। ফিক্তে যাহাকে Divine Idea বলেন,—অন্তর্জগতের যে সত্য শক্তি দ্বারা এই জগৎ পরিচালিত—উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহার কতদূর এই ক্ষুদ্র—অথচ বৃহৎ কাব্যে প্রচার করা হইয়াছে! যদি বাঙ্গালায় শিল্পাংশে শ্রেষ্ঠ কোন কাব্য থাকে, তবে তাহা বাল্মীকির জয়। হেমবাবুর বৃত্রসংহারে এবং কতক পরিমাণে দশমহাবিদ্যায় শিল্পের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

অতএব প্রকৃত শিল্পী সচরাচর মিলে না। নভেলের সৃষ্টি শিল্পের উপর নির্ভর করে, তাই প্রকৃত নভেল মিলে না। আবার অনেক সময়ে প্রকৃত নভেল-লেখকগণও, নভেলকে ব্যঙ্গাত্মক করিতে গিয়া, অথবা তাহা নীতি শাস্ত্রে পরিণত করিতে গিয়া, শিল্পকে বিকৃত করিয়া দেন। তাই তাঁহাদের নভেল—আর প্রকৃত নভেল থাকে না। ইংলণ্ডের দুই জন প্রধান নভেল-লেখক, থেকারি ও ডিকেন্স, নভেলে ব্যঙ্গ ও নীতি মিশাইয়াই তাঁহাদের নভেলের প্রকৃত নভেলত্ব নষ্ট করিয়াছেন। টেন সাহেব এই পরম সত্য সম্বন্ধে বলিয়া-

ছেন,—"To transform novel is to deform it; he who like Thakeray, gives to the novel satire for its object, ceases to give it art for its rule, and all the force of the satirist is the weakness of the novelist."

আর এক স্থানে আছে,

"The studied presence of a moral intention spoils the novel, as well as the novelist." History of English Literature, vol. II. p 390-91.

আমাদের দেশে ব্যঙ্গাত্মক নভেল আজিও লিখিত হয় নাই। থেকারি ও ডিকেন্সের রোগ বাঙ্গালী নভেল-লেখকের মধ্যে বড় অধিক প্রবেশ করে নাই—সুতরাং সে বিষয়ের বিশেষ উল্লেখের আবশ্যক নাই। যাঁহাদের নভেলে শিল্পের আভাস আছে, তাঁহাদের নভেলে আজিও ব্যঙ্গ প্রবেশ করে নাই। কেবল ইন্দ্র বাবুর কল্পতরুতে, থেকারির অনুকরণে অনেকটা ব্যঙ্গের অবতারণা আছে—কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ শিল্প চাতুর্য্য দেখান নাই।

তবে আজ কাল নভেলে নীতি কিছু অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকে চরিত্রের দোষ গুলি এত অধিক অতিরঞ্জিত করেন যে, তাহা স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। যেমন ব্যঙ্গ চিত্রে caricature আমাদের গঠনের দোষগুলি সম্যক প্রকারে বক্রিমাকারে অঙ্কিত এবং অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হয় কিন্তু চিত্র আদৌ স্বাভাবিক হয় না—তাহাতে প্রকৃত শিল্পের কোন পরিচয় থাকে না; সেইরূপ নভেলেও চরিত্রের দোষগুলি অতিরঞ্জিত করিলে অথবা তাহার কেবল গুণের অংশ অধিক পরিমাণে দেখাইলে, সে চরিত্রের প্রকৃত চিত্র হয় না—তাতে প্রকৃত শিল্পের কোনই আভাস থাকে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি ত, নভেল-লেখক, ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ কিছুই দেখিবেন না, যাহা সত্য, যাহা প্রকৃত জগতের প্রতিকৃতি—সংসারের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যাহা মূল তত্ত্ব,তাহাই তিনি দেখাইবেন মাত্র। ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ভার পাঠকের। অতএব যাঁহারা সৎ অসৎ দেখাইতে যান, নভেলের মধ্যে গ্রন্থকারের আমিত্ব প্রবেশ করাইয়া দিয়া—পাঠকবর্গকে ভাল মন্দ বাছিয়া দেন—পাঠকদের উপদেশ দেন, সৎ চরিত্রের উপর সহানুভূতি, মন্দ চরিত্রের উপর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতে বসেন, তিনি শিল্পকে নষ্ট করেন। তাঁহার নভেল প্রকৃত শিল্পীর সৃষ্টি নহে—তিনি ত সাধারণ সমালোচক—সাধারণ উপদেষ্টা মাত্র।

এই জন্য বঙ্কিম বাবুর আধুনিক নভেলগুলি শিল্পাংশে বড় সুন্দর হইতেছে না। আনন্দমঠ সুন্দর উদ্দেশ্য-মূলক নভেল হইলেও, তাহাতে প্রকৃত শিল্পের বড় অভাব। দেবীচৌধুরাণীতে অপেক্ষাকৃত শিল্পের আভাস থাকিলেও তাহাতে নীতি ও উদ্দেশ্য এত অধিক পরিমাণে মিশাইয়াছেন, art এর সহিত এত artificial মিশাইয়াছেন যে, তাহাতে শিল্প বড়ই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যথাসময়ে ইহার উল্লেখ করিব।

নভেলের উদ্দেশ্য ও নীতির কথা বলিলাম—উপসংহার কালে কবির রুচি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে রুচি কথাটা আজ কাল সাম্প্রদায়িক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত নহে—অথবা বিশেষ সাবধানে

তাহার উল্লেখ করিতে হয়। নীতিবেত্তাগণ সাধারণত যাহাকে রুচি বলেন—যাহা (obscene) কথার বিপরীত—ঠিক সে অর্থে প্রকৃত শিল্পীরা রুচি বুঝেন না। শিল্পীগণ জগতের সত্য মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারা আর কিছুই দেখেন না, আর কিছুর অনুরোধে শিল্পকে বিকৃত করেন না। কিন্তু পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ত, মহাপুরুষগণ, প্রকৃত নীতিবেত্তাগণ বা শিল্পীগণের মধ্যে প্রকৃত রুচি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রভেদ থাকা উচিত নহে। 'Greatness of a harmful sentiment অথবা organised mechanism of a pernicious character.' এর মধ্যে যে সত্য আছে—তাহা দেখান যেমন শিল্পীর কার্য্য, তেমনি নীতিবেত্তারও কর্ত্তব্য হওয়া উচিত,—সত্য পরিহার করা কোথাও উচিত নহে। কেন না সত্য হইতেই জগতের উন্নতি। দেখ, এক জন উচ্চদরের চিত্রকর, মৃত্যুশয্যায় শায়িত, নগ্নদেহ, এলায়িত বেণী—মৃত্যুযন্ত্রণায় মুখ বিকৃত—মৃত্যুশয্যার চারিপার্শ্বে স্বভাবের গম্ভীর ভাবে পরিবেষ্টিত, হস্তেস্থিত বিষধর দ্বারা বক্ষোপরি দষ্ট ক্লিওপেট্রার ছবি আঁকিয়াছেন *। মৃত্যুর কি চমৎকার—কি ভয়ানক দৃশ্য—মৃত্যু সময়ে মুখের কি আশ্চর্য্য ভাব-বিকাশ, ঐশ্বর্য্যক্রোড়ে লালিত বিলাসিনীর কি ভীষণ পরিণাম—চিত্রকর কেমন সুন্দর কৌশলের সহিত দেখাইয়াছেন। চিত্রে কি অসীম ভাব সাগরের বিকাশ,—উচ্চ কল্পনাকে কেমন চিত্রে পরিণতি—চিত্র মধ্যে কি এক নূতন জগতের ভাবময় বিকাশ,—যিনি দেখিয়াছেন, তিনি যদি চিত্রের প্রকৃত শিল্প মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, তাহাতে নিহিত সত্য মধ্যে না ডুবিয়া, রুচির নিন্দা করেন—তবে তিনি এখনও জগৎ বুঝেন নাই—সত্যকে আদর করিতে শিখেন নাই—তিনি কখনও নীতিবেত্তা হইতে পারেন না। নভেল সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যায়। পণ্ডিতবর কারলাইল রুচি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"Taste, if it means anything but a paltry connisseurship, must mean a general susceptibility to truth and nobleness : a sense to discern, and a heart to love and reverence, all beauty, order, goodness, wheresoever or in whatsoever forms and accopaniments they are to be seen." Carlyle's Essays. Vol. I. p. 34.

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু

* কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির হলের পার্শ্বে পাঠকগণ এই উৎকৃষ্ট ছবি দেখিতে পাইবেন। শুনিয়াছি ইহার মূল্য বড় অধিক।

বিগত-স্মরণে।*

না জানি কিসের তরে বৃথা অশ্রু ঝরে রে!
গভীর হতাশা হতে, হয়ে সমুত্থিত চিতে,
অবশেষে আসি চক্ষু আকুলিত করে রে!—

শরতের মনোলোভা, হরিত ক্ষেত্রের শোভা,
নিরখি যখন আমি ব্যথিত অন্তরে রে,
যে দিন গিয়াছে চলি, আর না ফিরিবে বলি,
ঝরে অশ্রু সুখময় সেই দিন তরে রে!

* **Translation of Tennyson's song—"Tears, idle tears—" vide the Princess, Canto IV.**

নবীন ঊষার যথা তরুণ কিরণ রে
হাসে সেই পোতোপরি,আনে যাহা হৃদেপরি,
পয়োনিধি অতিক্রমি যতনের ধন রে ;
হরি প্রিয়বন্ধু জনে, ধরি সান্ধ্য রাঙা রঙে,
কাঁদাইয়া পোত যথা দৃষ্টি ছাড়ি যায় রে,—
যেদিন গিয়াছে চলি,আর না ফিরিবে বলি,—
তেমতি হাসিছে হৃদে,—তেমতি কাঁদায় রে !

৩

মুমূর্ষুর কালে যথা বসন্ত উষার রে,
অর্দ্ধ-জাগরিত যত পাখীর প্রথম গীত
কি বিষাদে পরিপূর্ণ কহনে না যায় রে !—
যবে মুমূর্ষুর চোকে, বাতায়ন ক্ষীণালোকে,
অস্ফুট আলোক-খণ্ড-মাত্র বোধ হয় রে !
যেদিন গিয়াছে চলি, আর না ফিরিবে বলি,
তেমতি বিষাদপূর্ণ,—অকথ্য কথায় রে !

৪

মৃত্যুপরে কি মধুর চুম্বনের স্মৃতি রে !
যে অধর অন্তরে, চুম্বাশা সে সুধাধারে
কি মধুর নিরাশ্বাস প্রেমিকের অন্তরে !
গভীর উচ্ছ্বাসময়, কিবা নব প্রেমোদয়,
কি মর্ম্মপীড়ায় পরে আকুলিত করে রে !
তেমতি,তেমতি,আহা ! জীবনে মরণ রে !—
যেদিন গিয়াছে চলি,আর না ফিরিবে বলি,
মধুর,—আকুলকারী তাহার স্মরণ রে !
না জানি কিসের তরে বৃথা অশ্রু ঝরে রে !

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

ইন্দুবালা।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"গুরু শিষ্য।"

সময়,—নিশীথ ; স্থান—হিমগিরি শৃঙ্গের পার্শ্বস্থিত—নিভৃত কুটীর। এক যুবা আসীন, —পরিধান রক্তবস্ত্র, মস্তকে জটাজূট, সম্মুখে স্তিমিত প্রদীপ, হস্তে ক্ষুদ্রলিপি। চিন্তা— "সেই মধুর মুখচন্দ্রমা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব কি ? পুনর্ব্বার আমায় পত্র লিখিয়াছে। সংসার ত্যাগ করিয়া, আশা ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, ধন মান খ্যাতি, সংসারের সকল বস্তুতে জলাঞ্জলি দিয়া, হিমগিরির এই নির্জ্জন তুষারময় প্রদেশে আসিয়াও, কেন শান্তি পাই না ? আমি উদাসীন পরিব্রাজক। আমার মনে এরূপ ভাব,এরূপ চিন্তা, কেন ? ভাবিয়াছিলাম,তাহাকে আর পত্র লিখিব না, আমাকে পত্র লিখিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া দিব। আশা করিয়াছিলাম, এই অশান্ত জীবনের অবশিষ্ট ভাগ, জনসমাগম-শূন্য নিস্তব্ধ লুক্কায়িত গিরিকন্দরে নীরবে অতিবাহিত করিব ;—আশা করিয়াছিলাম, এখানে দীর্ঘকাল থাকিয়া হৃদয় শমিত হইবে, জীবনের সায়াহ্নে শান্তি লাভ করিতে পারিব। সে আশা বিফল।" এই বলিয়া তিনি করস্থিত পত্রখানি মৃদুস্বরে পড়িতে লাগিলেন—"জ্ঞানীগণ উপদেশ দেন, অজ্ঞান তাহা শুনিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করে, এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। হে গুরো ! আমি আপনার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করি। দুর্ব্বল মন অস্থির হইয়াছে—সম্পূর্ণ অধীর হইয়াছে। আপনার নিকটও সাত বৎসর একাদিক্রমে আত্মসংযমের কথা শুনিয়াছি, সুনীতি সহিষ্ণুতার কথা শুনিয়াছি, তথাচ কেন অধীর হইয়া আপ-

নার নিকট অসারতার পরিচয় দিতেছি। গুরো, আপনি জ্ঞানী, আপনি ত জানেন, উপদেশ দেওয়া কত সহজ,আর সেই প্রকার কার্য্য করা কত কঠিন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা স্মরণ রাখিয়া, এই হতভাগিনীর প্রতি নিতান্ত কঠোর আজ্ঞা বিধান করিবেন না। আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, আপনি যাহাই বলিবেন, আমি তাহাই করিব। * * *

আমরা দেখিতেছি, এই বিশ্বের ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে অনন্ত আকাশ,সকলই কবিত্বময় ও আমোদদায়ক। * * আমরা যখন গভীর নিশীথে একাকী জীবন আলোচনা করি, তখন জগৎ কি সুখের বোধ হয়? সকলের কথা বলিতেছি না, হইতে পারে, লোক বিশেষে হয় না। আমরা কেন বুঝিতে পারি না যে, আমরাই আমাদের অসুখের কারণ? আমরা অবস্থা ভুলিয়া, জীবন ভুলিয়া, এক এক বিশেষ দ্রব্যে মোহিত হইয়া যাই—চেতন হউক, আর অচেতনই হউক। চেতন হইলে, কোন কোন স্থলে, সময় আমাদের একটু সুখী করিতে চেষ্টা পায়, অচেতন ত জীবনহীন। * * * * আমরা যাহা চাই, সৌরজগৎ তাহা বুঝে না,—দয়ালু ঈশ্বর তাহা দেন না; তথাপি আমরা জীবন-স্রোতে ভাসিয়া তাহা ধরিতে যাই, পাইলে সমুদায় ভুলিয়া থাকি, নিরাশ হইলে আঁধারে অসুখে নিমগ্ন হই। হতভাগ্য জীবনের এত বিপদ, তথাপি আমরা সামান্য সুখে গলিয়া যাই—সকল কেন? আমি বুঝিতে পারি না। আপনি আমাকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও স্নেহ ভরে কতবার শিশু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাই বলি, এই শিশুর তরল মস্তিষ্ক এই সকল বুঝিতে পারে না, তাই——ব্যগ্র হইয়াছি, বুঝাইয়া দিবেন।

দিন আসে, চলিয়া যায়, থাকে না;—বলিলেও শুনে না কেন?—সময় থাকে না সত্য,কিন্তু জীবন এত দীর্ঘ,—ভবিষ্যতে কি হইবে? * * এক দুই করিয়া গণনায় যে শান্তি, তাহাও যদি না থাকে, তবে মনুষ্য কি উপায়ে বাঁচিতে পারে,জানি না। আমরা দিন গণি কেন? * * *

এ সকল লিখিয়া কি সুখ? শান্তি? তাহা পাইব কেমন করিয়া? কি চাই? কাহার নিকট? * * মনের অসুখ মুখে ভাসে কেন? * * * চক্ষু সকল সময় তাহার কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি * * ইচ্ছা-বিরুদ্ধ আচরণ সকলেই করে।

কি লিখিলাম, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। সকলই ত আপনি জানেন। অন্যে আমাকে দূষিতে পারে, কিন্তু আপনি আমাকে দূষিলে, আপনি আমাকে ঘৃণা করিলে, আমি এই ভারাক্রান্ত জীবন রাখিতে পারিব না। এখানেই শেষ।"

শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী।

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে, পরিব্রাজক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এই প্রিয়লিপি পুন পুন পাঠ করিলাম, তথাচ ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না—স্থানে স্থানে প্রহেলিকাবৎ। এই পত্রের বাচ্যবিষয়, অবশ্যই আমি। ইহা সুখময় বিপদ। আমি এখন পরিব্রাজক, ইন্দুবালা অন্য-পুরুষ বিবাহিতা—তথাচ এই দুর্ব্বোধ মন এই পত্র পাঠ করিয়া কেন আনন্দ অনুভব করিতেছে, গত জীবনের

ঘটনাগুলি কেন স্মৃতির স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া মনকে অস্থির করিতেছে? 'আমরা আপনার অবস্থা ভুলিয়া এক এক বিশেষ দ্রব্যে মোহিত হইয়া যাই"—এই দ্রব্য কি? আমি?—যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ কি? আর লিখিয়াছে—"এক দুই গণনা করার যে সুখ, তাহাও যদি না থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য কি উপায়ে বাঁচিতে পারে, জানি না"—ইহার অর্থ কি? কিছু কাল হইল, দুই মাস পরে প্রয়াগ যাইব, বলিয়াছিলাম। তা যাইলাম না। ইন্দুবালা সেখানে, তাহার সহিত এক্ষণও সাক্ষাৎ করিতে সাহস হয় না। মন উদ্বেল হইয়া যাইতে পারে—যে বাঁধ অনেক কষ্টে বাঁধিয়াছি, তাহা ভাসিয়া যাইতে পারে। আমি যাইব না। ভৃগুরাম গোস্বামী বোধ হয় প্রয়াগে আমার পিতৃব্যের নিকট এই সংবাদ দিয়াছেন। স্নেহময়ী ইন্দু তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে। যাহাই হউক, আমি যাইব না। কিন্তু ইন্দু যদি আমাকে এক বার দেখিয়া সুখী হয়, তাহা হইলে আমি যাইব না কেন? শিলাময় শৈলে থাকিয়া কি আমার হৃদয় এমনই পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছে? ইন্দু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দিন গণিতেছে—আর আমি যাইব না? আমার সুখ আমি ধরি না,—কিন্তু ইন্দু!—তাহার সুখের জন্য কি আমি এই তুচ্ছ প্রাণ দিতে পারি না? ইন্দুর সুখ—সুখ? ইন্দু কি এই সাক্ষাতে সুখী হইবে? এই ক্ষণকালস্থায়ী, ধর্ম্মশিক্ষাবিরুদ্ধ, বিপদজনক সাক্ষাতে ইন্দু কি সুখী হইবে?—ক্রমে পরিণামে, কি অপযশে ও অসুখে এককালীন ডুবিবে না? আমাকে গুরু বলিয়া মান্য করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, দক্ষিণা স্বরূপ তাহার দেবদুর্লভ হৃদয়ের অমূল্য স্নেহ পায়ের নিকট ঢালিয়া দিয়াছে—আর আমি জানিয়া শুনিয়া যাহাতে তাহার জীবনে কালিমা পড়িবে, তাহাই করিব? সে মুগ্ধ-স্বভাবা স্নেহ-প্রাণভূতা,—সংসার বুঝে না, বিপদ বুঝে না, ঈশ্বর ভালবাসিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সে ভালবাসিয়াছে—যাহাকে ভালবাসে, তাহার নিকট থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে দেখিতে চাহে,—সে মনে করে, তাহাতে দোষ কি? সংসার তাহাতে আপত্তি করিবে কেন? আর এমন অন্যায় আপত্তি করিলে আমরাই বা শুনিব কেন?—এমনই কথা যেন এক দিন বলিয়াছিল, এক্ষণও মনের ভাব যেন এই প্রকার। এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"ভালবাসা কি পাপ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহার অর্থ কি?" সে বলিল—"আপনি সাহসী পুরুষ, আমাকে আপনি ভালবাসেন, লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে ভয় পান কেন, আমার নিকটও সময় সময় গোপন করেন কেন? আমি যে আপনাকে ভালবাসি, তাহাত আমি কাহারও নিকট গোপন করি না, আপনার নিকটও করি না।" তখন তাহার বয়স অল্প, এখন বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভাব গুলি যেন একটুকু গাঢ় হইয়াছে, লজ্জাশীলতায় ভাষা একটু অপরিস্ফুট হইয়াছে,—কিন্তু সেই স্নেহ, সেই আত্মোৎসর্গ—আশ্চর্য্য—এই বালিকার সহিত আমার জীবন এমন জড়িত হইয়া যাইবে, কে ভাবিয়াছিল? আমারই জন্ম কোথায়, আর তাহারই বা জন্ম কোথায়? সে যাহা হউক, আমি যাইব না; আমি আমার.

প্রাণাধিক শিষ্যকে সুনীতি-বর্জ্জিত পথে যাইবার দৃষ্টান্ত দেখাইব না। আমাকে চিরকাল এই অনলে পুড়িতে হইবে,—একাকী নীরবে পুড়িব। কখন কখন ভাবি, একবার বলিয়া আসি,—"স্নেহময়ী ইন্দু, তুমি পুড়িতেছ আমি জানি,—আমিও পুড়িতেছি;—নীরবে পুড়িব, তোমার সহিত সহবাস করিবার নিমিত্ত সংসার যাহাকে সনন্দ দিয়াছে, তুমি তাহার নিকট থাক, তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা কর, নিজের মন সংযত কর,—পরকালে আমরা সুখী হইতে পারিব।" এই কথাটী একবার বলিয়া আসি না কেন?—না, না—যাইব না, যাইব না, কদাপি যাইব না। তাইত,—আমার নিষিদ্ধ ইচ্ছাকে মনে স্থান দিতেছিলাম? যাইব না, ঠিক; পত্রও লিখিব না, ইন্দুর এই পত্রের উত্তরও দিব না——"বিভো, জীবনের শেষভাগ কি এই রূপে কাটাইতে হইবে? তাহার নিকট চির বিদায় লওয়া ব্যতীত কি আর উপায় নাই? তবে কি তাহাকে আর দেখিবার অধিকার আমার থাকিল না"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যুবকের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে, হৃদয় কতক সংযত করিয়া, কুটীরের বাহিরে আসিয়া প্রাঙ্গণে ধীরে ধীরে পদ-সঞ্চালনা করিতে লাগিলেন। ধরাতল অন্ধকারে আবৃত; কেবলমাত্র নৈশগগনে নক্ষত্রমালা দীপ্তি পাইতেছে, আর কেবল মাত্র সুদূরস্থিত শৃঙ্গ হইতে দুইটী কুটীরের ক্ষুদ্রালোক তমোরাশি ভেদ করিয়া নক্ষত্রবৎ প্রতিভাত হইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; কেবল দূরে ভাগিরথী এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে ঝর্-ঝর্ ঝর্-ঝর্ করিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে পতিত হইতেছে, তাহারই গম্ভীর কলনাদ সেই শৃঙ্গময় প্রদেশকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। যুবা কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া আবার কুটীরে আসিলেন; ভাবিলেন—"যাইব না ঠিক, কিন্তু পত্র লিখিব,—"এক্ষণই লিখিব, প্রশান্ত ভাবে লিখিব, মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিব না, কিন্তু—।" তাহার পরে লিখিতে লাগিলেন,——"চিরজীবেষু,——

অনেক দিন পরে তোমার পত্র পাইলাম। বলা অনাবশ্যক, তোমার পত্র সকল সময়েই আমার নিকট আদরনীয় ও প্রীতিপ্রদ। তোমার নিকট পত্র লিখিতে বসিলে অনেক কথা মনে পড়ে, কিন্তু সে সব কথা লিখিব না। এই পত্রে তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহারই কেবল উত্তর দিব। তুমি লিখিয়াছ,—"আমরা যখন গভীর নিশীথে একাকী জীবন আলোচনা করি, তখন কি জগৎ সুখের মনে হয়?" ইহার উত্তর কি দিব? আমি ত কতদিন একাকী বাহিরে আসিয়া, গভীর নিশীথে, উত্তপ্ত হৃদয়ে বেড়াইয়াছি—মস্তকোপরি অগণ্য ভ্রাম্যমান নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ দেখিয়াছি—চাহিয়া চাহিয়া, নিরাশ হইয়া, সেই অজস্র দীপ্তি-পুঞ্জ হইতে আঁখি ফিরাইয়াছি—সুখময় নীল আকাশে সুখকণামাত্র পাই নাই—বিষময় ধরাতলের ত কথাই নাই—সুশীতল সমীরণে উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করে না। তখন গম্ভীর ভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—"আমি, কেন? আমি জীবিত কেন—আমার সহিত এই বিশ্বসংসারের সম্বন্ধ কি, এই নিদ্রিত পৃথিবীর সহিত এই অনিদ্র আমার সম্বন্ধ কি?" কোন উত্তর পাই নাই। "যেমন আকাশের অযুতযোজন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই,

তেমনি, ভাবিয়াছি, সংসারের কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই। আমি দুঃখে কাতর হইলে একটী মাত্র নক্ষত্র তাহার কক্ষ হইতে চ্যুত হইবে না,—আমার নিকট আসিবে না,—এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহার গতিরোধ করিবে না,—অনায়াসে,আমার দুঃখ দেখিয়াও, প্রশান্তভাবে, অনন্ত শূন্যে, আনন্দগীত গাইতে গাইতে, আপনপথে, আপনমনে চলিয়া যাইবে; তেমনই সংসারের কোন ব্যক্তি আমার দুঃখে, আমার শোকে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহার নিজের ঈপ্সিত পথ ছাড়িবে না, আমার দুঃখে এক বিন্দুমাত্র অশ্রু ফেলিবে না, আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণায় অভিভূত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইবে।" এইরূপও কতবার গভীর নিশীথে ভাবিয়াছি, ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি। কত বার ভাবিয়াছি যে, জগতে কোটি কোটি লোকের বাস, সেই জগতে আমি একটী মাত্র লোককে আমার বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলাম না,—কাহাকেও আমার বলিয়া সম্বোধন করিবার ইচ্ছাও হইল না—এক দিনের তরে আমার আত্মা অন্যের আত্মার সহিত মিশাইয়া দিতে পারিলাম না—একদিনের তরে স্বর্গীয় সম্মিলনের অমৃতময় সুখরস পান করিলাম না। পৃথিবীতে এমন অদৃষ্ট লইয়া আর কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে! আমি কি তবে অসুখী? আমি যদি অসুখী না হই, তবে এই ব্রহ্মাণ্ডে অসুখী কে? যাহার এ জগতে একটীও আকর্ষণের বস্তু নাই, যাহার জীবন-কাননে একটী মাত্র ফুল ফুটে নাই—কেবল কণ্টকময়;—যাহার দিবসে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে দগ্ধ হৃদয় শীতল হইবে, এমন আশা নাই;—যাহার রাত্রিতে কাহারও বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে ভাসিয়া ভাসিয়া নিদ্রার সুখস্বপ্নময় উপকূলে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই;—যাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার এই বিশাল পৃথ্বীতে একটী মাত্র প্রাণী নাই, সে যদি অসুখী না হয়, তবে অসুখী কে? কতবার গভীর নিশীথে বলিয়াছি,—"হে বিভো, তুমি আমাকে এই বিশ্বসংসারে পাঠাইয়া দিলে, অথচ তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ দেখাইয়া দিলে না, তুমি আমাকে ভালবাসিবার নিমিত্ত প্রবৃত্তি দিয়াছ, হৃদয় ব্যাকুল করিয়া দিয়াছ, অথচ ভালবাসিবার সামগ্রী দিলে না—"আমি" এবং "অন্য" এই প্রভেদজ্ঞান অসহনীয় করিয়া দিয়াছ, অথচ এই প্রভেদজ্ঞান কখনও দূরীকৃত করিলে না—কিন্তু তোমার অভিপ্রায় কে বুঝিবে—আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি নর।" এইত পূর্ব্বে ভাবিতাম, এক্ষণে কি ভাবি, তাহা বলা অনাবশ্যক।

তুমি লিখিয়াছ,—"আমরা আমাদের অসুখের কারণ"—এটী একটী মহামান্য সত্য বলিয়া বিবেচনা করি। একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিলে আমাদের মনে নরক বা স্বর্গ রচনা করিতে পারি। আমরা ইচ্ছা করিলে মনকে স্বর্গের ন্যায় সুখময় বা নরকের ন্যায় দুঃখের আধার করিতে পারি। কিন্তু একথা কি সম্পূর্ণ সত্য? আমাদের সুখ কি এতই নিজের আয়ত্ত? যদি তাই হ'বে, তা হ'লে আমরা সুখের জন্য লালায়িত হইয়া নিজের মস্তক অন্যের হৃদয়ে রাখিতে চাহি কেন? যদি তাই হ'বে, তাহা হ'লে ব্যক্তি বিশেষের একটী কথাতে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গ নাচিয়া উঠে কেন? কই, আমিত নিজে আমাকে সুখী করিবার অভিপ্রায়ে আপনাকে ক-

প্রিয় সম্বোধন করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে ত সুখের তরঙ্গ নাচিয়া উঠে নাই, তাহাতে হৃদয়-যন্ত্র মধুরস্বরে একদিনও ত বাজিয়া উঠে নাই। তবে ইন্দু, যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, তিনি নিজেতে নিজে মোহিত হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তুমি কি বুঝিবে? তিনি যাহাতে মোহিত, তিনি তাহাকে আপনা হইতে পৃথক মনে করেন না,—তাহা তাহার হৃদয়ভূত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহার চৈতন্য বা চিন্তা বা অনুভব রূপে পরিণত হইয়াছে। দর্শনে আছে যে, এই বিশ্বজগৎ মনুষ্যের চৈতন্য মাত্র, বোধ মাত্র। এই বিশ্বজগৎ যে আছে, তুমি যে আছ, আমার নিকট তাহা আমার চৈতন্য, আমার বোধ, ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; আমি জন্ম গ্রহণ না করিলে, আমার চৈতন্য না থাকিলে, আমার নিকট তুমি বা বিশ্বজগৎ থাকিতে না"—এতদূর লিখিয়াই লিপিলেখক থামিলেন, ভাবিলেন, "কি লিখিতেছি? দার্শনিকদিগের মত এখানে লেখার কি আবশ্যক? এক দিন ইন্দুবালা বলিয়াছিলেন—"আপনার দর্শন-বিজ্ঞান সকল সময় কাযে আসে না," সত্য। কি লিখিলাম দেখি, এই বলিয়া পত্র খানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলেন, পড়িয়া বলিলেন—"কি ছাইভস্ম লিখিয়াছি? অনেক অসঙ্গত ও অনাবশ্যক কথা লিখিয়াছি। আমি অনেক দিন সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া যেন মনের ভাব প্রকাশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি,—ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি—আর কিই বা লিখিব; যাহা লিখিবার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়, তাহা বিবেক অনুমোদন করে না, তাহা লিখিতে পারি না, সুতরাং ভাষা সুখের হয় না—" এই বলিয়া পত্র খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন—পূর্ব্বগগন প্রান্তে গিরিশৃঙ্গের উপর দিয়া শুধাংশু উদিত হইয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, দূর তুহিনাবৃত গিরিশৃঙ্গ রজত-কিরণে বিভূষিত হইয়া, অপূর্ব্ব স্নিগ্ধোজ্জ্বলে জ্যোতি প্রতিফলিত করিয়া, এক ঐন্দ্রজালিক-দীপ্তিময়ী মধুরিমার অবতারণা করিয়াছে; আকাশ নির্ম্মল, —বিস্তৃত চন্দ্রমা-বিভাসিত, নক্ষত্র-খচিত, কচিৎ বা লঘু শ্বেতাম্বরমালায় শোভিত। এই রূপ নিসর্গ-শোভা সন্দর্শন করিয়া পরিব্রাজক, ক্ষণকাল, সেই ধবল মধুর জ্যোতি-ধৌত পর্ব্বতশোভা একদৃষ্টিতে দেখিলেন,—পরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি সুন্দর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—ইন্দু, তুমি কোথায়? আমি আর সহ্য করিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি আবার কুটীরে প্রবেশ করিলেন,—"অদ্য আর পত্র লিখিতে পারি না" বলিয়া শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল পরে "হরিহর" বলিয়া ডাকিলেন। হরিহর প্রভুভক্ত দাস। সে আসিল, দেখিল, প্রভুর মুখ মেঘাচ্ছন্ন,—চক্ষু মুদ্রিত, ভ্রূকুঞ্চিত; বুঝিল, তুফান উঠিয়াছে। সঙ্কুচিত ভাবে শয্যার পাশে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, —দীপালোকে দেখিল যেন ললাটে—অনবরত একটী চিন্তার পশ্চাতে আর একটী চিন্তা ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, হৃদয় ঘন ঘন সঙ্কুচিত, আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে, মুখ রক্তিমবর্ণ, হস্তপদাদি স্পন্দহীন। ভৃত্য দুঃখ-মিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত নিরুপায় হইয়া প্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিল। অনেকক্ষণ পরে পরিব্রাজক আবার সজোরে

ডাকিলেন,—"হরিহর"

হরিহর।—"প্রভো"

পরিব্রাজক।—"কল্য—এখান হইতে—চলিয়া—যাইব"

হরিহর।—"প্রভো" আপনার ইচ্ছা।

পরিব্রাজক।—"হাঁ"

তুফান যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। পরিব্রাজক মধ্যে মধ্যে অপরিস্ফুট ও অসংলগ্নভাবে কি বলিতে লাগিলেন। হরিহর সে শব্দ পূর্ব্বে দুই একবার যেন শুনিয়াছিল,—তাহাই যেন শুনিল—"ইন্দু—ইন্দু—প্রাণের ইন্দু"——।

প্রাচীন তত্ত্ব

কোথাও কেহ, প্রতিভা বলে, ভবিষ্যৎ সমাজের গতিবিধি অনুমান করিয়া, বা আপন অভিলষিত একটী সমাজের কল্পনা করিয়া, তাহার শাসনের জন্য নিয়মাদি উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইলেও, সাধারণত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সমাজের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার অনুরূপ নিয়মাদি প্রচলিত করিয়া থাকে। অর্থাৎ অগ্রে সমাজ, তাহার পর নিয়মাদি। অথবা অগ্রে নিয়মাদি আচরিত হয়, তাহার পর সে গুলি যথাযথ বা কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়, তাহা রাজগণের বা শাস্ত্রকারদিগের আপন আপন ইচ্ছানুসারে অন্যদিগকে নিয়মিত করিবার জন্য। ব্যাকরণ যেমন ভাষার অনুসরণ করে, ধর্ম্মশাস্ত্র তেমনি সমাজের অনুসরণ করে। ভাষার গতি বিপরীত মুখে চালিত করিতে ব্যাকরণের যেমন সাধ্য নাই, শাস্ত্রকারেরও তেমনি সাধ্য নাই যে, সমাজের গতি প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারেন। ব্যাকরণকারের মত, ধর্ম্মশাস্ত্রকার এই মাত্র বলিতে পারেন, এটা ভাল নহে, বা এটা করা উচিত নহে। নতুবা সমাজ যাহা দূষণীয় বলিবে, যাহার দণ্ড দিতে চাহিবে, ধর্ম্মশাস্ত্রকারকেও তাহাই দূষ্য ও দণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সাধারণত, ধর্ম্মশাস্ত্র সকলকে সমাজের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই বলিয়া সকলকেই কাঁদিতে দেখা যায়। গৃহে এক জনের পীড়া হইলে যদি সকলেই মাটিতে পড়িয়া চিৎকার করিতে থাকে, আমরা তাহাদের ভাবপ্রবণতার প্রশংসা করিতে পারি, তাহাদের স্নেহশীলতার পরিমা করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ধিক্কার দিতে কুণ্ঠিত হই না। গ্রন্থ বিশেষে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিলে পড়িতে বড় আরাম হইত, সমালোচকে বড় প্রশ্রয় পাইত, অথবা অনুবাদ করিয়া অর্থ সঞ্চয়ের বড় সুবিধা হইত, স্বীকার করি। কিন্তু গ্রন্থ বিশেষ মধ্যে সমগ্র ইতিহাস [illegible] কি থাকিলে তত আনন্দ হয় না, নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া তর্ক মীমাংসা ও বিচার করিয়া, দেহ ও মস্তিষ্ক খাটাইয়া নূতন ইতিহাস সংগ্রহ করিতে আনন্দ যত অধিক হয়। রামচন্দ্র কোন সালে (?) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বা লঙ্কা-সমরে কত সহস্র সৈন্য উভয় পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল, এখন হয়ত, তাহা উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা নাই।

তখন প্রজাসংখ্যা কত ও আয় ব্যয় কিরূপ ছিল, হয়ত তাহা আমরা আর জানিতে পারিব না। এ সকল সংবাদের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু যাহা না পাইব, তাহার জন্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা পরিত্যাগ করি কেন? বিশেষত যে সকল অমূল্য সত্য এখনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার মূল্য সামান্য নহে; যাহা হারাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা তাহাদের মূল্য অনেক অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে সমাজের অবস্থা কিরূপে ক্রম-বিকশিত হইয়াছিল, কোন্ যুগের আর্য্যজাতির অবস্থা কিরূপ ছিল, কি ভাবে আর্য্যহৃদয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আলোড়িত হইয়াছিল, কি চিন্তায় পূর্ব্বপুরুষগণের মস্তিষ্ক কুঞ্চিত হইত, কিরূপে কৃষিচারী হলস্কন্ধ মহাপুরুষেরা সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মহাসূত্র উদ্ঘাটন করিলেন, প্রেত-পূজিত মহাদেশে কিরূপে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের উদয় সম্ভব হইল, যেদেশে "ধর্ম্মং গচ্ছামি সংঘং গচ্ছামি" বলিয়া পুরস্ত্রী হইতে মাঠের চাষা পর্য্যন্ত, রাজপুত্র রাহুল ও ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত চিৎকার করিত,—মহিষী যশোধরা ও কাঞ্চনমালা হইতে নগরবাসিনী বারাঙ্গনা পর্য্যন্ত যে দেশে সহস্র সহস্র বৎসর শাক্যসিংহের সুনাম গ্রহণ করিয়াছে, সেই দেশে কিরূপে ওলাবিবি ও সত্যনারায়ণের পূজা আসন অধিকার করিয়াছে—ভারতে তাহার ইতিবৃত্ত নাই। অথচ ভারতীয় আর্য্যজাতির সামাজিক ইতিহাসের উপকরণের অভাব নাই। যত্ন, ধীরতা ও বুদ্ধির সহিত সংগ্রহ করিতে পারিলে, এমন পারিজাত হার গাঁথিতে পারা যায়, যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত লোক পরিতৃপ্ত হইতে পারে। ভারতে প্রাচীন গ্রন্থের অভাব নাই। যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহাদিগকে হিসাবে না ধরিলেও বলা যাইতে পারে, এত অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলী পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই—অন্তত আছে বলিয়া আমরা অদ্যাপি শুনি নাই।

এই রাশি রাশি গ্রন্থ মন্থন করিয়া অমৃতের সঞ্চয় করা সহজ নহে, অস্বীকার করি না। যাহা ব্যক্তিবিশেষের সাধ্য নহে, শতজনে মিলিয়া চেষ্টা করিলে তাহা না হইবে কেন? যাহা এক জনের জীবন কালে সম্পূর্ণ না হইবে, তাহা বংশ পরম্পরায় চেষ্টা করিলে কেন হইবে না? কোথায় মিসর, কোথায় গ্রীশ, আর কোথায় বা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের লোকেরা টাকা সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিত পাঠাইয়া, পাতাল আলোড়ন করিয়া মিসরের প্রাচীন কাহিনী ও হোমরের পূর্ব্বতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহে সমর্থ হইতেছে; আর ভারত আমাদের জন্মভূমি, দেশে পণ্ডিতের অভাব নাই, সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে ভারতের প্রাচীন কাহিনী সংগ্রহ করা যায় না? বিলাতের লোক সভা করিয়া পণ্ডিত পাঠাইয়া বিদেশীয় বনচারী বর্ব্বরদিগের সমাজরহস্য সংগ্রহ করিয়া সমাজতত্ত্ব উদ্ভাবন করিতেছে; আর আমাদের শরীরে যাঁহাদিগের রক্ত, প্রাণে যাঁহাদিগের প্রাণ, তাঁহারা কিরূপ থাকিতেন, কি করিতেন, তখন দেশের ও সমাজের কি অবস্থা ছিল, আমরা তাহা সংগ্রহ করিতে পারিব না?—এ কথা বলিতে মনে আনিতেও লজ্জা বোধ হয়।

বেদ সকল ক্রমে ক্রমে সংগৃহীত হইতেছে, পুরাণ সকল সুপ্রাপ্য, রামায়ণ ও মহাভারত সকলেই পড়িতেছেন, বৌদ্ধ-

পিটক সকল সংস্কৃত ও পালি ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে, প্রাচীন সংহিতা ও আধুনিক স্মৃতি সকল সহজেই সংগ্রহ করা যায়, জৈন-গ্রন্থ অপ্রাপ্য নহে, প্রাচীন শাসন ও মুদ্রা অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে, এখনও কি ভারতের একখানি ইতিবৃত্ত সংগ্রহের সময় হয় নাই? কেবল কোথায় আর একখানি রাজতরঙ্গিনী, রাসমালা, রাজস্থান, বা বিক্রমাঙ্ক-চরিত প্রকাশিত হইবে, সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিব? দর্শন ব্যাকরণ, সাহিত্য অলঙ্কার, যাহা ধর, তাহা হইতেই ঐতিহাসিক সত্য চয়ন করা যাইতে পারে।

বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যদি তাহা অপেক্ষা আর একটু বিস্তৃত ভাবে, নিজ মতের ঘোষণা অপেক্ষা ঐতিহাসিক ঘটনা আর কিছু দিয়া, ইউরোপীয়দিগের দোহাই না দিয়া, আপন বুদ্ধির আর একটু অধিক চালনা করিয়া, কেহ পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ সকলের সার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন,—যদি দশজন কৃতবিদ্য উৎসাহী লোক এই পথে চেষ্টা করেন, তবে সময়ে কেন শুভফল লাভ হইবে না, তাহা বুঝি না।

এই সকল সার সংগ্রহ পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া, আর একটী মহৎ কার্য্য সাধন করা যাইতে পারে। কে কাহার আগে বা পরে, ইহা লইয়া যে ঘোরতর কলহ প্রত্নতত্ত্ববিৎ-সমাজে এখন চলিতেছে, সমাজের ক্রমবিকাশ স্তরে স্তরে অনুসরণ করিতে পারিলে, তাহার শান্তি হইবার সম্ভাবনা। এ পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ নাম দেখিয়া, তাহার তুলনা করিয়া, বা কে কাহার উল্লেখ করিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া, এই সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালিদাস কোথাকার লোক, কোন্ সময়ের লোক, আজি পর্য্যন্ত তাহা মীমাংসা হইল না,—অথচ, শকুন্তলা ও মেঘদূত, রঘু ও কুমার অন্তত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী পাঠ করিয়াছে। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, ইহা শুনিয়া পূর্ব্বতন লোকেরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, —কিন্তু কে শত্রুতা সাধিয়া, প্রমাণ করিল, —বিক্রমাদিত্য এক জন নয়, সাত জন; বিক্রমাদিত্য নাম নয়, উপাধি। অমনি মনের ভিতর ঝড় বহিয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে, কাহাকে কাহার মাথায়, কাহাকে কাহার পায়ে বসাইব, কিছুমাত্র স্থির করিতে পারা যাইতেছে না। এখন এই পথটা এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয় না কি? অষ্টবিংশতিতত্ত্ব অধুনা বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের মতে স্মৃতিশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইয়াছে। মনুসংহিতা একেবারে নির্ব্বাসিত হয় নাই সত্য বটে, কিন্তু ব্যবহারে মনু অপেক্ষা রঘুনন্দনের নাম কিছু অধিক সময় শুনিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গীয় বুধগণ মনু অপেক্ষা আপস্তম্ব, গৌতম, বৌদ্ধয়ণ, বশিষ্ঠ ও বিষ্ণু সংহিতা অধিক প্রাচীন বলিয়া থাকেন। বৃদ্ধ মনুর বৃহৎ মানব-সংহিতা বর্ত্তমান মনুসংহিতা কি না, মনুসংহিতা প্রকৃত পক্ষে ভৃগুসংহিতা কি না, বর্ত্তমান মনুসংহিতা প্রাচীন সংহিতার সার সঙ্কলন কি না, এ সকল বিষয় আমরা এক্ষণ আলোচনা করিব না। উপরে উল্লিখিত অভিপ্রায় মত, আমরা সময়ে সময়ে, নব্যভারতে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রাচীন আর্য্য-সমাজের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে চেষ্টা

করিব। অত্রি, হারীৎ প্রভৃতি সংহিতা সকল হইতে তাৎকালিক সমাজতত্ব সংগৃহীত হইলে, মনু ও তাহার পরে অষ্টবিংশতিতত্বে হস্তক্ষেপ করা যাইবে। তদনন্তর ঐ সকল সার সংগ্রহের তুলনা করিয়া, কে কাহার আগে বা পরে, স্থির করিতে চেষ্টা পাওয়া যাইবে।

যদি অপরে অন্যান্য গ্রন্থ সকলের এইরূপ সার সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করেন, আমরা বাধিত হইব। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য, শ্রীমদানন্দ গিরি ও শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা এবং বঙ্গানুবাদ, শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দ গিরির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সহিত। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত—প্রথম সংখ্যা। সমস্ত গ্রন্থের মূল্য ৩২ শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ২॥০। এই প্রাচীন ধর্ম্মভাব-পূর্ণ গ্রন্থ খানি ভারতের এক অমূল্য রত্ন;—ভক্তি-পিপাসুদিগের একমাত্র আশা-বারি-বিন্দু। এই গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-জীবনের এক অপরূপ পরিচয়। যিনি এই গ্রন্থ একবার পড়িয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মের মোহিনী শক্তিতে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, ধর্ম্মের অনাবিল জ্যোতিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কত পাপাসক্ত, দুষ্কর্ম্ম-রত চিত্ত যে এই গ্রন্থের শীতল-ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া জীবন পাইয়াছে, এই বিস্তৃত ভারতে তাহার গণনা হয় না। এই দুর্দ্দিনে,—এই জড়-পূজা বা অবিশ্বাস-পূজার দিনে, এরূপ প্রকাণ্ড রত্ন-খণ্ডকে যিনি অতি সুলভ মূল্যে সর্ব্ব সাধারণের হস্তে দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তিনি যে সকলেরই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এই গ্রন্থ এত দুষ্প্রাপ্য ছিল যে, বহু কষ্ট, বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও পাওয়া যাইত না। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের জীবন ধন্য হউক, তাঁহার পরিশ্রম সফল হউক।

প্রথম সংখ্যার ছাপা ইত্যাদি সকলই পরিপাটী হইয়াছে। কৈলাস বাবুর অনুগ্রহে, এই দুষ্প্রাপ্য বহু মূল্য গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ অবস্থায় হস্তে পাইলে, ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিতে আমাদের একান্ত বাসনা রহিল।

২। প্রসবতত্ব।—নূতন বিজ্ঞান যন্ত্রে মুদ্রিত—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০। আমরা এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। যদিও প্রসব-তত্ব অতি সংক্ষেপে ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তবুও ইহা পাঠে এই গভীর অত্যাবশ্যকীয় তত্ব সাধারণের কতক হৃদ্‌বোধ হইতে পারিবে। পুস্তক খানির ভাষা সহজ হইয়াছে।

৩। নবকবিতা।—শ্রীমুকুন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, এম, এ, বিরচিত, মূল্য ॥০। বঙ্গের সুশিক্ষিত কৃতবিদ্যগণ জাতীয় ভাষার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন, ইহা দেখিলে কাহার মনে না আশা-আনন্দ সঞ্চারিত হয়? নবকবিতা পাঠে গ্রন্থকারের উৎসাহ ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইলাম। পদ্যাংশে পুস্তকখানি উচ্চ দরের না হইলেও, সুরুচি-

সম্পন্ন নীতিপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া ইহা সকলের নিকট আদর পাইবার যোগ্য।

৪। ভারত-ইতিবৃত্ত-সার।—শ্রীশ্রীনাথ সিকদার, এম, এল, প্রণীত, মূল্য ৮০। এই ইতিহাস খানি সঙ্কলন করিতে শ্রীনাথ বাবু যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যে সকল তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও, মোটের উপর মন্দ হয় নাই, কিন্তু গ্রন্থকার আপন অভিজ্ঞতার বলে যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তেমন বিজ্ঞতা, তেমন উদারতা, তেমন বহুদর্শিতা লক্ষিত হইল না। বাঙ্গলার সাহিত্যের উন্নতির কথা যে স্থানে লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া মনে হইল। ইতিহাস লেখকের এ ত্রুটী কখনই মার্জ্জনীয় নহে। হিন্দুরাজত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাপেক্ষা হণ্টার সাহেব, তাঁহার Brief History of the Indian people নামক পুস্তকে, অনেক সার কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষের কাহিনী আজ কাল ইংরাজের হস্তেই যেন উৎকর্ষ লাভ করিতেছে,—ভারতবর্ষবাসীগণ এসম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন। গ্রন্থকার এই ইতিহাস-সঙ্কলনে যে সমস্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের তালিকায় হণ্টর সাহেবের পুস্তকের নাম না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। এই পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিলে ভাল হইত। যাহা হউক, গ্রন্থকার পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রচলিত ইতিহাস গুলি অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই। পুস্তকের ভাষা বেশ হইয়াছে, ছাপা পরিষ্কার হইয়াছে, এবং পুস্তকের মূল্য অতি অল্প হইয়াছে। স্কুলের ছাত্রগণের জন্য এই সংক্ষিপ্ত পুস্তক লিখিত হইয়াছে এবং আমাদের বিবেচনায় এসম্বন্ধে গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই পুস্তক খানি স্কুলে প্রচলিত হইলে আমরা সুখী হইব।

৫। সৎসঙ্গ।—মাসিক পত্রিকা, শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বেলডাঙ্গা হইতে প্রকাশিত। আমরা এপর্য্যন্ত অনেক গুলি সংখ্যা পাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ থাকে। সৎসঙ্গে প্রকাশিত অধিকাংশ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধই শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত। বঙ্গমহিলাদিগের পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে। সৎসঙ্গের দীর্ঘ জীবন আমরা প্রার্থনা করি।

৬। দৈনিক।—বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা ক্রমে তিন চারি সংখ্যা দৈনিক প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গ প্রদেশে সুলভ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশের পথ পরিষ্কার করিয়া বঙ্গবাসী-সম্পাদক সর্ব্ব সাধারণের আদরের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় আবার দৈনিক সুলভ পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। বঙ্গ ভাষার ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরঅঙ্কিত থাকিবে। দৈনিকে যদিও নূতন সংবাদ বড় থাকিতেছে না, তবুও লেখা বেশ হইতেছে। ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত কুৎসা প্রচারে মন না দিয়া, যদি দৈনিক নিরপেক্ষ ভাবে, এরূপ দক্ষতার সহিত আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তবে তাঁহার দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

অন্যান্য পুস্তক ক্রমে সমালোচিত হইবে।

দুই খানি পত্র।

(১ম)

ভাই,—আমি জাতি বৈদ্য, তুমি বিবর্ত্ত-বাদী। বংশানুক্রমে শীলধর্ম্মে ব্যাধি পরীক্ষার ক্ষমতা অনেকের অপেক্ষা আমার অধিক আছে, তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য। অনেক দিনের পর সে দিন তোমাকে দেখিলাম, তুমি সহসা বড় পরিবর্ত্তিত হইয়াছ; আমার অনুমান হইল, তোমার কোন ব্যাধি জন্মিয়াছে।

"পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ধূমাৎ",—ধূম দেখিয়া পর্ব্বতের জঠর-নিহিত অনলের অনুমান করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বল অধিক, আমি বলি যে, অনুমানই উৎকৃষ্টতম এবং এক মাত্র প্রমাণ।

সে যাহা হউক, তোমার বড় পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তোমার চপলতার হ্রাস হইয়াছে। এত দিন শূন্য-কুম্ভের ন্যায় তুমি জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছিলে, আপাত হিল্লোল মাত্রে তোমাকে দিক্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত করিতেছিল। তোমার ভাবের প্রবণতা, সরলতা, তোমার উৎসাহ, তোমার আনন্দ, তোমার শোক, তোমার দুঃখ, তোমার শোকের তীব্রতা, তোমার উল্লাসের প্রখরতা আমাদিগকে চমকিত করিত, কিন্তু মোহিত করে নাই। মোহকারী বিষাদ —বিষাদ প্রাণভরা, আর কাহাকে স্থান দেয় না। বিষাদ টলে না, উঠে না, স্থির নিবাত নিষ্কম্প। বিদ্যুৎগতিতে হৃদয়কে আকর্ষণ করে। বিষাদ দুঃখ নহে, দুঃখে মুগ্ধ করে না, বিষাদ আনন্দ নহে, আনন্দ অশ্রু-ভঙ্গুর, বিষাদে সুখের হাসি লতার ন্যায় জড়িত! তোমাকে আর কখন বিষন্ন, দেখি নাই। প্রাণভরা বিষাদে তোমার উজ্জ্বল চক্ষে স্থির-দৃষ্টি, উৎফুল্লবক্ষে দৃঢ়তা, ললাটে শান্তি, হৃদয়ে গভীরতা যোগাইয়াছে। তুমি কি রত্ন পাইয়াছ, তোমার হৃদয়-কলস পূর্ণ হইয়া জলের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। আর যেন ভাসিতে ইচ্ছা নাই, আর যেন বাহিরে থাকিতে চাহ না; আর যেন দেখা দিতে চাহ না, দেখিতে চাও; শুনাইতে চাহ না, শুনিতে চাও; বলিতে চাহ না, বলাইতে চাও। যে জনকোলাহলের জন্য তুমি লালায়িত হইতে, সে কোলাহল এখন উপেক্ষা কর; যে সমাগমের আয়োজন উদ্ভাবনে বড় ব্যস্ত হইতে, সে সমাগম তোমাবিহনে শূন্য; হয়ত নিভৃতকুট্টিমে পুস্তকে চক্ষু, হৃদয় আবেশে মুগ্ধ, নয়ত নীল বিশাল আকাশে যোজিত দৃষ্টি অন্য-মনা। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র, চন্দ্র অপেক্ষা কাদম্বিনী, দিবা অপেক্ষা সন্ধ্যা, সন্ধ্যা অপেক্ষা নিশা তোমার ভাল লাগে। আগে যেখানে চাহিতে এখন সেখানে দেখিতেছ, আগে যেখানে ভাসিতে এখন সেখানে ডুবিতেছ, আগে যেখানে ছুটিতে এখন সেখানে শুইতে চাও।

কি হলো অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা।
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নে তারা।

তাই তুমি কবি হইয়াছ, জগৎ অপূর্ব্ব-

সৌন্দর্য্যে তোমার নিকট এখন সুশোভিত। বৈশাখী পূর্ণিমা কতবার গিয়াছে, কোকিল-ঝঙ্কার কতবার শুনিয়াছ, দধিয়ালের সুকণ্ঠ-সঙ্গীত, কুসুমের কোমলকান্তি, সৌদামিনীর তড়িতগতি কতবার দেখিয়াছ, কিন্তু এত সুন্দর, এত মোহন, এত প্রাণভরা আর কখন দেখ নাই। কল্পনা স্নেহ প্রীতি পূর্ব্বে বিস্তৃত ছিল, এখন বিশাল হইয়াছে। বুকের ভিতর জগতটা টানিয়া লইতে পার, সকলকেই বুকে তুলিয়া বুকটা শীতল করিতে চাও। তুমি প্রেম, শান্তি, পবিত্রতার এতদিনে আস্বাদ পাইয়াছ, অমর হইতে চলিয়াছ, বুঝিলাম। আগে যাহাকে ঘৃণা করিতে, এখন তাহাকে দয়া কর, আগে যাহাকে শত্রু বলিতে, এখন তাহাকে প্রীতি কর; আগে যাহাকে শিষ্য বলিতে, এখন তাহাকে গুরু বল; আগে যাহাকে উপদেশ দিতে, এখন তাহার উপদেশ লও। তোমার শিক্ষার অহঙ্কার ভাঙ্গে নাই, প্রেমে কোমল হইয়াছে। আগে চমকিত করিতে এখন চমকিত হও; আগে উন্মত্ত করিতে এখন বিহ্বল; আগে নাচাইতে এখন আবেশে মুদিত; আগে আপনার ছবি জগতের ললাটে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতে, এখন অন্যের ছবি হৃদয়ে এমনি সাবধানে ধরিয়াছ যেন না টলে। তুমি যুবা ছিলে বালক হইয়াছ, যৌবনের উদ্দামতা কমিয়া বালকের কোমলতা পাইয়াছ; যৌবনের তেজস্বিতা গিয়া বালকের লালাম্বিততা আসিয়াছে। ভাই, তুমি কি অমূল্য-রত্ন পাইয়াছ, বুকের ভিতর লুকাইয়া আপনি একা দেখিবে, সদা সতর্ক, যেন আর কেহ না দেখে; নকের উপর কিসের দাগ পড়িয়াছে লুকাইতে চাও, যেন অপবিত্র চক্ষু তাহার উপর না পড়ে। যেন পাপীর নিশ্বাসে তাহা কলঙ্কিত না হয়। ভাই, তুমি এখন অন্যমনা। আগে শ্রুতিধর ছিলে, এখন দশবার ডাকিয়া উত্তর মিলে না; আগে সকল কথাই আপনি বলিতে, এখন একটা কথা ফুরাইতে পারিলে সুখী হও। অন্যে কথা কহিতে লাগিলে যেন আনন্দে অবসর লও। হৃদয়ের ভিতর দেবতা, তাই চক্ষু মুদিত; বাহিরে দেবতা তাই চক্ষু উন্মিলিত; সর্ব্বব্যাপী দেবতা তাই স্থিরদৃষ্টি অসীম—দিবানিশি ধ্যানমুগ্ধ। সেই বীজমন্ত্র গোপনে দিবানিশি জপ কর, তুমি সেই শক্তি প্রভাবিত, সেই প্রকৃতি পরিণত, সেই পরিবৃত্তি পরিবর্ত্তিত—তুমি তন্ময়।

নাচিলে মানুখ নিমিখ নাই,
কাঠের পুতলি রহিছে চাই।

তাহার কথা বলিতে চাও না, ভাবিতে চাও, শুনিতে চাও। তাহার মত কে তাহা বল, সে কে তাহা বল না; নিজে সে নামটী মুখে তুলিতে পুলকিত হও।

অন্যে তাহার নাম করিলে তুমি কম্পিত হও,—সে কম্পন হিংসা জনিত নহে, ভয় জনিত—তুমি গোপনে গোপনে তাহার নামটী যখন জপ কর, তখন সে নামটী আমি আড়ি পাতিয়া শুনিয়াছি। পাছে আমার ওষ্ঠস্পর্শে—তোমার সেটী কলঙ্কিত হয়, আমি সে নামটী মুখে তুলিতে সাহস করিলাম না। কিন্তু ভাই, তিনি তোমার কে?

তোমার ভাবের স্থিরতা নাই। আবর্ত্ত-তাড়িত সরসীহিল্লোলের ন্যায় বিভিন্ন মুহূর্ত্তে তুমি বিভিন্নমূর্ত্তী। বিরল হৃদয়ের প্রান্ত প্রদেশ কখন প্রদোষ আঁধারে কনক-

রঞ্জিত, কখন চন্দ্রিকার ছায়াময় কিরণে স্বপ্নাচ্ছন্ন। জীবন্ত অনলগিরি কখন সুপ্ত, কখন উচ্ছসিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ পর্ব্বতের রোষ-কশায়িত শৃঙ্খল মাত্র আতঙ্ক জনক। তোমার কোন বায়ুরোগ হইয়াছে। ভয় নাই তুমি ভীত, ত্রাস নাই তুমি ত্রস্ত, উল্লাস নাই তুমি হসিত, শীতে তুমি উত্তাপিত, গ্রীষ্মে তুমি কম্পিত, "পীনতমু ক্ষীণ ভেল, হার ভেল ভার, ফুল ভেল শূলসম উলট ব্যবহার।" রোগ ভিন্ন ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাসের অত বায়ু আর কে যোগাইতে পারে?

তোমার অন্যমনস্কতা ভাঙ্গাইতে কত চেষ্টা করিলাম, ভাঙ্গাইতে পারিলাম না। যাহাদিগের সংসর্গে কত আনন্দ পাইতে, তাহারা আসিল, কিন্তু তোমার আবেশ ভাঙ্গিল না। তুমি যে শাস্ত্রালোচনায় প্রভূত আনন্দ ভোগ করিতে, সে শাস্ত্র-কথা পাড়িলাম, তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলাম না। অপরে বুঝিল না, প্রাচীন চতুরতায় তাহাদিগকে প্রতারিত করিলে, কিন্তু ভাই, আমাকে ঠকাইতে পার নাই, বলিয়াছিত আমি জাতি বৈদ্য, লক্ষণ-তত্ত্বে সুপণ্ডিত। দুই একবার তুমি আবেশ ভাঙ্গিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য জাগিতে চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু পারিলে না—তুমি দুর্ব্বল মন্ত্রমুগ্ধ, নিদ্রিত, স্বপ্ন প্রয়াণের ন্যায় তোমার চেষ্টা বিফল—"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়?"

সামান্য ধনে যাহারা ধনী তাহারা ধনের বড়াই করে। তোমার লব্ধধন কোহিনুর গর্ব্বের উচ্চতার উচ্চে, তুমি ফলভরে অবনত, ভিখারী বেশে ভিখারীর দলে মিশিতে চাও। একি অপূর্ব্বভাব! যাহাদের মানসচিত্র অস্ফুট, মুছিয়া যাইবার ভয় থাকে, তাহারা প্রতিকৃতি সঙ্কম করিয়া রাখে, মুমূর্ষু অবস্থায় বিষবড়ি প্রয়োগ করিবে। যাহারা ভাবে ভোর, তাহারা সুরাপান তুচ্ছ করে। ভাই তুমি মাতাল, নেশায় ডুবিয়াছ, মানস চিত্রের উজ্জ্বলতায় বাহ্যিক সাহায্য উপেক্ষা করিতে পারিয়াছ, স্বাবলম্বী হইয়াছ, আপনাতে আপনি পূর্ণ অথচ বিনীত। তোমার এ দেবভাব আর কখন দেখি নাই। তুমি তপস্বী হইয়াছ, সদাই ধ্যান নিমীলিত নেত্র,—কিন্তু সন্ন্যাসী নহ। স্বতন্ত্র নির্জ্জনপ্রিয় কিন্তু বনবাসী নহ। তোমার সে বৈরাগ্যভাব কোথায় গেল? এখন আপনার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। আগে আমাদের ভাল বাসিতে, এখন আপনাকে ভাল বাস। আগে আমরাই তোমার সর্ব্বস্ব ছিলাম, এখন তুমি তোমার সর্ব্বস্ব হইয়াছ। তুমি নূতন যোগী, তোমার যোগে আত্মপীড়ন, সন্ন্যাস, বৈরাগ নাই, অথচ বিলাস বিজয় উল্লাস নাই। তুমি যোগী রামানন্দ, চৈতন্যের গুরু; বিলাসী সন্ন্যাসী, গৃহস্থ বৈরাগী, আত্মপ্রিয় যোগী। এ কর্ম্মযোগ নহে, জ্ঞান যোগ নহে, আমার নিদানে ইহার সংজ্ঞা প্রেমযোগ। অনুমানটী কি ঠিক হইয়াছে ভাই?

তোমার

* * *

(২য়)

ভাই, আমি দেব পূজায় মত্ত, আমি রাজ যোগে যোগী! ঈশ্বর প্রেমময়, ঈশ্বরের জগত্ প্রেমময়! সকলেই সকলকে চাহে, কেহ কাহাকে প্রত্যাখ্যান করে না। প্রত্যাখ্যান প্রেমের বিরহ, প্রেম বৈচিত্র্য মাত্র, প্রেমের রূপান্তর। প্রেমের রূপান্তর বলু

বলের রূপান্তর তেজ, তেজের রূপান্তর জ্যোতি, জ্যোতির রূপান্তর তড়িত, তড়িতের রূপান্তর প্রাণ। মাধ্যাকর্ষণ বল, যোগাকর্ষণ বল, কৈন্দ্রিক আকর্ষণ বল, সকলই প্রেমের আকর্ষণ, প্রেমের রূপান্তর। "যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে।" প্রেমে জগত্ সৃষ্ট বলিলে ভাব ফুরায় না, প্রেমে জগত্ প্রাণিত বলিলেও তৃপ্তি হয় না, প্রেমই জগত্। পশু, পক্ষী, লতা, পাতা, চাঁদের আলো, মেঘের ছটা, পাখীর গান, ফুলের বাস, শিশুর হাসি, নদীর খেলা, মেঘে সৌদামিনী কেন জড়িত? পর্ব্বতে কুয়াসা কেন শায়িত, হরিণী কেন বায়ুর সঙ্গে ছুটে? চকোর কেন বুক ভাসায়ে গগন-সাগরে সাঁতার খেলে, কাহে সে ভঁওরা ফুলে ফুলে বুলে?—এসব প্রেমের খেলা। গা বেসিয়া বায়ুটী যেই বহিল, অমনি তালে তালে পাতা গুলি নেচে উঠিল; কুসুমের সৌরভটী যেই ছুটিল, অমনি গুণ গুণ গুন, নেবরাজ চাঁদপানা মুখখানা যেই দুই হাতে চাপিয়া ধরেন, অমনি ষড়জস্বরে পাখী "নৌবত বাজে"। ঊষার আভাব না পাইলে কি দধিয়ালের সুকণ্ঠে টৌরিস্বর বাহির হয়? ঈশ্বর প্রেমময় নহেন, ঈশ্বরই প্রেম, ঈশ্বরই রস, বিশ্বময় রসময়।

ভাই, প্রেমিক বিনা কেহ কি কাঁদিতে পারে? যে না কাঁদিয়াছে, সে প্রেম চিনে না। যার প্রেম যত অধিক সে তত কাঁদে, যে না কাঁদে সে পাষাণ না। পাষাণেরও প্রেম আছে, হৃদয় আছে, নহিলে সেহালা এত সোহাগ করিবে কেন? নহিলে সে সোণাপানা রঙ্গটী দেখিলে বুকটী পাতিয়া লইবে কেন, বা লইবে তা যতনে পোষিবে কেন? বলিয়াছি, প্রেমময় মিদং জগৎ—যাহা আছে, যাহা ছিল, যাহা হইবে, যাহা বস্তু, যাহা বিদ্যা সকলই প্রেমময়, তাই প্রেমের কবি গাহিয়াছেন,—"নাসতো বিদ্যতে ভাব, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ—"। শিশু জন্মিয়াই কাঁদে, নির্ঝর জন্মিবামাত্র ঝির ঝির করে, সেই যতদিন তাহার প্রেমের পথ খুলে। তার পর যত বয়োবৃদ্ধি তত প্রেম বৃদ্ধি, শেষে সাগর সঙ্গমে মহাপ্রস্থান, দানসাগর। সরিৎ, সরসী, তড়াগ, নদী, কন্যা, স্ত্রী, ভগিনী বা জননী একই মহাসাগরের রূপান্তর। অল্প হইতে অধিক, মাত্রার ইতর বিশেষ, প্রেমোদধির সোপান পরম্পরা, সেই উদধি বিশাল, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ, বিশ্বময়। দর্শন বিজ্ঞান সেখানে পরাস্ত, প্রেম-শাস্ত্র যেখানে মুক্তপক্ষ; দ্বৈতবাদ অশাস্ত্র, অদ্বৈতবাদ একমেবাদ্বিতীয়ং একমাত্র সত্য। বিশ্ব নাই, জগত্ নাই, তুমি নাই, আমি নাই, সৎ নাই, অসৎ নাই, বস্তু নাই, ছায়া নাই, মায়া নাই, মোহ নাই, বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই—সকলই প্রেম স্বরূপ, রস স্বরূপ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু" "সোহহং" একমাত্র, অক্ষয়, অব্যয়, অনাবিল সত্য, দেহ অঙ্গ নাই, হস্ত পদ নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই, বৃক্ষ লতা নাই, সকলই দেহ, সকলই সেইএক। স্ত্রী পুত্র নাই, ভ্রাতা ভগিনী নাই, মাতাপিতা নাই, আত্মীয় পর নাই, আমার তোমার নাই—সকলই সেই এক, লিঙ্গ শূন্য, বর্ণ শূন্য, বিকার শূন্য 'তৎ'। তুমি আমি সকলই তাহার, পুত্র কন্যা সকলই তাহার, আমার যাহা কিছু সকলই তাহার। তৎসৎ, আর সব মিথ্যা। যাহা সৎ তাহাই তৎ, যাহা তৎ নয় তাহা নয়, নাই, হইবে না। ভাবশূন্য অসৎ। যাহা

তৎ তাহাই ভাবময়। বিদ্যা রূপবতী, রূপবতী রসস্বরূপা প্রকৃতি প্রেমময়ী। প্রেম আদি, প্রেম অন্ত, এক প্রেমই সৎ; অসজ্জনেরাই অপ্রেমিক।

বিবর্ত্তবাদের মূলসত্য প্রেম। উত্তরাধিকার বল, আপেক্ষিক বিকার বল, প্রেমের রূপান্তর। শরতের নিষ্কলঙ্ক জোছনা, কুসুমের কোমল কান্তি, কাদম্বিনীর গাম্ভীর্য্য, সৌদামিনীর প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করে, প্রেম বশাৎ; পিতার প্রখরবুদ্ধি, পিতামহের তেজস্বীতা আমি লাভ করিয়াছি, প্রেম বশাৎ। প্রাচীন বিবর্ত্তবাদীগণ পার্থিব প্রকৃতির বৈসাদৃশ্যে চমকিত হইয়া বিবর্ত্তবাদ উদ্ভাবন করেন। আধুনিক বিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির সাদৃশ্য-মোহিত। আজন্ম প্রত্যেক জীবাণু শত কোটী বিভিন্ন কারণ প্রভাবিত, প্রত্যেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত, তথাপি জগতে এত সাদৃশ্য-কেন? পাতায় পাতায়,লতায় লতায়,চোখে চোখে, হাতে হাতে, মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, এত সাদৃশ্য কোথা হইতে? পূর্ব্বপণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিতেন, একই কারণে একবিধ পদার্থ ভিন্ন পথে চলে কেন, এখনকার পণ্ডিতগণ বুঝাইতেছেন, ভিন্ন কারণে ভিন্ন বিধ পদার্থ একই পথে চলে কেন। ব্যাখ্যা উভয়ের একই—Tendency—! তুমি আমি ভিন্ন গৃহে ভিন্ন ভাবে পরিপোষিত, অধিকার ভিন্ন,শিক্ষা ভিন্ন, সংসর্গ ভিন্ন,অথচ দুইজনের সাদৃশ্য এত অধিক, পাক এমনি পড়িয়াছে যে পাশাপাশি হইবা মাত্র দুই জনে জড়াইয়া গেলাম, একে বারে প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে জড়াইয়া গেল। এমনটা কি প্রকারে হইল বল দেখি?

বিবর্ত্তবাদের প্রধান আচার্য্য ডারবিন এই (Tendency) বা প্রবণতা দ্বারা চেতন অচেতনের প্রভেদ করিয়াছেন; এই প্রবণতা জীবোৎপত্তির কারণ, কীটাণু হইতে নীচতর যে বিম্বাণু,তাও এই প্রবণতা প্রভাবিত। সেই প্রবণতা কালক্রমে পুরুষের তেজ, সতীর প্রেম, বালকের হাসিতে পরিণত হইয়াছে। সে প্রবণতার উৎস কোথায়? অন্ধতম কুটীরের গভীরতম প্রদেশে অগ্রসর হইয়া ডারবিন পুরোভাগে পাদক্ষেপ করিতে আর সাহস করেন নাই। এই স্থান হইতে তিনি পরাঙ্মুখ। কাব্য এখানে অগ্রসর হয়, এই Tendency সেই বিশ্বপ্রেমের অংশ। প্রেম (Tendency) হইয়া জীবন কোষ অনুপ্রাণিত করে, ক্রমে বিকাশের পর বিকাশ; আবার, বিকাশ, বিশ্ব বিশাল সহৃদয়তায় পরিণত হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য সকল শাস্ত্রের কুটিলরহস্য প্রেমমন্ত্রে সরল সহজ, স্মিতানন। এমন সোণার চাবি পিটর পান নাই, এই চাবিতে ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সকলই উদ্‌ঘাটিত হয়। ইহাই সেই সঞ্জীবনী সুধা। নদীর বাঁধ কাটিয়া দাও, সে ছুটিয়া সাগরে পৌছিবে; হরিণীর শৃঙ্খল ভগ্ন কর,সে বায়ুচারিত বনভূমে পলায়ন করিবে; পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া দাও, সারিকা গগন মুখে ধাবমান হইবে; শিশুর গতি মায়ের ক্রোড়ে, মরালের গতি মানসহ্রদে,পৃথিবীর গতি সূর্য্য পার্শ্বে, বিশ্বের গতি প্রেমের অনন্ত মণ্ডলে। কেবল মায়ায় চক্ষু অন্ধ করিয়া মনুষ্যকে জড়পথে পাতিত করে। মোহ আবরণ খুলিয়া লও, “রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ”, কৃত্রিমতা, অস্বাভাবিকতা, সামাজিকতা, কাপুরুষতা, প্রতারণা, মৌখিকতা কর্ম্মনাশার জলে ডুবাইয়া দাও, জগত্ সুস্থ হইবে, প্রকৃতিস্থ

হইবে, রসাল হইবে, পবিত্র শুদ্ধ সুধাময় প্রেমে সকল প্রফুল্ল হইবে। সেই প্রফুল্লতার নাম যৌবন। বিশ্ব চিরযৌবন লাভ করিবে। তখন চাঁদের আলোকে আর এক ছটা, ছায়াপথে আর এক শোভা, নীলাকাশে আর এক রূপ, পাখীর কণ্ঠে আর এক স্বর, ফুলের সৌরভে আর এক গন্ধ, নদীর কল কলে আর এক শব্দ, মায়ের স্নেহে আর এক রস, প্রণয়ে নূতন মধু, হৃদয়ে নূতন বল, দেহে নূতন কান্তি, চক্ষে নূতন জ্যোতি দেখা দিবে; বিশ্ব নবরূপ ধারণ করিবে; কল্পনা তার অন্ত পায় না, কবিগণ তাহাকেই স্বর্গ বলিয়া চিত্র করেন।

সেই পৃথিবী স্বর্গ, সেই স্বর্গ দেবতা, সেই দেবতা ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর প্রেম, তখন অদ্বৈতবাদ বুঝিতে আর বাধা থাকে না। মনুষ্য কর্ম্মফলে অচিন্ত্য চিন্তা করিতে পারে না, অব্যক্ত অনুভব করিতে পারে না, ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় অগ্রাহ্য বলিতে বাধ্য হয়। মহাসাগরের বিশালতা তাহাকে স্তম্ভিত করে, তুঙ্গ তরঙ্গের চঞ্চলতা তাহাকে ত্রাসিত করে। স্বাভাবিকতা তাহার নিকট কৃত্রিম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দুর্ব্বল মনুষ্যের এই হীনতা অতি শোচনীয়। অথচ তাহারা তাহাতেই গৌরব করে। গোলামের জাতি গোলামি করিতে গর্ব্ব করে। শৃঙ্খলকে অলঙ্কার বলে। সে সুধা বলিয়া বিষ পান করে, স্বর্গ বলিয়া নরক খোদন করে, নরককে গৃহ বলে, দাসীকে স্ত্রী বলে, মৃত্যুকে পুত্র বলে, কীটকে কুসুম বলে, কুসুমকে পদতলে দলন করে। বিকৃত রাক্ষস যাহাকে সুস্থ দেখে তাহাকে সমাজ চ্যুত করে; স্বভাব তাহার ঘৃণিত; সে মড়ার গলায় বর মালা দিল, শত্রুকে মিত্র বলে, মিত্রকে দ্রোহী বলিয়া নির্ব্বাসিত করে। হায় আর একজন প্রমিথিউস্ কবে পৃথিবীতে উদয় হইবে।

ভাই, মনুষ্য আদর্শ চাহে। বিশ্বপ্রেম আয়ত্ত করিতে আদর্শের আবশ্যক। সকল কার্য্যে সাধনা চাই। বিশ্বপ্রেমের আদর্শে আমি দেবী প্রতিমা স্থাপন করিয়াছি। সে প্রতিমা কবিশ্রেষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠদিগের অনুমোদিত। সেই আদর্শ আমার চপলতা হরণ করিয়াছে, বাচালতা শাসন করিয়াছে, ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছে, স্বর্গের আভাস দিয়াছে, প্রেমের আস্বাদ দিয়াছে, অমৃতের অধিকারী করিয়াছে। ভাই, তুমি সত্যই বলিয়াছ, আমি অমর হইতে চলিয়াছি। যে প্রেম চিনে না সে স্বর্গের অধিকারী নহে। দিল্লীতে যোগমায়ার মন্দির দেখিয়াছিলাম, প্রতিদিন নবকুসুমে মায়ের প্রতিমা গঠিত হয়। আমার প্রতিমা কল্পনাগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়ের অতীত। কুসুমের সৌরভ, চাঁদের আলো, মেঘের গম্ভীরতর উপাদানে গঠিত। ঈশ্বরের অবতার, প্রেমের মূর্ত্তী, সুখের উৎস, বিষাদের আকার জগতের অভূতপূর্ব্ব প্রাণতা। তিনি আমার কেহ নহেন, আমি তাঁহার, তিনি জগতের। যে সাধনা করিবে, সেই তাঁহাকে পাইবে। যোগের পরিণাম, ধ্যানের চিন্তা, ছায়ার স্বপ্ন, উপাসনার ভক্তি, তাঁহারই আমি আর কাহারই নহি, আমি নিজেরও নহি, আমি তাঁহারই। আশীর্ব্বাদ কর, আমার সাধনা সিদ্ধ হয়, আমি প্রেমের অধিকারী হই।

প্রেম বড় না জ্ঞান বড়? এতদিন যৌবনের উদ্দামে, জ্ঞানের নবীনতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বুদ্ধির প্রখরতা, জ্ঞানের চপলতা, জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া বিবেচনা

করিতাম। মস্তিষ্কের চটুলতা উপেক্ষা করিলাম, যে দিন হৃদয়ের গভীরতা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; সেই দিন বুঝিয়াছি, জগতের যাবতীয় বিজ্ঞানবিতের জ্ঞানসমষ্টি প্রেমকণার তুল্য মূল্য নহে। এক জন হৃদয়বান লক্ষজন বুদ্ধিমানের সমকক্ষ। শয়তানের বুদ্ধি কোটী স্পেনসর, ডারবিন, বেন্থাম ও কোমতের অনধিগম্য, সে শয়তান নরকের কীট, মিফিষ্টফিলিস্ কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে, ফষ্ট তাহার শিখরে। তাই জ্ঞানযোগ ছাড়িয়া প্রেমযোগ সর্ব্বস্ব করিয়াছি। বুদ্ধির ভেলা ছাড়িয়া দিয়া প্রেমের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন কুল পাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

পৌত্তলিক কে?

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥
যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় ভজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহংহিসর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতুমামভি জানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তিতে॥

এক দিন গভীর রাত্রিকালে একজন চোর কোন এক গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে দেখিতে পাইল, মাচার উপরে ধান আছে। আপনার গায়ের চাদর মাটীতে পাতিয়া মাচায় উঠিয়া তাহার উপরে ধান ঢালিতে লাগিল। ধানের শব্দে গৃহস্থের ঘুম ভাঙ্গিল। গৃহস্থ আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই চাদর খানা লুকাইয়া ফেলিল। ধান ঢালা শেষ হইলে পর, চোর নামিয়া ধান বাঁধিবে বলিয়া চাদরের কোণ তল্লাস করিতে লাগিল; এমন সময় গৃহস্থ তাহাকে ধরিল। দুজনে অনেক কুস্তাকুস্তির পর চোর তাহার হাত ছাড়াইয়া বাহিরে আসিল। গৃহস্থ "চোর, চোর," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চোর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই চোর, না আমি চোর? তুই আমার চাদর চুরি করিলি, উলটো চোর হইলাম কি আমি?" পাড়ার লোক জড় হইল। এ বলে ওকে চোর, ও বলে একে চোর। সেই চোর যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুই চোর না আমি চোর," আজ আমরাও, পৌত্তলিকের পক্ষ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি পৌত্তলিক না আমরা পৌত্তলিক? আজ এ প্রশ্নেরই মীমাংসায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

বল দেখি পৌত্তলিক কে? (১) যে জ্ঞাতসারে কোন মূর্ত্তি অথবা অন্য চিহ্নকে ঈশ্বর মনে করিয়া পূজা করে। এই অর্থে, যে ঈশ্বরকে না জানিয়াছে, সে পৌত্তলিক হইতে পারে না; কারণ যে শ্যামকে না জানে, সে রামকে শ্যাম মনে করিতে পারে না। তবে বলিতে পার, সাধারণ ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান মানুষ মাত্রেরই আছে। এবং যাহার যে পরিমাণে প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান লাভ

হইয়াছে, সেই পরিমাণেই সে অন্য বস্তু দেখিয়া ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম করিতে পারে। এ কথা সত্য হইত, যদি প্রকৃত ঈশ্বরের সহিত তাহার চিহ্নের কোন সাদৃশ্য থাকিত। নুন্ দেখিতে চিনির মতন বলিয়াই বালক কখনও চিনি ভাবিয়া নুন্ মুখে দেয়। যে পরিমাণে তুমি শ্যামকে জান, সেই পরিমাণেই শ্যামের মত অপর এক ব্যক্তিকে তুমি শ্যাম বলিয়া ভ্রম করিতে পার। যাহার যে পরিমাণে ঈশ্বর জ্ঞান লাভ হয় নাই, সেই পরিমাণেই সে অন্য বস্তুকে ঈশ্বর মনে করিতে পারে না; 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করিতে পারে. কিন্তু তাহার 'ঈশ্বর' পদবাচ্য বস্তু সেই পরিমাণেই প্রকৃত ঈশ্বর নয়। তুমি যাহাকে ইচ্ছা শ্যাম বলিয়া ডাকিতে পার, তাহা বলিয়া যে সেই আমাদের প্রকৃত শ্যাম হইবে না। তাহার 'ঈশ্বর' মনে করা যেমন প্রকৃত ঈশ্বর মনে করা হইল না, তাহার ঈশ্বর পূজাও পান ভোজনাদির ন্যায় ক্রিয়াবিশেষ মাত্র হইল। এস্থলে ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব অথবা সঙ্কীর্ণতাই তাহার দোষ। তাহাই যদি পৌত্তলিকতা হয়, তবে অনাস্তিক মাত্রেই মহা পৌত্তলিক। যাহা হউক, এস্থলে নূতন সংজ্ঞার বিচার না করিয়া, তাহা পরে করাই কর্ত্তব্য।

যে প্রকৃত ঈশ্বরকে জানে, অথবা যে পরিমাণে জানে তাহার পক্ষে আবার চিহ্নকে ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম করা অসম্ভব, অথবা সেই পরিমাণে অসম্ভব। ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার চিহ্নের কি সাদৃশ্য যে এককে অন্য বলিয়া ভ্রম করিবে? চিহ্ন জড়, পূজা গ্রহণ চেতনের কার্য্য, মূর্ত্তির গুণ—স্থূলতা, ব্যাপ্তি, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। যে কেহ সরল ভাবে দুর্গামূর্ত্তির পূজা করে, তাহার মনের ধারণা থাকে না যে, সেই পূজার পাত্র দুর্গার বেড় এক হাত, লম্বা তিন হাত, মাটিতে নির্ম্মিত। সে যে দুর্গার প্রতি ভক্তি অর্পণ করে, সে দুর্গা তাহার ভক্তি গ্রহণে সমর্থ জানিয়াই অর্পণ করে। অতএব সে দুর্গা জীবন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্। সেই মুর্ত্তিতে এবং সেই ভক্তির পাত্রেতে কোন সাদৃশ্য নাই; শুক্তি দেখিয়া লোকে যেমন তাহাতে রজত বলিয়া ভ্রম করে, মূর্ত্তি দেখিয়া লোকের তাহাতে ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম করিবার সেরূপ কোন কারণ নাই।

অথবা তর্কস্থলে যদি মানা যায়, মূর্ত্তির সহিত ঈশ্বরের সাদৃশ্য আছে, তাহাতেই বা কি হইবে? যদি সেই পূজা গ্রহণে অসমর্থ দুর্গা মূর্ত্তিকে পূজা গ্রহণে সমর্থ দুর্গা বলিয়া ধারণা করিতে হয়, তবে জড়কে অজড়, দেশকাল পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে সর্ব্বব্যাপী, নিশ্চেষ্টকে সর্ব্বশক্তিমান ভাবিতে হয়। কিন্তু একই সময়ে একই বস্তুকে জড়, পূজা গ্রহণে অসমর্থ জানিয়া, আবার তাহাকে অজড়, পূজা গ্রহণে সমর্থ বলিয়া ধারণ করা যায় না। অর্থাৎ মূর্ত্তি মনে করিলে ঈশ্বর মনে করা যায় না, ঈশ্বর মনে করিলে মূর্ত্তি মনে করা যায় না। যদি বল প্রথমে মূর্ত্তি জ্ঞান হইয়া পরে ঈশ্বর জ্ঞান হয়, তবে শ্যামের ছবি দেখিয়া শ্যামকে স্মরণ করার ন্যায়, অথবা বস্ত্রে গ্রন্থি দর্শনে কোন বিশেষ বিষয় স্মরণ হওয়ার ন্যায় তাহাতে দোষ হয় না। দুই জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক। চিহ্নকে ঈশ্বর মনে করা হইল না, চিহ্নের চিহ্নত্ব ভুলিয়াই ঈশ্বর জ্ঞান হইল। চিহ্ন বীজগণিতের অর্থ শূন্য ক, খ, গ এর ন্যায় সাহায্যকারী মাত্র হইল; অথবা লোকে যেমন বলিয়া থাকে, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" মূর্ত্তি জ্ঞান

দ্বারা মন স্থির হইয়া পরে চৈতন্যময় ঈশ্বরে মন সমর্পিত হইল। একের পর অথবা সাহায্যে অন্যের জ্ঞান হইল, কিন্তু এক অন্য হইল না—রাম শ্যাম হইল না।

তবে পৌত্তলিক কে? (২) যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন চিহ্ন বিশেষ ব্যবহার করে সেই পৌত্তলিক। ইহাতে যদি কেহ পৌত্তলিক হয়, তবে তাহাতে দোষ দেখি না। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য চিহ্ন অবলম্বন করিয়া যদি কাহারও অতীন্দ্রিয় চিন্ময়াত্মার স্মরণ হয় বলিয়া সে পৌত্তলিক হয়, তবে তুমিও পৌত্তলিক। বাক্য কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়? 'পরমাত্মা' এই শব্দ যেমন পরমাত্মা বস্তুকে বুঝায়, অথচ পরমাত্মা বস্তুর মধ্যে 'প'ও নাই 'র'ও নাই "মাত্মা" ও নাই, সেই রূপ স্থূল মৃণ্ময় মূর্ত্তিও সেই পরমাত্মা বস্তুকে বুঝাইতে পারে, যদিও পরমাত্মাবস্তুর গুণ স্থূলত্বও নয় মূর্ত্তত্বও নয়। 'পরমাত্মা' শব্দেতে এবং স্থূল মূর্ত্তিতে তারতম্য এই যে একটী শাব্দ চিহ্ন আর একটী চাক্ষুব চিহ্ন, কিন্তু দুইই চিহ্ন। কোন্ দোষে চক্ষুগ্রাহ্য চিহ্ন ব্যবহারে পৌত্তলিকতা হইল, কোন্ গুণে কর্ণগ্রাহ্য চিহ্ন ব্যবহারে পৌত্তলিকতা হইল না? আমরা যাহা বুঝি ভাবেতে যদি কোন দোষ না থাকে, চিহ্ন ব্যবহারে কোন দোষ হইতে পারে না। চিহ্নের স্বতঃ কোন মূল্য নাই। মৃণ্ময় মহাদেবই বল অথবা বর্ণ গঠিত 'ঈশ্বর' শব্দই বল, অথবা শূন্য আকাশই বল, চিহ্ন রূপে ইহাদের কোন তারতম্য হয় না। ব্রহ্ম দর্শন যদি লাভ করিয়া থাক, তবে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায়, তোমার সম্মুখে শিবলিঙ্গই থাকুক, অথবা মুখে ঈশ্বর শব্দই আসুক, অথবা বাহিরে কিছু নাই হউক, তুমি পৌত্তলিক নও। আর যদি পরমাত্মার দর্শন লাভ না করিয়া থাক, তুমি চিহ্ন ব্যবহার কর আর নাই কর, হে সংস্কারক, তুমিই পৌত্তলিক। যদি অপর লোকের ইষ্টানিষ্টের কথা বল, তবে শূন্য আকাশের অথবা 'ঈশ্বর' এই শব্দের স্বতঃ এমন কি গৌরব যে, প্রস্তরখণ্ড অপেক্ষা অধিক ইষ্ট সাধন করিবে? আবার তুমিও যে উপাসনার সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের চাক্ষুষ চিহ্ন অথবা ছবি ব্যবহার না কর এমন নয়। 'ঈশ্বর' এই শব্দ কাগজে লিখিলেই তাহা চাক্ষুষ চিহ্ন অথবা ছবি হইল। পুস্তক দেখিয়া মনে মনে ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করাকে কেন পৌত্তলিকতা বল না? সে কিছু নয়, ভাবের গৌরবে চিহ্নের গৌরব। চিহ্ন যে রূপই হউক না কেন, তাহাতে বিশেষ ভাবের যোগ হইলে ইষ্ট সাধন করিবেই করিবে। এ সব দিকে দৃষ্টি না করিয়া ভাবের রাজ্যে চলিতে থাক।

চিহ্ন ব্যবহারে যদি পৌত্তলিকতা হয়, তাহাতে কোন দোষ নাই, একথা বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, বরং চিহ্ন ব্যবহার করিলেই ধর্ম্ম সাধনা সহজ হয়। শুধু তাহা নয়, কোন কোন চিহ্নের ব্যবহারে জাতি বিশেষের বিশেষ উপকার হয়। খ্রীষ্টানের জর্ডান জলে, হিন্দুর গঙ্গাজলে, পুরুষানুক্রমে বিশেষ পবিত্রভাবের যোগ হইয়া আসিয়াছে। তাহার সংস্পর্শে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, পৌত্তলিক অপৌত্তলিক সকলেরই মনে বিশেষ পবিত্রভাবের সঞ্চার হয়। হিন্দু সন্তান মাত্রেরই মনে তুলসিপত্র, গঙ্গাজল, বিল্বপত্র, যবাফুলের যোগে সহজে যে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়, কলের অতি পরিষ্কৃত জলে, অথবা অতি সুগন্ধি সুন্দর

অপরাপর পত্র পুষ্পে সে ভাব হইবে না। সকলে ইহা অনুভব করুন আর না করুন, এ অতি স্বাভাবিক কথা। কালী দুর্গার নাম সম্বন্ধেও সেইরূপ। পুরুষানুক্রমে এমনি পবিত্র ভক্তি ভাবের যোগ হইয়া আসিয়াছে যে, কালী সাধক যখন তাঁহার 'আদরিণী শ্যামা মায়ের' গুণগান করেন, শুনিয়া, পৌত্তলিক অপৌত্তলিক, ভাবুক মাত্রেরই প্রাণ শীতল হয়। শ্যামা যেন কি মধুময় নাম। পৌত্তলিক অপৌত্তলিক, সাধক মাত্রেই ইহা অনুভব করিয়া থাকেন।

" দুর্গা কালী নাম সম্বন্ধে আরও বলা যায়, শব্দ রত্নের উদ্ধার নিতান্ত প্রয়োজন। যদি একথা সত্যও হয়, দুর্গাকালী নামে ঈশ্বর ভাবের বিরোধী ভাবেরও যোগ হইয়াছে, তাহা বলিয়া সে সকল নাম পরিত্যাগ করিতে হইবে না, ভাবেরই সংস্কার করিতে হইবে। দুদ্-কলসিতে মাছি পড়িলে দুদ্ শুদ্ধ কলসি কেহ ফেলিয়া দেয় না। ঈশ্বরের এমন কি নাম আছে, যে নামে দেশকালপাত্রের দোষে ঈশ্বর ভাবের বিরুদ্ধ ভাবের যোগ না হইয়াছে।' ঈশ্বর শব্দে বিশেষ ভাবে উমাপতিকে বুঝায়। অনন্ত নরকের যোগে খ্রীষ্টানদিগের গড্ শব্দও এক প্রতিহিংসাপরায়ণ অতি ভীষণ 'কালভৈরব' বুঝায়। যাহারা অকাতরে এ সকল নাম গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারা কালী দুর্গা নাম কেন পরিত্যাগ করিবেন, আমরা বুঝি না। শব্দের ভাব সংস্কারই কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া যদি একটী একটী করিয়া শব্দ পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে ধর্ম্মালাপ বন্ধ করিতে হয়। এরূপ করিয়া ভাবাকম্বলের লোম বাছিলে কি থাকিবে? নামই বল আর বিগ্রহই বল, পরিত্যাগ না করিয়া ভাবের সংস্কার, করাই কর্ত্তব্য, দূষিতভাব পরিত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য প্রকৃত ঈশ্বর ভাবের যোগ করাই কর্ত্তব্য। পাতায় পোকা পড়িয়াছে বলিয়া গাছকে উন্মূলিত করা মূর্খের কার্য্য।

হে সংস্কারক, যদি মনে উদিত হয়, তুমিও দুর্গানাম গঙ্গাজল ব্যবহার করিতে পার। কাহারও তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বরং বিপরীত; যে বস্তু অথবা নামেতেই হউক তুমি প্রকৃত ঈশ্বর ভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইলে, সে নাম সে বস্তু শোধিত হইয়া সকলের নিকটেই প্রকৃত ঈশ্বরের নাম ঈশ্বরের চিহ্ন বলিয়া পরিচিত হইবে। হাড়েহ্নে মজ্জাতে হিন্দুর ভিতরে দুর্গা নামে যে ভক্তি-স্রোত বহিতেছে, সে নামে প্রকৃত ঈশ্বরের ভাব আসিলে অতি সহজে সে স্রোত ঈশ্বরের দিকে বহিতে থাকিবে। অন্য নামে হয়ত সে ভক্তিভাব অনেক আয়াস, অনেক সাধনাতেও তত সহজে আসিবেনা।

গঙ্গাজলাদিতে বিশেষ পবিত্র ভাব অনুভব না করে এরূপ লোকও থাকিতে পারে; তাহাদের মধ্যে সে ভাব যাপ্য অথবা 'লেটেণ্ট' অবস্থায় আছে। পরিহাসচ্ছলে বৃদ্ধেরা এরূপ একটী বালকের কথা আমাদিগকে বলিতেন। একজন ভদ্রলোক ঘরের দরজায় শুইয়া আছেন, তখন তাহার শিক্ষাভিমানী পুত্র ঘরে যাইতে বাপের মাথায় তাহার পা লাগিয়াছিল। পুত্র কিছু মনে না করিয়া অনায়াসে চলিয়া গেল। দেখিয়া বাপের ভয়ঙ্কর রাগ হইল। তিনি বালককে গালি দিতে লাগিলেন। বালক উত্তর করিল;—"সে কি? মাথাতে পা লাগা যা, পায়েতে মাথা লাগাও তাই,

ইহাতে রাগ করিবার কি আছে। একটা মাংস পিণ্ডিতে আর একটা মাংসপিণ্ড লাগিল, তাহাতে মান অথবা অপমান মনে করা ভয়ঙ্কর কুসংস্কার। এরূপ ব্লাইণ্ড ফেথের (অন্ধ বিশ্বাসের) প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্ত অন্যায়।”

তবে পৌত্তলিকতা কি? (৩) ঈশ্বরের কোন বিশেষ আকার হইতে পারে বিশ্বাস করাই পৌত্তলিকতা। যাহারা মনে করে ঈশ্বরের আকারবিশেষ হইতে পারে, ঈশ্বর সেই আকারেই আবদ্ধ থাকেন,তাহারা এরূপ মনে করে না। যাহারা দশভূজা দুর্গাকে ঈশ্বর বলে, তাহারাই আবার চতুর্ভুজা কালীকেও ঈশ্বর বলিয়া থাকে। তাহারা বাস্তব বিশ্বাস করে, ঈশ্বর, যে আকার ইচ্ছা, সেই আকারই ধারণ করিতে পারেন। এ শক্তি ঈশ্বরেতে নাই বলিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা থাকে না।

পূর্ণ অনন্ত স্বরূপের পক্ষে দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন আকার ধারণ, বিরুদ্ধ কথা, যদি বল, আমরা জিজ্ঞাসা করি, পূর্ণ অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম বস্তু দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন আকারের আধার হইতে পারেন, কি পারেন না? যদি পারেন না, তবে তাঁহার পক্ষে পরিচ্ছিন্ন আকারবিশিষ্ট জীব সৃষ্টি করাও অসম্ভব হয়। যে জীব সৃষ্টি করিবেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে সে জীবকে চিন্তা করিতে হইবে, ইচ্ছা করিতে হইবে। অতএব চিন্তাতে এবং ইচ্ছাতে তাঁহাকে সেই দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন জীবাকৃতির আধার হইতেই হইবে। যদি বল পারেন, তবে সেই দেশকাল পরিচ্ছিন্ন জীবাকৃতির আধার ব্রহ্ম বস্তু, সেই আকারে অন্যের দর্শনে আসিতে বাধা দেখা যায় না। সামান্য দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, এক জন চিত্রকরের কল্পনাতে যখন একটী চিত্র পূর্ণভাবে উপস্থিত হয়, তাহা কাগজে অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে, সেই চিত্রকর যদি আপনার আত্মার প্রতি দৃষ্টি করে, সে আপনাকে সেই চিত্ররূপেই দেখিতে পাইবে। অথবা স্বপ্নকালে যখন কোন বস্তু আমাদের কল্পনাতে উপস্থিত হয়, তখন আমরা আপনাদিগকে সেই স্বপ্ন কল্পিত বস্তু রূপেই দেখিতে পাই। গুণকে গুণী হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। চিত্রকরের কল্পিত চিত্র, অথবা আমাদের স্বপ্ন কল্পিত বস্তু আমাদের আত্মার সেই কালের একটা গুণ অথবা অবস্থাবিশেষ ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। আবার আত্মা অবিভাজ্য, অতএব একথাও বলা যায়না, যে, তাহার অংশ-বিশেষ চিত্ররূপে, অথবা স্বপ্নকল্পিত বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই চিত্রকর চিত্ররূপে, এবং আমরা স্বপ্ন কল্পিত বস্তুরূপে আপনাদিগকে পূর্ণ ভাবেই দেখিতেছি, বলিতে হইবে। ঈশ্বর যেমন মানুষের নিকটে আবির্ভূত হন, মানুষের আত্মাও যদি পরস্পরের নিকট সেই ভাবে আবির্ভূত হইতে পারিত, তবে সেই সময়ে সেই চিত্রকরের আত্মা চিত্ররূপে এবং আমাদের আত্মা স্বপ্ন-কল্পিত বস্তুরূপেই আবির্ভূত হইত। ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধেও সে কথাই হইবে। সেই জগচ্চিত্রকর দুর্গা কালীরূপে স্বতন্ত্র জীব বিশেষ সৃষ্টি না করিয়া, কেবল দুর্গা কালী মূর্ত্তিমাত্র কল্পনাতে ধারণ করিয়া যদি ভক্তের নিকটে আবির্ভূত হন, ভক্ত তখন তাঁহাকে দুর্গা-কালীরূপেই আবির্ভূত দেখিতে পাইবেন।

অথবা সে কথা দূরে যাউক, যদি পূর্ণ অনন্ত স্বরূপের পক্ষে দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন আকার ধারণ অসম্ভবই হয়, যাহারা তাহা

না বুঝিয়া সরল ভাবে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করে, সে জন্য তাহারা দোষী হইতে পারে না। যদি দোষী হয়, তোমাকেও সে দোষে দোষী বলিতে হয়,—তোমাকেও পৌত্তলিক বলিতে হয়। স্থান সম্বন্ধ থাকিলেই আকার আছে। যাহা এখানে আছে, ওখানে নাই, তাহারই আকার আছে। এখানে ঈশ্বর আছেন, ওখানে তিনি নাই, এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে খাটে না সত্য, কিন্তু যখন আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করি, তখন স্থান সম্বন্ধ যোগেই ধারণা করি; যেমন 'ঈশ্বর এই ব্রহ্মমন্দিরে আছেন' 'আমার হৃদয়ে আছেন।' 'ব্রহ্মমন্দিরে আছেন' বলিলেই জ্ঞাতার অনুভব সম্বন্ধে ব্রহ্মমন্দিরের বাহিরে নাই বুঝায়। এস্থলে জ্ঞাতার অনুভবে ব্রহ্মমন্দিরের আকারই ঈশ্বরের আকার হইল। ঈশ্বরেতে দুর্গা কালীর মূর্ত্তি আরোপ করাতে যদি পৌত্তলিকতা হয়, ব্রহ্মমন্দিরের আকার আরোপ করিলেও তাহাই হইবে। তবে যদি বল, 'ব্রহ্মমন্দিরে ঈশ্বর আছেন' এ কথা যখন বলা হয়, তখন ঈশ্বরের সেই আকার বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, কিন্তু দুর্গা কালী ঈশ্বর যাহারা বলে, তাহারা ঈশ্বরের সেই আকারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করে। একথাও ঠিক হয় না। লোকে দুর্গা কালীর পূজা কেন করে? এই বলিয়া নয় যে, তাহার একটা বিশেষ আকার আছে, তাহা মাটীর দ্বারা নির্ম্মিত; এই বলিয়া নয় যে, ইহা তিন হাত উচ্চ অথবা ইহার দশটা হাত আছে। অসংখ্য অপরাপর মূর্ত্ত পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেন সেই বিশেষ মূর্ত্তির পূজা করে? এই বলিয়াই করে যে, উপাসক অনুভব করে, তাহার মধ্যে এমন বস্তু আছে, যে তাহার বাসনা পূর্ণ করিতে পারে। এই বলিয়াই করে যে, তাহার মধ্যে ঐশী শক্তি সকল আছে। ঐশী শক্তিতেই উপাসকের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। যে যে মূর্ত্তিরই পূজা করুক, মূর্ত্তির পূজা কেহ করে না, ঐশী শক্তিরই পূজা করে,—ঈশ্বরেরই পূজা করে।

অথবা তোমার কথাই যদি সত্য মানা যায়, যদি আকারেই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে—তদ্দ্বারা তাহাদের ঈশ্বর সাধনার বাধা হয়, এমন মনে করা যাইতে পারে না। তাহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে যথাশক্তি ঈশ্বর জানিয়াই দুর্গা কালীর পূজা করে, সে পূজা ঈশ্বর অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। যদি তুমি লাট সাহেবকে উপহার দিতে যাইয়া, না চিনিয়া তাঁহার বাড়ীর এক জন চাকরকে সে উপহার দিয়া আস, তুমি সে ভ্রম ইচ্ছাপূর্ব্বক করিলে না। লাট সাহেব যদি জানিতে পান যে, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া উপহার দেওয়া হইয়াছে, তিনি অবশ্যই তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। তবে কেন মনে করিব, ঈশ্বর সেরূপ করিবেন না?—দয়া করিয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন না? আমরা আরম্ভে গীতা হইতে যে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, সে অতি সত্য কথা। যে দেবতা অথবা জড় বস্তুকেই লক্ষ্য করিয়া তুমি পূজা কর, ঈশ্বর দয়া করিয়া অবশ্যই তোমার সে পূজা স্বয়ং গ্রহণ করিবেন, কালে তোমার নিকট আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

তবে পৌত্তলিকতা কি? (৪) সৃষ্ট কোন জীব বিশেষকে ঈশ্বর মনে করাই পৌত্তলিকতা। এ কথাও প্রথম কথার ন্যায় বিরুদ্ধ। জীব সৃষ্ট, ঈশ্বর সৃষ্ট নয়;

জীব অন্তবৎ—ঈশ্বর অনন্ত, জীব অল্প-শক্তি—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি। জীবকে ঈশ্বর মনে করাও "অশিরস্ক শিরব্যথার" ন্যায় বিরুদ্ধ। জীবজ্ঞান যাহার আছে, সে জানিয়া শুনিয়া জীবকে জীব ভিন্ন আর কি ভাবিতে পারে? যাহার ঈশ্বর জ্ঞান আছে, সেও ঈশ্বরকে ঈশ্বর ভিন্ন আর কি ভাবিবে? রামকে রাম বলিয়া চিনিয়া, কি কেহ আর তাহাকে শ্যাম বলিয়া ভাবিতে পারে? হয় সে ঈশ্বরকে জানে, না হয় সে জানে না। যদি বল জানে, তবে সে ঈশ্বরকে জীব অথবা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবিতে পারে না। যদি বল জানে না, তবে সে সৃষ্ট কোন জীবকেও ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারে না; যে যাহা জানে না, সে আবার তাহা মনে করিবে কিরূপে? তবে বলিতে পার, মনুষ্যমাত্রেই আংশিকরূপে ঈশ্বরকে জানে। তাহারও উত্তর এই, যতটুকু জানে, ততটুকু জীবকে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরকে জীব বলিয়া ভাবিতে পারে না। আর যতটুকু না জানে ততটুকুও ভাবিতে পারে না, পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

তবে পৌত্তলিকতা কি? (৫) ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব অথবা সংকীর্ণতাই পৌত্তলিকতা। তবে নাস্তিকই পৌত্তলিক অথবা তুমি আমি সকলেই পৌত্তলিক। চিন্তাতে এবং বাক্যে তুমি আমি সকলেই ঈশ্বরেতে স্থানসম্বন্ধ আরোপ করিয়া থাকি। মানুষভাব, ও অল্প বা অধিক পরিমাণে, তুমি আমি সকলেই ঈশ্বরেতে আরোপ করি। কোন চিহ্নিত সময়ে ঘটনাতে অথবা ব্যক্তিতে যখন ঈশ্বরের বিশেষ দয়া অনুভব করি, তখন আমাদের অনুভবে, অন্য ঘটনা অন্য সময় অন্য ব্যক্তি সম্বন্ধে ঈশ্বরেতে সেই বিশেষ দয়ার অভাব বুঝায়। অতএব তোমার আমার সকলেরই অনুভাবে, মানুষের মত, ঈশ্বর কখনও বা বিশেষ দয়া করিয়া থাকেন কখনও বা করেন না; পাপে তাপে লাঞ্ছিত হইয়া, সেই পৌত্তলিক সাধকের মতন, তুমি আমি সকলেই হয়ত কখনও ঈশ্বরকে বলিয়াছি, "তারা কি তোর্ বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেউ নই।" ঈশ্বর সম্বন্ধে কাহারও জ্ঞান পূর্ণ হইতে পারে না। তবে যে তুলনা করিয়া এক জনকে আর এক জন পৌত্তলিক বলিবে সেও তত সঙ্গত নয়। তোমার ঈশ্বর জ্ঞানের তুলনায় আমার ঈশ্বর জ্ঞান সংকীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া যদি আমি পৌত্তলিক হই—তবে হয়ত পৌত্তলিকদের মধ্যেও কত রামপ্রসাদ, রামদুলাল জন্মিয়াছে, যাঁহাদের তুলনায় তোমার ঈশ্বর জ্ঞানও সংকীর্ণ; তুমিও তবে পৌত্তলিক।

কিন্তু আমরা যে পৌত্তলিকতার কথা আলোচনা করিলাম, তাহাতে কোন ধর্ম্ম বিশেষের কিছু আসে যায় না। ইহা দ্বারা এই মাত্র হইল, ভক্তিভাবে যাহার যে চিহ্ন ঈশ্বরের বলিতে ভাল লাগে, সে তাহাই ব্যবহার করিবে। পূর্ব্বাভ্যাস অথবা শিক্ষাবশতঃ যাহার যে চিহ্নে ঈশ্বরভাব হইতেছে, শব্দই বল, আর প্রস্তর খণ্ডই বল, অথবা শূন্য আকাশই বল, তাহাকে সেই চিহ্নই ব্যবহার করিতে দাও, তাহাতেই আশু ফল লাভ হইবে।

"জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান
ভোজের বাজি।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই
তুমি হও মা রাজি॥

মঘেবলে ফরতরা,লাড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা।
আল্লা বলে ডাকে তোমার মোগল পাঠান
ছৈয়দ কাজি॥"
রামদুলাল।

চিহ্ন কাড়িয়া লইয়া পৌত্তলিকতার বিনাশ সাধন মূঢ়ের কার্য্য। প্রস্তর কাড়িয়া লইতে পার, জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু আকাশ চিহ্ন কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না; কল্পনার গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। সকল লইয়া গেলেও আকাশ চিহ্ন অবলম্বন করিয়া কল্পনা খেলিতে থাকিবে, পৌত্তলিকতার বিষদন্ত পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যাইবে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানেই—মাত্র পৌত্তলিকতার সমূল উচ্ছেদ হয়; তখন চিহ্ন ব্যবহার করা না করা তুল্য হয়, সেই জ্ঞান, শব্দই বল, আর মূর্ত্তিই বল, কোন চিহ্ন অবলম্বন করিয়া লাভ করাই সুবিধা। "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" খ্রীষ্টানদের মত মনে করিও না, মাটীর মূর্ত্তি ব্যবহারে ঈশ্বরের অবমাননা হয়, এ নিতান্ত অসার কথা। বরং ঈশ্বর অবমানিত হইতে পারেন—এ কথা ভাবিলে তাঁহার অবমাননা হয়। যিনি পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ, তাঁহার আবার অবমাননা কি? যে মাটীর মূর্ত্তি ব্যবহার করিল, অবমাননার ইচ্ছা তাহার কল্পনাতেও আসিল না, যাঁহার চিহ্নরূপে সে মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইল, তিনিও অবমাননা রূপে গ্রহণ করিলেন না; তুমি রাস্তার লোক দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছ—"ঈশ্বরের অবমাননা হইল!!" উপাসনার উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা হইত, তবে বলিতে পারিতে একপ্রকারের উপাসনাতে তিনি তুষ্ট হন, আর এক প্রকারের উপাসনায় রুষ্ট হন। ঈশ্বর নির্ব্বিকার স্বরূপ, তুমি আমি উপাসনা করি আর না করি, বেদীতে বসিয়া বক্তৃতায় তাঁহার স্বরূপ বর্ণনাই করি, অথবা চাউল কলা দিয়া, ভোগ সাজাইয়া দুর্গা পূজা করি, তাহাতে ঈশ্বরের সুখ বাড়েও না, কমেও না। উপাসকের মনের তৃপ্তিই উপাসনার উদ্দেশ্য। চাউল কলা দিয়া যাহার তৃপ্তির হয়, তাহার চাউল কলাই দেওয়া কর্ত্তব্য, বক্তৃতায় স্বরূপ বর্ণনা করায় যাঁহার তৃপ্তি হয়, তাঁহার তাহাই করা কর্ত্তব্য।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন ধর্ম্ম বিশেষের কিছু আসে যায় না,কেবল এই মাত্র হইল যে, চিহ্ন লইয়া গোলযোগ করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য। ব্রহ্মজ্ঞান লাভে, শব্দ-চিহ্ন যাহারা ব্যবহার করে, তাহারা যেমন অধিকারী, মূর্ত্ত-চিহ্ন যাহারা ব্যবহার করে তাহারাও সেইরূপই অধিকারী। একদিকে যেমন শাব্দ-চিহ্ন-ধারীরা মূর্ত্তচিহ্নধারীদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া দোষী করে, আর একদিকে মূর্ত্ত-চিহ্ন-ধারীরাও শাব্দ চিহ্নধারীর নিন্দা করিয়া থাকে। তাহাও নিতান্ত অসার। অভ্যাস অথবা শিক্ষা বশতঃ যদি কাহারও মূর্ত্ত চিহ্নে মন না মিশে, তাহাকে সে চিহ্ন ব্যবহার করিতে বলা আর তাহাকে কপট ব্যবহার করিতে অথবা চুরি করিতে বলা, একই কথা। তাহাকে সে জন্য তাড়না করা, সমাজচ্যুত করা, নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। "যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরনাত্মাপহারিনা।" মূর্ত্তচিহ্নধারী শাব্দধারীকে অথবা শাব্দ চিহ্নধারী মূর্ত্তধারীকে ঘৃণা করিবেনা, অথবা পর বলিয়া ভাবিবে না।

তাহাদের মধ্যে কিছু মাত্র বিরোধ নাই, উভয়ই একই ভগবানের দাস। দাসকে তাড়না করা আর প্রভুকে অবমাননা করা, এক কথা। যদি এক জনের দেবতা শব্দ হইত, আর এক জনের দেবতা মূর্ত্তি হইত, তবে তাহাদের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারিত। কিন্তু তাহা নয়, উভয়েই একই ঐশীশক্তির পূজক। উভয়েই এক ভূমির উপর দণ্ডায়মান, সদ্ভাব আত্মীয়তা থাকাই কর্ত্তব্য। বিরোধ রাখিতে হইলে তাহাদের উভয়েরই মিলিতভাবে কপটতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কর্ত্তব্য। কপটী (তাহাদেরই দল আজ কাল বড় পুষ্ট) শাব্দ-চিহ্নই ব্যবহার করুক আর মূর্ত্ত-চিহ্নই ব্যবহার করুক, সে ধর্ম্মের শত্রু—জগতের শত্রু। ভণ্ডতা চির দিনই ঘৃণার্হ।

প্রকৃত পৌত্তলিকতা কি,যদি জানিতে চাও, তবে শোন। লোকের খাতিরে, উৎপীড়নের ভয়ে আবার পশারের লোভে, বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য করাই পৌত্তলিকতা; কপটতাই পৌত্তলিকতা, সে পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিক অপৌত্তলিক সকলের মধ্যেই আছে। ভণ্ড কিসে পৌত্তলিক? ভণ্ড পৌত্তলিক যেহেতু ভণ্ড শাব্দ অথবা মূর্ত্ত পুত্তলের লক্ষ্য দেবতাকে উদ্দেশ না করিয়া কার্য্য করে। সে তাহার পূজিত পুত্তলকে জীবন্ত ঈশ্বরের চিহ্ন মনে না করিয়া সম্ভ্রম বিলাস অথবা পয়সারই চিহ্ন মনে করে; সেই পুত্তল অবলম্বন করিয়া, ভণ্ড,ঈশ্বরের নামে, তাহাদেরই সেবাপূজা করিয়া থাকে। তাহারই দেবতা প্রকৃত পক্ষে জড় পুত্তল, অতএব সেই প্রকৃত পৌত্তলিক। অথবা প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন যাহার লাভ হয় নাই, সেই পৌত্তলিক। সে অর্থে হয়ত তুমিও পৌত্তলিক, আমিও পৌত্তলিক; তোমার আমার পরস্পরকে পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করিতে হইলে স্থান সম্বন্ধযোগে ধারণা করিতে হয়; অর্থাৎ আকার বিশেষের দিকে লক্ষ্য থাকুক আর না থাকুক, তাঁহাকে সাকার বলিয়াই মানুষের ধারণা করিতে হয়। এ কথা অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ শিব বিষ্ণু ইত্যাদি মূর্ত্তি ব্যবহার করিতে সকলকেই বাধ্য করিতে চান। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যদি ঈশ্বরকে সাকারই ভাবিতে হইল, তবে ব্রহ্মাবিষ্ণুরূপে ভাবিতে হানি কি? এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক; যখন ঈশ্বরকে ভাবি তখন লক্ষ্য কি ঈশ্বর, না তাঁহার আকার বিশেষ? যদি ঈশ্বর লক্ষ্য হয়, আমরা ঈশ্বরকেই ভাবিব। ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে যে আকারই আসুক না কেন, তাহাকে টানিয়া শিববিষ্ণু করিবার প্রয়োজন কি? যে তাহা না করিবে তাহারই বা অপরাধ কি? বরং আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক কাল্পনিক শিববিষ্ণু রূপ ঈশ্বরের স্রষ্টা হই কেন? যদি এরূপ হইত, ঈশ্বর ভাবিতে গেলেই শিব বিষ্ণুর মূর্ত্তি ভিন্ন তাঁহাকে ভাবা যায় না, তবে না হয় আমি তাহাতে হানি না দেখিলাম। কিন্তু হয়ত আমি ঈশ্বরকে আকাশ রূপে দেখিলাম, অথবা জগতের সমস্ত বস্তুরূপে দেখিলাম, এখন সেই স্বাভাবিক সহজভাব ফেলিয়া দিয়া বহু আয়াসে তাহাকে ৪।৫ টা মাথারূপে গড়িয়া, এক ব্রহ্মা বা শিবরূপে পরিণত করি কেন? যে আকার অপরিহার্য্য, লাভ ক্ষতি হিসাব করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিয়া

ঈশ্বর ধারণা করিতে পারিব না। আবার যে আকারে ঈশ্বর আমার নিকট প্রকাশিত না হইলেন, আমি যদি লাভ ক্ষতি হিসাব করিয়া তাঁহাকে সেই আকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, তাহাতে কি নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য হয় না? এই মাত্রই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, লক্ষ্য না করিয়াও, ঈশ্বরকে ধারণা করিতে গেলে একটা আকার আসে। তাহা ধরিয়া তুমি বলিতেছ "লক্ষ্য করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ঈশ্বরেতে আমার পূর্ব্ব কল্পিত একটা আকার আরোপ করা"। স্থূল কথা এই, ঈশ্বর দর্শনকালে শিব বিষ্ণুর মূর্ত্তি পরিহার করা যায় কি পরিহার করা যায় না? যদি পরিহার করা যায়, তবে তোমার দৃষ্টান্ত হানি হইল। কারণ ঈশ্বর ধারণাতে আকার অপরিহার্য্য, এই তোমার হেতু। অপর পক্ষে, যদি পরিহার করা না যায়, তবে তোমার বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। যেই ঈশ্বর ধারণা করিতে যাইবে, সেই তুমি না বলিলেও শিব বিষ্ণুরূপেই ধারণা করিবে, বলিলেও তাহাই করিবে।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে চিৎকার নূতন নয়, তবে আজ কাল যে চীৎকার হইতেছে, সে খ্রীষ্টানির অনুকরণ মাত্র। খ্রীষ্টানদিগের গুরু ইহুদি জাতি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রথম চীৎকার তোলে। পরে তাহাদেরই 'গোলে হরিবোল' দিয়া খ্রীষ্টান এবং মুসলমান সে চীৎকার গ্রহণ করে। অধুনাতন শিক্ষিত লোকেরা আবাব নিজে চিন্তা না করিয়া এসম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগেরই পাদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের সকলেরই ধর্ম্ম কর্ম্ম আলোচনা করিলে বুঝা যায়, সে চীৎকার কতদূর অসার। ইহুদি জাতি তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর জাতি সকলকে পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিত, উৎপীড়ন করিত। কিন্তু তাহারা নিজেরাও ঘোর পৌত্তলিক ছিল। তাহাদের 'জায়ন' পর্ব্বতে ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয় একটী মন্দির ছিল, যেখানে 'সিকাইনা' নামে, মেঘচ্ছবির আড়ালে ঈশ্বরের এক খানি প্রতিমূর্ত্তি থাকিত, তাহাই ঈশ্বর বলিয়া সকলে পূজা করিত। খ্রীষ্টানেরা ইহুদিদিগেরই ধর্ম্ম সন্তান, তাহারাও নিজে ঘোর পৌত্তলিক। রোম্যান কাথলিকদিগের ত কথাই নাই, প্রোটেষ্টাণ্টরাও খ্রীষ্টের রক্তমাংস বলিয়া কিছু মদরুটি খাইয়া আপনাদিগকে স্বর্গ লাভে অধিকারী মনে করে। মুসলমানদেরও সেই দশা; তাহাদের মক্কা সরিফে 'কাবা' নামক প্রস্তরখণ্ডে ঈশ্বর সর্ব্বদা আবির্ভূত। না জানিয়া ইহাদেরই ধাঁধায় পড়িয়া অধুনাতন শিক্ষিত লোকেরাও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক রোল তুলিয়াছিলেন; কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গৈরিক বসন্ মৃগচর্ম্ম ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিতেছেন। এসব কথা ভাবিলে, সহজেই লোকের মনে হয়, পৌত্তলিকতা নামেতেই দূষ্য এমন একটা কিছুই নাই; সে কেবল দলাদলির মূলমন্ত্র মাত্র। সার কথা এই, সরল বিশ্বাসে চালিত হইয়া যে যাহা করে, তাহাতেই তাহার ধর্ম্ম সাধনা হয়।

উপসংহারকালে আমরা আবার বলিতেছি, যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন ধর্ম্ম বিশেষের কিছু আসে যায় না। পৌত্তলিকতাতে স্বতঃ কোন দোষ নাই, কিন্তু তাহাতে কপটতার যোগ হইলেই দোষ।

হয়। যাহাদের দুর্গা কালীর মূর্ত্তিতে ঈশ্বর ভাব আসে না, অথচ লোকের খাতিরে, উৎপীড়নের ভয়ে, মদ্য মাংস অথবা পশান্নের লোভে, খবরের কাগজ হইলে গ্রাহক জুটাইবার আশায়, বাহিরে ভান করিয়া থাকেন, যেন ঈশ্বরভাব আসিয়াছে, তাহাদের কপট পৌত্তলিকতা নিতান্ত ঘৃণার্হ। আবার পৌত্তলিকতাতে স্বতঃ কোন দোষ না থাকিলেও আমাদের দেশে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত আছে, জাতিভেদের যোগ থাকাতে তাহাতেও দোষ যোগ হইয়াছে। মূর্খ দুশ্চরিত্রলোক যখন তুচ্ছ জন্মের বলে লোক সমাজে ঐশ্বরিক ক্রিয়া কলাপে অধিকার লাভ করে, আর জ্ঞানী সাধু সচ্চরিত্র মহাত্মা কেবল জন্মের বাধায় অথবা আহারীয়ের ভেদে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হন, তখন তাহার বিরুদ্ধে শতকণ্ঠে চীৎকার করা কর্ত্তব্য। ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে, তাঁহার মাতার মৃতদেহ সংস্কার কালে, ইহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ইহারই মস্তকে পদাঘাত করিয়া যবনভক্ত হরিদাসের সহিত একত্রে পংক্তি ভোজন করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মও এ সকলেরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন। সত্য তাঁহার সহায়, বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ তাঁহার পথ প্রদর্শক, তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে এমন কে আছে?

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

হিম নদীর উৎপত্তি ও গতি।

(এখানে বলা আবশ্যক যে, ঘটনাক্রমে লেখকের অজ্ঞাতসারে পূর্ব্ব প্রবন্ধের শিরোনাম "হিমনদী" না হইয়া তুষার প্রবাহ লিখিত হইয়াছিল। তুষার শব্দটী এস্থলে snow অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, হওয়াও উচিত। নতুবা কথার বড় গোলযোগ হইয়া থাকে। এজন্য glacier কে হিম নদী নামেই ডাকা সঙ্গত। আশা করি পাঠক মহাশয়গণ উদারতা সহকারে আমাদের গত প্রবন্ধের প্রকাশে অনবধানতা ক্ষমা করিবেন।)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, হিমনদী তুষার প্রান্তর (snow field) হইতে উৎপন্ন। এক্ষণ ইহার উৎপত্তি-প্রণালী বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্যরশ্মি দুই জাতীয়; জ্যোতিঃ ও উত্তাপ; এই উভয় জাতীয় রশ্মি একত্র হইয়া রৌদ্র হয়। রৌদ্রের আলোকপ্রদ অংশ (light rays) বায়ুতে প্রতিফলিত হইয়া এবং পৃথিবীতে পড়িয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত করে। এবং উহার তেজ বা উত্তাপপ্রদ রশ্মি (Heat rays or black rays) বায়ুর মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবীতলস্থ পদার্থ সকলকে উত্তপ্ত করিয়া তুলে। বায়ু কিন্তু এই উত্তাপপ্রদ রশ্মিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, বায়ু উত্তাপপ্রদ রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ বা transparent, এজন্য বায়ুর মধ্য দিয়া ধরাপৃষ্ঠে পঁহুছিবার সময় সূর্য্য রশ্মি বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। সূর্য্যকিরণে বায়ু তখনই গরম হয়, যখন বায়ু সূর্য্য কিরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্তপ্ত কোন ধরাপৃষ্ঠস্থ পদার্থের গায়ে লাগে। স্পর্শগত (conducted) উত্তাপ ভিন্ন ব্যাপ্তিগত (radiated)

উত্তাপ গ্রহণ করিবার শক্তি বায়ুর নাই বলিলেই হয়। এজন্য পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ বায়ু উত্তপ্ত ধরাতল ও তদুপরিস্থ পদার্থ সমূহের স্পর্শে যত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, ঊর্দ্ধ দেশস্থিত বায়ু রাশি তাহা না পাইয়া তত উত্তপ্ত হইতে পারে না। এই কারণে যতই উপরে উঠা যায়, ততই বায়ু শীতল বোধ হয়। অধিক ঊর্দ্ধে পর্ব্বতাদির উপরের বায়ু এত শীতল যে, সেখানে জল লইয়া গেলে একে বারে জমিয়া বরফ হইয়া যায়। যাঁহারা ব্যোমযানে আরোহণ করেন, শীতল বায়ু প্রভাবে তাঁহাদের হস্ত পদ অবশ হইয়া যায়, এবং তাঁহারা থারমমিটারের সাহায্যে গণনা করিয়াছেন যে, উপরের বায়ু বরফ জমিবার অপেক্ষাও অধিক শীতল। যাঁহারা দার্জিলিঙ বা সিমলায় গিয়াছেন, তাঁহাদের একথা আর অধিক বাক্যব্যয়ে বুঝাইতে হইবে না।

এই সকল উচ্চ পর্ব্বত শিখরে যখন মেঘমালা বায়ুতাড়িত হইয়া উপস্থিত হয়, তখন আর তত্রত্য প্রচণ্ড শীতে তাহাদের সূক্ষ্ম জলীয় কণা সমূহ তরলাবস্থায় থাকিতে পারে না। পর্ব্বত শিখরের বা তন্নিম্নস্থ শীতল অধিত্যকার স্পর্শ মাত্র মেঘের জল-কণা সকল, সূক্ষ্ম বরফ কণায় পরিণত হয়। এই বরফ কণার নাম তুষার বা Snow। পর্ব্বতোপরিস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রান্তরগুলি এইরূপে তুষার কণায় মণ্ডিত হয়। প্রতি বৎসর সময় বিশেষে ভূরি ভূরি মেঘ আসিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে আঘাত করে এবং ঘোর শৈত্যময় শিলা স্পর্শমাত্র তুষার স্তূপে পরিণত হইয়া পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করে। ইহারই শোভায় হিমালয় চিরদিন দর্শক মাত্রেরই নয়ন-লোভনীয়। হিমাদ্রির বিমল শুভ্রশির—ধবলগিরি, দূর হইতে যাঁহারা একটী বার দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর কখনই সে মনোহর দৃশ্য বিস্মৃত হইবেন না।

কিন্তু বৎসরের এক সময়ে যেমন মেঘ আসিয়া তুষার উৎপাদন করে, আর এক সময়ে আবার সূর্য্যকিরণে উহা দ্রবীভূত হইয়া যায়; তবে "চিরতুহিন মণ্ডিত পর্ব্বতমালা" কিরূপে হয়?—উত্তর অতি সহজ। যতই উপরে যাইব, ততই শীতের আতিশয্য অধিক। এজন্য যে স্থান যত উপরে, সে স্থানে তুষার তত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এবং সেই কারণেই যে স্থান যত উচ্চ সে স্থানের তুষার, সূর্য্যকিরণ ক্ষীণ বলিয়া, তত অল্প পরিমাণে দ্রব হয়। কাজেই অতি সহজেই দেখা যাইতেছে যে, যে স্থান যত উচ্চে অবস্থিত সে স্থানে তত অধিক পরিমাণে তুষার উৎপন্ন হয়, কাজেই সেই সকল স্থানে প্রতিবৎসরই বিস্তর তুষার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সমস্ত বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণে তুষার পতিত হয়, তাহা অপেক্ষা সমস্ত বৎসরের দ্রবীভূত তুষারের পরিমাণ খুব অল্প, সুতরাং প্রতি বৎসরই বিস্তর তুষার অবশিষ্ট থাকে আবার সেই অবশিষ্ট তুষার রাশির উপর নূতন বৎসরের নূতন তুষার সঞ্চিত হইতে থাকে।

এই গেল উপরের কথা। কিন্তু যে স্থান তত উচ্চে অবস্থিত নহে, তথায় ক্রমশ দ্রবীভূত তুষারের পরিমাণ বাড়িতে থাকে ও সঞ্চিত তুষারের পরিমাণ কমিতে থাকে; কেন না সে স্থানে সূর্য্যের উত্তাপ উপর অপেক্ষা অধিক। অথবা ইহাই বলা সঙ্গত যে, তথাকার বায়ু ধরাতলের উত্তপ্ত বায়ুর নিকটে অবস্থিত হওয়ায়, উপরের বায়ু অপেক্ষা অধিকতর উত্তাপবিশিষ্ট। এইরূপে

নামিতে নামিতে শেষে পর্ব্বত পার্শ্বের এমন এক স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, যেখানে সম্বৎসরের সঞ্চিত তুষার গ্রীষ্মকালে ঠিক গলিয়া যায়। এখানে যেমন আয়, তেমনি ব্যয়। কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই স্থানের একটী বিশেষ নাম আছে। বৈজ্ঞানিকেরা এই সীমাবর্ত্তী রেখাকে snowline বা "তুষার রেখা" কহেন। ইহার নিম্নেও তুষার পাত হয় বটে, কিন্তু সে তুষারের কিছুই সঞ্চিত হইতে পায় না, সুতরাং তুষার প্রান্তরের সংগঠনে তুষার রেখার নিম্নস্থ স্থান সকলের কোন অধিকার নাই। এই তুষার রেখার উচ্চতা, সকল পর্ব্বতে সমান নহে। পর্ব্বতের অবস্থান ভেদে উহারও উচ্চতা ভেদ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে তুষার রেখা অনেক উচ্চে অবস্থিত। আবার শীত প্রধান দেশে উহার উচ্চতা নিতান্ত কম। হিমালয়ের উত্তর ভাগের তুষার রেখার উচ্চতা অন্যূন ১৬,৬০০ ফিট। আমেরিকার পেরু দেশস্থ আণ্ডিস্ পর্ব্বতে ইহার উচ্চতা ১৫,৫০ ফিটের কম নহে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শীতল দেশে, যেমন সুইজর্লাণ্ডের আল্প্স্ পর্ব্বতে, এই রেখার উচ্চতা ৮,৫০০ ফিট মাত্র। আবার গ্রীন্‌লণ্ড প্রভৃতি উত্তর প্রদেশে এই রেখা সাগরপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে, সেই জন্য ঐ সকল স্থানে হিমনদী সমূহ সাগরে প্রবেশ করিতে দেখা যায়।

তুষার প্রান্তর সকল এই তুষার রেখার উপরিভাগে উচ্চ অধিত্যকায় দেখা যায়। এখানে প্রতি বৎসরই প্রচুর তুষার স্তূপাকার হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। এখন প্রশ্ন এই যে, এক একটী পর্ব্বত যে কত কাল হইতে বর্ত্তমান আছে তাহার ঠিক নাই, তবে প্রতি বৎসর যদি এইরূপে তাহাদের উপর তুষার স্তূপ সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে এত দিনে হয়ত কত শত ক্রোশ উচ্চ হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহাত হয় না। তবে ঐ বাৎসরিক তুষার বৃদ্ধির গতি কি হয়? প্রতি বৎসর যে নূতন নূতন তুষার স্তূপ পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তাহারা হয় কি? যায় কোথায়?

চিন্তাশীল পাঠক হয়ত বলিবেন "কেন? কিয়দংশ গলিয়া জল হইয়া যায়, অবশিষ্ট খুব কনেকটা হয়ত একেবারে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।" যদি কেহ সে সকল দেশে গিয়া থাকেন তবে তিনি হয়ত হাসিয়া বলিবেন "কেন? আমি যে দেখিয়াছি মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গের মত তুষারপিণ্ড নিজভারে ও বায়ুর আঘাতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাদের দ্বারা ঐ তুষার রাশির নিশ্চয়ই অনেক হ্রাস হয়।" সত্য সত্যই সমস্ত তুষাররাশি কিয়ৎ পরিমাণে সূর্য্য কিরণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার পরিমাণ এতই অল্প যে, তদ্দ্বারা ঐ পর্ব্বতোপম স্তূপের কিছুই করিতে পারে না। ইহাও সত্য যে, মধ্যে মধ্যে আভালাশ বা প্রকাণ্ড তুষার পিণ্ড সকল বায়ুতে উড়িয়া পড়ে ও নিম্নস্থ গ্রাম নগরাদির বিস্তর অনিষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু সে দিগন্তব্যাপী তুষার প্রান্তরের তুলনায় এরূপ সহস্র আভালাঁশ ও নগণ্য। তবে কি উপায়ে ঐ তুষার ব্যয়িত হয়? উপায় দুইটী।

প্রথমত—উপরিস্থ স্তূপের বিপুলভারে চাপ পাইয়া নিম্নস্থ তুষাররাশি সঙ্কুচিত হইয়া, ক্রমে অল্প হইতে অল্পতর স্থান অধি-

কার করিতে থাকে। যাঁহারা তুষার কণা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে উহা নিরেট নয়। প্রত্যেক কণা তুলার কণার মত হালকা, (ভিতরে বায়ু থাকাতে শুভ্রবর্ণ দেখায়) ছুটী পাপড়ীবিশিষ্ট ছোট ছোট ফুলের মত দানা বাঁধা Crystals। কাজেই চাপ পাইলে এই পাপড়ীর মত বাঁধা দানা ভাঙ্গিয়া যায়, ভিতরকার বাতাস বাহির হইয়া যায় এবং গুঁড়া গুঁড়া তুষার জমাট বাঁধিয়া চাপ চাপ বরফ হইয়া যায়। উপর কার তুষার গলা জলও ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহাতে সাহায্য করে। কাজেই আগে যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া ছিল, এখন তদপেক্ষা অনেক কম স্থানেই তাহাদের সমাবেশ হয়। এইরূপ যতই অধিক তুষার জমিতে থাকে, ততই নীচের তুষারের আল্‌গা ভাব ঘুচিয়া গিয়া উহা ঘন হইয়া জমাট বরফ হইয়া দাঁড়ায়, ফলে এই হয় যে, রাশি রাশি তুষার জমিয়া অল্প স্থানেই বরফ (ice) হইয়া থাকিতে পায়, কিন্তু ইহাতেও কি যথেষ্ট হয়? সৃষ্টির আদিকাল হইতে যদি এইরূপে উপরে তুষার ও নীচে বরফ সাজান হইয়া আসিতে থাকে, তাহা হইলেও এত দিনে প্রত্যেক পর্ব্বতের মস্তকে কত গুণ উচ্চ বরফের চূড়া নির্ম্মিত হইত! তবে আরও কারণ আছে।—সে কারণ কি?

দ্বিতীয়ত—পর্ব্বত পৃষ্ঠের সাধারণ ঢালু ভাব বশত, এবং উপরিস্থ তুষার স্তূপের বিপুল ভারে আক্রান্ত হইয়া, উক্ত নিম্নতলস্থ বরফস্তর ক্রমশ পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া নিম্নে আসিবার চেষ্টা করে। কাজেই সে অবস্থায় ঐ বরফকে স্বস্থানে রাখিবার জন্য কোন উপায়ই থাকেনা। নীচের বরফ ধীরে ধীরে নামিতে থাকে। উপরে যেমন তুষার তেমনই থাকে, কিন্তু নিম্নতলস্থ জমাট তুষার অর্থাৎ বরফ, ক্রমে ক্রমে উপর হইতে চাপ পাওয়ায় এবং নিম্ন ঢালু প্রদেশে স্থির থাকা অসম্ভব হওয়ায় অগত্যা নীচের দিকে নামিতে থাকে। তুষার প্রান্তরের যে ভাগ অপেক্ষাকৃত নিম্ন, সেই ভাগ দিয়া প্রথমে বরফ পতিত হইতে আরম্ভ হয়, ক্রমে পর্ব্বতের যেখানে নিম্নগলি বা সংকীর্ণ উপত্যকার মত স্থান প্রাপ্ত হয়, উক্ত অতিরিক্ত বরফরাশি সেই স্থান দিয়াই নামিতে থাকে। অবশেষে যখন খুব নিম্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে আর বরফ দ্রব না হইয়া থাকিতে পারে না, তখন ক্রমে গলিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু অত্যন্ত গভীর বলিয়া গলিতে গলিতেও অনেক দূর পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। এজন্য তুষার রেখার অনেক নীচে পর্য্যন্তও হিম নদী সকল দেখা যায়। ইউরোপে হিমনদী এই অবস্থাভেদ লইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটা স্বতন্ত্র নামে অবিহিত হইয়া থাকে। তথায় তুষার রেখার উপরিস্থ অংশকে "নেভে" Névé বলা হয়, আর তন্নিম্নস্থ অংশকে "গ্লেশিয়ার" বলা হইয়া থাকে।

যে বরফরাশি আমরা নদীর উৎপত্তি-স্থান অবিষ্কার করিতে গিয়া দেখিতে পাই, সে সমস্তই তবে কি বহু দূরস্থিত পর্ব্বত শিখরের ঐ সকল তুষার প্রান্তর হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়াছে? যে সকল পর্ব্বতাকার হিম শিলা গ্রীষ্মপ্রধান সাগর পর্য্যন্তও ভাসমান হইয়া আসে, তাহাও কি পর্ব্বত শিখরের তুষার স্তূপের অবস্থা-ভেদ মাত্র? কঠিন বরফ কি তবে তরল বা অর্দ্ধ তরল পদার্থের ন্যায় যথার্থই পর্ব্ব-

তের গা বহিয়া হিম নদীরূপে অবতরণ করে? কি হইতে যে কি হয়, প্রকৃতির কত নিয়মই যে আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অতীত, তাহা কে জানে?

কিন্তু উপরে যাহা নির্দ্ধারিত হইল, তাহা পরিদর্শকের বিচারের সম্ভাবিত ফল মাত্র। তুমি, আমি, কি আর কেহ, যে হিমনদীর অবস্থা ও উৎপত্তি স্থানের বিষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখিবে, সেই উপরোক্তরূপ বিচার না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তথাপি বৈজ্ঞানিক বিষয় সকলে এত অনুমান প্রশ্রয় পায় না। ইহারও যুক্তি ও প্রমাণ আবশ্যক।

আমরা এবার প্রমাণিত করিব যে, যথার্থই হিম নদী এই তুষার প্রান্তরের নিম্ন তলের বরফ হইতে উৎপন্ন হইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। বরফ যে চলে, তদ্বিষয়ে এক কালে ঘোর সংশয় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতদিগের অপরিমেয় অধ্যবসায়ের ফলে অবার্থরূপে নির্ণীত হইয়াছে, কোন সন্দেহই নাই।

প্রথমে জিজ্ঞাস্য এই যে, বরফ যদি না চলে, তবে, কতকাল হইতে ঐ সকল উপত্যকা ও গলি বরফে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে? সূর্য্যের উত্তাপে নিয়ত উহার উপরিভাগ দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে, অথচ কমিয়া কমিয়া নিঃশেষ হয় না কেন? তুষার রেখার উপরকার কথা যেন একটু স্বতন্ত্র, কেন না, সেখানে বায়ুর উত্তাপ এত অধিক নহে যে, সমস্ত বরফ দ্রব হইয়া যায়। বৎসরে গড়ে যে তুষারই পড়ে তাহাই যখন সমস্ত গলিয়া যাইতে পারে না, তখন অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে সঞ্চিত বরফ রাশি দ্রব হইয়া যওয়া অবশ্য অসম্ভব। গ্রীষ্মের উত্তাপে যেটুকু গলে, শীতের প্রচুর তুষারপাতে সেটুকু আবার পূর্ণ হয়। কাজেই তুষার রেখার উপরিস্থ ভাগে একথা ঠিক খাটে না; কিন্তু তন্নিম্নে কেন সমস্ত বরফ গলিয়া যায় না? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত—আদৌ এই সকল স্থানে বরফের অস্তিত্বই বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। পর্ব্বতের শিখর দেশ যে চিরতুহিনাচ্ছন্ন হয় তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি; কিন্তু যদি এই বরফের প্রকাণ্ড জিহ্বা উক্ত তুষার প্রান্তর হইতে উৎপন্ন না হইল, তবে কোথা হইতে আসিল? আর সকলেরই, মূলে ঐ প্রান্তরের সহিত যোগই বা কিরূপে সম্পন্ন হইল? পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এই সকল স্থানে এই বরফ সংস্থিত ছিল; ইহাত বিজ্ঞানের উপহাসের কথা। তবে কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয়ই তুষারপ্রান্তর ইহার মূল। ঐ অগ্রভাগ নিশ্চয়ই এক সময়ে মূল প্রান্তরস্থ তুষারের সহিত সংলগ্ন ছিল বলিতে হইবে। সুতরাং উহাকে তুষার প্রান্তর হইতে শত দূর চলিয়া আসিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই।

তৃতীয়ত—যদি ইহাকে তুষার প্রান্তর হইতে উৎপন্ন না বলা যায়, তবে উপরিস্থ অতিরিক্ত তুষার স্তূপ কি হয়, ভাল করিয়া বুঝা যায় না, একথা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে তাহার আর বিচার করা অনাবশ্যক।

চতুর্থত—অধিকাংশ হিমনদীর মুখভাগ হইতেই একটী না একটী জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া নদী রূপ ধারণ করিয়াছে; এখন এই জলস্রোত যে ক্রমাগত চলিতেছে, এই ক্ষতি পূরণের উপায় কি? যদি পশ্চাৎ

হইতে নূতন বরফ আসিয়া দ্রবীভূত বরফের স্থান পূর্ণ না করিত, তাহা হইলে যত বড়ই কেন বরফ প্রবাহ হউক না, শত শত বৎসরের পর তাহার চিহ্ন মাত্রও থাকিত না, এবং ঐ জলস্রোতের মূল ক্রমেই উপরে উঠিত। কদাচ এক বা সমভাবে এইরূপ কার্য্য চলিতে পারিত না।

পঞ্চমত—হিমনদী মাত্রেরই মুখভাগে যে রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড সকল দেখা যায়, পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহাদিগকে প্রান্তস্থ প্রস্তর রাশি বলা গিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহারা কোথা হইতে আসিল। যদি বলা যায় যে, সেই স্থানেরই পর্ব্বত পার্শ্ব হইতে পড়িয়াছে, তাহা হইলে চলিবে না। কেন না, তাহাদের সংখ্যা এতই অধিক ও এরূপ স্তূপে স্তূপে সাজান যে, তাহারা কদাচ সেই স্থানের হইতে পারে না। হিম নদীর অন্যান্য অংশে যেরূপ প্রস্তর রাশি দেখা যায়, এখানে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক। তাহার কারণ বুঝা যায় না। যেমন স্রোত প্রবাহ চলিতেছে, অমনি নূতন নূতন প্রস্তরমালা নদী পৃষ্ঠে নীত হইয়া ঐ একই স্থানে পড়িতেছে। কাজেই অন্যান্য সকল স্থল অপেক্ষা এইখানে উপল-সংখ্যা অনেক অধিক। এই রূপ ব্যতীত উহাদের কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তদ্ভিন্ন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, যে জাতীয় প্রস্তর সকল ঐ স্থানে পতিত থাকে, তাহার হয়ত কোন চিহ্নই সেখানকার পর্ব্বতের গায়ে দেখা যায় না, সুতরাং তাহারা বহমান হইয়া না আসিলে আর অন্য কোন উপায়ই নাই। আরও প্রমাণ আছে। ঐ সকল প্রস্তরের অনেকের গায়ে এমন সকল চিহ্ন আছে যেন তাহাদের উপর দিয়া কোন কঠিন দ্রব্য ঘসিয়া সোজা সোজা লম্বা লম্বা দাগ পড়িয়াছে। এক এক খণ্ড পাথর এমন লম্বা ভাবে ঠিক সোজা অবস্থিত যে, তলার বরফ গলিয়া গিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে উক্ত অবস্থায় বসাইয়া না দিলে অন্য কোন উপায়ে তাহার সেরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব নহে। এ সকল কথা প্রথম প্রবন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদের কারণ এখন সকলে সহজে বুঝিবেন। নদী-মুখের সন্নিকটে যে সকল ঢিবি ঢিবি প্রস্তর উভয় পার্শ্বে দেখা যায়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাদের উপরিভাগ বেশ সুগোল পালিশ করা, ঠিক কচ্ছপের পৃষ্ঠের মত। তাহাদের উপর দিয়া বরফের স্রোত না চলিলে তাহাদের উপরিদেশ কখনও এরূপ আকার ধারণ করিতে পারিত না।

ষষ্ঠত—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক হিমনদীর উভয় পার্শ্বে এক এক সারি প্রস্তরমালা দেখা যায়, ইহাদিগকে পার্শ্বস্থ প্রস্তর রাশি বলে, এই সকল কোথা হইতে আইসে? অতি সহজেই তাহার মীমাংসা হয়। আমরা দেখিয়াছি, কোথাও কিছু নাই, মধ্যে মধ্যে ভীষণ শব্দ করত পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে বড় বড় উপলখণ্ড সকল স্খলিত হইয়া নদীপৃষ্ঠে পতিত হয়। ইহারাই সাধারণত উহার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উক্ত প্রস্তর-রাশি উৎপাদন করে। তদ্ভিন্ন আরও এক প্রকারে প্রস্তর-স্খলন দেখিতে পাওয়া যায়। হিমনদীর উভয় পার্শ্বে ঠিক বরফ ও প্রস্তরের সম্মিলন স্থলে প্রায়ই এরূপ দেখা যায় যে, এক খণ্ড বড় পাথরের একটা কোণ

বরফের মধ্যে খানিকটা ছিল, হঠাৎ ভয়ানক শব্দ করিয়া সম্মুখদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইহার অর্থ কি? একটু বুঝিয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে, উহার কারণ—ঐ বরফের সম্মুখদিকে গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বরফ কঠিন পদার্থ—পাথরের গায়ে ঠেকিয়াছিল; বরফ সম্মুখে চলিতে যায়, পশ্চাৎ হইতে চাপ আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিতেছে, কাজেই সে আগে যাইতে চায়; কিন্তু পর্ব্বত পার্শ্বস্থ পাথরের কোণ সম্মুখে থাকিয়া তাহাকে বাধা দিতেছে। কিছুকাল উভয়ে বলপ্রকাশ করিল, কিন্তু বরফের বহু দূরের প্রযুক্ত বল, পাথরের শক্তিকে হারাইয়া দিল। শেষে পাথরখানা ভাঙ্গিয়া গেল ও পার্শ্বস্থ পাথর রূপে পরিণত হইল। সুতরাং এখানেও বরফের ধীর কিন্তু অবাধ গতি প্রমাণিত হইতেছে।

সপ্ত মত—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রায় সমস্ত বড় হিমনদীরই মধ্যভাগে, পার্শ্ব হইতে শত শত গজ দূরে, পার্শ্বস্থ প্রস্তররাশির সমদূরবর্ত্তী আরও এক, দুই, বা ততোধিক শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তরমালা দেখা যায়, তাহাদিগকে মধ্যস্থ প্রস্তররাশি বলে। এই বার পাঠক, বলুন দেখি এই গুলি কিরূপে কোথা হইতে আসিল? যে নদীতে উপনদী মিশে নাই, তাহাতে এরূপ দেখা যায় না; যাহাতে একটী উপনদী মিশিয়াছে, তাহার মধ্যভাগে একটী মাত্র শ্রেণী দেখা যায়, দুটী মিলিলে দুই শ্রেণী, এইরূপে যতই উপনদীর সংখ্যা বাড়িতে দেখা যায়, ততই এই জাতীয় প্রস্তরশ্রেণীর সংখ্যা বাড়িয়া থাকে। ইহার কারণ কি? হিমনদীর গতি স্বীকার করা ভিন্ন এখানে আর অন্য উপায় নাই। প্রতি প্রবাহের দুই ধারে একটী একটী করিয়া পাথরের সারি থাকে। বেশ;—এখন মনে করুন, একটী প্রবাহ আর একটীর সহিত বামপার্শ্ব হইতে মিলিত হইল। তাহা হইলে মূল প্রবাহের বাম পার্শ্বস্থ প্রস্তর মালার সহিত সর্ব্ব প্রথমেই উপপ্রবাহের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রস্তরমালার সাক্ষাৎ হইবে। এবং এই দুটী প্রবাহ মিশিয়া যাইবে; তখন উক্ত সম্মিলিত প্রস্তর শ্রেণী পূর্ব্ববৎ মূল প্রবাহের বামদিকে ও উপপ্রবাহের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া যাইবে, অর্থাৎ উহা ঐ সম্মিলিত প্রবাহের মধ্যভাগে অবস্থিত হইবে। এইরূপে সমস্ত মধ্যস্থ প্রস্তর শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এবং বাস্তবিকই কোন হিমনদীর মধ্যস্থ শ্রেণীর সংখ্যা গণনাদ্বারা তাহার উপনদীর সংখ্যা বলিয়া দিতে পারা যায়। তবে যদি অনেক গুলি আসিয়া একত্র মিশে, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে নদীবক্ষে প্রস্তর রাশি এত গোলযোগে আলুথালু ভাবে ছড়ান থাকে যে, তাহাদের মধ্যে কিছুই বাহির করা যায় না। যাহাই হউক, মধ্যস্থ প্রস্তররাশির অস্তিত্বেই হিমনদীর গতি বেশ সপ্রমাণ হয়।

অষ্ট মত—হিমনদীর যে গতি আছে তাহার আর একটী প্রবল প্রমাণ—তাহার ফাটল। এই সকল ফাটল নানা জাতীয় হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম কেশ সদৃশ সামান্য চিড় হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি প্রকাণ্ড ভীষণ পর্ব্বত গহ্বরের ন্যায় পর্য্যন্তও দেখা গিয়া থাকে। চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে "ফট ফট" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এই শব্দ আর কিছুই নয়, বরফ ফাটিতেছে। কিন্তু জন্মমাত্র ফাটলকে দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা তখন এতই সূক্ষ্ম! ক্রমে সেই সূক্ষ্ম ফাটলই এত বৃহৎ

হইয়া থাকে যে, সে দিকে তাকাইলে ভয় হয়। এই সকল ফাটলের অর্থ কি? বরফ যদি স্থিরভাবে থাকিত, তবে তাহাতে এরূপ ফাটল হইবার কি সম্ভাবনা? বরফ চলিতেছে বলিয়াই, যখন কোন বাধা পায় অমনি ফাটিয়া যায়, এক ভাগ হয়ত বেশী অগ্রসর হয় আর এক ভাগ পারে না, কাজেই উভয়ের মধ্যে ফাক হইয়া যায়। ফাটল সকল কিন্তু অধিক দিন থাকিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অপর এক ফাটল পূর্ব্বের ফাটল পুনরায় জুড়িয়া যাইতে দেখা যায়। ইহা হিম নদীর গতির পক্ষে অব্যর্থ প্রমাণ। যে কারণেই ফাটল জন্মাক না কেন, বরফের গতি না থাকিলে জুড়িয়া যাওয়া অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন আরও একটী অকাট্য প্রমাণ ফাটলের উপর নির্ভর করে। তাহা এই—আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের "গ্রাণ্ডপ্লেটো (Grand Plateau) নামক স্থানে একটী ভীষণ ফাটল দেখা যায়। এই ফাটল চিরকাল এক নাই, মধ্যে মধ্যে ইহা জুড়িয়া যায় ও সেই স্থলে নূতন ফাটলের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক এই ভয়ানক গহ্বরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে একটা তুষার পিণ্ডের (Avalanche) আঘাতে তিন জন লোক পতিত হয়। যদি হিমনদীর বরফ অচল হইত, তাহা হইলে এই গহ্বরের মধ্যেই ঐ তিন জনের মৃত দেহ চির দিন থাকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। যথার্থই সে দিন, ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে, ঐ তিন জনের মৃত দেহের অবশিষ্টাংশ অনেক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে (Glacier Bossons) নামক হিমনদীর প্রান্তভাগের উপরে দেখা গেল! আশ্চর্য্য! এই ৪০টী বৎসর বরফের শীতে তাহাদের কঙ্কাল রক্ষিত হইয়াছিল! এত দিন গভীর বরফের মধ্যে নিহিত ছিল; ক্রমে উপরিভাগের বরফ যত গলিয়া যাইতে লাগিল, ততই নীচের বরফ উপরে দেখা দিতে আরম্ভ হইল। সুতরাং গতিশীল বরফের সঙ্গে সঙ্গে তন্মধ্যে প্রোথিত নরদেহও এতদূর চালিত হইয়া শেষে উপরের বরফের তিরোধানে বাহিরে দেখা দিল।

এ পর্য্যন্তও আমরা কেবল চিহ্ন দেখিয়া আনুমানিক প্রমাণ গুলির কথা বলিলাম। যদি কেহ ইহাতেও সন্দিহান হন যে, হয়ত অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে যাহা দ্বারা উপরোক্ত প্রকার ঘটনা সকল সংঘটিত হয়, তাহা হইলে আমরা আরও অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের অমিত উৎসাহ ও অতুলনীয় অধ্যবসায়ের কল্যাণে আমরা এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইয়াছি। তাঁহারা বাস্তবিকই এক, দুই, তিন, করিয়া ইঞ্চ ইঞ্চ পরিমাণে হিমনদীর দৈনিক. এমন কি প্রতি ঘণ্টার গতি নির্দ্ধারণ করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। এ বিষয় এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে সংক্ষেপে তাহার কথা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সকল বিষয়েরই প্রথমে অনুমান হইতে আরম্ভ করিয়া পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণে উপস্থিত হইতে হয়। এখানেও তাই। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ গুলি অবলোকনে সন্দেহ ও অনুমান, তৎপরে আরও অকাট্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুসন্ধান। রোম ও আর্ভীরণ নদীর ন্যায় সুইজর্লণ্ডের "আর্" নামক নদীরও উৎপত্তিস্থান একটী হিমনদী, তাহার মূলভাগের নাম "উন্তেরার্"। এই প্রকাণ্ড হিমনদীর মধ্যস্থ প্রস্তর রাশির মধ্যে

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিউজী' নামক এক জন ঐ দেশীয় পণ্ডিত, একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, এ হিমনদীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করেন। যেখানে তিনি কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার উভয় দিকের পর্ব্বতের গায়ের বস্তু সকলের সঙ্গে সমসূত্রে তাহার অবস্থান লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিন বৎসর পর্য্যবেক্ষণের পর দেখিলেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুটীর পূর্ব্ব স্থান হইতে ৩৩০ ফিট নীচে আসিয়াছে। ১৮৩৬খৃঃঅব্দে দেখা গেল যে, ঐ কুটীর ২৩,৫৪ ফিট নামিয়া আসিয়াছে। এবং ১৮৪১ অব্দে "আগেসিজ্" সাহেব দেখিলেন, উহা ৪,৬১২ ফিট নীচে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। ১৮৪০ অব্দে ইনি কতিপয় দুঃসাহসিক বন্ধু সমভিব্যাহারে এই হিমনদীর উপর "নিউসাটেল হোটেল" নামক আর একটী কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। দুই এক বৎসর পরে দেখা গেল যে, ঐ হোটেল ৪৮৬ ফিট নীচে অগ্রসর হইয়াছে।

কত কষ্ট সহ্য করিয়া প্রাগুক্ত মহাত্মাদ্বয়, কয়েক বৎসর পরিশ্রমের পর, যে সত্য লাভ করিলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী পরিদর্শকগণ কয়েকটী যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকমাত্র ঘণ্টার মধ্যেই সেই সত্য ও তদপেক্ষা আরও বিস্ময়কর বিষয় সকল নিঃসংশয়ে সুপ্রমাণিত করিতে সমর্থ হইলেন। আবাসিস্ সাহেব স্বয়ং ও অনেক বিষয় নূতন আবিষ্কার করেন। তাঁহার চেষ্টা ও প্রফেশার ফর্বেস নামে আর এক জন পণ্ডিতের যত্নে আমরা হিমনদী সম্বন্ধে অনেকানেক কৌতুকজনক ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ফর্বেস্ সাহেবের "আল্প্স্ ভ্রমণ" নামক গ্রন্থে তাঁহার পরিদর্শনের অনেক কথা দেখা যাইবে, ইহাতে তিনি পূর্ব্বোক্ত মার ডি গ্লেস্ নামক হিমনদীর বৃত্তান্ত পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাহার পর যে সকল বিষয় আবিষ্কৃত হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য। ইহাঁরা "থিয়োডলাইট" নামক এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উক্ত মার ডি গ্লেস্ হিমনদীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। বরফের উপর এই যন্ত্র দ্বারা বিস্তার দিকে সোজা সরল রেখা ক্রমে কয়েকটী বড় বড় কাটি পুতিয়া দেওয়া যায় এবং উহাতে যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে, তাহার সাহায্যে ঐ কাটি গুলির স্থানের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। কোন কাটি কতক্ষণে কত ইঞ্চ নড়িয়াছে তাহা অতি অভ্রান্ত রূপে অবগত হওয়া যায়। এই উপায়ে নিঃসংশয়ে হিমনদী সম্বন্ধে অনেক গুলি সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কাটীর গতি মাপিয়া তাহাদের অনেকেরই মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২।১টী এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। মার ডি গ্লেস নদীটীর একস্থানে ১৫ টী সমসূত্রবর্ত্তী কাটীর এক দিনের গতি নিম্নে দেওয়া গেল:—

কাটী—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ইঞ্চ—১১ ১৪ ১৩ ১৫ ১৫ ১৬ ১৭ ১৯ ২০ ১৯ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১০। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, দুই পার্শ্বের দুটী কাটী সমস্ত দিনে প্রায় সমান পথ অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু মধ্যভাগের কাটী গুলি ক্রমেই বেশী দূর চলিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝাযাইতেছে যে, মাঝের বরফ ধারের বরফ অপেক্ষা বেশী দূর চলিয়াছে, অর্থাৎ তাহার গতি অধিক। এই রূপ নিয়ম সর্ব্বত্র দেখা

যায়। যেখানেই হিমনদীর গতি সরল, বাঁক নাই, সে সব স্থানেই বরফ দ্রুত চলে। এ বিষয়ে বরফ অবিকল নদীর ন্যায়। সকলেই জানেন যে, নদীর স্রোত কিনারা অপেক্ষা মধ্যস্থলে অধিক প্রবল। এখানে আমরা অনেক মাপের মধ্যে যে একটীমাত্র মাপ দিলাম, তাহা দ্বারা বরফের নদীর পক্ষেও ঐ সত্য সম্পূর্ণ সঙ্গত প্রমাণিত হইল।

যখন কোন নদীতে বাঁক পড়ে, তখন ঐ বাঁকের যে দিকটা বেশী ঘোর, সে দিকের জলের স্রোত, যে দিকে কম ঘোর সে দিকের অপেক্ষা অধিক হয়, একথা সকলেই জানেন। বরফের নদীতেও ঠিক তাই। নিম্নে মার ডি গ্লেসের আর একটী দিনের এক স্থানের যে মাপ দিলাম, তদ্বারাই বুঝিতে পারিবেন।—

কাটী পূর্ব্ব—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৫ পশ্চিম

ইঞ্চ— ৭ ৮ ১৩ ১৫ ১৬ ১৯ ২০ ২১ ২১ ২৩ ২৩ ২১ ২২ ১৭।

ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? এবারেও পূর্ব্বের নিয়ম ঠিক রহিল। এখানেও মধ্য স্থলের গতি উভয় পার্শ্বের গতি অপেক্ষা পশ্চিম পার্শ্বে অধিক দ্রুত বেগে চলিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। আর যদি হিমনদীর চিত্র দেওয়া যাইত, তবে দেখিতে পাইতেন যে উহার পশ্চিম পার্শ্ব বাস্তবিকই পূর্ব্ব পার্শ্ব অপেক্ষা অধিক ঘোর। তৎপরে আর এক স্থানে যে বাঁক আছে, তাহার পশ্চিম দিক অপেক্ষা পূর্ব্বদিক বেশী ঘোর। সেই স্থানের কাটীর এক দিনের গতি নিম্নে দেওয়া গেল:—

কাটী পূর্ব্ব—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ পশ্চিম

ইঞ্চ— ২০ ২৩ ২৯ ৩০ ৩৪ ২৮ ২৫ ২৫ ২৫ ১৮ ১৯

আর অধিক মাপ দিবার আবশ্যক নাই; যথেষ্ট প্রমাণিত হইল যে, এ সম্বন্ধে হিমনদী ও আমাদের সাধারণ নদীতে কোন প্রভেদ নাই। যখন বাঁক থাকে না, তখন ঠিক মধ্য স্থলের গতি দুই পার্শ্বের গতি অপেক্ষা দ্রুত হয়। বাঁকের মাথায় যে দিকের ঘোর বেশী, সে দিকের জল ও বরফ দুএরই গতি অধিক দ্রুত।

আরও আছে। যখন কোন নদী প্রশস্ত অবস্থা হইতে হঠাৎ অপ্রশস্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া অল্প প্রশস্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়। এখানে বরফের ও সেই নিয়ম দেখা যায়। হিমনদী যখন কোন প্রশস্ত উপত্যকা হইতে সঙ্কীর্ণ স্থানে উপস্থিত হয়, তখন উহারও বেগ অধিক হইয়া পড়ে। এই রূপে দেখা যায় যে, সর্ব্ব বিষয়েই প্রায় জল ও বরফ উভয় জাতীয় নদীর গতির নিয়ম একই প্রকার, প্রভেদ কেবল গতির দ্রুততায়। এমন কি, নদীর তলদেশের জল অপেক্ষা উপরিভাগের জল যেমন অধিক বেগে চলে, পণ্ডিতেরা হিমনদীতেও এই সত্যটী প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রকাণ্ড কাটালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার গায়ে কাটী পুতিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, বরফের তলদেশ অপেক্ষা উপরিভাগ অধিকতর বেগে চলে। যেমন মার ডি গ্লেসের মাপ দেওয়া গেল, সেইরূপ অন্যান্য অনেক হিমনদীর এই বিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়াছে; ও তাহাতে এই সাদৃশ্য সম্পূর্ণ রূপেই প্রমাণ করা হইয়াছে।

এক্ষণে একটা কথা সহসা সকলেরই মনে উদয় হইতে পারে যে, হিমনদী কঠিন

বরফময় হইয়াও কিরূপে তরল নদীর ন্যায় চলে। এই প্রশ্ন অনেক দিন এ বিষয়ের অনুসন্ধানকারী বড় বড় পণ্ডিতদিগকেও চিন্তিত করিয়াছিল। অনেক দিন ইহার কিছু মীমাংসা করিতে তাঁহারাও সমর্থ হন নাই। একথাটীও বড় কৌতুকজনক। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে; অন্য এক সময়ে এ সম্বন্ধে লিখিবার রহিল।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্মশানে নিশান।

ব্রহ্মপুত্র তীরে—সন্ধ্যার সময়।

বৈশাখের শেষ দিন—মেঘে অন্ধকার;—
দিনমান প্রায় শেষ,ব্যাপিয়া আকাশ দেশ,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার!
উলঙ্গ—এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল,
বিকট ভৈরব নাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার,
নয়নে কালাগ্নি ঢালি,উন্মত্তা শ্মশান কালী
ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যা মূর্ত্তি তাড়কার!
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজালা,
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খ মালা!

১

নিরখি সে ভীমছায়া, দিগন্ত বিস্তৃত কায়া,
ভয়ে যেন ব্রহ্মপুত্র গেছে মসী হয়ে,
আতঙ্কে কাঁপিছে বুক, নাহি শান্তি একটুক
তরঙ্গ তুফান তার ছুটিছে হৃদয়ে,
আজি তারা শশধর, ওঠেনি গগন পর,
অমর পেয়েছে ডর মরণের ভয়ে,
এমন ভীষণ দৃশ্য, বুঝিবা ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব
এখনি হইবে ধ্বংশ মহান্ প্রলয়ে!

২

হেন ঘোর অন্ধকার,—এ হেন সময়
উড়িছে শ্মশানে এক ধবল নিশান,
অর্দ্ধ দগ্ধ বংশদণ্ড, ছিন্ন ভিন্ন লণ্ড ভণ্ড
এখানে ওখানে পড়ে শয্যা-উপাধান!
দুচারিটী কানাকড়ি, কোথাও কলসী দড়ী,
কোথাও বা ছাই ভস্ম অঙ্গার নির্ব্বাণ!
কোথাও মাথার খুল,ছেঁড়া নথ ছেঁড়া চুল,
কোথাও বা অস্থিখণ্ড রয়েছে বিছান,
ঘোর স্তব্ধতার শিরে,সে নিস্তব্ধ নদী তীরে
স্তিমিত স্তম্ভিত ঘোর গম্ভীর সে স্থান,—
উড়িতেছে "পত-পত" শ্মশানে নিশান!

৩

"শ্মশানে নিশান কেন?" হাসে খল খল,
মড়ার মাথার খুলি, বিকাশিয়া দন্তগুলি,
বিকট বিশুষ্ক শুভ্র দীঘল দীঘল!
সবে করে উপহাস, ছাই পাঁশ কাঁচা বাঁশ
বিছানা কলসী দড়ী মিলিয়া সকল!
কি যে সে বিকট হাসি হাসে খল খল!

৪

দিগন্তে সে অট্ট হাসি হয় প্রতিধ্বনি,
বিকট ভৈরবে হাসে আসন্না রজনী!
জ্বলে মুহুঃ বজ্রানল, গর্জ্জে মুহুঃ মেঘদল,
হইতেছে চূর্ণ চূর্ণ ভূধর মেদিনী!
প্রকৃতির বিশ্বনাশী, এ ঘোর প্রলয় হাসি,
সহিতে পারে না যেন প্রকৃতি আপনি!
বজ্র নখে বক্ষ চিরে, দেখায় যেতেছে ছিঁড়ে
প্রচণ্ড হাসির চোটে কলিজা ধমনী,
সহিতে পারে না হাসি প্রকৃতি আপনি!

দেখিলাম অকস্মাৎ রজত জ্যোৎস্নায়,
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়!
রজত ধুতুরা কর্ণে, বিমল রজত বর্ণে,
রজত বিভূতি মাখা তুষারের প্রায়!
রজত গিরির শিরে, রজত জাহ্নবী নীরে,
রজত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়া যায়!
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়!

৬

কিবা সেই সৌম্যমূর্ত্তি অমল ধবল,
ধবল বৃষভ পর, বিরাজিত বিশ্বম্ভর
ধবল অস্থির মালা গলে দল মল!
ধ্যানগত আত্মা তার, নাহি দেখে ত্রিসংসার,
জ্ঞানময় মহা মূর্ত্তি স্থির অবিচল!
বিশ্ব বিনাশের হেতু, বিবেকী সে বৃষকেতু
আপনি ধরিয়া সেই কেতু সমুজ্জ্বল,
শ্মশানের জয়ভেরী, বাজাইয়ে ত্রিপুরারী
ভৈরবে গাহিছে গীত, 'মরণ মঙ্গল'!
আতঙ্কে অবনী যেন করে টল মল!

৭

ছুটিছে ভৈরব রাগ কাঁপায়ে বিমান,
"গাও মরণের জয়, গাও শ্মশানের জয়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পবান্!
কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
অমর কথার কথা বোঝে না অজ্ঞান!
বাসবের বজ্র ছার, বৃথা গর্ব্ব করে তার,
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান্!
লওহে সবলে তুলি, মড়ার মাথার খুলি,
বাজাও বিকটে বাদ্য কাঁপাও বিমান!
নাচ ভূতগণ মিলে, কোথা হ'তে কে আসিলে,
শুনাও ভৈরব কণ্ঠে সে ভূত বিজ্ঞান!
তুলে ও চিতার ছাই, জীবেরে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব্ব বৃথা অভিমান!
গাওহে ভৈরব কণ্ঠে কাঁপায়ে বিমান!

গাওহে ভৈরব কণ্ঠে গম্ভীরে সে গান,
গাও সবে পঞ্চভূত, বিজয়ী শ্মশান দূত
সংসার জয়ের সেই সঙ্গীত মহান্!
"যাহা কিছু এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই,—
ভয় ভক্তি ভালবাসা ক্রোধ অভিমান!
ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, সুখ কিম্বা দুঃখক্লেশ
যশ কিম্বা অপযশ মান অপমান!
বীরের বীরত্ব পূর্ণ, হৃদয় হইবে চূর্ণ,
ভীরুর বিভগ্ন বক্ষ রেণুর সমান!
রাজার কীরিট গর্ব্ব, এখানেই হবে খর্ব্ব,
দাসের দাসত্ব ক্লেশ হবে অবসান!
জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি বল, সব যাবে রসাতল,
মুছে যাবে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান!
মড়ার মাথার খুলি, বাজাও সবলে তুলি
কর সে ভৈরব নৃত্যে ধরা কম্পবান!
তুলে এই ভস্ম ছাই, জীবেরে দেখাও তাই
কেন করে বৃথা গর্ব্ব বৃথা অভিমান!
দেখুক্ এ শ্মশানের বিজয় নিশান!"

৯

ভূতের ভৈরব কণ্ঠে কাঁপায়ে বিমান,
বিঘোর ভৈরব রাগে ছাড়িল সে তান।
"জয় মরণের জয়, জয় শ্মশানের জয়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পবান!
কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
অমর কথার কথা বোঝে না অজ্ঞান!
বাসবের বজ্রছার, বৃথা তার অহঙ্কার
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান্!
যত কিছু——এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই
দেখরে মোহান্ধ জীব নির্ব্বোধ অজ্ঞান!"
শ্মশান নিশান মূলে, চিতা-ভস্ম তুলে তুলে
বাজায়ে মড়ার মাথা ভূত করে গান,
উড়িতেছে 'পত-পত' "শ্মশানে নিশান!"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ভবভূতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবের উপসংহার স্থলে বলিয়াছি যে, ভবভূতি ও বাল্মীকি এই উভয় কবিরই উদ্দেশ্য এক। সে উদ্দেশ্য, মানবের সমক্ষে, পাপ প্রলোভনময় জগতে, আদর্শ চরিত্রের সমাবেশ। কিন্তু উভয় কবিরই উদ্দেশ্য একই হইলেও, ভবভূতির প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি তাঁহার আদর্শ চিত্রে মানবত্বের সঙ্গে সঙ্গেই দেবোচিত গুণের সমাবেশ করিয়াছেন, বাল্মীকির ন্যায় অমর প্রকৃতিতে অমরত্বের আরোপ করেন নাই। যাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই দেবতা বলিয়া জানি, তাঁহাতে যে দেবত্বের চিহ্ন দেখিতে পাইব, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? কিন্তু যদি কোন দিন জরামরণশীল মানবে অমরতার নিদর্শন, পৃথিবীতে অমরাবতীর সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে পাই, তবে সেই দিন যথার্থই বিস্মিত হইব। কিন্তু নায়কগণ অপেক্ষা গ্রন্থের প্রতিনায়কগণ সম্বন্ধে বাল্মীকি ও ভবভূতির পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট। অনার্য্য জাতি ও অনার্য্য সমাজের প্রতি যে ঘৃণা রামায়ণের প্রতি পংক্তিতে বর্ত্তমান, ভবভূতির গ্রন্থে তাহার আভাষ মাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমাংশে এ বিষয়ের বহুল পরিমাণে উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে আর তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। কেবল সংক্ষেপে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভবভূতি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিলেও সকল বিষয়ে বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। অনুসরণ দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে কাব্যের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য তিনি বাল্মীকি বর্ণিত অনেক অংশের প্রতিবাদই করিয়াছেন। বাল্মীকির অনুসৃত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া তিনি যুক্তিযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন কি না, সে কথা স্বতন্ত্র, এবং তাহা এ স্থলে আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়ও নহে। কিন্তু বাল্মীকির অনুসরণ না করিয়া, তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের বিবেচ্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বীর-চরিত ভবভূতির গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম। বীর-চরিতে রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্রাশ্রমে গমন হইতে, বনবাসাবসানে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ পর্য্যন্ত, সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কবি, রামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত ও শৈশব-চরিত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ঘটনা পূর্ণ অংশই গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বস্তু রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা রামায়ণের ছয় কাণ্ডে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তিনি একখানি মাত্র নাটকে তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই জন্য হয়ত বহু বৎসরের ঘটনা, তাঁহাকে একটী [illegible]র মধ্যেই সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে। যে সকল ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য রামায়ণের অধ্যায়ের পর অধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছে, তাহার জন্য হয়ত তিনি একটী মাত্র শ্লোকই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। এরূপ স্থলে প্রতি-

পাদ্য বিষয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। ঘটনা রাশির সংঘর্ষণে, এবং নানা জাতীয় বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের সমাবেশে, গ্রন্থখানি একটী সুবিশাল অরণ্যানীর ন্যায় গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সেই বিশাল কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, পাঠক আপনার গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তাহার মহান্ বনস্পতিগণের ছায়ায় তিনি অন্ধ প্রায় হইয়া যাইবেন। গাম্ভীর্য্যে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে সত্য, কিন্তু তিনি ভাবিবেন যে, এ কাননের কি শেষ নাই, এ আলোক-সংশ্লিষ্ঠ অন্ধকারের কি বিরাম নাই? তখন তাঁহার হৃদয় সেই অন্ধকারের রাজ্য হইতে আলোকে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। এবং সেই নিবিড় বনের অন্তরাল হইতে পত্র রাশির বিচ্ছেদ স্থানে সূর্য্যালোক দেখিতে পাইলে, তিনি পুলকিত হৃদয়ে তাহার পানে চাহিয়া দেখিবেন। আমরা এইবার সেই বিশাল অরণ্য সদৃশ ভবভূতির বীরচরিতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব। এবং যে গাম্ভীর্য্য ও মহত্বের জন্য ভবভূতির গ্রন্থ সমূহের এত সমাদর, তাহা পাঠকগণের নিকট প্রদর্শিত করিবার প্রয়াস পাইব।

বীরচরিত সাত অঙ্কে পরিসমাপ্ত। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় আমরা [illegible]র মুখে অবগত হইব, রাজর্ষি বিশ্বামি[illegible] বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া, যজ্ঞ র[illegible] জন্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আপনার আশ্রমে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ রাজর্ষি জনককেও এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু জনকও স্বয়ং যজ্ঞ কার্য্যে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত বিশ্বামিত্রাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে, ভবভূতি হিন্দু সমাজের একটী অতি সুন্দর চিত্র এ স্থলে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকা, নানা দেশ অতিক্রম করিয়া, পিতৃতুল্য গুরুজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন, এ দৃশ্য বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে অতি বিরল। আমরা সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, এ দৃশ্য অতি সুন্দর। আমরা ক্রমশঃ এইরূপে প্রসঙ্গ ক্রমে, হিন্দু সমাজের তৎকালীন অবস্থা পাঠকগণের নিকট বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

বীরচরিতের প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্য অতি সুন্দর। এই অঙ্কে রামচন্দ্রের সহিত সীতার প্রথম দর্শন। যাঁহাদিগের জীবন হিন্দুসন্তানের আদর্শ স্বরূপ, যাঁহাদিগের চরিত্রের প্রভাব হিন্দু জীবনের অস্থিমাংসের সঙ্গে২ সম্মিলিত, বীর-চরিতের প্রথমাঙ্কে, সেই হিন্দু নরনারীর আদর্শস্বরূপ দম্পতীর প্রথম সাক্ষাৎ। রাজা কুশধ্বজ বিশ্বামিত্রের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত তাঁহার আশ্রমে আসিয়াছেন। রামচন্দ্রও লক্ষণের সহিত যজ্ঞ রক্ষার জন্য সেখানে বর্ত্তমান। সেই কৌশিকী পরিক্ষিপ্ত বনভূমে, হরিতপরিসবারণ্য রমণীয় সিদ্ধাশ্রমে সীতা ও রামচন্দ্র পরস্পরকে প্রথম সন্দর্শন করিলেন, পরস্পরের হৃদয় বিগলিত হইল। উভয়ে ভাবিলেন, কি সুন্দর কি প্রিয়দর্শন! কিন্তু এ অনুরাগ কেবলই ইন্দ্রিয়গত, এ মোহগুণজনিত নহে; ইহাত রূপের

আসক্তি। গ্রন্থকার সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গেই সেই অনুরাগ যাহাতে বদ্ধমূল হইতে পারে, তজ্জন্য একটী অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করাইলেন। নেপথ্যে শব্দ হইল 'জয় জয় জগৎপতি রামচন্দ্রের জয়।' সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলেন, গৌতমপত্নী অহল্যা, রামচন্দ্রের প্রভাবে অন্ধ তামিশ্র হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। সীতার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে তিনি অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "সরীর নিম্মাণ সরিসো নং সে অণুভাবো।" "দেখিতেছি ইনি দেখিতেও যেমনই সুন্দর ইহার প্রভাবও তাহার অনুরূপ"। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে শারীরিক সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় বিমোহিত হইয়াছিল, মানসিক সৌন্দর্য্যে তাহা আরও আকৃষ্ট হইল। অজ্ঞাতভাবে যে বীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা বদ্ধমূল হইল। সীতা দেখিলেন, যে রামচন্দ্র কেবলই সৌন্দর্য্যের অবতার নহেন, তিনি করুণারও অবতার। স্বামী যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সমাজ যাঁহাকে কলঙ্কিণী বলিয়া চিরান্ধকারে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই হতভাগিনী অহল্যা তাঁহারই প্রসাদে মুক্তি লাভ করিল। তিনি দেখিলেন যে, রামচন্দ্র পাপীকেও ভালবাসিতে জানেন। মুগ্ধ স্বভাবা বালিকার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। সীতা ভাবিলেন, আজ ইহাকে দেখিলে আমার লোচন এত পরিতৃপ্ত হয় কেন? ইহাকে দেখিবার জন্য মনে মনে এত সাধ হয় কেন? কেবলই কি সীতার হৃদয়ে এই অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা নয়। রামচন্দ্রও ভাবিতেছিলেন "কি মিয়ং অমৃত বর্ত্তি রিব চক্ষু রাপ্যায়য়তি"। রাম সীতার যে প্রেম সর্ব্বাবস্থাতেই সমভাবে বর্ত্তমান, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে যে প্রেমের বিরাম ছিলনা, তাঁহা এইরূপে সেই পবিত্র বিশ্বামিত্রাশ্রমে পরস্পরের সন্দর্শনে সমুৎপন্ন হইল। রাম ও সীতাকে দেখিয়া রাজা কুশধ্বজও ভাবিতে ছিলেন, যে "দাদা যদি হর ধনু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা না করিতেন, তবে রামচন্দ্রের হস্তে সীতাকে সমর্পণ করিতাম"। এমন সময় সংবাদ আসিল যে, রাক্ষসাধিপতি রাবণের দূত, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। কুশধ্বজ ও বিশ্বামিত্র তাহাকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবার অনুমতি দিলেন। পরস্পর অভিবাদন ও কুশল প্রশ্নের পর দূত বলিল, যে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার পাণি-গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহাকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র ও কুশধ্বজ উভয়েই রাবণের এরূপ প্রার্থনায় কি উত্তর দিবেন চিন্তা করিতে ছিলেন। যাহার আদেশ জগতে কেহ কখন অন্যথা করিতে সাহস করিত না, তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা অল্প সাহসের কথা নহে। সীতা ভাবিতেছিলেন (১) হাধিক্ আমার অদৃষ্ট কি এতই কঠিন, রাক্ষস আমাকে বিবাহের জন্য প্রর্থনা করিতেছে। উর্ম্মিলা ভাবিতেছিলেন (২) "সে কি? অদৃষ্টে কি এই ছিল?" কিন্তু লক্ষণ আর সহ্য করিতে

কন্যা। সোম্ম দংশনা কৃখুএদে।
রাম। স্বপ্রসন্নোজ্জ্বলা মূর্ত্তিরস্যা স্নেহং করোতি মে।

সীতোর্ম্মিলে। তথৈব তৌপ্রতি কির্ত্তি সজ্জই ইমস্মিং লোঅ আনন্দে মে দিট্টি।

(১) হদ্ধী হদ্ধী রক্খসো মং পথ্থেদি।
(২) উর্ম্মিলা। কহং এব্বং।

পারিলেন না। সেই সৌন্দর্য্যময়ী বালিকা রাক্ষস হস্তে নিপতিতা হইবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, (৩) 'দাদা, দাদা, দেখিতেছ না যে রাক্ষসপতি রাবণ এই দেবীকে বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।" কিন্তু রামচন্দ্র উদ্বেগশূন্য। সুখ দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, হর্ষ ক্ষোভ, কোন অবস্থাতেই তাঁহার হৃদয়ের শান্তির বিপর্য্যায় ঘটিত না। অক্ষুণ্ণ চিত্তে, স্থির ভাবে বলিলেন (৪) বৎস, কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে যখন অতি সাধারণ লোক পর্য্যন্তও তাঁহাকে বিবাহ প্রার্থনা করিতে পারেন, তখন পরমেশ্বরের প্রপৌত্র, জগতের জেতা রাজা রাবণ যে এ বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? রাক্ষস দূত, কুশধ্বজও বিশ্বামিত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি চিন্তা করিতেছেন ? বিশ্বামিত্র প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় ভাবিতেছিলেন, প্রত্যাখ্যান করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে অপমানিত করিবার প্রয়োজন কি ? তবে এমন অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যাহাতে রাক্ষসরাজ আপনা হইতেই আমাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন। তিনি উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ দর্শনার্থ যে সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন, সুন্দপত্নী ত[illegible]কা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছিল। তাহার সর্ব্ব শরীর শোণিত কর্দ্দমে পরিপূর্ণ, নরকপাল, এবং নরাস্থি সমূহ অলঙ্কার রূপে তাহার অঙ্গে শোভা পাইতেছিল। তাহার বিশাল স্তনদ্বয় দ্রুতগমন বশতঃ বিকম্পিত হইতেছিল। বিশ্বামিত্র সেই ঘোররূপা রাক্ষসীকে দেখিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, বৎস, ইহাকে বিনাশ কর। যে রামচন্দ্র সীতাকে অন্য প্রার্থিতা দেখিয়া উদ্বেগ-শূন্য হৃদয়ে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, এখানেও সেই রামচন্দ্র। তাঁহার হৃদয় তেমনই নির্ভীক, তেমনই চিন্তা মাত্র বিরহিত। নিশ্চিন্তের ন্যায় অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, ভগবন্, "এ যে রমণী ?" (৫) রামচন্দ্রের উত্তরে কুশধ্বজ বিস্মিত, রাক্ষসদূত স্তম্ভিত হইলেন। উর্ম্মিলা সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দিদি, শুন্‌লেন, ইনি কি বল্লেন, শুন্‌লেন।"

এতক্ষণের পর আমরা মহাকবির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। একটী মাত্র কথায় আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাঁর রামচন্দ্র, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, সকল অবস্থাতেই অটল। যিনি অক্ষুণ্ণচিত্তে অবনত মস্তকে নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, হৃৎপিণ্ড দলিত করিয়া প্রাণের অধিক ধন সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, সেই রামচন্দ্রের পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইলাম। তাড়কা রামচন্দ্রের শরাঘাতে নিহতা হইল। রাক্ষস-দূত ব্যথিত হৃদয়ে প্রভুর অভিনব পরাজয় অনুভব করিয়া, কুশধ্বজ ও বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের অভিপ্রায় কি ? বিশ্বামিত্র সেই অবসরে রামচন্দ্রকে তাড়কা বধের পুরস্কার স্বরূপ

(৩) লক্ষ্মণ। আর্য্য! আর্য্য! কিং নপশ্যসি নিশাচর পতির্দ্দেবী মিমাং প্রার্থয়তে।

(৪) সাধারণ্যান্নিরাতঙ্কঃ কন্যা মন্যোঽপি যাপতে। কিং পুনর্জ্জগতাং জেতা প্রপৌত্র পরমেষ্ঠিনঃ।

(৫) রাম। ভগবন্, স্ত্রীমষীয়ঃ।

সমস্ত্রক জৃম্ভকাস্ত্র সমূহ প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, রাক্ষস-দূতকে আর অধিকক্ষণ আশ্বস্ত করিয়া রাখা অনাবশ্যক। তাঁহার আদেশ ক্রমে সীতা-বিবাহের পণ স্বরূপ হরধনু আনীত হইল। রামচন্দ্র অবলীলা ক্রমে তাহা দ্বিখণ্ডিত করিলেন। রাক্ষস-দূতের সমক্ষেই কুশধ্বজ সীতাকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিও, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নীত্বে বৃতা হইলেন। এমন সময় তাড়কা-নন্দন মারীচ, সুবাহুকে সঙ্গে লইয়া বৈর নির্য্যাতন মানসে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাক্ষস-দূতও আর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া প্রভুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। এইরূপ বীর-চরিতের প্রথমাঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল।

ভবভূতি বীরচরিতের প্রথমাঙ্কে আদিকাণ্ডের প্রায় সমস্তই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বহুবর্ষের ঘটনা তাঁহাকে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে সীতার সহিত সাক্ষাৎ, অহল্যার শাপ-মুক্তি, তাড়কা বধ, হরধনুর্ভঙ্গ ও সুবাহু নিধন, সমস্তই একদিনের ঘটনা রূপে বর্ণন করিতে হইয়াছে। রাশীকৃত পদার্থ এক স্থানে সমাবেশ করিলে যেমন তাহা সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রক্ষা করা দুরূহ বোধ হয়, তেমনি তিনি উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত ঘটনা-রাশির সমবায়ে প্রস্তাবিত বিষয় জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। অঙ্কের আরম্ভেই আমরা দেখিতে পাই যে, বিশ্বামিত্রের পবিত্র আশ্রমে রামচন্দ্র ও সীতা পরস্পরকে সন্দর্শন করিলেন। সে আশ্রম অতি সুন্দর, কৈশিকী নদী তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ধীর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। নিরন্তর শ্যাম-শোভায় অলঙ্কৃত অরণ্যানী, তাহার প্রান্তভাগ হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। সেই রমণীয় স্থানে রাম ও সীতা পরস্পরকে সন্দর্শন করিলেন। উভয়ের সৌন্দর্য্যে উভয়ে বিমোহিত হইলেন। কিন্তু সেই অনুরাগ যাহাতে আরও বদ্ধমূল হইতে পারে, কবি তৎজন্য রামচন্দ্রের করুণার ও সর্ব্ব ভূতানুকম্পার নিদর্শন স্বরূপ, অহল্যার শাপ মুক্তির প্রচার করিলেন। কিন্তু কেবল করুণায় ত ক্ষত্রিয়তনয়ার হৃদয় মোহিত থাকিবার নয়, বীরদুহিতা, বীর পতিলাভের জন্যই অভিলাষিণী হইয়া থাকেন। হর কার্ম্মুক ভঙ্গ যাহার বিবাহের পণ স্বরূপ, যিনি জন্মাবধিই শুনিয়া আসিতেছিলেন যে, কোন অদ্বিতীয় বীর পুরুষ ভিন্ন অপর কেহই তাহার পাণি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না, তাহার হৃদয় যে বীরত্বের পক্ষপাতিনী হইবে, ইহাতো নিতান্তই যুক্তিসঙ্গত কথা। বীর বালিকা স্বভাবতই বীরত্বের অনুরাগিণী হইয়া থাকেন। মহাকবি সেই জন্যই সঙ্গে সঙ্গে তাড়কাবধ, জৃম্ভকাস্ত্র লাভ এবং সুবাহু পরাজয় এই কয়টী ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের কমনীয় আকৃতি দর্শনে সীতার হৃদয়ে প্রথমে যে অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল, অহল্যার মুক্তিলাভে তাহা বদ্ধমূল হইল এবং অবশেষে হরকার্ম্মুক ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। পাশ্চাত্য-কবিগণ, বীরত্বকেই স্ত্রীজাতির হৃদয় আকর্ষণ করিবার উপায় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। ভব-

ভূতিও এবিষয়ে তাঁহাদিগের সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে অনুরাগের উৎপত্তি বাহ্য সৌন্দর্য্যে, তাহা দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য মানসিক সৌন্দর্য্যেরও প্রয়োজন।

রামচন্দ্র ও সীতার যে প্রণয়, সুখ দুঃখ, শৈশব যৌবন, সকল অবস্থাতেই অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা এইরূপে সমুৎপন্ন হইল। মহাকবি, যে প্রেমের পরিণাম উত্তরচরিতে বর্ণন করিবেন বলিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, বীর-চরিতের প্রথমাঙ্কে এই রূপে তাহার সূত্রপাত করিয়া রাখিলেন। যে বিশাল আগার তিনি ভবিষ্যৎ কালে নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তিভূমি এই রূপে নির্ম্মিত হইল। এই বার আমরা বীরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্কের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভবভূতি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বীর-চরিত ও উত্তরচরিত প্রণয়ন করিলেও, সকল স্থলে বাল্মীকিকে অনুসরণ করেন নাই। বরঞ্চ স্থানে স্থানে তাহার প্রতিবাদই করিয়াছেন। বিশ্বামিত্রাশ্রমে রাম ও সীতার পরস্পরকে সন্দর্শন, সম্পূর্ণ রূপেই ভবভূতির নিজের সৃষ্টি। যাহা রামায়ণের বর্ষব্যাপিনী ঘটনা, তিনি তাহা একই দিনের কার্য্য বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বীরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্কে, তাঁহার স্বতন্ত্রতা এবং মৌলিকতা যেরূপ সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হইবে, তেমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বাল্মীকি স্বপ্রণীত গ্রন্থে রাক্ষসরাজ রাবণের মাতামহ মাল্যবানের নাম মাত্রই করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণের মাল্যবান একজন অতি সামান্য, নিম্নশ্রেণীর প্রকৃতি। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বস্তুর উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা সাধনে, তাঁহার প্রভুত্ব অতি অল্প। প্রভুর হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলীর ন্যায় তিনি তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী। প্রতিবাদ করিবার শক্তি নাই; কেবল অন্ধের ন্যায় অনুসরণই তাঁহার কার্য্য। কিন্তু বীরচরিতের মাল্যবান রামায়ণের মাল্যবান হইতে সম্পূর্ণ রূপেই স্বতন্ত্র। জামদগ্ন্যপরাভব, সীতাহরণ এবং লঙ্কাজয় এ সকল তাঁহার গূঢ় মন্ত্রণার ফল। তিনি এক জন প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ। রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ গণনায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কিন্তু রাবণের দুর্ভাগ্য ক্রমে, ও অদৃষ্টচক্রের অখণ্ডনীয় নিয়মে তাঁহার সমস্ত মন্ত্রণা নিষ্ফল হইল। বহু চিন্তায় ও বহু যত্নে তিনি প্রভুর মঙ্গলের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সকলই তাঁহার অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু কৃতকার্য্য না হইলেও মাল্যবান একজন রাজনীতিজ্ঞ। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরল উপায় অবলম্বন করিলে, হয়ত তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু কবে কোন্ রাজনীতিজ্ঞ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহজ উপায় গ্রহণ করিয়া থাকেন?

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, মাল্যবান চিন্তামগ্ন। সে চিন্তা রাজ্যের অমঙ্গল পরিহারের জন্য নয়, তাহা রামচন্দ্রের অলৌকিক প্রভাবাসহিষ্ণুতা হইতে উদ্ভূত। মাল্যবান ভাবিতেছিলেন;—

"দুরাদ্দবীয়ো ধরণীধরাভং
যস্তাড়কেয়ং তৃণবদ্ব্যধূনোৎ

হত্বা সুবাহোরপি তারকারিঃ
সরাজপুত্রোঽস্মদিবাধতে মে।”

ক্ষত্রিয়কুমারের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, পর্ব্বতের ন্যায় সেই তাড়কাপুত্রকে একটা তৃণের মত দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার কথা ভাবিতে গেলেও আমার হৃদয় যেন ব্যথিত হয়ে যায়।

মাল্যবান একজন রাজনীতিজ্ঞ। কবে কোন্ রাজনীতিজ্ঞ অকুণ্ঠিত চিত্তে শত্রুর প্রভাব সহ্য করিতে পারে? তিনি শত্রুর বল বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আপনাদিগের তেজের হ্রাস আশঙ্কা করিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন যে, বিশ্বামিত্র অমোঘ দিব্যাস্ত্র সমূহ রামচন্দ্রকে দান করিয়াছেন। প্রবল পরাক্রান্ত সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। দেবতারাও রামচন্দ্রের পক্ষপাতী। তাঁহারা ও দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা আপনাদিগের অনুকূলতা প্রকাশ করিয়াছেন। এ সকলই ত চিন্তার কথা “সর্ব্বং প্রায়ো ভজতি বিকৃতিং ভিদ্যমানে প্রতাপে” দুঃখের দিন আসিলে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়।

মাল্যবান ভাবিতেছিলেন, তবেত আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়। এমন সময় সূর্পনখা আসিয়া বলিল, “ঠাকুদ্দাদা, আর দেখেন কি? রামসীতার বিবাহ হয়ে গিয়েছে, আবার অগস্ত্য ঋষি, সেই ইন্দ্রের ধনুখানাও রামের জন্য পাঠিয়ে দেছেন।” মাল্যবান দেখিলেন যে, বিবাদ আরও ঘনীভূত। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুলিও ক্রমে ক্রমে রামের নিকট একত্রিত হইতেছে। তবে এই সময় হইতেই রামকে দমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু হঠাৎ স্বয়ং রামের সহিত প্রতিযোগীতা না করিয়া শত্রুর দ্বারা শত্রু নিরস্ত করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। কিন্তু জগতে রামচন্দ্রের প্রতিযোগী যোদ্ধা কোথায়? শেষে মাতামহ দৌহিত্রী, উভয়ে অনেক পরামর্শের পর স্থির করিলেন যে, জামদগ্ন্যই জগতের মধ্যে রামচন্দ্রের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। যদি কোন কারণে তাঁহাকে রামের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে আর বড় উদ্বেগের বিষয় থাকে না। সে কারণেরও বড় অভাব ছিল না। রামচন্দ্র হরধনুর্ভঙ্গ করিয়াছিলেন। কবে কোন্ ভক্তিপরায়ণ শিষ্য গুরুর অপমান সহ্য করিতে পারে? শেষ পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, হরধনুর্ভঙ্গ লইয়া রামচন্দ্র ও জামদগ্ন্যের সঙ্গে বিবাদ উত্থাপন করাইতে হইবে। উভয়ে সেই উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র দ্বীপে জামদগ্ন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য পরিসমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য অতি গম্ভীর ও অতি কঠোর। ইহার নায়ক রামচন্দ্র ও ভগবান ভার্গব। একদিকে যেমনই কারুণ্য ও কোমলতার প্রাধান্য, অন্য দিকে তেমনই ভীষণ কর্কশ স্বভাবের পরাকাষ্ঠা। পাঠ করিলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ?

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব প্রপঞ্চের অন্তরালে যে এক অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তি বিদ্যমান, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। প্রচলিত ধর্ম্মমত সকলের সমুদায় সত্য যাঁহারা উড়াইয়া দিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি ও স্বরূপকে যাঁহারা মানবের অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মহাশক্তির বিদ্যমানতা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের *Nineteenth Century* নামক মাসিক পত্রিকাতে হার্বার্ট স্পেনসার এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহার উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"There is an Infinite and Eternal Energy from which every thing proceeds."

"অর্থ—জগত মধ্যে এক অনন্ত ও অবিনাশী শক্তি আছে, যাহা হইতে চরাচর বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে।" জন ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার প্রণীত Three Essays on Religion নামক গ্রন্থে প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেনঃ—

"It would seem then that, in the only sense in which experience supports in any shape the doctrine of a First Cause—viz, as the primœval and universal element in all causes, the First Cause can be no other than Force"—Mill's Essay on Theism.

অর্থ।—"কারণ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে এবং কারণ শব্দের অর্থ আমরা যাহা বুঝিয়াছি, অর্থাৎ সমুদায় কারণের আদি ও সর্ব্বব্যাপী কারণ রূপে যাহা বিদ্যমান, সেই অর্থে, শক্তি ভিন্ন আর কিছুকেই কারণ বলিতে পারা যায় না।"

উক্ত উভয় পণ্ডিতের মতেই এক অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তি হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে। কেবল তাহাও নহে, এই আদ্যাশক্তি, এক, অনন্ত ও অবিনাশী। প্রথম প্রশ্ন এই—এই শক্তি যে এক, তাহার প্রমাণ কি? কে বলিল, এই ব্রহ্মাণ্ড দুই বা তদধিক শক্তির সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় নাই? ইহার উত্তর জন ষ্টুয়ার্ট মিল উক্ত গ্রন্থে দিয়াছেন।

"The force itself is essentially one and the same; and there exists of it in nature a fixed quantity, which is never increased or diminished."

অর্থ—"এই শক্তি মূলে এক ও অভিন্ন, এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আছে, যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই।"

এই শক্তি এক ও অক্ষয় এবং ইহা হইতেই বিশ্বের সকল কার্য্য হইতেছে, সুতরাং ইহা সর্ব্বব্যাপী। তবে এই মহা পণ্ডিতদিগের সাহায্যে আমরা এই টুকু সত্যে উপনীত হইতেছি যে বিশ্বের অন্তরালে এক মহাশক্তি বিদ্যমান, যাহা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, অবিনাশী ও অনন্ত।

কিন্তু এই শক্তির প্রকৃতি কি? মিলের কথার ভাবে বোধ হয়, তিনি এই শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে জড়শক্তি বলিয়া অনুভব করেন; যেমন তাড়িত বা ম্যাগনেটিজ্‌ম্, শক্তি বটে, কিন্তু অন্ধ জড়শক্তি মাত্র, সেই রূপ এই আদি শক্তিও অন্ধ জড় শক্তিমাত্র। স্পেনসার বলেন, এই শক্তির স্বরূপ অপরিজ্ঞেয়, অথচ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত মাসিক পত্রিকার পরবর্ত্তী এক সংখ্যায়

স্বীকার করিয়াছেন যে, মানবচৈতন্যেও এই শক্তির প্রকাশ—"it wells up in consciousness"—"এই শক্তি মানবের চিৎ-শক্তি মধ্যে উৎসারিত হইতেছে"। আরও একস্থানে বলিয়াছেন—"Some thing more than consciousness" অর্থাৎ চিৎ-শক্তি বলিলে আমরা যাহা বুঝি, এই শক্তি তাহা অপেক্ষা হীন নহে, কিন্তু তাহা অ-পেক্ষা অধিক।

এখন একবার বিচার করিতে হইবে যে, এই আদ্যাশক্তির বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু জানিতে পারা যায় কি না? স্পেনসারের যে উক্তিটী সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, চরাচর বিশ্ব এই মহাশক্তি হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই মহাশক্তি সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু ইহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তিল হইতে যেমন তৈল নিঃসৃত হয়, জল হইতে যেরূপ বাষ্প নিঃসৃত হয়, সেইরূপ জগৎ এই শক্তিরই বিবর্ত্তিত স্বরূপ মাত্র। এখন প্রশ্ন এই, মানবের চিৎশক্তি কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? মানবাত্মা কি আশ্চর্য্য বস্তু! কি গভীর প্রহেলিকা! এই অদ্ভুত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন চৈতন্য কোথা হইতে সৃষ্টি-রাজ্যে দেখা দিল? আবার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই জগতের অবস্থা এক কালে উষ্ণ বাষ্পাকার ছিল এবং তখন সেই উষ্ণ বাষ্পরাশির মধ্যে মানব চৈতন্য দূরে থাকুক, কোন প্রকার জীবাঙ্কুরেরও থাকা সম্ভব ছিল না। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের এক স্থলে মিল বলিয়াছেন:—"There is a vast amount of evidence that the state of our planet was once such as to be incompatible with animal life, and that human life is of very much more modern than animal life"—Essay on Theism.

অর্থ।—"ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে যে, আমাদের এই পৃথিবীর অবস্থা এককালে এমন ছিল যে, ইহা কোন জীবের জীবন রক্ষার উপযোগী ছিলনা, এবং মানব জীবন অপর জীবনের অনেক পরে উদ্ভূত হইয়াছে।"

Encyclopedea Britanica নামক গ্রন্থে সুবিখ্যাত Huxley হাক্‌সলি সাহেব (Biology) অর্থাৎ জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার একস্থানে বলিয়াছেন;—

"The condition of the globe was at one time such, that living matter could not have existed in it, life being entirely incompatible with the gaseous state."—

অর্থ।—"পৃথিবীর অবস্থা এককালে এরূপ ছিল, তখন কোন জীবিত প্রাণীর ইহাতে বাস করা অসম্ভব ছিল; কারণ বাষ্পাবস্থায় ইহা কোন প্রকার জীবের স্থিতির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল।"

তবেই দেখা যাইতেছে, এই ধরণী এক কালে তরল উষ্ণ বাষ্পময় ও জীবন ধারণের অনুপযোগী ছিল, তখন ইহাতে বিচিত্র শক্তিময় মানবাত্মা দূরে থাকুক, জীবের জীবনও ছিল না। ধরাধামে জীবন ছিল না, জীবন আসিয়াছে; কোথা হইতে আসিয়াছে? এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উত্তর—জীবন জড়েরই পরিণতি মাত্র; দ্বিতীয় উত্তর—ইহা কোন চেতনময় পুরুষ হইতে সংক্রান্ত। দেখা যাউক, প্রথম উত্তরটী কতদূর যুক্তি-যুক্ত, ইহা সপ্রমাণ হয় কি না? যদি বলা হয়, জড় হইতেই জীবনের উৎপত্তি, তাহা

হইলে এই বলা হইল, অচেতন শক্তি চেতনকে প্রসব করিয়াছে। ইহা কিরূপে হইল? পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে হাক্‌সলি (Huxley) বলিয়াছেন;—

"The properties of living matter distinguish it absolutely from all other kinds of things; and the *present state of knowledge furnishes us with no link between the living and the not-living.*"

অর্থ।—"সজীব পদার্থের গুণাবলী তাহাকে অপর সমুদায় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার করিয়াছে; আমাদের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থাতে, কিরূপে যে জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হইল, তাহা আমরা জানি না।"

উক্ত প্রবন্ধের আর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন;—

"Of the causes which have led to the origination of living matter, it may be said, that we know absolutely nothing."

অর্থ।—"কি প্রণালীতে এ জগতে সজীব প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, আমরা কিছুই জানি না।"

তবুও যদি পাঠক মহাশয় বলেন যে, জড় হইতেই চৈতন্য উৎপত্তি হইয়াছে, তবে বিবর্ত্তবাদের একটী মূল নিয়ম স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সেটী আমাদের দেশে ন্যায় শাস্ত্রে অবলম্বিত হইয়াছে। নিয়মটী এই; কার্য্যের গুণাবলী কারণের গুণাবলীর অনুসারী হইয়া থাকে। মনে করুন, জল, তেজ, প্রভৃতি পদার্থের সমবায়ে বাষ্পের উৎপত্তি হইয়াছে। বাষ্পে এমন কিছু থাকিতে পারে না, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ সকলে কোন না কোন আকারে বিদ্যমান ছিল না। এই যুক্তির অনুসারে এক জন প্রশ্ন করিতে পারেন যে, চৈতন্য যদি কোন আকারে সেই আদি শক্তিতে বিদ্যমান ছিল না, তবে কোথা হইতে সৃষ্টি মধ্যে আবির্ভূত হইল? জনষ্টুয়ার্ট মিল ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, অতি কদর্য্য মৃত্তিকা হইতে যেমন চমৎকার উদ্ভিদ ও পুষ্পাদি উৎপন্ন হয়, সেই রূপ স্থূল জড় হইতে সূক্ষ্ম চেতন উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে বিচিত্র কি? ফুল মৃত্তিকার পরিণতি কিন্তু কোথায় মলিন মৃত্তিকা আর কোথায় নির্ম্মল ফুল, সেইরূপ জড় হইতে বিষদৃশ পদার্থ যে চেতন, তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। মিল মহাশয়ের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে আমাদিগকে নিরুত্তর করিতে পারিতেছে না। আমরা জিজ্ঞাসা করিব, ফুলের মধ্যে এমন কি গুণ আছে, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ পরম্পরার মধ্যে অবস্থিত ছিল না? পুষ্পের নয়ন-তৃপ্তিকর বর্ণ সূর্য্য-রশ্মিতে ছিল, কোমলতা জলীয় পরমাণুতে বিদ্যমান ছিল, সুগন্ধ পৃথিবীতে ছিল। সেই রূপ কি এই কথা বলিবে যে, মানবাত্মার চিৎশক্তি সেই আদি কারণভূত মহাশক্তি মধ্যে বর্ত্তমান ছিল? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, কার্য্যের গুণ যে, সকল স্থানেই কারণের গুণানুসারী হয়, তাহা নহে। চুণ ও হরিদ্রা, এই উভয়ের কেহই লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট নহে, অথচ উভয়ের সংযোগে রক্ত বর্ণের আবির্ভাব হয়। অথবা দশ খানি দ্রব্য মিলাইয়া ঔষধ প্রস্তুত হইল, তাহাদের কোন একটীর পিত্তঘ্নতা নাই কিন্তু দশখানি মিলিত হইলে পিত্তঘ্নতা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে যেমন দেখিতেছি যে, কার্য্যে এমন গুণের আবির্ভাব হইতেছে যাহা কারণীভূত পদার্থ নিচয়ের

মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না; সেই রূপ কেন বল না যে, চৈতন্য এই দেহের নিদানভূত ধাতু সকলের মধ্যে কোন একটীতে ব্যষ্টি-ভাবে না থাকিলেও সমষ্টিভাবে তাহাদের সংযোগ-সিদ্ধ দেহ-পিণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছে? ইহা উপমা মাত্র হইল, প্রমাণ হইল না। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা এই মাত্র বলা হইল যে, যে প্রণালীতে চূণ হরিদ্রার সংযোগে লোহিত বর্ণের উৎপত্তি, সেই রূপ কোন প্রণালীতে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ইহাকে প্রমাণ বলে না। মনে কর, যে ব্যক্তি সেই লোহিত বর্ণ পদার্থটী দেখিয়া বলিতেছে যে, ইহা চূণ ও হরিদ্রার সংযোগে সমুৎপন্ন, সে তাহা নানা প্রকারে প্রমাণ করিতে পারে। (১ম) সেই সংযোগ-জাত পদার্থটীকে রসায়ন বিদ্যা প্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া চূণ ও হরিদ্রা স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইতে পারে (২) সে চূণ ও হরিদ্রাকে মিশ্রিত করিয়া সেই যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে পারে (৩য়) সে চূণ ও হরিদ্রা উভয়ের মধ্যে এমন গুণ সকল আবিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারে, যাহার সংমিশ্রণে লোহিত বর্ণ হইবার কথা। যিনি বলিতেছেন যে, জড় হইতেই চৈতন্যের আবির্ভাব, তাঁহার নিকটে আমরা এরূপ কোন প্রমাণ চাই; কারণ যে মাত্র তিনি বলিলেন যে, ইহাতে জড়ের অতিরিক্ত কিছু নাই, তদ্দণ্ডেই তাঁহার উপর আমাদের এই দাওয়া জন্মিল যে, আমরা তাঁহার নিকট অপর জড় পদার্থের পরীক্ষার প্রমাণের ন্যায় প্রমাণ চাহিব। সেরূপ প্রমাণ না দিতে পারিলে তাঁহার উক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। তিনি হয় জড়কে অবলম্বন করিয়া চেতন উৎপন্ন করুন, (২য়) না হয় চেতনকে বিশ্লেষণ করিয়া জড়কে প্রদর্শন করুন (৩য়) না হয় রসায়ন বিদ্যার প্রভাবে বলিয়া দিন, দেহের কোন কোন ধাতুকে কি কি পরিমাণে সংযুক্ত করিলে চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে। ইহার কোন প্রমাণ তিনি যদি দিতে না পারেন, তবে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি, দম্ভপূর্ব্বক একথা প্রচার না করিয়া হাক্সলির ন্যায় বিনয়ের সহিত বলুন;—"কিরূপে জড় হইতে চৈতন্যের উদ্ভব হইল, তাহার কিছুই জানি না; তবে বোধ হয় যে প্রণালীতে চূণ হরিদ্রার সংমিশ্রণে লোহিত বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন প্রণালীতে হইয়া থাকিবে।" ভবিতব্যতার অনেক দ্বার; এরূপ হইতে পারে, আর এক প্রকারও হইতে পারে। "এরূপ হইলেও হইতে পারে" এ প্রকার মনের ভাবকে প্রমাণ কহে না। অতএব জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি—একথা অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই।

জড় হইতে চেতন একথা যদি প্রমাণিত হইল না, তখন চেতন হইতে চেতন একথাই অধিক বিশ্বাস্য। কারণ কার্য্য-গুণ কারণ-গুণের অনুসারী হয়। এতদ্দ্বারাও হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সেই আদ্যাশক্তি চিন্ময়ী। এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্য-বর্ত্তিনী শক্তি চিন্ময়ী, ইহার অর্থ এই যে, এই সৃষ্টি যেরূপেই উৎপন্ন হউক না কেন, সজ্ঞানে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ সেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এই পরাশক্তির জ্ঞানের অন্তর্গত ছিল। আরও বহুতর প্রমাণ দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, এই বিশ্বের অন্তরালে যিনিই থাকুন, চিৎশক্তি ও জ্ঞানক্রিয়া তাঁহার ধর্ম্ম। উপনিষদ কহিয়াছেন;—

পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভা-

বিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ"। ইহাঁর শক্তি মহৎ ও বিচিত্র এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বাভাবিক '

শিশুর স্তন-পানরূপ ক্রিয়াটীর বিষয় এক বার ভাবিয়া দেখা যাউক। এ ক্রিয়াটী কেমন আশ্চর্য্য!!! এতদ্দ্বারা একটী সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে অথচ সে বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান নাই, আবার কিরূপে সে ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন করিতে হইবে, তাহার উপদেশ নাই; অথচ সুচারুরূপে সেই ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন হইতেছে। এই ক্রিয়াটী অন্যান্য ক্রিয়া হইতে কিরূপ বিভিন্ন! শিশুর জ্ঞান নাই, অভ্যাস নাই, শিক্ষা নাই, উপদেশ নাই, অথচ এমন একটী ক্রিয়া করিতেছে, যদ্দ্বারা একটী সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, সেই উদ্দেশ্য জ্ঞান ও সেই মঙ্গল অভিসন্ধি ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই মহাশক্তিতেই আছে? মানব শিশুতে যেমন জ্ঞান নাই, অথচ আশ্চর্য্য জ্ঞান ক্রিয়া দৃষ্ট হইতেছে, পশু পক্ষীর ক্রিয়াবলী লক্ষ্য করিলেও এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা এমন সকল কার্য্য করে, যাহার তাৎপর্য্য তাহারা জানে না, এবং কোন বুদ্ধিমান জীব করিলে তাহার আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির ভূয়সী প্রসংশা করিতে হয়, অথচ তন্মূলে তাহাদের বিচার শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষিদিগের কুলায় নির্ম্মাণ, মধুমক্ষিকার মধু সঞ্চয়, বোলতা প্রভৃতির খাদ্যাহরণ কার্য্য এই শ্রেণী গণ্য। ভেকদিগের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া এই সকল স্বাভাবিক ক্রিয়ার অনেক আশ্চর্য্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভেককে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেই দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় মস্তক বিহীন শরীরার্দ্ধ—যখন পড়িয়া আছে, তখন তাহার এক খানি পায়ে যদি এক বিন্দু এসিড্ ফেলিয়া দেওয়া যায়, তখন আর এক খানি পা দিয়া সেই এসিড্ বিন্দু মুছিবার জন্য বার বার প্রয়াস পাইতে থাকে। এই ক্রিয়ার প্রকৃতি কি আশ্চর্য্য! এ কার্য্যে যে তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহার প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এখানেও দেখিতেছি, অজ্ঞতা সহকারে এমন একটী কার্য্য হইতেছে, যাহার মধ্যে একটী মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত। ইহা দেখিয়া পাঠকগণ কি বলিবেন? যে জ্ঞান ভেকে নাই অথচ কার্য্যে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, সে জ্ঞান কোথায়? শুনুন এক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জর্জ মিভার্ট এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন? বিগত এপ্রিল* মাসের Fortnightly Review পত্রিকাতে তিনি লিখিয়াছেন:—"For myself I am bound humbly to confess that the more I study nature, the more I am convinced that in the action of this all-pervading but inscrutable and unimaginable intelligence, of which self conscious human rationality is the utterly inadequate image attainable by us, is to be sought the possible explanation of the mysterious but undeniable presence in Nature of a rationality in that which is in itself irational."

অর্থ—"আমার কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার নিকট আমি বিনয় সহকারে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমি যতই প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিতেছি, ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে, সেই সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় পরম জ্ঞানকে—আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন মানবীয়

জ্ঞান যাহার ছায়ামাত্র,—অথচ (এই নানা জ্ঞান ভিন্ন সে জ্ঞানের অন্য প্রতিকৃতি আমাদের পাইবার উপায় নাই) স্বীকার করা ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে বিচার বিহীন ও জ্ঞান বিবর্জ্জিত প্রাণিতে জ্ঞান ক্রিয়া দর্শনরূপ অত্যাশ্চর্য্য সমস্যার সদুত্তর হইবার উপায়ান্তর নাই।"

সেই আদ্যা শক্তি যে জ্ঞানশালিনী, আর একটী যুক্তির দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়—তাহা সৃষ্টিকৌশল দর্শনে স্রষ্টার জ্ঞানের পরিচয়। এ বিষয়ে আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত গ্রন্থে ও এই পত্রিকারই প্রবন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি সে সকল দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করিয়া পাঠকগণের সময় নষ্ট করিব না। তবে এ বিষয়ে দুই একটী বড় লোকের মত উদ্ধৃত করিয়া নিবৃত্ত হইব। সুবিখ্যাত ডারুইন সাহেবের Fertilization of Orchids নামক একখানি গ্রন্থ আছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া একটী কথা বলিয়াছেন। সে ঘটনাটী এই;—পতঙ্গগণ যখন মধুপান করিবার জন্য পুষ্পে আসে, তখন দেখা যায় যে [illegible] গঠনের মধ্যে এমন চাতুরী [illegible] হারা সহসা মধুপান করিতে [illegible]র নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব [illegible] তাহাদের চরণস্থ পরাগরেণু [illegible]হিত মিলিয়া যায়। মধুপানে যে [illegible], তাহার উল্লেখ করিয়া ডারুইন [illegible]ছেন;—"If this is accidental, it [illegible]ortunate accident for the plant. If this be not accidental, *and I cannot believe it to be accidental*, what a Singular case of adaptation!"

অর্থ।—"এই ঘটনাকে যদি আকস্মিক বল তবে ইহা এমন আকস্মিক যাহা উক্ত পুষ্পের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি আকস্মিক না হয়—আমি ইহাকে আকস্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না—তাহা হইলে ইহাতে কি আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে!"

জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন;—

"I think it must be allowed that in the present state of our knowledge, the adaptations in Nature afford a large balance of probability in favour of creation by intelligence."

অর্থ।—"আমার বোধ হয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া, ইহা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, জ্ঞানদ্বারাই এই সৃষ্টি হইয়াছে।"

বিশ্বের আদি কারণে যে কেবল জ্ঞান আছে তাহা নহে, তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বশক্তি অথবা ক্রিয়েচ্ছাও আছে। ইহার প্রথম যুক্তি এই যে, আমাদের আত্ম নিহিত ক্রিয়েচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন শক্তির জ্ঞান আমাদের নাই। এবিষয়ে একটী প্রশ্ন আছে; আমরা জগতের কার্য্য পরম্পরা দেখিয়া যে শক্তির অনুমান করিতেছি, সে শক্তি-জ্ঞানের মূল কোথায়? যদি কোন স্থানে কার্য্যের পশ্চাতে, গতির অন্তরালে, চেষ্টার প্রারম্ভে শক্তিকে বিদ্যমান না দেখিয়া থাকি, তবে আর একস্থলে কার্য্য বা গতিকে দেখিয়া শক্তির চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইবে কেন? তাহা কি স্বাভাবিক? মনে কর, এক ব্যক্তি জীবনের মধ্যে একটী দিনও অগ্নি হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখে নাই, সে কি এক দিন পর্ব্বত পৃষ্ঠে হঠাৎ ধূমের সঞ্চার দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতে পারে? পর্ব্বতে ধূম আছে,

অতএব বহ্নিও আছে, ইহা যে ব্যক্তি বলিতেছে, সে ইহাও সেই সঙ্গে বলিতেছে যে, সে জানে ধূম বহ্নি হইতেই নির্গত হয়। অর্থাৎ ধূমের পশ্চাতে বহ্নি থাকে। সেইরূপ যে ব্যক্তি কখনও দেখে নাই যে, শক্তি হইতে গতির উৎপত্তি হয়, সে কি ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তনশীল ঘটনারাজি দেখিয়া শক্তির অনুমান করিতে পারে? তবেই এক ব্যক্তি যখন এই বিশ্বের কার্য্য সকল দেখিয়া বলিতেছে যে, ইহা নিশ্চয়ই এক মহাশক্তি হইতে উৎপন্ন, সে সেই সঙ্গে ইহাও বলিতেছে যে, সে নিজে শক্তি হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছে। সে কোথায় ইহা দেখিল? এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক্তির প্রথম পরিচয় আমাদের অন্তরে। আমরা যখন অঙ্গ সঞ্চালন করি, যখন কোন দৈহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করি, তখন আমরা কোন্ জাতীয় শক্তির পরিচয় পাই? আমরা হস্ত দ্বারা একটী ভারি বস্তু স্থানান্তরে রাখিতেছি, এখানে সেই কার্য্যের প্রেরক কে? হস্তের মাংসপেশী সমুদায় অথবা তদন্তরালবর্ত্তী আর কোন ও শক্তি? এমন অবিবেচক কে আছে যে বলিবে যে, মাংসপেশী সকল সেই কার্য্যের প্রেরক। সেখানে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের ইচ্ছাই কার্য্যের প্রেরক। সেই ইচ্ছারূপিনী শক্তিই হস্তকে প্রেরণ করিতেছে এবং তাহা হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের শক্তি-জ্ঞানের মূল এই খানে। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে শক্তির অনুমান করিতেছি, তাহা এই শক্তি-জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। স্পেনসারও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রণীত First Principles নামক গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন;—"No force save that, of which we are conscious during our own muscular efforts is immediately known to us" while "all other force is mediately known."

অর্থ।—"আমাদের অঙ্গচালনা কালে আমরা যে শক্তি অনুভব করি, তদ্ব্যতীত অন্য কোন শক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞান আমাদের নাই, এতদ্ভিন্ন যে কোন শক্তির জ্ঞান আছে, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে কিন্তু অনুমান-লব্ধ জ্ঞান মাত্র।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমরা যাহাকে শক্তি বলি, তাহার মূলে মানসিক বলেরই জ্ঞান। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে এক মহাশক্তি বিদ্যমান—এই সত্য উচ্চারণ করিলে আমরা যদি তাহা মনে ধারণ করিতে যাই, তাহা হইলে সেই শক্তিকে ক্রিয়েচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বলরূপে ধারণা করিতে পারি না। অতএব যে যুক্তি আমাদিগকে এই মহাশক্তির সত্তাতে উপনীত করে, সেই যুক্তিই আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, এই শক্তি মানসিক শক্তি বা ক্রিয়েচ্ছা (will)।

দ্বিতীয় যুক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আমাদিগের শারীরিক ক্রিয়া গুলির বিষয় এক বার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

একটু মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলেই মানবদেহে চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। (১ম) ইচ্ছা প্রসূত ক্রিয়া, (২য়) স্বভাবজাত ক্রিয়া (৩য়) অভ্যাস জাত-ক্রিয়া (৪র্থ) ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়া।

(১ম) বিশেষ ফল প্রাপ্তির উদ্দেশে জ্ঞান সহকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে ক্রিয়া করা যায়, তাহা ইচ্ছাপ্রসূত ক্রিয়া—যেমন একটী প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপ তুলিবার জন্য হস্ত

প্রসারণ করি। ইহাতে আমাদের সুখস্পৃহা উত্তেজক, জ্ঞান পথপ্রদর্শক, ও প্রবৃত্তি কার্য্যের পরিচালক।

(২য়) এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহা মানব কখনও শিক্ষা করে নাই, কিরূপে করিতে হয় তাহার উপদেশ পায় নাই, অথচ বিশেষ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য স্বভাবতই তাহা করে—তাহা স্বভাবজাত ক্রিয়া; যথা, শিশুর স্তন পান। স্তন পানরূপ ক্রিয়াটীতে বিশেষ কৌশল আছে। যেরূপে টানিলে দুগ্ধ পাওয়া যায়, সেরূপ করিয়া টানা এক জন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে দুষ্কর, অথচ শিশু জননীর গর্ভ হইতে পড়িয়াই, বিনা শিক্ষায় ও বিনা উপদেশে সুন্দররূপে জননীর চুচুক মুখে লইয়া টানিয়া থাকে। ইহা পুষ্প চয়নার্থ হস্ত প্রসারণের ন্যায় জ্ঞান বুদ্ধি বিচার পূর্ব্বক ক্রিয়া নয়, অথচ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ন্যায় ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়াও নয়। ইহাতে ইচ্ছার যোগ আছে অথচ জ্ঞানের যোগ নাই।

(৩য়) আর এক প্রকার ক্রিয়া, যাহার মূলে এক সময়ে ইচ্ছা ও জ্ঞানের যোগ ছিল, কিন্তু অভ্যাস বশত সে যোগ আর এখন লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। তাহা অভ্যাস জাত ক্রিয়া। যথা গমনার্থ পদবিক্ষেপ। আমরা গমনার্থে পদবিক্ষেপ করি, কিন্তু প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি আমাদের জ্ঞান থাকে যে, পদবিক্ষেপ করিতেছি, এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান দেখা যায়? তাহা যায় না। আমাদের দৃষ্টি আকাশের নক্ষত্রে রহিয়াছে, আমাদের মন কোন নিগূঢ় প্রশ্নের সমস্যাতে বিব্রত রহিয়াছে, অথচ আমরা যাইতেছি, পদদ্বয় উঠিতেছে ও পড়িতছে, গতিক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। যেন কলে কার্য্য চলিতেছে। এক সময়ে মনের কর্ত্তৃত্ব ছিল, এক সময়ে মনকে ভাবিতে হইয়াছিল, কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কত ফিকির ফন্দী করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেই ক্রিয়া, কলের ক্রিয়ার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। একটী শিশু যখন প্রথম দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে চেষ্টা করে, সেই সময়ের বিষয় একবার চিন্তা কর; তাহাকে কত পরিশ্রম ও কত চেষ্টা করিয়া হাঁটিতে হয়, কিন্তু অভ্যাস বশত সেই ক্রিয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। এরূপ শুনাও গিয়াছে যে, কোন কোন লোক হাঁটিতে হাঁটিতে ঘুমাইয়া থাকে।

(৪র্থ) যে শারীরিক ক্রিয়া আমাদের জ্ঞান বা ইচ্ছা নিরপেক্ষ হইয়া চলিতেছে, আমাদের ঘোর সুষুপ্তির অবস্থাতেও চলিয়া থাকে, তাহা চতুর্থ শ্রেণী গণ্য। যথা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, পাকস্থলীর ক্রিয়া, রক্তস্রোতের গতিবিধি ইত্যাদি। এ সকল ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার বহির্ভূত।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ ক্রিয়াতেই আমরা কর্ত্তৃত্বশক্তি অথবা ক্রিয়েচ্ছার বিদ্যমানতা দেখিতেছি। শিশু সন্তানের স্তনপান স্থলে, যদিও সে ক্রিয়া অজ্ঞতাসহকৃত ও স্বভাব-প্রণোদিত ক্রিয়া, তথাপি তন্মধ্যে শিশুর চেষ্টা সুতরাং তাহার কার্য্য-প্রবৃত্তিও আংশিকরূপে বিদ্যমান। সে মুখবিকাশ করিতেছে, হস্তদ্বয় প্রসারণ করিতেছে, স্তনদ্বয় ধরিতেছে, দুগ্ধ আকর্ষণ করিতেছে, এ সকল তাহার কার্য্য, সুতরাং এ সকলের অন্তরে তাহার ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্য-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেইরূপ অভ্যাসজনিত কার্য্য যেস্থলে হইতেছে, সেখানেও

অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্যভাবে ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন কেমন করিয়া সেই পথিক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়াও ঠিক পথে যাইতেছে, পথের বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিতেছে, গো, মহিষ, শকট প্রভৃতির পথ পরিহার করিতেছে, যেখানে যেখানে মোড় ফিরিতে হইবে তাহা ফিরেতেছে? এতদ্বারাই বোধ হয় যে,সে একটী চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন থাকিলেও অতি সূক্ষ্মরূপে তাহার দর্শন, শ্রবণ, বিচার প্রভৃতিও চলিয়াছে এবং তাহার ক্রিয়েচ্ছাও কার্য্য করিতেছে। এমন কি, নিদ্রিতাবস্থাতেও গমনের যে উল্লেখ করা হইয়াছে,সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও সূক্ষ্মরূপে ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার মধ্যেও অতি প্রচ্ছন্নভাবে পথের জ্ঞান রহিয়াছে, নতুবা সে ব্যক্তি বিপথে যাইতেছে না কেন? নিদ্রিতাবস্থাতে যে আমাদের এক প্রকার অন্তঃস্ফূর্ত্তি জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান থাকে, তাহার আরও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সর্ব্বদা দেখা যায় যে, রাত্রিকালে উঠিয়া যদি কোন স্থানে গমন করিবার কথা থাকে এবং এক ব্যক্তি সেই সংস্কার ও উৎকণ্ঠা লইয়া শয়ন করে, দেখিতে পাই, এক ঘুমের পর আপনা আপনি তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। ইহা কিরূপে হইল? নিদ্রার মধ্যেও তাহার মনে যদি বিচার ও বোধ শক্তি না থাকিবে, তবে সে কিরূপে ঠিক সময়ে জাগিল? এক বার এক খানি জাহাজ সমুদ্রে যাইতেছিল। যখন রাত্রি ১১ টা তখন তাহার কাপ্তেন নিদ্রা গেলেন, কিন্তু নিদ্রা যাইবার সময় দিঙ্‌নির্ণয় দ্বারা বুঝিলেন যে রাত্রি দুইটার পর জাহাজ খানি সমুদ্রের এক বিশেষ স্থানে উপস্থিত হইবে, সে সময়ে জাহাজের মুখ একটু ফিরাইয়া না দিলে একটা বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। ইহা দেখিয়া তিনি প্রহরীদিগকে দুইটার সময় তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া নিদ্রা গেলেন। ঘড়িতে ঠিক যখন দুইটা, প্রহরীগণ ডাকিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন শয্যাত্যাগ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং দেখেন যে ঠিক দুইটা বাজিয়াছে কিন্তু জাহাজ আশাতীত বেগের সহিত আসিয়াছে, এবং আর দশ মিনিট কাল তিনি নিদ্রিত থাকিলে সেই বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই বিপদ হইতে জাহাজ খানি বাঁচিয়া গেল। এখানেও দেখা গেল যে, গভীর নিদ্রার মধ্যেও বিচার ও বোধ শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিতেছিল।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে ত্রিবিধ ক্রিয়াস্থলে আমরা ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্যপ্রবৃত্তির বিদ্যমানতা দেখিতেছি, কেবল যে সকল ক্রিয়াকে ইচ্ছা-বহির্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, যথা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রভৃতি, তন্মধ্যেই মানবের ক্রিয়েচ্ছা দেখা যাইতেছে না। অথচ তদুপরি মানবের কর্তৃত্ব শক্তি না থাকার অতি গূঢ় শুভ উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে। যে সকল ক্রিয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক নহে, যাহার অকরণে হঠাৎ জীবননাশের সম্ভাবনা নাই সে, সকল কার্য্য মানবের ক্রিয়েচ্ছার অধীন রহিয়াছে,কিন্তু এই কতক গুলি ক্রিয়া মানব দেহেই হইতেছে, এবং যাহা মানবের জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক, ও যাহার অভাবে নিমেষ মধ্যে মানবের জীবননাশের সম্ভাবনা, সে গুলির উপরে মানবের কর্তৃত্ব নাই, তবে তদুপরি

কাহার কর্ত্তৃত্ব? ইহা কি মানবদেহের একটী আশ্চর্য্য তত্ত্ব নহে। এই বন্দোবস্তের প্রতি চিন্তাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিলে বিশ্বকারণে জ্ঞান, মঙ্গলভাব ও ক্রিয়েচ্ছা তিনেরই কি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না?

তৃতীয় দৃষ্টান্ত প্রসূতির প্রসব বেদনা। একজন দেহ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেই পাঠক মহাশয় জানিতে পারিবেন যে, গর্ব্ভিণীর যখন প্রসব কাল উপস্থিত হয়, তখন কিয়ৎ কাল পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার বেদনা বাড়িতে থাকে। অবশেষে প্রসব সময়ে গর্ব্ভিণী গর্ব্ভস্থ ভ্রূণদেহের নিষ্ক্রামণোপযোগী এক প্রকার বেগ দিতে থাকেন। তাহাকে কোঁতপাড়া বলে। সহজ শরীরে মলভাসাদির সময়ে কাহাকেও যদি সেইরূপ কোঁতপাড়িতে হয়, তাহাতে কত পরিশ্রম ও কত বল প্রয়োগ আবশ্যক হয়, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্য প্রবৃত্তি যদি কোথাও বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়, তবে উক্ত শ্রমজনক ক্রিয়ার মধ্যে। অথচ প্রসূতি যখন ঐরূপ কোঁত পাড়েন, তখন তদুপরি তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব শক্তি ও ক্রিয়েচ্ছার বহির্ভূত। যদি তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে ক্লোরোফারম করিয়া কিম্বা অন্য কোন উপায়ে হতচেতন করিয়া ফেলা যায়, তথাপি যথাকালে ঐ বেগ আপনি প্রকাশ পাইবে। এত বড় একটা বেগ ও বল প্রয়োগের কার্য্য হইতেছে, অথচ যে ব্যক্তির দ্বারা তাহা হইতেছে, তাহার সে বিষয়ে কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহাতে পাঠক মহাশয় কি বিবেচনা করেন? সে.শের কাহার ইচ্ছাতে হইতেছে .টী স্থলে ইহার সময় প্রসূতির উপ... করুন, এক ব্যক্তি কার্য্য করিবার ভার রাখিলে বিপদ ঘটিতে পারিত, এই জন্য বিশ্বকারণ আপনার হাতে সেই ভার রাখিয়াছেন, ইহা কি পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় না। ইহাও বিশ্বকারণে ক্রিয়েচ্ছা ও মঙ্গল ভাব বিদ্যমান থাকার অপর একটী প্রমাণ।

অতএব বিশ্বকারণে জ্ঞান আছে; এবং ক্রিয়েচ্ছা (will) আছে। কেবল তাহা নহে, প্রীতিও আছে। এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আসুন একবার চিন্তা করিয়া দেখি, প্রীতির সর্ব্ব প্রধান চিহ্ন কি? আমি সুখী হইলে যে সুখী হয় এবং আমাকে সুখী করিবার জন্য যে চেষ্টা করে, সেই আমাকে প্রীতি করে। ইহা সত্য কি না? যদি দেখি আমার কিছু লাভ হইয়াছে বলিয়া জগতের এত অসংখ্য মানবের মধ্যে দশটী লোক আনন্দ করিতেছে, এবং সেই দশজন যাহাতে আমার আরও লাভ হয় সেজন্য চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, সেই দশজন আমার মিত্র অর্থাৎ তাঁহারা আমাকে প্রীতি করেন। ইহা অতি সহজ কথা, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন পাঠক মহাশয় একটী সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল হস্তে লইয়া বিচার আরম্ভ করুন। যদি নিকটে গোলাপের বাগান থাকে, তবে বিশেষ অনুরোধ করি যে, ত্বরায় একটী গোলাপ তুলিয়া আবার এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আচ্ছা মনে করিয়া লই, তাঁহার হস্তে একটী গোলাপ রহিয়াছে। ঐ গোলাপটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। উহার পাপড়ীগুলি কেমন ..হার কে.. উহার গন্ধ কেমন চিত্তের আনন্দ করিতে প.. উহার বর্ণ কেমন মনোমোহন- মহত্ত্ব-জ্ঞান ..ন চিন্তা করুন, ঐ সুন্দর বর্ণ কেন

ঐ পুষ্পে ঢালা হইয়াছে? তাহার সুগন্ধ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, তাহা না থাকিলে ভ্রমর ইহার দিকে আকৃষ্ট হইত না এবং ভৃঙ্গ না আসিলে পরাগ-রেণু পড়িত না, ফল জন্মিত না। সুতরাং গন্ধের উল্লেখ করিলাম না। উহার বিচিত্র বর্ণ কেন দেওয়া হইল? সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন জীবের নাম কি পাঠক মহাশয় করিতে পারেন,গোলাপের ঐ সুন্দর বর্ণ না থাকিলে, যাহার জীবন ধারণের ব্যাঘাত হইত? আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, পশু পক্ষীদিগের কাহার ও প্রাণধারণ ঐ সুন্দর বর্ণের উপর নির্ভর করিতেছে না। উহার বর্ণ ওরূপ অত্যুজ্জ্বল ও সুন্দর না হইলে মধু লোভী ভৃঙ্গের আসিবার কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে উহাতে ওরূপ বিচিত্র বর্ণ ঢালা হইল কেন? উহার ও বিচিত্র বর্ণ না থাকিলে আমাদের প্রাণ ধারণের কোন ব্যাঘাত হইত কি না? কে বলিবেন যে, আমাদের প্রাণ ধারণের কোন ব্যাঘাত হইত? ইহার অভাবেও আমরা বাঁচিতাম, কিন্তু ইহা থাকাতে একটু সুখে বাঁচিতেছি; ইহা না থাকিলে একটু সুখের ব্যাঘাত হইত। তবে ত সৃষ্টির মূলে এরূপ দেখিতেছি যে, বিশ্ব কারণ এরূপ চাহিয়াছেন যে, আমরা যে কেবল কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকি তাহা নহে, কিন্তু বাঁচিয়া সুখে থাকি। এবং সেই জন্য আয়োজনও করিয়াছেন। প্রীতির পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ অনুসারে ইহা কি প্রীতি নহে? "কে গো তুমি বিশ্বের অন্তরালবাসী শক্তি, তুমি কেন চাও যে আমরা সুখে থাকি," ঐ গোলাপটী দেখিয়া পাঠক মহাশয়ের প্রাণ কি এরূপ [illegible]রা বুঝ [illegible] উঠিতেছে না? [illegible]াঙ্গ খানি

এরূপ আরও অনেক [illegible] হইবে, যাইতে পারে। অধিক বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। যে প্রীতি দেখিয়া বিশ্বকারণে প্রীতির অনুমান করিতেছি, সেই মানবপ্রীতির বিষয় একটু চিন্তা করা যাউক। মনে করুন, আমাদের প্রীতি যদি না থাকিত, কেবল স্বার্থ ও সুখাসক্তিই যদি আমাদের পরিচালক হইত, সংসারের অধিকাংশ কাজ অব্যাঘাতে চলিত কি না? বণিক স্বার্থের জন্য পণ্যদ্রব্য আনিত, আমি পেটের দায়ে কিনিতাম, পাচক বা পাচিকা স্বার্থের জন্য শ্রম করিত, আমার অন্ন পান ঘুচিয়া যাইত, এইরূপ চলিয়া যাইতেছে। পুরুষ সুখাশক্তির জন্য স্ত্রীলোককে চাহিত; স্ত্রীলোক সেই কারণে পুরুষের সঙ্গিনী হইত। ইহাতে কি প্রাণ রক্ষা ও সৃষ্টি রক্ষা হইত না? কিন্তু এই স্বার্থ ও সুখাসক্তির মধ্যে প্রেম নামে একটা পদার্থ কে ঢালিয়া দিল, দিয়া সমুদায়কে মধুময় করিল! আহা! প্রেম কি পদার্থ! কোন কবি কোথায় আছেন, যিনি এই স্বর্গীয় পদার্থের মহিমা অদ্যাপি বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? পাঠিকা ব্রাহ্মণী যে পয়সার লোভে খাটিতে আসিয়াছে, আমার প্রতি উহার স্নেহ ও ভালবাসা পড়ুক, অমনি উহার ঐ হস্তের শ্রম মিষ্ট হইয়া যাইবে, শ্রম করিয়া প্রাণ পরমাপ্যায়িত হইবে, আমি সুখে আহার করিলে ও ব্যক্তি স্বর্গ হাতে পাইবে, আমি সেই অন্নের সঙ্গে অমৃত আস্বাদন করিব। ধন্য প্রেম,তোমাকে ছোয়াইলে লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়। অনেক স্থলেই আমরা প্রেমের [illegible] [illegible]দিতে পারিতাম বটে, কিন্তু এমন [illegible]বের জীবননা[illegible] পারিতাম না। কে গো [illegible] উপরে মানবের কর্তৃত্ব [illegible] শক্তি,তুমি কেন চাও

যে আমরা সুখে থাকি? এই প্রশ্ন আবার মনে উদয় হইতেছে। আর ইহাও কি সম্ভব যে, মানব হৃদয়ে এই প্রেমাগ্নি দেখিতেছি অথচ যে বিশ্বকারণ হইতে মানব হৃদয় সমুৎপন্ন, তাহাতে সেই প্রেমাগ্নি নাই. অতএব বলি বিশ্বকারণে যে কেবল জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা আছে, তাহা নহে, প্রেম ও আছে।

কেবল তাহা নহে, তাঁহাতে আরও কিছু আছে। মানব প্রকৃতির আর একটী গূঢ় তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। মনে করুন, একজন লোকের সিন্ধুকের চাবিটী হারাইয়া গিয়াছে। তিনি প্রতিবেশী-দের বাড়ী হইতে অনেক গুলি চাবি আনা-ইয়াছেন; এক একটী করিয়া চাবী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। যে চাবিগুলি গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে কিন্তু লাগিতেছে না, তিনি এদিক ওদিক সেদিক করিয়া বার বার দেখিয়া শেষে বলিতেছেন, না এটা লাগিল না, এই বলিয়া সেটীকে পরি-ত্যাগ করিতেছেন। কিম্বা মনে করুন, এক ব্যক্তি শুনিয়াছিলেন যে, কোন একটী বিশেষ দ্রব্যে বমন নিবারণ করে। তিনি এক শত স্থলে সেইটী প্রয়োগ করিয়া দেখি-লেন যে, বমন নিবারণ করে না। তৎপরে তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার শুনা কথা মিথ্যা। তিনি উক্ত দ্রব্যের ব্যবহার পরি-ত্যাগ করিলেন। আর পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিল না। মানবের সকল কার্য্যেই এরূপ দেখা যায়; দশবার দেখিয়া যাহাতে বিফল হওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বাস থাকে না। সকলেই বলিবেন, ইহাই মানব-মনের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু একটী স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি আপনার চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিবায় জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা লাভের জন্য তিনি সংগ্রাম করিতেছেন। এই সংগ্রামের প্রকৃতি আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা ইহার মধ্যে তিনটী ভাব লক্ষ্য করি। (১ম) এই সংগ্রামে দুর্ব্বলতা বশত বার বার অকৃত-কার্য্য হইয়াও সাধুতা শ্রেষ্ঠ নয় বা সাধুতার জয় হইবে না, এরূপ বিশ্বাসে কেহ উপনীত হয় না—সে শতবার পড়িয়াও আশা করে। অন্যান্য স্থলে দশবার হারিলে নিরাশ হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মের স্থলে শতবার হারিয়াও নিরাশ হইতেছে না। (২য়) সে যখন দুষ্প্রবৃত্তিদিগের বশবর্ত্তী হইয়া পতিত হইতেছে, তখনও পতিত হইতে হইতে ইহা অনুভব করে যে, ধর্ম্মেরই জয় যুক্ত হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ সে পাপের দাসত্ব করিতে করিতেও পুণ্যের মহত্ত্ব অনুভব করে। (৩য়) এই ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সে যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে, কখনও এরূপ অবস্থা অনুভব করে না যে, ধর্ম্মের উপরে উঠিয়াছে, তাহার লাভ করিবার আর কিছু নাই, বরং যে যত উর্দ্ধে উত্থান করে, সে তত মস্তকের উপরে ধর্ম্মকে উন্নত দেখিতে পায়। প্রথম দুইটী হইতে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, ধর্ম্মের মহত্ত্বে বিশ্বাস মানবের স্বভাব-সিদ্ধ। ইহা অপরাপর বিশ্বাসের ন্যায় নয় যে, অকৃতকার্য্য হইলে উঠিয়া যায়। তৃতীয়-টী দ্বারা এই সত্য অনুভব করিতেছি যে, আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের যে ভাব আছে, তাহার কোন একটী সীমা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের মহত্ত্ব-জ্ঞান স্বাভাবিক এবং ধর্ম্ম ভাবের

মধ্যে অনন্তের ভাব মিশ্রিত; এই উভয় সত্য এক সঙ্গে আলোচনা করিলে কিরূপ ভাব মনে উদয় হয়, ইহাতে কি এই বিশ্বাস অন্তরে প্রবল হয় না যে, আমাদের প্রকৃতিতে যে ধর্ম্ম নিয়ম, সেই ধর্ম্ম নিয়ম সেই বিশ্বের আদি কারণ হইতে সমুৎপন্ন।

মানব হৃদয়ের এই ধর্ম্মভাবের গভীরতা যে কত, তাহা মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়। একি এক আশ্চর্য্য ভাব মানবকে শাসন করিতেছে!! রোমদেশ হইতে রাজাগণ যখন তাড়িত হইলেন, তখন দুইজন কনসলের উপর নগর রক্ষার ভার অর্পিত হইল। তখন রাজবংশের প্রতি রোমবাসীদিগের এত বিদ্বেষ যে তাঁহারা এই আইন করিয়াছিলেন যে, রোমনগরবাসী যে কোন ব্যক্তি পুনরায় রাজাদিগকে মানিবার ষড়যন্ত্র মধ্যে থাকিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। এইরূপ বিধি প্রচার হওয়ার পর কতকগুলি রোমীয় যুবক উক্ত অপরাধে অপরাধী হইয়া বিচারার্থ উক্ত কনসল দ্বারা নিকটে নীত হইল। দুর্ভাগ্য বশত সেই যুবকদলের মধ্যে একজন কনসলের দুইটী পুত্র ছিল। তিনি যখন বিচারাসনে, তখন সমুচিত বিচার করিয়া আইনসঙ্গত দণ্ড দেওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এই জ্ঞানে তিনি যথারীতি সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া যখন স্বীয় পুত্রদিগের দোষ সপ্রমাণ দেখিলেন, তখন তাহাদিগকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। যখন ঘাতকগণ তাহাদিগকে বধভূমিতে লইয়া চলিল, তখন তিনি বস্ত্রে মুখ আবরণ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। এক দিকে অপত্য স্নেহ অপর দিকে কর্ত্তব্য জ্ঞান, সংগ্রামে কর্ত্তব্য জ্ঞানই জয়যুক্ত হইল, এমন ব্যাপারটী মানব ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীতে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? বিগত মিউটিনীর সময় সার হেনরি লরেন্স অযোধ্যার কমিশনর ছিলেন। তিনি নিতান্ত অসুস্থ ও ভগ্নশরীর হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্ণৌ নগরে সংবাদ আসিল যে, সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী অধিকার পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌএর দিকে আছিতেছে। তখন তিনি অনুভব করিলেন যে, সেই বিপদের সময় তাঁহার নিজের গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশীয়দিগের প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া সেই রুগ্ন দেহে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক দল সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং ২৪ ঘণ্টা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। তৎপরে পরাজিত হইলে, লক্ষ্ণৌ নগরের প্রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া আসিয়া, সহরের ও চতুঃপার্শ্বের সমুদায় ইংরাজকে সেই বাড়ীতে পুরিয়া বাড়ীটীকে দুর্গপ্রায় করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক দিন এক কামানের গোলা তাঁহার গৃহ মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে সাংঘাতিক রূপে আঘাত করিল। সেই প্রহার বেদনায় তিনি মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন, ইহার পর কয়েক দিন মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু সেই অসহ্য যাতনার মধ্যে সতত সেই বাড়ীতে আশ্রিত ব্যক্তিদিগের রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছেন, আহতদিগের শুশ্রূষার বন্দোবস্তের উপদেশ দিতেছেন, স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার পরামর্শ দিতেছেন, শিশুদিগের তত্ত্ব লই-

তেছেন। পাঠক মহাশয় কোন পশুতে এপ্রকার কর্ত্তব্য জ্ঞানের কল্পনাও করিতে পারেন কি না? শরীর মন সমুদায় অবসন্ন, সমুদায় বিশ্রাম চাহিতেছে, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞান চুলে ধরিয়া পরিশ্রম করাইতেছে—এই স্বর্গীয় দৃশ্য কেবল মানবে সম্ভব। একদিকে যেমন কর্ত্তব্য জ্ঞান অপর দিকে অনুতাপ। অনুতাপের অশ্রু মুক্তাদল হইতেও সুন্দর। এ অশ্রু ফেলিবার অধিকার কেবল মানবেরই আছে। আমার যাহা করা উচিত ছিল তাহা করিতে পারি নাই, ইহা বলিয়া কোন নিকৃষ্ট প্রাণীকে কবে ম্লান হইতে দেখিয়াছেন? এই আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা ও লজ্জার গভীরতা কেবল মানবেই সম্ভব। যিনি এই উচ্চতা ও গভীরতাকে মানব প্রকৃতিতে নিহিত করিয়াছেন, তিনি যে "ধর্ম্মাবহ পাপানুদ" "ধর্ম্মের আবহ ও পাপের শান্তিদাতা," তাহা কি সহজ বুদ্ধিতেই অনুভব করা যায় না?

তবেই দেখুন, সেই আদ্যাশক্তিতে যদি জ্ঞান থাকিল, ক্রিয়েচ্ছা থাকিল, প্রেম থাকিল, ধর্ম্ম নিয়ম থাকিল, তাহা হইলে তিনি তাড়িত বা অন্য কোন ভৌতিক শক্তির ন্যায় জড় শক্তি হইলেন না, কিন্তু সচেতন পুরুষ হইলেন। যে অর্থে স্ত্রী পুরুষ শব্দ ব্যবহার হয়, সে অর্থে এই পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে না। জ্ঞান প্রীতি ও ক্রিয়েচ্ছাসম্পন্ন যিনি, তিনি পুরুষ। এই জন্যই প্রাচীন ঋষিদিগের সহিত যোগ দিয়া বলিতে ইচ্ছা করে;—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥

অর্থ—"অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী—এই মহৎ পুরুষকে আমি জানিয়াছি—ইহাকে লাভ করিয়া মানুষ মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে, যাইবার অন্য পথ নাই।"

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

নারায়ণ দেব।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

এমন একদিন ছিল, যখন বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে আবাল বৃদ্ধ সকলে 'পার্সী" শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিত। সুধু পাঠ করিত এমন নহে, বঙ্গীয় গায়কগণ "রাম বনবাস" "সীতার বনবাস," "অভিমন্যু বধ" প্রভৃতি রামা- মহাভারতোক্ত মহদাখ্যায়িকার ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের জঘন্য কুরুচিপূর্ণ কাহিনী নানা রাগ রাগিনীতে দেশময় গাহিয়া ফিরিত। সৌভাগ্য ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে—উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মাহাত্ম্যে বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি আক্ষেপের বিষয় যে, কলিকাতার কুরুচিপোষক অভিনয় গৃহ গুলিতে আজও বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব হ্রাস পায় নাই, মধুসূদন হেমচন্দ্রের সুরুচি পূর্ণ কবিতাবলী আজও ভারতচন্দ্রের চিতা-ভস্মের উপর বিস্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় নাই! ভারতচন্দ্রের

কুরুচিপূর্ণ রচনাবলী বঙ্গবাসীর অস্থি মজ্জাতে এরূপ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল, তথাপি বাঙ্গালির রুচি-বিকার দূর হইল না! এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাহারো কাহারো মুখে ভারতচন্দ্রের যশোকীর্ত্তন শুনিয়া আমরা বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইয়া থাকি। বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর লেখক দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহারা বাঙ্গালীর এই কুরুচি-বুভুক্ষার খোরাক যোগাইতে বসিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়?

আর শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই বা বলিব কি? তাঁহাদিগকে এখন ভ্রান্ত জাতীয়তা রোগে ধরিয়াছে। এই জাতীয়তার বিকৃত ভাবে তাঁহাদের দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণতর হইতেছে, বিচার শক্তি হ্রাস পাইতেছে। তাই কেহ কোন প্রাচীন কবির দোষ প্রদর্শন করিলে, তাঁহারা তাহার উপর চোখ রাঙ্গাইয়া উঠেন। কাহার সাধ্য তাঁহাদের নিকট কালিদাসের রুচির নিন্দা করে? এই বিকৃত জাতীয়তার প্রভাবেই আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিন্দুদিগের পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান গুলি রঙ্গভূমির প্রাঙ্গনে লাঞ্ছিত হইতেছে! মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের যে পবিত্র মধুর হরিনাম এক কালে পাপীর মুক্তিপ্রদ ছিল, আজ তাহা অপবিত্র রঙ্গভূমির অভিনয় সামগ্রী! যাক্ দেখি, কোন্ ইউরোপীয় অভিনেতৃ-সম্প্রদায় মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ-বিদ্ধ-ক্রিয়া অভিনয় করিয়া নিরাপদ থাকিতে পারে? আর আমাদের দেশে? আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়—হিন্দু ধর্ম্মের ভাণকারী মুরব্বীগণ, জাতীয়তার গড্ডরিকায় পড়িয়া, সেই পবিত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম গুলিকে বারাঙ্গনা-বিলাসাসক্ত অভিনেতৃগণের ক্রীড়াসামগ্রী দেখিয়া ক্ষোভ করা দূরে থাকুক, বরং উৎসাহ প্রদান করিতেছেন! কেবল তাহাই নহে, কলিকাতার কত সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের মধ্যে কুলনারীদিগের সমক্ষে কুলটাগণ শচীরাণী ও সাধ্বী সতী বিষ্ণুপ্রিয়া সাজিয়া ধর্ম্ম, নীতি ও সুরুচির মস্তকে পদাঘাত করিতেছে। এ সকল কথা ভাবিতে গেলে, নিজের উপর নিজের ঘৃণা জন্মে; জাতীয় কলঙ্ক স্মরণ করিয়া অন্ধকারে মুখ লুকাইতে ইচ্ছা করে। অন্ধ জাতীয়তার ধূমে পড়িয়া আমরা এমনই হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িতেছি যে, আমাদের যাহা কিছু প্রাচীন আমাদিগকে তাহারই প্রশংসা করিতে হইবে! এই সংস্কার বশতই ভারতচন্দ্র ধীরে ধীরে আবার সমাজে যেন প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছেন,—কলিকাতার রঙ্গভূমিগুলিতে সময় সময় বিদ্যাসুন্দরেরও অভিনয় হইয়া থাকে! আমাদের এই রুচি-বিকৃতি দেখিয়াই বঙ্গীয় কোন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসমালোচক বলিয়াছেন যে—

"That this work (Vidya Sundar) should generally, we might almost say universally, be considered to be the best work in the (Bengali) language, that the descriptions should be universally admired by our countrymen and learnt by rote, that Bharat Chandra should *still* be considered as the greatest poet of Bengal and should be spoken of with rapture, afford a curious index to the education and taste of our countrymen."

Literature of Bengal, P 159.

আমরা নারায়ণ দেব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এত গুলি অবান্তরিক কথা বলিলাম কেন, তাহার কারণ আছে। অনেকেই নাকি মনে করেন যে, বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্রই সর্ব্ব প্রধান। প্রাচীন কবিই বা বলি কেন, কাহারো কাহারো মুখে এরূপ কথাও কখনো কখনো শুনিতে হয় যে, ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি আজ পর্য্যন্ত এদেশে কেহ জন্মায় নাই!! আজ আমরা তাঁহাদের এই সংস্কারের ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখাইব যে, ভারতচন্দ্র ছন্দোবন্ধে ও ভাষা-পারিপাট্যে অদ্বিতীয় হইলেও তিনি একজন মৌলিক (Original) কবি নহেন। তাঁহার যাহা কিছু ভাল মন্দ রচনা, তাহার অধিকাংশই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর রচনার ভাব লইয়া। তিনি পদে পদে, নায়ক নায়িকা কি উপনায়ক উপনায়িকা, প্রায় প্রত্যেকের চরিত্রেই মুকুন্দরামের অনুকরণ করিয়াছেন; অনুকরণ করিয়াছেন বলিলে ঠিক হয় না, ললিত পদাবলীতে তাঁহার রচনার অনুবাদ করিয়াছেন বলাই বরং অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া কবিকঙ্কণ ও রায়গুণাকরের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের এই উক্তির সাক্ষ্য দিবেন। তথাপি সাধারণ পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা দুই একটী স্থান নির্দ্দেশ করিব। প্রথমত অন্নদামঙ্গল সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। কবি সতীর জন্ম হইতে প্রকৃত গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপর দক্ষযজ্ঞ, শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ ও পুনরায় হিমালয়ের গৃহে জন্ম, উমার সহিত শিবের বিবাহ প্রভৃতি অতি আমোদজনক সুললিত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে আমরা ভারতচন্দ্রের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, এই সমস্তই মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ফুল্লরা উপাখ্যানের প্রথমাংশের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঈশ্বরী পাটুনীর নিকট অন্নদার ছদ্মবেশে পরিচয় প্রদান অংশ অন্নদামঙ্গলের আদর্শ রচনা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সেই অংশ মুকুন্দরামের চণ্ডীর ছদ্মবেশে ফুল্লরার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান অংশের একেবারে অক্ষরে অক্ষরে নকল। মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রের কবিতার তুলনা করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, নতুবা উভয়ের রচনা পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা যাইত। আমরা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক উভয়ের গ্রন্থ একত্রে পাঠ করিয়া দেখিবেন।

তার পর "বিদ্যাসুন্দর"। বিদ্যাসুন্দরের গল্প সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিতে প্রবৃত্তি নাই; তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার ন্যায় জঘন্য কুরুচিসম্পন্ন রচনা বাঙ্গালা ভাষায় অন্য কিছু আছে কি না, আমরা জানি না। আর বোধ হয় ইহারই অনুকরণে বুঝি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তার সৃষ্টি। যত শীঘ্র সম্ভব এ সকল গ্রন্থের প্রকাশ এ দেশে লোপ পায়, ততই দেশে সুনীতি ও সুরুচি প্রচারের সুবিধা। কিন্তু বটতলার দুষ্টা সরস্বতী ও কলিকাতার অভিনয় গৃহগুলি ইহাদিগকে মরিয়াও মরিতে দিতেছে না। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনায় তাঁহার শব্দচাতুর্য্য ও ললিতপদাবলীর বাহার ছড়া-

ইতে গিয়া বর্ণনীয় বিষয় এত দূর অপ্রাকৃতিক করিয়া তুলিয়াছেন যে, নায়ক নায়িকার প্রকৃতিতে পবিত্র ভালবাসাকেও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাতে পরিণত করিয়াছেন! বিদ্যা এবং সুন্দরের জীবনে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ভিন্ন অন্য কোন মানবীয় কি দেব প্রবৃত্তি ছিল এরূপ মনে হয় না। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই যেন তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই গল্পও ভারতের স্বকপোলকল্পিত নহে—ইহাও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের অনুকরণ। বিদ্যাসুন্দরের প্রথম-প্রণেতা সাধকবর রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের উপর ভাষার আড়ম্বর ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করিয়াছেন মাত্র। বিদ্যা ও সুন্দরের বিষয় ছাড়িয়া দিলে গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রগুলি বরং অধিকতর প্রাকৃতিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যে মালিনী চরিত্র, কতোয়ালের প্রকৃতি প্রভৃতি সমালোচকগণ বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, তাহাও মুকুন্দরামের "দুর্ব্বলা" ও "কালকেতুর" ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি, ভারতচন্দ্রের ৩৪ অঙ্করে কালীর স্তবও মুকুন্দরামের নকল! তবে ভারতচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ—যে বিষয়ে বঙ্গীয় প্রাচীন কি আধুনিক কোন কবিই তাঁহার সমতুল্য নহেন—বর্ণনীয় বিষয়ের উজ্জ্বলতা সম্পাদন (Vividness of his descriptions), কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা গুণের বিষয় না হইয়া বরং দোষেরই বিষয় হইয়াছে। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের অভিমত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে গেলে, এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি এক জন শাব্দিক ও আলঙ্কারিক কবি ছিলেন বটে, কিন্তু স্বাভাবিক ও মৌলিক কবি নহেন। পূর্ব্বোক্ত "বঙ্গীয় সাহিত্য" প্রণেতা তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, পাঠক একবার তাহা পাঠ করুন—

"He has the power of raising in the reader's mind the very feeling he describes, though the feeling is often of a reprehensible character. His poetry has the *character* of Satan, but it has also the *power* of Satan, to tempt and to seduce."

"In all the higher qualifications of a poet in simplicity, and truth, in imagination, in sublimity and grandeur of conception and thought, nay, even in true tenderness and pathos, such as we meet with in almost every other Bengali poet, Bharat is singularly and sadly wanting. Inspite therefore of the fascination of his descriptions and the richness of his language, we are tempted, on reading his books, to exclaim with Hamlet, "words, words, words."

কোন দুই কি ততোধিক কবির সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই তাহাদের সময় ও বর্ণনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে দুই কি ততোধিক সমসাময়িক কবির এক বিষয়ে বর্ণিত রচনার সমালোচনা করাই সুযুক্তি সঙ্গত। তাই আমরা নারায়ণ দেবের রচনায় তুলনা করিতে গিয়া ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম। মুকুন্দরাম কিম্বা ভারতচন্দ্র ইহাদের কেহই নারায়ণ দেবের সম-সাময়িক নহেন। নারায়ণ দেব ইহাদের উভয়েরই বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। তবে নারায়ণ দেবের বর্ণনীয় বিষয়ের বিষয়-গত সাদৃশ্য আছে। ভারতচন্দ্র আলঙ্কারিক ও শাব্দিক কবি, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মুকুন্দরাম এক জন স্বাভাবিক ও মৌলিক কবি। মুকুন্দরাম

কোন্ শ্রেণীর কবি, পাঠক যদি তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। "বঙ্গীয় সহিত্য" প্রণেতা তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"A long conversation ensues (between disguised Chandi and Fullará), and the whole is one of the most beautiful passages we have anywhere seen or read. The passage is not marked by any deep poetical feeling, but is so exceedingly natural and intensely real that it almost reminds one of Shakespear himself."

Literature of Bengal, page 115-16

স্থানান্তরে বলিয়াছেন—

"Regarding the characteristic features of the poetry of Mukunda Ram we have said much already. The most remarkable feature is its intense reality. Many of the incidents are superhuman or wonderful or miraculous; but the thoughts and sayings of the men and women and all such as we see and hear around us, recorded with a fidelity and a skill which has no parallel in the whole range of Bengali literature. Open any page in the book, and you will find it. Page 137.

আমরা আজ সেই মুকুন্দরামের রচনার সহিত নারায়ণ দেবের একবিধ রচনার তুলনা করিয়া দেখাইব যে, নারায়ণ দেব মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও কবিত্ব শক্তিতে, মানব হৃদয়ের প্রকৃত ছবি অঙ্কনে মুকুন্দরাম অপেক্ষা হীন ছিলেন না। নারায়ণ দেবের পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় কেহ তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ে কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন কি না, এ পর্য্যন্ত আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বরং ইহাই দৃঢ়তর হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে অন্তত পূর্ব্ববঙ্গে অন্য কেহ এ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। পশ্চিম বঙ্গে সে দিনের কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ দাসের দুখানা চটি বই ভিন্ন ত অন্য কোন বই আমরা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। এই দুই খানা চটিকে সত্যনারায়ণ ও শনির পাঁচালি বলিলেই চলে, নারায়ণ দেবের গ্রন্থের সহিত একত্রে ইহাদের নামোল্লেখ না করাই বরং শ্রেয়। নারায়ণদেব এবং মুকুন্দরাম উভয়েই স্বাভাবিক এবং মৌলিক কবি; সুতরাং ইহাদেরই রচনার তুলনায় সমালোচন শোভা পায়। আজ আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু পাঠক একটী কথা মনে রাখিবেন যে, উভয়ের বর্ণনীয় বিষয় এক হইলেও উভয়ে সম সাময়িক নহেন। নারায়ণ দেব বর্ত্তমান সময়ের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের লোক, মুকুন্দরাম রামায়ণ-প্রণেতা কীর্ত্তিবাস ওঝার সম-সাময়িক ও ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

'আদি দেব নিরঞ্জন, যার সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি, চিন্তিলেন মহামতি
সৃজনের উপায় কারণ॥
নাহি কেহ সহচর, দেবতা অসুর নর
সিদ্ধ নাগ চরণ কিন্নর।
নাহি তথা দিবানিশি, না উদয় রবি শশী
অন্ধকার আছে নিরন্তর॥
কোটি ভানু সুপ্রকাশ, পরিধান পীতবাস,
অন্ধকারে ভাবে ভগবান্।

কনক কঙ্কণ হার, দূরে করে অন্ধকার,
পূরট মুকুদ মুনি দাম॥"

মুকুন্দরাম।

"না ছিলেক আকাশ, রবিশশী প্রকাশ,
না ছিলেক গমনাগমন।
না ছিলেক দিবারাত্তি, পর্ব্বত পৃথিবী
না ছিলেক এ তিন ভুবন॥
পঞ্চভূত হৈয়া, গঠিল সুমেরু কায়া
নিরঞ্জন রূপে হৈল স্থিতি। (ক)
জ্যোতি হৈতে প্রাণ মন, জ্ঞানে হইল চেতন
পরম পুরুষ উৎপত্তি॥
একেশ্বর নিরঞ্জন, দোসর নাহি অন্যজন
চিন্তে সৃষ্টি পাতিবার আশে।
নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভ হয়
যে কথা শুনিলে পাপ নাশে॥"

নারায়ণদেব।

সতী লোক-মুখে দক্ষযজ্ঞের কথা শুনিয়া পিত্রালয় যাইতে শিবের নিকট অনুমতি চাহিতেছেন, শঙ্কর অনুমতি দিতেছেন না। সতী বলিতেছেন :—

"অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে;
ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিল বাপের বাসে
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে?
চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর গুণনিধি
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ, যাইব বাপের বাস,
নিবেদন নাহি করি ডরে॥

পর্ব্বত কাননে বসি, নাহিক পাড়া পড়সী,
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই
বিধি মোরে কৈল জন্ম দুঃখী॥
সুমঙ্গল সূত্রধরে, আইলাম তব ঘরে
পূর্ণ সে হইল বর্ষ সাত।
দূর কর বিসম্বাদ, পূরাহ মনের সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পিতা মোর পুণ্যবান, করিবে অনেক দান
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
আমি আগে পাব মান, আভরণ পরিধান
ভেদ বুদ্ধি নাহিক পিতার॥
সতীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি,
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপ-ঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন॥"

মুকুন্দরাম।

সতী নারদের মুখে পিতৃযজ্ঞের সংবাদ ও তাঁহার ভগ্নীদিগের নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া মহাদেবের নিকট যজ্ঞে যাইতে বিদায় চাহিতেছেন, মহাদেব নিষেধ করিতেছেন। তখন সতী ছল ধরিয়া বলিতেছেন:—

"তখন শঙ্করী কহেন ছলে, না গেলে কি
মোর চলে?
চঞ্চল হইল মোর প্রাণী।
দক্ষ হরে তব মান, মনে করি অনুমান,
এ সন্ধান না জানে জননী॥
আমার মা বৈছে * পথ চাইয়া, এখনো
আইল না মাইয়া, †
বলি মায়ের জীবন্মৃত কায়া।
তুমি জান ওহে পশুপতি, সংসারে সন্তান প্রতি
গর্ভধারিণীর কত মায়া॥

(ক) "স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, আছিলেক একাকার
না আছিল পবনের গতি।
আদি অন্ত নাহি শুনি, শূন্যে উপজিল ধ্বনি
নিরঞ্জন হইল উৎপত্তি॥"

পাঠান্তর।

* বৈছে—বসিয়াছে। † মাইয়া—মেয়ে।

এত বলি মহামায়া, করিয়া মায়ের মায়া
দুই আঁখি ছল ছল করে,
দ্রুত যান এত বলি; "যাইওনা যাইওনা" বলি
গঙ্গাধর ধরেন দুই করে॥
তথাচ চঞ্চল মতি, বিনা পতির অনুমতি
সতীর গমন পিত্রালয়।
অনুমতি লৈতে শিবে, আতঙ্ক দেখায় শিবে,
দশমহাবিদ্যা রূপোদয়॥"

নারায়ণ দেব।

মুকুন্দরাম, পতির অনুমতি না লইয়াই সতীর পিতৃ গৃহে গমন বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু নারায়ণ দেবের সতী, দশমহাবিদ্যা রূপে মহাদেবকে ভয় প্রদর্শন করিয়া, পতির অনুমতি লইয়া পিতৃগৃহে গমন করিয়াছেন। এ রচনাটী এত সুন্দর যে আমরা পাঠক দিগকে তাহা উপহার নাদিয়া পারিলাম না।

"প্রথমে হন কৌষিকী, কালিকা করালমুখী
না-বাসনা বিবসনা অঙ্গ।
ক্রোধ করি হরোপরে, বিহরে হর উপরে
হর-রাণী করে নানা রঙ্গ।
নীলাম্বুজ জিনি আভা, আউলোকেশী লোল জিহ্বা
মহীর বিপদ পদ ভরে।
[...]শিতাঙ্গী ভালে শশী, অসিতে অসুর নাশি
অট্ট হাসি ধরে না অধরে॥
[...]র-রূপ-ধরা, হুহুঙ্কারে কাঁপে ধরা,
দৈত্য অহঙ্কার-হরা কালী।
কঙ্কালির কত খেলা, গলে নর-শির মালা,
নর-কর-বেষ্টিত কাঁকালি॥
দেখি ভয়ে পঞ্চমুখ, আতঙ্কে ফিরায় মুখ,
সম্মুখ হইলা দৈত্য-নাশা।
মুখে দিয়া বাঘাম্বর, যে দিকে যান দিগম্বর,
সেই দিগে যান দিগ্বাসা॥
পূর্ব্বে গেলে পূর্ব্বে যান, দক্ষিণে করিলে প্রয়াণ,
দক্ষিণে দক্ষিণাকালী যান।
তারার দেখিয়া তারা, মুদিয়া নয়ন-তারা,
ত্রিনয়ন তারা গুণ গান॥"

মহাদেব সতীর দশ মহাবিদ্যা রূপ দেখিয়া ভীত হইয়া অবশেষে ধনী-কন্যা প্রখরা গৃহিনীর দীন দুঃখী স্বামীর ন্যায় মনোদুঃখে বলিতেছেন;—

"বলেন পিতৃ-গৃহে তুমি যাও অতি ত্বরা।
মোরে দুঃখ আর দিওনা দুঃখ-হরা॥
থাকে দয়া হে নিদয়া আইস পুনরায়।'
মোর শক্তি নাহি শক্তি রাখিতে তোমায়॥
কোন্দল করিলে মোর বাড়িবে অযশ;
ভিক্ষাজীবী জনের রমণী কোথা বশ?
বিশেষ তোমার কাছে আমি নাহি গণ্য।
রাজ কন্যা তুমি মান্যা, আমি দীন দৈন্য॥
দুইটী কর আমার, তোমার দশ কর।
আমি বৃষোপরে, তুমি সিংহের উপর॥
তুমি হেম-বর্ণা, আমি রজত বরণ।
রজত কাঞ্চন তুল্য নহে কদাচন॥
তবে কি গুণে ত্রিগুণে তুমি হবে বশীভূত?
জীবনে কি ফল মোর, আছি জীবন্মৃত॥
জ্বালার উপরে জ্বালা দেখাও নানা ভয়।
এড়াই তোমার জ্বালা মৃত্যু যদি হয়॥"

মহাদেবের মনোদুঃখে সতীর বড়ই দুঃখ হইয়াছে, তাই তিনি পতিকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন:—

"পতির অভিমান বাক্যে, বাজিলা সতীর বক্ষে,
সজল নয়নে কন তারা।
দক্ষ হরে তব মান, ইতে কি আছে মান?
অপমান করি গিয়া ত্বরা॥
দিব সমুচিত ফল, করিব যজ্ঞ বিফল,
ফলাফল হবে কর্ম্ম দোষে।

এত বলি ক্রোধ-মতি, নন্দী সাথে লৈয়া সতী,
ধাইয়া যান দক্ষরাজ বাসে।
অপমানী হেরি শিবে, সুবর্ণ বরণী শিবে,
বিবর্ণ হইল দুঃখে কায়া।
দীন দুঃখিনীর প্রায়, মায়া করি গিয়া মায়,
দরশন দেন মহামায়া॥"

মুকুন্দরামের সতী পতির অনুমতি না লইয়াই পিতৃ গৃহে গিয়াছেন। সতীর মাতা প্রসূতি গ্রামে সতীর আগমন সংবাদ শুনিয়া সতীকে আনিতে চলিয়াছেন,—

"পাইলা বাপের গ্রাম, শুনিয়া সতীর নাম,
প্রসূতি ধাইল বেগবতী।
কোলেতে লইয়া সতী, প্রসূতি পুলকে অতি,
কৈল সতী মায়েরে প্রণতি॥
আনিয়া আপন ঘরে, প্রসূতি দিলেন তারে,
পাদ্য অর্ঘ্য বসিতে আসন।
যতেক ভগিনীগণ, সবে হরষিত মন,
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন।
জননী ভগিনী সঙ্গে, ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে,
যান দেবী যজ্ঞের সদন।
চণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

কিন্তু নারায়ণদেব এত সহজে সতীকে যজ্ঞস্থলে লইয়া যান নাই। তিনি কিরূপ করিয়াছেন, পাঠক স্বয়ং তাহা পাঠ করিয়া মানব হৃদয়ের চিত্র অঙ্কনে কে কত দূর সুপটু, অপক্ষপাতে একবার তাহার বিচার করুন,—

"কন্যার বিবর্ণ কায়া, চক্ষে হেরি দক্ষ-জায়া,
চক্ষে বারি বক্ষে কর হানি;
বলে সতী সত্য বল, তবে পাই অঙ্গে বল,
কাল কেন কাঞ্চন-বরণী?
তোমাকে দেখিতে সতী, নক্ষত্র সপ্তবিংশতি
ভগ্নী তব আইল যজ্ঞস্থলে।
এরূপ দেখিলে তারা, মরমে মরিবে তারা,
ভাসিবে নয়ন-তারা জলে॥
কত দুঃখ কব কায়, নারদের মন্ত্রণায়
শারদে তোমার এ দুর্গতি।
আমি না দেখিলাম বর, উদাসীন দিগাম্বর,
সেই হৈল রাজ কন্যার পতি!!
সেকালে সকালে বলে, রাণী তোর পুণ্য ফলে
জামাই হৈল ত্রিপুরারী।
সবাই কহিল শিবে, মাইয়া তোর সুখে ভাসিবে
সে শিবের কুবের ভাণ্ডারী॥
(তখন) কেহ না কহিল আসি, শঙ্কর শ্মশানবাসী,
তবে কি শঙ্কট ঘটে আর?
কপালে লিখন চণ্ডী, কার সাধ্য নহে খণ্ডি
পতি দণ্ডী হইল তোমার॥
কপালে যা ছিল হৈল, কাঁদি আর কি করি বল,
গত কর্ম্মে বৃথা চিন্তা করি।
যদি রক্ষা কর মোরে, এই হইতে কৈলাসপুরে
ফিরে আর যাইও না শঙ্করী॥"

প্রসূতির খেদে সতী কি বলিতেছেন, পাঠক তাহাও শুনুন;—

"জগৎ জননী কন শুনগো জননি!
মৃত্যু হেতু আজি মোর প্রভাত রজনী॥
পতি মোর পশুপতি সংসারের পতি।
তারে করে অনাদর দক্ষ প্রজাপতি॥
অঙ্গকালী হৈল মোর সেই দুঃখে দুঃখী;
নতুবা সংসারে কেবা মোর তুল্য সুখী?
আমার দুর্গতি তোকে কে বলে জননি?
আমি জানি আমি ত মা দুর্গতিনাশিনী॥
কাশীখণ্ড আমার কাণ্ড আমি কাশীশ্বরী।
অন্নপূর্ণারূপে লোকে অন্নদান করি॥
শুনিবাণী দক্ষরাণী মোক্ষদারে বলে।
মা তোমার অপমান শুনি প্রাণ জ্বলে॥
কুলের মধ্যে থাকি আমি কুলের কামিনী।
কুকর্ম্ম করিছে দক্ষ স্বপনে না জানি॥

অশেষ দেবতা আছে এই ত্রিভুবনে ।
বিশেষ সম্পর্ক মোর শঙ্করের সনে ॥
এত বলি ভাসে রাণী নয়নের জলে ।
সঙ্গে করি শঙ্করীরে যান যজ্ঞ স্থলে ॥”

মুকুন্দরাম সতীকে একাকিনী যজ্ঞ স্থলে পাঠাইয়াছেন এবং নিতান্ত মুখরার ন্যায় যজ্ঞস্থানে স্বামীর পূজা না দেখিয়া পিতাকে ভৎর্সনা করাইতেছেন:—

“দক্ষের চরণে সতী করিল প্রণতি ।
হেট মুখে আশীষ করিল প্রজাপতি ॥
আইয়োতে যাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি ।
চিরজীবি হউক স্বামী সুস্থির সুমতি ॥
না দেখিয়া যজ্ঞস্থানে শিবের পূজন ।
কোপে কম্পমান তনু বাপে জিজ্ঞাসন ॥
শোন বাপা তোমারে এ করি অভিমান ।
সতী ঝির প্রতি তব নাহি অবধান ॥
ধর্ম্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুগণ ।
সবাকে আসিতে যজ্ঞে দিলা নিমন্ত্রণ ॥
শিব নিমন্ত্রণ নাহি কর কি কারণে ?
সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে ॥
ব্রহ্মা যাঁর সতত বাঞ্ছয়ে পদধূলি ।
আপনি কমলাপতি করেণ অঞ্জলি ॥
অন্য জামাতারে দিলা বস্ত্র অলঙ্কার ।
শিব প্রতি ভাল নহে তব ব্যবহার ॥
দারুণ দৈবের ফলে আমি তব ঝি ;
না করিলা ভাল কর্ম্ম নিবেদিবে কি ?
এমন শুনিয়া দক্ষ সতীর বচন ।
নিন্দিয়া বলেন শিবে শুনে সর্ব্বজন ॥”

কিন্তু নারায়ণদেবের সতী, পিতার মুখরা কন্যা নহেন, নিজে পিতাকে একটী কথা বলেন নাই। মাতা প্রভৃতি, কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, সতীকে লইয়া যজ্ঞ স্থানে পতি দক্ষের নিকট গমন করিয়া বলিতেছেন:—

“বলেন মহারাজ, যত বুদ্ধিমন্ত তুমি ।
কন্যার দেখিয়া মূর্ত্তি বুঝিলাম আমি ॥
হাতে ধরি গঙ্গাধরে দিলা কন্যাদান ;
শিরোধার্য্য হরের কি জন্য হয় মান ?
নিতান্ত তোমার বুদ্ধে ঘটেছে যন্ত্রণা ;
কুমন্ত্রী নারদ বুঝি দিল কুমন্ত্রণা ?”

মুকুন্দরামের সতীর ভৎর্সনা শুনিয়া দক্ষ সতীপতি শিবের নিন্দা করিতেছেন:—

“কহিতে উচিত কথা, মনে পাছে পাও ব্যথা,
যেবা ছিল ললাটে লিখন ।
তোমার কর্ম্মের গতি, স্বামী—হৈল দুর্ম্মতি,
তারে যজ্ঞে আনি কি কারণ ॥
আরোহণ বৃষোপরে, শিঙ্গা ডমরুর করে,
ভক্ষ্য যার ধুতুরার ফল ।
ভাঙে বড় অভিলাষ, ভুজঙ্গ উত্তরী বাস,
ফণি হার ফণির কুণ্ডল ॥
পরিধান বাঘ ছাল, গলায় হাড়ের মাল,
বিভূতি ভূষিত যার অঙ্গে ।
শ্মশানে যাহার স্থান, তার কেবা করে মান,
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে ॥
আরাধিলা পশুপতি, পাইলা পশুর গতি,
অহী সঙ্গে একত্রে শয়ন ।
হরি শিরে শশী কলা, অহী সঙ্গে যার মেলা,
বঞ্চিত ভুবনে দুই জন ॥ ”

নারায়ণ দেবের দক্ষ, প্রসূতির ভৎর্সনায়, স্ত্রীর উদ্দেশে শিবনিন্দা করিয়া বলিতেছেন:—

“রাজা বলে নীতি শিক্ষা শুনিব কি তোর ?
সাধেতে বিষাধ ঘটে হেন সাধ কি মোর ?
তারে যত্ন করি রত্নপুরে চাইয়াছি রাখিতে ;
কাপালির সুখ নাই পারে কি থাকিতে ?
পাগলের সম্ভাষণ করায় কোন্ প্রয়োজন ?
সাগরে ফেলেছি কন্যা বলিয়া বুঝাই মন ॥

অদ্ভুত সঙ্গেতে ভূত শ্মশানে ভ্রমিছে।
সেটা পূর্ণ ক্ষেপা, তারে কৃপা করা মিছে॥
তার কথা বলিব কি মাথা মুণ্ড ছাই।
তৈল বিনা সর্ব্বদা সে গায় মাখে ছাই॥
মহাপাপ ধরি সাপ গলায় পরে পৈতে।
তারে আনিলে লোকে হাসিবে, তাই হবে
সৈতে।"

তাহার পর উভয়ের সতীই দক্ষকে অভিসম্পাত দিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। পাঠক, আমরা অধিক আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না; কাহার রচনা কেমন, কোন্‌টী অধিকতর স্বাভাবিক, তাহা আপনি বিচার করিয়া লউন। প্রস্তাব বড় সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, যদি সময় পাই ত আবার কতকগুলি এক বিষয়িনী রচনা আপনাদিগকে উপহার দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগগনচন্দ্র হোম।

ঈশ্বর বিশ্বাস ও দার্শনিক প্রমাণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান লক্ষণ, বিচার ও বিপ্লব। যে সকল ভিত্তির উপর বহুকাল পর্য্যন্ত কত লোকের জীবন পর্য্যন্ত তিষ্ঠিতে ছিল, এ যুগে সে ভিত্তি টলিতে আরম্ভ হইয়াছে; এক দিন যাহা অবশ্য অবলম্বনীয় ছিল, এ যুগে তাহার কঠোর বিচার আরম্ভ হইয়াছে। যে ঈশ্বরের নামে, পরলোকের নামে এবং চির-প্রচলিত প্রথা পদ্ধতির নামে, এক দিন মনুষ্য-হৃদয় ভক্তিতে অবনত হইত; এই বুদ্ধি প্রধান যুগে, সেই ঈশ্বর, পরলোক এবং সামাজিক আচার ব্যবহারে আর তেমন শ্রদ্ধা নাই, বরং অনেক স্থলেই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ঘনীভূত হইয়াছে। বিলাতে স্পেন্‌সার এবং কোমতের শিষ্যগণ অবিশ্বাসীদিগের মুখপাত্র স্বরূপ। মার্টিনু, কেয়ার্ড, ফ্লিণ্ট প্রভৃতি কয়েক জন, এই অন্ধকার দূর করিবার জন্য, অবিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য, বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগের আলোক অতি ক্ষীণ, অতি ক্ষুদ্র; আবার স্পেন্সার প্রভৃতি কর্ত্তৃক উৎপন্ন অন্ধকার অতি নিবিড় এবং অসীম!

পরাধীন ভারতবর্ষ বিলাতের ছায়ামাত্র। কাজেই শিক্ষিত নব্যভারতবাসীর হৃদয়েও এই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ঢালিয়া পড়িতেছে! তেত্রিশ কোটী দেবতা আজি কেবল নিরক্ষর গ্রামে, শিষ্য-যজমানাশ্রিত ভট্টাচার্য্যের পুরাতন গ্রন্থে, এবং আলস্যপ্রিয় কবির কল্পনায় কিম্বা অর্থলোলুপ পশারপ্রার্থী সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের লেখনী মুখে অবস্থিতি করিতেছে। স্বর্গ ও নরক, এ যুগে বিকার-গ্রস্তের আর্ত্তনাদ বলিয়া শিক্ষিত সমাজে উপহসিত!! নব্য শিক্ষিতদিগের এই সংশয় জাল ছিন্ন করিবার জন্য, ঈশ্বর ভক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ অনবরত চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্রাহ্ম সমাজেও দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইতেছি; এক শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া, আত্মজীবনে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া, আত্ম অভিজ্ঞতা, তর্কহীন ভাষায় সকলকে শুনাইতেছেন; অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা, যুক্তি ও তর্ক বলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট! মৃতমহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য প্রতাপ

চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি, প্রথম শ্রেণী ভুক্ত; ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, Roots of faith-প্রণেতা সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের উদ্যম কত দূর যুক্তি-সঙ্গত—এবং সাধারণত, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বর-নির্ণয় কতদূর সম্ভবপর, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা হইবে। একটী প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশদ সমালোচনা প্রত্যাশা করা যায় না; তবে সর্ব্বদা যে সকল যুক্তি তর্ক অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার ছিদ্র দেখাইয়াই নিরস্ত হইব; চিন্তাশীল পাঠকগণ, কোন্ পক্ষের যুক্তি কত দূর প্রবল, আপনারা বুঝিয়া লইবেন।

জগৎস্রষ্টা জগৎকর্ত্তা কেহ আছেন কি? এ মহা সমস্যার উত্তর কে দিবে? এই যে পৃথিবী, সুখ দুঃখময়, সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য পূর্ণ, বলিতে পার কি ইহার কেহ নেতা আছে, রক্ষক আছে, প্রাণ আছে? সুজলা সুফলা,শস্য-শ্যামলা পৃথিবীর অপরূপ রূপ দেখিয়া আর্য্য-ঋষি ঈশস্তুতি গাইয়াছেন, আবার কঠোর শাস্ত্রালোচনা করিয়া সাংখ্যকার বলিলেন,"ঈশ্বর প্রমাণাতীত"। নববলে উন্মত্ত, নব জীবনে জীবন্ত ইংলণ্ডের লোক-কোলাহলময় আকাশের দিকে তাকাইয়া বেকন বলিয়াছেন যে, "আমি আলমদ্ ও কোরাণের উপকথায়ও বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু অসীম বিশ্বের প্রাণ নাই, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিব না।" কিন্তু হিউমের গবেষণায়, মিলের কূট তর্কে এবং কোমত্ শিষ্যদিগের সূক্ষ্ম বিচারে ঈশ্বর, অজ্ঞেয় এবং অজ্ঞাত প্রমাণিত হইল। চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল, নব্য বাঙ্গালীর উদ্ধারকর্ত্তা কেশবচন্দ্র সেন, এক দিন গোলদিঘির ধারে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে,"ঈশ্বর আছেন।"সেই মধুর কণ্ঠস্বর-জড়িত বিশ্বাসের "আছেন" কথা বহুদিন স্মৃতিতে জীবন্ত থাকিবে। কিন্তু মায়াবাদের তর্কে ও কৌশলের যুক্তিতে অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করিতেছে। যখনি ধ্যানমগ্ন ঋষির নয়নে প্রেমাশ্রু দেখি, অমনি প্রাণের উৎস খুলিয়া যায়; কিন্তু যখন দর্শনের দাম্ভিক বিচারে, বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে মনোভিনিবেশ করি,—তখন দেখি সকলি শূন্য, সকলি অন্ধকারপূর্ণ। মনের এই ভাবকে, হে দার্শনিক পণ্ডিত, তুমি কুসংস্কার বলিও না; ইহার নৈসর্গিক মূল আছে, উপযুক্ত কারণ আছে, সে কথা সবিস্তারে পরে বলিব।

ইংরাজ দার্শনিক-কুলাগ্রগণ্য বার্ক্লি,মায়াবাদের (Idealism) উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে বার্ক্লির প্রবর্ত্তিত মত, কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া, সর্ব্বত্রই একরূপ সত্য বলিয়া আদৃত হইয়াছে। এই মায়াবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, বাবু সীতানাথ দত্ত, সম্প্রতি Roots of faith নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে ঈশ্বর প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। মায়াবাদ, এবং ঈশ্বর প্রমাণ সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র ইংরাজি গ্রন্থ খানা সম্বন্ধে একটী কথা বলি; আমরা এই গ্রন্থ খানি পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছি, এই গ্রন্থ খানিতে সীতানাথ বাবু সরল ইংরাজিতে আপনার মনের কথা অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকার পুস্তক প্রচারিত হইলে অনেকের ইংরাজি দর্শন

শাস্ত্রাদি পাঠে প্রবৃত্তি হইতে পারে। মায়াবাদের বাহ্য জগৎ সিদ্ধান্ত অতি সুন্দর; নব্যভারতের পাঠকগণ প্রথম বৎসরের নব্যভারতে উল্লিখিত সীতানাথ বাবু কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত ঐ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পড়িলে একথা বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই বাহ্য জগৎ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা দু একটী কথা বলিব। মায়াবাদী বলেন যে, বাহ্যজগৎ বলিতে যে দৈর্ঘ, বিস্তার, রূপ, রস, প্রভৃতি গুণ অনুভব করি, এই সকল জ্ঞাত গুণের আর কোন অজ্ঞাত জড় আধার নাই। এস্থলে একটী কথা বলি; আমরা দৈর্ঘ বিস্তার ইত্যাদি গুণ সমষ্টিকে জগৎ বলিয়া অনায়াসে ভাবিতে পারি; এবং স্বীকার করি যে, আধার কল্পনায় কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু জগতাধার নাই, একথা বলাও কি অসঙ্গত নয়? আধার স্বীকার এবং অস্বীকার উভয়ই কি অতর্কিত কথা নহে? আমাদের মনে হয় যে, এস্থলে অজ্ঞেয়তাবাদই সর্ব্বথা প্রশস্ত। তবে বার্ক্লি এবং তাঁহাদের আধুনিক শিষ্যেরা যদি বলেন যে, "আমাদের ঐ জড়াধার অস্বীকার করিবার কারণ এই যে, ঐ জড়াধার কেবল মানস কল্পনা-প্রসূত, এবং শুদ্ধ গুণ পরম্পরাকে শরীরী করিবার চেষ্টা করা মাত্র। বেন্ সাহেবের ভাষায়, "It (অচেতন জগতাধার) is self contradictory and a fictitious entity of the imagination আবার, It is the result of converting the abstract into reality." কিন্তু এই এক মাত্র সার যুক্তি যদি অবলম্বন করা যায় (এ পথে এমীমাংসা ভিন্ন আর গতিও নাই) তাহা হইলে আবার কতকগুলি নূতন গোল বাধিয়া উঠিল; প্রথম গোল, মন সম্বন্ধে। যেমন দেখিতেছি, এ জগৎ জড়াধার শূন্য, কেবলি ভাব-পরম্পরা মাত্র, এবং সেই ভাবও যাহা, আমার মনের ঘটনা বা মনও তাহা, তখন 'আমি' বলিয়া মনের আধারটী কোথায় উড়িয়া যান? আমার মনে (কথাটা প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত হইল) ভাব তরঙ্গ উঠিতেছে, চলিতেছে, মিলাইতেছে, এইত গেল প্রত্যক্ষ ঘটনা; যেমন জগৎ বলিয়াও কিছু নাই, পক্ষান্তরে তেমনি মন বলিয়াও কিছু নাই। স্মৃতি, আশা, বুদ্ধি, সকলি ঘটনা মাত্র (Phenomena)। তবে তর্ক উঠিতে পারে যে, সকল অস্থায়ী ঘটনার মধ্যে যে, এক স্থির আমি-জ্ঞান আছে, ঐ আমি-জ্ঞান কি? তাহা বুঝাইতেছি; আমি-ভাব (Ego phenomenon), জ্ঞানের বা consciousness এর অবস্থান্তর মাত্র। Secretion কথা ব্যবহার করিলে সহজে এভাব বুঝাইয়া দেওয়া যায়। আরও কথা আছে, যদি স্থির আমি-জ্ঞান দেখিয়া মনের আধার মানিতে হয়, তবে সেই নিয়মে জগতের জড়াধার কল্পনা করিবারও ত হেতু আছে? কথাটা ভাঙ্গিয়া বলি; আমরা একটা পদার্থ আস্বাদন করি, এবং দূরে সূর্য্য দেখি, এ দুয়ে কি কিছু প্রভেদ নাই? প্রথম অবস্থা সম্বন্ধে আমার মনের যে ভাব হইতে পারে, দ্বিতীয় অবস্থা সম্বন্ধে কিন্তু সেরূপ নহে; প্রথম ভাবের পরিবর্ত্তন আছে, দ্বিতীয় ভাবের খুব পরিবর্ত্তন দেখি না। বেন্ বলিতেছেন, "In regard to the Object properties all minds are affected alike: in regard to the Subject properties, there is no constant agreement." তাহা যদি হইল, তবে ত পদার্থের নিজত্ব

কিছু থাকিবার সম্ভাবনা আছে? যদি এখানে বল যে, গুণ পরম্পরাকে শরীরী করিবার, চেষ্টাজনিত দোষ পঁহুছিল, (We are guilty here of converting an abstract into reality, which is an error of Realism)'তবে মন সম্বন্ধেও কেন ঐ কথা বল না? ঘটনাসমূহ পরে পরে সংঘটিত হইতেছে,প্রত্যক্ষ কথা; সেই সংযোগের ফলে জ্ঞান আসিল, স্মৃতি আসিল, আশা আসিল, ইহাও প্রত্যক্ষ কথা; তবে আর অতিরিক্ত একটা আধার—লইয়া টানা টানির প্রয়োজন কোথায়? এখন যদি জড়াধারের সঙ্গে সঙ্গে "আমি" ও উড়িয়া গেলাম, তবে কোথায় বা গেল ইচ্ছা (will), কোথায় বা গেল ইচ্ছার সহিত কার্য্য-যোগের অভিজ্ঞতা, আর কোথায় বা গেল এ সকল হইতে ঈশ্বর প্রমাণ!! কেহ হয়ত বলিবেন যে, এ তর্ক নিতান্তই তর্ক করিবার জন্য; আমি যে আছি তাহার ত আর ভুল নাই? সে কথা আমি স্বীকার করি; কিন্তু এ কথা তুলিয়া এইটী দেখান গেল যে, যাহা নিত্য-প্রত্যক্ষ, সে কথা যুক্তি তর্ক দিয়া বুঝাইতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা। এ কথা উপসংহার কালে আরও খুলিয়া বলিব। এখন এ পর্য্যন্ত, এইত গেল মায়াবাদের কঠোর বিচার। তাহার পর, যদিই বা মানিয়া লই যে,"আমি" আছি, "জগৎ" আমার ভাব-পরম্পরারূপে আছে; এবং আমার মনে, আমার অনিচ্ছায় অনেক সময় ঐ ভাব-পরম্পরা উপস্থিত হইয়া থাকে। এ কথা মানিলেও ঈশ্বর প্রমাণ সহজ হয় কি? তার্কিক বলিবেন যে, কেন? যখন আমার ইচ্ছা ভিন্ন এই সকল ভাব পরম্পরা তরঙ্গ তুলে, তখন সে তরঙ্গের প্রথম আঘাত কোথায়? কে আমার মনে এই ভাবসমূহ উৎপন্ন করে? আর, প্রতিকার্য্যের সহিত যখন ইচ্ছার যোগ দেখি, ইচ্ছা ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি যখন বুঝি না, তখন ত জগদান্তরালে এক ইচ্ছাময় কর্ত্তাকে—মানিয়া লইতে হয়? দুই দিক হইতে একথার উত্তর দিব;—(১) "আমি ইচ্ছা করিয়া উৎপন্ন করিতেছিনা অথচ কিরূপে ভাবের উৎপত্তি হইতেছে" এ অন্ধকারকে আলোকিত করিতে গিয়া, "কেহ করিতেছে" এইটী মানিয়া লওয়া হইল; ইহাতে অন্ধকার কমিল না বাড়িল? যাহা এক পদ অগ্রে ছিল, তাহাকে আর এক পদ পশ্চাতে সরাইয়া দিলে; ইহাতে কিছু বিশেষ লাভ হইয়াছে কি? আরও বলি, যদি এই উপস্থিত ভাব, কে করিল, কে করিল, বলিয়া চিৎকার করা দার্শনিক যুক্তি, তবে কর্ত্তাকে কে করিল বলিয়া চিৎকার করা ত অধিকতর যুক্তি যুক্ত হইতেছে? যদি তাহা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ অনন্ত শৃঙ্খলের শেষ কোথায়? এ অন্ধকার-সাগরের পর পার কোথায়? (২) কার্য্যের সহিত যে ইচ্ছার সর্ব্বত্রই যোগ আছে, কে বলিল? "আমাতে" এমন অনেক কার্য্যত সংঘটিত হইতেছে, যে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার সহিত কোন যোগ নাই? অনিচ্ছায় শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, অনিচ্ছায় রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে, অনিচ্ছায় পরিপাক-ক্রিয়া সাধিত হইতেছে। এমনও পড়িয়াছি যে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, দুর্ব্বলতা বশত এখন যাহা ইচ্ছা করিয়া করি, শারীরিক উন্নতি হইলে সেই সমুদয় কার্য্য অনিচ্ছায় সাধিত হইবে। এ যুগে যে সকল ক্রিয়া (শ্বাস পরিপাক ইত্যাদি) অনিচ্ছায়

হইতেছে, এক সময়ে তাহা ইচ্ছা করিয়া, কষ্ট করিয়া করিতে হইত। যদি বলেন যে, ক্রমোন্নতির এ কাথার অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই; আমি বলি, যদি কখনও পাওয়া যায়? যদি কখনও আমরা ইচ্ছা-শূন্য হইয়া কেবল বিমলানন্দ অনুভব করি? তখন ইচ্ছা বেচারার অভাবে কি দিয়া ঈশ্বর প্রমাণ করিব? জিজ্ঞাসা করি, এরূপ বালির ভিত্তির উপর ঈশ্বর-স্থাপনের ফল কি? আরও এক তর্ক আছে; যদি ইচ্ছা দেখিয়া ইচ্ছাময় ঈশ্বর কল্পনা করিতে হয়, তবে সে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকিল কৈ? ইচ্ছা কথাটাকে যে রূপেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, এমন ইচ্ছা কখনও দেখিয়াছেন কি, যাহার উৎপত্তি অহেতুকি (without motive)? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নির্ব্বিকার ঈশ্বরের ইচ্ছা জন্মিবার হেতু বা motive কি? যদি বল জানি না, তবে ইচ্ছা কথাটা ব্যবহারও করিও না; ইচ্ছা দিয়া ঈশ্বর গড়াইতে চেষ্টাও করিও না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের যুক্তিদ্বারা প্রমাণ হয় না, তেমনি এ স্থলেও হইল না। প্রত্যক্ষ কথাকে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে গেলে, এবং (সর্ব্বোপরি) ঈশ্বরকে প্রমাণাধীন করিতে গেলে এইরূপ বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হয়; কখনও বা ঈশ্বর বুঝিতে পারা যায় না, এবং কখনও বা তিনি মানুষ হইয়া দাঁড়ান; এ কথা Mansel এর অতি সুন্দর কয়েক ছত্রে বেশ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"From the (above) examination of necessary truths, it may be shown that no matter of fact can be a matter of demonstration in the highest sense of the term. For it is essential to demonstration that its object should be such as we can construct from within, out of the forms inherent in our mental constitution; and it is essential to the existence of a fact, as such, that it should be presented to us from without. A fact, as such, must exist independently of my thinking about it: an object of demonstration, as such, exists only in and by the act of conceiving it. This consideration is sufficient to explain the failure of all attempts to demonstrate, *apriori*, the being and attributes of God. If we can demonstrate the attributes of those objects only which we have constructed for ourselves, follows that the demonstrated God is a creature of human imagination." (Mansel's Metaphysics 278-79)

এইস্থলে আর একটী কথা না বলিলে বোধ হয় আমাদের এই তর্ক অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইচ্ছা হইতে শক্তি বোধ হয়, এ কথাও এই শ্রেণীর প্রমাণকারীগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হইতেছে না। শক্তির জ্ঞান, উদ্যম (effort) হইতে; এই উদ্যম আবার আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতারই পরিচয়মাত্র। আমি অনেক কার্য্য করিব, ইচ্ছা করিতেছি, এবং কার্য্য হইতেছে; কিন্তু তাহাতে উদ্যম নাই, আমাদের এরূপ অভিজ্ঞতা আছে। যখন সম্পূর্ণ বিকাশের দিকে আমাদের গতি, তখন বুঝা যাইতেছে যে,এক সময় এই উদ্যম তিরোহিত হইবে; শক্তিজ্ঞান একেবারেই থাকিবে না।

যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন; তাঁহাদের আর এক যুক্তি সৃষ্টি কৌশল, এবং সেই সৃষ্টি কৌশল হইতে স্রষ্টার পরিচয়। নব্যভারতের পাঠক মহাশয়েরা এতৎ সম্বন্ধে সপক্ষীয় কথা নগেন্দ্র বাবুর সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধে অনেক পড়িয়াছেন; অতএব তাঁহাদের কথা আর

অধিক পরিমাণে আমার বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, এই কৌশলের যুক্তিও আমার নিকট পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয় না। এ যুক্তির বিরুদ্ধে আমার অনেক বলিবার আছে; কিন্তু অত কথা বলিয়া সকলকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা নাই; সংক্ষেপত গোটা-কতক কথা বলি। ১ম ত—জগতের উপাদান এবং বিকাশ শক্তির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নির্ণীত হইয়াছে যে, এই পৃথিবী একদিনে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ থাকিবে না—ক্রমশই উন্নততর অবস্থায় আসিতেছে। এমন এক সময় ছিল, যখন অতি কষ্টে পৃথিবীতে বাস করা যাইত; আজ কাল তেমন কষ্ট নাই, তবুও নিতান্ত কম নহে; আশা আছে ভবিষ্যতে মনুষ্য জাতির পূর্ণ সুখ হইবে। যদি এ জগৎ ঈশ্বরের কৌশল নির্ম্মিত, তবে পৃথিবী, মানবাবিষ্কৃত কলের মত নিত্য উন্নতি-প্রার্থী কেন? কেহ বলিতে পারেন যে, অসম্পূর্ণাবস্থা হইতে সম্পূর্ণে পরিণতিই জগতের নিয়ম। বুঝিলাম। এই অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্তি ত এক জনের ভাগ্যে ঘটে না? এক অসম্পূর্ণ হইতে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যুগেরই বিকাশ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি, এ উন্নতিতে আমার সুখ কি? আমার বুকের রক্তে পরের অট্টালিকার সিমেণ্ট হইতেছে; ইহাতে আমার সুখ কোথায়? এক যুগের বুকে বংশদলন, এবং অন্য যুগের সুখ বর্দ্ধন; এ প্রকার কৌশলকে সদর্পে দাঁড় করান কি লজ্জার কথা নয়? আরও কথা আছে; পৃথিবী যেমন অবনত অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় পরিণত হইতেছে, তেমনি আবার সম্পূর্ণ উন্নতি হইলে পৃথিবীর ধ্বংশও(dissolution) সাধিত হইবে! উন্নতি ও ক্রমবিকাশ (evolution) যেমন জগতের নিয়মপুঞ্জের ভাগ্যে বিধাতার কলমে অঙ্কিত হইয়াছে; ধ্বংশ ও "অবনতিও (dissolution) আবার তেমনি অচ্ছেদ্য নিয়মে বদ্ধ। উন্নতি দেখিয়া যদি মঙ্গলময় এবং কৌশলকারী ঈশ্বর মানিতে হয়, তবে এই ধ্বংশের আইন দেখিয়া কেন তাঁহাকে নির্ম্মম বল না? অথবা অন্ধ জড়ের অন্ধকারই পরিনাম, এইরূপ সিদ্ধান্ত কর না? (২) আজ পৃথিবীর এমন অবস্থা হইয়াছে (যে প্রকারেই হউক) যাহাতে এখানে জীবের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইয়াছে; আমরা জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারি এরূপ বন্দোবস্ত দাঁড়াইয়া গিয়াছে; এখন আমি যদি চারি দিকের অবস্থা গুলির সম্বন্ধে এইরূপ কথা প্রয়োগ করি যে, "আহা! এই অবস্থাপুঞ্জ কেমন আমাকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী রহিয়াছে!" তাহা হইলে কি ভ্রম হয় না? আসল কথা এই যে, আমার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই আমি রহিয়াছি; না হইলে আমিও থাকিতাম না; এমন সুন্দর কৌশলের যুক্তি দিয়া ঈশ্বর প্রমাণও করিতে পারিতাম না। (৩) এখন পর্য্যন্ত মনুষ্য শরীরে নখ ও নানা প্রকার কেশ আছে, পূর্ব্বে যাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল কিন্তু এখন আর নাই; এবং বুঝা যাইতেছে যে, অবিলম্বে তাহারা ধ্বংশপুরেও যাইবে: বল দেখি এখানে কি প্রকার কৌশল প্রযুক্ত হইতেছে? (৪) কৌশল সম্পন্ন বলিলে, ঈশ্বরকে নির্ম্মাতা বুঝায়, স্রষ্ঠা বুঝায় না। (৫) কৌশলের যুক্তি কারণ বাদের অংশ মাত্র; কাজেই কারণবাদ

ভ্রমাত্মক হইলে, কৌশলও ভ্রমাত্মক হয়। (৬ কৌশল বলিলে, কৌশলকারী সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হইতে পারেন না। এস্থলে একটী কথা বলি, নগেন্দ্র বাবু তাঁহার অতি সুন্দর অতি সুপাঠ্য ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা গ্রন্থে কৌশলের যুক্তি, সর্ব্ব প্রথমে সন্নিবিষ্ট না করিলে ভাল করিতেন। বোধ হয়, তাড়াতাড়ি ছাপায় এরূপ হইয়া থাকিবে।

পাঠকগণ, দর্শন বিজ্ঞানের বিচারে ঈশ্বর কেমন আয়ত্ত তাহা দেখিলেন? ঈশ্বর বিচার সম্বন্ধে ফরাসী-পণ্ডিত জুবার্টের অমৃতময়ী লিপি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি:—

"It is not hard to know God, provided one will not force oneself to define him. Do not bring into the domain of reasoning that which belongs to our innermost feeling. In things that are visible and palpable, never prove what is believed already; in things that are certain and mysterious (mysterious by their greatness and by their nature) make people believe them and do not prove them." (Mathew Arnold's translation.)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রবাসী।

(১)

লও, মা, অন্তরে,
বুকের ভিতরে,
কাতর পরাণে,
কোথা বা যাই!
আমি যে দুয়ারে,
ডাকি ধীরে ধীরে,
প্রাণের অন্তরে,
আঘাত পাই!

(২)

সংসার যাতনা,
বহিতে পারিনা,
শোকের পেষণে
ভাঙ্গিয়া যাই!
বারেক ফিরিয়া,
দেখ গো চাহিয়া,
প্রবাসী সন্তানে
আবার দ্বারে।

(৩)

লও মা অন্তরে,
একেলা প্রান্তরে,
একাকী সংসারে,
ভাসিয়া যাই!
দেমা, শান্তি, প্রেম,-
ভকতি, বিরাম,
পরাণি জুড়াই,
অমর হই!

(৪)

যুগ যুগান্তর,
ছাড়ি এই দ্বার,
গিয়াছি ভাসিয়া,
নরকে ছুটিয়া;
কেন ডাকিলে না?
কেন রাখিলে না?
কেন গো সন্তানে
চরণ দিলে না?

আমি শত্রু সনে,
ব্যথিত পরাণে,
কি যাতনা সই,
কি বেদনা বই,
বুঝিতে পারনা ?

(৫)

মস্তকে কঠোর,
অদৃষ্ট দুর্ব্বার !
দেহে শত শত,
ক্ষত অগণিত !
ক্ষত বক্ষস্থল,
ক্ষত বাহুবল,
চরণে অপার
অনন্ত শৃঙ্খল !

(৬)

প্রকৃতির সনে,
আপনার মনে,
নিয়ত বিবাদ,
নিত্য সংঘটন ;
শান্তি-সুসঙ্গীত
বহেনা সমীরে
সংসার প্রান্তরে।
বিশ্ব দ্বন্দ্ব-ময়,
বিশ্ব পূর্ণনয় ;
কভু মিটিল না
প্রাণের বাসনা।
সে অতৃপ্ত শ্বাস,
অতৃপ্ত পরশ
এখনো অন্তরে ;
বড় আশা ভরে,
আজি গো দুয়ারে,
লও গো সন্তানে
আবার চরণে।
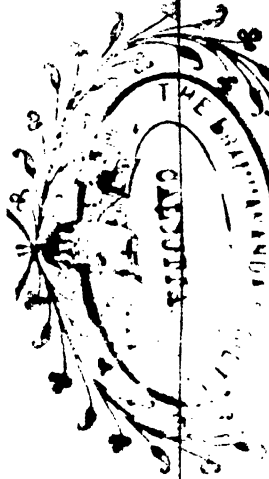
(৭)

প্রতীপ পবন,
অজ্ঞাত ছুটিয়া,
বহি নিয়া গেল
দিক্ দিগন্তর ;
সুরম্য, মধুর,
সুগন্ধ, সুরস,
রূপের কিরণ,
মৃদুল পরশ,—
খোইলাম পথে ;
হাসিতে হাসিতে,
বাহু প্রসারিয়া
ধরিলাম প্রাণে ;
ক্ষত বক্ষস্থল,
ক্ষত আত্ম-বল,
কলঙ্কের রেখা,
অনুতাপ-শিখা,
চির দিন তরে
বরিল আমারে !

(৮)

লও, মা ! অন্তরে,
আমি গো দুয়ারে,
ডাকি ধীরে ধীরে,
আঘাত পাই !
মরম বেদনা,
বহিতে পারিনা,
শোকের পেষণে
ভাঙ্গিয়া যাই !

(৯)

তোমার অন্তরে
রব লুকাইয়া ;
যাইব ভুলিয়া
হৃদয়ের ভার :
জানি না কেমন
নিরবান ধন,

অতীন্দ্রিয় জ্ঞান,
সে অনন্ত-পার!

(১০)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে
প্রাণ মিলাইয়া,
অনন্ত হইয়া,
রব লুকাইয়া!
বাসনা আমার
ভুলিতে সংসার,
ভুলিতে অপার
জনম ভার।

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

সাংখ্যদর্শন।

বৈদিক সময়ের অব্যবহিত পরেই আর্য্যদের দর্শন শাস্ত্রগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। এই দর্শন গুলির মধ্যে দুই খানি প্রধান, সাংখ্য ও বেদান্ত। ইহাদেরই উপর প্রকৃত পক্ষে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বেদের উপনিষদে যে নির্ম্মল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অবতারণা আছে,তাহারই উপর বেদান্ত দর্শন সৃষ্ট হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শন মতে, এই সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগত এক অনাদি, অনন্ত, নিশ্চল ব্রহ্ম হইতে জাত। তিনিই জগতের স্রষ্টা, এবং সৃষ্ট এই জগতের আদিকারণ ও উপাদান কারণ। এই সৃষ্ট জগত ব্রহ্মের মায়া বা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন। আমরাও সেই নির্গুণ ব্রহ্মের অংশমাত্র—তবে তাঁহার যে অংশ হইতে এই ভৌতিক জগত সৃষ্ট হইয়াছে, সেই মায়ার দ্বারা আমরা আচ্ছন্ন থাকি বলিয়া তাহা বুঝিতে পারি না।

সে যাহা হউক, এই বৈদিক দর্শনের প্রভাব আর্য্যদিগের ধর্ম্মের উপর প্রথমে অধিক দিন থাকে নাই। বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব হইতে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব অনেক কমিয়া যায়; সেই সময় সাংখ্য মতই প্রবল হয়, এবং ইহারই উপর তখনকার পুরাণ প্রভৃতি সংগঠিত হইয়া, অথবা ইহার পূর্ব্বে যেরূপ পৌত্তলিকতা ছিল, তাহা, সংশোধিত হইয়া এই সাংখ্য দর্শনের মতেই তাহার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।

তৎপরে পুরাণের পর, যে সকল তন্ত্র শাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং যে তান্ত্রিক ধর্ম্ম এক্ষণে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষেই ব্যাপিয়া আছে, তাহারও ভিত্তি এই সাংখ্যদর্শনের উপর সংস্থাপিত। প্রকৃতি, পুরুষ, শক্তি প্রভৃতি হইতে যে সকল দেবদেবী কল্পিত হইয়াছে, তাহাই একথা প্রমাণীকৃত করিতেছে। তন্ত্র ব্যতীত, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম যদিও মূলত তান্ত্রিক ধর্ম্মের অংশ মাত্র, তথাপি তাহারও দর্শন অংশ সাংখ্যের দর্শনের অনুরূপ।

এ সকল বিষয় আমাদের অধিক দেখাইবার আবশ্যক নাই। বৈদিক ধর্ম্ম যাহাই হউক, হিন্দুদিগের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম যে সাংখ্যদর্শনের উপর সংস্থাপিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। অনেকের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মই কেবল দর্শনের উপর সংস্থাপিত (metaphysical religion),জগতে আর কোথাও কোন ধর্ম্ম নাই, যাহার মূল ভিত্তি জটিল দর্শন শাস্ত্র। কিন্তু উপরে যাহা দেখাইলাম,তাহা হইতে বোধ হয় ইহা বুঝা যাইবে যে, এমন কি, হিন্দুদিগের তামসিক

পৌত্তলিক ধর্ম্মও কাহারও স্বকপোল কল্পিত নহে। তাহারও মূল, জটিল সাংখ্যদর্শনের উপর দৃঢ় সংস্থাপিত।

এই সাংখ্যশাস্ত্রের এইরূপ প্রভাব বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। তিনি সম্ভবত ইংরাজি নবম শতাব্দির প্রথমেই জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই বেদান্ত-শাস্ত্র পুণর্জ্জীবিত করেন। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ পুনর্ব্বার ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার করেন। এই সময় হইতেই অদ্বৈতবাদ .. সাধারণে অত্যন্ত আদৃত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, সাংখ্যদর্শনের প্রাদুর্ভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যতদিন তান্ত্রিক ধর্ম্ম থাকিবে, যতদিন তান্ত্রিক ক্রিয়া কাণ্ড আমাদের দেশে বর্ত্তমান থাকিবে,ততদিন সাংখ্যমত একেবারে দূর হইবে না। আর্য্যেরা যখন বুঝিয়াছিলেন যে, সাংখ্যের সমান জ্ঞানী নাই,কপিলের মত পণ্ডিত নাই, তখন এক সময় ইহার কতদূর প্রাদুর্ভাব ছিল, বেশ বুঝা যায়। আমরা এস্থলে সেই সাংখ্যদর্শন কি, তাহাই সংক্ষেপে দেখাইব।

সাংখ্যদর্শনের প্রথম কথা, ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি কিরূপে সম্ভব, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া। যতদিন মানুষের ইহজীবনের সহিত সংশ্রব থাকে, যতদিন তাহাকে একজন্ম হইতে আর একজন্ম ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তত দিন তাহার এই দুঃখের সহিত সম্বন্ধ অনিবার্য্য। অতএব মানুষের যাহাতে দুঃখ নিবারণ হইতে পারে, তাহারই জন্য চেষ্টা করা, তাহার উপায় স্থির করা, ও তদনুসারে কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। এক কথায়, যাহাতে মানুষের মুক্তি হয়, এই সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে রহিত হয়, তাহা দেখান সাঙ্খ্যদর্শনের উদ্দেশ্য।

অতএব ইংরাজীতে যাহাকে মনোবিজ্ঞান বা (Philosophy) বলে, সাংখ্যদর্শন সেরূপ নহে। ইহাতে Science এবং Art বা Practice উভয়ই আছে। প্রথমত সাঙ্খ্যকার দেখাইয়াছেন যে, মানুষের আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের মন বা বুদ্ধি বৃত্তি, ইচ্ছাবৃত্তি বা কার্য্যকারিণী বৃত্তি গুলি প্রকৃতি হইতে জাত। সাঙ্খ্যকার একথা প্রমাণ দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মনের বৃত্তি গুলি কি কি, তাহাদের ক্রিয়ারূপ প্রকৃতি হইতে তাহারা কিরূপে জাত, তাহা সাঙ্খ্যকার বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। শেষে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আমাদের আত্মা প্রকৃতিজ,মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে যত দিন এই জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে,তত দিন তাহার সহিত মনের কখন অত্যন্ত বিচ্ছেদ হয় না। মৃত্যুকালে আত্মা মনের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পঞ্চভৌতিক শরীর হইতে বিভিন্ন হইয়া যায়। এই মনের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই আত্মা জগতের সহিত লিপ্ত থাকে। এবং তাহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং সাঙ্খ্যমতে ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণের জন্য — আত্মার মুক্তির জন্য, প্রকৃতির সহিত তাহার সংশ্রব একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে— মনের সহিত ও তাহার সংশ্রব দূর করিতে হইবে।

সাঙ্খ্যদর্শনের মূল বিবরণ অতি সংক্ষেপে সাঙ্খ্যকারিকাতে বিবৃত আছে। আমরা এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সাঙ্খ্য-

দর্শনের মূলতত্ত্ব পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিব।

সাঙ্খ্যমতে দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। বলিয়াছি ত, এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণের উপায় স্থির করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শ্রুতিতে এই দুঃখ দূরীকরণের যে উপায় উল্লিখিত আছে, তাহা অতি সামান্য,জটিল, অবিশুদ্ধ, অসম্পূর্ণ ও অনাবশ্যকীয়। ইহাতে দুঃখ-ত্রয়ের আপত নিবারণের উপায় নির্দ্ধারিত থাকিলেও, ইহাদের একেবারে বিনাশ করিবার উপায় স্থিরীকৃত হয় নাই। যে জ্ঞান দ্বারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রিয়া এবং আত্মা বা পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি হয়,তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—ইহা দ্বারাই মুক্তি সংসাধিত হয়। সাঙ্খ্যকার দেখাইয়াছেন যে, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন শক্তি বা (পদার্থের ?) সাম্যাবস্থা যে মূল প্রকৃতি, তাহা অবিকৃত। ইহা হইতে পুরুষের সান্নিধ্য জন্য মহতাদি প্রকৃতি—বিকৃতি সাত প্রকার। প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিকৃত অবস্থা ষোড়শ প্রকার এবং পুরুষ, অবিকৃত ও প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এ তত্ত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা সাঙ্খ্যকার বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি ন্যায় যুক্তি (বা logic শাস্ত্রের মূল সূত্র) অবলম্বন করিয়া, কিরূপে এবিষয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রমাণ (Inference) তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত বাক্য (বা শ্রুতির বচন)। ইহা হইতেই সর্ব্ব প্রকার প্রমাণ সিদ্ধ হয়। সাঙ্খ্যমতে ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ইহা দ্বারা প্রমেয় বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। বিষয় সকল (objects) আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইলেই প্রত্যক্ষীভূত হয়।

অনুমান তিন প্রকার—পূর্ব্ববৎ (deduction) শেষবৎ (induction), ও সামান্য (analogy)। এবং বেদের প্রমাণই (আচার্য্য ও ব্রহ্মার বচন) আপ্তবাক্য। অনুমান দ্বারাই সামান্যত অতীন্দ্রিয় পদার্থে জ্ঞান জন্মায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হয়। এবং এই উভয় উপায়ে যাহা স্থিরীকৃত হয় না, তাহাই আপ্তবাক্য দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অধিক দূরত্ব জন্য বা অত্যধিক নৈকট্য বশত ইন্দ্রিয়ের দোষ জন্য—অন্যমনস্ক জন্য—অতি সূক্ষ্মত্ব জন্য—অন্য বস্তুর ব্যবধান জন্য—অন্য বস্তু দ্বারা অভিভূত থাকিলে এবং সমান পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থেরও প্রত্যক্ষসিদ্ধি হয় না।

সাঙ্খ্যকার জগতের মূলতত্ত্ব প্রমাণের এইরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া কিরূপে তাহার অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন, তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভব নহে। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহা অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না (nothing comes from nothing)। উপযুক্ত কারণ হইতেই উপযুক্ত কার্য্য উৎপন্ন হয়। কার্য্য, কারণের স্বরূপ বা সমপ্রকৃতি। আর যখন যাহা বিনষ্ট হয়, তাহা তখন আপন কারণেই বিলীন হয় —তাহার একেবারে ধ্বংশ হয় না। আর এককথা, কার্য্য অপেক্ষা কারণ অধিক সূক্ষ্মতর ও অধিক ব্যাপক।

এই কথা সিদ্ধান্ত করিয়া সাঙ্খ্যকার বলিয়াছেন যে, মূল প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার উপলব্ধি (প্রত্যক্ষসিদ্ধ) হয়

না। কিন্তু তাই বলিয়া মূলপ্রকৃতি নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে। কার্য্য হইতেই তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়—(এবং সমস্ত প্রাকৃত পদার্থই ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া, মূল প্রকৃতিও যে ত্রিগুণ-সম্পন্ন বা তিনটী মূলশক্তিতে গঠিত, তাহাও প্রতিপন্ন হয়)। মহৎ প্রভৃতি সমুদয়ই প্রকৃতির কার্য্য। তবে ব্যক্তাবস্থায় বা প্রকৃতির বিকৃত অবস্থার যে ধর্ম্ম অব্যক্ত, প্রকৃতির ধর্ম্ম তাহার বিপরীত। তাঁহার মতে ব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকলের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে,তাহারা স্বহেতুক, অনিত্য, পরিমেয়, ক্রিয়াশীল, বহুরূপ, কারণাধীন, কারণেই লীন হয়, ও অবয়ববিশিষ্ট। আর বলিয়াছিত, অব্যক্ত প্রকৃতি ইহার বিপরীত গুণযুক্ত। তবে ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রকৃতি উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, তাহারা ত্রিগুণাত্মক,জড়, (সাধারণ) অচেতন, ক্রিয়াশীল (প্রসবধর্ম্মী), ও আ[illegible]দের জ্ঞানের বিষয়ীভূত (objectiv[illegible]), কিন্তু পুরুষ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সাঙ্খ্যকার দেখাইয়াছেন যে, যখন বিভিন্ন পদার্থ মাত্রেরই পরিমাণ আছে, সমন্বয় আছে, (অর্থাৎ যখন তাহারা কতকগুলি সাধারণ গুণবিশিষ্ট);—যখন শক্তি হইতেই তাহাদের প্রবৃত্তি বা উৎপত্তি হয়—যখন কেবল কারণ হইতেই কার্য্যোৎপত্তি হয়, এবং ধ্বংশকালে তাহা কারণেই বিলীন হয়, তখন প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই ব্যক্ত বা পরিদৃশ্যমান জগতের অবশ্যই অব্যক্ত কারণ আছে। এই অব্যক্ত কারণ ত্রিগুণসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের পরস্পর সম্মিলনে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হয়। এবং এই ত্রিগুণ জন্যই পদার্থ সকল নানারূপ হইয়াছে।

সাঙ্খ্যমতে পুরুষেরও অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ। কারণ,অন্যের জন্যই পদার্থের সংযোগ (Creation) সম্ভব। আর প্রকৃতিতে পুরুষের অধিষ্ঠান আছে, নতুবা প্রকৃতি হইতে স্বতঃ সৃষ্টি সম্ভব নহে। আর এক কথা, সাঙ্খ্যকার বলেন,যখন সকল পদার্থই ত্রিগুণবিশিষ্ট, তখন তাহার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত অন্য কিছু পদার্থ আছে। সাঙ্খ্যমতে এই পুরুষ বা আত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করে এবং মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে এই বোধ হয় যে, সাঙ্খ্যমতে পুরুষ এক, সাঙ্খ্য-পণ্ডিতগণই এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন; তবে এই বহুরূপ জগতের সংশ্রবে তাহা বহুরূপ প্রতীয়মান হয়। জন্ম মৃত্যু জন্য, আমাদের ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব জন্য, এক সময়েই বিভিন্ন লোকের মনে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি উত্তেজিত [illegible]লিয়া ও ত্রিগুণের বিভিন্নতা জন্য [illegible] বহুত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

[illegible] দেখান হইয়াছে যে, প্রকৃতির [illegible], পুরুষের ধর্ম্ম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই জগৎ সম্বন্ধে পুরুষ কেবল সাক্ষীস্বরূপ, নির্লিপ্ত, অকর্ত্তা, মধ্যস্থ ও দ্রষ্টা। পুরুষের সহিত সংযোগ জন্য অচেতন প্রকৃতিকে চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়, এবং গুণের কর্তৃত্ব জন্য উদাসীন পুরুষকেও কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। পুরুষের ভোগের জন্যই ও কৈবল্য জন্যই পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হয় এবং ইহা হইতেই সৃষ্টি হয়।

যে ত্রিগুণের কথা লেখা হইল, সাঙ্খ্যকার তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার মতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতির এই তিনগুণ বা এই তিনশক্তি; ইহারা যথাক্রমে সুখাত্মক, দুঃখাত্মক ও মোহাত্মক। সত্ত্ব-

শক্তি প্রকাশ করে,রজঃশক্তি ক্রিয়া বা গতি উৎপন্ন করে, আর তমঃ শক্তি আবরণ করে বা গতি ও ক্রিয়া বন্ধ করে। ফরাসী-পণ্ডিত ল্যাসেঁ ইহার নাম করণ করিয়াছেন,—Essentia (Essence বা Spirit), Impetus (Energy), Caligo (Inertia). ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, আশ্রয় করে, উৎপন্ন করে, এবং একটী অপরটীর সহিত ক্রীড়া করে। সত্বগুণ, লঘু ও প্রকাশ্যভাব; রজঃগুণ,উত্তেজক ও চঞ্চলতাকারী; তমঃগুণ, গুরু ও আবরণকারী। পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম, তৈল সলিতা ও অগ্নি সংযোগে প্রদীপের ন্যায়, এই গুণ গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও, তাহারা একত্র কার্য্য করে। এই ত্রিগুণ হইতে, ব্যক্ত প্রকৃতির অবিবেকাদি ধর্ম্ম জন্মে। এবং কার্য্য কারণের গুণাত্মক বলিয়া এই ব্যক্ত প্রকৃতির ত্রিগুণভাব হইতে, অব্যক্ত প্রকৃতিও যে ত্রিগুণসম্পন্ন, তাহা সিদ্ধ হয়। এবং যে (পুরুষ) ত্রিগুণাত্মক নহে, প্রকৃতির ইহার বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত, ইহাই সিদ্ধান্ত এবং

তৎপরে সাংখ্যকার মূলপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পুরুষের সান্নিধ্যে কিরূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে মূল প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহান্ উৎপত্তি হয়। তৎপরেই এই মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার উদ্ভূত হয়।* এই অহঙ্কারের ষোড়শ পরিণাম হয়,তন্মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পাঁচ স্থূল ভূত সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মধ্যে সত্ত্ব গুণাধিক্যে, কেহ শান্ত, রজো গুণাধিক্যে কেহ ঘোর, আর তমোগুণাধিক্যে কেহ জড়বৎ।

আমাদের সকলের যে বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহা এই মহানের অংশ মাত্র। ইহা জগত্ ব্যাপ্ত এবং সাংখ্য-পণ্ডিতদের মতে প্রকৃত জগত্স্রষ্টা বা ঈশ্বর। ইহার যে অংশ আমাদের মধ্যে আছে, তাহাই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই আমাদের অধ্যবসায়। আমাদের জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সাত্তিক গুণগুলি এই মহত্ত্বের ফল। এবং ইহার বিপরীত গুণগুলি তামসিক।

আমরা পূর্ব্বে মহত্তত্ব হইতে যে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়, বলিয়াছি, সাংখ্যকার বলেন, সেই অহঙ্কার অভিমানাত্মক। ইহা হইতে দুইরূপ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমত ইহার রাজসিক অংশে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়;—সাত্তিক অংশে মন,আর সর্ব্বশেষে পঞ্চ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র তামস ও তৈজস (রাজসিক) উভয়াত্মক অহঙ্কার হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, ইহারাই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—আর বাক্ organs of speech পানি, পায়ু, পাশ ও উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। রাজসিক অহঙ্কার হইতে এই দশ ইন্দ্রিয় শক্তি প্রথমে সৃষ্টি হয়। মন, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক (বা সমধর্ম্মী)। বাস্তবিক মন ইন্দ্রিয়গণের সমধর্ম্মী বলিয়াই তাহাদের সংকল্পক (বা পরিচালক হয়)। যেমন ত্রিগুণের ভেদে বাহ্যপদার্থ সকল নানা প্রকার, সেইরূপ মনও নানারূপ অবস্থাত্মক হয়। সাংখ্যকার এই দশ ইন্দ্রিয়কে সমষ্টি ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন—এবং পরবর্ত্তী সাংখ্যপণ্ডিতগণ ইহাদিগকে এক একটী দেবতা বলিয়াছেন।

* এই বিষয়ের যাঁহারা সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যার নবজীবনে ত্রিগুণ ও সৃষ্টি প্রবন্ধ দেখিবেন।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের শব্দাদি আলোচনা (প্রত্যক্ষ) মাত্রই আমাদের বৃত্তি উত্তেজিত হয়—(ক্রিয়া করে) আর বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ ইহাই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি।

আমরা এই স্থলে বলিয়া রাখি যে, সাঙ্খ্যকারিককার জগৎসৃষ্টি দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। সাঙ্খ্য-প্রবচনেই ইহার সবিস্তার বিবরণ আছে। পূর্ব্বে যে সৃষ্টি প্রকরণ উল্লেখ করা হইল, তাহা ব্যষ্টি বা individual সৃষ্টিসম্বন্ধে। এইটুকু কারিকাকারের খাঁটি মনোবিজ্ঞান। কিরূপে আত্মা প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হয়—কিরূপে তাহার সন্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে বিকার আরম্ভ হইয়া—তাহা হইতে প্রথমে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয়, দশ তন্মাত্র গুলি সৃষ্টি হইয়া প্রথমে শরীর সংগঠিত হয়—কিরূপে এই সূক্ষ্ম শরীর, মাতা পিতৃজ স্থূল শরীরের সহিত একত্রিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে—কিরূপে এই সূক্ষ্ম শরীর, [illegible] আত্মার মুক্তি না হয়—প্রকৃতির [illegible] বিচ্ছেদ না হয়—ততদিন (প্রলয় কাল পর্য্যন্ত) বর্ত্তমান থাকে, [illegible] সকল তত্ত্ব দেখাইয়াছেন।

মূল সাংখ্য সূত্রেও এইরূপ ব্যষ্টি (বা individual) সৃষ্টি দেখাইয়া তাহা হইতে (generalisation দ্বারা) সমষ্টি সৃষ্টি (বা universal creation) অনুমান দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে কারিকামতে ব্যষ্টি সৃষ্টির কথাই উল্লেখ করিব। তবে উপরে সাংখ্যকারের জগত-সৃষ্টির প্রক্রিয়ারও আভাস দিলাম। বাস্তবিক সংখ্যশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ধরিলে সমষ্টি সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখানের তত আবশ্যক নাই, কেবল ব্যষ্টি সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিলেই দুঃখ নিবৃত্তি বা মোক্ষের উপায় বুঝিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়াছি। দেখাইয়াছি যে, বুদ্ধির বিশেষ ধর্ম্ম অধ্যবসায় (intellect), অহঙ্কারের বিশেষ ধর্ম্ম অভিমান (feeling), আর মনের বিশেষ ধর্ম্ম সঙ্কল্প (willing), এই বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, আর দশটী ইন্দ্রিয়, এই ত্রয়োদশটীকে করণ বলে। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, সাংখ্য-মতে, এই ত্রয়োদশ করণের সাধারণ ধর্ম্ম।

এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কি, তাহা বিশেষ রূপে বুঝা যায় না। যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে প্রাণ যখন সকলের পরিচালক, তখন ইহাকে আমরা Feeling of respiration (vitality ও) বলিতে পারি। অপান বায়ুকে Feeling of secretion, সমানবায়ুকে sensation of Digestion or of alimentary canal, উদান বায়ুকে organic sensation of nerve, আর ব্যান বায়ুকে organic feelings of circulation and nutrition বলিতে পারি। বেন সাহেবের Mental Science এর প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন।

সাঙ্খ্যদর্শন মতে, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে, আমাদের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এবং দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটী যুগপৎ অথবা ক্রমেৎ উত্তেজিত হয়। কিন্তু অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে যদি আমাদের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। (স্পেন্সর সাহেবের representative faculty কতকটা এই-

রূপ।) করণগুলি এইরূপ পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী ক্রিয়া উৎপন্ন করে। ইহারা আত্মার জন্যই কার্য্য করে, নতুবা আর কেহ তাহাদিগকে উত্তেজিত করে না।

এই করণগুলি প্রথমত আহরণ করে (perception) তৎপরে ধারণ করে (sensation) এবং শেষে প্রকাশ করে (consciousness) সাংখ্যকার বলেন, এই করণগুলির কার্য্য দশ প্রকার, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচ, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পাঁচ। তবে ইহার মধ্যে কতকগুলি হার্য্য, কতকগুলি ধার্য্য, আর কতকগুলি প্রকাশক। (কেহ কেহ বলেন, আহরণ বলিলে "application of an organ to the object to which it is adapted" এই কথা বুঝায়, আর ধারণ করা বলিলে আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বুঝায়, অথবা অন্তঃকরণ বৃত্তির ক্রিয়া বা প্রাণ সংরক্ষণী ক্রিয়া বুঝায়।)

এক্ষণে বুঝা গেল যে, সাংখ্যমতে অন্তঃকরণ mind ত্রিবিধ;—বুদ্ধি intellect, অহঙ্কার feeling, আর মন willing। আর বাহ্য বৃত্তি দশটী, তাহারাই পদার্থ সকলকে জ্ঞাপন করে (সেই জন্য তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়) ; বর্ত্তমান কাল লইয়া বাহ্যবৃত্তি—আর ত্রিকাল লইয়াই অন্তঃকরণ। সাংখ্যকার বলেন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থূল পদার্থ সকলই গ্রহণ করে, তবে কোন কোন অবস্থায় (যোগ অবস্থায় বা উচ্চতর দেবতার পক্ষে) তাহারা সূক্ষ্ম পদার্থও গ্রহণ করিতে পারে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাকের (organ of speech) বিষয় কেবল শব্দ। অপর চারি কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ ভৌতিক সমুদায় স্থূল বিষয়ই গ্রহণ করে।

সাংখ্যমতে বুদ্ধি প্রভৃতি তিন অন্তঃকরণই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিবার মূল কারণ। এই জন্য তিনটীকেই প্রকৃত করণ বলে, দশটী ইন্দ্রিয়কে কেবল ইহাদের দ্বার বলা যায় মাত্র। এই ত্রয়োদশ করণ পরস্পর বিভিন্ন, ইহারা ত্রিগুণ হইতে জাত, অথচ প্রদীপের ন্যায় বিষয় সকল প্রকাশ করে। ইহারা পুরুষেরই জন্য সমস্ত প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে প্রেরণ করে, আর বুদ্ধিস্থ হইলেই পুরুষের তাহা উপলব্ধি হয়। সাংখ্যমতে যে বুদ্ধি হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ পুরুষ উপভোগ করে—সেই বুদ্ধি হইতেই মূল প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ অবগত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে যতদূর দেখান হইল, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্রের মনোবিজ্ঞান। যতদূর দেখা গেল, তাহাতে এই বুঝা যায় যে, সাংখ্যকার অতি সংক্ষেপে, অল্প কথায় মনোবিজ্ঞানের প্রায় সমুদায় মূল সূত্রগুলিই দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে আমরা এ বিষয় অধিক বিশদ করিয়া দেখাইতে পারিলাম না।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, শরীর সাধারণত তিন প্রকার, এক সূক্ষ্ম শরীর (ইহা পুরুষের সান্নিধ্যে ত্রয়োদশ করণ আর পঞ্চতন্মাত্রে গঠিত) এই জন্য ইহাকে কেহ কেহ তন্মাত্রিক শরীরও বলে। আর এক মাতা পিতৃজ শরীর, ইহাই সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীর সহ সংযুক্ত করে। আর তৃতীয় স্থূল শরীর, ইহা পঞ্চ ভৌতিক (সাংখ্যপ্রবচনে ইহা একভৌতিক ক্ষিতিভূত হইতে জাত) ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর স্থায়ী, আর স্থূল শরীর অস্থায়ী (সাংখ্যমতে এই সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টির প্রথমেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা সঙ্গ রহিত, স্বাধীনভাবে বিচরণ

করে, কিন্তু কিছুই (সুখ দুঃখ ইত্যাদি) উপভোগ করে না—আর লয় কালে কারণে বিলীন হয়। যেমন আশ্রয় ব্যতীত চিত্র হয় না, সাংখ্যমতে সেইরূপ আশ্রয় (ভূতাশ্রয় ব্যতীত) লিঙ্গ শরীর থাকিতে পারে না। এই লিঙ্গ শরীর সাংখ্যমতে কেবল আত্মার জন্যই ক্রিয়া করে এবং কার্য্য ফল ভোগ করে, এবং এই ক্রিয়া ও কার্য্য ফল দ্বারা ভূতের সহিত সংযোগের জন্য, এই শরীর পুরুষের জন্য নটবৎ কার্য্য করে। সাংখ্যমতে ইহার ভাব (condition) তিন প্রকার,—সাংসিদ্ধিক (innate) প্রাকৃতিক (essential) ও বৈকৃত (incidental) পাতঞ্জল-দর্শনে ইহাকেই সিদ্ধি বলিয়াছেন। ইহা হইতেই ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হয়। ইহারা সূক্ষ্ম শরীরের অংশ, আর কর্ম্ম হইতেই স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়।

সাঙ্খ্যকার বলেন, ধর্ম্মে উদ্গমন (উচ্চতর অবস্থায় পরিণতি) আর অধর্ম্মে অধোগমন (তির্য্যগ যোনিতে গমন) হয়। জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, আর অজ্ঞান হইতেই বন্ধন বা প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হয়। বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতি লয় হয়। রজঃগুণ বা রাগ (Passion) হইতে সংসরণ বা যোনিতে ভ্রমণ হয়। আর অণিমাদি ঐশ্বর্য্য হইতে বাধা দূর হয়। ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। সুবিধার জন্য নিম্নে ইহার তালিকা দেখান গেল।—

Cause	*Effect*
1 Virtue .	Elevation in the scale of being.
2 Vice	Degradation in the scale of being.
3 Knowledge	Liberation from existence.
4 Ignorance .	Bondage or transmigration.
5 Dispassion ...	Dissolution *of* the subtile bodily form.
6 Passion ...	Migration.
7 Power ...	Unimpediment.
8 Feebleness	Obstruction.

Wilson's Comment on Sankhya Karika, p, 141.

ইহার পর সাংখ্যকার বুদ্ধি ও বুদ্ধিজাত বিপর্য্য (মিথ্যা জ্ঞান Illusion), অশক্তি (Imperfection of Intellect), তুষ্টি (Indifference), সিদ্ধি (Complete knowledge) প্রভৃতির বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কৌতূহলী পাঠকগণ গত পৌষের নবজীবনে "বুদ্ধিবধ ও জ্ঞানকাণ্ড" প্রবন্ধে পঞ্চশিখাচার্য্য মতে সাংখ্যের ইন্দ্রিয়ের অশক্তির কথা জানিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত লিঙ্গশরীর, ভাব-Personal and intellectual creation, দেবশরীর, তির্য্যগ-শরীর প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সে সকল বিষয়ের এ স্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

যাহা হউক, সাঙ্খ্যকার বলেন যে, এই চৈতন্য পুরুষ এই শরীর হইতেই জরা মরণরূপ দুঃখ ভোগ করে, আর যতদিন না শরীর হইতে মুক্ত হয়, ততদিন এই দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। অতএব এই দুঃখই শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রকৃত হইতে মহতত্ত্বাদি পঞ্চভূত সৃষ্টি হইয়াই আত্মাকে বদ্ধ করে এবং ইহা হইতেই পরিশেষে আত্মার মুক্তি হয়। সাঙ্খ্যকার স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, আত্মার বন্ধন নাই,—মুক্তি নাই, জাতি পরিণাম নাই। প্রকৃতিই কেবল ইহার নানা অবস্থার সহিত সম্বন্ধ বশতঃ বদ্ধ হয়, মুক্ত হয়, বা জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। ধর্ম্মাধর্ম্ম, রাগ বিরাগ, পাপ পুণ্য,

ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি দ্বারাই পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বন্ধন হয়। আর পুরুষ ইহা তাহার নিজের বন্ধন বিবেচনা করে। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই কেবল মুক্তি হইতে পারে।

ইহার জন্য বিচার, শ্রবণ, অধ্যয়ন, সুহৃদপ্রাপ্তি, দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন, ইহাই জ্ঞানের প্রধান উপকরণ। সাঙ্খ্যকার বলেন যে, তাহার পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে এই শ্রেষ্ঠজ্ঞান উৎপন্ন হইবে যে,—"আমি কেহ নহে, আমার কেহ নহে, ও আমার অস্তিত্ব নাই।" এক কথায় আমাদের প্রকৃতিজ অহং জ্ঞান দূর হইলে, প্রকৃতির সহিত আত্মার বন্ধন ঘুচিবে, ও আত্মার মুক্তি হইবে। সাঙ্খ্যকার, অর্থাৎ আত্মা এইরূপে প্রকৃতির স্বরূপ সংরক্ষণী হইলে,প্রকৃতি আপনিই আত্মাকে পরিত্যাগ করিবে—তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের কিছুই ফল হইবে না। সাঙ্খ্যকার, আত্মার এই অবস্থায় প্রকৃতি তাহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে বিষয়ের এখানে আর অবতারণা করিলাম না।

আমরা এতক্ষণ সাংখ্যদর্শনের সার মর্ম্ম উল্লেখ করিলাম। যে সাংখ্যজ্ঞানকে প্রাচীন আর্য্য-ঋষিরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্থূল স্থূল অংশ আমরা এস্থলে দেখাইলাম। সাংখ্য শাস্ত্রমত এই জ্ঞান যাহার হইবে,সেই মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু সহজে এ জ্ঞান হওয়ার সম্ভব নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, এই প্রকৃতি চারি প্রকার অবস্থা, বিশেষ (ব্যক্ত), অবিশেষ (অব্যক্ত), লিঙ্গ (কারণে লীন) এবং অলিঙ্গ (মূল প্রকৃতি ভাব)। ইহার মধ্যে বিশেষ অবস্থা আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অনেক বিঘ্ন আছে। ইহা ব্যতীত প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থা উপলব্ধির উপায় কি? বলিয়াছি ত,প্রকৃতির স্বরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি না করিলে ত মুক্তি নাই। সাংখ্যকার বলেন, এই অব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করিবার উপায়, যোগ। যেমন যুক্তি বলে পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অনুমান করিতে পারিব, সেইরূপ যোগবলে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। এইরূপে নির্ব্বিকল্পভাবে যোগযুক্ত হইয়া প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করিলেই তাহার সহিত আত্মা বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে এবং তাহা হইলেই মুক্তি হবে।

অতএব সাংখ্যশাস্ত্রে প্রথমত ত্রিশত্রয় নিবৃত্তি বা মুক্তির উপায় স্থির করিতে গিয়া যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এই।

(১) কিরূপ যুক্তি বা তর্ক শাস্ত্র (method of reasoning or Logic) অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব স্থির করিবেন, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) তৎপরে এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল সত্য (axioms) ধরিয়া লইয়াছেন।

(৩) তৃতীয়ত, তিনি উল্লিখিত যুক্তিবলে এই ব্যক্ত জগতের মূলে,(underlying) যে অব্যক্ত জগত আছে তাহাই দেখাইলেন, তাহার গুণ কি, তাহার কার্য্য কি, ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম্ম কি, তাহা স্থিরীকৃত করিয়াছেন।

(৪) তৎপরে তিনি, অব্যক্ত জগত কেন যুক্তিসিদ্ধ, তাহা দেখাইয়াছেন, পুরুষের অস্তিত্বও যুক্তি সম্মত এবং পুরুষের ধর্ম্ম কি, তাহাও দেখান হইয়াছে।

(৫) এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগত যে ত্রিগুণাত্মক,সেই ত্রিগুণের স্বরূপ ও ধর্ম্ম কি, তাহা স্থির করা হইয়াছে।

(৬) অব্যক্ত জগত হইতে কিরূপে ব্যক্ত জগত সৃষ্টি হইল, তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

(৭) তৎপরে সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান। সংক্ষিপ্ত সূত্র পুস্তকে যত দূর সম্ভব, এই মনোবিজ্ঞান বেশ বিশদরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(৮) তৎপরে শরীর বিজ্ঞান—স্থূলশরীর, সূক্ষ্ম শরীর বিচার,—জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতি তত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে।

(৯) সর্ব্বশেষে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। সে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, কিরূপে মুক্তি হয়, তাহা বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে।

সাংখ্যের এতগুলি তত্ত্ব বিশদ করিয়া বুঝান সহজ নহে। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কারিকা অবলম্বনে তাহা নির্দ্দেশ করিলাম মাত্র। মূল সাংখ্যসূত্রের যুক্তি অনেক সময়ে জটিল—অনেক সময় সামান্য বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, সাংখ্যদর্শন আপাততঃ অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; বিশেষত সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে যে মূলানুসন্ধায়ী বা *a priori* যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা এই উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সময়ে বিশেষ আদৃত হয় না, বা বিশেষরূপে বুঝা যায় না। আর এক কথা, আধুনিক বিজ্ঞান পড়িয়া জড়বাদ আমাদের হাড়ে হাড়ে বিন্ধিয়াছে, আমরা পরিদৃশ্যমান জড় জগতের বাহিরে যে আর কিছু আছে,তাহা একেবারে ধারণা করিতে পারি না,—যে যুক্তিতে তাহার সিদ্ধান্ত সম্ভব, তাহা অসার মনে করি; কাজে কাজেই আমরা প্রকৃত পক্ষে সাংখ্য প্রভৃতি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র বুঝিবার অধিকারী নহি। তবে যে বিজ্ঞান আমাদিগকে জড়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী করিয়াছে,সেই বিজ্ঞানই যত অধিক বুঝা যাইবে, ততই আমাদের জড়বাদ দূর হইবে—জড়ের কারণ রূপে যে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে,—যে অব্যক্ত জগত লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। তখন সাংখ্য প্রভৃতি প্রাচীন দর্শনের যুক্তি বুঝিব,তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহার আদর করিতে শিখিব।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

শেষে অশ্রু ঝরিল।*

রণ-হত পতি-দেহ গৃহে ফিরি আনিল;
না ঝরে নয়ন, না সরে বচন;—
সে ভাব নিরখি সহচরীগণ,
"রোদন অথবা নিশ্চয় মরণ,"
সবে কাণাকাণি করিল।

* After Tennyson's Song—"Home they brought her warrior dead—Vide the Princess, Beginning of canto VI.

বীরের যতেক গুণ ধীরে ধীরে গাহিল;
বলিল, রমণী-হৃদয়ের সার,
প্রকৃত বান্ধব, অরাতি উদার;
শরীর নিস্পন্দ, মুখেতে বালার
বচন না তবু সরিল।

৩

সখি এক ধীরি ধীরি নিজস্থান ত্যজিল;
মৃত্যু শয্যাপাশে করিয়া গমন,
চকিতে খুলিল মুখ-আবরণ,—
শরীরে বালার না হল স্পন্দন,
নয়ন না তবু ঝরিল।

৪

নবতি বর্ষের দাসী বীর শিশু লইয়া,
বসাল শিশুরে কোলে বিধুবার;—
ছুটিল নয়ন, বরষা-আসার,
ফুটিল বচন,—"বাছারে আমার
বাঁচিব তোমার লাগিয়া!"

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সন্ধিস্থলে।

দুটী বস্তু যে স্থানে মিলিত হয়, তাহাকে সন্ধিস্থল কহে। এই মিলনের স্থান অতি উপাদেয় বস্তু। সংসার-মরুর ওয়েসিস, বিপদ-সাগরের আশা তরী, উষ্ণ পৃথিবীর শীতল বট-ছায়া,—এই মিলনের স্থান। তোমার হৃদয় অতি কঠোর হইয়াছে,—বিজ্ঞান দর্শনের কূট প্রশ্নের জটিল তত্ত্ব মীমাংসায় মস্তিষ্ক বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে,—সোণার বর্ণ কালিমাময় হইয়া গিয়াছে? ভাই, ক্ষণকাল কোন এক পর্ব্বতের উচ্চস্থানে আরোহণ কর,—দেখ, চতুর্দ্দিকে কেবলই পাহাড়ের কোলে পাহাড় উদাসীনত্ব প্রচার করিতেছে, বৃক্ষের পশ্চাতে বৃক্ষ সো সো রবে দুলিতেছে, ঝরণার গায়ে ঝরণা বহিয়া, কুল কুল রবে, কোথাও বা গভীর গর্জ্জনে উপলখণ্ড সকলকে অবহেলা করিয়া তীরবেগে ছুটিতেছে;—তাহারই নিকটে বৃক্ষে বসিয়া কত কত পাখী, অতি মধুর স্বরে, মধুর ঝঙ্কারে পাহাড়ের নিস্তব্ধতাকে ভেদ করিয়া, আকাশ ভাসাইয়া কি স্নিগ্ধকর অমৃত ঢালিতেছে;—চাহিয়া দেখ, এই মধুময় স্থানে, অনন্তগগন-পথকে অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বত শোভাকে তুচ্ছ করিয়া, দেহকে আরক্তিম করিয়া, ঐ বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া সূর্য্যদেব অস্তমিত হইতেছেন। উজ্জ্বল সোণার রং ক্রমেই কালিমাময় হইতেছে,—উষ্ণত্ব, উজ্জ্বলত্ব কমিয়া যাইতেছে, অমনি দূরবর্ত্তী পাহাড়ের অঙ্গ শোকে যেন বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছে,—সকল শোভা নিমেষের মধ্যে আঁধারময় হইয়া আসিতেছে! আলোক আর আঁধার, আনন্দ আর ভয়, উৎসাহ আর বিষাদ,—আসক্তি আর বৈরাগ্য,—দিবস আর রজনী, একস্থানে মিলিয়াছে!!—এই মহা সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া একবার বলত, ঐ মিলন উপাদেয় কিনা, হৃদয়-প্রফুল্লকর কিনা? দেখিতে দেখিতে এ ভীতিমাখা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পাখী সব কুলায় ছাড়িয়া, গগন ছাইয়া, মেঘের কোলে চড়িয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছে,—পশু সকল ত্রস্তব্যস্ত হইতেছে,—মেঘ সকল দ্রুত চলিয়া বিদ্যুৎ ঢালিয়া পাহাড়ের গায়ে আশ্রয় লইতেছে,—ঝরণা হইতে অবিরত বাষ্প উঠিয়া, দিক ডুবাইয়া, আনন্দোৎসবে মত্ত হইতেছে,—যোগাশ্রমে শঙ্খ

ঘণ্টা উচ্চরবে বাজিতেছে,—নরনারী মিলিত কণ্ঠে যোগেশ্বরের গুণ গাইতেছে,—কি আনন্দ, কি মহোৎসব, কি স্বর্গের ছবি ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছে! মানুষ, এ ছবি দেখিয়া, শুষ্কত্ব, কঠোরত্ব, নিরাশত্বকে হৃদয় হইতে খুলিয়া রাখিয়া,—অবিশ্বাস, অপ্রেম, অভক্তি,—রিপুর জ্বালা,—সংসারের বিপদ-জালকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া, ভক্তি-গদ-গদ চিত্তে এই মহোৎসবে ক্ষণকালের জন্য যোগ দিয়া কৃতার্থ হইতেছে!! সান্ধ্য-গগন তলে, সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিয়া, এমন কোন্ পাষণ্ড পৃথিবীতে আছে, যে বক্ষস্ফীত করিয়া বলিতে পারে, আমার হৃদয়ে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, মন আনন্দে মাতে নাই,—জীবন সুখময় বলিয়া বোধ নাই?

আর একস্থানে এস। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্র উৎসরিত হইয়া জীবনলীলা খেলিতেছে,—কত দেশের মলিনতা বিধৌত করিতেছে, কত মেঘ-পরিত্যক্ত বারি-রাশি বা পাহাড়-চ্যুত ঝরণা-রাশিকে প্রশস্ত উদার কোল পাতিয়া স্থান দিতেছে,—কি মধুর প্রেমের খেলা খেলিতেছে; কত চাঁদের কিরণ ধরিতেছে,—কত ভাব-তরঙ্গ তুলিয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে। চলিতে চলিতে,—দূর দেশ হইতে আগত, প্রেম-বিহ্বল, গঙ্গা-যমুনার ঘনীভূত মিলন—উত্তালতরঙ্গময়ী, উন্মত্ত, পদ্মার সহিত যখনই সাক্ষাৎ হইল, অমনি কোলে কোল মিলাইয়া, হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া,—জীবন-মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, দুই এক হইয়া গেল;—ভ্রাতা ভগ্নীর এমন ঘনিষ্ঠ মিলন আর কে কবে দেখিয়াছে? উন্মত্তভাবে উন্মত্তভাব মিশিল, প্রশস্ত হৃদয় আরও প্রশস্ততর হইল,—মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে মায়াময়ী পদ্মা, পূর্ব্বব-ঙ্গকে কৃতার্থ করিয়া, ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধরিয়া ছুটিতে লাগিল। বাধার উপরে বাধা, বিঘ্নের উপরে বিঘ্ন; বিপদের উপরে বিপদ, সকল অতিক্রম করিয়া, গভীর গর্জ্জনে সকলকে ভীত করিয়া, শেষে মেঘনার কূলে যাইয়া, আপনাকে বিসর্জ্জন দিল। গভীরে গভীরতা, প্রশস্ত হৃদয়ে প্রশস্ততা, উন্মত্ততাতে উন্মত্ততা মিলিয়া মিশিয়া সেখানে যে কি মহাশক্তি সংগঠিত হইল, যে কখনও দেখে নাই, তাহাকে বুঝান যায় না। জীবনে জীবন ঢালিয়া, হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া যে কি সুখ, আমাদের ন্যায় লোকেরা তাহা কি বুঝিবে? একতা-বিহীন, সম্প্রদায়-প্লাবিত, ব্যক্তিত্ব-পূজিত, অহং-জ্ঞান-গর্ব্বিত ভারতের নব্যসম্প্রদায় তাহা কি বুঝিবে? ব্রহ্মপুত্র, হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া, আপনার অস্তিত্বকে ডুবাইয়া, গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য ভ্রাতা ভগ্নীর কোলে ডুবিয়া, অলক্ষিত ভাবে, অনন্ত মহাসিন্ধুতে মিলিতে চলিল!! সেরূপ দেখিয়া জগৎ মোহিত, সে ভাব দেখিয়া সংসার বিস্মিত! সকল মায়া, সকল মোহ অতিক্রম করিয়া, শেষে মহাসাগর-কূলে উপস্থিত হইল। ক্ষুদ্র আর মহান, সসীম আর অসীম, সঙ্কীর্ণ আর উদার, সংখ্যা-জ্ঞাপক আলোক আর বিশেষত্ব-নাশক আঁধার, যেখানে একত্বে মিলিত হইতেছে, সে স্থানের বর্ণনা আর আমরা কি করিব! সীমা অসীমে মিশিতেছে, ক্ষুদ্র অনন্তে ডুবিতেছে, জীবন-মায়া বিসর্জ্জিত হইতেছে যেখানে, আমরা মায়া মোহের দাস, সে মহাসন্ধি-স্থলের ব্যাখ্যা আর কি করিব!! কূল ছাড়িয়া ব্রহ্মপুত্র অকূলে দেহ ঢালিতেছে,

—আসক্তি ছাড়িয়া মহা বৈরাগ্যে মজিতেছে—রূপ বিসর্জ্জন দিয়া অরূপে মিশিতেছে—আলোক ত্যজিয়া মহা আঁধারে ডুবিতেছে। কি সৌন্দর্য্য, কি অপরূপ চিত্র, কি স্বর্গের ছবি! মৃত্যুকে ভয় করি, তুমি আর আমি; যে মরিতেছে, সে ভয় করে না। মহাসন্ধিস্থলে যখন মানুষ দণ্ডায়মান হয়,—শরীরের সহিত আসক্তি, মায়া, মোহ, রূপ গন্ধ, জ্বালা যন্ত্রণা, পাপ তাপ, যখন সকল নির্ব্বাপিত হইতে থাকে, তখন মানুষ যে তৃপ্তিকর সুখে, যে মনোমোহন শান্তিতে নিমগ্ন হয়; সন্দেহবাদী, অবিশ্বাসী আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। আমরা বুঝি আর না বুঝি, জানি আর না জানি, ঐ পথেই চলিয়াছি; জীবন তরী বিপদ-মেঘনায় ডুবিবে বলিয়া ভয় করিতেছি না,—কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে, কোন্ অলক্ষিত শক্তির ইঙ্গিতে, কে জানে, সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া, অবিরত আমরা ঐ মহাসন্ধিস্থলকে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছি। যদি সুখ শান্তির আশা না থাকে, তবে চলিয়াছি কেন, বলিতে পার?—তোমরা চলিতেছ কেন, বলিতে পার? বাস্তবিকই এমন সুখের স্থান আর নাই, তাই চলিতেছি। শিশু মরিয়া বালক হইতেছে, বালক মরিয়া যুবক সাজিতেছে, যুবক রূপ ডুবাইয়া বৃদ্ধ হইতেছে, বৃদ্ধ শেষে মায়া মোহ বা আসক্তিকে ডুবাইয়া অনন্তকাল-সাগরে মিশিতেছে। ব্রহ্মপুত্র পদ্মা হইতেছে, পদ্মা-মেঘনা রূপ ধরিয়া পরে মহাসমুদ্রে মিশিতেছে। সৃষ্টির মহত্তত্ত্ব যে জন হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে, জীবন-মহাকাব্য যে জন একবার অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে এই গভীর ভীতি-সংযুক্ত মহাসন্ধি-স্থলের মহত্তত্ত্ব, মহাকাব্য পাঠ করিয়া বিস্মিত, আনন্দ-বিহ্বল না হইয়াই থাকিতে পারে না। মহাসিন্ধুতে দেহ ঢালিতে আসিয়া যে ব্যক্তি চক্ষের জলে বক্ষ ভাসায়, সে ত অবিশ্বাসী মূর্খ; কিম্বা মহাসিন্ধুতে ব্রহ্মপুত্রকে কূলের মমতা ছাড়িয়া মিলিতে দেখিলে সে জন চক্ষের জল ফেলে, সে ত নরকের কীট,—মায়া মোহের অধীন, আসক্তির দাসানুদাস। মানুষের বাহ্য-চক্ষুর ভিতরে যে অন্তর-চক্ষু বিদ্যমান রহিয়াছে,—দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়-শক্তি লুক্কায়িত আছে, এই মাটীর শরীরের মধ্যে যে বিবেক-তাড়িত চলিতেছে, তাহার সাহায্যে, যে এই মহাসন্ধিস্থলের মহত্তত্ত্ব দেখিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে,—সন্ধিস্থল কি সুন্দর, কি হৃদয়-তৃপ্তিকর, কি মনোমোহন!

জীবনময় সন্ধিস্থল, ভুবনময় মিলনের শাস্ত্র। মিলনই লক্ষ্য, মিলনই গতি, মিলনই পরিণাম,—এই জীবনের, এই ভুবনের। কত ব্যাখ্যা করিব, কত কথা বলিব! কঠিন প্রস্তরে শীতল ঝরণা, শীতল মেঘেতে কঠিন বজ্র; কোমল কুসুমে তীক্ষ্ণ কণ্টক; সূর্য্যের প্রখর দীপ্তিময় বুকে রজনীর আঁধার, চন্দ্রের স্নিগ্ধতাতে রূপ-কলঙ্ক;—কঠিন পুরুষের হৃদয়ে কোমল নারীর হৃদয়;—সুখে দুঃখ;—বিপদে সম্পদ; উৎসাহে বাধা; পাপে পুণ্য; হৃদয়ে শরীর; উদারতায় সঙ্কীর্ণতা;—বৈরাগ্যে আসক্তি; ধর্ম্মে অধর্ম্ম; আলোকে আঁধার, এ সকল মিলনে কি স্বর্গের শোভা বিদ্যমান, সঙ্কীর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া, চক্ষু খুলিয়া সে একবার দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। আধ হাসি আধ কান্না;—আধ প্রেম আধ জ্ঞান;—আধ মোহ আধ মুক্তি,—

—এইরূপ মিলনের স্থান কি এক উপাদেয় বস্তু!!

এই যে সন্ধিস্থলের মাহাত্ম্য এতক্ষণ ধরিয়া ক্ষীণ ভাষায় কীর্ত্তন করিলাম,—এই সন্ধিস্থল জীবনময়, ভুবনময়। অণুতে অণুতে সন্ধি, জড়ে জড়ে সন্ধি, জীবে জীবে সন্ধি, মানুষে মানুষে সন্ধি। মিলনের জন্য জগৎ চির-লোলুপ। দুটী বর্ণ মিলিয়া এক হইতেছে, দুটী নদী মিলিতেছে, দুটী পুষ্পের অণু সম্মিলিত হইতেছে, দুটী হৃদয় মিশিতেছে, দুটী দেশ বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া মিলিতেছে, দুটী জাতি যুদ্ধ বিগ্রহ মিটাইয়া সন্ধির জন্য লালায়িত হইতেছে; দুটী সম্প্রদায় মত-পার্থক্যকে ভুলিয়া, ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া এক হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিচ্ছেদ, অমিলন, পৃথিবীর বড়ই অসহ্য। স্বামী স্ত্রীর মনমালিন্যে বা ঝগড়া বিবাদে পৃথিবীর বায়ু দূষিত হইতেছে, কিন্তু কোন্ মানুস এমন আছেন, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, রমণীর সহিত মিলিত হইতে যাহার বিতৃষ্ণা বা অনিচ্ছা জন্মিয়াছে? তোমাতে আমাতে কত বিবাদ, মতের পার্থক্য হেতু কত অসদ্ভাব, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া অনুসন্ধান কর, বুঝিবে, আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য তোমার হৃদয়ের এক গভীর তৃষ্ণা রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা, পৃথিবীর এই মিলনের প্রবল বাসনাকে অনেক মলিন করিয়া ফেলিয়াছে বটে; পৃথিবীর প্রভুত্ব-লাভ-ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, দেশে দেশে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া মিলনের গভীর বাসনাকে অনেকাংশে বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে; কিন্তু স্থির ভাবে অনুসন্ধান কর, পরীক্ষা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে,—এখনও মিলনের জন্য কেমন এক স্বর্গীয়-ভাব নরনারীর শোণিতের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। প্রত্যেক নরনারীর মুখে বা হৃদয়ে, পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুতে এমন এক স্বর্গীয় জিনিষ, এমন এক আচার্য্য অমৃত-ভাণ্ডার, এমন এক বিশেষত্ব নিহিত রহিয়াছে, যাহার মমতায় মানুষ মানুষের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত। যে জন মিলনের এই প্রবল বাসনার মুখে জাতি-বিদ্বেষ-ভস্ম ঢালিতে প্রয়াসী, তাহার ন্যায় পৃথিবীর শত্রু আর নাই। সৃষ্টির গূঢ় রহস্যই যেন,—মিলন। প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক জীবেই এই জন্য, বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। বিশেষত্ব লাভের জন্য, পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য চির-লোলুপ। বিশেষত্ব লাভের জন্য মানুষ এতই উৎকণ্ঠিত যে, চিরকাল কখনই এক অবস্থায় থাকিতে সে ভালবাসে না। যে দুঃখের কষাঘাতে আমাদের ন্যায় দরিদ্রের অঙ্গ পেষিত হইয়া যাইতেছে, চির-সুখীজন সেই দুঃখকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই লালায়িত। চির-আলোক মানুষ সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই, প্রজ্জ্বলিত দীপকে রাত্রে নির্ব্বাণ করিয়া রাখে। এক অবস্থা মানুষের কখনই ভাল লাগে না। বালক যুবক হইতে চায়। যুবক বৃদ্ধত্বের জন্য লালায়িত। দরিদ্র ধন চায়, ধনী দারিদ্র্যকে ভালবাসে। সুখে দুঃখ না মিলিলে, সুখ সুখই নয়। ধনের পার্শ্বে দারিদ্র্যের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ধ্বনিত না হইলে, ধনে কোন সুখই পাওয়া যায় না। নদীতে ভীতিযুক্ত তরঙ্গ না থাকিলে নদীর আদর হয় না,—অরণ্যে

হিংস্রজন্তু না থাকিলে অরণ্য ভাললাগে না; —রজনীতে চন্দ্রের ফুল্লকুসুমবৎ জ্যোতির কোলে আঁধার না ভাসিলে কখনও চন্দ্রমার আদর হইত না। এক অবস্থা, এক ভাব পৃথিবীর অসহ্য। তাই এত বিশেষত্বের সৃষ্টি। লালের পার্শ্বে নীল, নীলের কোলে শাদা, শাদার বুকে সবুজ, সবুজের ধারে কাল, কালোতে হলুদ মিলিয়া মিশিয়া কতই তৃপ্তি উৎপাদন করিতেছে। যদি পৃথিবীর সব একাকার হইত—বৃক্ষ তলা, চন্দ্র সূর্য্য, আলোক আঁধার, পর্ব্বত নদী, নরনারী, তুমি আমি, —বালক বৃদ্ধ, সকলই যদি একাকার হইত, পৃথিবীতে মিলনের এই যে গভীর শাস্ত্রের কথা বলিতেছি, এ শাস্ত্র থাকিত না;— পৃথিবী নরনারীর বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত। ঈশ্বরের বিধান, মানুষ পৃথিবীতে বাস করিবে, তাই অবস্থার পরে নূতনতর অবস্থা আসিতেছে,—পৃথিবী যেন অনন্ত বৈচিত্র্যময় শোভায় সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ মিলিতে মিলিতে, ক্রমাগত মহা-মিলনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অবস্থার পরে অবস্থা, লোকের পরে লোক, জাতির পরে জাতি, ক্রমেই আসিয়া মানুষের শূন্য বুককে আলিঙ্গন করিতেছে। দুঃখীর মনে যদি অবস্থার বৈপরিত্যের আশাময়ী অঙ্কুর না থাকিত, তবে দুঃখী কখনও জীবনভার বহিত না। ঘোরতর যুদ্ধের সময় উভয় দলের মনে যদি সন্ধিরআশা না জাগিত, তবে কেহ দেহ বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধে রত হইত না। মানুষের জীবন উন্নতির দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইবে, এ বিশ্বাস যদি নরনারীর হৃদয়ে না থাকিত, মানুষ কখনও জীবন-সংগ্রামে রত হইতে পারিত না,—আত্মঘাতী হইয়া মরিত। যে দিকে দেখ, সর্ব্বত্রই মিলনের বিধান, সৃষ্টির গূঢ় স্থানে সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত। এই মিলনকে লক্ষ্য করিয়াই, মিলনকে ধরিয়াই মানুষ চলিতেছে। পৃথিবী হইতে মিলনের ভাব উঠিয়া যাইতেছে, যে মনে করে, সে মূর্খ; কারণ মিলনের আশা না থাকিলে বিশ্বের কোন জীবসংখ্যার বৃদ্ধি হইত না। আমরা বুঝিতেছি, পৃথিবী সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত মিলনের দিকেই চলিতেছে! ভারতবর্ষ আর ইংলণ্ডের সহিত দশ শত বৎসর পূর্ব্বে যে সম্বন্ধ ছিল না, সে সম্বন্ধ আজ হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য পৃথিবীকে ক্রমাগত এক গভীর আত্মীয়তার দিকে, —এক অপরূপ মিলনের পথে লইয়া যাইতেছে। য়ুরোপ আসিয়া, আফ্রিকা আমেরিকা, আজ সকলেই মিলন, সকলেই ভ্রাতৃভাবের জন্য লালায়িত হইতেছে। আর্য্যভাবে পাশ্চাত্য ভাব মিশিতেছে,—শ্রীগৌরাঙ্গে আর মহম্মদে, শাক্যমুনি আর যিশুখ্রীষ্টের সহিত গভীর মিলনের ভাব দেখা যাইতেছে। ভারত কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ মূর্খ পণ্ডিত, তুমি তাহা কি বুঝিবে? পৃথিবীর সকল দেশ উন্নতির জন্য, পরস্পরের বিশেষত্ব গ্রহণের জন্য উন্মত্ত হইয়া, কষ্ট যন্ত্রনাকে মাথায় বহিয়া দেশ দেশান্তরে যাইবে, আর ভারত চিরকাল একই ভাবে মরণের কোলে পড়িয়া রহিবে? অসভ্য জাপান উন্নতির সঙ্গীত ধরিয়াছে,—পর-পদ-দলিত ইটালীতে আবার দীপ্তিময়ী অবস্থা পরিবর্ত্তনের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতেছে,—অসভ্য রুসিয়া উন্নত মস্তকে রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে ছুটিতেছে, আর

সোণার ভারত চির অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে? বিধাতার বিধান কখনই তাহা হইতে পারে না। এক অবস্থার পীড়নে কখনই কোন জাতি চিরকাল পেষিত হইতে পারে না। তাই দেখ,দুঃখের পরে সুখ-সূর্য্য উদিত হইতেছে। ভারত যে এক অপরূপ সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, আজ আমরা তাহারই কথা বলিব। মরণের কোলে শুইয়া, ভারত যে এক জীবন্ত ভাব উপার্জ্জন করিতেছেন, আজ আমরা তাহারই কথা বলিব।

বহুকাল ধরিয়া ভারতে এই এক গভীর শাস্ত্র প্রচারিত হইতেছিল,—আপনাকে লইয়া মত্ত হও। "আপনি মানুষ হও, আপনি মহত্ত্ব লাভ কর, আপনি যোগী হও, আপনি মুক্ত হও, সংসারসুখ, ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া বিজন সুমেরু বনি[?] কর, যোগ সাধনায় অঙ্গ ঢালি[?]তায় সিরার্ব্বান মুক্তি লাভ করিয়া মোক্ষধা[?], আমরা যা[?]," বিধাতার ভূমিতে মহত্ত্বের জ্য- [illegible] টিল। মুসলমানের —বিজ্ঞান দর্শ[?] শা[?] ক্কিল প্রেম, পৌরা- সকলেরই উৎ[?] বিলাস[?]দীপ্ত ভাব [?] ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীর উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট ভারতের মস্তকে শোভিত হইল। কিন্তু অন্যের জন্য সে সকলের কিছুই হয় নাই, সুতরাং থাকিল না। ভারতের কীর্ত্তিকলাপ যে আজ বিস্মৃতির আঁধারে,—কল্পনার ক্রোড়ে শয়িত রহিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতের প্রাচীন যোগী ঋষিরা পরের জন্য ভাবিতেন না,—ভাবাকে ধর্ম্ম মনে করিতেন না। তুমি পাও আর না পাও, আমার মুক্তি হইলেই হইল। ভাব বুঝিয়া অনুসরণ করিতে হয়, কর, আমি কাহার জন্য ভাবিব না, আমি আমারই জন্য দায়ী, আমারই জন্য চিন্তা করিব, এই তখনকার অধিকাংশ মুনিঋষি-দিগের ধর্ম্ম-কথা। সংসার করা অধর্ম্ম,বিবাহ পাপ-কলঙ্ক,—পৃথিবীময় প্রলোভন,—লোকের হৃদয় গরলময়,—তখনকার লোকেরা, কল্পনার চক্ষে ইহাই দেখিয়া ভীত হইয়া, সংসার পরিত্যাগ করিয়া,বিজন অরণ্যে পলায়ন করিতেন। ভারতের কত মুনি, কত যোগী, কত ঋষির অস্তিত্ব-নাম হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বিস্মৃতিতে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? তখনকার ভাবই এই—নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন কর—ফলের প্রত্যাসী হইও না,—অন্যের জন্য ভাবিও না, আপনি যোগী হও, আপনি ঋষি হও। যাহা কিছু ভজন সাধন, যাগযজ্ঞ, যোগধ্যান, সকলই নিজের জন্য কর। অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ,—ভারতের ভাবী উন্নতির মূলে এই প্রকারে কুঠারাঘাত করিল। এই যোগ ধর্ম্মের ভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হইল অবশেষে—বারমৈনির সময়ে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যখন আপনস্পৃহা প্রবেশ করিতেছিল,যোগ ধর্ম্মের হর্ম্ম্য যখন একটু একটু শিথিল হইতেছিল, তখন শাক্যসিংহ রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। স্ত্রী জানি না, পুত্র জানি না, পিতা জানি না, মাতা জানি না, শাক্য এই সিদ্ধান্ত করিয়া, রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনের পর সিদ্ধ হইলেন। মার পিশুনকে পরাজয় করিয়া শাক্য বুদ্ধ হইলেন,—নির্ব্বাণ মুক্তি পাইলেন। বুদ্ধের প্রতিকৃতি,বুদ্ধের ছায়া দেশ দেশান্তরে অমনি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল;—যোগ ধর্ম্মে আবার ভারত মাতিয়া উঠিল। ভারতের নরনারী আবার আপনার জীবনকে উন্নত কবিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কি উন্নত ভাব! বাস্তবিক বুদ্ধের জীবনে এক

গভীর শিক্ষা এই পাওয়া যায়, আপনি সিদ্ধ না হইলে অন্যের জন্য কিছুই করা যায় না। যতক্ষণ আমি অন্ধ, ততক্ষণ আর একজন অন্ধকে কখনই আমি চালাইতে পারি না। আমার জীবন পবিত্র না হইলে কখনই অন্যকে আমি পবিত্রতার পথে টানিতে পারি না। আমার জীবন বিশ্বাসে অটল না হইলে, কখনই আমি অন্যকে বিশ্বাসে আকর্ষণ করিতে পারি না। ভারতের এই আত্মতত্ত্ব শিক্ষা,—এই সিদ্ধির কাব্য,—এই অহং-জ্ঞান বিসর্জ্জনের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত, বুদ্ধের সময়ে চরম উন্নতি লাভ করিল। দলে দলে পরিব্রাজকগণ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন :—ভারতের আকাশ আবার ধর্ম্ম বিপ্লবে মাতিয়া উঠিল। সকলেই মাতিয়া উঠিল, কেহ আর সংসারের উন্নতির দিকে চাহিল না। রাজা হও, আর প্রজা হও,—ধনী হও আর দরিদ্র হও, সাধুতা ভিন্ন আর কাহারও পরিত্রাণের পথ অনন্ত এই মন্ত্র জলদ গম্ভীরস্বরে এক প্রান্ত হইতে ভারতের অপর প্রান্তর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইল। কিন্তু রক্তমাংসধারী ভারত, হৃদয় ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, কেবল কঠোর পরমার্থ জ্ঞান লইয়া অধিক দিন থাকিতে পারিল না। আবার ভোগ বিলাস উপস্থিত হইল। আবার ব্রাহ্মণের আধিপত্য কিম্বা অলসতার পরিচর্য্যা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য পুন স্থাপিত হইলে, সকল উন্নতি-লাভের ভার ব্রাহ্মণের উপর সমর্পণ করিয়া, ভারত আরো নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। অনেক যুগ এই ভাবে অতীত হইল। কিন্তু দুর্দ্দিন কি কখনও চিরস্থায়ী হয়? ভারতের আকাশ আবার পরিষ্কার হইল,—জ্ঞান কাণ্ডের পরে চৈতন্যের প্রেম কাণ্ড আরম্ভ হইল। প্রেমের অবতার অবতীর্ণ হইলেন। কোথায় হরি, কিরূপ হরি, কেমনে পাইব হরিকে, এই চিন্তায় উন্মত্ত। জ্ঞানহীন সন্ন্যাসীর দল চৈতন্যের সময়ে সৃষ্ট হইল। বুদ্ধ এবং চৈতন্য উভয়েরই মূলমন্ত্র সাম্যবাদ—ভেদাভেদ নাই, সকলেই ধর্ম্মের অধিকারী। কিন্তু এক জন জ্ঞানী, আর এক জন প্রেমিক। দলে দলে লোক আসিয়া চৈতন্যের হরিগুণ কীর্ত্তনের উন্মত্ততায় যোগ দিল,—সংসার পরিবার পরিত্যাগ করিয়া, ভেক লইয়া, ভিখারী হইয়া, বৈরাগীর দল বাহির হইল,—মূলমন্ত্র,"—নামে রুচি, জীবে দয়া।" সকলকে প্রেমালিঙ্গন কর, পাপী পুণ্যাত্মার ভেদাভেদ নাই, সকলের কর্ণেই হরিনাম শুনাও, সকলকে মাতাও, পরিবার পরিজন নাই,—আত্মীয় বান্ধব নাই; সকল একাকার হইয়া হরি বোল বল। চৈতন্যের গভীর প্রেমে সেই মিলন, মাতিল বটে, ভাবের জন্য [illegible] যে কারণে পাশ্চাত্য ভাব মিশিতেরিতে পারিল না, আর মহম্মদে, শাক্যমুনি জ্ঞান-শূন্য প্রেমও [illegible] গভীর মিলনের ভাগ্য হইল না। সন্ন্যাস ধর্ম্ম সকলের উপযোগী হইল না, ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায় মিশিয়া এক হইল না;—সাম্যে অসাম্য মিশিল। চৈতন্যের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক হইল না, ইহা বুঝিয়া, দয়ার অবতার সোণার চাঁদ অসময়ে অস্তমিত হইলেন। বুদ্ধের প্রেমশূন্য জ্ঞান, আর চৈতন্যের জ্ঞান-শূন্য ভক্তি উভয়ই যুদ্ধে পরাস্ত হইল,—ভারতের উদ্ধার হইল না। প্রেমের ভিতরে কি এক অভাব ছিল, যাহাতে প্রেম সময়ে অপ্রেম হইয়া গেল। প্রেমে কত মলিনতা—কত অপবিত্রতা—কত কি কলুষিত ভাব মিশিল।

স্বর্গের ঝরণা পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইল। আজ চৈতন্যের প্রেমের রূপান্তরিত অবস্থা দেখিলে কাহার চক্ষে না জল পড়ে? মনুষ্যের চক্ষে জল পড়ুক বা না পড়ুক, ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা অভাব বুঝিলেন! ভারত আবার মরণের পথে যখন চলিতে লাগিল,—ধর্ম্মে যখন অধর্ম্ম, পুণ্যের নামে যখন পাপ বিক্রীত হইতে লাগিল,—অদ্বৈতবাদ যখন অহঙ্কার আনিল; মায়াবাদ যখন অলসতা বৃদ্ধি করিল; জ্ঞানবাদ, প্রেমবাদ যখন পরাজয় হইল; পৌরাণিক শাক্ত ধর্ম্মের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মেও যখন নানা প্রকার পূতিগন্ধময় কদাচার সদাচার বলিয়া প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন ভারতের বিধাতা চক্ষের নিমেষে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। মানুষেরা বলিল, পলাশীর সমরে বিশ্বাস-ঘাতকতায় সিরাজের সিংহাসন অপহৃত হইল, আমরা বলি, বিধাতার ইঙ্গিতে সে ঘটনা ঘটিল। মুসলমানের বিলাস, বৈষ্ণবধর্ম্মের পঙ্কিল প্রেম, পৌরাণিক শাক্তধর্ম্মের হিংসা-প্রদীপ্ত ভাব এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলুপ্ত-প্রায় জ্ঞানকাণ্ডের স্থলে কর্ম্ম কাণ্ডের রাজত্ব আরম্ভ হইল। * সুসময়ে ইংরাজ সিংহাসনে বসিল;—বিলাসিতা, কুসংস্কার, অন্ধ-প্রেম, এবং জটিল জ্ঞানের স্থলে খ্রীষ্টের কর্ম্মকাণ্ড রাজত্ব স্থাপন করিতে উপস্থিত হইল। ইংরাজ রাজত্বে কলঙ্ক আরোপ করিতে চাও, কর, কিন্তু যদি তুমি চিন্তাশীল হও, তবে তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইংরাজরাজত্বের সহিত খ্রীষ্টের কর্ম্মকাণ্ডের জয়ধ্বনি ভারতে নিনাদিত হইতেছে। "তুমি ততক্ষণ স্বর্গের উপযোগী হইবে না, যতক্ষণ 'তোমার ভ্রাতার সহিত মিলিত না হও" এই গভীর সংসার-ধর্ম্মশাস্ত্র ভারতে প্রচারিত হইল। "ভ্রাতার সহিত কলহ বিবাদ করিয়া—ভ্রাতার রক্তে শরীরকে প্লাবিত করিয়া—সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বার্থপরের ন্যায় আসিয়াছ?—স্বর্গ তোমার নিকট হইতে অনেক দূরে। যাও অগ্রে মিলিত হও,—অহঙ্কারকে বলি দাও,—মান সম্ভ্রমকে বিসর্জ্জন দাও,—ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত একীভূত হইয়া উপস্থিত হও।" এই মধুর ধ্বনি স্বর্গ হইতে প্রচারিত হইল। মানুষের বিশেষত্ব দেখিতে হইবে, মানুষের জন্য ভাবিতে হইবে,—অসৎকে সৎ করিতে হইবে,—ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে হইবে,—পরিবারকে প্রতিপালন করিতে হইবে;—আপনার সহিত দেশের উন্নতি করিতে হইবে;—খ্রীষ্টনীতির এই কর্ম্মের প্রবল স্রোত আসিয়া অলস ভারতকে প্লাবিত করিল। কিন্তু বুদ্ধের কঠোর জ্ঞান, চৈতন্যের প্রেম, আর খ্রীষ্টের বিনয় ও কর্ম্মকাণ্ড ভারতে পৃথক হইয়া রহিল। অনেকে মিলনের মর্ম্ম না বুঝিয়া, একক বিসর্জ্জন দিয়া অন্যকে আলিঙ্গন করিল—বুদ্ধের আত্ম ও পরমার্থ জ্ঞান, চৈতন্যের বিশ্ব-প্রেমকে ভুলিয়া, কর্ম্মের মাহাত্ম্যে গা ঢালিয়া খ্রীষ্টের উপাসক হইল! ভারতের সে দুর্দ্দশার কাহিনী আর বলিব কি? জ্ঞান, প্রেম ভুলিয়া কি ধর্ম্ম হয়? কুসংস্কারের পঙ্কিল স্রোত ভারতের অনেক রত্নকে ডুবাইয়া দিল! কেবল কর্ম্ম-স্রোতে মজিয়া ইংলণ্ডের হৃদয়ে যে শুষ্কত্ব,

* পূর্ব্বে ভারতে যে কর্ম্মকাণ্ড ছিল, তাহা প্রকৃত কর্ম্মকাণ্ড নহে; যাগ যজ্ঞাদি, যোগ সাধনারই একাঙ্গ বিশেষ ছিল। প্রকৃত কর্ম্মের পূজা ভারতে প্রাচীন সময়ে ছিল না।

হৃদয়-হীনত্ব প্রবেশ করিতেছে, তাহাদেরও সেই দশা ঘটিল। ঘোরতর ঘৃণা বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল,—হিন্দু খ্রীষ্টানে আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল;—ভারতে এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হইল। ঘনীভূত মেঘে ভারত আবার আচ্ছন্ন হইল। এই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়—এই তিনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, তিনকে মিলাইয়া এক করিতে চেষ্টিত হইলেন। পৃথিবীর ধর্ম্মের সকল সত্য মিলিয়া এক হইবে,—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম মিলিলে তবে ভারত রক্ষা পাইবে,এই মহামন্ত্র সেই তমসাচ্ছন্ন দিনে তিনি গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিলেন। সম্প্রদায় নাই,—ভেদাভেদ নাই,—হিংসা বিদ্বেষ নাই,—জ্ঞানী মূর্খের প্রভেদ নাই—সকলে এক সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান, প্রেম ও কর্ত্তব্যে মিলিত হইব; এই কথা তিনি প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তখনও সাম্প্রদায়িকরূপ ধারণ করে নাই,—উদার,—সার্ব্বভৌমিক,—ঘনীভূত মিলনের ধর্ম্ম তিনি প্রচার করিলেন। একে তিন, তিনে এক। জ্ঞান ভিন্ন প্রেম প্রেম নহে; প্রেম ভিন্ন জ্ঞান শুষ্ক, কর্ম্ম ভিন্ন প্রেম নাই;—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম ভিন্ন ব্রহ্ম নাই। বিধাতার কৃপায় এইরূপে ভারত এক আশ্চর্য্য সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। আজ শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ ভাব, বিশেষ স্রোত সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইতেছে;—'যুক্তি ভিন্ন শাস্ত্র মানি না; আবার শাস্ত্র মানি বলিয়াই যুক্তি মানি;—আবার যুক্তি মানি বলিয়াই কোন শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করি না;—কোন শাস্ত্রই অভ্রান্ত নহে বলিয়া বেদবেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ, সকলই সমান।' এইরূপে পাশ্চাত্য স্রোত, বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায়, ভারতের নরনারীর হৃদয় ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, কাহার সাধ্য ইহার দুর্দ্দম্য বেগকে প্রশমিত করে? দুঃখের কষাঘাত সহ্য করিয়া যে সুখ পায়, সে কি পুন দুঃখে পড়িতে চায়? অন্ধ যদি একবার চক্ষু পায়, তবে সে কি আবার অন্ধ হইতে বাসনা রাখে? শিক্ষার মাহাত্ম্য যে একবার বুঝে, সে কি পুন অশিক্ষিত হইতে চায়?—যুবক কি বালক হইতে চায়? ধনী কি চিরদরিদ্র হইতে চায়? জ্ঞানী কি মূর্খ হইতে ইচ্ছা করে? যে কঠোর অবস্থার হস্ত হইতে ভারত চলিয়া আসিয়াছে, শত সহস্র চেষ্টা কর, কাহারও সাধ্য নাই যে, ভারতকে আবার সেই প্রাচীন অবস্থায় লইয়া যাইবে। ব্রহ্মপুত্র পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে, মানুষ তোমার কি শক্তি আছে যে,তুমি পুন পদ্মা গঙ্গাকে গোমুখীতে, ব্রহ্মপুত্রকে ব্রহ্মকুণ্ডে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে? সকল শক্তি এখানে পরাস্ত। কাল্পনিক নিষ্কাম ধর্ম্ম আর ভারতে ফিরিবে না, পৌরাণিক (unpractical ?) কল্পনার ধর্ম্ম আর মাথা তুলিবে না;—বৈষ্ণব,—সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আর স্থান পাইবে না;—আর্য্য মিলিয়াছে—অনার্য্যের সহিত; জ্ঞান মিলিয়াছে—কর্ম্মের সহিত,—প্রেম মিলিয়াছে জ্ঞানের সহিত,—পূর্ব্ব পশ্চিম এক হইতেছে,—শাক্য, চৈতন্য, খ্রীষ্ট এক হইতেছেন;—এমন সুখের মিলন ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, সঙ্কীর্ণমনা, কর্ম্মশূন্য, ভক্তিশূন্য, জ্ঞানপিপাসু, তুমি? জাতিভেদের মূল ভারত-হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইয়াছে,—সাধ্য কি তোমার যে তুমি পুন তাহাকে সঙ্কীর্ণতার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবে? বিধবার অশ্রু ঘুচিবে,—ভ্রূণহত্যা,—পাপ ব্যভিচার,—মদ মাংস,এসকল আর ভারতে

স্থান পাইবে না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আর উদার বিবেকপ্রধান ভারতে টিকিবে না। আমার হইয়া তুমি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, আর আমি অলস ভাবে বসিয়া থাকিব, এ অর্থশূন্য ধর্ম্ম আর ভারতে স্থান পাইবে না। যদি মানুষ হও, যদি দেশের হিতৈষী হও, এই বিশেষ সময়ের বিশেষ ভাব হৃদয়ঙ্গম কর—করিয়া বল, চাই—জ্ঞান, চাই প্রেম, চাই কর্ম্ম। মহা মিলনের দিনে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য কর, আর বল, চাই—জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্ম। মত লইয়া ভারতে অনেক কাটাকাটী হইয়া গিয়াছে,—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে,জাতিতে জাতিতে ভারতের অস্থি মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে,—ভ্রাতার বুকের রক্তে অনেক ভ্রাতার রক্ত-পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে, আর না। যে যেখানে থাক, এস। জ্ঞানী, প্রেমিক ও কর্ম্মী, সকলে একবার একতার মধুময় মিলনের মন্ত্র মুখে তুলিয়া এস। ঘৃণা বিদ্বেষ দূর হউক,—শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার পরিবারের পার্শ্বে অজ্ঞান আঁধারে আমি থাকিলে,ভাই তোমার পরিবার কখনই জ্ঞানী হইতে পারিবে না, আমার চরিত্র দূষিত থাকিলে, কখনই ভাই তোমার চরিত্র ভাল থাকিবে না। তবে ভাই এস, তোমার চরণধূলি আমার মাথায় ছোঁয়াও। এস, পরস্পরে পরস্পরের বিশেষ বিশেষ ভাব গ্রহণ করি। প্রেমিক প্রেম দেও, জ্ঞানী জ্ঞান বিলাও, কর্ম্মী কর্ম্ম শিখাও। আদান প্রদানের প্রশস্ত পথ খুলিয়া যাউক। একের জীবনে যাহা নাই, তাহা অন্যের নিকট পাইয়া কৃতার্থ হই, ধন্য হই। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে একেবারে পরিত্যাজ্য কিছুই নাই, কে কাহাকে ঘৃণা করিবে? সকলই ভাই ভাই,—সকলের ভিতরেই বিশেষত্ব লুক্কায়িত। তবে এস, মত ভুলিয়া, ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া, অহংতত্ত্ব ভুলিয়া, পরস্পর এই মহা মিলনের দিনে মিলিত হই, মিলিয়া, এক হইয়া মহা সিন্ধুর দিকে ধাবিত হই। এস, আনন্দের দিনে মহানন্দে নৃত্য করি। এমন মনোমুগ্ধকর মিলনের স্থলে সঙ্কীর্ণতা, সন্দেহ, বিবাদ, বিসম্বাদ কেন আনিতেছ? কেবল পূর্ব্বকে লইয়া থাকিবে, পশ্চিমকে তুচ্ছ করিবে? কেন পশ্চিম কি বিধাতার সৃষ্ট নয়? পশ্চিমে কি বিশেষত্ব নাই? পশ্চিমের কর্ম্মকে আদর করিতেই হইবে। খ্রীষ্ট, চৈতন্য ও বুদ্ধ এক হইয়াছেন এই ভারতে, একবার চাহিয়া দেখ। যদি মনুষ্যত্ব লাভের বাসনা থাকে, তবে অগ্রে সিদ্ধি লাভের জন্য নিভৃত হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ কর, পরে মানবের উদ্ধারের জন্য,প্রাণকে কর্ম্মের স্রোতে ভাসাইয়া দেও। সিদ্ধ হইয়া,জ্ঞান-কর্ম্মকে জীবনের ভূষণ করিয়া, ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। জ্ঞান, প্রেম,কর্ম্ম,তিনকে হৃদয়ে বাঁধ,—বুদ্ধ,চৈতন্য, খ্রীষ্ট, তিনের বিশেষ ভাবকে অবলম্বন কর। বিশেষ সময়ের বিশেষ ভাব বুঝিয়া দেশের জন্য চিন্তিত হও। পূর্ব্ব পশ্চিম মিলিয়াছে, উত্তর দক্ষিণ মিলিবে যে ধর্ম্মে, সে ধর্ম্মের ভাব এই। পাশব বল ভারতে নাই বলিয়া দুঃখ নাই; ভারতের বিশেষ ভাব এই,ভারত জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মে মিলিয়া অধ্যাত্মিকবলে পৃথিবীকে এক হৃদয়ে বাঁধিবে হিংসা বিদ্বেষ সকল নাশ করিয়া,অহঙ্কারকে ডুবাইয়া,গঙ্গা যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা সকল একীভূত হইয়া,মহাসিন্ধুতে মিলিবে। সেই দিন কবে আসিবে, যে দিন ভারত, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই তিনের সমঞ্জসীভূত সাধনায় সিদ্ধ হইয়া পৃথিবীর সকল নর-নারীকে এক হৃদয়ে

বাঁধিয়া, মেঘনার ন্যায় মহাসিন্ধুতে জীবন ভাসাইতে পারিবে! সেই শুভ মুহূর্ত্ত কখন দেখা দিবে, যখন এই মহা সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রসন্ন চিত্তে, আনন্দে আনন্দময়ীর নাম কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া, ভারত-সন্তান, আর্য্য অনার্য্য বিচার ভুলিয়া, কুসংস্কারের কঠিন আবরণ ছিন্ন করিয়া, কর্ত্তব্যের কঠোর ভাবে বিভোর হইয়া,পৃথিবীকে সমঞ্জসীভূত উন্নতি-আনন্দের বার্ত্তা শুনাইবে,—কবে সঙ্কীর্ণ দ্বেষ হিংসাযুক্ত মত-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া, ভাই ভগ্নী মিলিয়া, জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের মঙ্গলময় পূজা অর্চ্চনায় রত হইবে,—কবে ভারতের চির মরণ-জাল ছিন্ন হইবে,—কবে ভারত প্রকৃত জীবন পাইবে!!

ইন্দুবালা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"একাকিনী—বিরহিনী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।"
তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য।

সায়াহ্ন। নিদাঘের প্রচণ্ড প্রভাকরের অগ্নিময় কিরণে ধরাতল সমুদায় দিবস পুড়িয়াছে, এক্ষণে উত্তাপ ম[illegible]য়া আসিতেছে। জীবগণ পুনর্ব্বার আশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। গৃহরুদ্ধ ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে ঘরের বাহির হইতে সাহস পাইতেছে।

এমন সময়ে আলাহাবাদে—একটী বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলস্থিত প্রকোষ্ঠে এক সুন্দরী বেত্রাসনে হেলিয়া রহিয়াছেন। হাতে এক খানি কাগজ। জানালা দিয়া বাহিরে শূন্য চক্ষুতে তাকাইয়া রহিয়াছেন। ইঁহার বয়স সপ্তদশবর্ষ, কিন্তু গঠনের ও মুখের ভাব এমনি যে, তাহাকে দেখিলে তাঁহার বয়স তাহা হইতে ন্যূন বোধ হয়। সমুদয় শরীর এমনি সুকুমার, দেখিলে বোধ হয় যেন বিধাতা তাহাকে কোমলতা দিয়া রচনা করিয়াছেন,কিন্তু এই মোহন মূর্ত্তিতে প্রফুল্লতার বিকাশ নাই, আনন্দের গরিমা নাই—ইহাতে কেমন এক প্রশান্ত বিষণ্ণ চিন্তা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে ইনি ইন্দুবালা। হস্তে যে পত্র বহিয়াছে, তাহা অনেকবার পড়িয়াছেন। এক্ষণে তাহা আর পড়িতেছেন না। কিন্তু প্রাণাদপিপ্রিয় বস্তুর ন্যায় তাহা সুকোমল হস্তে ধারণ করিয়াছেন—চিন্তাতে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। পাঠক মনে করিবেন যে, এই পত্র হয়ত ইন্দুবালার স্বামীর নিকট হইতে আসিয়াছে, ইহাতে তাঁহাকে তাহার শ্বশুরালয় যাইতে হইবে, এই কথা আছে। তাহা ভুল। পত্রে কি ছিল তাহা আমরা নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

মিরট, বৈশাখ, ১২ সাল—
স্নেহময়ি,

"তোমাকে লিখিবার নিমিত্ত লেখনী হস্তে করিয়া অনেক ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিলাম, এক্ষণও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছিনা। আমার আর কিছু মাত্র দৃঢ়তা নাই, বল নাই, অদ্য দীর্ঘকালের পর তোমাকে পত্র লিখিতে গিয়া বালকের ন্যায় অধীর হইয়াছি। সকলি শুনিয়াছি—তোমার দিন কেমনে যাইতেছে, তাহা শুনিয়াছি। কিন্তু সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা; আমরা মনুষ্য,

বুঝি না কিসে ভাল হয়। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহা কে নিবারণ করিতে পারে? অতএব যত দিন বাঁচি, তত দিন এই রূপে যাইবে। আমি বাতাসে ছিন্ন পত্রের ন্যায় এই সংসারে বিচরণ করিতেছি। ভরসা নাই, সুখের সম্ভাবনা নাই, যন্ত্রণার অবধি নাই। মরুভূমি—সংসার মরুভূমি। তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত কতবার উন্মাদের ন্যায় আলাহাবাদের নিকট আসিয়াছিলাম, আবার ক্ষিপ্তের ন্যায় তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছি। তোমার আমার সাক্ষাৎ এখন অমঙ্গলজনক, তন্নিমিত্ত নিতান্ত অকর্ত্তব্য, তুমি সরল প্রকৃতি, অসন্দিগ্ধান, তুমি আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, নির্ভর কর, তাই বলি, ইন্দু, আমায় আর পত্র লিখিও না, আমায় আর ক্ষিপ্ত করিও না। তোমার হস্ত-লিখিত একটী অক্ষর দেখিলে আমি ক্ষিপ্ত হইয়া যাই। তুমি লিখিয়াছ—"আর সহে না।" আত্মহত্যা কি পাপ? ইন্দু "আর সহেনা" আমিও বলি; কিন্তু আত্মহত্যা কি পাপ?—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমার হৃদয়ে তুমি দারুণ আঘাত করিয়াছ। এত কাল শিক্ষার পর, শাস্ত্রাধ্যয়নের পর, আত্মহত্যা পাপ কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলে! ইন্দু, আমার শিক্ষার কি এই ফল? তাহা অবশেষে কি ঘৃণিত আত্মহত্যাতে পরিণত হইবে? আমি বুঝি, তুমি যন্ত্রণায় এই কথা বলিয়াছ। তবে বলি, আমিও মরিতে পারিতাম, আমি যে বাঁচিয়া রহিয়াছি তাহা কি মরিবার ভয়ে? যদি আত্মহত্যা পাপ না হইত, তাহা হইলে এই যন্ত্রণাময় জীবন এত দিন কোন্ কালে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম। ইন্দু, আমার উপদেশ, আমার আজ্ঞা—তুমি এই পাপময় চিন্তাকে কদাপি মনে স্থান দিবে না, দিলে আমি বড় কষ্ট পাইব।

ইন্দু, আরো তোমায় কিছু বলিবার আছে, বলিতে অনেক চেষ্টা করিতে হইতেছে। তুমি বলিবে যে, যাহা অসাধ্য তাহা কেন আমাকে করিতে আদেশ করেন। আমি আদেশ করিতেছি না, আমার মিনতি, তুমি তোমার স্বামীর নিকট যাও, গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হও, আমাকে ভুলিয়া যাও। এই জীবনে আমার আর সাক্ষাৎ পাইবে না। এই আমার শেষ পত্র। আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি, আমাকে আর পত্র লিখিও না। আমার এক মাত্র মিনতি, তুমি তোমার পতির প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা করিও না। এই সংসারে আমরা সুখের নিমিত্ত আসি নাই, কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত আসিয়াছি। তোমাকে পাইবার আমার কোন আশা নাই, সম্ভাবনা নাই। তবে, আমার এক মাত্র সুখের প্রার্থনা যে, তুমি কঠোর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ক্রমে আদর্শচরিত্রা হইবে, পরিণামে অবনীমণ্ডলে তোমার পবিত্র নাম চিরকাল পূজিত হইবে।"

তোমার আশাশূন্য—পরিব্রাজক।

ইন্দুবালা আবার এই পত্র খানি খুলিয়া পড়িলেন। "আমার মিনতি, তুমি তোমার স্বামীর নিকট যাও—গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃত হও, আমাকে ভুলিয়া যাও"—পড়িয়া থামিলেন, অর্দ্ধ স্ফুট স্বরে বলিলেন,—"আমাকে ভুলিয়া যাও"—আমি তাঁহাকে ভুলিয়া যাইব? কি প্রকারে?—কত দিনে, জীবন থাকিতে, না মরিলে পরে?—"আমাকে ভুলিয়া" যাও"—কই, এই দীর্ঘ কালেও ভুলিতে পারিলাম না, দিন দিন যে সেই মূর্ত্তি স্মৃতিতে আরও গভীর রূপে খোদিত হইয়া

যাইতেছে—এই জীবনের এক মাত্র চিন্তা যে সেই স্মৃতি। এখনও যে সেই দেবাকৃতি, সেই স্নেহময়, সেই পবিত্রতাময়, জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী দেখিতেছি, এখনও যে সেই অনন্ত সুধাপূর্ণ শব্দ পান করিতেছি, সেই দেববাক্য শুনিতেছি। তাঁহাকে ভুলিব ? –কেমনে ? হে গুরো, হে স্বামিন্,—স্বামিন্—কি বলিলাম ?—স্বামিন্ ? কি মধুর শব্দ—কিন্তু আমার তাহা বলিবার অধিকার কি ?—অধিকার নাই ? যাহাকে আজীবন ভাল বাসিলাম, যাহাকে ভিন্ন আর কাহাকে মনে আনিলাম না, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত জানিলাম না, যাঁহার নাম নিরবধি জপ করি, যাঁহার নিমিত্ত এই প্রাণ সতত দিতে প্রস্তুত,—তাঁহাকে আমার স্বামী বলিবার অধিকার নাই, কি প্রকারে স্বীকার করি ?—যিনি অনন্যভাবে আমার হৃদয়ে বিচরণ করিতেছেন, যিনি আমার সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করিয়াছেন, যিনি আমার হৃদয়ের একমাত্র পতি, তাঁহাকে যদি আমার স্বামী বলিবার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে জগতে কোন স্ত্রীলোকের কোন পুরুষকে স্বামী বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু তিনিই যে স্বামী নাম লইতে অস্বীকার করেন। "আমার একমাত্র মিনতি তুমি তোমার পতির প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা করিও না"—আরও লিখিয়াছেন, "এই সংসারে আমরা সুখের নিমিত্ত আসি নাই, কর্ত্তব্যসাধনের নিমিত্ত আসিয়াছি।" সত্য, কর্ত্তব্যসাধনই জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু আমি যে কর্ত্তব্য সাধনে অসমর্থ, আমি নিতান্ত দুর্ব্বল, নিতান্ত স্বার্থপর,—নিতান্ত নীচ, তাহা না হইলে—আমার সুখের নিমিত্ত তাঁহাকে বারম্বার কর্ত্তব্যের পথ হইতে ফিরাইবার আকাঙ্ক্ষা করি কেন ? তিনি ত আমার জন্য গৃহত্যাগী—দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছেন, তথাচ ত একবারও আমাকে সুনীতি-বর্জ্জিত কথা বলেন নাই। আমার কি পবিত্রতাতে আস্থা নাই, ধর্ম্মে মতি নাই ? আছে, কিন্তু প্রবল স্রোতে যে সকলই ভাসিয়া যাইতেছে। কি করি ? দুর্ব্বল মনকে ত কত বুঝাই,—সংযমের ত চেষ্টা করি, তবু যে পারি না—কখন কি পারিব না ? তিনি লিখিয়াছেন—"ইন্দু, তোমাকে পাইবার আমার কোন আশা নাই, সম্ভাবনা নাই—তবে আমার একমাত্র সুখের আশা যে, তুমি কঠোর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে আদর্শ-চরিত্রা হইবে, অবনীমণ্ডলে তোমার পবিত্র নাম চিরকাল পূজিত হইবে" তাঁহার একমাত্র সুখের আশা—আর আমি যত্ন করিব না ? ইন্দুবালা এই রূপে চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার ঘরে একটী তরুণ বয়স্ক যুবা প্রবেশ করিলেন। ইনি ইন্দুবালার ভ্রাতা, বয়সে তাঁহার অপেক্ষা ২ বৎসর বড়, ইন্দুর সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে।

নির্ম্মলচন্দ্র ডাকিলেন। ইন্দু চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতা। হস্তস্থিত পত্রখানি ধীরভাবে এক খানি পুস্তক দিয়া চাপিয়া রাখিলেন, নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহার নিকট গিয়া বসিলেন, ক্ষণকাল পরে বলিলেন—"ইন্দু"—ইন্দুবালা নীরবা—বিষণ্ণবদনা। নির্ম্মলচন্দ্র ক্ষণকাল পরে আবার বলিলেন—'তুমি কি ভাবিতেছ।' ইন্দু উত্তর করিলেন না, কেবল মাত্র তাঁহার ভ্রাতার মুখের দিকে নীরজনয়নে চাহিয়া থাকিলেন। ইন্দু কাহাকেও বেদনা দিতে চাহিত না, নিজের কষ্ট নিজের মনেই

স্থাপিত। ইন্দু জীবনে মিথ্যা কথা কহিতে পারিত না, সুতরাং অনেক সময়ে অনেক কথার উত্তর করিতে পারিত না। নির্ম্মল আবার বলিলেন, 'ইন্দু, তুমি কি ভাবিতেছ?" ইন্দুবালা বলিলেন—"আমি ভাবিতেছি—বিশেষ কিছু নহে। আপনার তাহা শুনিয়া কি হইবে?" তাঁহার ভ্রাতা আবার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, পরে বলিলেন—'ইন্দু, তোমার শ্বশুরবাটী হইতে যে পত্র আসিয়াছে, মা কি তাহার বিষয় তোমাকে বলিয়াছেন"? ইন্দু একটু চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "না, আমি কিছুই শুনি নাই।' নির্ম্মল—"তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, কল্য তোমাকে লইতে লোক আসিবে।" ইন্দু—"কল্য?"

নির্ম্মল—হাঁ—তুমি কি বল, যাবে?

ইন্দু উত্তর করিল না। তাহার কোমলকান্তি বদনে বিষাদের ছায়া যেন আরও কিছু গাঢ়তর হইল। ইন্দু শূন্য নয়নে তাকাইয়া রহিল। নির্ম্মল আবার বলিলেন—"যদি তোমার এখন সেখানে যাওয়া অমত হয়, আমি বাবাকে না হয় তোমার না যাওয়ার কথা বলি।" ইন্দু আবার নির্ম্মলচন্দ্রের মুখের পানে স্নিগ্ধভাবে চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকিলেন। ক্ষণকাল পরে মৃদুস্বরে বলিলেন—"আমার যাওয়ার অমত নাই।" নির্ম্মলচন্দ্র আশ্চর্য্য হইলেন, ইন্দুবালার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ইন্দু গম্ভীর, কিন্তু প্রশান্ত। নির্ম্মল ইন্দুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "ইন্দু, ইহা কি তোমার যথার্থই ইচ্ছা—না নিজকে বলিদান দিবে বলিয়া যাইতেছ?" ভগিনী কোন উত্তর দিলেন না। জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিলেন, এক বিন্দু অশ্রু পড়িয়া থাকিবে। নির্ম্মল বুঝিলেন, ইন্দু যে সম্মতি দিয়াছে, এতকাল পরে যাইতে চাহিতেছে, তাহা নিজের সুখের জন্য নহে, তাহার অন্য কোন কারণ আছে। তিনি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল বলিলেন, "ইন্দু, আমি তোমার কষ্ট বুঝি।" এই বলিয়া ভগিনীর কোমল-কেশ-কলাপ-শোভিত মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন, "এক্ষণে আমি চলিলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজপুতানার একটী গিরি-গহ্বরে, শ্মশ্রুধারী ভস্ম-মার্জ্জিত দেহ সেই কৌপীন-পরিহিত যুবা অর্দ্ধ শয়ান। চিন্তা—"এতদিন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই, আমার পত্র পৌঁছিয়াছে কি না তাহাও জানিতে পারি নাই। গোস্বামী মহাশয় ফেরেন নাই। আর জানিয়াই বা কি হইবে? পত্র লিখিয়া ভাল করি নাই। হয়তো নির্ব্বাণোন্মুখ শিখা উদ্দীপ্ত করিয়াছি। আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইন্দু এক্ষণে শ্বশুরালয়ে। আমি নিষ্ঠুর, তাহা না হইলে ইন্দুকে কেন শ্বশুরালয়ে যাইতে বলিয়াছি। মন একস্থানে, শরীর একস্থানে। ইন্দু আমাকে ভালবাসিয়া কি প্রকারে তাহার পতি সেবা করিবে, কেমনে যথার্থ পাতিব্রত্য লাভ করিবে? তবে ইন্দু ক্রমে ক্রমে স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিতে পারে, আমাকে ভুলিয়া যাইতে সক্ষম হইতে পারে। ইন্দু আমাকে ভুলিয়া যাইবে! ইন্দু! তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইবে? না, তাহা তুমি পার না, পারিলেও তুমি আমাকে ভুলিও না। অনন্ত কাল পুড়িব, সেও ভাল—এই দহনে, এই অতৃপ্ত পিপা-

সার, এই জীবন্ত মৃত্যুতে যে সুখ আছে, তাহা জগতে কোথাও পাই না। অশান্তিতে যে সুখ আছে, তাহা শান্তিতে নাই। আমি শান্তি চাহি না, অর্থের সুখ চাহি না, আমি কেবল মাত্র ইন্দুর ভাল-বাসা চাহি; তবে এই ভালবাসার পরিণাম—সার্থকতা, সফলতা কোথায়? স্বর্গ ত দেখিলাম—কিন্তু আমি স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত। চন্দ্র আকাশে উদিত, কিন্তু গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন। তাই বলি, আর এই চিন্তার ফল কি? ফল নাই, তাহা বেশ দেখিতেছি, কিন্তু ইন্দুকে ভুলিতে পারিব না। কিন্তু ভুলিতে চেষ্টা করিব। নির্জ্জনে বাস করিয়া দেখিয়াছি, বিস্মৃতি লাভ করিতে পারি নাই। এখন দেখি, সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পরোপকারে নিবিষ্ট হইয়া, দুঃখীজনের দুঃখ মোচন করিয়া, অত্যাচারীদিগের দম্ভ ও নিষ্ঠুরতার প্রতিবিধান করিয়া, প্রবঞ্চকদিগের কূট জাল ভেদ করিয়া, মনকে কতক ব্যাপৃত রাখিতে পারি কি না। এই দেশে কত লোক দুঃখী; রাজা কি পাপী!—এমন মহৎ পিতার, এমন কুসন্তান কখনও দেখি নাই। বয়স অল্প, ইন্দ্রিয়াশক্ত, মদ্যপায়ী কুমন্ত্রী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই রাজ্যে কি প্রকারে সুশাসন হইতে পারে? আমি সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়াছি,তাহাতে উপকার হইতে পারে। রাজা এবং মন্ত্রিগণ সশঙ্কিত হইয়াছে, অপরিজ্ঞাত লেখকের অনুসন্ধান করিতেছে, কিন্তু সুশাসনের কোন উপায় করিতেছে না। আমি সকলই অবগত হইয়াছি। আর বিলম্ব করিলে চলে না। অদ্য পাষণ্ডদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত করিব—এই প্রবন্ধটী অদ্যই লিখিব, কল্য প্রাতে সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দিব; ইহার উপরে ব্রিটিস-রাজের অবশ্যই চক্ষু পড়িবে, তাহা হইলেই সংস্কার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। পরিব্রাজক এই প্রকার ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাহার সেই গহ্বরে দুইটী অস্ত্রধারী-পুরুষ প্রবেশ করিল। পরিব্রাজক উঠিয়া বসিলেন এবং গম্ভীরস্বরে বলিলেন,"কি চাই?"

অস্ত্রধারী পুরুষের মধ্যে এক জন বলিল—"আপনাকে"।

তিনি আবার গম্ভীরস্বরে বলিলেন "কেন?" সেই অস্ত্রধারী পুরুষ বলিল—"রাজ আজ্ঞা"।

পরিব্রাজক প্রশান্ত ও দৃঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইতে হইবে?"

অস্ত্রধারী পুরুষ—"রাজ ভবনে"।

পরিব্রাজক—"চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিব্রাজক রাজার একটী নিভৃত কক্ষে দণ্ডায়মান। তাঁহার সম্মুখে রাজা ও রাজমন্ত্রী। পশ্চাতে তরবারি হস্তে এক জন সেনা। রাজা মন্ত্রীর হস্ত হইতে কয়েক খানি কাগজ লইলেন এবং সেই কাগজ পরিব্রাজককে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছ?" পরিব্রাজক হস্তপ্রসারণ করিয়া কাগজগুলি লইলেন, নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধগুলি ধীরে ধীরে দেখিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন—"মিথ্যা কহিলে নিস্তার নাই।" পরিব্রাজক এই কথা শুনিয়া তাঁহার আরক্ত লোচনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষণকাল রাজার উপর স্থির করিয়া রাখিলেন। দৃঢ়তা ও অবজ্ঞাসূচক ওষ্ঠ ঈষৎ প্রকম্পিত হইল। আবার তিনি প্রশান্ত বদনে সেই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠান্তে বলিলেন, "হাঁ, এই গুলি আমার লেখা।" রাজা এবং মন্ত্রী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—"ইহা

তোমার লেখা, আমাদিগের প্রত্যয় হয় না।” পরিব্রাজক বলিলেন—“আপনাকে, ইহা যে আমার লেখা, সে প্রত্যয় করাইয়া দিতে আমি স্বয়ং এখানে আসি নাই, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বলিয়া আমি এই কথা প্রকাশ করিলাম।” রাজমন্ত্রী—“মহাশয় অবশ্যই সত্যবাদী, কিন্তু সন্ন্যাসীকে অদ্যাবধি সংবাদপত্রে রাজনীতি সমালোচনা করিয়া লিখিতে শুনি নাই, সেই নিমিত্তই আপনার কথা সহসা বিশ্বাস হইতেছে না, আপনি সত্যবাদী, সহজেই তাহা প্রমাণ করিতে পারেন। আপনি আমাদিগের সম্মুখে একটী প্রবন্ধ লিখুন।” পরিব্রাজক বলিলেন—“ তাহাতে আমার আপত্তি নাই। ” রাজ-মন্ত্রী তাঁহাকে লিখনোপযোগী সামগ্রী দিলেন। পরিব্রাজক যে প্রবন্ধটী সেই দিন লিখিবেন, মনে করিয়াছিলেন, সেইটী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই প্রস্তাবটী সমাপ্ত না হইতেই রাজা অধীর হইয়া পরিব্রাজকের হস্ত হইতে কাগজ লইলেন, এবং পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কতকদুর পড়িয়াই তাঁহার মুখে বিষম আশঙ্কা এবং ক্রোধের লক্ষণ আবির্ভূত হইতে লাগিল। যতই পড়িতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনের উদ্বেগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং পাঠ সমাপ্ত হইলে মন্ত্রীর হস্তে কাগজ দিলেন। মন্ত্রীও উৎকণ্ঠার সহিত তাহা পাঠ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে, রাজা বলিলেন,—“তুই আমার রাজ্যে বাস করিয়া কি সাহসে এইরূপ লিখিতেছিস্? তোর মনে কি যন্ত্রণার ভয় নাই, মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। তোর মৃত্যু নিকট, তাহা না হইলে কেন এই কুমতি হইবে? ” পরিব্রাজক বলিলেন--“মহারাজ, কুমতি আমার নহে, কুমতি আপনার। তাহা না হইলে আপনি একবারে কর্ত্তব্য জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া, ইন্দ্রিয়ের দাস হইবেন কেন? তাহা না হইলে আপনি মদ্যপায়ী পাষণ্ডদিগের বশীভূত হইয়া যথেচ্ছাচার করিবেন কেন? তাহা না হইলে আপনার রাজ্যে এত অত্যাচার কেন? দেশে হাহাকারে শব্দ, আর আপনি নৃত্য গীত, বাদ্য ও সুরাতে মত্ত। আরও অনেক কথা আছে, অনেক কথা জানি,--আপনার দুষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে; সাবধান, মহারাজ পাপের বিনাশ বিলম্ব বা সত্বরে হইবেই হইবে। আমাকে আপনি ইচ্ছা করিলেই বিনাশ করিতে পারেন বটে। কিন্তু তাহাতে আপনার পাপের বৃদ্ধি হইবে কেবল মাত্র—কিন্তু বিপদের লাঘব হইবে না”

রাজা। “তোমাকে এখনই মুক্ত করিলে কি তুমি আবার আমার বিরুদ্ধে লিখিবে?”

পরি। “হা, যতদিন আবশ্যক হইবে, যতদিন দেশে অত্যাচার থাকিবে, আর যতক্ষণ এই হস্ত চালনা করিবার ক্ষমতা থাকিবে।”

রাজা। “আচ্ছা আমি তোমার লিখিবার সুবিধা করিয়া দিতেছি”--রাজা সেনার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন—“প্রহরি! ইহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখ গিয়া। ইহার হস্ত পদ লৌহ-শৃঙ্খল দিয়া আবদ্ধ রাখিবে।” প্রহরী পরিব্রাজককে লইয়া গেল। পরিব্রাজক কারাগার থাকিলেন। রাজ্যে দিন দিন আরও বিশৃঙ্খল বাড়িতে লাগিল। ব্রিটিস রাজের নিকট হইতে দুই একখানি ভীতি-প্রদর্শক পত্র আসিল। পরিব্রাজকের প্রতি রাজার মনে মনে ভক্তি হইয়াছিল। কয়েক দিন পরে রাজা আবার পরিব্রাজক-

কে সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি এখনও আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে? কারাবাসের যন্ত্রণায় তোমার কি এখনও জ্ঞানের উদয় হয় নাই।"

পরিব্রাজক বলিলেন, "মহারাজ, আমি কারাবাসের যন্ত্রণা ও ভয় করি না, মৃত্যুকেও ভয় করি না। আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা আপনার মঙ্গলের জন্য। আপনি আমার পরামর্শানুসারে কাজ করিলে আপনি অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারিতেন। আপনার চক্ষু এখনও খুলিল না! দেশে অত্যাচারের সীমা নাই। দরিদ্র লোক সকল অনাহারে অত্যাচারে মরিতেছে। সৈন্যগণ তাহাদিগের প্রাপ্য মাহিয়ানা বহুদিন হইতে পায় নাই। রাজ কর্ম্মচারীরা যদৃচ্ছাক্রমে প্রজাদিগের উপর নানা প্রকারে অত্যাচার করিয়া কর আদায় করিতেছে। যাহা আদায় করে তাহা কোষাগারে দেয় না, প্রায় সমুদয়ই চুরি করে। কোষাগারে টাকা নাই। প্রজাগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। প্রজাগণের অবস্থা এইরূপ—রাজস্বের অবস্থা, সৈন্যগণের অবস্থা এইরূপ,—আর আপনি চক্ষু মুদিয়া মজা করিতেছেন, আমি আপনাকে বলিতেছি—আপনার রাজ্যে শীঘ্র প্রজাবিদ্রোহ হইবে, সেই বিদ্রোহ কি প্রকারে দমন করিবেন? সৈন্যগণ প্রাপ্য বেতন না পাইলে কখনই বাধ্য থাকিবে না, আর আপনি কোথা হইতেই বা তাহাদিগের বেতন দিবেন? যখন প্রজাগণ বিদ্রোহী হইবে, সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইবে, তখন আপনাকে কে রক্ষা করিবে? আর যদিও প্রজাগণ, কি আপনার সৈন্যগণ আপাতত কিছু কালের নিমিত্ত বিদ্রোহাচরণ না করে, তথাচ আপনি কি মনে করেন, ব্রিটিস-ব্যাঘ্র, আপনি এই প্রকার আচার করিলে, আপনার রাজ্যে এই প্রকার বিশৃঙ্খল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইলে, আপনাকে কি নির্ব্বিবাদে এই সিংহাসনে থাকিতে দিবে? মনেও করিবেন না। ইংরাজ সতত রাজ্যলোলুপ। সাতরা, ঝান্সি, নাগপুর যাহারা অছিলা করিয়া অনায়াসে আত্মসাৎ করিল, ওয়াজিদ আলিকে তাড়াইয়া দিয়া যাহারা অযোদ্ধা কাড়িয়া লইল, আপনার রাজ্যের উপর কি তাহাদিগের দৃষ্টি নাই? আকাশে ঘন কাল মেঘ উঠিতেছে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শীঘ্র ঝড় উঠিবে—আপনাকে কে রক্ষা করিবে? আরও যদি শুনিতে চাহেন, আমি আপনাকে বলি, রাজ্যে আপনার কত শত্রু আছে।" বলিয়া তিনি অনেক গূঢ় কথা বলিলেন। ষড়যন্ত্রের অবস্থা সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া রাজা স্তম্ভিত হইলেন, শেষে বলিলেন, "উপায়?"

পরি। আমি বলিতেছি, আপনি প্রথমে আপনার অসার ও পশুবৎ পারিষদদিগকে দূরীভূত করুন। রাজকার্য্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা করুন। যাহারা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান অপরাধী কয়েক ব্যক্তিকে হৃদয়কম্পনকারী দণ্ড দেন। সুশাসন যাহাতে হয়, তাহার জন্য আপনি স্বয়ং অভিযোগ শুনিবেন, যাহার যে কষ্ট থাকে আপনি তাহা অচিরাৎ মোচন করিবেন, এই ঘোষণা করিয়া দেন ও সেই মত কার্য্য করুন। যাহারা রাজস্ব চুরি করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে দুই এক জনকে কঠোর শাস্তি দিয়া

সৎ ব্যক্তির হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দিন। আপনার মহামূল্য রত্ন কিঞ্চিৎ বিক্রয় করিয়া আপাতত সৈন্যদিগের কতক বেতন শোধ করিয়া দিন এবং ভবিষ্যতে তাহাদের বেতন রীতিমত দেওয়া হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিন। আপনি কার্য্য করিতে আরম্ভ করুন, পরামর্শের অভাব হইবে না। আপনার ইচ্ছা থাকিলে অনেক জ্ঞানী লোক আসিয়া পরামর্শ দিবে।

রাজা বলিলেন—"মহাশয় আমার একটী মিনতি, আপনি রাজ-মন্ত্রী হউন।"

পরিব্রাজক বলিলেন, মহারাজ, আমি সংসারাশ্রম ছাড়িয়া দিয়াছি। সুতরাং আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। আর আমি কবে কোথায় থাকি, তাহারও স্থিরতা নাই। তবে যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আমি এক জন সুযোগ্য লোককে আপনার মন্ত্রী ঠিক করিয়া দিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, আমি এবিষয় বিবেচনা করিয়া আপনাকে বলিব। আপনি এক্ষণে আপনার আবাস-স্থানে যাউন। এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

নবজীবন ও বিধবা বিবাহ।

নবজীবন-সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সাবিত্রী লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে, "হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না," বিষয়ে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, (১) তাহা লইয়া সংবাদ পত্র সমূহে একটী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, প্রায় সমস্ত পত্রিকাই অক্ষয় বাবুর মতের বিরুদ্ধে লিখিতেছেন। এই উপলক্ষে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আবার একটু আন্দোলন উঠিয়াছে। অক্ষয় বাবুর কবিত্বপূর্ণ, বাগাড়ম্বরপূর্ণ, যুক্তিতর্ক-শূন্য, অসংলগ্ন প্রবন্ধের মত শুনিয়া, বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ, এই উভয় সম্প্রদায়ই কিছু বিস্মিত হইয়াছেন। অক্ষয় বাবু পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত; তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে একদেশদর্শীরূপে বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করিতে দেখিলে সকলেরই বিস্মিত হইবার কথা। ভারতবর্ষে এখনও হিন্দু শাস্ত্রালোচনা একেবারে রহিত হয় নাই। এরূপ স্থলে যাহা-তাহা বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাওয়া বড়ই বিড়ম্বনা। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধে যে সকল অসংলগ্ন যুক্তি তর্ক ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বিজ্ঞ সমালোচকগণের কুঠোর লেখনীর আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাঁহার শাস্ত্রের যুক্তি সকল একদেশদর্শী বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তিনি সে সকল সমালোচনার প্রতিবাদ না করিয়া, "নবজীবনের আটকৌড়ে" প্রকাশ করিয়া যতই গালিগালাজ বর্ষণ করুন না কেন, শিক্ষিত-সমাজ এতই ভীত নহে যে, অন্ধরূপে তাঁহার কল্পনার কথা শুনিতে বা পালন করিতে বাধ্য হইবে। বঙ্গভূমি আজও শিক্ষা বা ধর্ম্ম শূন্য হয় নাই যে, যে যাহা বলিবে, তাহাই সকলে পালন করিবে। আপন বুদ্ধি বা বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করিয়া, এই উনবিংশ শতাব্দীতে কে আর অন্ধরূপে

(১) এই প্রবন্ধটী বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছে।

শাস্ত্রের কূট-ব্যাখ্যানুসারে কার্য্য করিবে? কিন্তু বঙ্কিম বাবু পর্য্যন্ত বিগত বৎসর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্কীর্ণ, অনুদার, যাহা-তাহা রকম হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া, প্রথম সংখ্যক প্রচারে লিখিয়াছিলেন, "শাস্ত্রের সব কথাই যে মানিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।" ইত্যাদি (প্রচার ১ম সংখ্যা দেখ) অক্ষয় বাবু নিজেও শাস্ত্রের কথা মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক নহেন, কারণ তাহা হইলে, তিনি কখনই শূদ্র হইয়া, মনুর বাক্য লঙ্ঘন করিয়া, হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেন না। তিনি শাস্ত্র না জানিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। তবে আমরা বুঝিতে বাধ্য হইয়াছি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি তাঁহার নিজের কুটিল অভিপ্রায়কে, শাস্ত্র, যুক্তি ও ধর্ম্মের অভিপ্রায় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন;—তিনি নিজের কল্পিত অনেক কথা, শাস্ত্রের কথা বলিয়া, প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং তাঁহার প্রবন্ধ সুললিত ভাষার পরিচ্ছদে, হিন্দু ধর্ম্মের নাম-অলঙ্কার এবং বাহ্য-সুন্দর যুক্তির বেশ বিন্যাসে এমনই সজ্জিত হইয়া সাধারণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, দেখিবামাত্র বড় হৃদয়ঙ্গম মূর্ত্তি বলিয়া, ভ্রম হয়। এই আপাত মধুর বাহ্য সৌন্দর্য্যে অনেকেরই প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্যই, অন্যান্য সম্পাদকগণের ন্যায়, আমরাও অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে যে কয়েকটী যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়; আমরা ক্রমে তাহার সমালোচনা করিব।

প্রথমত;—"হিন্দুর জীবন ধর্ম্মপ্রধান, সকল ব্যাপারেই হিন্দু আধ্যাত্মিকদিকে দৃষ্টি-প্রখর। হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আত্মায় মিল। হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস, মানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে তাঁহার আত্মার ধ্বংশ হয় না, পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর জাতি ধর্ম্ম। এখন বলুন দেখি, হিন্দুনারী স্বামীর পরলোক প্রাপ্তিতে কি বলিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে যাইবে?"

অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন যে, হিন্দুর বিবাহ আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। এবং ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপে বলিয়াছেন যে, এই আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠানের অর্থ আত্মায় আত্মায় যোগ। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, এই যে আত্মায় আত্মায় যোগ, তাহা কি দুইটী সমতুল্য আত্মার মধ্যে, না একটী ক্ষুদ্র একটী মহৎ আত্মার মধ্যে? যদি দুইটী সমতুল্য আত্মারই যোগ হয়, তবে তাহাদিগেরই যোগ সম্ভব; এবং সেই রূপ যোগ বা একীকরণই ইহকাল ও পরকাল স্থায়ী। কিন্তু যদি দুইটী অসমতুল্য আত্মা একত্রিত হয়, তবে তাহাদিগের যোগ ত দুর্ব্বাদলের শিশির কণার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মাত্র। আত্মা যেমনই অবিনশ্বর, তেমনি নিয়ত উন্নতিপ্রার্থী। আপন আপন সুকৃত অথবা দুষ্কৃতের ফলে, আত্মাদ্বয়ের বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। দম্পতীর মধ্যে এক জনের আত্মা যখন দেবলোকে, অপরের আত্মা হয় ত

তখন রসাতলে,—একজন যখন নন্দনে, অপর হয় ত তখন রৌরবে। এরূপ স্থলে, আত্মার সহিত আত্মার যোগ কেবলই অর্থ-হীন শব্দ সমষ্টিমাত্র। অক্ষয় বাবু বোধ হয় বলিতে সাহস করিবেন না যে, দম্পতীর প্রত্যেক নরনারী সমান ধার্ম্মিক এবং তাঁহাদিগের আত্মা সমতুল্য। ইহা হইতেই অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে যে, আধ্যাত্মিক বিবাহ, অর্থাৎ যে বিবাহে আত্মার সহিত আত্মার যোগ হয়, তাহা জগতে কত দুর্ল্লভ। আমরা বলিতে পারি না যে, বিবাহ মাত্র হইলেই নরনারীর অত্মার একীকরণ হইল; কিন্তু যখন দেখিতে পাইব যে,একটী দম্পতীর আত্মাদ্বয়ের প্রকৃতিও সমরূপ, তখনই আমরা স্বীকার করিব যে, তাঁহাদিগের বিবাহই তাঁহাদিগের আত্মার একীকরণের উপায় এবং সেই রূপ বিবাহই আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। অক্ষয় বাবু যদি বলিতেন যে, এই রূপ দুইটী আত্মার একীকরণ না হইলে সে বিবাহ বিবাহই নয়, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জনিত পিপাসা নিবারণের উপায়মাত্র, তাহা হইলে আমরা বুঝিতাম যে, তিনি বিবাহের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত একবাক্যে বলিতাম যে, এইরূপ একীভূত দম্পতীর মধ্যেই বিচ্ছেদ নাই; এবং তাঁহাদিগের মধ্যেই একজনের মৃত্যুতে অপরের পুনর্ব্বার বিবাহের অধিকার নাই। যে দম্পতী বুঝিয়াছেন যে, আমাদিগের এ সম্বন্ধ কেবল ইহ কালের জন্য নয়; পরকালেও আবার আমরা একত্রিত হইব, তাঁহাদিগের বিবাহই প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিবাহ। অন্যথা বিবাহ মাত্রকেই আধ্যাত্মিক বিবাহ বলিলে, আধ্যাত্মিক বিবাহের অবমাননা করা হয়। এ সম্বন্ধে আমাদিগের দ্বিতীয় কথা এই যে, এই আত্মায় আত্মায় যোগ, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশ্রণ, তাহা কি বর এবং কন্যা উভয়ের মধ্যে, না তাঁহাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধের উদ্যোগ-কর্ত্তা পুরোহিত এবং গুরুজনের মধ্যে? অশিক্ষিতা, অপ্রাপ্ত-বয়স্কা, সংসার-জ্ঞান-শূন্যা বালিকাকে তুমি বাধ্য করিয়া বলাইলে, বল "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং; পতিকুলে ভূয়াসম্;" বালিকা না জানিয়া না বুঝিয়া বলিল, "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং; পতিকুলে ভূয়াসম্।" যদি এ মন্ত্র না বলাইয়া, তুমি তাহাকে বলাইতে, বল, "পতির্বধ্যঃ পতিশ্ছেদ্যঃ" তাহা হইলেও ত বালিকা বলিত,—"পতিবর্ধ্যঃ পতিশ্ছেদ্যঃ।" এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই যে প্রতিজ্ঞা, যাহার অর্থ দূরে থাকুক, যাহার ভাষা পর্য্যন্তও বিবাহেচ্ছু বুঝিল না, সে প্রতিজ্ঞার কি কোন মূল্য আছে? না সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাকারী বাধ্য? এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া, যদি সেই বিবাহের নাম আধ্যাত্মিক বিবাহ বলিতে চাও, বল, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার অনুরোধে, হিন্দুনারীর স্বামীর পরলোক-প্রাপ্তিতে পুনর্ব্বার বিবাহ অধর্ম্ম, একথা মুখেও আনিও না। যাহারা কুলীদিগকে আসামে বা মরীশাষে পাঠায়, তাহারা তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে শিখাইয়া রাখে যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন,তাহার উত্তরে কেবলই বলিও—"আজ্ঞা হাঁ।" কখনও কোন কথায় অসম্মতি দিও না, দিলেই তোমাদিগের বিপদ ঘটিবে। হতভাগ্য কুলী আপনার দুর্দ্দশা জানে না, আপনার ভবিষ্যৎ

বুঝিতে পারে না; ম্যাজিষ্ট্রেট যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তুমি কি আসামে যাইবে? কুলী বলিল—"আজ্ঞা হাঁ।" সেখানে ৫ বৎসর থাকিবে? উত্তর হইল—"আজ্ঞা হাঁ।" ম্যাজিষ্ট্রেট সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তুমি ত ইচ্ছা পূর্ব্বক সেখানে যাইতেছ? হতভাগা না বুঝিয়া, আপনার পায়ে আপনি কুঠার আঘাত করিয়া বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই যাইতেছি।" তখন সেত জানিত না যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। শেষে যখন পরীক্ষার দিন আসিল, আহারের অভাবে, রোগের যন্ত্রনায়, অত্যাচারী প্রভুর উৎপীড়নে, হতভাগ্যের জীবন তখন বড় ভার বোধ হইল। গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য, পত্নী পুত্রের মুখ দেখিবার জন্য, তাহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। সে প্রভুর নিকট যাইয়া, কৃতঞ্জলি পুটে বলিল, "প্রভো, আমার বড় কষ্ট, আমাকে বিদায় দিন।" কিন্তু তাহার নির্দ্দয় প্রভু বলিল, হতভাগ্য দাস, তুমি ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই এখানে আসিয়াছ, তবে আর যাইতে চাহিতেছ কোথায়? মরিতে হয়, তোমাকে এই খানেই মরিতে হইবে। বৈধব্যের যন্ত্রণা, সমাজের অত্যাচার সহ্য করিয়া, প্রবৃত্তির সহিত অহরহ সংগ্রামে পরাজিত-প্রায় হইয়া, বালিকা বিধবা যখন গদ গদ কণ্ঠে কৃতাঞ্জলি পুটে সমাজের নিকট যাইয়া বলিল, "আর আমি পারি না, আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, আমি অ—পা, আমার উপর এ অত্যাচার কেন, আমার এবন্ধন একটু শিথিল করিয়া দাও! তখন নিষ্ঠুর, পরদুঃখপরাঙ্মুখ সমাজ তাহাকে বলিল,—পাপিয়সি, তুমি ত স্বেচ্ছাপূর্ব্ব-কই "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ,—তবে আবার আজি কোন্ প্রাণে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বিদায়ের কথা মুখে আনিতেছ? তোমার প্রাণ ফাটিয়া যায় যাউক কিন্তু "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং" প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন হইবে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, এই আসামগামী কুলী ও বালিকার বিবাহ কালীন প্রতিজ্ঞা কি সমতুল্য নয়? যাহা তাহারা বুঝে না, যাহার পরিণাম কি হইবে, তাহারা জানিতে পারে না, তাহাদিগকে প্রথমে সেইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করাইয়া, শেষ বলিলে যে তোমরা এই প্রতিজ্ঞার জন্য বাধ্য, ইহা ভঙ্গ করিলে তোমাদিগের পরিণাম অনন্ত নরক। ইহা যে কিরূপ যুক্তি, এবং কিরূপ আধ্যাত্মিক বিবাহ, তাহা যুক্তিদাতাগণই বলিতে পারেন।

এস্থলে অক্ষয় বাবু হয়ত বলিতে পারেন যে, পরিণত বয়সে অর্থাৎ যে বয়সে দম্পতী বিবাহ-প্রতিজ্ঞা বুঝিতে সমর্থ হয়, সেই বয়সে বিবাহ দিলেই ত এই আপত্তি খণ্ডিত হইল। আমরা বলি যে, তাহা নয়। পরিণত বয়সে বিবাহ হইলেও যে আত্মার মিল হইবে, তাহার অর্থ কি? আত্মায় আত্মায় মিল, বুদ্ধি, বয়স, বা শিক্ষা, কিছুরই উপর নির্ভর করে না, তাহা একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, জগতে বড় দুর্ল্লভ সামগ্রী। সুতরাং অক্ষয় বাবু যে হিন্দু বিবাহ মাত্রেই আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন, তাহা কেবল কল্পনায় মাত্র, বাস্তবিক জীবনে দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং হিন্দু বিবাহের যে আধ্যাত্মিকতার অনুরোধে, তাঁহার মতে, হিন্দু নারীর স্বামীর পরলোক প্রাপ্তিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার অধিকার নাই, হিন্দু বিবাহে যখন সেই আধ্যাত্মিকতারই অভাব, তখন বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ যে ধর্ম্ম বহির্ভূত কার্য্য নহে, তাহা বলা অতিরিক্ত মাত্র। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

হইতে

নব-জীবন ও বিধবা বিবাহ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবের উপ-সংহার স্থলে বলিয়াছি যে প্রত্যেক বিবাহকে আধ্যাত্মিক বিবাহ বলিলে, আধ্যাত্মিক বিবাহের অবমাননা করা হয়। যে বিবাহে আত্মার সহিত আত্মার যোগ,—প্রাণের সহিত প্রাণের মিল, সংসারে তাহা বাস্তবিকই বড় দুর্লভ সামগ্রী; সহস্রেরও মধ্যে একটী দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। বিবাহের পর হইতেই, অনেক দম্পতীকে জীবনের অবশিষ্ট কাল, গুরুতর মানসিক যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিতে হয়। আত্মার সহিত আত্মার যোগ দূরে থাকুক, পরস্পরের রুচি ও প্রবৃত্তির পার্থক্য বশতঃ, তাঁহাদিগের বিবাহ-সম্বন্ধ ভয়ঙ্কর ক্লেশের কারণ হইয়াই উঠে। এরূপ অবস্থায় উদ্বাহ-বন্ধনের উচ্ছেদই, পরস্পরের পক্ষে শান্তি-জনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরে যখন মৃত্যু আসিয়া চির দিনের জন্য তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, তখন কি বলিব যে, যাঁহারা এতদিন পর্য্যন্ত পতিপত্নী রূপে, অশান্তিতে, জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আজি মৃত্যুর পর তাঁহারা আদর্শ দম্পতীরূপে শান্তি রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন? এরূপ বিশ্বাস ত কোন মতেই সুসঙ্গত হইতে পারে না। আত্মা যে অবিনশ্বর, তাহাত স্বীকার করি; যদি একবার একটী আত্মার সহিত অপর একটী আত্মার যোগ হয়, তবে তাহাতে যে বিয়োগ ঘটে না, তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু জগতে যখন আত্মার সহিত আত্মার যোগ এত দুর্লভ, দেখিতে পাই না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তখন কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, বিবাহ মাত্রই আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান; এবং তজ্জন্য হিন্দু রমণীর পতি বিয়োগের পর পুনর্ব্বার বিবাহে অধিকার নাই?

(২) "হিন্দু রমণীর বিবাহ একটী কুলের সহিত, বিশেষ পুরুষ কেবল পাত্র মাত্র। তিনি একবার যে কুলে গৃহীতা, নীতা ও পরিণীতা হইয়াছেন, কোন প্রকারেই আর তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। কুলত্যাগিনী, কুলটা, ব্যভিচারিণী, হিন্দুদিগের অভিধানে একই পর্য্যায় ভুক্ত।"

আমরাও স্বীকার করি যে, বিবাহ পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে নহে; তাহারা কেবল বিশেষ ব্যক্তি মাত্র। বিবাহ একটী কুলের সহিত অপর একটী কুলের; একটী কুল আদান প্রদান দ্বারা অপর একটী কুলের সহিত মিলিত হইয়া যায়; পরস্পরের শোণিত একত্রিত হইয়া, দুইটী বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে একটী অভিনব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া কখন স্বীকার করিতে পারিনা যে, পতি-বিয়োগের পর পত্যন্তর গ্রহণকারিণী রমণী, কুলটা। বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী অবস্থায়ত রমণী পিতৃকুলে বাস করেন; পিতার কুলই তখন তাঁহার কুল;—ক্রিয়া, কর্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু, সকল বিষয়েইত তিনি পিতৃকুল হইতে সম্পূর্ণ রূপে অনন্য। তবে বিবাহের পর যখন তিনি পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া, "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহম্" বলিয়া, পতিকুলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন তিনিও ত সে অবস্থায় কুলত্যাগিনী; তবে কুলটা নহেন

কেন? অক্ষয় বাবু কুলটা শব্দের কি এই রূপই অর্থ বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন? না উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজের ইচ্ছামত একটী অর্থ করিলেন? পতি লইয়াই রমণীর পতিকুলের সহিত সম্বন্ধ, এবং পতি অবর্ত্তমানে সে কুল হইতে তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। কুমারী অবস্থায় পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া, বিবাহের পর পতিকুলে আসিবার তাঁহার যেমন অধিকার; বৈধব্য দশা ঘটিলে পত্যন্তর গ্রহণ করিবার সময়, ভবিষ্যত্-পতির কুল গ্রহণেও তেমনি অধিকার। ইন্দ্রিয়-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য, বা স্বার্থ-বিশেষ সিদ্ধির নিমিত্ত, কুলত্যাগই নিন্দিত; এবং এইরূপ কুল-ত্যাগিনী রমণীরই নাম কুলটা। কুলত্যাগ মাত্রই নিন্দিত বা ঘৃণাবহ নহে। যখন পত্যন্তর-গ্রহণই শাস্ত্র ও ধর্ম্ম সঙ্গত, তখন ভবিষ্যৎ পতিরকুল গ্রহণ যে দোষাবহ নহে, তাহা [illegible] নিষ্প্রয়োজন। অক্ষয় বাবু কুলটা শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোনও কথা বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু তিনি যে, স্বেচ্ছা ক্রমে এবং নিজের জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই, সমাজের এক শ্রেণীর লোকের উপর, এরূপ তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি; বিবাহেচ্ছু বিধবাগণকে প্রকারান্তরে কুলটা ও ব্যভিচারিণী বলিয়া, তিনি যে কেবলই আপনার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার ও অনুদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নীচত্বেরও যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। বিবাহার্থিনী বিধবাগণের প্রতি এইরূপ কটূক্তি বর্ষণ করিবার তাঁহার কোন অধিকার ছিল না; কিন্তু যাহারা কটূক্তি-প্রিয়, তাঁহারা প্রায়ই বড় নির্লজ্জ; সুতরাং অক্ষয় বাবুকে এ বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

৩। "হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয়। হিন্দুনারী জানেন কেবল একং ও অদ্বিতীয়ং; কাযেই তিনি পতিচারিণী হইলেই একচারিণী; সেই পতি যখন ব্রহ্মে লীন হইলেন, কাযেই তিনি ব্রহ্মচারিণী"।

এই যুক্তিটীর সম্বন্ধে আমাদের দুইটী বক্তব্য আছে। প্রথম কথা এই যে, হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয় কেন? এবং দ্বিতীয় কথা এই যে, পতির ব্রহ্মেলীন হওয়া, কি প্রত্যেক বিধবাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সেই জন্য ব্রহ্মচারিণী হইতে হইবে?

অক্ষয় বাবু এই যুক্তি প্রদর্শনের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা না করে কে? কিন্তু সেই প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি ব্রহ্মচর্য্যের একটী প্রকৃত লক্ষণ, ও তাহা কিরূপ অবস্থায় এবং কিরূপ ব্যক্তির দ্বারায় অনুবর্ত্তনীয়, তাহা বিবৃত করিতেন, তাহা হইলেই বড় ভাল হইত। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ আমরা কি বুঝিব? অভিধান যাহা বলে তাহাত এই:—ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুন বর্জ্জনং তাম্বুলাদি বিবর্জ্জনঞ্চ। যথা প্রচেতাঃ।

তাম্বূলা ভ্যঞ্জনং চৈব কাংস্য পাত্রেচ ভোজনং।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিবর্জ্জয়েৎ।
একাহারঃ সদা কার্য্যঃ নদ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং।
গন্ধ দ্রব্যস্য সম্ভোগোনৈব কার্য্য স্তয়া পুন
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুস্তিল কুশোদকৈ
বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষং নিয়মঞ্চরেৎ
স্নানং দানং তীর্থ যাত্রাং বিষ্ণোর্নাম গ্রহং মুহুঃ
ইতি শুদ্ধিতত্ত্বম্।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম উদ্দেশ্য মৈথুন বর্জ্জন। এবং এই উদ্দেশ্য যাহাতে সংসাধিত হয়, তজ্জন্যই একাহার প্রভৃতির উপদেশ। বিধবার খাদ্যাখাদ্য ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের নিম্নলিখিত উপদেশটীও এই যুক্তিকে আরও দৃঢ় করিতেছে।

"পর্য্যঙ্ক শায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং
যানমারোহণং কৃত্বা বিধবা নরকং ব্রজেৎ ॥
ন কুর্য্যাৎ কেশ সংস্কারং গাত্র সংস্কার মেবচ।
কেশ বেণী জটা রূপং তৎক্ষৌরং তীর্থকং বিনা ॥
তৈলাভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত ন হি পশ্যতি দর্পণং।
মুখঞ্চ পরপুংসাঞ্চ যাত্রাং নৃত্যং মহোৎসবং ॥
নর্ত্তকং গায়নঞ্চৈব সুবেশং পুরুষং শুভং।
ইতি ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে ৮৩ অধ্যায় ॥

এক্ষণে আমরা অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই কি ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত লক্ষণ? এসকল ত দেখিতেছি, ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য উপদেশ। যাহাতে হৃদয়ে বিলাসস্পৃহা না আসে, ইন্দ্রিয় পিপাসা না জন্মে, শরীরকে বশীভূত রাখিয়া,দুর্দ্দমনীয় রিপু সকলকে দমন করিয়া রাখিতে পারা যায়, এ উপদেশ ত তাহারই জন্য প্রদত্ত। পাছে বিধবার হৃদয়ে, ইন্দ্রিয়পিপাসা জন্মে, প্রবৃত্তির পীড়নে পাছে সে কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হয়, এ উপদেশ ত সেই জন্য। পাপ হইতে রক্ষা মাত্রই এই উপদেশের লক্ষ্য; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ ত আরো মহত্তর হওয়া কর্ত্তব্য, তাহার বিধানত আরও প্রশস্ত, আরও সার্ব্বলৌকিক হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয় সংযম কেবল বিধবার কর্ত্তব্য কেন; প্রত্যেক নরনারীরইত অবশ্যোচিত কার্য্য; তবে এ নিয়ম প্রতিপালন করিতে কেবল বিধবাগণই বাধ্য কিজন্য?

অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন—"যে হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয়।' শাস্ত্রে ত ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ, এবং পুনর্ব্বার বিবাহ, বিধবার পক্ষে এই তিনই বিধান আছে, তবে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয় কি জন্য? ইহার উত্তরে অক্ষয় বাবু অনেক বাগাড়ম্বরের পর বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম ধর্ম্মেরই অনুসরণ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য; ব্রহ্মচর্য্য সেই নিষ্কাম ধর্ম্ম এবং সেই জন্যই বিধবার একমাত্র অবলম্বনীয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য যে নিষ্কাম ধর্ম্ম, হিন্দু শাস্ত্র কোবিদ এবং হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক অক্ষয় বাবু, তাহা কোন্ হিন্দু শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছেন? ব্রহ্মচর্য্যের ফলত আমরা মনুসংহিতায় এইরূপই অবগত হই।

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি।" মনুসংহিতা ৫।১৬০ ॥

সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, অপুত্রা হইলেও স্বর্গে গমন করিবেন।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য এবং ফল স্বর্গ; কিন্তু যাহার কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহাত নিষ্কাম ধর্ম্ম হইতে পারে না; তবে ব্রহ্মচর্য্য কি রূপে নিষ্কাম ধর্ম্ম হইবে? সকাম এবং নিষ্কাম ধর্ম্মের যাহা লক্ষণ, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্য কামতা।
কামোহি বেদাধিগমঃ কর্ম্ম-যোগশ্চ বৈদিকঃ ॥"
মনু ২ অ ২ ॥

কর্ম্ম মাত্রই কামনার বিষয়, স্বর্গাদি ফলাভিলাষ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান অতি গর্হিত, যে হেতু তদ্রূপ কর্ম্ম করিলে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান সহকারে বেদবোধিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥

"সঙ্কল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্প সম্ভবাঃ।
ব্রতানিয়ম ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃস্মৃতাঃ॥"
মনু ২য় অঃ ৩।

এই রূপ কর্ম্মদ্বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, এইরূপ বুদ্ধিকে সঙ্কল্প বলা যায়, এই সঙ্কল্পের পর তাহাতে ইচ্ছা জন্মে, অনন্তর তাহার অনুষ্ঠান হয়,এইরূপে যজ্ঞ সকলসঙ্কল্প সম্ভব হইয়া থাকে, আর ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ও গুরু শুশ্রূষাদি নিয়ম সকল সঙ্কল্প জন্য হয়।

"তেষু সম্যগ্বর্ত্তমানো গচ্ছত্য নরলোকতাং।
যথা সঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান কামান্ সমশ্নুতে॥
মনু ২য় অঃ ৫॥

ফলাভিলাষ শূন্য হইয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং স্বভাবতই সকল অভিলাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, যে কর্ম্ম কোন উদ্দেশ্য বা কোন ফলাভিলাষের জন্য হয়, তাহা কাম্য কর্ম্ম, এবং ফলাভিলাষ শূন্য হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম, এবং মোক্ষ প্রাপ্তির অনুকূল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য স্বর্গ;—সুতরাং অক্ষয় বাবু সহমরণ ও পুনর্ব্বিবাহকে যে বর্জ্জনীয় কাম্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যও সেই জাতীয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কাম অর্থাৎ শ্রেষ্টতম ধর্ম্ম; এবং তজ্জন্যই বিধবার একমাত্র অবলম্বনীয়, এযুক্তির সারবত্তা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। যখন ব্রহ্মচর্য্য এবং পুনর্ব্বার বিবাহ এই উভয়ই শাস্ত্রানুসঙ্গত এবং ধর্ম্মানুমোদিত, তখন ইচ্ছা করিলেই বিধবা এ দুইএর যে কোনটী অবলম্বন করিতে পারেন। ব্রহ্মচর্য্যই একমাত্র অবলম্বনীয়, পত্যন্তর গ্রহণ অশাস্ত্র এবং অধর্ম্ম, একথার কোনও অর্থ নাই। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অক্ষয় বাবুর দ্বিতীয় কথা এই যে, পতি যখন ব্রহ্মেলীন হইলেন, তখন ব্রহ্মচারিণী হওয়াই বিধবার কর্ত্তব্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, পতি মাত্রই কি মৃত্যুরপর ব্রহ্মে লীন হইবেন? এবং প্রত্যেক বিধবাকেই কি বিশ্বাস করিতে হইবে যে, তাঁহার পতি ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন? এমন অনেক বিধবা আছেন, যাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদিগের পতি জীবনে যেরূপ দুষ্ক্রিয়াসক্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রহ্মেলীন হওয়া দূরে থাকুক, হিন্দুশাস্ত্র মতে কৃমিযোনিপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। এই সকল বিধবার পক্ষে, তাহা হইলে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? অক্ষয়বাবু হয় ত বলিবেন যে, পতি স্বর্গে অথবা নরকে থাকুন্ ক্ষতি নাই, বিধবার ব্রহ্মচারিণী হওয়াই কর্ত্তব্য। আমরা তাহার উত্তরে বলিব যে, তাহা যদি বলেন, তবে কেবল বিধবারই কর্ত্তব্য কেন, প্রত্যেক নর নারীরই, ব্রহ্মচারী অথবা ব্রহ্মচারিণী হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পতি ব্রহ্মেলীন হইয়াছেন, যদি এইমাত্র কারণেই ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয়, তাহা হইলে ত দেখিতে পাই, অনেক বিধবাকে কৃমিগত চিন্তাতেই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। আমরা এই পর্য্যন্ত বুঝি যে, ব্রহ্মচর্য্য যদি অনুসরণীয় হয়, তবে তাহা সধবা, কুমারী, বিধবা, সকলেরই পক্ষে সমান।

ব্রহ্মচর্য্য সকাম অথবা নিষ্কাম ধর্ম্মই হউক, পুনর্ব্বিবাহ অপেক্ষা, শ্রেষ্ট অথবা নিকৃষ্ট কর্ম্মই হউক, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। এমন যুক্তি ত দেখিতে পাই না, যাহা হিন্দু শাস্ত্রের কোন

না কোন স্থলে সমর্থিত না হইয়াছে; তবে শাস্ত্রের কথা অনর্থক। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, শাস্ত্রকার, এই বহু প্রশংসিত, বহু ফলপ্রদ ধর্ম্মটী, কেবলই বিধবার ব্যবহারের জন্যই রাখিয়া দিয়াছেন কেন? যাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়, তাহাত সকলেরই নিকট সমান; যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জানি, তাহা করিবার জন্যত সকলেরই ব্যগ্র হওয়া কর্ত্তব্য; তাহা করিতে ত সকলেরই অধিকার আছে; তবে কেবল বিধবার উপর এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম চালাইতে চান কি জন্য? এই একদেশদর্শিতা এবং অত্যাচার দেখিয়া, আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, হিন্দুশাস্ত্রে বিধবার যে ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অতি দূরতর, কিন্তু শারীরিক প্রবৃত্তি বিশেষের প্রতিরোধই এই ব্রহ্মচর্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্রহ্মচর্য্য বিধবার আত্মার উন্নতির জন্য নয়, তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশেষের নিরোধের জন্য। পুরুষকে ক্লীবে পরিণত করিবার জন্য, পূর্ব্বে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিবার রীতি ছিল, স্ত্রী জাতির পক্ষে সে সকল উপায় অপ্রযোয্য। এই একদেশব্যাপী, শ্রেণী-বিশেষ-প্রযোয্য ব্রহ্মচর্য্য, বিধবাকে ক্লীবে পরিণত করিবার উপায়। হয়ত অক্ষয় বাবু এস্থলে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, যাহাতে ইন্দ্রিয় সংযম হয়, তাহা কি ব্রহ্মচর্য্য নয়? আমরা বলি যে, তাহা ব্রহ্মচর্য্য না হইলেও তাহার আনুষঙ্গিক, নিত্য সহচর, অথবা অবশ্যম্ভাবী ফল বটে। কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযমের নামই যদি ব্রহ্মচর্য্য, তবে তাহাকে নিষ্কাম ধর্ম্ম না বলাই কর্ত্তব্য।

নিষ্কাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগের এখনও একটু বক্তব্য আছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিলেই আমরা বুঝিব যে, যে ধর্ম্মে উদ্দেশ্য নাই, স্বার্থ নাই, কামনা নাই, যে ধর্ম্ম কেবলই ধর্ম্মের জন্য, সেই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা ত আর কোন মহত্তর লক্ষ্য হইতে পারে না। যদি আমি কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সত্য কথা বলি, তবেত সে সত্যের তেমন গৌরব নাই। কিন্তু যদি আমি কেবলই সত্যের জন্যই সত্য কথা বলি, তবেই আমি সত্যের প্রকৃত গৌরব বুঝিয়াছি। সেই জন্যই বলি যে, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, স্বাধীনতার প্রয়োজন। যে ধর্ম্মে স্বাধীনতার অভাব, তাহা কখনই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম হইতে পারে না। যদি কেহ রাজদণ্ডের ভয়ে চৌর্য্যাচরণ না করে, তবে, কি বলিব যে, সে ব্যক্তি বড় ধার্ম্মিক, তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম। যদি এমন কোন রাজ নিয়ম হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাঁহার উপার্জ্জনের অর্দ্ধাংশ দরিদ্রদিগকে দান করিতে হইবে; এবং না করিলে নিয়ম ভঙ্গকারীকে দ্বীপান্তরিত হইতে হইবে; এবং এরূপ অবস্থায় রাজদণ্ডের ভয়ে, যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন আপনার উপার্জ্জনের অর্দ্ধাংশ দরিদ্রদিগকে দান করেন; তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে তিনি বড় দানশীল, তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম। স্বাধীনতা না থাকিলে ত নিষ্কাম ধর্ম্ম হইতে পারেনা। কিন্তু বিধবার ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতা নাই। অত্যাচারের ভয়ে, মানসিক নির্ব্বেদে, বিধবা ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার ভয় না করিলে সমাজ তাঁহাকে পাপিয়সী বলিয়া ঘৃণা করিবে, আত্মীয়গণ কলঙ্কিনী বলিয়া নির্য্যাতন করিবেন। কিন্তু যদি বিধবাকে স্বাধী-

নতা দিয়া, ব্রহ্মচর্য্য এবং পুনর্ব্বিবাহ এ উভয়ের মধ্যে তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইত, তাহা হইলেই বুঝিতাম যে, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব বুঝিতে সমর্থ। নতুবা বল পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করাইয়া, আমাদিগের বিধবাগণ "কেমনই ক্ষেমঙ্করী, কেমনই নিষ্কামে কার্য্যকরী বলা" অন্তঃসারহীন বাক্যের আড়ম্বর মাত্র।

এস্থলে হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমরা বলিতেছি যে, হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বিধবাই বিবাহ প্রয়াসিনী। আমাদিগের এরূপ উদ্দেশ্য নহে। আমরা জানি যে, হিন্দু সমাজে আদর্শ বিধবার অসদ্ভাব নাই। বিধবাগণের মধ্যে, এমন কি বাল বিধবাগণের মধ্যেও, এমন কেহ কেহ থাকিতে পারেন যে, যাঁহারা আজীবনই পরের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। পতিগত চিন্তায়, প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে তাঁহাদিগের বিরক্তি নাই। কিন্তু কেহ কি অস্বীকার করিতে পারিবেন যে, এরূপ রমণীর সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প? এই রক্তমাংসময় শরীরে, পাপ কলুষময় জগতে, তেমন নিসর্গ পবিত্র দেবতার আবির্ভাবই অসম্ভব। অহরহ আমাদিগের চক্ষুর সমক্ষে যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাই নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। কোথাও তাহার পার্থক্য দেখিলেই বুঝিব যে, তাহা নিয়ম নহে; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। যে প্রেত মূর্ত্ত অবিশ্রান্তই আমাদিগের চক্ষুর উপর ভাসিতেছে, তাহা না দেখিয়া কি যুগান্তরে কোথায় একটী দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া বলিব যে, হিন্দুসংসার শ্মশান নয়, স্বর্গ? অহরহ পূতি গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, এক দিন স্বর্গের সৌরভে মোহিত হইয়া কি বলিব যে, হিন্দু সংসার নরক ময়, নন্দন কানন? সত্যের অনুরোধে আমরা স্বীকার করিতে পারিনা যে, হিন্দু সংসার পবিত্র, হিন্দুশাস্ত্র ন্যায়ানুগত। হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু সমাজের উপর আমরা এইরূপ দোষারোপ করিতেছি দেখিয়া, হয়ত অনেকে একটু ক্ষুণ্ণ হইবেন। এখন এইরূপ একটী সম্প্রদায় হইয়াছেন, যাঁহারা বলিতে চান যে, হিন্দুর যাহা কিছু ছিল, সে সকলই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। বিধি, নিয়ম, শাস্ত্র, ব্যবহার, হিন্দুর সকলই উন্নতির চরম সোপানে উঠিয়াছিল। "হিন্দুর জীবন ধর্ম্ম প্রধান" "হিন্দুর সকল কার্য্যই আধ্যাত্মিক' ইত্যাদি নানা কথা এক্ষণে সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা বলি যে, এইরূপ আরোপিত গৌরবে হিন্দুকে গৌরবান্বিত করিবার প্রয়োজন কি? গৌরবের বিষয় ত তাঁহাদিগের যথেষ্টই ছিল; অপর কোন্ জাতির তেমন ছিল? তবে এই সকল আরোপিত প্রশংসা কি জন্য? দিবালোককে উজ্জ্বল করিবার জন্যত বিদ্যুদালোকের প্রয়োজন হয় না। হিন্দু নিজের তেজেই তেজস্বী, তিনি কল্পিত জ্যোতির প্রার্থী নহেন। এসম্বন্ধে আমাদিগের মত এই যে, আমরা হিন্দুর যাহা প্রশংসার কথা আছে, তাহাত মুক্ত কণ্ঠেই বলিব, কিন্তু দোষ দেখিলেই বা বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? আমরা সেই জন্যই বলি যে, হিন্দুর জীবন যেমনই ধর্ম্ম প্রধান, তেমনই অধর্ম্ম প্রধান; যেমনই আধ্যাত্মিক, তেমনই আধিভৌতিক; যেমনই পারলৌকিক, তেমনি পার্থিব; যেমনই পরহিত-পরায়ণ, তেমনই স্বার্থ—পূর্ণ। নচেৎ "মাঃ হিংস্যাৎ সর্ব্বা-

ভূতানি” এই স্নেহ নিস্যন্দিনী বাণী যে জাতির কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল, তাহারই ব্যক্তি বিশেষ “শূদ্রের জীবন জীবনই নয়” একথা বলিতে সাহস করিবেন কেন! যদি এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম, স্ত্রী জাতির ন্যায় পুরুষেরও উপরে বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে বুঝিতাম যে, বিধি দাতা প্রকৃত হৃদয়বান্। কিন্তু বিধি, নিয়ম, ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, সকলই কি হতভাগিনী অবলাগণের জন্য? অশীতিবর্ষবয়স্ক পুরুষের দার গ্রহণ ধর্ম্মানুমোদিত ও শাস্ত্র-সম্মত, কিন্তু অষ্টম বর্ষীয়া বিধবার পুনর্ব্বিবাহ অধর্ম্ম পূর্ণ ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এই যদি ধর্ম্ম, এই যদি শাস্ত্র, তবে অধর্ম্ম, অশাস্ত্র কি, জানি না। এই কঠোর শাস্ত্র-প্রণেতা এবং তাহার অনুমোদকগণ যদি আর্য্য সন্তান, তবে অনার্য্য কে, বলিতে পারি না! কিন্তু এ নিয়মের কি পরিবর্ত্তন হইবে না? অশাস্ত্র ব্যবহারও শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিও ত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কেবল এই দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার কি ঘুচিবে না? কিন্তু ভারত সন্তান আজি নিদ্রিত, অনাথার আর্ত্তনাদ তাঁহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারে না; তবে এ সর্ব্বনাশিনী ব্যাধির প্রতিকারের উপায় কোথায়?

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আমাদিগের শেষ কথা এই যে, যে নিয়ম লোকে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমরা স্বীকার করি যে, ধর্ম্ম কৃচ্ছ্র সাধ্য হইলেও অনুসরণীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া কখনও স্বীকার করিতে পারি না, যে কেবল কৃচ্ছ্রসাধ্য ধর্ম্মই ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম, ধর্ম্মই নহে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ মানব প্রকৃতি বুঝিতেন; তাঁহারা জানিতেন যে, সকলের মানসিক বৃত্তি সমান নহে। যাহা একের পক্ষে উপযুক্ত, অন্যের পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। একের নিকট যাহা বড় কোমল, বড় সুগম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, হয় ত অপরের নিকট তাহা বড় কঠোর, বড় দুর্গম হইতে পারে। তাঁহারা সেই জন্যই বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ, এবং পুনর্ব্বিবাহ, এই তিনেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এবং অবস্থা ও প্রবৃত্তি অনুসারে এই তিনের যে কোনটীই অনুসরণীয়, এইরূপই আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বাবুর সাহস শত গুণ অধিক, তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন, হিন্দুবিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয় এবং ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগিনী বিবাহেচ্ছু রমণী কুলটা এবং ব্যভিচারিণী। অক্ষয় বাবুকে শত সহস্র ধন্যবাদ! তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির জন্যই আমরা এতদিন তাঁহাকে অতুল্য ভাবিয়া প্রশংসা করিতাম; এত দিন পরে বুঝিলাম যে, শাস্ত্রার্থের বিপরীত করণে এবং যুক্তির শিরশ্ছেদনেও তিনি অদ্বিতীয়; বীর ব্রিটানিকস ভিন্ন তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা সাহিত্য জগতে আর নাই।

৪। “হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য মুক্তি। বিবাহ মোক্ষ লাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী। বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের অবলম্বন।”

এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য যে, বিবাহ মাত্র অথবা বিবাহ বিশেষ, মোক্ষ লাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী? যদি বিবাহ মাত্রই হয়, তবে মোক্ষ লাভেরত এমন সহজ উপায়, সরল পথ আর দেখিতে

পাই না। সহস্র দুষ্কর্ম, সহস্র অপরাধ করিয়াও ত, তাহা হইলে বিবাহের বলেই মুক্তি লাভ হয়। মোক্ষ লাভই ত জীবাত্মার উদ্দেশ্য; বিধি, নিয়ম, কর্ম্ম, ব্রত, হিন্দু শাস্ত্র মতে সকলই ত মোক্ষ লাভের জন্য। যখন বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী, তখন হতভাগিণী বিধবাগণকে এখন সহজ পথ হইতে, এমন "রুই কাতলার রাস্তা" হইতে, ব্রহ্মচর্য্যারূপ এমন দুর্গম পথে (ব্রহ্মচর্য্য ত মোক্ষের অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট কোন পদার্থ দিতে পারে না।) "এমন চুনা গলিতে" পাঠাইতে চান কেন? রহস্য ছাড়িয়া তর্ক করিতে হইলেই তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিবাহ মাত্রই মোক্ষ লাভের সুপ্রশস্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী নহে; বিবাহ বিশেষ মাত্র। এখন বুঝিতে হইবে যে, বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী কেন, এবং তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, কিরূপ বিবাহ, মোক্ষ লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। আমাদিগের শাস্ত্রকার গণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, গার্হস্থ্যাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ।

"চতুর্ণা মাশ্রমানাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।"

গৃহিণী এই গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন; সেই জন্যই বিবাহ মোক্ষ লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী। কিন্তু গৃহী হইলেই অথবা গৃহিণী পাইলেই উদ্দেশ্য লাভ হইল না, তাহার জন্য আরও একটু স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন। মানুষ প্রথমে আপনাকেই ভালবাসে, স্বভাবত স্বার্থপর প্রাণ, প্রথমে নিজের জন্যই ব্যগ্র হয়, পরের জন্য ভাবিবার অবসর পায় না। বিবাহের পর হইতে তখন আর এক জনের জন্য চিন্তা করিতে হয়; ক্রমে একজন হইতে দুইজন, দুইজন হইতে পাঁচজন, ক্রমে মনুষ্য সমাজ, অবশেষে সমস্ত জগতকে ভাল বাসিবার শিক্ষা লাভ হয়। অক্ষয়বাবু নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রথমে আপনার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, তাহার পর পারিবারিক বা সাংসারিক উন্নতি, তাহার পর সামাজিক উন্নতি, সর্ব্ব শেষ ঐশ্বরিক উন্নতি।" "বিশাল হইতে বিশাল তরে, বিশালতর হইতে বিশালতমে পরিণতি অথচ বিলয়, ইহাই জগতের নিয়ম।" তবেই স্বীকার করিতে হইল যে, সামাজিক উন্নতির জন্য, আত্মার সদগতির জন্য, ঐশ্বরিক উন্নতির জন্য, (প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য সাধনের জন্য) "ক্রমের আবশ্যক করে।" এই কলুষময় সংসারে, পাপ প্রলোভনময় জগতে, দুর্ব্বল নর-নারীর পক্ষে পদ্ধতি ব্যতিরেকে ব্রহ্মচর্য্য সাধন অসম্ভব। ইহার জন্য সহায় আবশ্যক। পতনোন্মুখ আত্মাকে কেশে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে, এরূপ ব্যক্তির প্রয়োজন। এইবার অক্ষয় বাবুর নিজের কথায় ও নিজের যুক্তি বলেই, আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। যখন সুশিক্ষিত, সৎসংসর্গ-প্রাপ্ত, সংসার-পরিচিত ব্যক্তির জন্য, ব্রহ্মচর্য্য সাধনে সহায় আবশ্যক; গৃহী হইবার জন্য বিবাহের প্রয়োজন; তখন অশিক্ষিতা, সংসার-জ্ঞান-শূন্যা, বিধবার পক্ষে যে বিবাহ একান্তই প্রয়োজনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারিবেন? যখন ব্রহ্মচর্য্যের জন্য আমাদিগের পক্ষেই এত ক্রমের প্রয়োজন, তখন নিঃসহায়া বিধবাকে কেমন করিয়া বলিব যে, হতভাগিনি, তোমাকে শিখিতে দিব না, পথ দেখাইয়া দিব না, কিন্তু তুমি সেই বাক্য—

মনের অগোচর, যাঁহাকে শুক সনাতন ভাবিয়া পান নাই, সেই দেবতাকে হৃদয়ে লইয়া তৃপ্ত থাক? বিধবা হইল বলিয়াই কি তাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, এবং গ্রাহিণী শক্তি বিস্তৃত হইল? তাহাত নয়। বিবাহ কুমারীর পক্ষেও যেমন শিক্ষার জন্য, বিধবার জন্যও ত তাই। যদি কুমারী বিশ্বপ্রেম শিখিবার জন্য, জগৎকে ভাল বাসিবার জন্য বিবাহ করেন, তবে বিধবার বিবাহে সেই উদ্দেশ্য নাই কেন? "বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী" স্বীকার করিয়াও, জানি না অক্ষয় বাবু তবে কোন্ যুক্তি অনুসারে বলিলেন, "স্বামীর পরলোক গতির পর যে রমণী বিবাহ করেন, তিনি আপনার জন্যই বিব্রত, তাও আবার কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসুক। সুতরাং তাহার কার্য্য কাম্য মধ্যে ঘোরতর কাম্য।"

৫। "উচ্চতর সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করা একরূপ অসম্ভবের সম্ভবনা করা। হিন্দুর আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস দেখিলে তাহা বুঝা যায়। ত্রিশ বৎসরের আইন খানির দুর্দ্দশা দেখাইয়া একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে বলিলেও চলে।"

বোধ হয় বিধবা-বিবাহ-আইনের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া অক্ষয় বাবু প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা নাই। থাকিলে আইন খানির এত অপ্রচলন হইবে কেন? যদি আবশ্যকতা থাকিত, তাহা হইলে, আইন থাকা সত্বেও, হিন্দু বিধবা এইরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেন না; অবশ্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিবাহার্থিনী হইতে পারিতেন। আইনের অপ্রচলন দেখিয়া অগত্যাই স্থির করিতে হইবে যে, হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহে অভিলাষ নাই। কিন্তু অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, সমাজ সংস্কারের আবশ্যকতা কি প্রচলিত বিধি বিশেষের প্রচলন বা অপ্রচলনের উপর নির্ভর করে? সংস্কারক ও গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন যে সংস্কার আবশ্যক, সেই মর্ম্মে একটী আইন প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু সমাজ প্রয়োজন সত্বেও, আইন পাইয়াও, নানা কারণে তদনুসারে কার্য্য করিতে সাহসী হইল না; তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, সমাজে সে আইনের প্রয়োজন নাই? আইনের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিবার সময় অক্ষয় বাবুর ভাবা উচিত ছিল যে, আইন করিয়াছিল কে? গবর্ণমেণ্টেরত আর বলপূর্ব্বক তাহা প্রচলিত করিবার অধিকার নাই; আমি চুরি করিলে গবর্ণমেণ্ট আমাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু যদি আমার প্রতিবাসী অন্নাভাবে মরিয়া যায়, আর আমি তাহা দেখিয়াও তাহাকে একটী পয়সা সাহায্য না করি, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কি আমাকে বাধ্য করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করাইতে পারেন? বিধি হইল যে, বিধবার বিবাহ অন্যান্য বিবাহের ন্যায় আইন-সঙ্গত, পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবার পুত্র পিতৃ-ধনে অধিকারী হইবেন; কিন্তু বিধবাকে বিবাহ করিতেই হইবে, গবর্ণমেণ্ট ত আর একথা বলিতে পারেন না; তবে আইনের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া লাভ কি? হয়ত অনেকে এস্থলে বলিতে পারেন যে, লোকে যদি আইন গ্রহণ করিতেই না পারিল, তবে সে আইনের প্রয়োজন কি? আমরা বলি, প্রয়োজন আছে। আইন যদি ন্যায়সঙ্গতই হয়, তবে তাহা সহস্র বৎসর অনাদরে, অযত্নে ও

অবজ্ঞার সহিত রক্ষিত হইলেও ক্ষতি নাই। মনে করুন, লর্ড সলস্‌বরি নিয়ম করিলেন, ঊনবিংশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক যে কোন ব্রিটীশ প্রজাই সিভিল সারভিষ পরীক্ষা দিতে পারিবেন। নানা কারণে ভারতবাসী কয়েক বৎসর এই পরীক্ষা দিতে পারিল না; তখন যদি সলস্‌বরি বলেন যে, ভারতবর্ষীয়-দিগের মধ্যে সিভিলসারভিষের প্রচলনের চেষ্টা করা একরূপ অসম্ভবের সম্ভবনা করা, হিন্দুর আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস দেখিলেই তাহা বুঝা যায়, ত্রিশ বৎসরের আইন খানির দুর্দ্দশা দেখাইয়া একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে বলিলেও চলে; তখন তাহা কেমন শুনায়? "যখন এই কয় বৎসরের মধ্যে ভারতবাসী সিবিল সারবিষ পরীক্ষা দিতে পারে নাই, তখন তাহাদিগের এ আইনের প্রয়োজন নাই," একথা শুনিলে আমরা কি মনে করি? যিনি হৃদয় এবং চিন্তাশীল, তিনি ভাবিবেন, ভারতবাসী পরীক্ষা দেয় নাই কেন; পরীক্ষা দিবার জন্য তাহাকে কত বাধা, কত বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়, সে কথা তাঁহার মনে পড়িবে। অক্ষয় বাবু ত একজন সমাজ-তত্বজ্ঞ; তিনি কি জানেন না যে, বিবাহার্থিনী বিধবাকে হিন্দুসমাজে কত ক্লেশ, ও কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়? তবে বিধবা কেমন করিয়া আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? এরূপ অবস্থায় বিধবা বিবাহ আইনের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া হিন্দু-বিধবা বিবাহ-প্রার্থিনী নয়, একথা বলা অক্ষয় বাবুর কর্ত্তব্য হয় নাই। এসম্বন্ধে আমাদিগের আরও একটু বক্তব্য আছে, অক্ষয় বাবু বলিতে চাহিয়াছেন যে, বিধবাগণ বিবাহ প্রার্থিনী নন, কিন্তু সে বিষয়ে কি কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে? যদি পিতা মাতা আপন আপন বিবাহ-যোগ্য কুমার অথবা কুমারীর ন্যায়, বিধবা দুহিতারও বিবাহের জন্য ব্যগ্র হইতেন, কুমারীর বিবাহ যেমন আবশ্যক, বিধবার পক্ষেও তেমনি আবশ্যক, একথা ভাবিয়া দেখিতেন, এবং সে সময় যদি বিধবা বলিত যে, আমার বিবাহের প্রয়োজন নাই, তাহা হইলেই আমরা বুঝিতাম যে, অক্ষয় বাবুর কথা প্রকৃত। কিন্তু সেই রূপ না করিয়া, কৌশলে, নির্যাতনে, বা প্রলোভনে, তাহাকে নিস্তব্ধ রাখিয়া, শেষ যদি বলেন "যে, বিধবা বিবাহার্থিনী নয়, তাহার প্রমাণ বিধবা বিবাহ আইনের দুর্দ্দশা" তবে সে যুক্তিকে আমরা কোন মতেই যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যদি পুনর্ব্বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য, এই উভয়ই বিধবার জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকিত, তাহা হইলে বিধবার পক্ষেও অত্যাচার হইত না, এবং লোকেও বুঝিতে পারিত যে, বিধবা বিবাহের আইনের প্রয়োজন আছে কি না; এবং এরূপ অবস্থায় যে বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন, সংসার ছাড়িয়া স্বর্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, আমরা বুঝিতাম যে তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী। কিন্তু তাহা হইলে, হয় ত জগৎ, সাবিত্রী লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে, বিধবা বিবাহ "নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আছেও বটে, থাকিবেও বটে" এ নূতন কথা শুনিতে পাইত না।"

৬। "হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না, হিন্দু মানেন অনুপাত-বাদ। ক খ যখন সমান নহে, তখন তাহারা সমান পাইবেও না, ক যেমন তেমনই ক পাইবে, খ যেমন তেমনই খ পাইবে।"

স্পষ্ট কথায় ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী-পুরুষ যখন সমান নহে, তখন তাহাদিগের অধিকারও সমান হইতে পারে না। স্ত্রী নিকৃষ্ট, সুতরাং জগতের দুঃখ, ক্লেশ, দাসত্ব, সকলই তাহার জন্য; পুরুষ উৎকৃষ্ট, সুতরাং সংসারের সুখ, সম্পদ, প্রভুত্ব, সকল বিষয়েই তাহার অধিকার। আরও স্পষ্ট কথায় ইহার অর্থ এই যে, পত্নীর মৃত্যু হইলে, পুরুষ পুনর্ব্বিবাহের অধিকারী; কিন্তু রমণী রমণী বলিয়াই সে অধিকারে বঞ্চিতা। এযুক্তি খণ্ডন করিব কি, শুনিয়াই আমরা বিস্মিত হইয়াছি। একজন শিক্ষিত লোক যে, শত শত লোকের মধ্যে, প্রকাশ্য ভাবে এরূপ যুক্তি সমর্থন করিতে সাহসী হইতে পারেন, ইহাতেই আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। অক্ষয় বাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন যে, "এমন ঘোরতর শয়তানি মত, ধর্ম্মের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা আর হয় না ;" আমরা তাঁহারই ভাষায় বলি, এমন শয়তানি মত, হিন্দু চরিত্রের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা আর কেহ করিতে পারে না।

স্ত্রী পুরুষের অধিকার সমান নহে, অক্ষয় বাবু একথা কোথায় শিখিলেন? পাশ্চাত্য শিক্ষার কথা নহে, "শরীরার্দ্ধ হরা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলেসমা" "যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেন দুহিতা সমা"—এ সকল বচন কি তাঁহার মনে পড়িল না? কিন্তু যাঁহারা সত্যকে আপলাপ করিতে চান, যুক্তির দিকে তাঁহারা চাহিবেন কেন?

সাম্যবাদ শব্দের অর্থই ন্যায়বাদ এবং অক্ষয় বাবুর অনুপাতবাদ শব্দের অর্থ, অত্যাচার-বাদ বা অন্যায়-বাদ। হিন্দু অনুপাত-বাদী অর্থাৎ অত্যাচার-প্রিয়, একথা অক্ষয় বাবু, এতদিন প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই; কিন্তু তিনি বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া, পরম হিন্দুত্বের পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কথায় হিন্দু-সমাজ যে দুঃখিত হইবেন না, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ রূপই বিশ্বাস আছে। এক্ষণে আমরা অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, স্ত্রী জাতি যে পুরুষের সঙ্গে সমান নয়, একথার যুক্তি কি? শারীরিক দুর্ব্বলতাই যদি ইহার কারণ হয়, তবে আর ইংরাজের নিকট সমান অধিকারের জন্য চিৎকার করেন কেন? মানসিক অথবা বুদ্ধিগত অপকর্ষতার কথাই যদি বলেন, তাহা হইলেও ত ইংরাজ আমাদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ট। বুঝিতে পারি না যে, যাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় "মানুষ মানুষের সমান" বলিয়া, চিৎকার করিতে চান, সমাজ-সংস্কারের দিন তাঁহারা কোন্ প্রাণে বলিতে চাহেন যে, আমি আমার পত্নীর অপেক্ষা শ্রেষ্ট, আমার পুত্র কন্যার অধিকার, সমান নহে। সভা-মণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিয়া আসিলাম, "ইংরাজ, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষা, চরিত্র, ধর্ম্মভাব, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তোমার এমন অধিকার নাই যে, তুমি আমাকে আমার প্রকৃতি-প্রদত্ত আজন্ম-প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পার।" কিন্তু গৃহে গিয়া পত্নীকে বলিলাম, চরিত্রে, স্নেহে, সহিষ্ণুতায়, পরদুঃখ-কাতরতায় তুমি আমার শিক্ষাদাত্রী হইলেও, তুমি দুর্ব্বল বলিয়া, আমার উপর নির্ভর করিয়া আছ বলিয়া, আমি ভিন্ন তোমার আর গতি নাই বলিয়া, তোমাকে তোমার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিব। হিন্দু অনুপাত-

বাদী, এবং এই যদি অনুপাত-বাদের অর্থ হয়, তবে আমরা আবার বলি, এমন শয়তানি মত, হিন্দু চরিত্রের এমন বিকৃত ব্যাখ্যা, অক্ষয় বাবু ভিন্ন আর কেহ প্রচার করিতে সাহস করে না।

অক্ষয় বাবু বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে এবং অপ্রসঙ্গ ক্রমে ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি যে সকল কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, আমরা তাহার আলোচনা করি নাই; করাও আবশ্যক বলিয়া বোধ করি না। তিনি বিবাহেচ্ছু বিধবাগণকে প্রকারান্তরে কুলটা ও ব্যভিচারিণী বলিয়াছেন; বিজাতীয় বিবাহকে "নেড়া নেড়ীর কাণ্ড" নাম দিয়াছেন, বিধবা বিবাহ যে সমাজে প্রচলিত তাহা অতি নিকৃষ্ট ও নীচ সমাজ, তাহাও বলিয়াছেন। ইহার কোন কথায় আমরা বিস্মিত হই নাই। শাস্ত্রের নাম দিয়া তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পুনর্ব্বিবাহ বিধবার পক্ষে অধর্ম্ম,এবং একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই তাহার অবলম্বনীয়। আইনের কথা উল্লেখ করিয়া, "হিন্দু বিধবা বিবাহার্থিনী নহে" এ মিথ্যাও তিনি প্রকারান্তরে প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের হৃদয়-শূন্যতার সমর্থন করিতে গিয়া, তিনি হিন্দু অনুপাতবাদী, এই অন্যায় দোষারোপ করিতেও ক্রটী করেন নাই। এ সকলের কিছুতেই আমরা বিস্মিত হই নাই। কিন্তু তিনি যে হিন্দু বিধবার অবস্থা বর্ণন করিতে যাইয়া, প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া, কতকগুলি অলীক বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথায়, বিধবা হিন্দু সংসারে দেবীর ন্যায় পূজনীয়া এবং আপনার অবস্থায় আপনি পরিতুষ্টা, একথা প্রচার করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের পরিতাপের বিষয়। যদি তিনি বিধবার প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিয়া, বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের দুঃখিত হইবার কারণ থাকিত না। কিন্তু তিনি তাঁহার দর্শকগণের নিকট যে আলেখ্য ধরিয়াছেন, তাহা জীবনে বড় দুর্লভ। তিনি তাঁহার আদর্শ চিত্র যে বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা ত জগতে কোথায়ও মিলে না। সে পবিত্র ব্রহ্মচারিণী দেবী, হিন্দু সংসারে কোথায়? যিনি হিন্দুসংসারের আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত নহেন, তিনি অক্ষয় বাবুর চিত্র দেখিলে হয়ত মনে করিবেন যে, যে সমাজের গৃহে গৃহে এমন স্নেহময়ী দেবী বিরাজিতা, তাহাতে দুঃখ তাপ আসিতে পারে না। তিনি ভাবিবেন যে, যে সমাজ এই দেবীর পূজা করিতে জানে, তাহাতে পাপ আসিতে পারে না। কিন্তু বড় দুঃখের কথা এই যে, এ চিত্র কেবলই চিত্র মাত্র; জগতে ইহার জীবন্ত প্রতিকৃতি দেখিতে পাই না। অক্ষয় বাবুর বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল যে, তিনি উপন্যাস লিখিতেছেন না। সামাজিক অবস্থা, কল্পনা বিকাশের স্থান নহে। তিনি ত বিধবাকে সর্ব্বজন-পূজ্যা দেবী বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুসমাজে যে তাহাকে কত নির্যাতন, কত লাঞ্ছনা, কত অপমান,সহ্য করিতে হয়,তাহারত একবারও উল্লেখ করেন নাই। সত্য প্রতিপাদনই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য, তবে তিনি এক দিক দেখাইয়াই পরিতুষ্ট আছেন কেন? তিনি কি জানেন না যে, বিধবা হিন্দুসমাজে কতই নিগৃহীতা ও কতই লাঞ্ছিতা হইয়া দিনপাত

করে ? বিবাহ বল, আনন্দ উৎসব বল, দেবসেবার মাঙ্গলিক কার্য্যই বল, সমাজ যে তাহাকে কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না, একথা তিনি বিস্মৃত হইলেন কেন ? সংসারের এক জন হইয়াও যে সে কেহ নয়, রাজরাণী হইয়াও যে সে পথের ভিখারিণী, সকল বিষয়েই যে তাহাকে অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, একথা তিনি গোপন করিলেন কেন ? অহোরাত্র তাহাকে যে কত মলিন, কত সঙ্কুচিত হইয়া অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাত ভুলিবার কথা নয়। তাহার রক্ষক তাহার অলঙ্কার গুলি হরণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন, দেবর তাহাকে বিষয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন, ভ্রাতৃজায়া তাহাকে আপনার পুত্র কন্যার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিবার জন্য অভিলাষ করেন এবং প্রতিবেশীগণ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, সতীত্ব রত্ন অপহরণ করিবার জন্য উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করেন। অক্ষয় বাবু কি এ সকল কথা জানিতেন না, না ইচ্ছা পূর্ব্বকই গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন ? তিনি কি জানেন না যে, তাঁহার এবং আমার আত্মীয়গণের মধ্যে, কত হতভাগিনী ইন্দ্রিয়-সংযমে অসমর্থা হইয়া, পাপ স্রোতে পৃথিবীকে কলঙ্কিতা করিতেছে ?* কত অভাগিনী আত্মীয় স্বজনের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য, অকালপ্রসবযন্ত্রনায়, অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া, হিন্দুসমাজকে ঘোরতর পাপ পঙ্কে নিমগ্ন করিতেছে। নিদাঘের একাদশী রাত্রির শেষে যখন বিধবা বালিকা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করে—"মা আজ কি রাত পোয়াবেনা" তখন সেই শুষ্ক কণ্ঠের ধ্বনি কি তিনি শুনিতে পান না ? যখন সংসারের কোন আনন্দদিনে, মাতা, ভগ্নী, ও ভ্রাতৃজায়াকে অলঙ্কারে সুসজ্জিতা দেখিয়া, সঙ্গিনীগণকে স্বামী-সুখে উৎফুল্ল দেখিয়া অভাগিনী বিধবা নির্জ্জন গৃহে আসিয়া, উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলে—"জগদীশ, কি দোষে আমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলে" তখন তাহার সেই অশ্রুপূর্ণ মুখ, নীরব ক্রন্দন, তিনি কি দেখিতে পান না ? গর্ভস্থ শিশু যখন মাতৃগর্ভে বিনষ্ট হইয়া, মৃত্যুকণ্ঠে হিন্দুসমাজকে অভিসম্পাত করিয়া বলে, "এই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তবে আমাকে এ জগতে আনিয়াছিলে কেন!" তখন সেই ক্ষুদ্র শিশুর অস্ফুট রোদন, যন্ত্রণাজড়িত কণ্ঠস্বর, তিনি কি শুনিতে পান না ? কিন্তু যাহারা দৃক্ শক্তি থাকিতেও অন্ধ, শ্রুতি শক্তি থাকিতেও বধীর, তাহাদিগের নিকট এ সকল কথা বলিবার প্রয়োজন কি ?

বড় ক্ষোভ রহিল যে, আমাদিগকে কেবলই বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধ যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াই নিরস্ত হইতে হইল। বিধবা বিবাহের অনুকূলে কোন কথা বলি-

* বর্ত্তমান সময়ে যে হিন্দু-বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে, তাহা এই জন্য যে, সমাজে কেবল বালিকা বিবাহই প্রচলিত রহিয়াছে। বালিকা-বিবাহ উঠিয়া গেলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকা সঙ্গত হইবে কি না, সে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। নবজীবন সম্পাদক বা শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, বালিকা বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, সে বিষয়ে আজও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই। (নবজীবন—জ্যৈষ্ঠ, ৭০৯ পৃষ্ঠা)। এরূপ স্থলে, যে আধ্যাত্মিক বিবাহ সমাজে প্রচলিত নাই, তাহার ধুয়া ধরিয়া, কল্পনাময় ভাষার বৃথা আড়ম্বর করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের চেষ্টাতে কি কিছু মহত্ত্ব আছে ?

নঃ সঃ।

বারই আমরা অবসর পাইলাম না ; যদি সময় দেখি, তবে একবার প্রস্তাবান্তরে সে কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিব। কিন্তু বিধবার জন্য আর কি কোন কথা বলিবার বাকী আছে? সেই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার কথা কি আর লোককে বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে? এই হিন্দুসমাজে এমন সৌভাগ্যবান পুরুষ কে আছেন, যাঁহার আত্মীয়াগণের মধ্যে কেহ বাল-বিধবা নাই? এই হিন্দুসমাজে এমন হৃদয়বান পুরুষ কে আছেন, যাঁহাকে কোন না কোন দিন, সেই রুক্ষ-কেশা, মলিন-বেশা, বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া, নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতে না হইয়াছে? কোন্ গৃহ বিধবার দীর্ঘ নিশ্বাসে দগ্ধ না হইতেছে? কোন্ গৃহ বিধবার অশ্রুজলে কলঙ্কিত না হইতেছে? তবে আবার বিধবার জন্য কাঁদিতে যাইব কোথায়? কাঁদিবার স্থান জগতে কেবল একটী মাত্র আছে। নিষ্ঠুর সমাজ এ দুঃখ কোন কালে বুঝিতে পারিবে না, সামাজিকগণ এ দুঃখ বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না ; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ দেবতা, তুমিত সকলই জানিতেছ, তুমিত সকলই বুঝিতেছ, তবে হিন্দু বিধবার, এ যন্ত্রণা কি ঘুচিবে না?

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

মহারাষ্ট্রে মহাকীর্ত্তি।

আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে আপনার অধিকার বিস্তারে উদ্যত হইয়াছেন। মহাবীর শিবজী অপূর্ব্ব বীরত্ব বলে সম্রাটের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার সাহস বাড়িয়া উঠিয়াছে—উচ্চতর অধ্যবসায়, মহত্তর সাধনা বিকাশ পাইয়াছে। তিনি অতুল সাহসে, অসামান্য বিক্রমে, অলৌকিক অধ্যবসায়গুণে স্বর্গাদপি-গরীয়সী পুণ্যভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গপ্রবাহ ভৈরব রবে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী দক্ষিণাপথে অটল গিরিবরের ন্যায় দাঁড়াইয়া, লোকাতীত তেজস্বিতার সহিত সেই তরঙ্গপ্রবাহের গতিরোধ করিতেছেন। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত এইরূপ বীরত্ব-কীর্ত্তিতে উজ্জ্বল হইয়াছিল। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে স্বাধীনতার স্বর্গীয় মূর্ত্তি এইরূপ ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্তে প্রকাশ পাইয়া লোকের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। ঘোর দুর্দ্দিনে মেঘমালার একদেশ হইতে সূর্য্যের অনতিস্ফুট আলোক নিঃসৃত হইয়া অন্ধকারময় স্থান এইরূপ উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আওরঙ্গজেব শিবজীর পরাক্রম খর্ব্ব করিতে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মাজেম ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শিবজীর সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ মোগলের হস্তগত হইয়াছে। মোগল পক্ষের অনেক রাজপুত সৈন্য সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতেছে। আজ শিবজী এই দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত—মোগলের সমক্ষে আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প। বীরশ্রেষ্ঠ আজ এই উদ্দেশে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন—

নীরবে গম্ভীর ভাবে বিপক্ষের ক্ষমতা নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

সিংহগড় নিসর্গরাজ্যের গভীর সৌন্দর্য্যময় স্থানে অবস্থিত। ইহা উন্নত পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এক দিকে সহ্যাদ্রি অনন্ত গগনে মাথা তুলিয়া আপনার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সহ্যাদ্রির পূর্ব্ব প্রান্তে সিংহগড়। উত্তরে ও দক্ষিণে সমুন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বত অতিশয় দুরারোহ। অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া সঙ্কীর্ণ দুর্গম গিরিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। পশ্চিম দিকেও এই রূপ দুর্গম, দুরারোহ পর্ব্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। দুর্গটী ত্রিকোণাকার। উহার মধ্য ভাগের পরিধি প্রায় দুই মাইল। ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর দুর্গের বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে। যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, অনভ্র নীল গগনে সূর্য্যালোক প্রকাশ পায়, তখন পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীরা নদীর বৃক্ষ লতা পরিশোভিত শ্যামল তটীদেশ নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে থাকে। উত্তর দিকে পর্ব্বতের বহিঃপ্রদেশ প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র। শিবজীর বাল্যকালের লীলাভূমি পুনানগরী এই ক্ষেত্রের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত ও অবনত শৈলমালা সুনীল বারিধির তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই অভ্রভেদী গিরির শিখরগুলি সুদূর দিগন্তে—অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। এই দিকে শিবজীর রায়গড় অবস্থিত। শিবজীর সেনাপতি তন্নজী এই দুর্গম দুরারোহ গিরি-দুর্গ অধিকার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাঘমাস। দুর্গম গিরিপ্রদেশে দুরন্ত শীত আপনার দ্বিগুণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সাহসী তন্নজী এই শীতের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে একহাজার মাওয়ালী সৈন্য লইয়া সিংহগড় অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। গিরিপথগুলি এই সকল সৈন্যের পরিচিত ছিল। ইহারা গভীর নৈশ অন্ধকারে নির্ভয়ে নিঃশব্দে এই পরিচিত গিরিপথ দিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তন্নজী আপনার সৈন্য দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একভাগ কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের উপর আদেশ ছিল যে, ইহারা আদেশ প্রাপ্তি মাত্র অগ্রসর হইবে। অপর ভাগ দুর্গের ঠিক নিম্নে পর্ব্বতের পাদদেশে লুকায়িত রহিল। ইহাদের মধ্যে একজন সাহসী বীরপুরুষ নিঃশব্দে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বিশেষ সত্বরতার সহিত একগাছি দড়ির মই ফেলিয়া দিল। শিবজীর মাওয়ালী সৈন্যগণ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এই সোপান মাত্র অবলম্বন করিয়া একে একে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে তিন শত সৈন্য উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটী শব্দ হইল। এই শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা, যে দিক দিয়া মাওয়ালী সৈন্য উপরে উঠিতেছে, সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। একজন সৈনিক, ঘটনা কি, জানিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইয়াছে, অমনি এক জন মাওয়ালীর নিক্ষিপ্ত তীরে তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। কিন্তু এই শব্দে দুর্গরক্ষীরা অগ্রসর হইতে লাগিল। তন্নজী তখন বিপুল সাহসে তিনশত মাত্র সৈন্য লইয়া সেই বহুসংখ্য দুর্গরক্ষীকে আক্রমণ করিলেন। মাওয়ালীগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গরক্ষী সৈন্য-

দিগের উপর অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তন্নজী প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় সেই যুদ্ধস্থলে বীর শয্যায় শায়িত হইলেন। তখন মাওয়ালী সৈন্যগণ রণক্ষেত্র হইতে নীচে নামিবার জন্য দৌড়িতে লাগিল। এমন সময়ে তন্নজীর ভ্রাতা সূর্য্যজী যুদ্ধ স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে মাওয়ালীদিগকে বহিলেন—"কোন্ নরাধম আপনার পিতার দেহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে? দড়ির মই নষ্ট হইয়াছে। সকলে যে, শিবজীর মাওয়ালী সৈন্য, এখন তাহারই প্রমাণ দেওয়া উচিত।"

সূর্য্যজীর এই তেজস্বীতাময় বাক্য মাওয়ালীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা আবার "হর হর মহাদেব" শব্দে শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইল। এই গম্ভীর শব্দে গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া পর্ব্বতকন্দরে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। এবার মাওয়ালীগণ এরূপ বেগে দুর্গ রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা কিছুতেই এই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। পাঁচ শত দুর্গরক্ষী সাহসী সৈনিক-পুরুষ মাওয়ালীদিগের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। সূর্য্যজী বিজয়ী হইলেন। দুরারোহ পর্ব্বত শিখরস্থিত সিংহগড়ে আবার শিবজীর বিজয় পতাকা সুদূর গগনে প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

এই বিজয়-বার্ত্তা শিবজীর নিকট পঁহুছিল। কিন্তু শিবজী যখন শুনিলেন যে, দুর্গ অধিকার করিতে তন্নজী নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি গভীর শোকে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন—"সিংহের আবাস-গৃহ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ হত হইল। আমরা দুর্গ হস্তগত করিলাম, কিন্তু হায়! তন্নজীকে জন্মের মত হারাইতে হইল।"

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও দার্শনিক প্রমাণ।

(প্রত্যুত্তর)

"নব্যভারতের" বিগত সংখ্যায় বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের লিখিত উক্ত শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মের দার্শনিক আলোচনা প্রত্যেক চিন্তাশীল এবং ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির নিকট আহ্লাদের বিষয় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাতে মানসিক জড়তা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উদাসীনতা দূর হয়, সুতরাং মন নির্ম্মল জ্ঞানালোক লাভের জন্য প্রস্তুত হয়। বিজয় বাবুর প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ দুঃখের বিষয়ও আছে, সন্দেহ নাই; দুঃখের বিষয় এই যে, দর্শনালোচনা দ্বারা সম্প্রতি তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে, "বিশ্বাস স্থাপনকারীদিগের আলোক অতি ক্ষীণ, অতি ক্ষুদ্র, আবার স্পেনসার প্রভৃতি কর্ত্তৃক উৎপন্ন অন্ধকার অতি নিবিড় এবং অসীম।" যাহা হউক, আশা করি তাঁহার এইভাব স্থায়ী হইবে না। ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় আর একটু গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলে এই সংস্কার চলিয়া যাইবে। আমরা বিজয় বাবুকে একটী পরামর্শ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না;

তাঁহার লেখার ধরণে বোধ হইল, তিনি একটী বিশেষ শ্রেণীর দার্শনিকদিগের সহিতই সুপরিচিত; ইহাদিগকে মোটামোটি প্রত্যক্ষবাদী বা অজ্ঞেয়তাবাদী বলা যায়; আমাদের পরামর্শ এই যে, তিনি স্পেন্সার ও বেন্ প্রমুখ এই দলের নিকট কিছুদিনের জন্য বিদায় লইয়া বার্কলি, ফেরিয়ার, ফ্রেজার, গ্রীন, কেয়ার্ড ও মারটিনো প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী দার্শনিকদিগের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হউন; এবং ক্রমে অপেক্ষাকৃত অগভীর ইংলণ্ডীয় দর্শনের ভূমি ছাড়িয়া গভীরতর জার্ম্যান্ দর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করুন্।

যাহা হউক, এই সকল কথা আনুষঙ্গিক মাত্র, ইহাতে বিজয় বাবুর প্রদর্শিত যুক্তি সমূহের কিছুই উত্তর দেওয়া হইল না। কিন্তু রীতিমত তাঁহার উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আরো দুই একটী আনুষঙ্গিক কথা বলিব। বিজয় বাবু তাঁদের প্রবন্ধের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মসমাজেও দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইতেছি; এক শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া, আত্মজীবনে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্ম-অভিজ্ঞতা তর্কহীন ভাষায় সকলকে শুনাইতেছেন; অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা যুক্তি ও তর্ক বলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীভুক্ত; ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা-প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ও Roots of Faith-প্রণেতা বাবু সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।" বিজয় বাবুর এই শ্রেণী-বিভাগটী আমাদের ভাল লাগিল না। প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা কেবল "তর্কহীন-ভাষায় আত্ম-অভিজ্ঞতা সকলকে শুনাইতেছেন," এবং অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা "সর্ব্বদা যুক্তি তর্কবলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট," এই কথা যে ঠিক নহে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। "যুক্তি ও তর্ক বলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করাতে" যাহা বুঝায়, তাহা বাবু কেশবচন্দ্র সেন জীবনের শেষ ২১ বৎসর ভিন্ন কখনই ছাড়েন নাই। প্রাচীন আদিসমাজের সময় হইতে নববিধানের শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত একটী না একটী ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার্থী যুবকদল সর্ব্বদাই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের সহিত সংসৃষ্ট থাকিত; ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় তাঁহার উৎসাহ সর্ব্বদা অব্যাহত ছিল। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্বন্ধেও এই কথা নেক দূর সত্য। কতিপয় বৎসর এই প্রবন্ধ-লেখক তাঁহারই শিক্ষাধীন একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আলবার্ট হলে কেশব বাবুর ইদানিন্তন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের যে সকল অধিবেশন হইত, তাহাতেও প্রতাপবাবু মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিতেন। এখন তিনি এই সম্বন্ধে কার্য্যত নীরব থাকিলেও, এই বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ কিছুই কমেই নাই। কিছু দিন হইল তাঁহার নিকট হইতে যে একখানা স্নেহলিপি পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে এ স্থলে ২।১টী কথা উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় পাঠকদিগের নিকট তাহা অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রীতিকর বোধ হইবে না। তিনি বলিতেছেনঃ—"My sympathy with the aspirations of pure free theistic thought continues unabated. Where I have foiled to persuade the youth of the Brahmo Somaj to find sure foundations of their trust in the eternal verities of a devout philo-

sophy, may you succeed, and others like you." অপর দিকে দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মেরা যে কেবল "যুক্তি ও তর্কবলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট" নহেন, তাঁহারাও যে "তর্কহীন ভাষায় আত্মঅভিজ্ঞতা সকলকে শুনাইতেছেন," তাহাও বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে কেবল একজন ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-বিষয়ক-বক্তা ও লেখক নহেন, তিনি যে একজন অতি উন্নত ভক্ত প্রচারক, তাঁহার আত্মঅভিজ্ঞতা দ্বারা যে দিন দিন কত লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহা ব্রাহ্মমাত্রই অবগত আছেন। Roots of Faith-প্রণেতার আত্মঅভিজ্ঞতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, সন্দেহ নাই, তবে যখন বিজয় বাবু সজোরে তাঁহাকে আনিয়া উক্ত শ্রদ্ধেয় মহাত্মাদিগের মধ্যে ফেলিয়াছেন, তখন বোধ হয় বলাতে কোন ক্ষতি নাই যে, তাহার প্রণীত Gleams of the New Light এবং "সাধন-বিন্দু" নামক পুস্তিকাদ্বয় ধর্ম্মপিপাসুদিগের নিকট যাহা কিছু আদর লাভ করিয়াছে, তাহা ঐ "তর্কহীন আত্মঅভিজ্ঞতার" জন্যই, "যুক্তি তর্কের" জন্য নহে। বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসঙ্গ করিতে হইল, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

অতঃপর মূল বিষয়ের আলোচনা করা যাক। বিজয় বাবুর মীমাংসাটী একটু আশ্চর্য্যজনক। তাঁহার মীমাংসা এই যে, দার্শনিক বিচারে ঈশ্বর নির্ণয় অসম্ভব, অথচ ঈশ্বর আছেন। "দার্শনিক বিচার" কথটার অর্থ সম্বন্ধে বিজয় বাবুর কিছু ভ্রম আছে। জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর যে আছেন, ইহা বিজয় বাবু কেন বিশ্বাস করেন? এই সম্বন্ধে তিনি তাঁহার প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে কিছুই বলেন নাই। ২১১ স্থলে বলিয়াছেন—"নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয়ের যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হয় না" ইত্যাদি। এক স্থলে ফরাশী পণ্ডিত জুবার্টের কথায় বলিয়াছেন—"It is not hard to know God provided one will not force oneself to define him.* Do not bring into the domain of reasoning that which belongs to our innermost feelings. "Innermost feelings" কথাটাতে কিছুই বুঝা গেল না; feeling এর দ্বারা বাহিরের অস্তিত্ব জানা যায় না, আপন আপন ভিতরকার অবস্থা মাত্র জানা যায়। জ্ঞানই একমাত্র অস্তিত্বের প্রমাণ। তবে "নিত্যপ্রত্যক্ষ" কথাটা কিছু বুঝায় বটে। বিজয়বাবু কি ঈশ্বরকে নিত্যপ্রত্যক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করেন? নিত্যপ্রত্যক্ষ কি অর্থে? এক নিত্যপ্রত্যক্ষ বাহেন্দ্রিয়ের বিষয়, দ্বিতীয় নিত্যপ্রত্যক্ষ মানসিক অবস্থা নিচয়; "নিত্যপ্রত্যক্ষের" আর একটী কেবল অর্থ থাকে—"আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞান সিদ্ধ"। ঈশ্বর বাহেন্দ্রিয় বা অন্তর্দৃষ্টির (self-consciousness) বিষয় নহেন, সুতরাং তিনি প্রথম দুই অর্থে নিত্যপ্রত্যক্ষ হইতে পারেন না; তবেই তাঁহাকে নিত্য-প্রত্যক্ষ বলিয়া মানিতে গেলে, বলিতে হইবে, তিনি আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ। এখন, ঈশ্বর বিশ্বাস যদি আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ সত্যই হইল, তবে আর ইহা দার্শনিক বিচারের অতীত হইল

* যাহাকে কোন না কোন প্রকারে Define (বর্ণনা বা সংজ্ঞা করা যায় না, তাঁহাকে ঈশ্বর বলেন কেন? ঈশ্বর কথাটী Definition বাচক। আদ্যাশক্তি, আদিকারণ, যাহাই বল, প্রতি কথাই Definition বুঝাইবে। যাহাকে Define করা যায় না, তাহার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না।

কি রূপে? আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য কিছু আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহাদের লক্ষণ কি, তাহাদের সংখ্যা কত, তাহাদের বিষয় কি কি, এই সকল বিষয়ের বিচার দর্শন শাস্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বর বিশ্বাস যদি আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য হয়, তবে তাহা দার্শনিক বিচারের অতীত নহে। কতকগুলি লোকের সংস্কার (ইহারা দর্শনের বিষয় কিছুই জানেন না) যে, দর্শন কেবল যুক্তিতর্ক বলেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট। বিজয় বাবু অবশ্য এই শ্রেণীর লোক নহেন; আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ বা "নিত্যপ্রত্যক্ষ" সত্য ভিন্ন যে যুক্তিতর্ক দাঁড়াইতে পারে না, এবং দর্শনের মূল সূত্র সমূহ যে "নিত্যপ্রত্যক্ষ, তাহা বিজয়বাবুকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। বিজয় বাবু কি বলিতে চান যে,দর্শনে যাহাকে "আত্মপ্রত্যয়" (intuition)বলা হয়,ঈশ্বর-বিশ্বাস তাহারও অতীত? তবে পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি— ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কেন? যুক্তিতর্কের ভূমি ছাড়াইয়া, আত্মপ্রত্যয় সহজজ্ঞানের ভূমি ছাড়াইয়া, আর বিশ্বাসের ভূমি কোথায়? এই সমুদায়ের অতীত যে বিশ্বাস, তাহাকে কুসংস্কার বা কল্পনা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? দর্শনের "বালির ভিত্তি" ভাঙ্গিয়া বিজয়বাবু কি আমাদিগকে সার সত্যপূর্ণ কল্পনার রাজ্যে লইয়া যাইতে চাহেন? তবে আর সত্যলাভ বা সত্য নির্ণয়ের জন্য জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন কি? যাহার কল্পনাতে যাহা আসে,বিশ্বাস করিলেই হয়। কেহ যদি এই কল্পনারাজ্যে বিশ্বাস লাভ করিয়া থাকেন, করুন; আমার মন বড়ই সন্দেহ-প্রবণ; এরূপ সস্তা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি বড়ই দরিদ্র।

এখন বিজয় বাবুর মীমাংসার দ্বিতীয় বিভাগে আসা যাক্। আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানাকে 'নব্য ভারতের' পাঠকগণের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়াতে, আমি বিজয়-বাবুর নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ আছি। ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত স্থান ইহা নহে, নতুবা এই বিষয়ে আরো বিশেষ রূপে বলিতাম। কিন্তু বিজয় বাবুর প্রবন্ধটী পড়িয়া বোধ হইল, তিনি গ্রন্থ খানা তাদৃশ মনযোগের সহিত পড়েন নাই। তাহা করিলে, তাঁহার অনেক আপত্তির উত্তর গ্রন্থ মধ্যেই পাইতেন। এখন আমাকে সেই সমুদায়ের পুনরুক্তি করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া যে কিছু বলিতে পারিব বা বুঝাইতে পারিব, তাহার আশা নাই, কেননা তাহা অনেক স্থান-সাপেক্ষ। বিজয় বাবু আমার প্রধান যুক্তির সমালোচনা করিয়াছেন,অথচ যুক্তিটী আমার ভাষায় কিম্বা আমার ভাবে কোন স্থানেই উল্লেখ করেন নাই। পাঠক পুস্তক খানা পাঠ না করিলে আমার যুক্তির বল বা দুর্ব্বলতা এবং সমালোচনার যুক্তি-যুক্ততা বা যুক্তিহীনতা কিছুই ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন না। যাহা হউক,সংক্ষেপে যত দূর পারি তাঁহার আপত্তি গুলির উত্তর দিতেছি।

প্রথমত, বিজয় বাবু যে বলিয়াছেন, "এই মায়াবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বাবু সীতানাথ দত্ত Roots of Faith নামক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে ঈশ্বর প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন," এই কথাটী সম্পূর্ণরূপ ঠিক নহে। মায়াবাদের উপর না দাঁড়া-ইলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন সমূহের চূড়ান্ত বিচার হয় না, ধর্ম্মবিশ্বাস সুদৃঢ় অটল ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত হইতে পারে না, ইহ

উক্ত পুস্তকে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনা পুস্তকের অতি অল্প স্থান মাত্র অধিকার করিয়াছে। যাঁহারা মায়াবাদ মানেন না,বা বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের বোধগম্য এবং মায়াবাদ-নিরপেক্ষ কারণবাদের যুক্তি এবং অজ্ঞেয়তাবাদের সমালোচনাতেই পুস্তকের অধিকাংশ পরিপূর্ণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহ যে প্রকৃত অর্থে বাহ্যবস্তু নহে, আত্মা-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নহে, উহারা যে মানসিক ভাব পরম্পরা মাত্র, এই মতের ব্যাখ্যাতে পুস্তকের কিয়দংশ অধিকৃত, কিন্তু এই মত যে মায়াবাদ নহে, ইহা যে আধুনিক মায়াবাদ ও প্রকৃতিবাদের সাধারণ ভূমি, তাহা বিজয় বাবু অবশ্যই জানেন। অথচ দর্শনানভিজ্ঞ লোকেরা ইহাকেই মায়াবাদ বলে। প্রকৃত মায়াবাদ হচ্ছে এই যে, বাহ্যজগৎ নামের এই যে ভাবনিচয়, ইহাদের কোন অচেতন আধার বা কারণ নাই। এই মায়াবাদ Roots of Faith এর মত, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু, যাহা বলা হইল,—পুস্তকের অধিকাংশই মায়াবাদ-নিরপেক্ষ যুক্তিতে পরিপূর্ণ।

অতঃপর বিজয় বাবুর প্রথম আপত্তিতে আসা যাক্। বিজয়বাবু বলিতেছেন—"আমরা দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রভৃতি গুণ* সমষ্টিকে জগৎ বলিয়া অনায়াসে ভাবিতে পারি, এবং স্বীকার করি যে আধার কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু জগতাধার নাই,একথা বলাও কি অসঙ্গত নয়? আধার স্বীকার এবং অস্বীকার উভয়ই কি অতর্কিত কথা নয়? আমাদের মনে হয় যে এস্থলে অজ্ঞেয়তাবাদই সর্ব্বথা প্রশস্ত।" এই কথার উত্তর Roots of Faith এর তৃতীয় প্রবন্ধের শেষভাগে (পৃ ১২-১৩) কতকটা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা হয়ত বিজয় বাবুর আপত্তির পক্ষে যথেষ্ট নহে। বিজয় বাবুর কথার উত্তর এই;—ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় সমূহ যখন ভাবনিচয় মাত্র, ইন্দ্রিয়-বোধ-পরম্পরা মাত্র, তখন তাহাদের জন্য কিরূপ আধারের প্রয়োজন? ভাবের আধার, বোধের আধার কেবল মনই হইতে পারে। জড়রূপী আধার-কল্পনার কেবল যে প্রয়োজন নাই, তাহা নহে, "মানসিক ব্যাপারের জড়রূপী আধার" এই কথাটা নিতান্তই অসঙ্গত। "গোলাকার ত্রিকোণ," "চতুষ্কোণবৃত্ত," 'সোণার পাথরের বাটি" এই সমুদয় যেমন আত্ম বিরোধী (self-contradictory)ভাব, এবং এরূপ বস্তুর অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, "মানসিক ভাবের জড় আধার" এটাও তেমনি অসঙ্গত, (self contradictory) এবং অসম্ভব। সুতরাং এসম্বন্ধে অজ্ঞেয়তাবাদ আদবেই তিষ্ঠিতে পারে না। জড়াধার মানিবার প্রয়োজন নাই, কেবল তাহা নহে, জড়াধারের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে বিজয় বাবু আর একটা অতি কাচা কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। "In regard to the object properties all minds are affected alike: in regard to the subject properties, there is no constant agreement." বেন্ সাহেবের এই কথাটা উদ্ধৃত করিয়া বিজয়বাবু বলিয়াছেন,—"তাহা যদি হইল, তবে তো পদার্থের নিজত্ব কিছু থাকিবার সম্ভাবনা

* 'গুণ' কথাটা এরূপ স্থলে আপত্তিকর; 'বিষয়' 'ভাব' বা 'ইন্দ্রিয়বোধ' বলা উচিত। 'গুণ বলিলে' ইন্দ্রিয়াতীত, ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ 'শক্তি' বুঝাইতে পারে।

আছে।” কি আশ্চর্য্য! ভিন্ন ভিন্ন মনে কতকগুলি ইন্দ্রিয়বোধ একই নিয়মে, একই ভাবে আবির্ভূত হয়, ইহাতে পদার্থের নিজত্ব কি প্রকাশ পাইল? ইহাতে কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয়তা এবং নিয়ন্তার অটল ইচ্ছাই প্রকাশ পাইল; ইন্দ্রিয়বোধের ইন্দ্রিয়বোধত্ব, ভাবের ভাবত্ব, বিষয়ের বিষয়ী সাপেক্ষতা কিছুই দূর হইল না। “মানসিক ভাবের জড়াধার” এই অসঙ্গত বিষয়ও সঙ্গত বলিয়া সপ্রমাণ হইল না।

অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জড়াধার-রূপী এই যে অসঙ্গত বিষয়, ইহাকে বিজয়-বাবু, সমুদয় সত্যের আধার স্বরূপ যে আত্মা, তাহার সহিত এক পদবীতে রাখিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঐ যে জ্ঞানের অতীত, কল্পনার অতীত, নিষ্প্র-য়োজন, অসম্ভব সোণার-পাথরের বাটিটী, উহা না থাকিলে মন বলিয়াও কোন স্থায়ী বস্তু নাই, অথবা আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার যুক্তি এই :--“স্মৃতি, আশা, বুদ্ধি সকলই ঘটনা (phenomena*) মাত্র। তবে তর্ক উঠিতে পারে যে, সকল অস্থায়ী ঘটনার মধ্যে যে এক স্থির আমি জ্ঞান আছে, ঐ আমি-জ্ঞান কি? তাহা বুঝাইতেছি; আমি-ভাব (ego-phenomenon) জ্ঞানের বা consciousness এর অবস্থান্তর মাত্র। Secretion কথা ব্যব-হার করিলে সহজে এভাব বুঝাইয়া দেওয়া যায়।” এই কি আমি জ্ঞানের যথার্থ বর্ণনা হইল? আমি-জ্ঞান জ্ঞানের কোন ‘অব-স্থান্তর” নহে, ইহা সমুদয় জ্ঞানের, সমুদায় মানসিক ক্রিয়ার, সমুদায় ভাবের অবশ্যম্ভাবী আধার, (the very condition and possibility of knowledge and all other states of consciousness.) ইহা না থাকিলে কোন জ্ঞান, কোন মানসিক ক্রিয়াই হইতে পারে না। জ্ঞান বা (consciousness এর প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়-বোধ, ভাব, বা ঘটনা (phenomenon) মাত্রই একভাবে দেখিতে গেলে দ্বিত্বভাব-ব্যঞ্জক। “দর্শন” বলিলেই আমার দর্শন বুঝায়, “শ্রবণ” বলিলেই আমার শ্রবণ বুঝায়, স্পর্শ বলিলেই আমার স্পর্শ বুঝায়। আমি-ছাড়া দর্শন, আমি-ছাড়া শ্রবণ, আমি-ছাড়া স্পর্শ ইত্যাদি অর্থহীন, অসম্ভব, কল্পনারও অতীত। এই সমস্ত ঘটনাবলীই পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু এই সমুদায়ের অবশ্যম্ভাবী আধাররূপী আমি জ্ঞান অটল, স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয়। আমার ক্ষুদ্র “আমির” ধ্বংশ ভাবিতে পারি, কিন্তু একটী অনন্ত “আমি” না ভাবিলে, কোন বস্তুর কল্পনাই সম্ভবপর নহে। সুতরাং “আমার মনের অস্থায়ীভাব ও আমি একই” এই কথার ন্যায় সার কথা আর কি হইতে পারে? বিজয়বাবু পুনশ্চ বলিতেছেন,—“ঘটনা সমূহ পরে পরে সংঘটিত হইতেছে, প্রত্যক্ষ কথা; এই সংযোগের ফলে জ্ঞান আসিল, স্মৃতি আসিল, আশা আসিল, ইহাও প্রত্যক্ষ কথা; তবে আর অতিরিক্ত একটা আধার লইয়া টানা-টানির প্রয়োজন কোথায়?” তাইতো! বিজয় বাবুর আদর্শ বেন্ প্রভৃতি স্থূলদর্শী দার্শনিকদিগের দৃষ্টি এই পর্য্যন্তই বটে। বলি, এই যে ‘পরে পরে সংঘটিত হইতেছে’

* দৃষ্টান্ত ঠিক উপযোগী হয় নাই; এই সমস্ত ঘটনা নহে, ইহারা স্থায়িত্বব্যঞ্জক; যাহা হউক ইহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না।

কথাটা বলা হইল; এটা কোথা হইতে আসিল? একজন স্থায়ী জ্ঞাতার সম্বন্ধেই কেবল 'পরে পরে' কথাটা সম্ভব; একজন স্থায়ী জ্ঞাতা না থাকিলে কাহার সম্বন্ধেই বা পূর্ব্বে হইবে, কাহার সম্বন্ধেইবা 'পরে' হইবে? 'পূর্ব্বাপরের' কোন অর্থই থাকে না। স্থায়ী আত্ম-জ্ঞানেই কেবল কাল এবং কালবোধ সম্ভব। বিজয় বাবু বলিতেছেন,—'সেই সংযোগের ফলে জ্ঞান আসিল'' ইত্যাদি? সংযোগের ফলে জ্ঞান আসিল? সংযোগ হইল কিসে? সংযোগের অর্থ বহুত্বের একত্ব (Synthesis of the manifold); জ্ঞান (বা জ্ঞাতা) ব্যতীত এই বহুত্বের একত্ব আর কিছুতেই সাধন করিতে পারে না। এটা ওটা নয়, ওটা সেটা নয়, অথচ সকলেই পরস্পর সম্বন্ধ, এই বোধের নামই বহুত্বের একত্ব বা সংযোগ। এই সংযোগ সংঘটনকারী কেবল জ্ঞান বা জ্ঞাতাই হইতে পারে। যে জানে যে আমি এই ঘটনা বা বস্তু নই, ওই ঘটনা বা বস্তু নই, সেই ঘটনা বা বস্তু নই, অথচ আমি প্রত্যেকের সহিতই সম্বন্ধ, কেবল তাহারই পক্ষে, তাহারই আশ্রয়ে, সংযোগ সম্ভব।* সংযোগের জন্য যদি তবে জ্ঞানের প্রয়োজন, তবে আর "সংযোগের ফলে জ্ঞান আসিল'' কিরূপে বলিব? স্মৃতি এবং আশা সম্বন্ধেও তাহাই ঠিক। কেবল প্রবহমান ঘটনাবলীর সংযোগে কথনই স্মৃতি ও আশা উৎপন্ন হইতে পারে না। একটী স্থায়ী জ্ঞান বা জ্ঞাতার সম্বন্ধ ছাড়া স্মৃতি ও আশা অসম্ভব, অর্থহীন। ভূত এবং বর্ত্তমানের সংযোগের নাম স্মৃতি;" ভূত এবং বর্ত্তমানের সংযোগ" বলিলেই তাহাদের মধ্যে এমন কিছু বুঝায়, যাহা ভূত এবং বর্ত্তমান উভয়েতেই বিদ্যমান। যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সে আবার আপনি কিরূপে বর্ত্তমান ঘটনার সহিত সংযুক্ত হইবে? ভূত এবং বর্ত্তমানের সংযোগ কেবল সেই করিতে পারে, যে ভূত এবং বর্ত্তমান উভয়েতেই বিদ্যমান, ভূতের বিনাশেও যে বিনষ্ট হয় না। কল্য কতকগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, অদ্য আর কতকগুলি প্রত্যক্ষ করিলাম; স্মৃতি বলিতেছে, উভয় ঘটনারই জ্ঞাতা আমি; "আমি" অর্থ যদি কেবল ভাব পরম্পরাই হয়, তবে স্মৃতি নিতান্তই মিথ্যাবাদিনী, প্রলাপবাদিনী। কল্যকার ভাব পরম্পরা বা কল্যকার 'আমি' তো বহুক্ষণ পূর্ব্বেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; সেইভাব পরম্পরা বা সেই—"আমি" যাহার এখন কোন অস্তিত্ব নাই, সে আবার অদ্যকার ভাব পরম্পরাকে আমার

*"It is essential to the comparison and to the character which the sensations acquire from the comparison, essential too, to their forming an observable event or succession, that one should not be fused with the other, that the distinct being of each should be maintained On the other hand, in the relation to which their distinctness is thus necessary they are, at the same time, united. But if it were not for the action of something which is not either of them or both together, there would be no alternative between their separateness and their fusion. One might give place to the other, or both together might be combined into a third; but a unity in which their distinctness is preserved could not be constituted without the relating action of an intelligence which does not blend with either."—Green's *Prolegomena to Ethics*. P. 32.

বলিয়া দাবি করিতেছে—কি অসঙ্গত ও অর্থহীন কথা! আশার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। প্রবহমান বিনাশশীল ভাব পরম্পরা, আত্মার কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত, ভূত এবং বর্ত্তমান সংযুক্ত করিতে যেমন অসমর্থ, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সংযুক্ত করিতেও তেমনি অসমর্থ। পাঠকগণ বোধহয় বিজয়বাবুর যুক্তির সারবত্তা এখন বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। "ঘটনাসমূহ পরে পরে সংঘটিত হইতেছে" ইহাই কেবল 'প্রত্যক্ষ কথা' নহে; স্থির, অটল, অপরিবর্ত্তনীয় 'আমি' বর্ত্তমান আছি, আমারই সম্বন্ধে, আমার সমক্ষে, ঘটনাসমূহ সংঘটিত হইতেছে, আমারই আশ্রয়ে সংযুক্ত হইতেছে, ইহাও তেমনি 'প্রত্যক্ষকথা'; ইহা কেবল অন্ধ বিশ্বাসের বিষয় নহে, 'টানাটানির' কথা নহে, উজ্জ্বল আত্মপ্রত্যয়, প্রখর অখণ্ডনীয় যুক্তির বিষয়।

বিষয় কেবল স্থায়ী বিষয়ীর আশ্রয়েই— আত্মার ভাবরূপেই, থাকিতে পারে, এই মত, এবং আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস যে বাহ্যজগৎ মানবাত্মার জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া, মানবাত্মার অনাশ্রিত হইয়া, বর্ত্তমান আছে, এই দুই মতের উপর পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের Ontological Argument নামক ব্রহ্মপ্রতিপাদক যুক্তি সংস্থাপিত। এই যুক্তির বিষয় বিজয় বাবু তাঁহার প্রবন্ধে কিছুই বলেন নাই। Roots of Faith এর তৃতীয় প্রবন্ধে পাঠক এই যুক্তির ব্যাখ্যা দেখিতে পাইবেন। এস্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছেঃ—

"We believe the world to have a permanent existence quite independent of our perception of it. This is the popular belief, and true Philosophy, as we apprehend it, has nothing to say against it. But what can this permanent existence of phenomena mean, and what does it imply?......Phenomena or appearances can exist, as we have showed, only as appearing to a person; things visible, tangible, perceivable in short, can exist only as perceived by,--as objects of perception to some percipeint being or other, the contrary supposition involving a manifest contradiction. If so, it is clear what is implied in the existence of phenomena independently of ourperception. If the phenomenal world exists, as we believe it does, independently of its perception by finite beings, it exists as the permanent object of an all-knowing intelligence. Matter, phenomenal matter—exists, and can exist only for and in relation to mind. The world,—the phenomenal world......exists and can exist permanently only for and in relation to God. It is he, who is the eternal substance, support and ultimate Reality of all." (P 11.)

"Roots of Faith" এবং 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়' ব্যাখ্যাত কারণবাদের যুক্তির উপর বিজয় বাবুর প্রথম আপত্তি এইঃ— 'আমি ইচ্ছা করিয়া উৎপন্ন করিতেছি না, অথচ কিরূপে ভাবের উৎপত্তি হইতেছে' এই অন্ধকারকে আলোকিত করিতে গিয়া 'কেহ করিতেছে' এইটী মানিয়া দেওয়া হইল; ইহাতে অন্ধকার কমিল না বাড়িল?" Roots of Faith এ এই আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে, বিজয়বাবু লিখিবার সময় তাহা ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। "কেহ করিতেছে" ইটী মিছামিছি কেবল মানিয়া লওয়া হয় নাই; ঘটনামাত্রেই কোন কর্ত্তৃত্বশালী কারণ (efficient cause) বা অন্য কথায় 'শক্তি' দ্বারা সংঘটিত হয়, ইটী কেবল মানিয়া লওয়া হয় নাই, ইটী যে একটী স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, ইটীতে যে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের অভ্রান্ত লক্ষণ (বিপরী-

তের আত্ম-বিরোধিতা—Contradictoriness of the opposite) প্রত্যক্ষভাবে বর্ত্তমান আছে, ইহা অস্বীকার করিলে যে জগৎ একেবারে অন্ধকার হইয়া যায়, তাহা Roots of Faith এ সবিস্তারে দেখান হইয়াছে, একটী স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"It is not simply because we have never seen (perceived) changes to occur except through the action of an agent that we believe there must be an agent behind every action, but there is a higher ground on which the belief rests. It is not merely subjectively necessary, but objectively necessary, —necessary from the nature of things themselves, the contrary proposition actually involving a contradiction... *Phenomena, by their very nature, are dependent, passive, inert, inactive. To say therefore that they can change, can act, of themselves* (can appear disappear or be transformed)—*is to say that inactive things can act—a manifest contradiction.* Wherever therefore, there is change, there must necessarily be an agent behind it as its cause." (p. 18–19.) পাঠক দেখিতেছেন, কর্ত্তা বা শক্তির অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হয় নাই, অপরিহার্য্য সত্য বলিয়া দেখান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিজয় বাবু আর একটী কথা বলিয়াছেনঃ— "যদি কে করিল, কে করিল বলিয়া চিৎকার করা দার্শনিক যুক্তি, তবে কর্ত্তাকে কে করিল বলিয়া চিৎকার করা তো অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইতেছে।" বিজয় বাবু কারণবাদের যুক্তি আদতেই বুঝেন নাই, বুঝিলে এরূপ আপত্তি তুলিতেন না। আর Roots of Faith এর "Cause—physical and spiritual" শীর্ষক প্রবন্ধ চতুষ্টয় বোধ হয় একেবারেই পড়েন নাই, যদি পড়িতেন, তবে তাহাতে এই আপত্তির যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, অন্তত তার উল্লেখও করিতেন। উক্ত প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে দেখান হইয়াছে যে, আমাদের জ্ঞান কেবল ঘটনা বা phenomena রই কারণ চায়, পরিবর্ত্তনশীল কারণেরই আবার কারণ চায়, যাহা স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয়, তাহার কারণ চায় না, কারণবাদ সে স্থলে খাটেই না। একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"Now, what class of things requires a cause, an explanation? Let us see. Our causal inquiry takes the form of a question something like this—how or by whom or what, or under what circumstances did this *come about*, or such and such a thing *come to be* so and so? From this it is evident that it is only the changeful, the ephemeral, the transient that require a cause; it is only things or facts that *come to be*, that begun to exist, which require to be explained. The unchangeable, the eternal, the permanent, if there be such things in Nature, or in relation to Nature, are absolved from such a necessity; they need no cause, no explanation. The causal principle is then not that every *thing* must have a cause but that every *change* must have a cause?" (p. 21-22.) অতঃপর, যেমন এক দিকে কেবল পরিবর্ত্তনশীল অস্থায়ী ঘটনা বা বস্তুরই কারণের প্রয়োজন, তেমনি, অপর দিকে,—কারণ, শেষ এবং আদিকারণ কেবল তাহাই হইতে পারে যাহা স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয়, অন্যকারণ-নিরপেক্ষ। "Nothing is a true cause, nothing is truly a cause that requires another cause that does not entirely satisfy and silence us. An explanation that requires to be explained is an explanation only by courtesy or conversation. সুতরাং কারণবাদের মূল সূত্র একবার মানিতে গেলে একটী স্থায়ী,

নিত্য, অন্যকারণ-নিরপেক্ষ আদি কারণে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই আদিকারণ একজন অনন্ত আত্মা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। প্রকৃত কারণত্ব, কর্তৃত্ব, শক্তি কেবল জ্ঞান বস্তুতেই থাকিতে পারে, ইহা বুঝাইবার জন্য Roots of Faith এবং "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসায়" অনেক বলা হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। মানুষের ক্ষুদ্র আত্মা যে আদিকারণ হইতে পারে না, তাহাও সুস্পষ্ট; ইহা কারণত্বশালী হইয়াও অনিত্য, সৃষ্ট, অন্য কারণসাপেক্ষ; আরো,

"Our finite spirit, since they are finite, afford no explanation of Nature. The world of change and action extends far beyond our small spheres of activity; there is, therefore, an all knowing, all-powerful spirit within whose knowledge every thing in Nature is comprehended and to whom all change and action in Nature is due. (P. 37.)......When such a first cause is reached, our causal inquiring finds its fullest satisfaction and is silenced; for an eternal all-knowing all-powerful, benevolent Mind contains in it the promise and potency of all things, present, past and future. and consequently explains everything that has been, is and will be, while in itself it needs no explanation whatever." (P. 40.) সুতরাং "কর্ত্তাকে কে করিল বলিয়া চিৎকার করা অধিকতর দার্শনিক যুক্তি" হওয়া দূরে থাকুক্, এই চিৎকারের কোন অর্থই নাই; 'কর্ত্তার' অর্থ, 'আত্মার' অর্থ, "পরমাত্মার" অর্থ যিনি বুঝেন, তিনি এরূপ চিৎকার করেন না।

বিজয় বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি এই—"কার্য্যের সহিত ইচ্ছার যে সর্ব্বত্রই যোগ আছে, কে বলিল? 'আমাতে' এমন অনেক কার্য্য ত সংঘটিত হইতেছে, যে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার সহিত কোন যোগ নাই। অনিচ্ছায় শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, অনিচ্ছায় রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে, অনিচ্ছায় পরিপাক ক্রিয়া সাধিত হইতেছে" ইত্যাদি। আশ্চর্য্য! এই কথা কি আমি, বা 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রণেতা কখনো অস্বীকার করিয়াছেন? অস্বীকার করা দূরে থাক্, আমাতে আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (involuntary) এই সকল কার্য্য দেখিয়াই তো স্থির করিতেছি যে, এই সমুদায়ের কারণ আর একটী ইচ্ছা আছে,—আর একটী আত্মা আছে, যাঁহার আশ্রয়ে, যাঁহারই করতলে আমি রহিয়াছি। আমাতে যাহা কিছু আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে হইতেছে, তাহাই সেই আশ্রয়রূপী আত্মার কার্য্য। আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ঘটনার সহিত আমার ইচ্ছার যোগ নাই বিজয় বাবু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন, কিন্তু অন্য একটী অদৃশ্য ইচ্ছার সহিত যে সে সমুদায়ের যোগ নাই তাহা তাঁহাকে কে বলিল? যদি বলেন সে ইচ্ছার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? প্রমাণ আত্মপ্রত্যয়। ইচ্ছা ব্যতিরেকে, ইচ্ছা বিশিষ্ট মন ব্যতিরেকে, কর্তৃত্বশালী কারণ বা শক্তি ব্যতিরেকে কোন কার্য্য হইতে পারে না, ইহা যে একটী অপরিহার্য্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তাহা দেখাইবার জন্য Roots of Faith এ অনেক বলা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে ও কিঞ্চিদগ্রে কিছু বলা হইয়াছে, আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। বিজয় বাবু যাহাকে 'বালির ভিত্তি' বলিয়াছেন, সেই 'বালির ভিত্তির' উপর যে কেবল ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা নহে, তাহার উপর আমরা প্রত্যেকেই নিজ-আত্মা ব্যতীত অন্য আত্মার

অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস স্থাপন করি; (See Roots of Faith Pp. 19—20) এই 'বালির ভিত্তির' উপর দাঁড়াইয়াই বিজয় বাবু তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বিশ্বাস করিতেছেন যে, তিনি ছাড়া আরো শত শত লোক আছে, যাহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবে।

বিজয় বাবুর আরএকটী কথার সংক্ষেপে উত্তর দিই। 'অহেতুকি (without motive) ইচ্ছা' মনুষ্য কিম্বা ঈশ্বর কোন জীবে আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরবাদের কিছুই আসে যায় না; 'নির্ব্বিকার' অর্থ যদি এরূপ অসম্ভব ইচ্ছা-বিশিষ্ট হয়, তবে ঈশ্বর নির্ব্বিকার নহেন। এবং এরূপ নির্ব্বিকার ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর নহেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছা অহেতুকি নহে; তাঁহার ইচ্ছার হেতু আছে, কিন্তু সেই হেতু তাহা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে; তাঁহার ইচ্ছার হেতু অনন্তপ্রেম, এই অনন্ত-প্রেম তাঁহার প্রকৃতির অঙ্গীভূত; ঈশ্বর অনন্তপ্রেমময় বলিয়াই ইচ্ছাময় এবং কার্য্যশীল, কোন বাহ্যিক কারণের প্রভাবে কার্য্যশীল নহেন। অতঃপর বিজয় বাবুকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক Roots of Faith এ 'Will' কথাটা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে:—

"The mind as active, as capable of producing changes is called the will. Let the reader understand and stick to this definition of will. Let him not confound will, as philosophically understood with mere desire, mere intention or volition. The will is not an action or a change but a power that produces action and change. It is the mind considered as acting and capable of acting, just as Intelligence is the mind as knowing" (P. 14.

সুতরাং will এর কর্ত্তা বা কর্ত্তৃত্ব। দুর্ব্বলা-বস্থায় কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যম জ্ঞান (sense of effort) থাকিতে পারে, এবং 'এক সময়' (সবলাবস্থায়) এই উদ্যম তিরোহিত হইবে, তাহাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ইহা সপ্রমাণ হইল কৈ যে তখন 'শক্তিজ্ঞান একেবারে থাকিবে না?' এ ইচ্ছা করিতেছি এবং কার্য্য হইতেছে; কিন্তু তাহাতে উদ্যম নাই, আমাদের এরূপ অভিজ্ঞতা আছে, থাকিতে পারে; কিন্তু 'ইচ্ছা করিতেছি' ইহাতেই কর্ত্তৃত্বজ্ঞান বা শক্তিজ্ঞান রহিয়াছে। সুতরাং উদ্যম তিরোহিত হইলেও শক্তিজ্ঞান তিরোহিত হয় না।

প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িল; বিজয় বাবু আরো কত কথা বলিয়াছেন, যাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু এই প্রবন্ধে আর তাহা হইয়া উঠে না। বিজয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এত কথার অবতরণা না করিলেই কি নয়? "দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বর নির্ণয় কত দূর সম্ভবপর?"—এরূপ গুরুতর প্রশ্ন কি এমন ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মীমাংসা করা যাইতে পারে, না মীমাংসা করিতে চেষ্টা করাই উচিত? যাহা হউক, তিনি আর যাহা যাহা বলিয়াছেন, বিশেষত কৌশ-লের যুক্তি সম্বন্ধে যে সমুদায় আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের উত্তর দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলেও আমি আর পারিলাম না। আশা করি 'ধর্ম্ম-

জিজ্ঞাসা' প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যাঁহার পুস্তকে কৌশলের যুক্তি Roots of Faith অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তিনি এই কার্য্যটী সম্পাদন করিবেন।

শ্রীসীতানাথ দত্ত

সংস্কারকদিগের প্রতি

"দশের লাঠী একের বোঝা"। এই সমাজ সংস্করণের ভার দশজনে ভাগ করিয়া লইলে সহজ হয়। এমন একজন কুম্ভকর্ণ, কি একদল বীরপুরুষ কে আছে, যে একাকী এই বোঝা বহন করিতে পারে? যখনই একের স্কন্ধে এই মহাভার চাপিয়াছে, তখনই হয় বাহকের পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়াছে, না হয় ভাল করিয়া কার্য্যোদ্ধার হয় নাই। একদিন বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সমাজ-সংস্করণের একটী অসাধারণ নৈতির লক্ষণ বলিয়া গণিত হইত; আজ তাহা, অন্ততঃ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে, অতি সাধারণ কার্য্য বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একজন পরাক্রান্ত পুরুষ এই বিধবা বিবাহ বিষয়ের সমস্ত ভার নিজ হস্তে লইয়া লোকের কাছে কত নাকাল হইলেন, এবং এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও অবলম্বিত বিষয়ের তাদৃশ উন্নতি সাধন করিতে পারিলেন না। আজ কিনা জন কতক অব্যবসায়ী সৌখীন ব্রহ্মচর্য্যার পাণ্ডা, হিন্দুয়ানীর হুজুগ তুলিয়া গদাহস্তে পথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলে যে, শৈশবে বৈধব্য ঘটিলে পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া নীতি ও ধর্ম্ম উভয়েরই বিরুদ্ধ। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যদি সমুদায় শিক্ষিত দল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসাতে যোগ দিয়া, আপনাদের সাধ্য অনুসারে এই পুনর্ব্বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিতেন, আজ আর তাহা হইলে এই অবিদ্যার সাগরে তরঙ্গ উঠিত না। কিন্তু তখন তাঁহাকে লোকে একাকী ফেলিয়া রাখিল, এখন সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইতেছে। তেমনি আবার বর্ত্তমান সময়ে যে সকল উচ্চসংস্করণের প্রারম্ভ দেখা যায়, তাহা পরস্পরের যোগ ও সহানুভূতি অভাবে বিলোপ হইবার সম্ভাবনা। যখন ব্রাহ্মসমাজ মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হইলেন, তখন প্রায় দেশীয় সমস্ত শিক্ষিত দল সেই প্রতিবাদে সায় দেন; কিন্তু সময়ে প্রতিবাদীদের উদ্যম কমিয়া গেল, এবং তদ্দর্শনে আজ, দানব-গ্রস্ত শবের ন্যায়, পুনর্জীবিত পৌত্তলিকতা নব্যভারতের প্রতি মুখভঙ্গী করিতেছে। পরস্পরের সহকারীতা ভিন্ন ব্রাহ্মগণ কি এই বিকট বীভৎস রহিত করিতে পারেন? কুসংস্কার শতবার হত হইলেও তাহার পুনরুত্থান আছে, এবং সত্যের ন্যায় মিথ্যার বীজ ভূতলে পড়িলে বর্ষার তৃণ তুল্য চারিদিকে সতেজ হইয়া উঠে; যদি তাহা নিবারণ করিতে হয়, ভূমিকর্ষণ করিয়া সত্যের বীজ বপন কর। একার্য্যের জন্য যত কৃষক আবশ্যক, তাহা কোন্ দলে পাওয়া যায়? সকল দল এক না হইলে আর এব্যাপার সম্পন্ন হইবার নহে। যখন সমুদয় হরিসভার অধিবেশন ও সাম্বৎসরিক কার্য্যেতে ব্রাহ্ম সভার মাছি-মারা-নকল প্রত্যক্ষ করাযায়, যখন দেখা যায় সত্যব্রত হিন্দুযুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম ভক্ষণ করিয়া

আর্য্যধর্ম্ম রক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, যখন উক্ত সমাজের "সমগ্র উন্নতির" পুরাতন পরিচিত মত, বঙ্কিম বাবুর বিপুল মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া ফিল্টার হইয়া, শ্রীনন্দের-নন্দন সাক্ষাৎ ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি কৃষ্ণের পাদপদ্মে অঞ্জলি দেওয়া হইল, তখন সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সমবেত চেষ্টাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিজ সম্পত্তি রক্ষার সময় হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সপ্তসাগর পার হইয়া কর্ণেল অল্‌কট সাহেব, সাইকিক ও মেসমেরিক শক্তিযোগে পুনরায় কার্ত্তিক গণেশ ও লক্ষ্মী সরস্বতীর যোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ করিলেন, ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে নবীন থিয়জবির অঙ্গরাগ আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া কিরূপে আপনাদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ দেখিবেন, ও দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন?

সম্বাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্যের এক ঘোরতর অতি-বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এক দেশানুরাগ ও দেশাচারের নামে গ্লানি অসূয়া, অত্যুক্তি অশ্লীলতা মুষলের ধারে চারিদিক হইতে পড়িতেছে, নিবারণ করে কে? একজনের কি একদলের সাধ্যাতীত। সকলেই বলেন, অমুক কাগজ ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, অমুকের উপর অযথা আক্রমণ করা হইয়াছে, অমুক বিষয়ের আলোচনা বড় অন্যায় ভাবে করা হইতেছে; কিন্তু কাহাকেও প্রতীকারের চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। এ সমস্ত অত্যাচার রহিত করিতে হইলে, ন্যায় সত্যের পক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রকেই বদ্ধ-পরিকর হইতে হয়, সকল দলকেই একদল হইতে হয়। সদ্ভাবের, ন্যায়পরতার, সুরুচির, ধর্ম্মানুরাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, প্রেমের জোরে অপ্রেমকে নিবারণ করিতে হয়। অতএব আমাদের অনুরোধ, কতকগুলি লোক অগ্রসর হইয়া এই মহৎ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থল হউন।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

মিলন।

কোথায় থাকিত দারুণ সংসার,
কি হত জানিনা জীবনের গতি,
কোন্ কেন্দ্র বেড়ি ফিরিত উদ্দাম,
নাহি পাইতাম তোমারে যদি।

২

ভাবিতাম তোরে অমূল্য রতন,
তোমা বিনা হ'ত বিফল জীবন,
তুফানে-তাড়িত তরণি মতন,
আশার বাঁধন ছিঁড়িয়া যেত।

৩

হৃদয়ের বেগ ছিল না তখন,
কে জানে হৃদয় অপূর্ণ এমন,
ভাঙ্গা থাকে মন—হু হু করে প্রাণ,
মনমত মনে না মিলালে মন।

৪

যৌবন গরবে বলেছি তখন,
বৃথা পরিণয় পথের কণ্টক,
স্বধু বিড়ম্বনা কেবল যাতনা,
উদ্দেশ্য সাধনে প্রধান আটক।

৫

সে ভ্রম গিয়াছে—বুঝেছি এখন,
তুমিই আমার প্রধান বন্ধন,
দুখ-দগ্ধ মনে অমিয়া মতন,
দারুণ মরুতে ওসিস্ যেমন।

নদী ধায় বেগে সাগর উদ্দেশে,
মেঘ ছুটে যায় শৈলরাজ পাশে,
মিলন মন্ত্রেতে মোহিত জগত,
পরমাণু পরমাণুতে মিশে।

৭

আকাশ নামিয়া মিলে ধরাসনে,
তাড়িত নামিয়া তাড়িতে মিশে,
যদি পায় মন—মনমত মন
চিনিবে—মিলিবে তাহার সনে।

৮

ঐ দেখ চাঁদ আকাশে থাকিয়া
প্রসারি সহস্র কিরণ কর—
আলিঙ্গে সাগরে সুখে গদগদ,
উঠিছে উথলি অন্তর তার।

৯

তবে—
কেমনে থাকিব তোমায় ছাড়িয়া,
পেয়েছি মনের মতন মন,
দেশ কাল বাধা করিয়া লঙ্ঘন,
মিলাব—মিলিব সহ এখন।

১০

রাসায়ণ-মিলে মিলিব দুজনে,
কখন হবেনা বিশ্লেষ তার,
জীবনের পথ করিয়া চিহ্নিত,
যাইব দুজনে সংসার পার।

১১

অনায়াসে করি কর্ত্তব্য সাধন,
যতনে করিব ব্রত উজ্জাপন,
ভাঙ্গিবে না কভু উদ্যম যতন,
মিলাইলে মনে তোমার মন।

১২

কে বলে রমণী পথের কণ্টক,
উদ্দেশ্য সাধনে প্রধান আটক,
ভ্রান্ত মূঢ়মতি সেজন নিশ্চয়,
জানেনা সেজন রমণী হৃদয়।

১৩

কতই মধুর কতই গভীর,
কত যে আমোদ কোমলতা ভরা,
উৎসাহ মাখান—মধুর মূরতি,
মানব জীবনে পীযূষ খনি।

১৪

এমন অতুল রমণী হৃদয়ে,
হৃদয় আমার দিয়াছি মিলায়ে,
দিবাকরে ধরা বাঁধন যেমন,
কাহার (ও) হবেনা বিপথে গতি?

১৫

ঐ যে তরণী—আমোদে মাতিয়া,
ভাগিরথী বক্ষে ভাসিয়া যায়!
নাচিয়া নাচিয়া তপনে ধরিয়া,
শত ভাগে যেন ভাঙ্গিয়া দেয়।

১৬

উহারি মতন সংসার-সাগরে,
ভাসিতে ভাসিয়া হইব পার,
পরে দেহ ভার, করিয়া অন্তর,
যাইব দুজনে গগনপর।

১৭

দুজনে মিলিব, এক আত্মা হব,
অনন্ত পুণ্যের সুখেতে ভাসিব,
অথবা বিশ্বেতে স্বাধীন হইয়া,
বাষ্পের মতন ব্যাপিয়া রব।

১৮

যুগ্ম তারা হয়ে থাকিব দুজনে,
দেখাব ধরার মানবগণে—
প্রেমের বাঁধন—কঠিন কেমন—
কখনও হয় না বিলোপ তার।

১৯

কভু ধ্রুব তারা সনে দুজনে মিলিয়ে—
ক্ষীণজ্যোতি তার প্রখর ফুটায়ে—

বিপন্ন নাবিকে দেখাইব পথ,
সংসার-সাগরে দিশাহারা যবে ;
ঘুচাব তুফান পবনে থামায়ে,
উদ্দেশ্যে পথে সে চলিয়া যাবে

২০

ধরাতে দেখিলে পাপ আচরণ,
মুদিয়া নয়ন—সাধি দিবাকরে
লইব সিন্ধুর বাষ্প উপহার,
সাজাব তাহাতে ঘন আবরণ
ঢাকিব ধরায়—দেখিব না তায় ;
কাঁদাব জলদে পাপীর তরে।

২১

দেখিলে পুণ্যের তাপিত অন্তর ;
পশিব তখনি হৃদয়ে তার,
দুজনে মিলিয়া, শান্তি সুধা দিয়া,
দিবাকর-কর জলদে ফেলিয়া,
আঁকি ইন্দ্রধনু দেখাব তাহায়,
গৌরব-মাখান স্বরগ দ্বার।

২২

দেখিব যখন জগতের গায়ে
পাপীর তাপেতে প্রলয়ের ছায়া—
অন্তরীক্ষে আসি পুণ্যের প্রবাহ
ছুটাব, ঘুচাব এ পাপের মায়া—
জগত হাসিবে, দুর্দ্দিন ঘুচিবে,
উন্নতির পথে চলিয়া যাবে।

২৩

অথবা জীবন সাগরে মিশিয়ে,
পার্থক্য ঘুচায়ে—সব একহয়ে,
সৃজিয়া জীবেরে পুন আত্মা লয়ে,
আবার জীবন-সাগরে মিলাব।

২৪

পরমেশ পাশে পরমাণু সনে,
মিশিয়া প্রাকৃত শকতি সহ—
সৃজন প্রলয় কৌতুকে খেলিয়া,
শূন্য হতে শূন্যে ভাসিয়া যাব।

২৫

যদি কভু বিধি দুজনে লইয়া,
আবার ধরায় জনম দেন,
দুজনে মিলিয়ে—অন্তর মিশায়ে,
জীবনের ব্রত যতনে সাধিয়া।
আবার যাইব গগনপর।

২৬

তবে এস প্রিয়ে হৃদয় বাঁধিয়ে,
মিলিয়ে দুজনে—স্বকার্য্য সাধনে,
সঁপি এ জীবন ব্রত উদ্যাপনে,
সাধি নিজ কাজ করি প্রাণপণ।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

প্রেম-খনি বা প্রকৃত ধর্ম্ম।

"We are the miracle of miracles,—the great inscrutable mystery of God. We cannot understand it, we know not how to speak of it, but we may feel and know, if we like, that it is verily so."—*Thomas Carlyle.*

সচরাচর সকল বস্তুরই দুটী দিক দেখিতে পাওয়া যায়,—এক বাহির,আর এক ভিতর। ভিতর আর বাহিরে ঘনীভূত যোগ থাকিলেও উভয়ের প্রকৃতি, উভয়ের রূপ ও গুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মনুষ্যের বাহিরের আকৃতি ভিতরের ছায়ায় চিত্রিত হইলেও, ভিতর ও বাহির সম্পূর্ণ পৃথক। বাহিরের অন্তরালে আর এক সূক্ষ্ম রাজ্য সর্ব্বত্র বিরাজিত। তোমাকে প্রথম যখন দেখিলাম, তখন কেবল তোমার রূপ দেখিলাম, আকৃতি দেখিলাম, সৌন্দর্য্য দেখিলাম। ক্রমে দুচারি বৎসর যখন চলিয়া গেল, তখন তোমাকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপ দেখিলাম। যতই তোমাতে ডুবিতে লাগিলাম, ততই যেন ভিতর হইতে তুমি নব নব শোভায় ফুটিতে লাগিলে,—তোমার

কতই শক্তি, কতই গুণ, কতই দয়া, কতই জ্ঞান প্রকাশ পাইল; অথবা তুমি যদি অসৎ লোক হও, তবে সময়ে তোমার কতই নির্দয়তা, অপ্রেম, কুজ্ঞান—কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রকাশ পাইল। কিছু দিন পরে বুঝিলাম, তোমাকে প্রথম যাহা দেখিয়াছিলাম; তুমি প্রকৃত পক্ষে তাহা নহ;—বুঝিলাম, তোমার বাহিরই সর্ব্বস্ব নহে,—ভিতর আছে। এই প্রকারে জীবজগৎ হইতে জড়জগৎ, জড়জগৎ হইতে পুন জীবজগৎ, সর্ব্বত্রই বাহির ও ভিতর এই দুইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল্ল কুসুমের সুগন্ধময়, সৌন্দর্য্যময়, প্রফুল্লতাময় বহিরাবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে যাও, দেখিবে, সেখানে ফুল-পত্রের ন্যায় গন্ধও নাই, সৌন্দর্য্যও নাই, সেখানে বীজকোষে সূক্ষ্ম বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে;—অসারের ভিতরে সার জন্মিতেছে। এক খণ্ড প্রস্তরকে দেখ, তাহার বর্ণ আছে, বিস্তৃতি আছে, পরিধি আছে,—দৈর্ঘ্য আছে,—কত কি আছে। প্রস্তরকে ভেদ কর, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেল, দেখিবে, পূর্ব্বের সকল মিলাইয়া যাইতেছে; ক্রমে আরো চূর্ণ কর, দেখিবে, আরো মিলাইয়া যাইতেছে; শেষে দেখিতে পাইবে, প্রস্তরত্ব যেন আর নাই—সকল মিলাইয়া গিয়াছে, কেবল কি যেন এক অব্যক্ত, অদৃশ্য, অননুভবনীয় শক্তি রহিয়াছে! এই জন্য, আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, পদার্থের দুই রূপ,—সূক্ষ্ম ও স্থূল। নদী-তীরের বালুকণা যে হিমাদ্রির রূপান্তরিত অবস্থা, কেহ কি তাহা বুঝিতে পারে? ক্ষুদ্র বটবীজের পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড বটবৃক্ষকে দেখিয়া উহারই পরিণতি বলিয়া কি কেহ তাহাকে মনে ভাবিতে পারে? শারীরিক বলের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া কে তাহার ভিতরের অলক্ষিত মানসিক বলের অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে চায়? প্রকাণ্ড, গগনভেদী হিমালয়কে ভেদ করিয়া ভিতরে যাও, দেখিবে, সেখানে শক্তি মিলিয়া পরমাণু হইতেছে, পরমাণু মিলিয়া বালুকণা হইতেছে, বালুকণা মিলিয়া মিলিয়া প্রকাণ্ড পর্ব্বত হইতেছে! কত সূক্ষ্ম বস্তু কত বড় হইয়াছে! অথবা বাহিরের রূপ ও ভিতরের শক্তিতে কত প্রভেদ!

ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে প্রবেশ কর, দেখিবে উহারই ভিতরে কত বড় বৃক্ষের অঙ্কুর; আবার বটবৃক্ষের দিকে তাকাও, দেখিবে উহারই ভিতরে কত অনন্ত বীজ পরিপুষ্ট হইতেছে। একটী ক্ষুদ্র বটবীজে কত অনন্ত বৃক্ষের অঙ্কুর রহিয়াছে, একবার দেখ। সসীম বাহির বড় হইয়াও, কত ক্ষুদ্র; আর অসীম ভিতরে কি অনন্তত্বই প্রচারিত হইতেছে! এক হইতে সংখ্যাতীত বস্তু উৎপন্ন হইতেছে। মানুষকে ভাঙ্গ; দেখিবে, সেখানেও কত সূক্ষ্মত্ব কত বহুত্বে পরিণত হইতেছে। এক হইতে কোটী হইতেছে;—একের ভিতরে কোটী কোটী জীবের অঙ্কুর রহিয়াছে। শরীরের বলকে ভিন্ন ভিন্ন কর,—দেখিবে ভিতরের বল ভিন্ন শরীরে বল নাই,—মৃতের শরীর দুর্ব্বল। শরীর সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু ভিতরে যে বল, তাহার পরিমাণ নাই;—সে অনন্তেরই ছায়া। পণ্ডিতেরা যাহাকে স্থূল শরীর বলেন, তাহারই ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনন্ত শরীর লুক্কায়িত। সামান্য সামান্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যখন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের দিকে ক্ষণকাল দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন এই স্থূল অবয়বের ভিতরে যে

অনন্তসূক্ষ্মত্ব বিরাজিত—তাঁহার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিত হই, বিস্ময়ে ডুবিয়া যাই। সূক্ষ্ম যাহা, তাহাই তখন মহান বলিয়া বোধ হয়,—সামান্য যাহা, তাহাই অসামান্য বলিয়া বোধ হয়;—উপেক্ষিত যাহা, তাহাই সার বলিয়া মনে হয়। সূক্ষ্মত্বেই অনন্তত্ব যেন লাগিয়া রহিয়াছে! চক্ষুর সীমা অতিক্রম করিলেই—অনন্ত শক্তির লীলা স্পষ্ট অনুভব হইতে থাকে।

কি ছাই লিখিতেছি? বাহির ও ভিতরের কথা বলিতেছি কেন?—বর্ত্তমান শতাব্দীতে প্রত্যক্ষ বা জড়বাদ বাহির ভিন্ন আর ভিতর মানিতে চায় না;—যাহা দেখা যায়, অনুভব করা যায়, স্পর্শ করা যায়, তাহা ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চায় না। এই পরিদৃশ্যমান শরীরের ভিতরে জড়ভিন্ন আর যে কিছু শক্তি আছে, জড়বাদী তাহা মানেন না, জগতের ভিতরে আর কোন শক্তি আছে, তাঁহারা স্বীকার করেন না,—ইহকালের পরে আর কোন কাল আছে, তাহা মানিতে চাহেন না। বাহিরে যাহা দেখা যায়, ইহাই সর্ব্বস্ব—আর যেন কিছুই নাই। আমিত্ব আর কিছুই নহে, কেবল এই ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট শরীর, এবং মরণেই আমিত্বের শেষ। ধর্ম্ম, কল্পনা বই আর কিছুই নহে। এই কথাই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতেছে। অথবা ধর্ম্ম কেবল শরীরের সুখ। নাচ, গাও, খাও, এই জীবের মূল মন্ত্র। এই প্রকারে বাহির ধরিয়া লোকেরা কেবল বাহিরেরই পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বাহিরকে প্রত্যক্ষ পাইয়া কেবল সীমাবদ্ধ বাহিরেরই সম্মান করিতেছে! বাহিরে আরম্ভ করিয়া কেবল বাহির লইয়াই থাকিতেছে!

এই প্রত্যক্ষবাদ বা স্থূলবাদের প্রবল স্রোত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রত্যক্ষবাদের সংশ্রব দোষে মানবসমাজের ধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে বাহির-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মটা এক প্রকার পোষাকের মত হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের আড়ম্বরে আরম্ভ, বাহিরেই ধর্ম্ম শেষ হইতেছে! বাহির ভিন্ন আর যাহা কিছু আছে, তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি যায় না। বাহির-নিরপেক্ষ সাধন-ভজন, কল্পনা বা স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় হইতেছে। এমনই এক দুর্দ্দশার দিন উপস্থিত হইয়াছে!! প্রাচীন ঋষিগণের স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্মত্বের সেই উজ্জ্বল মত, ক্রমে ক্রমে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। বল্কলময় নারিকেলের কঠিন আবরণ ভেদ না করিলে ভিতরের জলময় দুর্গের কোমল, সুস্বাদু, সারবস্তু বীজ-কোঁপল বা অনন্তের বিন্দু কি কখনও পাওয়া যায়? মানব-শরীরের ভিতরে প্রবেশ না করিলে, দয়া বল, আর ভালবাসা বল, নীতিবল আর পুণ্য বল, সাহস বল আর অধ্যবসায় বল, এ সকলের অস্তিত্ব কি পাওয়া যায়? কিন্তু হায়, বাহিরের কোলাহলে মজিয়া মানুষ ভিতরকে একবারে ভুলিয়া যাইতেছে, নীতিবলের পরিবর্ত্তে পাশববল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে,—দয়া বা প্রেমের বদলে দ্বেষ হিংসাবান নিক্ষিপ্ত হইতেছে,—সারের পরিবর্ত্তে অসারের পূজা জগতে দিন দিন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অসার বলিতেছি?—অসার বই কি! তোমার শরীর আর তোমার ইন্দ্রিয় কদিনের? বীজ ভিন্ন ফল কদিনের?—ফল বা সার ভিন্ন বৃক্ষইবা কদিনের? একবস্তু ভিন্ন রূপ ধরিবে—সকল দ্রব্যই অবিনশ্বর, সে পৃথক কথা। তোমার

ও আমার শরীরের অবশিষ্ট শ্মশানের ভস্ম যদি কেহ দেখে, তবে সে কিছু তোমাকে ও আমাকে দেখিল না। সুপক্ক আম্রফলের পরিবর্ত্তে, আম্রের পরিণতিতে যে মৃত্তিকা হইয়াছে, তাহা খাইলে কিছু আম খাওয়া হইল না। রূপান্তরের কথা ভিন্ন কথা। ভিতরের সার বস্তু বাদ দিলে,—জড় বা চেতন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না,—তুমি থাক না, আমি থাকি না। জীবনী-শক্তি বাদে, মানুষ, কৃমিকীটের আবাসভূমি বই আর কি? জড়ের ভিতরের শক্তিকে বাদ দিলে, জড়ই বা কি, বলিতে পার? কিন্তু এমনই হইয়া উঠিয়াছে,—বাহির-সর্ব্বস্ব জড়ের আদরই সর্ব্বত্র। মানুষের দৃষ্টি এমনই স্থূলদর্শী হইতেছে, ইন্দ্রিয় লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুকেই সে মানিতে চাহে না। মানুষ, মানুষের ভিতরের পরিচয় চাহে না—বাহিরের পরিচয়ে অথবা বাহির দেখিয়াই সন্তুষ্ট। এই জন্যই দিন দিন ধর্ম্মসমাজ-সকলে ভয়ানক সাম্প্রদায়িকতা,—ব্যক্তিত্ব বা জড়ত্ব প্রবেশ করিতেছে। যে ব্যক্তি মানুষকে কেবল পৃথিবীর কোলাহলময় হাটে বাজারে, কেবল বাহিরে বাহিরে দেখিল, নির্জ্জন হৃদয় গৃহে একবারও দেখিল না, সে ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্বের কি পরিচয় পাইবে? চৈতন্যের বিশ্ব-ব্যাপিনী প্রেমকাহিনীর নিগূঢ় তত্ত্ব যে জানে নাই, সে গৌরাঙ্গের বাহ্য রূপ দেখিয়া তাঁহাকে কি চিনিবে? বিনয়-ভূষিত খ্রীষ্টের সাম্যনীতির মূল কোথায়, যে জন তাহা না বুঝিয়াছে, সে ক্রুশে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত মহাযোগীর মহাতত্ত্ব কি জানিবে? ভিতর না দেখার দরুণ মানুষ আর মানুষকে প্রকৃত অবস্থায় চিনিতে পারিতেছে না;—মানুষের বুকের ভিতরে মিলনের যে গভীর স্থান আছে, তাহা ধরিতে পারিতেছে না,—প্রেমের যে অপরূপ খনি আছে, তাহা পাইতেছে না। ব্যক্তিরই সমষ্টি, সমাজ। বিন্দু বিন্দু জল মিলিয়াই মহাসমুদ্র। ব্যক্তি ছাড়িয়া সমাজে যাই, সেখানেও দেখি, এক সমাজ অন্য সমাজের কেবল বাহির দেখিতেছে, এক দল অন্যদলের শরীর ও ইন্দ্রিয়-প্রসূত কেবল দোষ দেখিয়া মরিতেছে। হিন্দুসমাজ, খ্রীষ্টসমাজের কেবল বাহির দেখিয়া নিন্দা করিতেছে; মুসলমানসমাজ, হিন্দুসমাজের বাহির দেখিয়া ঘৃণা করিতেছে। হিন্দুতে আর খ্রীষ্টানে, মুসলমানে আর বৌদ্ধে কত বিবাদ বিসম্বাদ, কত কাটাকাটি চলিতেছে! ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে কত রক্তপাত হইতেছে! অথচ খুব চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই যে বিবাদ বিসম্বাদ সোনার পৃথিবীকে ছারখার করিতেছে, ইহার মূল কারণ অতি সামান্য,—যেন কিছুই নহে বলিয়া মনে হয়;—সে সকল অধিকাংশ স্থলেই নশ্বর শরীরের স্বার্থ লইয়া। সামান্য খুঁটিনাটী লইয়া যেমন শিশুরা মারামারি করে, প্রবীণ লোকেরাও সেই প্রকার সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া কাটাকাটি করিতেছে। সামান্য একটু স্থানে অনৈক্য হইলেই, বা সামান্য একটু স্বার্থের হানি হইলেই কত ঘৃণার চক্ষে পরস্পরকে পরস্পরে দেখিতেছে। অথবা ভিতরে দৃষ্টি না থাকায়, ভিতরের আদর না থাকায়, মানুষ মানুষকে প্রকৃত রূপে না চিনিতে পারিয়া, কেবলই বিদ্বেষের আগুনে পুড়িতেছে। আজ কাল ধর্ম্মটা এক প্রকার কথা-কাটাকাটির উপায় হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্রই আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়,—প্রমাণ

পাই না, ঈশ্বরকে মানিব কি? অথচ সকলেই কোন রকমে একটা কিছু দল ধরিয়া আছেন। একজন পণ্ডিত বলিলেন,—"ঈশ্বরকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখি, কিছুই বুঝিনা",—অথচ তিনিই নাকি একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মপ্রচারক নামে জগতে বিখ্যাত হইতেছেন! কেহই কিছু বুঝি না, অথচ বাহিরে বুদ্ধি খাটাইয়া একটা না একটা কিছু দাঁড় করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত ধর্ম্মই সর্ব্বত্র দেখিতেছি। এইজন্য পার্থক্যও দেখা যাইতেছে! বুঝি না কেহই, অথচ সকলেই ধার্ম্মিক! ধার্ম্মিক সকলেই, অথচ পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা, মারামারি কাটাকাটি, অশান্তি অপ্রেম ঘুচিতেছে না। এ যে কি বিষম অবস্থা, চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। মানুষের এমনই অহঙ্কার, ক্ষুদ্র হইয়াও, আপনার জ্ঞানে বা বুদ্ধিতে, তর্কে বা যুক্তিতে সে ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন [illegible]ই করিবে। বামন হইয়া মানুষ চাঁদ ধরিবে! কিন্তু হায়, মানুষ চাঁদ ধরিতে যাইয়া জোনাকী ধরিতেছে;—প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া—মানুষ আজ এক সোণার চাঁদকে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিত্র করিয়াছে, একবার দেখ। মুসলমানের আল্লা আর যোগীর ঈশ্বর, খ্রীষ্টানের গড্ আর বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ, আজ কত বিভিন্ন রূপে জগতে পরিচিত! মূলে এক হইয়াও আজ ধর্ম্ম কত পৃথক পৃথক হইয়া পড়িতেছে। মানুষের কূটবুদ্ধি পরিচালনার ফল এ নহে, তুমি বলিতে পার? সূক্ষ্মভাবে চিন্তা কর, প্রত্যক্ষবাদ বা বাহিরবাদ, প্রমাণবাদ, বা জড়বাদ জগতের কি মহা অনিষ্ট সাধিতেছে, বুঝিতে পারিবে। তর্ক যুক্তিতে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস জন্মে, তাহাকে আমরা বিশ্বাস বলি না, সে কল্পনার ক্রীড়া—মস্তিষ্কের খেলা। লোকের বুদ্ধি শক্তির তারতম্য অনুসারে, সে বিশ্বাস রূপান্তরিত হয়। জ্ঞানীর ঈশ্বর আর মূর্খের ঈশ্বর—পৃথক হইয়া পড়ে। তাই হইয়াছে, ত। ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তাই কত কাটাকাটি চলিতেছে। বাস্তবিক মানুষ যতদিন ভিতরে চাহিয়া না দেখে, ততদিন সারবস্তু সে পায় না। মাটীর শরীরের ভিতরে চিন্ময়ী যে আত্মা বিরাজিত, যে কেবল মানুষের বাহির লইয়াই রহিল, সে তাহা কিরূপে বুঝিবে, কিরূপে জানিবে? আবার ঐ চিন্ময়ী আত্মার মূলে যে পরমাত্মার অরূপ-রূপ-মাধুর্য্য মিলিয়া রহিয়াছে, তাহাইবা সে কি বুঝিবে? এক স্থানে অসার ও সার মিলিত রহিয়াছে! অসারের ভিতরে সারের ঘনীভূত যোগ রহিয়াছে। জড় শরীরে চিন্ময়ী আত্মা, চিন্ময়ী আত্মার মূলে জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা। অরূপ জমিয়া সেখানে রূপ হইতেছে, অসীম ঘুচিয়া সেখানে সীমা পাইতেছে। বহির আবরণের ভিতরে এক অপরূপ,—ভিন্নরূপ। দুই সেখানে এক হইয়াছে,—জড় আর চিৎশক্তি সেখানে মিলিয়াছে, সে যে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মিলনের স্থল, জড়বাদী বা প্রত্যক্ষবাদীর চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না। প্রত্যক্ষবাদী পরমাণু দেখিয়াই নীরব হয়, পরাজিত হয়, মাটীর শরীর দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু ভিতরবাদী বা বিশ্বাসবাদী, প্রেমবাদী বা সাম্যবাদী, এক চিন্ময়ীরূপ, এক মনোমোহন শক্তি-তরঙ্গ প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে অবিনশ্বর ভাবে বিরাজিত আছে, জ্বলন্ত দেখিতে পান। ভাষায় তাহা কি ব্যাখ্যা করিব?

বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিলে, সকলেই দেখিতে পান, সেখানে কি এক মহৎ ইচ্ছা শক্তির কার্য্য অবিরত চলিতেছে,—সেখানে কি এক মনমোহন প্রেমখনির কারখানা খোলা রহিয়াছে। আমার ইচ্ছা নাই, অথচ শরীরে রক্ত চলিতেছে; ইচ্ছা নাই, অথচ পাকস্থলীতে, প্লীহাতে, যকৃতে, ফুসফুসে, এবং হৃদয়যন্ত্রে অবিরত কল চলিতেছে। আমার ইচ্ছা নাই, অথচ বাহিরের জ্ঞান মস্তিষ্কে স্থান পাইতেছে। ইচ্ছার উপরে এক মহৎ ইচ্ছার রাজত্ব বিস্তৃত হইতেছে, আত্মার মূলে কি এক অবিনাশী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা যাইতেছে। সকলেই কি সেই মহতী শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতেপারেন? আত্মদর্শী, ভিতরদর্শী ব্যক্তিরা সকলেই বুঝিতে পারেন। অথবা যাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। ঘড়ির কাটা চলিতেছে, যে দৃষ্টি ফিরায়, সেই দেখে। মানুষ এমনই বধির যে, বুদ্ধি-প্রসূত নশ্বর জ্ঞানের কথা শুনিতেছে কিন্তু সে অবিনশ্বর ধ্বনি শুনিতেছে না। সম্প্রদায় হইবে না, কেন? মিলনের প্রকৃত স্থানে না মিলিয়া মানুষ কেবল বাহিরে মিলিতেছে, বাহিরের শব্দে কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে, তাই মানুষ সে স্বর শুনিয়াও শুনে না। ভিতরের শব্দ শুনিতে পারে—সকলেই। শুনিয়াও তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি, মায়ামোহের দাসত্বে আবদ্ধ থাকিয়া তাহাকে তুচ্ছ করিতে পারি, কিন্তু সকলেরই ভিতরে অবিরত সে শব্দ হইতেছে! অশব্দ অরূপ যেখানে রূপ ধরিয়া শব্দ করিতেছেন, ক্ষুদ্র মানুষ তাহা মানুষকে কি বুঝাইয়া দিবে? তিনি আপনি সর্ব্বত্র স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ আপনি আপনাকে সর্ব্বক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন! মানুষের সাধ্য নাই, তাঁহাকে ব্যক্ত করে। ভিতরের দিকে চাহিয়া, গৃহে বসিয়া, মায়ের জীবন্ত মূর্ত্তি আপন চক্ষে না দেখিয়া যেজন লোকের তর্ক যুক্তিপ্রসূত মাকে দেখিতে চায়, সে ভ্রান্ত; মাতার প্রকৃত স্বরূপ কখনই সে বুঝিতে পারিবে না। মানুষের বাক্য মন যাঁহাকে ধারণাও করিতে পারেনা, তাঁহাকে মানুষ আর কি প্রকাশ করিবে?—পারে না, পারে নাই, পারিবে না। ইতিহাস পাঠ কর,—ধর্ম্মান্দোলনের মূল তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, দেখিবে, বুঝিবে, মানুষ মানুষের নিকট ঈশ্বরতত্ত্ব অতি অল্পই জানিয়াছে;—যাহা জানিয়াছে, তাহা মানুষের কল্পনার ঈশ্বর,—মস্তিষ্কের দেবতা, তাহা সার বস্তু হইতে কত বিভিন্ন, কত পৃথক। অথচ মানুষের এমনি প্রকৃতি, মানুষ ভিতরে একবারও চাহিবে না, একবারও কাণ পাতিয়া সে শব্দ শুনিবে না! বিশ্বেশ্বরীর অপরূপ যেখানে চিত্রিত, চিন্ময়ীর মহামিলন যেখানে, সে দিকে ভ্রমেও চাহিবে না! মানুষ মানুষের কথা শুনিবে,—কুসংস্কারের পূজা করিবে,—অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ক্রিয়া কাণ্ড মানিবে, অথচ ভিতরে যে চিদ্‌ঘন-আনন্দ বিরাজিত, সে দিকে চাহিবে না! তাই দেখ, আজ পৃথিবীতে কতই বিচ্ছেদ, কতই অমিলন, কতই বিবাদ বিসম্বাদ,—বিদ্বেষ, ঘৃণা। দার্শনিক পণ্ডিতের নাম লইতে চাও, এবং আপনি দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিতে চাও, কিন্তু একবার বলত, সসীম তুমি, সে অনন্তগভীর তত্ত্ব কি প্রচার করিতে পার, সে তত্ত্বের আর কি প্রমাণ দিতে পার?

তিনি স্বপ্রকাশ, ইহা ভিন্ন আর তাঁর কি প্রমাণ আছে? নিজে যে অজ্ঞান, সে জ্ঞানময়কে কি প্রকাশ করিবে?—নিজে যে অসিদ্ধ, সে সিদ্ধ-পুরুষকে কি ব্যাখ্যা করিবে? জ্ঞানী নিউটনকে কি একজন সামান্য মূর্খ কৃষক প্রকৃত রূপে প্রচার করিতে পারে? কখনই নহে। একবিন্দু যাহা পারে, তাহার সহিত নিউটনের কত প্রভেদ! নিউটনকে সে নিজের বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে না। বালক নিজে বৃদ্ধের তত্ত্বকথা কি বলিবে? যে বলিতে চায়, লোকে তাহাকে জেঠার শিরোমণি বলে। যে দর্প করিয়া সামান্য বুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রমাণ দিতে চায়, সে আপনি প্রমাণহীন,—সে আপনি আপনার বুদ্ধির পাকে ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রকৃত ঈশ্বর তত্ত্বের নিকট দিয়াও যায় না। যে সে গভীর তত্ত্বের প্রমাণ দিতে যায়, সে কিছুই জানে না। প্রমাণহীনের প্রমাণ অসিদ্ধ, জ্ঞান-হীনের জ্ঞান প্রচার মিথ্যার ক্রীড়া, প্রেম-হীনের প্রেমকাহিনী প্রচার কল্পনার কথা। প্রকৃত প্রেমিক, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, প্রকৃত সিদ্ধ-পুরুষ বলেন, "—তিনি আপনি প্রকাশিত না হইলে কিছুই জানিতে পারি না;—বলেন, শুনি বটে একজনের কথা, কিন্তু কি শুনি বলিতে পারি না, দেখি বটে এক জীবন্ত মহাপুরুষকে আত্মার মূলে বিরাজিত, কিন্তু কি যে দেখি, বলিতে পারি না;—অকূল সাগর দেখি বটে, কিন্তু ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করিতে পারি না।" বুদ্ধি মন, জ্ঞান বিদ্যা, সকল সেখানে পরাস্ত হয়। সামান্য সসীম সাগরের ব্যাখ্যা হয় না, সসীম মানুষের ব্যাখ্যা হয় না,—জড়ের ব্যাখ্যা হয় না, আর সেই অনাদি, অনন্ত, ভূমা, মহান, অপার, অগম্যের ব্যাখ্যা হইবে? ভুল কথা। যে ব্যাখ্যা করে, সেও মূর্খ, প্রতারক; যে সে ব্যাখ্যা শুনে, সেও অজ্ঞান,—নির্ব্বোধ। তবে কি ধর্ম্ম জগতে টিকিবে না? তবে কি ঈশ্বর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন না? একথাও যে মনে ভাবে, সেও মূর্খ। ধর্ম্ম অবিনাশী, অবিনশ্বর। সমস্ত জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে,—সাগর পঙ্কে পরিণত হইতে পারে, এবং পঙ্কও সাগরের বেশ ধরিতে পারে,—রাজার রাজসিংহাসন টলিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম চিরস্থায়ী,—অবিনাশী, অবিনশ্বর। ঈশ্বর আপনি স্বপ্রকাশ, আপনিই শিক্ষক, আপনিই প্রচারক, আপনিই গুরু, আপনিই নেতা। তিনি আপনি আপনাকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার দুর্জ্জয়বাণী সতত আত্মার ভিতরে নিনাদিত হইতেছে। সে বাণী শুনিয়া রাজা কম্পিত হইতেছেন, কৃষকের প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিতেছে! আমি তুমি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই স্বরূপে নিমগ্ন রহিয়াছি। যখনই ভিতরে যাইতেছি, কি এক মহা-বাণী শুনিতেছি! অনেক সময়ে বাহিরে থাকিতেছি বটে, কিন্তু যখনই ভিতরে যাই, কি এক দুর্জ্জয় মহাশক্তির তরঙ্গ দেখিতে পাই। আবার প্রমাণ কি?—ইহাই জ্বলন্ত প্রমাণ। মিথ্যা কথা নয়, কল্পনার কথা নয়, প্রবঞ্চনার কথা নয়, কিন্তু নিত্য সত্য, জাগ্রত সত্য। তাঁহাকে ভিতরে যেভাবে যে দেখিতে পায়, সেই ভাবেই সে পূজা করুক, বিশ্বাস করুক, পৃথিবীর কিছুই অনিষ্ট হইবে না। যে তাঁহাকে যেরূপে, যে স্বরূপে দেখিতেছে, সরল প্রাণে, অকপট ভাবে সে সেই স্বরূপের পূজা করুক, কখনও সম্প্রদায় থাকিবে না। যে সাগরের

কূলে তুমি, সেই সাগরের কূলেই আমি ;— অমিলনেও গভীর যোগ, গভীর মিলন! জ্ঞানী যদি বিশ্বাসী হয়, তবে প্রেমিক-বিশ্বাসীর সহিত তাঁহার অমিল থাকে না, আর কর্ম্মী যদি বিশ্বাসী হয় তবে ভক্তের সহিত অমিল থাকে না।—এক মাত্র বিশ্বাসে বহুর মিলন সংসাধিত হয়। যে জন তাঁহার দুর্জ্জয় বাণী শুনে নাই, সে যেন কখনও ভণ্ড হইয়া ধর্ম্মের নাম মুখে আনে না। যে ব্যক্তি সে স্বর শুনে নাই, সে যদি অবিশ্বাসী থাকিয়া থাকে, তাঁহাকে নিন্দা করিও না। ঈশ্বরকে না বুঝিয়া, না জানিয়া, জানিয়াছি, বুঝিয়াছি বলার অপেক্ষা আর মহা পাপ নাই। যে ব্যক্তি আপন গৃহকে সেই অরূপ রূপের আলোকে আলোকিত দেখে নাই, সে যেন লোকের মুখে প্রমাণের কথা শুনিয়া ঈশ্বরের কথা না বলে। সর্প লইয়া খেলা? আগুন লইয়া ক্রীড়া? না ধরিয়া, না বুঝিয়া, ধরিয়াছি, পাইয়াছি বলার ন্যায় মহাপাপ আর নাই। ধর্ম্মের প্রথম উপদেশ এই, মানুষ বাহির পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করুক—নীরবে গম্ভীর স্থানে, নির্জ্জন আত্ম-অরণ্যে প্রবেশ করুক। সেখানে অরূপের সহিত সাক্ষাৎ হইবে—অশব্দের শব্দ শ্রুত হইবে, অস্পর্শকে স্পর্শ করা যাইবে;—সকল অসম্ভব সম্ভব হইবে। শুনিয়া, স্পর্শ করিয়া, সাক্ষাৎ করিয়া, তবে ধর্ম্ম ধন লাভ হইবে। নচেৎ কি অমূল্য ধর্ম্ম-ধন পাওয়া যায়? এ ত কল্পনার কথা নয়;—নিত্যসত্য, জ্বলন্ত সত্যের কথা। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যক্ষবাদীর দল এতই প্রাধান্য লাভ করিতেছে যে, বুঝি বা ধর্ম্ম আর জগতে টিকিবে না। আমরা বলি, ভয় কি? মানুষের চেষ্টা বড়, না ঈশ্বর বড়?—মানুষের সাধ্য কি যে, সে স্বপ্রকাশকে কুসংস্কার বা কুজ্ঞানে চিরকাল ঢাকিয়া রাখিবে? আমার তোমার ভিতরে যাঁহার করুণাস্রোত অবিরত প্রবাহিত, তিনি কি জগৎকে ভুলিয়া রহিয়াছেন? —থাকিতে কি পারেন? তাঁহার পক্ষে এ সকল অসম্ভবের অসম্ভব। ভয় নাই—আপনাকে তিনি আপনিই চিরকাল প্রচার করিয়াছেন, চিরকাল করিবেন। কে এমন শক্তিবান পাপী, অবিশ্বাসী আছে, যে ভগবানের রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে? সর্ব্বদর্শীর নিকট সকলই প্রকাশিত। তিনি আমাকে ধরিবেন, তোমাকে ধরিবেন,—জগৎকে ধরিবেন। বাহির লইয়া অন্ধ হইয়া আছি যতক্ষণ, ততক্ষণ কিছুই দেখিতেছি না বটে,—শরীরের বিলাস সুখ, ভোগ বিলাস, মায়া মোহ, অবিদ্যা অজ্ঞানে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ বুঝিতেছি না বটে; কিন্তু যখনই ভিতরে দৃষ্টি পড়িবে, অমনি ধরা পড়িব। চিন্তাহীন, বিশ্বাসহীন, তর্কযুক্তির দাস হইয়া চির দিন কখনই থাকিতে পারিব না। আজ আমার সামান্য জ্ঞানে তোমাকে বাঁধিতে চাহিতেছি বটে, কিন্তু যখন অনন্ত জ্ঞান সাগরে ডুবিব, তখন আর এ ভাব থাকিবে না। যখন বাঁধা পড়িব, তখন আর বাহির হইব না। কিন্তু সে দিন কবে আসিবে? সে দিন কবে আসিবে, যে দিন বিদেশ পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া গৃহে যাইয়া মায়ের মুখ দেখিব! সে দিন কবে আসিবে, যে দিন ক্ষুদ্র বুদ্ধি-প্রসূত অহঙ্কারের পূজা পরিত্যাগ করিয়া, ভিতরে যাইয়া, আনন্দময়ীর অনন্তক্রোড়ে শুইয়া ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র হইয়া যাইব! সে দিন কবে আসিবে, যে

দিন বাহিরের অন্তরালে সেই চিৎ শক্তির অস্তিত্ব জ্বলন্ত রূপে দেখিতে পাইব! প্রমাণ লইয়া, তর্ক যুক্তি লইয়া কাটাকাটি করিলে আর কি হইবে! সময় যথেষ্ট গিয়াছে,—এস, একবার সকলে হৃদয়-কাননে প্রবেশ করি। কৃপাময়ীকে প্রত্যক্ষ না দেখিলে কখনই আমরা সম্প্রদায় বা দল ভুলিতে পারিব না। যে প্রেম-খনিতে আমরা মিলিত হইব, অগ্রে তাঁহাকে প্রাণে দেখি। তিনি ত প্রাণের মূলে। বাহিরের ভিতরেই প্রাণ, প্রাণের মূলেই তিনি। জড়ের ভিতরে তিনি, জীবের ভিতরেও তিনি। তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির কার্য্য সতত সর্ব্বত্র হইতেছে। তাঁহারই ইচ্ছা শক্তির বিকাশ, জড়ে এবং জীবে। তাঁহারই ইচ্ছার সমষ্টি, জড় বা জীব। মজিব কেন?—ভুলিব কেন?—অবিশ্বাসী হইব কেন? সে তোমার কল্পনার কথা শুনিব কেন? যাহা না দেখিয়াও দেখা যায়, না বুঝিয়াও বুঝা যায়, যাহা না ধরিয়াও ধরা যায়, তোমার কল্পনার প্রমাণে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিব? বায়ুকে যেমন না দেখিয়াও স্পর্শ করা যায়, তাঁহাকেও সেইরূপ স্পর্শ করা যায়; বিদ্যুৎ কি পদার্থ না জানিয়াও যেমন তাহার কার্য্য দেখা যায়, সেইরূপ তাঁহাকে সৃষ্টির মূলে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অব্যক্ত হইলেন, তাহাতে কি? বায়ু নিত্য সত্য, বিদ্যুৎ নিত্য সত্য; ব্যাখ্যা হয় না বলিয়া কি ইহাদিগকে অস্বীকার করিতে পার? শরীরের ভিতরে আর কিছুর অস্তিত্ব না থাকিলে, তুমি ও আমি শ্মশানের ভস্ম। সে কিছু যে কি, তাহা জানি না, ব্যাখ্যা করিতে পারি না বলিয়া কি সত্যকে অস্বীকার করিব? জীবন্ত খেলা, জীবন্ত লীলা দেখিয়াও মানুষ কেমনে অবিশ্বাসী থাকিবে? গৃহে প্রবেশ করিলেই আত্মার মূলে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ লাভ। তাঁহাকে যে দেখিয়াছে, তাঁহাকে যে বুঝিয়াছে, সে বিবাদও জানে না, বিসম্বাদও জানে না, ঘৃণাও জানে না, বিদ্বেষও জানে না। সাক্ষাৎ লাভ হইলে—ভিতর ও বাহির এক হইয়া যায়। ভিতরই বাহির, বাহিরই তাহার নিকট ভিতর হয়। সে যখনই ভিতরে যায়, এক জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ সর্ব্বক্ষণ দেখে। দেখে আর তাঁহাতে নিমগ্ন হয়, নিমগ্ন হয় আর তাঁহাকে দেখে। তাঁহার নিকট রাজা প্রজা, পাপী পুণ্যাত্মা, জ্ঞানী মূর্খ, বিষ্ঠা চন্দন, সকল একাকার হইয়া যায়। একই রূপ, একই ভাব, একই চিন্তা। একই ধ্যান, একই জ্ঞান। একই ধর্ম্ম, একই বস্তু, সকলের ভিতরে সে দেখে। ভাল মন্দ সকলের ভিতরেই এক জনকে সে দেখে। পৃথিবীর বাজারে মত্ত হইয়া সে ঝগড়া বিবাদ করে না, আপনার সত্যে আপনি অটল হইয়া বসিয়া থাকে। সে মনে করে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভ হইলে কুসংস্কার বা কুজ্ঞান, মানুষের মধ্যে থাকিবে না, তবে কেন ভেদাভেদ মানিব? একই শক্তির রূপান্তর,—সাগর পর্ব্বত, নরনারী, জীবজন্তু, কীট পতঙ্গ, সকল। ছোট বড়, এ ভেদাভেদ আর তখন তাঁহার থাকে না। মাটী সোণা, এক হয়। সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ এক হয়;—সে অভেদাত্মক মহাযোগী মহাধ্যানে, মহা জ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন;—নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হন। তিনিই চৈতন্য, তিনিই বুদ্ধ, বা তিনিই খ্রীষ্ট নামে পৃথিবীতে সাম্যাবতার বলিয়া পূজিত

বা সম্মানিত হন। মানুষ যদি সে মহাধনকে পায়, তবেই জগতের নরনারীর ভিতরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, সকলের সহিত অভেদাত্মক হইতে পারে, আসক্তিহীন হইয়াও মজিতে পারে—সকলকে কোলে তুলিয়া,হৃদয়ে পুরিয়া নৃত্য করিতে পারে। প্রেম-খনি যাহার আবিষ্কার হয় নাই, সে মরণের কোলে, শুষ্কত্বের শ্মশানে, তর্ক যুক্তির ভস্মে নিমগ্ন রহিয়াছে। যে তাঁহাকে স্পর্শ করে, যে তাঁহাকে দেখে, সেই মিলনের মন্ত্র পায়;—সেই জ্ঞান প্রেম, নীতি পুণ্য—প্রকৃত ধর্ম্ম ধন পায়। ঈশ্বর এই করুন, আমরা তাঁহাকে জীবনের মূলে জীবন্ত ভাবে দেখিয়া প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত হইতে পারি। ঈশ্বর এই করুন, সম্প্রদায়গত তর্কযুক্তি-প্রধান মতের ঝগড়া-বিবাদ পৃথিবীর বক্ষকে পরিত্যাগ করুক;—সকলে পরস্পরের ভিতরের সৌন্দর্য্য দেখিতে পারি;—শরীরের ভিতরে লুক্কায়িত অনন্ত সূক্ষ্ম সার বস্তু দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। কেবল খোসা, কেবল অসার, কেবল বাহির, কেবল মত,—কেবল ঝগড়া লইয়া কি হইবে? এই করুন, স্থূল শরীরের ভিতরের অনন্তজ্ঞান, অনন্ত শক্তিতে ডুবিতে পারি। এই করুন, সকলে অনন্তে ডুবিয়া একাত্মক হইয়া শান্তির রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হই এবং ইচ্ছার ভিতরে ইচ্ছার জয় দেখি, জড়ের ভিতরে চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া তাহাতে নিমগ্ন হই!

ইন্দুবালা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইন্দুবালা এখন শ্বশুরালয়ে। মনকে যতদূর পারেন, কর্ত্তব্যের পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বামীকে সুখী করিবার জন্য, সমুদয় পরিবারের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য, অনলস্ত কঠোর পরিশ্রম অম্লান বদনে সহ্য করিবার জন্য, সতত আপনাকে শিক্ষিত করিতেছেন। নিজের হৃদয়ের সহিত সতত সংগ্রাম করিয়া, কঠোর বিবেকের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। এখন তাঁহার মুখশ্রীতে কেমন এক গম্ভীর, সহিষ্ণু, প্রশান্ত ভাব বিরাজিত। এখন তিনি দুঃখের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইন্দুবালার দুর্ভাগ্য বশত এই শিক্ষা সমাপ্ত হইল না। পাঁচ মাস পরে তাঁহার পীড়া হইল। চিকিৎসার দোষেই হউক, অথবা মানসিক পীড়ার জন্যই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, রোগ ক্রমে সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিল। এক মাস পরে তাঁহার জীবন-দীপ নিবু নিবু হইল। তখন তাঁহার পিতার নিকট সংবাদ আসিল। ইন্দুর ভ্রাতা নির্ম্মল তাহাকে লইতে আসিলেন। দেখিলেন, ইন্দু মৃতপ্রায়। তিনি দেখিয়া কাঁদিলেন। প্রয়োজনীয় আয়োজন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইলেন। ইন্দুবালার পিতা ধনী। বড় চিকিৎসক দিয়া দেখাইতে লাগিলেন। চিকিৎসকেরা বলিলেন, জলভ্রমণ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। জল-যাত্রার ব্যবস্থা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সায়ংকাল নিকট। ভাগীরথী তীরে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা ধীরে ধীরে উজান বহিয়া যাইতেছে। বাহিরে ইন্দু-বালা বিছানার উপর বালিশ ঠেক দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কাছে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা বসিয়া আছেন। ভ্রাতার হাতে একখানি সংবাদ পত্র ও পুস্তক। ইন্দুবালার শরীর অনেক সারিয়াছে, কিন্তু বদনপাণ্ডুবর্ণ, দেহ জ্যোতিহীন,—দুর্ব্বল। তথাপি তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য, অতুলনীয় লালিত্য কেমন এক মধুর ভাবে প্রতিভাত হইতেছিল,—লঘু আকৃতিতে কেমন বীর মাধুরী লক্ষিত হইতেছিল ইন্দুবালার ভ্রাতা একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িতেছিলেন, ইন্দুবালা তাহা শুনিতে-ছিলেন। ক্রমে নির্ম্মল দেখিলেন, ইন্দু অন্যমনস্কা হইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিলেন,—"ইন্দু, তোমার কি কোন অসুখ করিতেছে?" ইন্দু-বালা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"না।" নির্ম্মল বলিলেন—"এই স্থানটী বড় সুন্দর বোধ হইতেছে।" নদীর দুই ধারে কোথাও বা রমণীয় হরিতক্ষেত্রে, কোথাও বা কৃষক ধীরে ধীরে এখনও হলচালনা করিতেছে, কোথাও বা রমণীয় কুঞ্জ শাখা লতা তটিনী-তীর লগ্ন তরঙ্গকে চুম্বন করিতেছে। দূরে কোথাও বা একটী গাভী, কোথায়ও একটী ছাগ, কোথায়ও বা কৃষক পল্লীর অস্পষ্ট ছায়া, আর দূরে কোথায়ও বা উন্নত সৌধমালা, কোথায় বা দেবমন্দিরের চূড়া আকাশ পটে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মেদিনী মৃদুমোহন ভাব ধারণ করিয়াছে—সেই মৃদু কলনাদিনী তরঙ্গিণী—সেই মন্থর-গতি তরণী—আর সেই লোহিত প্রশান্ত আকাশ, আর সেই চতুর্দ্দিকস্থ—কোমল নিস্তব্ধতা। ইন্দু ও নির্ম্মল, দুই জনে সেই প্রশান্ত সৌন্দর্য্য নীরবে দেখিতে লাগি-লেন। অনেকক্ষণ পরে ইন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা, আমরা এলাহাবাদে কত-দিনে পঁহুছিব?"

নির্ম্মল।—"বোধ হয় আর এক মাসে।"

ইন্দু।—"এত দিন?"

নির্ম্মল।—"তোমার জলভ্রমণ কি কষ্ট-দায়ক বোধ হইতেছে?"

ইন্দু।—"অনেক দিন বাটী হইতে আসি-য়াছি। বাটীর সকলকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, আর আমার যে পীড়া তাহাতে কতদিন বাঁচিব, তাহার কিছু স্থির নাই।"

নি।—"কেন, তোমার পীড়া ত প্রায় সারিয়া গিয়াছে।"

ই।—অস্ফুটস্বরে, "এপীড়া কি সারি-বার?"

নি।—"ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, তাত তুমি জান, তোমার পীড়ায় আর কোন আশঙ্কা নাই।"

ই।—"দাদা, সিমলা কেমন জায়গা?"

নি।—কেন, তোমার সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে?"

ই।—"হাঁ, আমার ঐসকল স্থান দেখিতে খুব ইচ্ছা হয়।"

নির্ম্মল শুনিয়াছিলেন, পরিব্রাজক সিম-লার নিকটস্থ কোন স্থানে কিছুকাল পূর্ব্বে বাস করিতেন। তিনি কোন উত্তর করি-লেন না। কেবল একটীমাত্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ইন্দু কতক্ষণ পরে বলিলেন,—"দাদা, অদ্য প্রাতে সংবাদপত্রে একটী বাঙ্গালী বক্তার বিষয় কি পড়িতেছিলেন?"

নির্ম্মল।—"আমি কি সে প্রবন্ধটী আবার পড়িব?"

ই।—"না, আমার হাতে দিন, আমি নিজে পড়িতেছি।" এই বলিয়া তিনি সংবাদ পত্র খানি লইলেন। তিনি সেইটী নিজে পড়িতে লাগিলেন।

"নগরে (পঞ্জাবে) কয়েক দিবস হইল একজন বাঙ্গালী আসিয়াছেন। ইনি গত শনিবারে রাজশাসন ও জাতীয় উন্নতির বিষয়ে হিন্দি ভাষায় একটী চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহার বাগ্মিতা অসাধারণ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কণ্ঠধ্বনি মধুর ও সুদূরশ্রুত, মূর্ত্তি গম্ভীর ও কঠোর।——সংবাদপত্রে রাজপুতনার——রাজ্যের বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে যে কয়েকটী তেজপূর্ণ প্রবন্ধ সম্প্রতি বাহির হইয়াছিল, অনেকে বলেন, ইঁহারই লেখনী হইতে তাহা নিঃসৃত। কেহ কেহ বলেন, ইনি বাঙ্গালী। ইনি যে দেশীয়ই হউন, এখন দেখিতে সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী, অতি বিশুদ্ধ হিন্দি কহিয়া থাকেন। ইহার বক্তৃতাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আগামী শনিবারে "ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, ইনি আর একটী বক্তৃতা করিবেন।"

ইন্দু পড়িয়া বলিলেন—"দাদা, ইহার পরের তারিখের কাগজ খানি কোথায়?"

নির্ম্মল।—উহার "পরের কাগজ পাওয়া যায় নাই।"

ইন্দু।—"আপনার কি বোধ হয়, এই লোকটী বাঙ্গালী?"

নির্ম্মল।—"ইহাতেও পারে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরিব্রাজক রাজপুতনার সেই রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া পঞ্জাবে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই রাজপুত রাজ্যের 'রেসিডেণ্ট সাহেবের সহিত রাজার একটু সংঘর্ষণ হয়। তাহাতে রাজা পরিব্রাজকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরিব্রাজক সেই কার্য্য উদ্ধারের জন্য কলিকাতায় আসিবেন স্থির করিলেন। প্রথমে এলাহাবাদে আসিলেন, সেখান হইতে জলপথে যাত্রা করিলেন। বর্ষাকাল নৌকা সোঁ সোঁ করিয়া যাইতে লাগিল। একদিন অপরাহ্নে দেখিলেন, একখানি নৌকা উজান বহিয়া আসিতেছে। নৌকার ভিতর একটী স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। ক্ষণকাল পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার নৌকা দূরে যাইলে রমণীটী আস্তে আস্তে নৌকার বাহিরে আসিলেন, ততক্ষণ পূর্ণ ভাগীরথী হৃদয়ে তাহার নৌকা নাচিতে নাচিতে অনেকদুর চলিয়া গিয়াছে। তখন পরিব্রাজক একটী দূরবীণ লইয়া দেখিতে লাগিলেন। চিনিতে পারিলেন,—ইন্দুবালা। কৃশ, পীড়িত—ইন্দু। ইন্দু তাঁহাকে পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, বাহিরে আসিয়া দেখিতে দেখিতে পরিব্রাজকের দুরবর্ত্তী মূর্ত্তি ও নৌকা ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইন্দু নিজের মাথা ধরিয়া বসিলেন। নির্ম্মল, ইন্দুর ভাবান্তর দেখিয়া বলিলেন—"ইন্দু, ইন্দু, কি হইয়াছে?"

ইন্দু বলিলেন—"কিছু নহে।"

এদিকে পরিব্রাজক শীর্ণা ইন্দুকে দেখিয়া ও চিনিয়া আবার ক্ষিপ্তপ্রায়। কিন্তু তিনি হৃদয়ের অসাধারণ বল প্রয়োগ করিয়া রাজকার্য্য সমাধা পূর্ব্বক আবার নিভৃত হিমাচল কুটীরে আশ্রয় লইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরিব্রাজক আবার সেই তুষারময় হিম-

গিরিশিখরে। সেই বিজন কুটীরে, প্রধূমিত হৃদয়ে, কখন মুদিতনয়নে ধ্যান-মগ্ন। অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"জানামি ধর্ম্মং ন চমে প্রবৃত্তি
জানাম্য ধর্ম্মং ন চমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদয়স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽসি তথা করোমি॥"

আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কতকগুলি জীর্ণ পত্র একটী পুটলী হইতে বাহির করিলেন। বলিয়া দিতে হইবে না, এই পত্র গুলি ইন্দুবালার। আমরা ইহার মধ্যে কেবলমাত্র একখানি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

স্নেহময় পূজ্যতম দেব—

"কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য" আমাকে বলা বৃথা। আমি কি অকর্ত্তব্য করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারি না। আমি আপনার পত্রের যুক্তি অনুভব করিতে পারি না—উপদেশ বুঝিতে পারি না। আমার সরল বুদ্ধি, হয়ত বলিবেন। আমি দুর্ব্বল, শতবার স্বীকার করিতেছি, কিন্তু আপনি কি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন না? আমি বুঝিতে পারি, স্রোতে যতই গা ঢালিয়া দিব, ততই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, অবশেষে অকূল-সাগরে ফেলিবে। সংসার দেখিতেছি, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় কঠোর বিধি অনুভব করিতেছি, ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারময়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। তথাপি অবোধ মন দৃঢ় করিতে পারিতেছি না। যাহা আপনার অভিমত, তাহাই হইবে। অশিক্ষিত জীবন আমার। লিখিবার ভাষা পাইতেছি না। সমুদায় কথাগুলি যেন একবারে উথলিয়া উঠিতেছে, তাহাতে সকলই ভুলিয়া যাইতেছি। যাঁহাকে অনন্তকাল দেখিলেও আমার তৃপ্তি হয় না, তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা কিরূপে হ্রাস করিতে পারি? সমুদ্রোচ্ছ্বাস মনুষ্যের আজ্ঞায় থামিয়া যায় না। আপনি বলিয়াছেন, 'হৃদয়কে সংযত কর, আপনার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, স্রোতে ভাসিয়া যাইও না, অনন্তকালের নিমিত্ত দুঃখরাশি সঞ্চয় করিও না।" আপনি আরও লিখিয়াছেন—'ইন্দু, সাবধান, তুফানে হাল ছাড়িয়া দিও না, দিলেই সর্ব্বনাশ হইবে। ঝড় কিছু চিরকাল বহে না, আকাশ চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, সমুদ্র চিরকাল উত্তাল তরঙ্গে ক্ষিপ্ত রহে না, তোমার বুদ্ধি আছে, তোমার শিক্ষা আছে, তোমার নীতির বল আছে। তবে কেন হতাশ হইবে, তবে কেন হৃদয়কে মরুভূমি করিবে, তবে কেন অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবিবে? তুমি পতিসেবায় ও গৃহকার্য্যে, পুস্তকে ও ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া আমাকে ভুলিয়া যাও।"

—জীবনগতি আপনি যাহা লিখেন, তাহাই আমার নিকট মধুর, চমৎকার। কিন্তু আপনার উপদেশ কেমন যেন অসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে, কেমন যেন নিষ্ঠুর বোধ হইতেছে। আপনাকে ভুলিয়া যাইব? আপনাকে ভুলিয়া যাইলে আমার কি পাপ হইবে না? জীবন থাকিতে আপনাকে ভুলিতে পারিব না। প্রভু, এইখানে আপনার আদেশ আমি পালন করিতে অসমর্থ, ক্ষমা করিবেন।

অনন্ত শোকে, অনন্ত দুঃখে দুর্ব্বলমন ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহা সহ্য করিয়াছি। কিন্তু প্রভু, আপনার উদাসীনতা আমি সহ্য করিতে পারি না।—কি দেখিলে সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া যাইতে পারি? এই কয়েকরাত্রি যে কতবার চিন্তা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নির্জ্জন উদ্যানের নিকট গিয়া বসিয়াছি ও ভাবিয়াছি ও কাঁদিয়াছি, তাহার পরিণাম কি? কেবল মাত্র এক একবার দেখিয়া যদি প্রাণে বাঁচি, তাহাতে প্রভু বিমুখ কেন? তাহাতে দোষ কি?

সাবিত্রী—মাননীয়া, পবিত্রা। সুন্দর উদাহরণ। সাবিত্রী সম্বন্ধে আপনার দেব লেখনী হইতে যাহা নির্গত হইয়াছে, তাহা সত্য। স্বর্গীয়া সাবিত্রীর নিকট যাইতে পারিব কি? পারিব না কেন? একজনের গুণ অবস্থা বশত ফুটিয়াছিল, লোকে দেখিতে পাইয়াছিল, আর একজনের গুণ ঘটনা বশত লোকের চোখের উপর ফুটিতে পাইল না। আমার সহিত সাবিত্রীর তুলনা সংসারের লোকের নিকট উপহাসের কথা হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, যিনি সকলই দেখিতেছেন, তিনি জানেন আর আপনিও জানেন, আমি কি। আর কিছু এখন লিখিতে পারিতেছি না, আমার প্রার্থনা, আমার হৃদয়ের অবোধ ব্যাকুলতা আপনার কোন অমঙ্গলের কারণ না হয়।"

শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী।

প্রেম কোথায় ?

হে প্রেম পরশমণি, হৃদয়ের ধন,
কোথা এবে হলে অন্তর্দ্ধান ?
না হেরি তোমার মুখ, বিষাদে বিদরে বুক,
তোমার অভাবে হায় ! আঁধার ভুবন,
জনপদ শ্মশান সমান।

২

শৈশবের প্রণয় বিলাস,
বাল্য সখা সনে সহবাস,
আমোদ আহ্লাদ হাসি, নব অনুরাগ রাশি,
আহার বিহার নৃত্য গীত রসোল্লাস ;—
স্মরণ হইলে সেই সুখের সময় আহা,
হৃদিসরোবরে উঠে প্রেমের উচ্ছ্বাস,
প্রাণের ভিতরে বহে প্রেমের বাতাস।

৩

প্রথম যৌবন কালে দেখিয়াছি তারে
আমি যেথানে সেখানে ;
সহজেই অবিচারে, মন খুলে একবারে
ঢালিয়া দিতাম ভালবাসা যারে তারে ;
ছিলনা সংশয় কিছু প্রাণে।

৪

না হইতে পরিচয় ধরিতাম গলে,
ঝরিত প্রণয়-সুধা নয়নের জলে ;
ভাবিতাম সব ভাই,
পর আর কেহ নাই,
ভাসিতাম যেন সদা প্রেমসিন্ধু জলে,
দেখিতাম প্রেম-চক্ষে মানব সকলে।

৫

কাল ধর্ম্মে এবে দিন দিন
বয়স বাড়িছে যত, ভুষণ্ডী কাকের মত
দেখে শুনে হইতেছি ততই প্রবীণ,
মনে হয় যেন এই বিশ্ব প্রেমহীন।

৬

সুখের পৃথিবী কেন হল পুরাতন রে,
প্রেমশূন্য স্বার্থের আবাস ;
কুটিল সভ্যতাচার, অসরল ব্যবহার
সহেনা যে প্রাণে আর কি করি এখন রে,
লোকালয় যেন বনবাস !

৭

নর-হৃদি শূন্য করি হায় !
প্রেম তুমি লুকালে কোথায় ?
বাহিরে না অভ্যন্তরে, এ লোকে না লোকান্তরে,
কোথায় বিরাজ তুমি বলহে আমায় ?
হয়ে তব চিরদাস রহিব তথায়।

৮

অঞ্জন হইয়া তুমি থাক মোর নয়নে,
সেই চক্ষে দেখি ধরাধামে ;
প্রেমানন্দরসে ভাসি, সদানন্দে হাসি হাসি,
ভালবাসি সবে এই সাধ বড় জীবনে ;
করি প্রেম দান অবিরাম।

৯

প্রেম বিনা এ সংসারে, আর কিছু দেখি নারে,
তাই তার লাগি প্রাণ কাঁদে দিন যামিনী ;
প্রেমিকের মিষ্ট বাণী, হাসি হাসি মুখ খানি,
নিবিড় নীরদ কোলে জলে যেন দামিনী।

১০

প্রেমময় ভগবান প্রেমেতেই বর্ত্তমান,
প্রেম বিনা এ জীবনে কিবা সুখ আছে ভাই,
ভেবে দেখ মনে ;
এস তবে প্রেমে গলে, হরি হরি হরি বলে,
হরি প্রেমরসে মজে ভালবেসে মরে যাই
হরির চরণে।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

ভবভূতি।

বীরচরিত--পরশুরাম।

বীরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য অতি গম্ভীর ভীষণ, অতি প্রসন্ন কর্কশ। ইহার নায়ক রামচন্দ্র এবং প্রতিনায়ক ভগবান জামদগ্ন্য। এক দিকে যেমনই বিনয় এবং সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা, অন্যদিকে তেমনই গর্ব্ব এবং প্রগল্‌ভতার প্রাধান্য। এক দিকে করুণা এবং কোমলতা, অন্য দিকে নিষ্ঠুরতা এবং কাঠিন্য। এই পরস্পর-বিরোধী গুণ নিচয়ের সংস্পর্শে, নায়ক এবং প্রতিনায়কের চরিত্রের স্বতন্ত্রতা, অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হরশরাসন ভঙ্গের পর, রাম ও সীতার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; ভগবান জামদগ্ন্য, মাল্যবান ও শূর্পনখার নিকট এই সংবাদ শুনিয়া, মিথিলায় আগমন করিয়াছেন। রামচন্দ্র তাঁহার নিকট অতি গুরুতর অপরাধে অপরাধী; সে অপরাধের প্রতিবিধান আবশ্যক। কিন্তু তাঁহার নিকট রামচন্দ্রের অপরাধ, কেবলই হরকার্ম্মুক ভঙ্গরূপ গুরুতর অপমান জনিত নয়; তাহার অভ্যন্তরে আরও একটী গূঢ় কারণ নিহিত আছে। হর ধনুর্ভঙ্গ, সীতা বিবাহের পণরূপে জগতের বীরগণের বীরত্বের পরীক্ষাস্থল। জগতের মহা মহা বীরপুরুষগণ, সে পরীক্ষায় পরাভূত হইয়া গিয়াছেন; যিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, তিনি যে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বীর বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। রামচন্দ্র আজি সে বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি আজ বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয়। দিগ্বিজয় না করিলেও, আজ জগৎ বুঝিয়াছে যে, তিনি অদ্বিতীয় বীর, সংসারে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্ল্লভ। পরশুরামের নিকট, রামচন্দ্রের এরূপ প্রতিপত্তি অসহনীয়, তিনি জানিতেন যে, সংসারে তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহ নাই; বীর পুরুষের নাম করিতে হইলে, লোকে অগ্রে তাঁহারই নাম করিত। কিন্তু আজ অকস্মাৎ এ প্রতিদ্বন্দ্বী কোথা হইতে আসিল? তুচ্ছ ক্ষত্রিয় শিশু, যাহার পিতৃপিতামহগণের রুধিরে তিনি একবিংশতিবার আপনার পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়াছেন, সেই আজ তাঁহার সমক্ষে প্রতিযোদ্ধারূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে; নির্ব্বাণোন্মুখ শিখা আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া, জগৎ আলোকিত করিয়াছে, ইহাত উপেক্ষা করিবার কথা নয়। জগতে এককালে এবং একই আকাশে, শত সহস্র নক্ষত্র সমুদিত হইতে পারে; কিন্তু আকাশমণ্ডল অনন্ত হইলেও, সেখানেত একটীর অধিক সূর্য্যের স্থান হইতে পারে না; তবে পরশুরাম কেমন করিয়া, অবিবাদে রামচন্দ্রের প্রভাব দর্শন করিবেন? অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, প্রদীপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ করা কর্ত্তব্য। সেই জন্যই তিনি মাল্যবান ও শূর্পনখার নিকট, হরধনুর্ভঙ্গের সংবাদ পাইয়া, মিথিলানগরে আগমন করিয়াছেন। স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা বশত এবং হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বেগে, তিনি রাজাবরোধের সম্মান রক্ষা না করিয়াই, একেবারে কন্যান্তঃপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার রৌদ্রোজ্জ্বল

মূর্ত্তি দেখিয়া, দ্বারপালগণ সভয়ে দ্বার ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। তিনি গম্ভীর স্বরে পরিচারকগণকে রামচন্দ্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বর্ষাজলপূর্ণমেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সীতা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ ভীতা হইয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্র উদ্বেগশূন্য; পরশুরামের বিক্রম এবং অমর্ষস্বভাব, তিনি যে অবগত ছিলেন না, তাহা নয়; কিন্তু নিরুদ্বেগই তাঁহার প্রকৃতি। তিনি ভাবিতেছিলেন যে, যিনি ভগবান ত্রিপুর দাহনকারী দেবাদিদেবের প্রিয় শিষ্য, যাঁহার পবিত্র চরিত্র বেদপাঠে পরিপূত, তিনি যে আজ অযাচিত হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাহাত আনন্দেরই কথা, গৌরবেরই কথা, তবে তাহাতে উদ্বেগের বিষয় কি? তাঁহার হৃদয়ে যে কেবলই উদ্বেগ নাই তাহা নয়, কিন্তু তিনি পরশুরামের গুণেরও পক্ষপাতী; তিনি সীতা ও তাঁহার সখিগণের নিকট মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণগ্রামের প্রশংসা করিতেছিলেন। সে প্রশংসায় অসূয়া নাই, ঈর্ষাকটাক্ষপাত নাই, কেবলই গুণবিমুগ্ধ সরল হৃদয়ের ভাব। পরশুরাম যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য অবরোধ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এ কথা তিনি তখনও পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, জামদগ্ন্য কন্যান্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, 'নন্বেতএব শিষ্টাচার পদ্ধতেঃ প্রণেতারঃ। তৎ কথময়ং বিদ্বান্ প্রমাদ্যতি? ভবতু উপসর্পামি", 'ইহারাইত শিষ্টাচারের পথ প্রদর্শক, তবে ইনি আজ জানিয়া শুনিয়াই এমন ব্যবহার করিলেন কেন?" যাহাই হউক, আমি নিকটে যাই, এই বলিয়া তিনি বাহিরে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। সীতা দেখিলেন, বড় বিপদ, "সকল ক্ষত্রিয় মহারাক্ষস" পরশুরাম, আজি তাঁহার প্রাণের অধিক ধনকে বলি দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে; যাঁহার কঠোর কবলে, হয়ত তাঁহার পিতৃ পিতামহগণের অনেকে চর্ব্বিত হইয়াছেন, আজ আবার তিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ধনকে আকর্ষণ করিতেছেন; এখন ত আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই। তিনি প্রিয়তমকে পরশুরামের নিকট গমন করিতে নিবারণ করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন মুগ্ধা বালিকা বড় কাতর হইয়া, প্রিয়তমের ধনু আকর্ষণ করিয়া বলিল, "অজ্জাউত্তণদাব তুহেমহিংগন্তব্যং জাবতাদো নাগচ্ছদি" "আর্য্যপুত্র, তবে একটু দাঁড়াও, বাবা আসুন, তবে যাইও।" আমরা বলিয়াছিলাম যে, ভবভূতির প্রতিভা গুণে আমরা বিমুগ্ধ; সীতার এই কয়টী কথা, ভবভূতির সেই অলৌকিক প্রতিভার অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। সরলা বালিকা পর্য্যাকুল হৃদয়ে বলিতেছিল—"তবে একটু দাঁড়াও বাবা আসুন, তবে যাইও।" এমন সরল ভাষায় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে, বাস্তবিকই মহাকবির শক্তির প্রয়োজন। হরকার্ম্মুক ভঙ্গ করিয়া, রামচন্দ্র জগতে আপনার অতুল্যবীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, যিনি জগতের বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়, জনকরাজ ত বীরত্বে তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। কিন্তু সরলা সীতা হৃদয়ের উৎকণ্ঠায় তখন প্রিয়তমের সেই অনুপম বীরত্বের কথা

বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বাল্যাবধি পিতার উপর নির্ভর করিতেই তাঁহার অভ্যাস হইয়াছিল, স্বামীনির্ভরতা তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার শিক্ষা হয় নাই। তিনি সেই জন্যই আপনার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি অনুসারে বলিতেছিলেন 'বাবা আসুন তবে যাইও।' এই অন্য-নির্ভরতা মনুষ্যের হৃদয়ে স্বতন্ত্রতা অপেক্ষাও বলবতী। শিশু পিতার নিকট তিরস্কৃত হইলে, পিতাকে তর্জ্জনী সঙ্কেতে শাসাইয়া বলে "আচ্ছা মার সঙ্গে বলে দেব,এখন।" মাতার উপর নির্ভরই শিশুর ধর্ম্ম; সীতাও সেই জন্য রামচন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন, "বাবা আসুন তবে যাইও।"

রামচন্দ্র সীতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য বলিলেন। কিন্তু বালিকার হৃদয়ে,সে সান্ত্বনা বাক্য স্থান পাইল না। সীতা প্রিয়তমের ধনুক আকর্ষণ করিয়া রাখিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন—"তবে আমি ধনু রাখিয়াই যাই।" উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়া সীতা "তবে আমি তোমাকে যাইতে দিব না" বলিয়া, প্রিয়তমকে বল পূর্ব্বক নিবারণ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। সখিরা তাঁহার ভাব দেখিয়া একটু হাসিল, কিন্তু সীতার তখন লজ্জা করিবার সময় ছিলনা। দূর হইতে জামদগ্ন্যকে আগমন করিতে দেখিয়া, তিনি করপুটে বলিলেন, "আর্য্য পুত্র, আমাকে রক্ষা করুন্, আপনি বড় অসম সাহসী, আমাকে রক্ষা করুন্।" রামচন্দ্র পত্নীর কাতর ভাব দেখিয়া, একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন; কোথায় ক্ষত্রিয়বালিকার ন্যায় সীতা তাঁহার সহায়তা করিবেন, না বিপদপাতের পূর্ব্বেই তিনি কাঁদিয়া অধীরা। তিনি পত্নীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেনঃ—

মুনিরয় মথ বীর স্তাদৃশস্তৎ প্রিয়ংমে
বিরমতু পরিকম্পঃ কাতরে ক্ষত্রিয়াঽসি।
জগতি বিততকীর্ত্তে র্দর্প কণ্ডুল দোষ্ণঃ
পরিসরণসমর্থো রাঘবঃ ক্ষত্রিয়োঽহম্॥

এই আশ্বাস বাক্যে সীতার প্রতি একটু মধুর ভৎসনাও আছে। "একি সীতে, আজ তুমি এমন কাতরা হইতেছ কেন? তুমি ক্ষত্রিয় পত্নী, এ ভীতি কখন তোমার ভাল দেখায় না; তুমি কি জাননা যে,আমি ক্ষত্রিয়, রঘুবংশে আমার জন্ম।" এ ভর্ৎসনা রামেরই উপযুক্ত। যিনি ত্রিভুবনবিজয়ী দশাননের হন্তা, জামদগ্ন্যের সমক্ষে এই গর্ব্বমাত্র শূন্য মধুর ভর্ৎসনা, তাঁহারই উপযুক্ত। রাম ও সীতার এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, পরশুরাম এমন সময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পরশুরামের চরিত্র সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী কথা না বলিয়া রাখিলে,আমাদিগের এ প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমরা বলিয়াছি যে, ভবভূতি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিলেও, সকল সময়ে বাল্মিকীর অনুসরণ করেন নাই। প্রয়োজন মত নিজেরও প্রতিভার বিকাশের চেষ্টা করিয়াছেন; বীরচরিতে এই পরশুরামের চিত্র সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার নিজের সৃষ্টি।

বীরচরিতের পরশুরামে এবং রামায়ণবর্ণিত পরশুরামে কেবলই কার্য্যগত পার্থক্য নয়, চরিত্রগত ও বিভিন্নতা আছে। রামায়ণের পরশুরামে কেবলই তেজস্বীতা এবং কোপন স্বভাব; কিন্তু বীরচরিতের পরশুরামে তেজস্বীতা এবং কোপন স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাভিমান ও উদ্ধতভাব বড় প্রবল। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাতে

করুণা ও কোমলতারও অভাব নাই। তিনি বাহুবলে ও তপঃ প্রভাবে জগতের সকল ব্যক্তিকেই অবজ্ঞা করেন। জগতে তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি কেহ আছেন, অথবা থাকিতে পারেন, একথা তাঁহার নিকট অসহ্য। রামায়ণের পরশুরাম স্বয়ং মহাবীর হইলেও বুঝিয়াছিলেন যে, যিনি হর-শরাসন ভঙ্গ করিয়াছেন, তিনি স্বল্পবয়ঃ হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তি নহেন। কিন্তু বীরচরিতের পরশুরাম, রামচন্দ্রকে অহঙ্কারে একটী সামান্য বালক বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। আমরা রামায়ণ ও বীরচরিত, এই উভয় গ্রন্থ হইতেই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, আমাদিগের কথা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিব। আমরা বলিয়াছি যে, রামায়ণের পরশুরাম, রামচন্দ্রকে সামান্য বালক বলিয়া, অবজ্ঞা করিতে পারেন্ নাই। রামচন্দ্রকে তিনি যে সকল কথায় সম্বোধন করিয়াছেন, তাহার ভাষা বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর হইলেও, তাহার প্রতি বর্ণে রামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকটিত। হর-শরাসন ভঙ্গরূপ যে অলৌকিক কার্য্যে রামচন্দ্র জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, পরশুরামও তজ্জন্য বিস্মিত, কিন্তু বিস্মিত বলিয়া রামচন্দ্রের প্রতি আস্থাশূন্য নহেন। শত্রু হইলেও তাঁহার প্রতি কেমন সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক; বয়কনিষ্ঠেরও সদ্‌গুণের কেমন আদর করা কর্ত্তব্য, এ সকলই যেন তাঁহার সম্বোধন বাক্যে বর্ত্তমান। কিন্তু বীরচরিতের পরশুরামে কেবলই পরুষভাব, কেবলই আত্মাভিমান। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

পুষ্পময়ী।

(পুষ্পময়ী নাম্নী কোন খ্রীষ্টান বালিকার মৃত্যুতে তাহার জননী)

কোথা যাস্ পুষ্পময়ি? আয় মা আমার!
যাস্‌নে যাস্‌নে ছেড়ে
দুখিনীর আছে কেরে?
ভুলিলি কি ভালবাসা কাঙ্গালিনী মার?
কোথা যাস্ পুষ্পময়ি? আয় মা আমার!

১

হৃদয়ের বৃন্ত শূন্য করিয়ে কোথায়—
মায়েরে না ব'লে ক'য়ে
পাষাণের মত হয়ে,
কোমল কুসুম পুষ্প!—হায়! হায়! হায়!
করিয়ে হৃদয় শূন্য যাস্ রে কোথায়?

২

যাস্‌নে যাস্‌নে. ফিরে আয় মা আমার,
আজ রে প্রাণের 'পুষি'
করিস্ যা তোর খুসি;
এত যে বারণ তোরে করি বার বার?
আগে ত অবাধ্য তুই ছিলি না আমার!

৩

অই যে সেজেছে মেঘ দেখ্ 'পুষি' চেয়ে,
হিম জল লেগে গায়,
কফ্ কাসী হবে তায়,
যাস্‌নে বাহিরে তুই দুখিনীর মেয়ে!
অই যে সেজেছে মেঘ দেখ্ 'পুষি' চেয়ে!

৪

অই দেখ্ মেঘে মেঘে বিজলী খেলায়,
এখনি পড়িবে বাজ,
বড়ই দুর্যোগ আজ,
দেখ্ দেখি ছেলে পিলে কে বাহিরে যায়?
ভয় পাবি পুষ্পময়ি! আয় কোলে আয়!

৫

যাস্‌নে সেখানে তুই, আয় মা আমার,
তোর আরো আট ভাই,

গেছে সে বিষম ঠাঁই,
কেহই ফিরিয়ে তারা আসিল না আর,
তাই তোরে যেতে 'পুষি' দিব না এবার!

৬

সেখানে মানুষ গেলে ভুলে যায় সব,
কি জানি সে মাঠে আছে,
যাহারা সেখানে গেছে,
কিছুই থাকে না মনে আত্মীয় বান্ধব,
কি আছে সে শূন্যমাঠে, ভোলে যে মানব?

৭

শুনেছি সেখানে নাকি ঘর বাড়ী নাই,
শুনেছি সে শূন্য মাঠে
দিনে যেতে প্রাণ ফাটে,
বড়ই নির্জ্জন সেই সমাধির ঠাঁই,
যাস্‌নেরে সন্ধ্যাকালে—একা যেতে নাই!

৮

কি ক'রে কফিনে তুই থাকিবিবে শু'য়ে?
উপরে বাহিরে ঝড়,
শিলা বৃষ্টি বহুতর,
একাকী কফিনে তোরে আসিবেরে থু'য়ে,
কি করিয়া শূন্য মাঠে থাকিবিরে শু'য়ে!

৯

একিরে সত্যই 'পুষি' ছাড়িয়া চলিলি?
করুণা মমতা যত,
সকলি জন্মের মত,
কেমন পাষাণ প্রাণে মায়েরে ভুলিলি?
কি করিয়া দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিলি?

১০

রাখ গো কফিন তুলে দেখি একবার,
দেখি এই জন্ম শেষ,
মায়ের সুন্দর বেশ,
দেখি অই পুষ্পময়ি, বালিকা আমার!
দেখি আজ জন্ম শেষ—দেখিব না আর!

১১

এই যে রয়েছে পুষ্প মুদিয়া নয়ন,
পূর্ণিমার শশধর,
যেন কাল জলধর,
চুরি করি রাখিয়াছে করি আচ্ছাদন!
এই যে কফিনে পুষ্প মুদিয়া নয়ন!

১২

পুষ্পময়ি! মা আমার! নয়ন মেলিয়া,
দেখ এক বার চেয়ে,
দেখ রে পাষাণী মেয়ে,
বুকের পাষাণ খানি সরাইয়া দিয়া,
দেখ তোর অভাগিনী মায়েরে চাহিয়া!

১৩

হায়, হায়! সহেনারে কি বলিব আর,
স্মরিতে ফাটেরে হিয়া,
বুঝাইব কি যে দিয়া,
'মা' বলে মায়েরে 'পুষি' ডাক একবার,
হয়ে নব পুত্রবতী,
হায় বিধি এদুর্গতি,
লিখেছিল কি যে পাপে কপালে আমার!
মা-ডাকের কাঙ্গালিনী হইনু এবার!

১৪

থাকিবিনা যদি 'পুষি' যা তবে সেখানে,
যা তবে সেখানে তুই,
কথা শুনে গোটা দুই,
বলিবি যাইয়া তোর ভাইয়েদের সনে,
"মা দিছে পাঠায়ে ভাই
চল সবে চল যাই,
তোমাদেরে নিয়ে যাব মায়ের সেখানে!
যাবে ব'লে চ'লে এ'লে,
আর না ফিরিয়ে গেলে,
দুখিনী জননী তাই কেঁদে মরে প্রাণে!
মা দিছে পাঠায়ে চল মায়ের সেখানে।"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

আর্য্যধর্ম্ম সমন্বয়।

শিশুর জীবন লীলাময়, যুবার জীবন প্রমোদপূর্ণ, প্রৌঢ়ের জীবন চিন্তাময়। শিশু নপুংসক; যুবা রমণী, প্রৌঢ়ই কেবল পুরুষত্ব-প্রধান। সমাজের প্রথমাবস্থা বালকোচিত ক্রীড়া, কলহ ও কোলাহলময়, যৌবনে আনন্দ আশা উৎসাহ প্রেম কবিত্ব সৃষ্টি সঞ্চয় ও আয়োজন; সমাজের পূর্ণাবস্থায় কোথায় কি রাখিতে হইবে? কি বসিবে কি উঠিবে, গৃহ সজ্জা পারিপাট্য, অতীত ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। বাল্যের অতীত নাই, যৌবনের অতীত অকিঞ্চিৎকর, প্রৌঢ়াবস্থার অতীত উজ্জ্বল, ঘটনা পূর্ণ, শিক্ষাপ্রদ; যে শিখিতে জানে সে তাহা হইতে ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচন করিয়া লয়। যৌবন যাহার কুয়াসাপূর্ণ, ক্ষীণ, মৃতপ্রায়, ছায়াময়, অন্ধকারবাসী প্রেতবৎ, পরিচীনতা তাহার নাই, থাকিলেও নাই। যাহার অতীত নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই, সে ক্ষণপ্রাণী, যে অতীত উপেক্ষা করে সে কুলাঙ্গার, নির্ব্বোধ, পামর; যে অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সমন্বয় করিতে পারে, সেই মনীষী।

ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা ক্রীড়াময়,—প্রাণশূন্য দেহ, ফলশূন্য কার্য্য; জীবনের সকলি আছে জীবন নাই, চেষ্টা অসাধারণ আছে, কুর্দ্দন আছে, চলন আছে কিন্তু কার্য্য নাই, ধরি ধরি ধরিতে পারি না, সেইত ক্রীড়া। আলোকে আঁধার, চন্দ্রমায় ছায়া, গাম্ভীর্য্যে তরলতা, স্রোতে আবর্ত্ত, সেইত ক্রীড়া, সকলই আছে অথচ কিছুই নাই, আরম্ভ মাত্র পরিণাম নাই; সতেজ নীল নিবিড় অঙ্কুর মাত্র, সেই ত বাল্যকাল। কখন "সূর্য্য মামা" বলি, আঁচল পাতিয়া ধরি, মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ছুটিয়া বেড়াই, আবার কখন "জবা কুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং" বলিয়া সরলতার মধ্যে মধ্যে গাম্ভীর্য্যের আবর্ত্ত তুলিয়া মামাকে মহত্ত্ব দিয়া সাবেক ভালবাসায় নূতন ঘটা মিশাইয়া ভয়ে ভয়ে বলাইয়া লয় তুমি কি আমাদের সেই আপনার? প্রত্যেক পদার্থই ভালবাসি, আদর করি, বুকে পূরি। আবার প্রত্যেককেই সন্দেহ করি সে যেন সে নয়, সে যেন পর। এই গলাগলি ভাব হাতে হাতে চোখে চোখে; আবার এই ঝগড়া, সন্দেহ, বিচ্ছেদ। আলো আঁধার জড়িত, [illegible] জড়িত জড়িত, শান্তি বিবাদ জড়িত, প্রাধ[illegible]াতঙ্ক জড়িত, সেই বালধর্ম্ম। বালকের ক্রী[illegible] যৌবনের অঙ্কুর।

যৌবনে চি[illegible] নাই, কার্য্য; আশঙ্কা নাই, আশা; ক্লান্তি নাই, উৎসাহ। ভয়ের কুয়াসা উৎসাহের উদ্যমতায় তিরোধান করে। এই আনন্দ কানন, অশোক কুঞ্জ, অচ্ছোদ সরোবর। সদা হাস্যরোল করতালি, কাংস্য বাদ্য, শঙ্খধ্বনি জয়নাদ। যাগ যজ্ঞে সংসার পরিপূর্ণ, হৃদয় ভাবপূর্ণ, গৃহ সন্তানপূর্ণ, সমাজ যজ্ঞপূর্ণ, এইত বৈদিক কাল। উত্তর কুরুর প্রাঙ্গনে আর্য্য পিতামহ বাল্যলীলা উদ্যাপন করিয়াছিলেন। যাহা ধর্ম্মও নহে অধর্ম্মও নহে, আর্য্য ইতিহাসের তাহা কুরুযুগ, যাহা সুরও নহে, অসুরও নহে, দেবও নহে, দানবও নহে, সে উত্তর কুরুর আর্য্য দেবতা।

পঞ্চনদ বৈদিক যজ্ঞে পরিপূরিত, সাম রবে প্রতিধ্বনিত, আর্য্য ইতিহাসের প্রমোদ কানন। একে ইহা আর্য্য সমাজের যৌবন কাল, তাহে ভারতে আর্য্যসন্তান বিজয়ী, নিত্যই বলিদান, নিত্যই যজ্ঞ, নিত্যই হোম নিমন্ত্রণ, কলরব, প্রমোদ বাসর। যজ্ঞের পর নূতন যজ্ঞ নিত্য উদ্ভাবিত; অনার্য্য প্রজা যত পেষিত,ভীত,আর্য্য সন্তান ততই প্রফুল্ল, উৎসাহিত। এ ধর্ম্ম যৌবনের ধর্ম্ম, বিজয়ীর ধর্ম্ম, মোহের ধর্ম্ম, বাহিরের ধর্ম্ম। ইহা কর্ম্ম কাণ্ড প্রধান। এ সময় আর্য্যসন্তান বাহ্য প্রকৃতি চালিত, বাহ্য প্রকৃতি মুগ্ধ। বাহ্য প্রকৃতি চিন্তাশূন্য, এ ধর্ম্ম চিন্তাশূন্য। বাহ্য প্রকৃতি বিজয়ীর সহায়, আর্য্য সন্তান তাহার সেবা করেন, আরাধনা করেন, গৌরব করেন। বাহ্য প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়ের অধিকারিনী। বৈদিক ধর্ম্ম বাহ্য প্রকৃতির পদানত।

অনার্য্য-পীড়িত প্রজা বাহ্য প্রকৃতি প্রপীড়িত। প্রফুল্লতার তিনি অধিকারী নহেন, ভীষণতার অভিঘাতের তাড়নার পাত্র। অনার্য্য সন্তান বাহ্য প্রকৃতির নিকট চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, ইন্দ্রিয় নিবৃত্ত করিলেন। বাহ্য প্রকৃতি পরাস্ত হইল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি অন্তঃপ্রকৃতির বিশালতর রাজ্যের সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইলেন, তিনি যাহা দেখিলেন বাহিরে তাহার তুলনা নাই, বাহ্য প্রকৃতি উপেক্ষিত হইল, অন্তঃপ্রকৃতি গৌরবান্বিত হইল। চিন্তার কঠোর সৌন্দর্য্য, পার্ব্বতীয় ভয়জড়িত মধুরতা, ভাবের কুসুম কোমল, বায়ু পেষিত, আতপ সন্তাপিত প্রাণশূন্য নারী সৌন্দর্য্য পরাস্ত করিল। আবার পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই পুরুষত্ব-প্রধান, পরাস্ত প্রকৃতি বীর ধর্ম্মের নাম যোগ ধর্ম্ম। প্রকৃতি চপলা, ভীরু, প্রমদা, মানিনী ও কোপনা, পুরুষ অটল, সাহসী, বিষণ্ণ ও নিবৃত্তি-পরায়ণ। প্রকৃতির বিড়ম্বনা অসহ্য হইলে লোকে পুরুষার্থের মহত্ত্ব অনুভব করে। ভগবান পাতঞ্জলি এই পুরুষকারের প্রচারক। কপিলদেব প্রকৃতির দাস, পাতঞ্জলি পুরুষ সহচর, সাঙ্খ্যসূত্রে প্রকৃতি প্রধান, পাতঞ্জলি প্রকৃতি পুরুষের সমতা বিধান করেন, শাক্য সিংহের প্রকৃতি পুরুষ সমক্ষে ব্রীড়াবতী, মুদিত চক্ষু, গুণ্ঠন হস্তা। সাঙ্খ্যসূত্র যোগসূত্রের পূর্ব্বতন। এই যোগ সূত্র আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের অগ্রগামী। পণ্ডিতপ্রবর শাক্যসিংহ পাতঞ্জলির শিষ্য, অনার্য্যগণের অগ্রণী, ভারতে পুরুষ ধর্ম্মের প্রচারক। শঙ্করাচার্য্য, শাক্য শিষ্য, বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম বিপ্লবের ধর্ম্ম, অনার্য্যের ধর্ম্ম, পুরুষের ধর্ম্ম, চিন্তার ধর্ম্ম। ভাব, কল্পনা, কবিত্ব, কোমলতা বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম উপনিবেশিকের ধর্ম্ম নহে, অনৈতিহাসিকের ধর্ম্ম নহে, ক্ষণপ্রাণ ধর্ম্ম নহে; ভারত ইতিহাসের ক্রম বিকাশে আর্য্য অনার্য্য প্রকৃতির সংমিশ্রণে, যৌবনের পরিণামে, চিন্তাশীল পরিপক্কতার অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি। বৈদিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-পরায়ণ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিবৃত্তিপরায়ণ। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি শ্মশান বৈরাগ্যের পূর্ব্ব সোপান। পক্ষান্তরে যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম শঙ্কর বা কুমারিল বা অন্য কাহা কর্ত্তৃক ভারত নির্ব্বাসিত বা মৃত ধর্ম্ম বলিয়া অনুমান করেন, তাঁহারা শাস্ত্রে অপণ্ডিত। যাহা হইতে পারে তাহা থাকিতে পারে, যাহা হয় তাহা যায় না, যাহা ছিল তাহা আছে, বিবর্ত্তবাদের এই মহা সূত্র তাঁহা-

দিগের অপরিজ্ঞাত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও ভারত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বৈদিক ধর্ম্ম যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল, কর্ম্মমার্গ যেমন জ্ঞানমার্গে পৌঁছিয়াছিল, তেমনি বৌদ্ধধর্ম্মও বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। বিবর্ত্তবাদের মূলসূত্র এই, ভারত ইতিহাসের সাক্ষ্যও এই। বৈদিক ধর্ম্ম, যজ্ঞ, হোম, আনন্দের ধর্ম্ম, যোগধর্ম্ম ধ্যান ধারণা সমাধি বিষাদের মূল ধর্ম্ম। বৈদিক ধর্ম্মে একমাত্র কর্ত্তব্য যজ্ঞসাধন, বৌদ্ধধর্ম্মে একমাত্র কর্ত্তব্য চিত্তশুদ্ধি। বৈদিক ধর্ম্মে দুইটী আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য, যোগ ধর্ম্মে সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থের বিধান হয়। বৈদিক ধর্ম্মে জাতিকাল স্থানও পাত্র ও অবস্থানুসারে কৃচ্ছ্র সাধনীয়, যোগ ধর্ম্মানুসারে অহিংসা সত্য অথণ্ডেয় ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বজন সেবিতব্য। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম উভয়ের সমন্বয় করিয়াছে। ইহাতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমপ্রভাব। ভগবৎগীতা এই ধর্ম্মের শাস্ত্র। গীতাকার শাক্য সিংহের উত্তর পুরুষ।

কাল তোমার যৌবনের কবিত্ব উৎসাহ দেখিয়াই আজি তুমি চিন্তাকাতর,বিষাদজড়িত,চিন্তিত নয়ন। একদিন তোমার উদ্দামতা, অন্যদিনে তোমার শ্রান্তি, ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ। আজ চিন্তা শুষ্ক কঠোরতা দেখিয়া কে অস্বীকার করিবে, তুমি কালিকার হাস্যময় সেজন নহ? তুমি সেই তুমি,সময়ে প্রকৃতি অঙ্কুরকে লতায়, লতাকে ফলরূপে পরিণত করে। সময়ে প্রকৃতি তোমার ভাবকে অপসারিত করিয়া চিন্তাকে স্থান দিয়াছে। সময়ে প্রকৃতি ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছিল। সময়ে প্রকৃতি বৈদিক ধর্ম্মকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিবর্ত্তিত করিয়াছিল। একটী অপরটীর অবশ্যম্ভাবী ফল। অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খলের বন্ধনী, সেই শৃঙ্খলের তৃতীয় বন্ধনী বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম, চতুর্থ বন্ধনী তৃতীয়ের পরস্তন হইবে। তাহা ঘটিবে ইহা যেমন নিশ্চয়, তাহা তৃতীয়ের পরিণামফল ইহাও তেমনি নিশ্চয়। "পুনর্জ্জীবন" "পুনরুদ্ধার" ইত্যাদি মোহের স্বপ্ন। নবজীবন, নবজীবনও বটে, পুরাতনও বটে, ঠিক পুরাতন নহে, ঠিক নূতনও নহে। যখন সে সন্তান জন্মিবে, বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিবে, তাহার প্রকৃতিতে মাতৃ-প্রকৃতি লক্ষিত হইবে, সে মায়ের কন্যা,মায়ের মা মাতামহী নহে। হিন্দুধর্ম্মের "পুনরুদ্ধার" বাতুলের প্রলাপ। জাহ্নবী প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া হিমালয় কূটস্থ করা যেমন সম্ভব, বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার তেমনি সম্ভব। ক্রম বিকাশে কোথায় একটীর আরম্ভ অপরটীর অন্ত, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বৈদিক ধর্ম্ম উপেক্ষা করিলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুঝা যেমন দুষ্কর, কখন বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝা তেমনি দুষ্কর। যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী গুলি পর্ব্বতে ঝির ঝির করিতেছিল, শাক্য সিংহ তাহাদিগকে একত্র করিয়া একটী মহানদীতে পরিণত করিয়াছিলেন মাত্র। বস্তুত খ্রীষ্টের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের ও শাক্যের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছিল। তেমনি আবার কখন কাহা কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, বলা যায় না। আবার নিত্য যে সহস্র প্রকার ঘটনা ঘটিতেছে, কোনটী উপলক্ষ করিয়া দুর্লক্ষ্য সূত্রে কত দিনে কি নূতন মহাধর্ম্মের উৎপত্তির সূচনা হইতেছে, কে বলিতে পারে?

বৈদিক ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম অপেক্ষা এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট, এখানে তাহার কিছুই আলোচনা করা হইল না। ক্রমোন্নতির ন্যায় ক্রমাবনতি বিবর্ত্তন নিয়ম। সুতরাং সময়ে পরস্তন হইলেই যে গুণে উন্নততর হইবে, এমন আশা করা যায় না। অন্যান্য প্রকৃতির ন্যায় ধর্ম্ম প্রকৃতি ক্রম বিকাশ সিদ্ধ, কাল পাত্র ও অবস্থা সাপেক্ষ, কেহই সম্পূর্ণ নূতন বা বিচ্ছিন্ন নহে, সকলের সহিত সকলের সংযোগ আছে; ইহাই মাত্র আলোচনা করা হইল। স্থানভেদে ধর্ম্মভেদ হইবেই হইবে। কালভেদে ধর্ম্মভেদ হইবেই হইবে। য়ুরোপের ধর্ম্ম আসিয়ার ধর্ম্ম হইতে পারে না; কলিকাতা প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত ভবানীপুর প্রচলিত ধর্ম্মের পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে। তেমতি সত্যযুগের ধর্ম্মও দ্বাপরের ধর্ম্ম এক হইতে পারে না। পূর্ব্বের ধর্ম্ম পরে থাকেনা, পরের ধর্ম্মও পূর্ব্বে যাইতে পারে না। জগদ্ব্যাপী এক ধর্ম্ম, জগদ্ব্যাপী এক ভাষা, একাচার, একজাতি, এসব কবির কল্পনা মাত্র।

কোন এক বিষয়ে দুই জনে এক মত হইতে পারে না। প্রত্যেকের হাতে পাঁচ আঙ্গুল বটে, কিন্তু কাহারও একটী আঙ্গুল অন্যের আঙ্গুলের সমান নহে। একই বৃক্ষে একই শাখার একই পল্লবের দুইটী পত্র এক রূপ নহে। দেহের ন্যায় সকলেরই মন আছে সত্য, কিন্তু কোন দুই জনের মন একরূপ নহে। মনের কোন একটী বৃত্তি দুই জনের একরূপ নহে। তখন কোন এক বিষয়ে দুই জনের এক মত হয় না, ইহা আশ্চর্য্য নহে। একই শব্দ দুই জনে একরূপ শুনে না, একই অর্থ দুইজনে একরূপ বুঝেনা। যেখানে সাম্য প্রভৃতি অসম্ভব, সেখানে ঘটনার সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

ভবভূতি।

বীরচরিত—পরশুরাম।

রামায়ণ ও বীরচরিত হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই, বোধ হয় সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, বাল্মীকির ও ভবভূতির পরশুরামের পার্থক্য কত সুস্পষ্ট।

"রাম! দাশরথে! বীর,বীর্য্যং তেশ্রূয়তেহ দ্ভুতম্।
ধনুঃ কিলত্বয়া ভগ্নং দিব্যং যৎ তচ্ছ্রুতং ময়া॥
অদ্ভুতং তৎকৃতং রাম! ধনুষো ভেদনং ত্বয়া।
শ্রুত্বৈবাহমনুপ্রাপ্ত আদায়েদং মহদ্ধনুঃ॥
অনেন ধনুষা রাম! ময়া কৃৎস্নামহীজিতা।
পূরয়েদমপিক্ষিপ্রং বলং দর্শয় রাঘব॥
তদহং তেবলং দৃষ্ট্বা ধনুষোপ্যস্য পূরণে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্য্যশ্লাঘ্য মনুত্তমম্॥
ইমে দ্বে ধনুষীরাম! দিব্যে লোকাভিপূজিতে।
দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্ব কর্ম্মণা।
তয়োরেকং এ্যম্বকায় দত্তং রাম! যুযুৎসবে।
ত্রিপুরং জঘ্নুষে দেবৈর্ভগ্নং কাকুৎস্থযৎ ত্বয়া।
ইদং দ্বিতীয়ং দুর্দ্ধর্ষং বিষ্ণবে যদ্দদুঃ সুরাঃ।
দ্রব্য সার বল প্রাণ প্রমাণাকৃতিভিঃ সমম্॥
তদিদং বৈষ্ণবং রাম পিতৃ পৈতামহং মম।
ক্ষত্র ধর্ম্ম মুপাশ্রিত্য গৃহাণ ধনুরুত্তমম্।
যোজয়স্ব গৃহীত্বাচ শরেণ রঘু নন্দন।
যদি শক্তোহসি সংধাতুং যুদ্ধং দাস্যামিতেততঃ॥" রামায়ণ।

আমরা বলিয়াছি যে, রামায়ণের পরশুরামের বাক্যের প্রতি বর্ণেই, রামচন্দ্রের

প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকটিত। "বীর রামচন্দ্র, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা বড় অদ্ভুত। তোমার এই অদ্ভুত কার্য্য শুনিয়া, আমি আজ তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। দেখ রাম, আমার হাতে এই যে ধনু দেখিতে পাইতেছ, এই ধনুতে একবার আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলাম। যদি তুমি ইহাতে গুণ দিতে পার, তবেই আমি তোমার বল বুঝিব। এবং তাহা হইলেই জানিব যে,দ্বন্দযুদ্ধে তুমি আমার উপযুক্ত বট।"

এ কথায় অহঙ্কার নাই, উদ্ধতভাব নাই, অথচ তাহা অর্থ পূর্ণ এবং সাগর তরঙ্গের ন্যায় গম্ভীরনাদী। কিন্তু বীর চরিতের পরশুরামের কথাগুলি,কেবলই দাম্ভিকতার নিদর্শন। তিনি ভাবিতেছিলেন ;—

"অহো দুরাত্মনঃ ক্ষত্রিয় বটোরণাত্মজ্ঞতা।
ন এস্তং যদি নামভূতকরুণা সন্তান শান্তাত্মন
স্তেন ব্যাকৃজতা ধনুর্ভগবতো দেবাত্তবানী পতেঃ।
তৎপুত্রস্তু মদান্ধতারকবধাদ্বিশ্বস্ত দত্তোৎসবঃ
স্কন্দঃ স্কন্দইব প্রিয়োহমথবা শিষ্যঃ কথংন শ্রুতঃ॥"

"এই দুরাত্মা ক্ষত্রিয় বটুরত দেখিতে পাইতেছি, বড় অনাত্মজ্ঞতা। করুণাপরবশ বলিয়া, যদি মহাদেবের কথাই সে বিস্মৃত হইয়া থাকে, কিন্তু আমার কথা কি তাহার একবার মনে পড়িল না? না এ দোষ তাহার নয়; আমি যে এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলাম, এদোষ আমারই।" বীরত্বের প্রশংসা দূরে থাকুক, প্রথমেই দুরাত্মা নামে সম্বোধন। আমরা সেই জন্যই বলিয়াছি যে, বীরচরিতের পরশুরাম, ভবভূতির নিজের সৃষ্টি এবং রামায়ণ হইতে সম্পূর্ণ রূপ বিভিন্ন।

কিন্তু ভবভূতির পরশুরাম, রামায়ণ হইতে বিভিন্ন হইলেও অতিরঞ্জিত অথবা কেবলই কল্পনা প্রসূত নয়। তিনি পরশুরামে আত্মাভিমানের সঙ্গে তেজ, ক্রোধন স্বভাবের সঙ্গে অনুকম্পার সমাবেশ করিলেও এরূপ সুন্দরভাবে তাঁহাদিগের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন যে, তাহার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে আমরা প্রাকরণিক বিষয় হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এইবার আমাদিগের প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব।

রামচন্দ্র ও জামদগ্ন্য পরস্পর পরস্পরকে সন্দর্শন করিলেন। পরস্পরের দর্পনিকষ ভুবনের দুই অদ্বিতীয় বীর, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে একত্রিত হইলেন। পরস্পরকে দেখিয়া, দুই জনের মনে দুইটী স্বতন্ত্র ভাবের উদয় হইল। এক জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি, অন্যের হৃদয়ে বিস্ময় এবং অনুরাগ; রামচন্দ্র ভাবিতেছিলেনঃ—

"অকলিত[illegible]স্তজোবীর্য্য প্রথিম্নি যশোনিধা।
ববিতথমদা[illegible]ত রোষান্মুনাবভিধাবতি।
অভিনবধনুর্বিদ্যা দর্প ক্ষমায় চ কর্ম্মণে
স্ফুরতি রভসাৎ পাণিঃ পাদোপ্ম সংগ্রহণায়॥"

জামদগ্ন্য ভাবিতেছিলেনঃ—

"সাধুরাজপুত্র! সাধু সত্য মৈক্ষাকঃ খল্বসি।
অন্বিষ্যতঃ প্রমথনায় মমাপি দর্পা—
দাত্মান মর্পয়সি জাতি বিশুদ্ধ সত্বঃ।
গন্ধদ্বিপেন্দ্রকলভঃ করিকুম্ভ কুট
কুট্টাকপাণি কুলিশস্য যথা মৃগারেঃ॥"

কিন্তু অনুরাগ জামদগ্ন্যের প্রকৃতি নয়। রামচন্দ্রের সাহসের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার স্বাভাবিক অহমিকা আসিয়া, তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতেছিল। তিনি রামচন্দ্রের মোহিনী মূর্ত্তিতে বিমোহিত হইয়া বলিলেন;

"রমণীয়ঃ ক্ষত্রিয়কুমারঃ আসীৎ।"

"চঞ্চৎপঞ্চ শিখণ্ডমণ্ডলমসৌ মুগ্ধ প্রগল্‌ভশিশুঃ
গম্ভীরঞ্চ মনোহরঞ্চ সহজ শ্রীলক্ষ্মরূপং দধৎ।
দ্রাগ্‌দৃষ্টোঽপি হরত্যয়ং মম মনঃ সৌন্দর্য্য সারশ্রিয়া
হন্তব্যস্ত তথাপি নাম ধিগহো বীরব্রত ক্রূরতাম্‌।"

পরশুরাম ভাবিতেছিলেন, রামচন্দ্রের মূর্ত্তি বড় কমনীয়; কিন্তু বীরব্রত বড়ই কর্কশ, এমন সুন্দর বালককেও বধ করিতে হইবে। যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, যাঁহার পরশু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনেরও অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিল, জগতে যাঁহার তুল্য প্রতিদ্বন্দী কেহ ছিলনা, তাঁহার হৃদয়ে যে স্বভাবত এইরূপ আত্মাভিমান এবং অবজ্ঞাপূর্ণচিন্তা আসিবে, তাহাতে বিচিত্রতা, কি? রামচন্দ্র যে তাঁহার বধ্য, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ [illegible] ছিল না। কিন্তু রামচন্দ্রের চিত্তবৃত্তি [illegible]র ব্যাপার। পরশুরাম তাঁহার নিকট [illegible] প্রতিদ্বন্দী যোদ্ধা মাত্র নহেন, তিনি [illegible]র নিকট ইতিহাস অথবা পুরাণবর্ণিত মহাপুরুষ। বাল্যাবধিই যাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ এবং অদ্ভুত গুণ নিচয় তিনি আত্মীয়গণের মুখে এবং কবিগণের গাথায় শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই মহাপুরুষ আজি সশরীরে তাঁহার সমীপে উপস্থিত। বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় আপ্লবিত হইল। তিনি বিমুগ্ধনেত্রে পরশুরামের জটাকলাপকুটিল মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। সংসার জ্ঞান শূন্য শিশু, যেমন পতনোন্মুখ ব্যাঘ্রের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, তাহার দিকে চাহিয়া থাকে; নির্ভয়ে এবং নিরুদ্বেগে যেমন তাহার বিশাল দংষ্ট্রা এবং তীক্ষ্ণনখরের প্রশংসা করে, রামচন্দ্র তেমনই অনুদ্বিগ্ন চিত্তে পরশুরামের পানে চাহিয়া রহিলেন তাঁহার ভাব দেখিয়া পরশুরাম কিছু বিস্মিত হইলেন। জগতে কেহ কখনও তেমন করিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে সাহস করে নাই। তবে বালকের হৃদয়ে এ সাহস কোথা হইতে আসিল?

তিনি রামচন্দ্রের সাহস পরীক্ষা করিবার জন্য স্বীয় করস্থিত পরশু তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "রাম! দাশরথে সএবায় আচার্য্য পাদানাং প্রিয়ঃ পরশুঃ" কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অপর কেহ হইলে হয়ত পরশুরামের সেই "ক্ষত্রিয় কালরাত্রি" পরশুর নাম শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইত। তাঁহার পরশুর নাম শুনিলে, কবে কোন ক্ষত্রিয় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কিন্তু রামচন্দ্র সকল অবস্থাতেই অটল। "উত্তাল তাড়কোৎপাত" দর্শনেও তিনি অকম্পিত; আজি পরশুরামের কুঠার দর্শনেও তাঁহার স্থৈর্য্যের ব্যতিক্রম নাই। তিনি সেই দেবদত্ত কুঠারের এবং সঙ্গে সঙ্গে কুঠারধারীরও প্রশংসা করিলেন; সে প্রশংসা তোষামোদ নহে, প্রকৃত কথা মাত্র; অথচ তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভয় অথবা বিস্ময়ের নিদর্শন ছিল না। প্রশংসা-প্রিয় জামদগ্ন্য রামচন্দ্রের সেই মধুর কথায় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তিনি একেবারে বিগলিত প্রায় হইয়াই বলিলেন, 'রাম, তুমি আমার হৃদয়ঙ্গম, তোমাকে বুকে রাখিবার জন্য মনে মনে বড়ই সাধ হইতেছে।" যিনি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন; "রমণীয়ঃ ক্ষত্রিয় কুমারঃ আসীৎ" পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন,—

রাম, সর্ব্বথৈব হৃদয়ঙ্গমোঽসিমে।

সত্যং ব্রবীমি পরিরব্ধু মিবেচ্ছতি ত্বাম্।”

বড় কৌতুকের কথা। কিন্তু জগতে যদি মধুর কথার সঙ্গে, মধুর হৃদয়ের যোগ থাকে, তবে তাহাতে বশীভূত না হয় কে? গ্লাডষ্টোন বল অথবা ব্রাইট বল, সকলেরই আধিপত্য মধুর হৃদয়ের সঙ্গে মধুর ভাষার যোগ আছে বলিয়া। যাহারা পেরনিকে হত্যা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারাই তাঁহার মধুর কথায় মোহিত হইয়া, তাঁহার পদানত হইল। তবে জামদগ্ন্য যে রামচন্দ্রের কথায় বিমুগ্ধ হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যাঁহারা আততায়ীভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বহুদিনের পরিচিত সুহৃদের ন্যায় বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কবির উদ্দেশ্য বুঝি ব্যর্থ হইল। অপর কেহ হইলে, এতদূর আসিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইত না। কিন্তু ভবভূতি অতিআশ্চর্য্যকৌশলে আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিয়া লইলেন। এবং পাঠকগণের সমক্ষে রামচন্দ্রের চরিত্র,আরও উজ্জ্বলতর বর্ণে প্রতিভাত হইল।

পরশুরাম রামচন্দ্রের গুণে বিমুগ্ধ হইলেও রামচন্দ্র অবিচলিত; পর্ব্বতের ন্যায় নিষ্কম্প। নিন্দা অথবা প্রশংসা, আলিঙ্গন অথবা প্রত্যাখ্যান, তাঁহার হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। তিনি পূর্ব্বে পরশুরামের গর্ব্বিত বাক্যে বিকম্পিত হন্ নাই; এক্ষণে তাঁহার সস্নেহ সম্ভাষণ শুনিয়া অতি বিনীতভাবে অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “ভগবন্ঃ পরিরম্ভনমিতি প্রস্তুতপ্রতীপ মেতৎ” ভগবান্, আজ, আমরা যে কার্য্যে উদ্যত, আলিঙ্গন ত তাহার অনুকূল নয়।” রামচন্দ্রের উত্তরে পরশুরাম স্তম্ভিত হইলেন। ক্ষত্রিয়ের নিকট তিনি এমন কথার প্রত্যাশা করেন নাই। তি কর্ম্ম করিয়াছে, এ ন্য কুমারের কি দর্প-জড়িত া তাহাকে' ির! অথবা বুঝি এ কেবলই স আমি আ নয়;—

“ত্রাতুং লোকানি দিতে নি কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রোধর্ম্মঃ শ্রিত ইব ষ, রাম কাষস্ত গুপ্ত্যৈ।
সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানাম্
আবির্ভূয় স্থিতইব জগৎপুণ্যনির্ম্মাণরাশিঃ॥”

তিনি মনে মনে রামচন্দ্রের সাহসের প্রশংসা করিলেন; কিন্তু কেবলই বাঙ্মাত্র সাহসে পরশুরাম পরিতৃপ্ত হইবার লোক নহেন। রামের যে মুখে এমন নির্ভীকতা, তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন; কিন্তু নববিবাহিতা সীতার সমক্ষে সে পরীক্ষা গ্রহণ অসম্ভব। এজন্য তিনি সীতার সখীগণকে বলিলেন “তোমরা এই নববধূটীকে অভ্যন্তরে লইয়া যাও।” রামচন্দ্রও ভাবিতেছিলেন েতাহা হইলেই ভাল হয়। এমন সময় নেপথ্যে শব্দ হইল যে “রাজা জনক জামাতার বিপদ শুনিয়া ধনুষ্পাণি সেই দিকে আগমন করিতেছেন।” সরলা সীতা পিতার আগমন শুনিয়া নিশ্চিন্তা হইলেন, ভাবিলেন, তবে আর কি বিপদের বুঝি শেষ হইল। তিনি সমরলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া, সখীগণের সহিত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, পরশুরাম কঠোরতা এবং নিষ্ঠুরতার আধার; কিন্তু তাহাতে করুণা ও কোমলতারও অসদ্ভাব নাই। রামচন্দ্রকে দেখিয়া, তাঁহার কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে। যে হৃদয় মাতৃশিরচ্ছেদনেও কুণ্ঠিত হয় নাই, গর্ভস্থ শিশু সন্তানগণকেও খণ্ড খণ্ড করিতে পরাঙমুখ

হয় নাই, রামচন্দ্রের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আজ তাহা বিগলিত হইয়াছে। কোন প্রাণে হরত্যয়ং মম মনঃ। শরীরে আঘাত করিব ভ.' চক্ষুতে জল আসিতেছিল। াপি নাম ধি ভাব দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞা. ,—"তৎ কিমিতি অতি বাষ্পা ভাবিতে ? আজ আপনাকে এমন ব্যাকুলিত ে.খিতেছি কেন ? পরশুরাম বলিলেন—"ন কিঞ্চিৎ" "না কিছুনয়।"

"সন্তুষ্টৈব মুখানি চেতসি পরং ভূমান মাতন্বতে
যথা লোক পথাব তারিণি রতিং প্রস্তৌতি নেত্রোৎ সবঃ।
স ত্বং নূতনএবকঙ্কনধরঃ শ্রীমান প্রিয়শ্চে তসো
হন্তব্যঃ পরিভূতবান্ গুরুমিতি প্রাগেব দূয়া মহে॥"

কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার নয়ন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল; তুমি নববিবাহিত,কিন্তু গুরুর অবমাননার প্রতিশোধের জন্য তোমাকে যে বধ করিতে হইল, এই বড় ৱে.। রামচন্দ্র দেখিলেন যে, পরশুরাম তাঁহার প্রতি অনুকম্পাই প্রকাশ করিতেছেন। রামচন্দ্র বীর; বীরপুরুষের হৃদয় অনুকম্পার প্রার্থী নয়। তিনি আপনার স্বাভাবিক বিনয় পূর্ণ অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন "ভার্গব, জ্ঞায়তে মামনুকম্পস ইতি।" ভার্গব, বুঝিলাম আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহই প্রকাশ করিতে চান্। পরশুরামের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে একথা বড় অসহ্য হইল। ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয় শিশুর মুখে শুনিতে হইল "ভার্গব"; আর্য্য ভগবন্ না শুনিয়া শুনিতে হইল ভার্গব। ক্রীড়াপর সিংহ যেমন কশাঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া, পালকের দিকে অগ্নিময় কটাক্ষপাত করে, তিনি রামচন্দ্রের দিকে একবার তেমনই কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "ক্ষত্রিয় বটো, অতিনাম প্রগল্ভসে" আর নিস্তার নাই অস্ত্র গ্রহণ কর। জনক ও শতানন্দ উভয়েই ইতিপূর্ব্বে রামচন্দ্রের সহিত জামদগ্ন্যের বিবাদের কথা শুনিয়া সেখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রামচন্দ্রকে বলিলেন, "বৎস রামচন্দ্র বিস্রব্ধবংতাবদাস্ব। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, রামচন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাদে নিরস্ত হইলেন। জামদগ্ন্যও শতানন্দকে দেখিয়া, একটু লজ্জিতের ন্যায় বলিলেন, "অপিসুখমাঙ্গিরসস্য ? শতানন্দ বলিলেন "বিশেষতস্তদ্দর্শনাৎ"

এইরূপ পরস্পর অভিবাদন ও কুশল প্রশ্নের পর শতানন্দ জামদগ্ন্যকে বলিলেন, কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, আমাদিগের মর্য্যাদা ভঙ্গ করা আপনার ন্যায় ব্যক্তির কর্ত্তব্য হয় নাই। পরশুরাম একটু হাসিয়া বলিলেন, আমরা বনবাসী, রাজাধিরাজগণের কুলপদ্ধতিত আমরা অবগত নই। যিনি দিগ্বিজয়ে পৃথিবী জয় করিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি একজন সামন্তরাজকে রাজাধিরাজ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, বড়ই কৌতুকের কথা। পরশুরামের সোৎপ্রাস উক্তিতে রাজা জনক একটু ব্যথিত হইলেন। তিনি পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনি আমাদিগের সমক্ষেই এই বালক রামচন্দ্রের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করিতেছেন কেন ? এই সময় কঞ্চুকী আসিয়া বলিল, মহারাজ, দেবীগণ কঙ্কন মোচনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, জামাতাকে অভ্যন্তরে প্রেরণ করুন। জনক ও শতানন্দ রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরে গমন করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র গুরুজনের অনুমতি পাইয়া

জামদগ্ন্যের নিকট বলিলেন, "ভগবন্ জামদগ্ন্য, এব মাদিশন্তি গুরবঃ।" জামদগ্ন্য রামচন্দ্রের প্রার্থনায়, যে অনুমতি দিলেন তাহা তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ। তিনি বলিলেন, ক্ষতি কি যাও লোকধর্ম্ম সম্পাদন কর, আত্মীয়গণ তোমাকে শেষ দেখা দেখিয়া লউন, কিন্তু যেন তোমার স্মরণ থাকে যে, অরণ্যবাসীগণ অধিকক্ষণ জনপদে বাস করেন না। এই সময় সুমন্ত্র আসিয়া নিবেদন করিল যে, বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে দেখিতে চাহিতেছেন। তখন রামচন্দ্র গুরুজনের অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে এবং পরশুরাম প্রভৃতিও বশিষ্ট বিশ্বামিত্রের উদ্দেশে বহির্দ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

বীর চরিতের তৃতীয় অঙ্ক সম্পূর্ণরূপেই ভবভূতির নিজের সৃষ্টি। আমরা বলিয়াছি যে, বীর চরিতের পরশুরাম, আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ। ভবভূতি পরশুরামের চরিত্র এই তৃতীয় অঙ্কে অতি সুন্দর রূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের চরিত্রও পাঠকের নিকট অতি উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত করিয়াছেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরশুরামকে দেখিয়া বলিলেন, বৎস, এই শুষ্ক কলহ হইতে বিরত হও; সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, ইন্দ্রের সখা রাজা দশরথ, আজ তোমার নিকট পুত্রের জীবনের জন্য অভয় প্রার্থী, ইঁহার প্রার্থনা পূর্ণ কর। কিন্তু জামদগ্ন্য তাঁহাদিগের বিনীত বাক্য শুনিয়া বলিলেন, আপনাদিগের নিকট আমার নিবেদন যে, একার্য্য আমার অসাধ্য। আমরা এই প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র পরশুরামের নিকট কেবলই গুরুর অবমাননাকারীমাত্র নহেন, তিনি তাঁহার দর্প নিকষ প্রতিদ্বন্দ্বী। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া পরশুরাম বলিলেন, "রাম বালক হইলেও অতি অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছে, এই তিরস্ক্রিয়ার পর যদি আমি তাহাকে' ক্ষমা করি, তবে কে বুঝিবে যে, আমি আপনাদিগের অনুরোধেই রামকে দণ্ড দিতে নিরস্ত হইলাম? বীরব্রত বড় সুলভদ্বেষ, রাম মহাবীর না হইলে আমি এ অপমান সহ্য করিতে পারিতাম। আপনারা ত অবগত আছেন যে, বীরপুরুষের যশ, একবার কলঙ্কিত হইলে আর তাহা পরিশুদ্ধ হইবার নয়।" পরশুরাম কোন মতেই নিরস্ত হইলেন না দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, বৎস জামদগ্ন্য, বংশসম্বন্ধে আমি, বশিষ্টদেব এবং শতানন্দ আমরা সকলেই তোমার আত্মীয়, আমাদিগের অনুরোধ অতিক্রম করা তোমার কর্ত্তব্য নয়।
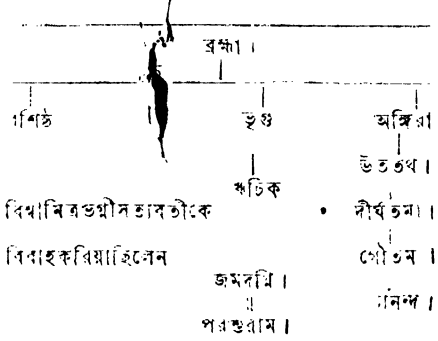
কিন্তু পরশুরাম উপরোধ শূন্য, তিনি বলিলেন, আপনাদিগের অবমাননার জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতে বরং প্রস্তুত, কিন্তু তাহা বলিয়া শস্ত্রগ্রহণব্রত কলঙ্কিত করিতে পারি না। পরশুরাম বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, বরং বারম্বার রামচন্দ্রের অকল্যাণসূচকবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, শতানন্দ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

এবং পরশুরামকে তাঁহার উদ্ধত প্রকৃতির জন্য কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। উগ্রস্বভাব জামদগ্ন্যের নিকট তাহা বড় অসহ্য বোধ হইল। শতানন্দের সহিত পরশুরামের এই কলহ বর্ণন অতি নীরস এবং দীর্ঘ। স্বভাবত শান্ত প্রকৃতি বশিষ্ঠদেব শতানন্দকে নিরস্ত করিলেন। রাজা দশরথ ও জনক উভয়েই বিবাদ স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং পরশুরামের উদ্ধত ব্যবহার দর্শনে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরশুরাম আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ। তিনি কাহাকেও অপেক্ষা করিবার পাত্র নহেন; শতানন্দের শাপোদক, রাজন্যগণের ভ্রূকুটী এবং বিশ্বামিত্রের তিরস্কার শুনিয়া, তিনি গর্ব্বিত বাক্যে বলিলেন;—

"ধর্ম্মে ব্রহ্মণি কার্ম্মুকেচ ভগবানীশোহিমে শাসিতা
সর্ব্বক্ষত্রনিবর্হণস্তু বিনয়ঃকুর্য্যাৎ কথং ক্ষত্রিয়াঃ
সম্বন্ধস্তু বশিষ্ঠ মিশ্র বিষয়ে ম[illegible]জরায়াং নতু
স্পর্দ্ধায়ামধিকঃ সমশ্চ তপসা জ্ঞানেন চান্যোহস্তিমে॥"

পরশুরাম এইবার আত্মাভিমানের চরম সীমা প্রদর্শন করিলেন। বিশ্বামিত্র অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, আর সহ্য করিতে পারিলেন না। পরশুরামের আত্মাভিমানপূর্ণ বাক্যে তাঁহার ক্রোধ পূর্ব্ব হইতেই উদ্বেলিত হইতেছিল; অতি কষ্টেই তিনি হৃদয়ের বেগ নিরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠদেবের অপমানে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন "অনার্য্য, নির্মর্য্যাদ,

জগৎ সনাতন গুরৌ বশিষ্ঠেহপি নিরঙ্কুশঃ
ব্যালদ্বীপ ইবাস্মাভিঃরতিত্রস্যৈব দম্যসে।"

বশিষ্ঠদেবের প্রতিও তোমার সম্মান নাই, দুষ্টগজের ন্যায় আজ তোমাকে দণ্ড দিতে হইবে।" ভবভূতি এইস্থলে আপনার শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শমগুণপ্রধান বশিষ্ঠদেবের চরিত্র, অপর কোন কবিই এরূপ স্থলের মধ্যে অথচ সুন্দর রূপে বিবৃত করিতে সক্ষম হন্ নাই। যখন পরশুরামের আত্মাভিমান পূর্ণ বাক্যে জনক বিশ্বামিত্র ও দশরথ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন, বশিষ্ঠদেব তখনও স্থির, অবিচলিত এবং ব্যথাশূন্য। তিনি পরশুরামের স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, ভৃগুর বংশধরের নিকট পরাভব, সে ত গৌরবেরই কথা।"*

বায়ুর অভিঘাতে মহীরুহ সকল বিকম্পিত হয়, কিন্তু, পর্ব্বত যেমন তেমনই অবিকম্পিত থাকে। পরশুরাম বিশ্বামিত্রের কথায় বিচলিত হইলেন না। তিনি অহঙ্কারে এবং ক্রোধে, পিতৃ সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া বলিলেন কৌশিক, ক্ষমতা থাকে অগ্রসর হও, এই আমি তোমার ব্রহ্মতেজ অথবা জাতি সুলভ ক্ষত্রিয় তেজঃ বিনাশের জন্য উদ্যত রহিলাম। এই সময় রামচন্দ্র কঙ্কন মোচন সমাপন করিয়া, অন্তঃপুর হইতে আগমন করিলেন। তখন পরশুরাম তাঁহার আহ্বানে, দৃপ্ত সিংহ শাবক যেমন মেঘগর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, গজযূথ বিক্ষোভে নিরস্ত হয়, তেমনই জনক বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া "বিমর্দ্দক্ষম" ভূমিতে অবতরণ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

* ভৃগু প্রসবাৎ পরাজয় ইতি প্রিয়ং নঃ।

ধর্ম্মমায়া।

সংসারে বিষয়লালসা, ইন্দ্রিয়কামনা, মর্য্যাদাভিলাষ বশতঃ যেমন লোক সকল মায়ামুগ্ধ হয়, ধর্ম্মসমাজের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ মায়ার প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেন সংসারবাসনা রূপান্তরিত হইয়া, নামান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মজগতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এই জন্য পৃথিবীতে ধর্ম্মসংক্রান্ত আড়ম্বর যেরূপ প্রবল, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন তাহা অপেক্ষা অনেক কম; এমন কি সময়ে সময়ে মনে হয়, ধর্ম্মও একটী বাণিজ্য ব্যবসায় বিশেষ। সংসার-পথে যেমন লোক সকল ধন মান সুখ বিলাসের জন্য দিবা নিশি মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; ধর্ম্মধ্বজী মানবগণ ধর্ম্মের নামে তেমনি আপনাকে এবং জন সমাজকে প্রতারণা করিয়া নীচ স্বার্থ সাধন করিয়া লইতেছে। বরং অন্ধবিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে সরল বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু নিকৃষ্ট কামনা পরতন্ত্র ধর্ম্ম ব্যবসায়ীর কার্য্যে এবং কথায় কিছুমাত্র আস্থা বা শ্রদ্ধা জন্মে না। উক্ত উভয় শ্রেণীর লোকের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে নিশ্চয়ই হতাশ হইতে হইবে। যিনি অন্ধ বিশ্বাসী, তাঁহার চক্ষে ধর্ম্মমত এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠান যেরূপ মূল্যবান, প্রকৃত ধর্ম্ম ব্যবহার তেমন মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয় না। তিনি আপনার চির অভ্যস্ত মত সমর্থন এবং কার্য্যসাধনের জন্য এত দূর উৎসাহী হইবেন যে, তাহার অনুরোধে তিনি দয়া ন্যায় নীতি ভদ্রতা সত্যানুরাগ সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে পারিবেন। আপনার কল্পিত ভাব এবং প্রাচীন সংস্কারকে ঈশ্বররূপে গঠন করিতেও তিনি ভীত হইবেন না। যদিও তিনি বিশ্বাসী এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের কিছুমাত্র ত্রুটি তিনি করেন না, তথাপি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে থাকিতে হয়! বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা শ্রদ্ধা সত্ত্বেও যদি এইরূপ হইল, তবে যাহাদের উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন, তাহাদের কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

সংসার রাজ্যে অবিদ্যার যত প্রকার খেলা আছে, ধর্ম্মের ভিতরে তাহার একটীরও অভাব নাই। একটু অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, সমস্ত গুলি তন্মধ্যে ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন রূপে বিরাজ করিতেছে। কার্য্য দেখিয়া, কথা শুনিয়া সহসা কেহ তাহাদিগকে ধরিতে পারে না; কিন্তু অভিপ্রায়ের দূষিত গন্ধ, আত্মাভিমানের বিকৃত মূর্ত্তি অধিক কাল প্রচ্ছন্নও থাকে না। পরিশেষে মনুষ্য আপনিও আপনার হৃদ্‌গত রোগ বুঝিতে পারে। তখন সে দেখে যে, আত্মা মূলাদেশ হইতে ক্রমে শুকাইয়া উঠিতেছে, হৃদয় কলুষরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে; বিবেকের চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হইতেছে; তখন বুদ্ধি আর স্ফূর্ত্তি পায় না, ভাবস্রোত আর চলে না, সমস্ত জীবনযন্ত্র যেন বন্ধ হইবার উপক্রম। ঈশ্বর-প্রীতিকামনায় নিষ্কাম ভাবে সে কি কি করিয়াছে, তাহা আর তখন খুঁজিয়া পায় না। সুতরাং চিত্ত অপ্রসন্ন হয়, আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মে। তদবস্থায় উপস্থিত হইয়া সে মনে মনে ভাবে, আমি যে সকল

প্রবন্ধ লিখিলাম, তাহাত কীট-দূষিত, ধূলি-ধূসরিত হইয়া ভূতকালের অতীত স্মৃতির মধ্যে মিশিয়া গেল; যে কিছু বক্তৃতাদি করিলাম, তাহাওত আকাশ-বায়ু গ্রাস করিল; সৎকার্য্য সকল জনসমাজের নিম্ন স্তরে গিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইল, তবে এখন হাতে রহিল কি? দেবপ্রভা, আত্মপ্রসাদ কৈ? সংবাদপত্রে আর ত আমার প্রশংসা কেহ লিখিবে না। বক্তৃতা শুনিয়া আর ত কেহ হাততালি দিবে না। এখন আমাকে পুরাতন ভগ্ন পাত্রের ন্যায় অব্যবহার্য্য হইয়া থাকিতে হইল; হায়! তবে কি আমি ধর্ম্মমায়ার চক্রে পড়িয়া আত্ম-প্রবঞ্চিত হইলাম? যাঁহার কার্য্য আমি এত দিন করিলাম, তিনি এখন কোথায়? আকাশ প্রতিধ্বনি করিয়া বলে "কোথায়?" তখন নিদ্রিত বিবেক জাগ্রত হইয়া বলে, "তোমার ন্যায় শ্রোতা, বক্তা, লেখক, পাঠক কেবল লোকের মুখ চাহিয়া ধর্ম্ম কার্য্য করে, অতএব তাহাদের পুরস্কার পৃথিবী দিয়াছে; কিন্তু স্বর্গে তাহাদের জন্য পুরস্কার নাই, কেবল অনুতাপ, আত্মশাসন আর প্রার্থনা আছে।"

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

চাকরি করিতে যাই।

"যেওনা যামিনি আজি"—হয়োনা প্রভা
কি বলিব মাথামুণ্ড ছাই ভ[illegible] আর,
হৃদয়ে দারিদ্র্য দুঃখ শক্তিশেল ঘাত,
করিতেছে প্রবাহিত রক্ত শ[illegible]ধার!
নীরবে নিঃশেষে রক্ত হতেছে পতন,
নীরবে অলক্ষ্যে এই হয় অশ্রুপাত,
নীরবে মরমমূল করি বিধূনন,
নীরবে নিঃশেষে এই প্রাণের প্রপাত!
উঠিলে ভাস্কর খুলি পূর্ব্বসার দ্বার,
গ্রাসিবে জীবন "অন্ন চিন্তা চমৎকার!"

১

দরিদ্র বাঙ্গালী যুবা অন্ন নাই ঘরে,
আছে পুত্র কন্যা তার বহু পরিবার,
ক্ষুধায় আকুল শিশু কাঁদিছে কাতরে,
নয়নের জলে বক্ষ ভাসিছে বামার!
বাম করতলে রাখি বিবণ্ণ বদন,
অশ্রুমুখী বিষাদিনী প্রত্যেক নিশ্বাসে
হৃদয় শোণিত করে মহা আন্দোলন,
আতঙ্কে প্রাণের প্রাণ মরে হা হুতাশে!
নহে উগ্রচণ্ডা ধনী তবু ভীত মন,
প্রত্যেক নিশ্বাস ঊণ পঞ্চাশ পবন!

২

প্রতি অশ্রু বিন্দু ওর সপ্ত পারাবার,
প্রলয়ের মহা মেঘ এলান কুন্তল,
বদন কালিমা ওই মহা অন্ধকার,
ঢাকিছে একত্রে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল!
আজিও করুণ কণ্ঠে 'নাথ' সম্বোধনে
অষ্ট বর্জ্জ গর্জ্জে যেন হেন মনে লয়,
চিত্তের জড়তা জন্মে, ভয় হয় মনে—
সংযত হৃদয় রক্ত—আসন্ন প্রলয়!
কাঁদিল—'কি হবে নাথ!' ক্ষুদ্র বালুকণা
উড়িল প্রলয় ঝড়ে কে করে সান্ত্বনা?

৩

'বলনা কি হবে নাথ! কেমনে সহিব,
ক্ষুধায় কাতর শিশু ধরিয়া গলায়
কাঁদিছে করুণ কণ্ঠে, বল না কি দিব
বাছার ও চাঁদ মুখে,—কি হবে উপায়!"
অনশনে ক্ষীণ তনু মলিন বসন,

নিস্তেজ নিমগ্ন দুটি নয়ন মলিন,
শোকে দুঃখে মুর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন মন
ঢলিয়া পড়িল ওই সোণার নলিন!
উঠিতে অশক্ত শিশু হামাগুড়ি দিয়া,
পড়িল জননী বক্ষে দ্রুত আছাড়িয়া!

৪

নীরব নিস্পন্দ নেত্র মূর্চ্ছিতা ললনা,
নীরব নিশ্চেষ্ট যুবা সম্মুখে তাহার,
নির্নিমেষ নেত্রে দেখে না করে সান্ত্বনা,
ভাবিতেছে ভবিষ্যত ভাগ্য আপনার!
নির্জীব তরুর মূলে ছিন্ন লতা প্রায়,
একটা কুসুম বক্ষে করিয়া ধারণ,
হায়রে কৃশাঙ্গী অই ধূলায় লুটায়
বিলুপ্ত অঙ্গের সেই লাবণ্য এখন!
অবরুদ্ধ কণ্ঠে বামা কহিল আবার
'কি হইবে নাথ!' এযে জ্ঞানের বিকার!

৫

'কি হইবে নাথ!" মহা ভীম প্রভঞ্জনে
ক্ষীণ অঙ্গ যষ্টি এই বাঙ্গালী দুর্ব্বল,
এই ক্ষুদ্র বালুকণা উড়িল গগনে
একটু গুরুত্ব নাই—হৃদয়ের বল!

* * * *

৬

ঝরিল একটী অশ্রু যুবার নয়নে,
বিষাগ্নির সপ্তশিখা জ্ঞানের সহিত
প্রবেশিল পুনরায় সংজ্ঞাহীন মনে
ধ্বনিল যুবক কণ্ঠ—ভগ্ন বিকম্পিত!!
"জীবন সর্ব্বস্ব মোর প্রিয় প্রাণেশ্বরি!
পারি না হেরিতে তোরে ধূলায় লুণ্ঠিত,
হৃদয় কণ্টকে বিদ্ধ শতবার করি
কে দেখিতে পারে অই পদ্ম কণ্টকিত?
আয় বক্ষে এইবার, এই শেষ বার
কণকের কল্পলতা প্রেয়সি আমার!'

যুবতীর অর্দ্ধ দেহ রাখি অঙ্কতলে
আবার সে ক্ষীণ কণ্ঠ হইল নীরব,
নীরবে ভাসায় যুবা নয়নের জলে
প্রীতির প্রতিমা তার প্রাণের পল্লব।
সেই অর্দ্ধ নিমীলিত বামার নয়নে,
সেই অর্দ্ধ নিমীলিত নব নীলোৎপলে,
বহিল দুইটী ধারা উষ্ণ প্রস্রবণে,
বহিল দুইটী ধারা রজত তরলে!
চারি চক্ষে চারি ধারা চারি ওষ্ঠাধর
মিশিল সে দম্পতীর যুগ্ম পরস্পর!

৮

সময়ের আবর্ত্তনে সরিল সত্বর
সে মুহূর্ত্ত দম্পতীর দুঃখের জীবনে,
একটী একটী কার খসি নিরন্তর
ভগ্নমান দ্বীপ হতে প্রবাহ প্লাবনে
সরিল ও বালুকণা নীল সিন্ধুজলে!
সরিল ও চারি চক্ষু চারি ওষ্ঠাধর,
ভরিল সে শূন্য স্থান তপ্ত হলাহলে,
আবার কাঁদিল যুবা উন্মাদ অন্তর,—
"কত কাল সহিব এ লাঞ্ছনা গঞ্জনা,
নির্দ্দয় বিধির বিধি নিত্য বিড়ম্বনা!"

৯

কিম্বা——
বৃথা দোষি বিধাতায়—দেশের এ দোষ—
সমাজের দোষ এই, নহে বিধাতার,
হেন মূর্খ আছে কেহে যে হয় সন্তোষ
প্রতপ্ত গরল বক্ষে মাখি আপনার?
নির্ব্যূঢ় অজ্ঞান সেই এ বঙ্গ সমাজ
তাহার (ই) প্রীতির কার্য্য বাল্য পরিণয়,
সেই পূর্ণ নির্ব্বোধের বিষময় কাজ
অচিরে প্রসবে এই ফল বিষময়!
বক্ষে করি এই বিষ নরক অনল
প্রবেশে সংসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী দুর্ব্বল!"

১০

"অনভিজ্ঞ সংসারের জীবন সংগ্রামে
প্রতিকূলে দাঁড়াইতে একান্ত অক্ষম,
কত যে বেদনা পায় ফুটে যদি প্রাণে—
একটী দুঃখের অস্ত্র বিষাক্ত বিষম!
নৈতিক ব্যায়ামে নহে হৃদয় সবল;
জ্ঞান বিদ্যা মহত্বের লৌহ আবরণে
নহে সুরক্ষিত প্রাণ নিতান্ত কোমল!
সংসারের আগ্নেয়াস্ত্র মৃদু প্রহরণে
সুখের কুসুম ফুল্ল বিলাসের প্রাণ
নিস্তেজ বাঙ্গালী যুবা মূর্চ্ছিত অজ্ঞান!"

১১

"না খুলিতে বালকের জ্ঞানের নয়ন,
রে পাপিষ্ঠ দুরাচার সমাজ নিষ্ঠুর,
সংসারের এ বিষাক্ত কণ্টক কানন,
প্রবেশ করাও তারে পিশাচ অসুর!
কি যন্ত্রণা কি যাতনা শরীর শিহরে,
কণ্টকে কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত শরীর,
উছলিছে হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে
কালীময় করি বিষ হৃদয় রুধির
দেখেও দেখনা কিরে, শিশু নিরাশ্রয়
পিশাচ আচারে তোর কত জ্বালা সয়?"

১২

"যাক সেই গত কথা কি বলিব আর,
ফিরাইয়া সময়ের অদৃষ্ট প্রস্তর
কে মুছিতে পারে, হেন আছে সাধ্য কার
বর্ত্তমান জীবনের আগ্নেয় অক্ষর?"

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি মুছি অশ্রুজল,
প্রীতির প্রতিমা খানি রাখি ভূশয্যায়,
সজোরে চাপিয়া চক্ষে মুক্ত করতল,
বলিল উন্মাদ যুবা—"প্রেয়সি বিদায়,
হৃদয়ের পুষ্পহার প্রীতি সুবাসিত,
প্রাণের জীবনী শক্তি সুধা-প্রবাহিনি!
হৃদয়-আতপ্ত পূর্ণ উজ্জ্বল শোণিত,
জীবনের মূল মন্ত্র—সিদ্ধি-প্রদায়িনি!
চলিলাম প্রিয়তমে প্রেয়সি আমার,
অনলে কুসুম ভস্ম দেখিবনা আর!"

১৪

"যাই প্রিয়ে যদি স্বাধীনতা বিনিময়ে—
কি উপায় আছে আর? বাঙ্গালী দুর্ব্বল,
পরের পাদুকাঘাতে সুধু প্রাণ লয়ে
দাসত্ব করিব এই আশার সম্বল!
যাই প্রিয়ে যদি অর্থ পারি উপার্জ্জিতে
এ হেন দাসত্ব কর বেচিয়া পরাণ,
যাই যদি পারি তোর অশ্রু মুছাইতে
বদন সরোজ যাহে সদা ভাসমান!
যাই, যদি ইহাতেও বিধি সাধে বাদ
তবে—
প্রীতির পবিত্র এই শেষ আশীর্ব্বাদ!"

১৫

আবার মোহান্ধ যুবা যুবতীর পানে
স্থির মনে স্থির নেত্রে স্থির দৃষ্টি করি,
চুম্বিল সে বিম্বাধর বজ্রাহত প্রাণে,—
কহিল করুণ কণ্ঠে "প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি!
যাই তবে বায়ুবিম্ব সাগরে ভাসিয়া
কালের তরঙ্গ শিরে, জানি না কোথায়
দ্বিতীয় তরঙ্গ পুন কবে আঘাতিয়া
প্রাণের এ বায়ু বিন্দু বায়ুতে মিশায়!
যাই যদি পোড়া বিধি সাধে হেন বাদ,
তবে—
প্রীতির পবিত্র এই শেষ আশীর্ব্বাদ!"

১৬

"কত কষ্ট দিয়াছি যে জীবনে তোমার,
যাহ প্রিয়ে, সে সকল করিওনা মনে,
জানি আমি এ জনমে ক্ষমা নাই তার
চাও একবার শেষ প্রীতির নয়নে!

যাইরে অবোধ শিশো !—হে করুণাময়,
দীনবন্ধো ! বাঁচাইও এ দীন সন্তান,
স্বর্গের করুণা তব চির সুধাময়,
রাখে যেন অভাগিনী দুঃখিনীর প্রাণ !
এমন আত্মীয় নাই একজন আর
রক্ষিবে যে অভাগার দীন পরিবার !"

১৭

"কাঁদিলে করুণকণ্ঠে শিশু নিরাশ্রয়
এমন বান্ধব নাই করিতে সান্ত্বনা,
কথার দোসর নাই বিপদ সময়,
তোমার আশ্রিতা এই দরিদ্র ললনা !
রাজা প্রজা ধনী দীন—সমস্ত সংসার,
জীব জন্তু তরুলতা শ্যাম তৃণ দল,
সকলে সমান পাত্র তব করুণার,
তুমিই করুণাময় ভরসা কেবল !
যাই তবে —চলিলাম প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি,
পবিত্র প্রীতির শেষ আশীর্ব্বাদ করি !"

১৮

"যাই প্রিয় জন্মভূমি জননি আমার !
ভুলেছ কি গত কথা ?—আছে কি মা মনে ?
সহিয়াছি কত শত প্রেত অত্যাচার
জননি ! তোমার তরে অকাতর মনে ?
ন্যায়ের পবিত্র বক্ষে করি পদাঘাত
অকালে সে দিন হায় করি চুর চুর,
পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি মাগো অকস্মাৎ
ভেঙ্গেছে সৌভাগ্য মোর সোণার মুকুর !
কিন্তু—
এতেও সুখের নাহি ছিল পরিসীমা
মুছিত যদি মা তোর কলঙ্ক কালিমা !"

১৯

"কিন্তু তাহা হইল না—হবে একদিন,
অবশ্য জননি, কোন পুত্র পুণ্যবান
(ঘন অন্ধকারে শশী নহে চির লীন)
মুছাইবে ও কালিমা কলঙ্ক নিশান !
যাই তবে জননি গো বিদায় এখন,
যাই হে স্বদেশবাসি ! মনে রে'খ ভাই,
তোমাদেরি তরে সহি এত নির্যাতন,
বিড়ম্বিত হইলাম বর্ব্বরের ঠাঁই।
যাক্ সে কথায় আর করিনা বিবাদ,
পবিত্র প্রীতির কর শেষ আশীর্ব্বাদ !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

উত্তর।

আষাঢ় মাসের নব্যভারতে 'ঈশ্বর বিশ্বাস ও দার্শনিক প্রমাণ' প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বর নির্ণয় অসম্ভব, কারণবাদ এবং কৌশলের যুক্তি, কেবল অযুক্তিরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ঈশ্বর জ্ঞান নিত্যপ্রত্যক্ষ। এই শেষ কথার প্রকৃত অর্থ কি ? আমি স্বাভাবিক এবং নিত্যপ্রত্যক্ষ অর্থ অবশ্যই দার্শনিকের ভাষায় ব্যবহার করি নাই ; প্রচলিত শব্দের সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। সেই সমুদয় কথা বিশেষ করিয়া অন্য এক প্রবন্ধে উল্লেখ করিব, এবং আমি কেন যে ঈশ্বর বিশ্বাস করি, পাঠক মহাশয়দিগের কাছে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিব, এরূপ প্রতিশ্রুত ছিলাম।

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত প্রবন্ধের অবতারণার পূর্ব্বে কতকগুলি আনুষঙ্গিক কথা এবারে

বলিতে হইবে। সুশিক্ষিত, (এবং তাঁহার নিজের কথায়) চিন্তাশীল এবং ধর্ম্মানুরাগী বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়, গত শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে 'আমার সেই প্রবন্ধের একটী সমালোচনা করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা না বলিলে এখন অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব। প্রথমত, সীতানাথ বাবু, আমার ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার অগভীরতা দেখিয়া যে কতকগুলি স্থূলদর্শী পণ্ডিতের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে এবং ব্রহ্মবাদী দার্শনিকের সহিত পরিচিত হইতে আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যুক্তির উত্তর না হইলেও তিনি যখন ব্যবহার করিয়াছেন, তখন আমিও, তাঁহাকে এই উপদেশের জন্য ধন্যবাদ দিবার জন্য, তাহার উল্লেখ করিয়া বোধ হয় অধিক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিলাম না। দ্বিতীয়ত, আমি ভূমিকায় ধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়দিগের যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলাম, তাহাতে একথা মনে করি নাই যে, যাঁহারা যুক্তি তর্ক বলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তাঁহারা সাধক ভক্ত নহেন। শ্রেণী বিভাগে, অবলম্বিত স্বীয় স্বীয় প্রচার প্রণালীর কথাই বলা হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্থলে মার্টিনু এবং ফেনেলোঁকে গ্রহণ করা যাউক। মার্টিনুর সাধুতা ও ভক্তিভাব ফেনেলোঁ অপেক্ষা এক চুলও কম নহে, কিন্তু একের প্রচার প্রণালী—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি, এবং অপরের প্রণালী কেবলই ধর্ম্মাভিজ্ঞতা প্রদর্শন। ফেনেলোঁর পাণ্ডিত্য কত ছিল, কে না জানে; মার্টিনুর ঋষি-চরিত্র কাহার অবিদিত? কিন্তু ফেনেলোঁ, যুক্তি তর্ক ভাল বাসিতেন না, এবং মার্টিনু উহার উপযোগীতা বিশেষরূপে স্বীকার করেন। আমিও এই হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছি। নাম ঐতিহাসিক না হইলে, জীবিত লোকের চরিত্রের প্রশংসাদি সাহিত্যে কীর্ত্তিত হওয়া সাহিত্য-নীতির বহির্ভূত না হইলে, আমি সীতানাথ বাবুর অপেক্ষা, অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া, নগেন্দ্র বাবু এবং সীতানাথ বাবুর কথা উল্লেখ করিতাম। সুতরাং সংক্ষেপত এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, শ্রেণী বিভাগের অর্থ সীতানাথ বাবু যেরূপ বুঝিয়াছেন, আমি সেরূপ বুঝাই নাই। তৃতীয়ত, সীতানাথ বাবু প্রশ্ন করিয়াছেন যে, দার্শনিক বিচার যদি বিড়ম্বনা, তবে, আমি কি যুক্তি বলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, এবং আমার নিত্যপ্রত্যক্ষ কথারই বা অর্থ কি? তাঁহার প্রস্তাবের উত্তর না দিতে হইলে, এই বারই তাঁহার এ প্রশ্নের উল্লেখ করিতাম, কিন্তু উত্তর দেওয়া অগ্রে প্রয়োজনীয় বলিয়া সে প্রস্তাব এবারকার মত এখানে স্থগিত থাকিল। তবে একটা কথা বলি, তিনি যে আমার ব্যবহৃত নিত্য-প্রত্যক্ষ শব্দ দার্শনিকদিগের (Intuition) নামক অপূর্ব্ব পদার্থে অভিহিত করিয়া, "দার্শনিক বিচার" কথাটার অর্থ বুঝিতে আমার ভ্রম আছে, ভাবিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। আমি "যুক্তি তর্কের ভূমি ছাড়াইয়া এক বিশ্বাসের ভূমি" দেখাইব। এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, সেই ভূমি শিলা অপেক্ষাও দৃঢ়, কল্পনার গন্ধও সেখানে নাই। অধিকন্তু (নব্যভারত সম্পাদকের ভাষায়) ইহাও দেখাইব যে, "তর্ক ও যুক্তিতে যে ঈশ্বর বিশ্বাস জন্মে তাহাকে আমরা ঈশ্বর বিশ্বাস বলি না, সে কল্পনার ক্রীড়া—মস্তিষ্কের খেলা।" চতুর্থত, সীতানাথ বাবু বলিয়াছেন যে, আমি তাঁহার গ্রন্থখানা

ভাল করিয়া পড়ি নাই। ভাল শব্দের ওজন নাই, কিন্তু একথা বলিতে পারি যে, শিক্ষা লাভের জন্য তাঁহার গ্রন্থখানি মনোযোগের সহিত দুই বার পড়িয়াছি। তবে তাঁহার যুক্তি গুলির সর্ব্বস্থল উল্লেখ না করিবার হেতু ছিল; আমার প্রবন্ধ তাঁহার ও নগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থের সমালোচনায় লিখিত হয় নাই; একটী (আমার সঙ্ক-ল্পিত) প্রবন্ধের ভূমিকা স্বরূপে লিখিত হইয়াছিল। সাধারণত ঈশ্বর প্রমাণার্থ যে সকল যুক্তি ব্যবহৃত হয়, তাহারই সমা-লোচনা করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন Roots of faith এবং ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা নামক অতি সুন্দর, সুপাঠ্য ও সহজবোধ্য গ্রন্থদ্বয় এদেশে রহিয়াছে, তখন আমার বিপক্ষীয়-দিগের যুক্তি ফ্লিণ্ট ও কেয়ার্ড হইতে না তুলিয়া, ঐ গ্রন্থদ্বয় হইতেই যথা সম্ভব তুলি-য়াছি; এবং গ্রন্থদ্বয় নূতন বলিয়া পাঠক-দিগের কাছে পরিচয় করিয়া দিয়াছি। সীতানাথ বাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থেরই এক মাত্র সমালোচনায় সম্ভবপর। পঞ্চমত, আমি অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এত কথার আলোচনা করিলাম কেন? আমি যত কথার অবতরণ করিয়াছি, সে গুলির মীমাংসাতেই সমগ্র ইংরাজি দর্শন শাস্ত্র। আমি কিছু সেই সকল দর্শন শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ করিতে বসি নাই; বিশেষত সে কার্য্য নানা কারণেই আমার সাধ্যাতীত। আমি দেখাইয়াছি যে, দার্শ-নিকদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী, এবং তাহা-রই এক শ্রেণীর যুক্তি অধিক প্রবল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সীতানাথ বাবু তাঁহা-দিগকে স্থূলদর্শী বলিয়াছেন, আমিও ব্রহ্ম-বিদ্যাবিদ্ দার্শনিকদিগকে ইঁহাদের অস-মকক্ষ বলিয়াছি; সেটা গেল কথার লড়াই। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রের সহিত আমার ন্যায় অন্তত অল্প পরিমাণেও পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, উভয় শ্রেণীরই বলিবার অনেক কথা আছে। যদি ছোট বড় বিচার ত্যাগ করা যায়, তবুও কি বলা যায় না যে, উভয়ের বিবাদের কিছুই নিষ্পত্তি হয় নাই? যিনি ঘটনাক্রমে যে পক্ষ প্রবল মনে করেন, তিনি তাঁহা-দেরই মীমাংসা অবলম্বন করেন? সেই জন্যই আমি ঈশ্বর-প্রমাণকারীদিগের বি-রোধী পক্ষীয় যুক্তি গুলির আভাসমাত্র দিয়া ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, এ সংগ্রাম কখনও মিটিবে না—অন্তত সহজে মিটিবে না; এবং ঈশ্বর প্রমাণ, দার্শ-নিক যুক্তিদ্বারা অসম্ভব, অথবা এখনও সম্ভব হয় নাই। সীতানাথ বাবু স্পেন্সার প্রভৃ-তিকে অগভীর বলিতে পারেন, কিন্তু অধি-কাংশ শিক্ষিত লোকের হৃদয়ের উপর তাঁহার যে কি প্রকার প্রভুত্ব, একবার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? আমি লোকরঞ্জন যুক্তি (Argumentum ad hominum) দিতেছি না; তবে আমি যে সকল কথার আভাস দিয়াছি, তাহার বল বড় কম নহে, ইহাই বলিতে চাহি। আমার মূল প্রব-ন্ধের ভূমিকায়, কাজেকাজেই, কেবল দর্শনা-ভিজ্ঞদিগেরই জন্য অতি সংক্ষেপে সকল প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া, দার্শনিক যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর প্রমাণ অসম্ভব, এই কথা বলিয়া-ছিলাম। এই পর্য্যন্ত গেল আমার কৈফি-য়ৎ। এখনও সীতানাথ বাবুর প্রতিবাদের কথা কিছু বলি নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ অপেক্ষা ডালের প্রভাব বাড়িয়া চলিল, সংক্ষেপে সীতানাথ বাবুর যুক্তির বিরুদ্ধে

কিছু বলিয়া নিজের কথা সম্ভবত পরবারেই আরম্ভ করিব।

সীতানাথ বাবু বলিয়াছেন যে, আমি কারণবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝি নাই। যাহা হউক, এবারে সীতানাথ বাবুর নিজের ভাষায় কারণবাদের অর্থ বুঝিতে একবার চেষ্টা করি। Roots of Faith গ্রন্থে ইহার বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে যে. "Phenomena, by their very nature are dependent, passive, inert, inactive. To say therefore that they can change, can act, of themselves (can appear, dis appear or be transformed,) is to say, that, in active things can act—a manifest contradiction. Wherever therefore, there is a change, there must necessarily be an agent behind it, as its cause." এই যে পরিদৃশ্যমান ঘটনাপুঞ্জ বা জগৎ বা জাগতিক প্রকাশ, সীতানাথ বাবু ইহাকে পরমুখাপেক্ষী, নিশ্চল এবং কার্য্যাক্ষম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন যে ইহারা আপনাপনি আবির্ভূত, তিরোহিত বা রূপান্তরিত হইতে পারে না। তবেই নাকি বুঝা যাইতেছে যে, ইহাদের পশ্চাতে কেহ কারণ রূপে বর্ত্তমান আছেন। পণ্ডিত ও কবি বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী গ্রন্থ নামক উপন্যাস হাতে নাই, যতদূর স্মরণ হইতেছে, সেই গ্রন্থে রজনীর প্রেমে সন্ন্যাসী অমরনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন "ঐ যে শিয়াল কাঁটার ফুলটী, উহারই তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য, ডারুইন, হক্‌স্লে, টিণ্ডাল ও লায়ল, একাসনে বসিয়া আজন্ম চেষ্টা করিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।" অদ্বিতীয় কবি এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গেটে এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "লোকে সৌন্দর্য্য-পিপাসায় চন্দ্রসূর্য্য দেখে, আমি কিন্তু একটা ক্ষুদ্রতম বালুকা-কণার সৌন্দর্য্যও বিশেষ করিয়া তৃপ্তির সহিত দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। যে জগতের সামান্য বালুকা-কণার কথা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার চক্ষে অনন্ত রহস্যময়, সে জগতের সিদ্ধান্তে কোন্ সাহসে বলিব যে, পদার্থপুঞ্জ পরমুখাপেক্ষী, নিশ্চল ও কার্য্যাক্ষম? ধর্ম্ম প্রমাণকারী দার্শনিকদিগের মধ্যে সাধারণত একটী দোষ লক্ষিত হইতেছে; সে দোষ এই যে, যেখানে কেহ কিছু বুঝিতে পারে না, বা এখন পর্য্যন্ত পারে নাই, সেখানে একটা সিদ্ধান্ত করা। সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞান ও দর্শনের রাজ্যে সর্ব্বথা পরিহার্য্য। মিঝার্ট হইতে সীতানাথ বাবু পর্য্যন্ত সকলেই এই দোষে দোষী। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের নব্যভারতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "ঈশ্বর সচেতন কি অচেতন" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, বিজ্ঞান শাস্ত্র জীবনোৎপত্তির বিষয় কিছু প্রমাণ করিতে পারে নাই, এবং দেখাইতে পারে নাই যে, পদার্থ হইতেই চেতনের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, চৈতন্যময় আত্মা স্বতন্ত্র রূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, এ কি প্রকার মীমাংসা? আজিও বুঝিতে পারা যায় নাই যে, সূর্য্যের উত্তপ্ত বুকে জীবনাঙ্কুর থাকিতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি কখনও বুঝিতে পারা যায়? ঐ যে বালুকা-কণা, যাহাকে জড় নামে আখ্যাত করিতেছ, বলিতে পার কি যে, উহারই সংযোগ ও বিয়োগে বুদ্ধদেব ও কপিলের বিকাশ কি না? প্রমাণ হয় নাই বলিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। *

* জড় হইতে চেতনের বিকাশ সম্ভব বলিয়া আজিকালি আবার অনেক বড় বড় পণ্ডিত মানিতে

সেই জন্যই বলিয়াছি, যদি সীতানাথ বাবু এ জগতের কারণ চাহেন, তবে কারণের কারণ চাহিতে তিনি কোন্ যুক্তিতে বাধা দিবেন? এ কথারও নাকি তাঁহার উত্তর আছে, সে উত্তর একবার পরীক্ষা করা যাউক। সীতানাথ বাবু বলেন যে আমরা তাহারই কারণ প্রার্থনা করি, যাহা অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল ইত্যাদি; সেই জন্য জগতের কারণ প্রার্থনা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কিছুকে কারণ বলিতে হয় ত সে অবশ্যই আদিকারণ হইবে, এবং আদিকারণ হইতে হইলে তাহাকে স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনশীল প্রভৃতি হইতে হয়; নতুবা আদিকারণ কথা অর্থশূন্য হয়। সীতানাথ বাবুর এ যুক্তি স্পেন্সারের কারণবাদের যুক্তি। কিন্তু এযুক্তিতে ছিদ্র আছে। এই জগৎ দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয়, ইহাকে কে করিল, এখন যদি কারণ মানিতে হয়, তবে বর্ণিত আদিকারণই গ্রহণ করিতে হইবে। এইত আসল কথা। কারণ-শৃঙ্খল অনন্ত, এই অনন্তশৃঙ্খল ভাবিতে পারি না, ইহাতে উত্তরও মিলে না, কারণ স্থিরও হয় না; কাজেই কারণ স্বরূপে আদিকারণ মানা স্বাভাবিক। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, পদার্থের কারণ বলিয়া প্রশ্নকরিবার আদৌ শিরঃপীড়া কেন? এবং আদিকারণও কি সেই স্বীয় সৃষ্ট শিরঃপীড়ার কল্পিত ঔষধিমাত্র নয়? স্পেন্সার কহেন যে, সীমাবদ্ধ জীবের অস্তিত্বের অবস্থা মাত্রেই, তাহার পক্ষে এই কারণ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। ভাল কথা। যাহা স্বাভাবিক তাহাই যে আবার সত্য, একথা কে বলিল? হইতে পারে, আমরা কারণ খুঁজি; এবং যখন কারণ খুজি তখন কাজেই আমাদিগকে আদিকারণ ভাবিতে হয়। আমি বলি যে, আদিকারণ ভাবিয়া রোগ নিবৃত্তি অপেক্ষা রোগটা থাকাই ভাল। ঘটনামাত্রের efficient cause না ভাবিয়া, তাহাদিগকে রহস্যময় করিয়া রাখাই সর্ব্বথা যুক্তি সিদ্ধ। এই জন্যই প্রত্যক্ষবাদী হইয়া "স্থূলদর্শী দার্শনিকদিগকে আদর্শ করিয়া" জড় শরীর যন্ত্রের বিকাশ প্রণালীকেই (অচৈতন্য হইতেই) চৈতন্য, স্মৃতি আশা প্রভৃতির জন্মের কথা বলিয়াছিলাম। অচেতন লক্ষণাক্রান্ত ডিমের পরিণতিই চৈতন্যবিশিষ্ট জীব। 'Not consciousness হইতে consciouness' না বুঝিতে পারি; কিন্তু "হইতেই পারে না" এ সিদ্ধান্তকেও অতিরিক্ত সাহসী (too bold an assertion) বলিতে বাধ্য হইলাম।* প্রত্যক্ষ যাহা দেখি তাহা ঐ পর্য্যন্তই। তাহা যদি মীমাংসা বলিয়া বোধ না হয়, চুপ করিয়া থাক। অতিরিক্ত মীমাংসা অনধিকার প্রবেশ।

ঈশ্বর ইচ্ছাময়, অপরদিকে ইচ্ছা অহেতুকি নয়, ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব যে মনুষ্যত্বে পরিণত হয় না, এই কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য সীতানাথ বাবু লিখিয়াছেন যে,

আরম্ভ করিতেছেন। এসম্বন্ধে ক্ষীরোদ বাবুর কোন কোন প্রবন্ধে পাঠক মহাশয়গণ, ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতের পৃষ্ঠায় আভাস পাইয়াছেন। তাঁহার মানবপ্রকৃতি দ্বিতীয় ভাগে ইহার সবিস্তার আলোচনা আছে।

* স্পেন্সারের কারণবাদ পড়িয়া আমার একজন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, স্পেন্সার টানাটানি করিয়া যে কারণ মানিয়াছেন, তাহাকে আর এক ধাক্কা দিলেই Mill এর অনন্ত শৃঙ্খলায় ঝুঁকিয়া পড়িবে। সত্য কথা বটে। এ সম্বন্ধে হিউমের প্রবর্ত্তিত মত আজিও অটল রহিয়াছে।

"তাঁহার (ঈশ্বরের) ইচ্ছা অহেতুকি নহে, তাঁহার ইচ্ছার হেতু আছে, কিন্তু সেই হেতু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে; তাঁহার ইচ্ছার হেতু অনন্ত প্রেম, এই অনন্ত প্রেম তাঁহার প্রকৃতির অঙ্গীভূত; ঈশ্বর অনন্ত প্রেমময় বলিয়া ইচ্ছাময় এবং কার্য্য-শীল; কোন বাহ্যিক কারণের প্রভাবে নহে।" পাঠক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি, কেহ ইহার কোন অর্থ বুঝিয়াছেন কি? অন্তত আমিত বুঝি নাই। কতক গুলি তত্ত্ব বিদ্যার বুথা কথা (Theological cant) ব্যবহৃত হইয়াছে এই মাত্র। ইচ্ছার কারণ কি? না প্রেম। জিজ্ঞাসা করি যে, প্রেম অর্থ কি? তাহাও আমাদের প্রেমের একটা বড় রকম ছবি নয় কি? সকল যুক্তি, এখানে এক "অনন্ত" কথার উপর নির্ভর করিতেছে। এই অনন্ত অর্থ কি? একটা (Indefinite) না-বুঝিলাম-কথার এলোমেলো বিন্যাস নয় কি? হয়ত বলিবেন, তুমি বুঝিতে বড় গোলকর; তাহা বলিলে নিতান্তই নাচার।'

প্রবন্ধের উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া এবিষয়ের মীমাংসার্থ ও আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য এই উত্তরের সমালোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা আমার সঙ্কলিত প্রবন্ধ (যাহাতে আমি কেন ঈশ্বর বিশ্বাস করি, লিখিব) প্রকাশিত হইলে, করিলে বিশেষ কৃতার্থ হইব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আদি সৃষ্টি শক্তি ও তাহার তিন রূপ বিকাশ।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে জগতের গূঢ় তত্ত্ব মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষার বলে যত দূর যাইতে সমর্থ না হয়—দর্শন আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে সেই দুর্জ্ঞেয় স্থানে প্রবেশ করিতেছে। যে সকল তত্ত্ব এত দিন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল—তাহা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে।

আমরা এ স্থলে বিজ্ঞানের মূল সত্য মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহি না, জগতের যে সকল মূল তত্ত্ব, দর্শন, অসাধারণ প্রতিভা বলে আবিষ্কার করিয়াছে—এবং বিজ্ঞান যুক্তির দ্বারা—প্রমাণের দ্বারা যাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া যতদূর সম্ভব একরূপ অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছে—সেই সমস্ত মূল তত্ত্ব গুলি কি, তাহা আমরা দেখাইব।

জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইলেও অধুনা বিবর্ত্তনবাদ তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি কিরূপে সংসাধিত হয়, কিরূপে সৌরজগত, নাক্ষত্রিক জগতের উৎপত্তি হয়—কিরূপে তাহা গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য রূপে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়—এ কথা আধুনিক বিবর্ত্তনবাদ মীমাংসা করিয়াছে। কিরূপে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি হইয়াছে—জীবের সৃষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে, তাহাও বিবর্ত্তনবাদ দেখাইয়া দিয়াছে। আমরা এ সব বিস্তৃত কথার এ স্থলে মীমাংসা করিব না।

আমরা এই বিবর্ত্তন নিয়মের অধীন এইবাহ্য জগতের মূলে কোন স্থায়ী পদার্থ, কোন সৎবস্তু নিহিত আছে কি না, এবং সেই সৎবস্তুর কিরূপ শক্তি বিকাশে এই

বাহ্য জগত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই দেখাইব। এ স্থলে একটা গুরুতর দর্শনের কথার উল্লেখ করিয়া এ কথা বুঝাইব। এই জগতের যাহা আমরা জানিতে পারি, মনে করি, তাহা প্রকৃত বাহ্য জগতের কিছুই নহে। তাহা আমাদের মনের বিকার মাত্র। বাস্তবিক,—

"Man in fact, does not know any thing of substances; he knows neither minds nor bodies; he perceives only transient, isolated, internal conditions he makes; use of them to affirm and name exterior states, positions, movements, changes and avails himself of them for nothing else."

H. A. Taine.

মনে কর, আমরা যে লাল নীল পীত প্রভৃতি পদার্থের নানা রূপ দেখিতেছি, এ গুলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুকম্পন বই আর কিছুই নহে। শব্দও ত নানা রূপ অনুকম্পন মাত্র। আবার অনুকম্পনের মূল কথা কি, তাহাও ত জানি না, কারণ অনুকম্পনও মনের অবস্থা বিশেষ। সুতরাং যাহাকে আমরা রূপ বা শব্দ বলি, বাহ্যিক জগতে তাহার স্বরূপ কি, তাহা জানি না। সকল বিষয়েরই এই নিয়ম। বাহ্য জগতের স্বরূপ আমরা বুঝি না।

কিন্তু তাই বলিয়া বাহ্য জগত যে নাই, তাহা বলা যায় না। দর্শনের মায়াবাদ বা Idealism আর Realism বা Phenomenalism লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল, এখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের ভ্রম বুঝিয়াছে—এখন একরূপ স্থির হইয়াছে যে জগত সত্য, তবে আমরা তাহার স্বরূপ জানি না।

"Our conclusion is simply this that no theory of phenomena, external or internal can be framed without postulating an Absolute Existence of which phenomena are manifestations. Absolute existence therefore,—the reality of which persists independently of us, and of which Mind and Matter are the phenomenal manifestations—can'not be identified either with mind or with matter."

Fiske's Cosmic Philosophy Vol. I. p 88

পণ্ডিত স্পেন্সর সাহেব বলিয়াছেন,—

"Matter and Motion are both regarded by me as modes of manifestations of Force, and that force is the correlation of that Universal Power which transcends conciousness."

First Principles p 579.

প্রসিদ্ধ দার্শনিক মিল্ (J.S. Mill) সাহেবও এতটুকু স্বীকার করেন যে "There exists in nature a number of Permanent Causes. * * But we can give no account of the origin of the Permanent Causes themselves." Logic I. p. 378.

অতএব যদিও বাহ্য জগতের যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা বাহ্য জগতের স্বরূপ নহে, তথাপি বাহ্য জগতের অন্তরালে যে অনন্ত Force বা শক্তি সৎস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা যে বাহ্য জগত প্রত্যক্ষ করি, তাহা প্রকৃত বাহ্য জগতের জ্ঞান নহে, তাহা অজ্ঞান জড়িত আমাদের মনোভাব মাত্র। এই অজ্ঞানের অন্তরাল দিয়া যখন আমরা এই সদ্বস্তু অনুভব করিতে পারিব—এই সৎস্বরূপ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইলেও, (Transcends consciousness) হইলেও, যখন আমরা তাহাকে ধারণা করিতে পারিব, তখনই আমরা অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দ্বারে আসিব।

সে যাহা হউক, আমরা ফিস্কে ও স্পেন্সরের কথায় পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, বাহ্য জগতের যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান তাহাকে তিন

ভাগেই বিভক্ত করে। ইহারা Matter বা জড়, Motion বা গতি এবং Mind বা মন। অথবা ইংরাজী কথায় ইহারা তিনটা (M) এম্। বিবর্ত্তনবাদই বল আর যাহাই বল, সকলই এই তিন ভিত্তির উপর স্থাপিত। এক কথায় বাহ্য জগতের যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহার মূল এই তিনটী।

প্রথমত, এই অনন্ত সৃষ্টির অসংখ্য স্থূল পদার্থ মধ্যে পণ্ডিতগণ দুইটী মূল সত্য স্থির করিয়াছেন—“জড়” ও গতি”। যেখানে যে পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, তাহার মধ্যে “জড় ও গতি” এই উভয়ই সম্মিলিত থাকে, কখনই এই সম্মিলিত অবস্থার অন্যথা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। বিবর্ত্তনবাদ স্থির করিয়াছে যে, পদার্থের যতই জড়ত্ব বৃদ্ধি হইবে, ততই গতির হ্রাস হইবে—আর যতই জড়ত্বের হ্রাস হইবে, ততই গতি বৃদ্ধি হইবে। জড় জগতের বিকাশের সময়—অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টি কালে—জড়ত্বের আধিক্য ও গতির হ্রাস, আর তাহার বিনাশের সময় জড়ত্বের হ্রাস ও গতির আধিক্য হয়।

কিন্তু জীব সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র। এস্থলে স্থূল সূক্ষ্ম উভয়ই একীভূত, জড় ও গতি উভয়েরই আধিক্য থাকে। গতি রূপান্তর হইয়া জড় শরীরে প্রবেশ করে। তাই জড়ের জড়ত্ব নষ্ট হইয়া যায়। জড় হইতে জীব জগতে প্রবেশ করিবার সময় এই এক নূতন তত্ত্ব দেখিতে পাই। জীব জগতে জড় ও গতি মিশামিশি মাখামাখি হইয়া আছে। কিন্তু সচরাচর আমরা জড় জগতে গতি যে ভাবে দেখিতে পাই, জীব জগতের গতি সেরূপ নহে। জীব জগতে প্রবেশ করিয়া গতি অন্য রূপ হইয়াছে। তাহার নাম আর এখন ভৌতিক গতি বা আনবিক গতি নহে—তাহা এক্ষণে জৈবিক গতি, তাহা স্বতন্ত্র পদার্থ।

বিজ্ঞানের এত বড় একটা গুরুতর কথা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝান যায় না। দেখ যাহাকে পরমাণু বলি—যাহা জড়ের সূক্ষ্মতম অণু—তাহার মধ্যে কি একরূপ গতি নিহিত থাকে। যখন পরমাণুতে পরমাণুতে কোন সংশ্রব থাকে না, তখন এই গতি পরমাণুর মধ্যেই কোথায় লুক্কায়িত (বা বিজ্ঞানের কথায় Latent) অবস্থায় থাকে। যখনই পরমাণু আসিয়া আকর্ষণ (অথবা কিসের) বলে অন্য পরমাণুর সহিত মিশিয়া যায়—তখন সেই গতির কতকাংশ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়—তখনই পরমাণুর সহিত গতি আমরা দেখিতে পাই। দেখ একটা অক্‌সিজেন্ অণু একটা হাইড্রোজেন্ অণুর সহিত আসিয়া মিলিল। মিলনের সময় এক অদ্ভুত গতি উৎপন্ন হইয়া, তোমার কাছে তাপ রূপে প্রতীয়মান হইল। এই রূপ হাইড্রোজেন অণু আর একটা হাইড্রোজেন অণুর সহিত যখন মিলিয়াছিল, যখন তাহার (Nascent) আনবিক অবস্থা গিয়া Molecular বা দ্বণুকাবস্থা আসিয়াছিল, তখনও এইরূপ কতকটা গতি মুক্ত হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা গেল, অণু অবস্থা থাকিতে পারে না। কিন্তু যখনই আনবিক অবস্থা গিয়া যৌগিক, বা Molecular অবস্থা হইয়াছে—তখনই কত গতি এইরূপে স্বাধীন হইয়াছিল। এই অণু কোথা হইতে আসিল, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না। তবে বিজ্ঞান এই মাত্র বুঝে যে, তাহারা সৃষ্ট।

“We have reached the utmost

limit of our thinking faculties when we have admitted that, because matter can not be eternal and self-existent it, must, have been created."

Clark Maxwell, on "Atom."

যাঁহারা ইহার অধিক বুঝিতে চান, তাঁহারা আর বিজ্ঞানের পথে যান না, কল্পনা বা দর্শন বলে বুঝিতে চেষ্টা করেন। এই সকল লোকে পরমাণু গুলিকে, এবং তাহার আনুষঙ্গিক গতিকে, কোন এক আদি শক্তি হইতে সৃষ্ট বিবেচনা করেন। বাস্তবিক বিজ্ঞানের সন্দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া, এই পথ ব্যতীত জ্ঞানের অগ্রসর হইবার আর অন্য পথ নাই।

সুধু ইহাই নহে। কোন্ সময়ে পরমাণু সৃষ্টি হইয়া যে যৌগিক দ্বণুক প্রভৃতি সৃষ্টি হইল—ও তাহার সহিত এই গতির স্বাধীন স্ফূর্ত্তি হইল, তাহাও বিজ্ঞানের সীমার অতীত।

"The formation of molecule is an event not belonging to that order of nature under which we live."

C. Maxwell.

সে যাহা হউক, আমরা যাহা বলিলাম বোধ হয় ইহাতেই পাঠকগণ একরূপ বুঝিয়াছেন যে, অণুতে অণুতে মিলিলে গতির আবির্ভাব হয়। সেইরূপ এক দ্বণুক বা ত্র্যণুকের সহিত আর এক দ্ব্যণুক বা ত্র্যণুক মিলিলেও গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকলেই জানেন, চুনের সহিত হরিদ্রা মিলাইলে বড়ই উত্তপ্ত হয়—ইহাই আনবিক গতির লক্ষণ। প্রায় সকল স্থানেই এই সাধারণ নিয়ম। জড়ের সহিত জড় মিলিলেই গতির মুক্তি। আর জড় হইতে জড় বিচ্ছিন্ন হইলেই গতির অবরোধ হয়। সকল রাসায়নিক ক্রিয়ারই এই নিয়ম।

এই জড় ও গতির কথা বলিবার সময় একটা কথা বলা হয় নাই। সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে, এই গতির মূলে একটা শক্তি নিহিত আছে। স্বতঃ গতি সম্ভব নহে। ইহার মূল কারণই এই শক্তি। সুধু গতি বলিয়া নহে, বলিয়াছিত, জড়েরও একটা মূল কারণ আছে। বিজ্ঞান বলে যে, জড় পরমাণুগুলি সৃষ্ট। কিন্তু যাহা ছিল না তাহা হইতে পারে না, এই পুরাতন কথা আজ বিজ্ঞান, Conservation of matter ও energy এই মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিয়াছে। সুতরাং এই জড়ের—অথবা এই জড়ের সূক্ষ্মতম অংশ অণুর মূলে একটা কি আছে, যাহা হইতে এই জড় সৃষ্টি হইয়াছে। এই পদার্থটাকে বিজ্ঞান শক্তি বলে। হবার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিত বুঝিয়াছেন যে, Matters (atoms) are centres of force এই শক্তি সুতরাং জড় পরমাণুর স্রষ্টা,—জড়জগত স্রষ্টা এবং এই জড়ের গতিরও স্রষ্টা। জড়ের গতিকে বিজ্ঞান Motion বলে। সুতরাং দেখা গেল, বিজ্ঞান যাহাকে Matter ও Motion বলে, সে দুইটাই সৃষ্ট। এবং সেই জন্য তাহার স্রষ্টা কল্পনা করিতে হয়। এই স্রষ্টা এক শক্তি। এ কথা এস্থলে আর অধিক বিবাদ করিয়া বুঝাইব না।

এখন জড় জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া জীব জগতের কথা বলা যাউক। জীব জগতের এক সম্পূর্ণ নূতন নিয়ম দেখিতে পাই। জড় যখন জড়কে আকর্ষণ করে, তখন তাহা হইতে গতিকে তাড়াইয়া দেয়, আর জড় যখন জড়কে প্রত্যাখ্যান করে, তখন সে গতির সহিত মিলিয়া যায়। কিম্বা এক কথায় জড়কে জড় আকর্ষণ করিলে

গতি চলিয়া যায়। আর গতিকে গতি আকর্ষণ করিলে জড় চলিয়া যায়। জড় রাজ্যের নিয়ম, সম পদার্থ সম পদার্থকে আকর্ষণ করে, আর বিষম পদার্থকে প্রত্যাখ্যান করে।* কিন্তু জীবজগতে এই নিয়মের বিশেষ হয়। এখানে জড় গতিকে ছাড়িয়া অন্য জড়ের সহিত গিয়া মিলে না। এখানে কি এক উচ্চতর শক্তিবলে জড়ে গতিতে মিশামিশি মাখামাখি। কে যেন জড় ও গতি উভয়কে আকর্ষণ করিয়া স্বায়ত্ব করিয়া লইতেছে। জড় জড়ের সহিত একা অধিক দূর মিলিতে পারেনা। গতিতে গতিতে এত মিশামিশিও আর কোথাও হয় না। বিজ্ঞানবিদ্ পাঠক জানেন, রাসায়নের, (Inorganic) যৌগিক পদার্থ গুলিতে উর্দ্ধসংখ্যা কুড়িটী পরমাণু মিলিতে পারে। কিন্তু Organic পদার্থে দুই শত, কখন বা দুই সহস্র পরমাণু এক হইয়া একটা Molecule সৃষ্টি হয়। জীব জগতে কি একটা উচ্চশক্তি জড় ও গতিকে লইয়া মিলায়—তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করে—তাহাদিগকে আপন মনমত করিয়া সাজায়—আপনার আবশ্যক মত বন্দোবস্ত করিয়া লয়।

"Essential characteristic of living organic matter is that it unites this large quantity of contained motion with a degree of cohesion that permits temporary fixity of arrangement."
First Principles. p. 297.

অথবা,—"Organic aggregates differ from other aggregates alike in the quantity of motion they contain, and the amount of rearrangement of parts that accompanies their progressive integration." Ibid. p. 299.

অতএব জীবজগতে যাহা দ্বারা জড় ও গতির এইরূপ মিলন হয়, তাহা এক উচ্চতর শক্তি। কেহ কেহ এই শক্তিকে Organic force বলে। কেহ কেহ ইহাকেই Vital force বলেন। এই শক্তি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই এইরূপ জড় ও গতির মিলন থাকে। তখনও গতি বিক্ষেপ শক্তির বলে জড় হইতে চলিয়া যাইতে চাহে—জড়ও এত গুরুতর মিলনে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। কিন্তু এই উচ্চতর শক্তিই তাহাদের বিক্ষেপ শক্তিকে বাধা দেয়, তাহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া থাকে। যতক্ষন এই শক্তির ক্রিয়া থাকে, ততক্ষণই জীবন। তাহার পরই, জীবন যাইলে—এই শক্তি রূপান্তরিত বা স্থানান্তরিত হইলে (কারণ শক্তির বিনাশ নাই) গতি জড়কে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে—মৃত্যু এবং বিশ্লেষণ উপস্থিত হয়।

এই জীব জগতের নিম্নতম বিকাশ উদ্ভিদ। উদ্ভিদ হইতে ক্রমে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব, মৎস্য, সরিসৃপ, পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট হইতে ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্টতর জীবের—এবং অবশেষে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবজগতের এই ক্রমোন্নতির কারণ এই যে, ক্রমে ক্রমে অধিকতর শক্তি ও জড় আয়ত্বীকৃত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারাই ক্রমশ উচ্চতর জৈবিক শরীর সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য শরীরে জড়ের তুলনায় যে পরিমাণে গতি আয়ত্বীকৃত হইয়াছে, উদ্ভিদ শরীর

---

* পাঠক এই স্থলে চুম্বক ও বিদ্যুতের কথা মনে করিয়া যেন এই সাধারণ নিয়ম ভ্রমপূর্ণ মনে না করেন। বিষম চুম্বক আকর্ষণ করে বা বিষম তড়িত আকর্ষণ করে ইহাও, অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এই সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত বুঝিতে পারিবেন। এস্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণের স্থান নাই।

হইলে, সেই পরিমাণ গতিই মনুষ্যশরীর অপেক্ষা বিশগুণ স্থান ও জড়পদার্থ অধিকার করিয়া ফেলিত। অতএব এই জীব জগতের মূলেও এক শক্তি নিহিত রহিয়াছে। যে শক্তির এক রূপ বিকাশে জড় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই আর একরূপ বিকাশে গতি (বা ভৌতিক শক্তি) সৃষ্টি হইয়াছে। এবং তাহারই আর এক রূপ বিকাশে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।

আরও এক কথা আছে। আমরা এ পর্য্যন্ত জড় ও গতি এবং জীব, এই কয়টী, বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি। ইহা ব্যতীত আর একটী বিষয় আছে। উদ্ভিদ এবং জীব, ইহাদের উভয়ের মধ্যেই জৈবিক কার্য্য দেখিতে পাই। তবে ইহাদের মধ্যে এরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ কেন? সকলেই জানেন, জীব জগতে আর একটী নূতন ব্যাপার আমরা দেখিতে পাই—সেইটী মন। অতি নিম্নতম জীব হইতেই এই মনের অস্তিত্ব বুঝা যায়, তবে পুরুভূজের ন্যায় উদ্ভিদবৎ জীবে আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না। ক্রমে ক্রমে উচ্চতর জীবে আমরা মনের বিকাশ বুঝিতে পারি। অবশেষে মনুষ্যে, মনের এক অংশ ইচ্ছা শক্তি বা অহং জ্ঞান, আর এক অংশ মনোবৃত্তি এবং এক অংশ বুদ্ধিরূপে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। মনের সহিত জৈবিক কার্য্যের কিরূপ সম্বন্ধ আছে, বুঝান সহজ নহে, তবে মনের ক্রমবিকাশের সহিত যে এই জৈবিক ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহা স্থির। বোধ হয় যেরূপ জৈবিক ক্রিয়ার আধিক্যে জড় ও গতি অধিক পরিমাণে আয়ত্বীকৃত হয়, সেইরূপ মনঃশক্তির আধিক্যেও জৈবিক ক্রিয়ার অধিক পরিমাণে বিকাশ হয়। একথা পরে বলিতেছি।

এই জড় ও গতির তত্ত্ব, বিজ্ঞান বা science আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়। জৈবিক ক্রিয়ার কথা শারীর-তত্ত্ব বা Physiology আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়, আর মনের তত্ত্ব মনোবিজ্ঞান বা Psychology আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। আর এই তিনের সামঞ্জস্য রাখিয়া সমস্ত জগত-কার্য্য বিষয়ে যে একীভূত জ্ঞান—এই তিনের মূলে যে স্বরূপ নিহিত আছে, তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকেই Philosophy বা দর্শন বলা যায়। পণ্ডিত হর্ব্বার্ট স্পেন্সর Philosophy অর্থে এইরূপ বুঝিয়াছেন,—

"Knowledge of the lowest kind is *unnified* knowledge; Science is partially *unified* knowledge: Philosophy is *completely unified* knowledge."

উ[illegible] মতে কি ভৌতিক জগত, কি জৈবিক জগত ও কি মন, সকলই মূলত, সেই এক আদি শক্তি হইতে জাত। এই আদি শক্তির একরূপ বিকাশকেই আমরা জড় বলিয়া বুঝি, আর এক রূপ বিকাশকেই আমরা জীব বলিয়া বুঝি। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হর্শেল বলিয়াছেন,—

"The universe presents to us with an assemblage of phenomena, *physical, vital, intellectual*; the connecting link between the world of intellect and matter being that of organised vitality occupying the whole domain of animal and vegetable life throughout which, in some way inscrutable to us, movements among the molecules of matter are originated of such a character, as apparently to bring them under the control of an agency other than physical superseding the ordinary laws which regulate the movement of inanimate matter, or in other words *giving rise*

to movements which would not result from the action of those laws interfered with, and therefore implying in the very same principle, the origination of force."

অতএব দেখা গেল, সেই একই শক্তি, যাহার (Actual play remains unintelligible) কখন ভৌতিক কার্য্য রূপে, কখন জৈবিক কার্য্য রূপে, আর কখন মনঃশক্তি রূপে আমাদের নিকট সর্ব্বদা প্রতিভাত হইতেছে। আমরা এই শক্তি স্বরূপ কি, তাহা জানি না—কখনও জানিতে পারিব না। কারণ "Conception given in phenomenal manifestations of this ultimate energy can in no wise shew us what it is." Herbert Spencer.

এস্থলে এবিষয়ের শেষ মীমাংসার পূর্ব্বে আর কটা বিষয় মীমাংসার আবশ্যক। আমরা এই যে তিন প্রকার শক্তির বিকাশের কথা বলিলাম, তাহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা কেহ কি দেখাইতে পার? জড়কে কেটা M শক্তি ছাড়া দেখিয়াছ? জড়ে শক্তিতে যে সম্বন্ধ কি ভাব, তাহার বাহার কোথাও দেখিয়াছ কি? ইহারা যেন একটা দ্রব্যের দুটা অঙ্গ, একটা পক্ষীর দুইটী পক্ষ। বাস্তবিক Motion ছাড়া Matter নাই, আবার কোথাও Matter ছাড়া Motion নাই।

বাস্তবিক "Without its relation to, and union with force or motion matter has no existence just as force or motion has no existence without its relation to and union with inertia."

দার্শনিক বেনও তাহাই বলেন, তাঁহার মতে, "Matter and force are not two things but one thing."

সুতরাং জড়ও গতি ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা বিজ্ঞানের সুবিধা জন্য কল্পনা মাত্র। ষ্টেলো সাহেব বলেন যে, "Matter is an ideal complement of two attributes belonging to all bodies alike." Concepts of **Modern Physics.**

আর এক কথা—জীব ছাড়া জড় কোথাও কেহ কি দেখাইতে পার? যেখানে জড় সেই খানেই জীব। এক ফোঁটা জলেও, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখ, কোটী কোটী কীটাণু দেখিতে পাইবে। এমন ক্ষুদ্র কীটাণু আছে যাহার আয়তন এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও অল্প হইবে। এমন স্থান নাই যেখানে এই সকল কীটাণু দেখিতে পাইবে না। জলে অসংখ্য কীটাণু, স্থলে অসংখ্য কীটাণু, শূন্যে অসংখ্য কীটাণু।

"From innumerable and separate points of this teeming earth myriads of protoplasm spring into existence and serve as food for more highly organised rivals." G. H. Lewis.

এইরূপ "air contains invisible or ultramicroscopical particles."

আর অধিক কি দেখাইব। সংসারে এমন স্থান নাই যেখানে জীব নাই। এমন জড় নাই যাহার সহিত জীব নাই।

এখন কথা হইতেছে, জড়ের সহিত জৈবনিকের সম্বন্ধ কি? বিলাতে ব্যাসটিয়ান (Bastian) সাহেব তাঁহার Spontaneous generation নামক প্রবন্ধে এবং Beginnings of Life নামক পুস্তকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জড় হইতেই—জড় শক্তি হইতেই জীব উৎপন্ন হইতে পারে। তিনি দেখাইয়াছেন, জল আগুনে ফুটাইলে যখন তাহার সমুদায় জৈবনিক নষ্ট হয়, তখন তাহাকেও বোতলে সম্পূর্ণ রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, কিছুদিন পরে সেই জলেই জৈবনিক জন্মিয়াছে দেখা গিয়াছে। ইহাকেই Law of Archebiosis বলে। টিনডলের মত জড়বাদী পণ্ডিতও বলিয়াছেন;—"I discern in that matter the promise and potency of every form of life." Tyndall's Address 1874.

স্পেন্সর সাহেবও দেখাইয়াছেন;—"The conception to which the physicist tends is much less that of a universe of dead matter than that of a universe everywhere alive: alive if not in the strictest sense, still in a general sense." Herbert Spencer.

অতএব যেরূপ জড়ের সহিত ভৌতিক শক্তি বা গতির পার্থক্য নাই—তদ্রূপ জৈবনিক ছাড়া জড়ও মিলে না। এই জগতে তাহাদের এত মিশামিশি যে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করা যায় না। আসল কথা, যাহাদিগকে সচরাচর জড় পরমাণু বলে, আমরা দেখাইয়াছি যে, তাহাদের একরূপ সম্মিলনে জড় পদার্থ উৎপন্ন হয়—রাসায়নিক Inorganic পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই জড় পরমাণুরই আর একরূপ সম্মিলনে জৈবিক শরীর উৎপন্ন হয়—ও তাহার সহিত জৈবিক ক্রিয়ারও বিকাশ হয়। অর্থাৎ অবস্থা বিশেষে—

"Molecular force become structural." Tyndall's Address.

আর এক কথা, জৈবিক ক্রিয়া (এক রূপ গতি ক্রিয়ার) রূপান্তর মাত্র। বলিয়াছিত, জড়ের মিলনে গতি অন্তর্হিত হয়—কিন্তু জৈবিক ক্রিয়ার বলে জড় ও গতি একত্র সম্মিলিত হয়। সুতরাং জৈবিক ক্রিয়া গতির একরূপ বিকাশমাত্র। পণ্ডিত স্পেন্সর বলেন যে, এই জৈবিক ক্রিয়া কেবল "The metamorphosis of retained motion that accompany the metamorphosis of retained matter."

সুধু তাহাই নহে, স্পেন্সর আরও বলেন, "The forces called vital, we have seen to be correlates of the force called physical." এবং "There is a correlation and equivalence between sensation and those physical forces which in the shape of bodily actions result from them." First Principles.

সুতরাং যে গতি শক্তি জড়কে লইয়া ভৌতিক ক্রিয়া করে, তাহাই অন্য কারণে অন্য শক্তির বশে জৈবিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে।

কিরূপে এই শক্তি রূপান্তরিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মনঃশক্তি বা অন্য একটা শক্তি আছে, তাহার দ্বারা এইরূপ গতি ও জড় উভয়ই রূপান্তরিত হয়—জীব উৎপন্ন হয়।

অনেক জড়বাদী পণ্ডিত আবার এই উচ্চ শক্তি স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলেন যে, পরমাণুদিগের মধ্যে নাইট্রোজেন নামক যে মূল পদার্থ আছে, ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহাকে সাধারণত নিষ্ক্রিয় বোধ হইলেও, যখন ইহা অন্য মূল পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন ইহা অধিক পরিমাণে গতি আকর্ষণ করিয়া লয়। ইহার এই অসাধারণ ক্ষমতাতেই জৈবিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই জন্যই অবশেষে ক অণুর মধ্যে নাইট্রোজেন [illegible], তাহাকে। এই জন্য—বারুদ, উচিত। ডাইনামাইট্ প্রভৃতি দাহ্যমান পদার্থটুকু বুঝায়, নাইট্রোজেন অণুর দ্বারা গঠিত হওয়ায় সেইরূপ গুণযুক্ত হইয়াছে। এই সকল জড়বাদী পণ্ডিতগণ এই সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী যুক্তি দেখাইয়া থাকেন, সে সকল জটিল বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

সে যাহা হউক, জৈবিক ক্রিয়া যে রূপান্তরিত জড় ও গতির সম্মিলনে উৎপন্ন হয়, তাহা স্বীকার করিলেও—জড় ও গতির এইরূপে রূপান্তর হইবার কারণ আছে—তাহাদিগকে এইরূপে রূপান্তরিত করিবার জন্য উচ্চতর শক্তির ক্রিয়া আবশ্যক হয়—তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হয়।

কারণ, যখন মনঃশক্তি ও জৈবিক শক্তির

মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ আছে যে, তাহাদের মধ্যে একটীর আধিক্যে আর একটীর আধিক্য হয়, একটী হ্রাস হইলে আর একটী হ্রাস হয়—তখন অনুমানের (Induction) অভ্রান্ত প্রমাণ বলে (method of concommitant variations) সাহায্যে একটীর সহিত আর একটীর যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হয়।

অতএব যেমন ভৌতিক জগতে জড় ও শক্তির সহিত মিশামিশি, সেই রূপ মনঃশক্তির সহিতও জড়ের ও শক্তির মিশামিশিতে জীবজগতের উৎপত্তি। তবে মনের বিকাশ সর্ব্বত্র আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয় না। জীব জগতে জৈবিক ক্রিয়ার সহিত যে মনের বিকাশ হয়, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না—তবে উদ্ভিদ্ জগতে এই মনের অস্তিত্ব আছে কি না, তাহা M শক্তি [illegible] বটে। উদ্ভিদবিদ্ পরীক্ষিতে যে [illegible] (carnivorous) উদ্ভিদের কোথাও [illegible] যে, স্বভাবতই তাহা একটা দ্রব্যোর্য্য সংগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ কৌশল প্রদর্শন করে। বাস্তবিক যেখানে জৈবনিক ক্রিয়ার বিকাশ, সেই স্থলেই জৈবনিক শরীর রক্ষার্থ কোন না কোন রূপ কৌশল (?) আবশ্যক করে। চারিদিকের অবস্থা সমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়াই উদ্ভিদকে পরিপুষ্ট হইতে হয়। জৈবনিক শক্তির প্রথম সংগ্রাম—বলিয়াছিত, জড় শক্তির সহিত চলিতে থাকে। ইহাতেই মনের এক রূপ নিম্নতম বিকাশ উপলব্ধি হইতেছে। দেখ মনের একটী প্রধান অঙ্গ ইচ্ছা শক্তি। এই শক্তির নিম্নতম বিকাশ, দার্শনিকদিগের মতে "Spontaneity of movement" এবং "self-preservation." উদ্ভিদ্দিগের মধ্যে মনঃশক্তির এই নিম্নতম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

আরও দেখ, অঙ্গ পরিচালনে আমাদিগের একরূপ বৃত্তি উত্তেজিত হয়। রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া প্রভৃতি সাধারণ জৈবিক কার্য্যেই মনের চেষ্টার নিম্নতম বিকাশ দেখিতে পাই। উদ্ভিদেও সুতরাং মনের এই রূপ একটা নিম্নতম বিকাশ হয় না, তাহা বলিতে পার না। আসল কথা যেখানে জৈবনিক ক্রিয়ার বিকাশ—সেই খানেই তাহার মূলে অবশ্যই মনঃশক্তি নিহিত থাকিবে। বলিয়াছি ত, এই জৈবনিক ক্রিয়ার অধিক স্ফূর্ত্তির সহিত মনঃশক্তিরও স্ফূর্ত্তির আধিক্য দেখা যায়। অথবা মনঃশক্তির ক্রমবিকাশের জন্যই জৈবনিক ক্রিয়ার এবং তাহার সহিত জীব শরীরের (উদ্ভিদ শরীরেরও বটে) ক্রম-বিকাশ হয়। এই মানস শক্তির বিকাশ হইয়া একটা সীমায় না আসিলে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জৈবনিক ক্রিয়ায় তাহার সমুদায় শক্তি পর্য্যবশিত না হওয়ায় তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্তির উপায় না হয়, সে পর্য্যন্ত মনের কার্য্য আমাদের উপলব্ধি হয় না। আসল কথা, জৈবিক ক্রিয়াই মনঃশক্তির সাধারণ কার্য্য। এই সাধারণ বা সামান্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও মনঃশক্তির কতক অংশ বাকী থাকিলে তবে তাহার বিশেষ ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয়। এ কথা পরে বলিব।

অতএব দেখা গেল, আমরা জগতে যে থানে যে বস্তু দেখি—তাহার কতটুকু জড়, কতটুকু গতি, আর কতটুকু মন, তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি না। এইমাত্র জানি যে, জগতে জড়ের স্বতন্ত্র সত্তা নাই,

গতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই—এবং মনেরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সকলেরই কি একরূপ মিশামিশি ভাব—কি একরূপ মাখামাখি ব্যাপার। গাছ, পাথর, মাটী যাহা কিছু দেখ—সকলের মধ্যেই শক্তির এই ত্রিমূর্ত্তি বিরাজমান। বলিয়াছিত, তুমি সাবধানে প্রস্তুত করা,পরীক্ষিত, রাসায়নিক পণ্ডিতের যত্ন-রক্ষিত একটু অম্লজান বায়ু অথবা এক টুকরা কয়লা লও। অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহাতেও জৈবনিক দেখিতে পাইবে। চোঁয়ান জল লইয়া দৃঢ় বদ্ধ করিয়া রাখ, কিছু দিন পরে তাহাতেই বড় বড় কীটাণু দেখিতে পাইবে।

অতএব মন, জড়, ও শক্তি এতিনের স্বতন্ত্র সত্তা কোথাও দেখিতে পাও কি? বাস্তবিক এই তিনই এক শক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র। আমরা কেবল বোধসৌকার্য্যার্থে ইহাদিগকে বিভিন্ন করিয়া লইয়া থাকি এই পর্য্যন্ত।

মূল শক্তির এই তিনরূপ বা তিন প্রকার বিকাশের কথা বলা শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এই একটী শক্তির এরূপ সম্বন্ধ আছে যে যখন একটীর বিকাশাধিক্য হয়, তখন অন্যগুলি অভিভূত থাকে। আমরা একথা কতক পরিমাণে পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। বলিয়াছি যে জড় শক্তির নিয়ম এই যে, যখন জড়ের সম্মিলন হয়—তখন তাহার অন্তর্ভূত শক্তি বা গতি দূর হইয়া যায়। জড়ের সম্মিলনের নিয়মই এই। আর এক কথা, জড় জড়ের সহিত অধিক দূর মিশিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড় জোর কুড়িটী পরমাণু লইয়া একটী Inorganic molecule হইতে পারে। কিন্তু জৈবনিক ক্রিয়া সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র। এ শক্তি জড়পরমাণুকেও চায়, আবার তাহার সহিত জড় শক্তিকেও চায়। সুতরাং ইহা জড় ও গতিকে স্বায়ত্ত করিয়া রাখে। কিন্তু জড় শক্তি এই অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে; অতএব যদিও জড় ও জৈবনিক শক্তি উভয়ে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহাদের এক জনকে আর এক জন অভিভূত করিয়া রাখে।

মনুষ্য শরীরের ন্যায় উচ্চ জৈবনিক শরীর যখন বিনষ্ট হয়, তখন তাহার কতক নিম্ন জৈবনিক শরীর (Bactria প্রভৃতি,—Modern germ theory of decay দেখ) এবং কতক জড় ও জড় শক্তি রূপে পরিণত হয়, তখন তাহার উচ্চতর জৈবনিক-ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়,অথবা অন্যরূপে রূপান্তরিত হয়।

অবশেষে ক্রিয়াকে আমরা জৈবনিক ক্রিয়া বলিব, তাহা মোটামুটি স্থির করিয়া রাখা উচিত। Life বা Vitality বলিলে যত টুকু বুঝায়, তাহা স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মানুষের শরীরেই এই জৈবনিক ক্রিয়ার উচ্চতর বিকাশ। মানুষের জৈবনিক ক্রিয়া সম্বন্ধে ডাক্তরগণ কি বলেন, তাহা এই স্থলে দেখাই,—"Animal life is nothing more or less a continued transformation of matter, the ceaseless operations of two opposing processes of waste and supply. * * * These two grand processes of supply and waste comprise the functions of digestion, absorption, circulation, assimilation, respiration, and excretion."

Hunter on Hydropathy p. 18.

অথবা দেশী কথায় বলিলে প্রাণ (Respiration) অপান (Excretion) সমান (Digestion) উদান (Assimilation ও Absorption) এবং ব্যান (Circulation)

এই কয়টী ক্রিয়াই জৈবিক কার্য্য। মনুষ্য হইতে যত আমরা নিম্নতর জীবে যাই, ততই এই জৈবিক ক্রিয়ার কার্য্য কমিতে থাকে, তাহার আর এত বহুরূপ বন্দোবস্ত থাকে না। উদ্ভিদ মধ্যে এই ক্রিয়া আরও সরল; সেখানে Absorption, Assimilation ও Circulation এই কয়টী সামান্য পরিমাণে দেখা যায় মাত্র।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই জৈবিক ক্রিয়ার মূলে আমরা আর এক শক্তি দেখিতে পাই। জৈবিক ক্রিয়াও বাস্তবিক ধরিতে গেলে এই শক্তির অধীন। এই শক্তিকে আমরা মানস শক্তি বলিয়াছি। বলিতে গেলে এই জৈবিক ক্রিয়া ইহার বৃত্তি বিশেষ মাত্র। যখন জৈবিক ক্রিয়া অতি সামান্য হয়, তখন জৈবিক ক্রিয়াই প্রবল হয়, তাহার মূলে কারণ স্বরূপে যে মনঃ শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাটা M শক্তি হয় না। বাস্তবিক তখন জৈবিক ক্রিয়া ও মনঃশক্তির কার্য্য উভয়ের কোন ইতর বিশেষ থাকে না। বলিয়াছিত, সমস্ত উদ্ভিত জগতে এই নিয়ম। তখন ক্রিয়া শক্তির দ্বারা মনঃশক্তি অভিভূত থাকে।

অতএব জগতের সমস্ত রাসায়নিক কঠিন ও তরল পদার্থের মধ্যে যদিও জড়, গতি ও মনঃশক্তি তিনই নিহিত আছে, কিন্তু তাহাতে জড়ের বিশেষ আধিক্য জন্য গতি অভিভূত থাকে। তাহার অতি সামান্য অংশ কখন কখন তেজঃ রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। এবং তাহার মধ্যে মনঃশক্তিও নিহিত থাকে, কারণ তাহার কার্য্য যে জৈবিক ক্রিয়া, তাহা জড় পদার্থের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে (কেবল অনুবীক্ষণ দ্বারাই তাহা উপলব্ধি হয়)। এইরূপ বায়ু, তেজঃ প্রভৃতির মধ্যে গতিরই আধিক্য থাকে, জড় তাহার মধ্যে অভিভূত বা প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র এবং তাহার সহিত জীবও বর্ত্তমান থাকে। জীবের মধ্যে জড় ও গতি এবং মনঃশক্তি যে নিহিত থাকে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

অতএব জগতে যে তিন শ্রেণীর বস্তু দেখিতে পাই, যে ভৌতিক জগত (Inorganic world) জৈবিক জগত (Organic world) এবং মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চতর জীব জগত (Animal world) দেখিতে পাই, তাহারা জড়, গতি ও মন এই তিনের সমবায়ে উৎপন্ন। ভৌতিক জগত জড় প্রধান, গতি ও মনঃ তাহার মধ্যে অভিভূত থাকে, বিশেষত তাহার মধ্যে মনের অস্তিত্ব আমরা সহজে কল্পনা করিতে পারি না। এইরূপ জৈবিক জগত গতি প্রধান। ইহাতে সাধারণ জড় ও গতি অভিভূত হওয়ায় এক নূতন রূপ গতি দেখিতে পাই। কারণ ইহার মধ্যে যদিও মন অভিভূত থাকে, তথাপি মনের ক্রিয়া যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে এই শক্তি কতক পরিমাণে অভিভূত থাকে। সাধারণ জীব জগতে মন ও গতির আধিক্য—তবে এখানে মনের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক,—তবে তাহা জৈবিক ক্রিয়ারূপে অনুভূত হয় মাত্র।

এখন মানুষের কথা বলা যাউক। মানুষের মধ্যে মনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ। জৈবিক ক্রিয়াকে অভিভূত করিয়া সমস্ত গতিকে—জড়কে অভিভূত করিয়া, মনের বিশেষ ক্রিয়ার বিকাশ হয়, এইখানেই তাহার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। অতএব যেমন ভৌতিক জগত জড়প্রধান, জৈবিক জগত গতিপ্রধান, সেইরূপ মানুষ মনঃপ্রধান।

আবার যেখানে মানুষের মন জৈবিক ক্রিয়ায় বিশেষ রূপে আকৃষ্ট থাকে, মনের স্বতঃ ক্রিয়া—তাহার নিজ শক্তির বিকাশ হয় না—সেই খানেই মানুষ নিকৃষ্ট জীব।* তাহারা হয়ত Respiration, Digestion প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত,—না হয় মনের নিম্নতর বৃত্তি গুলির দ্বারাই ক্রিয়াশীল। আরও এক কথা বলিয়াছি, সাধারণত মানবশরীরে এত অধিক পরিমাণ গতি জড়ের সহিত অভিভূত থাকে যে, মনুষ্যশরীর উদ্ভিদে পরিণত হইলে তাহার শরীরায়তন বিশগুণ অপেক্ষা অধিক হইবে। অতএব মানুষে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ গতি জড়ের সহিত মিলিত থাকে। যদি এই গতির অংশ অল্প হয়, জড়ের ভাগ অধিক হয়, তাহা হইলে সে লোকের ক্রিয়া শক্তি অল্প হইয়া যায়। জড়ত্বের বেশী আধিক্য হইলে, তাহার, "নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি দোষ হয়। † এই জন্য কোন ফরাসী নভেল লেখক বলিয়াছেন—

"God lends the soul to the body it is true. But it is no less true that during the time the soul animates the body, there is a union between the two—an influence of one over the other—a supremacy of matter over mind, or mind over matter, according as for some purpose hidden from us. God permits either the body or the soul to be the ruling power." Dumas' Memoir of a Physician.

অতএব জগতের যেখানে যে পদার্থই আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার মূলে এই তিনটী মূলতত্ব আমরা দেখিতে পাই—সেগুলি, মন (বা Intelligence) গতি (Motion) এবং জড়। ইহার মধ্যে জড় ও গতিতে (এবং অল্প মাত্রা মনের দ্বারাও) ভৌতিক জগত, গতি ও মনে (এবং জড়ে) জৈবিক জগত। আর মন ও গতি ও জড়ে মানুষ হইতে সমস্ত জীবজগত সৃষ্টি হইয়াছে।*

অবশেষে আর একবার বলিয়া রাখি যে, মনই বল, আর গতিই বল, আর জড়ই বল, সকলের মূলেই শক্তি নিহিত আছে, সকলেই শক্তির বিকার মাত্র। এই শক্তিরই একরূপ পরিণামে মন, আর একরূপ পরিণামে গতি, এবং আর একরূপ পরিণামে জড় সৃষ্ট হইয়াছে। এই তিন শক্তিক্রিয়ার বিনাশ নাই, ইহারা অবিনশ্বর, কারণ, ইহা-

---

* এই স্থলে বলিয়া রাখি যে, আমরা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা অনুশীলন করিতে গিয়া প্রাচীন আর্য্যঋষিরা যে সত্য আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহাই প্রমাণ করিয়া ফেলিলাম। যে লোকের মন ক্রিয়া শক্তি ও জড়কে অভিভূত করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়, সেই সাত্ত্বিক লোক। যাহার মন, ক্রিয়া শক্তির সহিত, জৈবিক শক্তির সহিত একীভূত, সেই রাজসিক লোক। আর যাহার জড় ভাগ অধিক ক্রিয়া শক্তি অল্প এবং ইহার দ্বারা তাহার মন অপেক্ষাকৃত অভিভূত থাকে, সেই তামসিক লোক।

† "Wherever powers of the sort which can be named *vital* are at work, in the body, all doctors are agreed, the first condition of complete health is, that each organ perform its functions unconsciously, unheeded. * * The beginning of inquiry is disease."
Carlyle's Essay of Characteristics.

* এস্থলেও আমরা অজ্ঞাতসারে আর্য্যপণ্ডিতদিগের ত্রিগুণে আসিয়া পড়িলাম। সত্ব গুণে মন, রজো গুণে গতি, আর তমো গুণে জড় (Inert matter) বুঝিতে হইবে। ইহার রজঃ ও তমো গুণে ভূত সৃষ্টি। রজঃ আধিক্য সত্ত্ব গুণে জৈবনিক সৃষ্টি, এবং সত্বাধিক্য রজোগুণ মনুষ্য সৃষ্টি। একথা নবজীবনে দেখান যাইবে।

দের মূলে যে আদিশক্তি রহিয়াছে, তাহারও বিনাশ নাই, কারণ

"By indistructibility of matter (motion and mindt) we mean the persistence of force (by which they are caused) এবং by persistence of force we really mean the persistence of some Cause which transends our knowledge and conception."

H. Spencer.

সুধু তাহাই নহে, এই তিনটী শক্তির পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ (Correlation) আছে যে, একটী আর একটীতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু এরূপ পরিণাম জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। অথবা জড়, গতি ও মনের স্বতন্ত্র সত্তা আমরা প্রত্যক্ষ করি না, এই তিনেই মিশামিশি, তিনেই মাখামাখি। অতএব যে মূল আদিশক্তি হইতে এই তিন পরিণাম হইয়াছে, তাহার এই তিন বিভিন্ন বিকাশও আমরা বিভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। আমরা এই মূল আদি শক্তির স্বরূপ জানিব কি, তাহার প্রথম যে বিকাশ প্রত্যক্ষ হয়, তাহারও আমরা স্বরূপ বুঝি না। এই আদিশক্তি অনন্ত, অজ্ঞেয়, সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ (Absolute) ইহা সমস্ত বিশ্বই ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তি বা প্রকৃতি। এমন জড়বাদী কে আছে, এমন নাস্তিক কে আছে—যে উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে মুক্ত কণ্ঠে না বলিবে—"Without postulating Absolute Being—existence independent of the conditions of the process of knowing—we can frame no theory whatever, either of internal or of external phenomena." অথবা দর্শন ও বিজ্ঞানের চরম সীমায় দাঁড়াইয়া কে না স্বীকার করিবে যে, "We find the continued existence of the Unknowable, as the necessary correlative of the knowable." H. Spencer. First Principles p 192d.

আমরা ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, বালুকণা সদৃশ মানুষ—আমরা সেই মূল আদিশক্তির অতি সামান্যতম বিকাশ—অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গমাত্র—আমরা তাহার জড় তত্ত্ব কিরূপে বুঝিব?—

"We the whole species of Mankind and our whole existence and history are but a floating speck in the illimitable ocean of the ALL."

T. Carlyle.

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

† মনঃশক্তি যে অবিনশ্বর, ইহা আপাতত নূতন বোধ হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের ও দর্শনের অভ্রান্ত যুক্তি বলে আমরা দেখাইলাম যে,মনঃশক্তিকে কখনই বিনশ্বর বলা যায় না। ইহার অধিক বিশদ করিয়া বুঝাই, এরূপ স্থান নাই

হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ।

মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেকেই বিজ্ঞ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু সকল বিষয়ে সকলের মীমাংসার সামঞ্জস্য দেখা যায় না; বরং বিস্তর বিষয়ে মতভেদই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরাশর বিধবাগণের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু মনু বলিলেন যে, স্ত্রী বিধবা হইলে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিবেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা অবশ্য এ কথা বলিতে পারি না যে, একের বিধি দোষযুক্ত, অপরের বিধি দোষশূন্য। যদি একের বিধি দোষযুক্ত হইবে, তবে দুই জন নহে, দশ জন নহে, সহস্র জন নহে, সমস্ত হিন্দু-সমাজ তাহা মান্য করিয়া চলিল

কেন? আর, অপরের বিধি যদি দোষ শূন্য, তবে তাহা তিরোহিত হইয়া তাহার স্থানে নূতন বিধি প্রচলিত হইল কেন? আমাদিগের বিবেচনায় সকল বিধিই দোষ শূন্য এবং সমাজের উপযোগী। কেবল প্রভেদ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-সংস্কারকেরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া তদানীন্তন কালের সমাজের উপযোগী করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সমাজ একভাবে চিরকাল চলিতেছে না, ও চলিতে পারে না; সুতরাং অদ্য যে বিধি সমাজের উপযোগী, কল্য আর তাহা তদ্রূপ নাই। যখন লোক সংখ্যা অল্প, তখন বিবাহ বিশেষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু লোকাধিক্য হইলে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলা যায় না। মনুষ্য-শরীরের ন্যায় সমাজ-শরীরও অনুদিন পরিবর্ত্তনের অধীন। অদ্য যে সমাজের বাল্যাবস্থা, কল্য তাহার যৌবনাবস্থা, পরশ্ব তাহার বার্দ্ধক্য। সমাজের যতই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার শরীরে ততই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে এবং এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যুবার পক্ষে পান ভোজনের যে নিয়ম, বৃদ্ধের পক্ষে সে নিয়ম নহে—বৃদ্ধের পক্ষে যে নিয়ম, যুবা সে নিয়ম অনুসারে চলিতে পারে না। শক্তি অবস্থাগত; অবস্থা শক্তিগত নহে। যাহার যখন যে অবস্থা, সে তখন সেই অবস্থার উপযুক্ত শক্তিরই অধিকারী হইয়া থাকে; ভিন্ন অবস্থার শক্তি তাহাতে প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? বৃদ্ধের পরিপাক শক্তি অল্প, সে কখনই অধিক ভোজন করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না। কিন্তু যদি বলপূর্ব্বক তাহার উদরে প্রচুর আহার প্রবিষ্ট করান যায়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার অজীর্ণ পীড়া উপস্থিত হইবে।

এই প্রকার বিশেষ বিশেষ সমাজের অবস্থার পক্ষে বিশেষ বিশেষ বিধিই প্রয়োজনীয়—এক বিধি সকল অবস্থাতেই প্রযুজ্য হইতে পারে না। সমাজের অবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাঁহারা কোন অযোগ্য বিধি প্রচলিত করিতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত না বলিয়া আর কি বলিব? তাঁহাদিগের বাসনা কোন ক্রমেই সফল হইবার নহে—সমাজ অযোগ্য ব্যবস্থার চির বিরোধী। সমাজভুক্ত কোন কোন ব্যক্তি অনুপযোগী ব্যবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে সত্য, কিন্তু আপনার উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ না করিয়া নহে। যদি এই সকল লোকের সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে উল্লঙ্ঘনকারীগণ প্রথমে ইহাদিগকে লুকাইয়া অনুপযোগী নিয়মের মস্তকে পদাঘাত করিবে, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা অধিক হইলে আর তাহাদিগের কার্য্য প্রকাশ্যে সম্পাদন করিবার কোন বাধা থাকিবে না। আবার যাহাদিগের সাহস অধিক, তাহারা সকল অবস্থাতেই প্রকাশ্য ভাবে অযোগ্য বিধি পরিহার করিয়া আপনাদিগের জন্য নূতন উপযোগী বিধির ব্যবস্থা করিবে।

যেমন বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া মহাসমুদ্র, তেমনই এক একটী মনুষ্য লইয়া সমাজ। যাহাতে সমাজের এক একটী মনুষ্যের উপকার বা অপকার, তাহাতেই সমগ্র সমাজের উপকার, বা অপকার। যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের উপকার সে তাহারই অনু-

সরণ করে এবং অধিকাংশ লোকে আপন আপন হিতানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কোন কার্য্য করিবার ব্যবস্থা স্থাপন করিলে, তাহাই সামাজিক নিয়ম রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকারে, সাধারণের পক্ষে আপনাদিগের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া লইতে অনেক সময় লাগে; কেন না এক কালেই কোন এক বিধিকে সকলে আপনার হিতকর বলিয়া বুঝিতে পারে না। লোক মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে উন্নতির অগ্র পশ্চাৎ হইয়া থাকে। যাহারা অধিক বুদ্ধিমান, তাহারাই অগ্রে উন্নত হইয়া কোন বিধি বিশেষকে আপনার হিতকর বলিয়া বুঝিতে পারে, অপরে যতদিন না তাহাদিগের ন্যায় উন্নত হয়, ততদিন সে বিধির উপকারিতা বুঝিতে সক্ষম হয় না। যদি এই অনুন্নত ব্যক্তিদিগকে, উন্নত হইয়া, আপনাদিগের হিতকর বিধির ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উন্নত ব্যক্তিদিগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উন্নত হইতে থাকে, সমাজকেও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হয়। এমত অবস্থায় সমাজ একটী পূর্ণ রাশি না হইয়া একটী রাশির সহস্র ভগ্নাংশে পর্য্যবসিত হয়। এই ভগ্নাংশতা ও বিভিন্নতা নিবারণ করিয়া সমাজকে একটী অক্ষুণ্ণ রাশিতে পরিণত ও রক্ষিত করাই সমাজসংস্কারকের কার্য্য। যাঁহারা সাধারণ লোকমণ্ডলী অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী এবং জন সাধারণের ক্লেশে যাঁহারা ক্লিষ্ট, সাধারণের উন্নতি স্রোতের গতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা এমন সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন যে, উন্নতানুন্নত নির্ব্বিশেষে সকলেই সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে, এবং অনুন্নত ব্যক্তি সেই নিয়মের অধীন হইলেই উন্নত ব্যক্তির সহিত সমান ফলভোগে সক্ষম হয়। সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই যাহাতে উন্নতি, তাহাই সংস্কারকের আলোচ্য বিষয়। নতুবা ব্যক্তি বিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের উন্নতিকে তাঁহার আলোচ্য বিষয় করিলে সমাজ শরীরের এক অঙ্গ পরিপুষ্ট হইবে ও অপর অঙ্গ শীর্ণ হইয়া অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল, সুতরাং সমগ্র সমাজেরই মঙ্গল তাঁহার লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক— পক্ষাপক্ষ ভেদ করিলে সমাজ চলে না। সাম্যনীতি প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে পারা যায় না।

সংসারে মনুষ্যের অবস্থা এমনই সুন্দর যে, প্রত্যেকেই স্বাধীন হইয়া অন্যের অধীন—ক্ষুদ্র মহতের অধীন, মহৎ ক্ষুদ্রের অধীন। সুতরাং সমাজে কোন বিভিন্নতা নাই, সমাজে মহৎ ক্ষুদ্র নাই, সমাজে ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই। সমাজ মধ্যে সকলেরই প্রয়োজনীয়তা সমান, এক জনকে উচ্ছেদ করিয়া সমাজ চলে না। শূদ্র না থাকিলে ব্রাহ্মণ এক দিনও তিষ্ঠিতে পারে না, ব্রাহ্মণ না থাকিলে শূদ্রও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সমাজের পক্ষে ব্রাহ্মণের ও শূদ্রের প্রয়োজনীয়তা সমান; সুতরাং সমাজে ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ব নাই। যখন সমাজ শরীরের পুষ্টির জন্য সকল অঙ্গেরই প্রয়োজন, তখন আর ইতর বিশেষ কোথায়? যে সমাজে ইতর বিশেষ নাই, সেই সমাজই যথাযোগ্য পরিপুষ্ট, সবল ও উন্নত হইতে পারে। যথা পথে উন্নতির গতি পরিচালিত হইলেই

সমাজ নিরোগী হইয়া বহুকাল জীবিত থাকিতে পারে। সমাজ সংস্কারকেরা যদি সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনোপযোগী প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা তাহার গতি সৎপথে পরিচালিত করেন, তাহা হইলে সমাজ লয় পাইবে কেন, তাহা আমরা বুঝি না। সমাজের ধ্বংশ কেবল অনুপযোগী ব্যবস্থার দোষেই ঘটিয়া থাকে, অন্য কারণে নহে।

আর্য্যসমাজের যখন যে প্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, মনু, পরাশরাদি সমাজ-সংস্কারকেরা কেবল তাহারই চিকিৎসা করিয়া সমাজকে সবল রাখিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু নরশরীর যেমন ব্যাধিমন্দির, সমাজশরীরও সেইরূপ। বর্ত্তমানকালে সমাজের আবার ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে। যে দিন হইতে ইউরোপীয় পশ্চিম বায়ু হিন্দু সমাজের গাত্র স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে এই পীড়ার আরম্ভ। এক্ষণে পীড়ার কোপ ষোল আনা বলিতে হইবে—রোগীও ক্রমে বিকারগ্রস্ত হইতেছে। কিন্তু বড় আক্ষেপের বিষয় যে, উপযুক্ত চিকিৎসক মিলিতেছে না;—সংস্কারকেরা এক্ষণে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ পুরাতন বিধি আমূল ভাঙ্গিয়া তাহার স্থলে নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে, অর্থাৎ সমাজশরীরকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন; কেহ কেহ সমাজের গাত্রে একেবারেই হস্ত দিতে চাহেন না, অর্থাৎ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় যে, পুরাতন বিধিই প্রচলিত থাকে; এবং অপরে, পুরাতনে নূতন মিশ্রিত করিয়া, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থার উপযোগী করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে চাহেন। আমরা এক্ষণে কাহার কথা শুনি? কুল ছাড়িলে কলঙ্কিনী হইতে হয়; কিন্তু আবার কুল রাখিতে গিয়া শ্যামকে হারাই। এমত অবস্থায় যে শ্যাম ও কুল উভয়ই বজায় করিতে পারে, তাহার বাক্যই শিরোধার্য্য করা উচিৎ নহে কি? জাতিভেদ সম্বন্ধে কি প্রকারে উভয় পক্ষকে সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

আর্য্যসমাজ প্রথমে চারিভাগে বিভক্ত ছিল। আজও সেই প্রধান চারি ভাগ আছে সত্য; কিন্তু প্রত্যেক ভাগ আবার বিস্তর করিয়া উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যদি সেই সকল উপবিভাগকে এক একটী শাখা বলিয়া গণনা করা যায়, তাহা হইলে সমাজ-বৃক্ষের শাখার সংখ্যা করা বড় সহজ কথা নহে—সমস্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে কত ভিন্ন ভিন্ন শাখা দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা হয় না। এই সকল বিভাগ অবশ্য সমাজের প্রথম অবস্থায় ছিল না, ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি বর্ণও সমাজের আদিম কালে নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয় নাই। আদিম অবস্থায় অবশ্যই সমাজে জাতিভেদ ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। ক্রমে যখন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে একত্রিত করিয়া সমাজ শরীর সংগঠিত হইল, তখন হইতেই অঙ্গবিশেষের ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য নিরূপিত হইল। জ্ঞান শিক্ষা, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, বল বীর্য্য প্রভৃতি যাহাতে যেমন দৃষ্ট হইল, তদনুসারে তাহার কার্য্যও নির্দ্ধারিত হইল। সকল সমাজেই বস্তুত চারি প্রকার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। চারি ভাগে বিভক্ত না হইলেও সমাজে প্রধানত চারি প্রকার কার্য্যেরই আবশ্যক। যে সমাজে জাতি-

ভেদ অধিক স্পষ্ট নহে, তাহারও কার্য্য সকলকে বিশ্লেষ করিলে চারি শ্রেণীর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর কার্য্য জ্ঞান ও শিক্ষাদান, দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য দেশ রক্ষা, তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্য আহার সংগ্রহ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কার্য্য উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সেবা। ইউরোপীয় সমাজে বিশেষ বিশেষ বংশের উপর বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার ন্যস্ত না হইলেও, সমগ্র সমাজ-সমষ্টির কার্য্য সকল এই চারি প্রকার বলিতে হইবে। ভারত সমাজে যাহা, ইউরোপীয় সমাজেও তাহাই। ভারতে কেবল বিশেষত্ব এই যে, বিশেষ বিশেষ বংশের উপর বিশেষ বিশেষ কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। কোন বিশেষ কার্য্য বিশেষ বংশের উপর অর্পিত হওয়াতে যে কি সুফল, তাহা প্রায় সকলেই বিদিত আছেন। সন্তান জন্মাবধি পিতার কার্য্য দেখিয়া যত শিখিবে এবং সেই কার্য্যে দক্ষ হইবে, অল্প দিবস মাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া তাহাতে নিশ্চয়ই তত পটু হইবে না। পিতার চিন্তাপ্রণালী পর্য্যন্ত যখন সন্তান উত্তরাধিকার করে, তখন পিতার ব্যবসায় সন্তান যেমন শিখিবে, অন্যে কখনই তেমন শিখিবে না। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় সমাজের কার্য্য সকল বংশ পরম্পরার উপর অর্পিত হওয়াতে সমাজের উৎকর্ষ ব্যতীত অপকর্ষ সাধিত হয় না। পরন্তু এক প্রকার কার্য্য এক শ্রেণীর লোকেরই অন্তর্নিবিষ্ট থাকা উচিত এবং ইহাতেই সমাজের মঙ্গল। এক প্রকার কার্য্য করিবার অধিকার যদি সকলকেই প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে মহান অনিষ্টের সম্ভাবনা। সকলকে সমান অধিকার প্রদত্ত হইলে, যদি কোন সময়ে সকল লোকেই আহার সংগ্রহে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তৎকালে সাধারণকে শিক্ষা দান বা দেশ রক্ষা বা পরিচর্য্যা করে কে?

সমাজ সংগঠনে সমাজ-ভুক্ত সকল লোককে সমান অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। সমান অধিকার পাইলেই কি সকলে সমান হইতে পারে? স্বীয় স্বীয় শিক্ষা ও শক্তি অনুসারে অবশ্যই পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িবে; সুতরাং সমান অধিকার বিড়ম্বনা ও বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। যাঁহারা সাম্যতন্ত্রীর দ্বারা সমাজ শরীরকে বাঁধিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, সকল লোকেই যাগ যজ্ঞ করিতে বসিলে দেশ রক্ষা, আহার সংগ্রহ ও পরিচর্য্যা করিবার লোক মিলিবে না; সুতরাং এক দিনও যাগ যজ্ঞ চলিবে না। তদ্ভিন্ন সকল লোকেরই স্বাভাবিক শক্তি ও শিক্ষা যে সমান হইবে, তাহা আশা করা যায় না; সুতরাং সকলকে সমান অধিকার দিলেও সকলে কখনই সমান হইতে পারিবে না। তবে যদি স্বাভাবিক শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে সকলের জন্যই সকল দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তাহা হইলে সমাজকে সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত করা না হইয়া যোগ্যতা সূত্রে গ্রথিত করা হয়। কিন্তু যোগ্যতা সূত্রে সমাজ বাঁধিতে হইলে "যোগ্যতার উন্নতি" (Survival of the Fittest) নিয়মে এক অংশ উন্নত হইবে ও অপরাংশ অবনত এবং অবশেষে বিনষ্ট হইবে। এক অংশ বিনষ্ট হইবে তাহার কারণ এই যে, তাহাকে হীনবল করিতে না পারিলে অন্য অংশ বলবান হইতে পারে না। জীবিত থাকিবার জন্য সংসারে ইতর

প্রাণীগণ যে প্রকার প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামে নিরত, যোগ্যতা অনুসারে সমাজ সংগঠিত হইলে মনুষ্য মধ্যেও সেই প্রকার জীবন সংগ্রাম বাধিবে এবং একে অন্যকে ক্রমশ হীনবল ও অবশেষে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং বলবান ও উন্নত হইবে। হিন্দু-সমাজ এ প্রকার সংগ্রামের সমাজ নহে। এ প্রকার সংগ্রামের সমাজের মধ্যে ইংরাজ সমাজ অগ্রগণ্য। ইংরাজ সমাজ সংগ্রামের সমাজ বলিয়াই ইংলণ্ডের উন্নত ব্যক্তি অনুন্নত অবস্থা লইতে এতদূর উঠিয়াছে যে, তথা হইতে অনুন্নতকে দেখা যায় না। কিন্তু হিন্দু সমাজের দুই শ্রেণীর দুই জনের মধ্যে কখনই তাদৃশ পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। সুতরাং হিন্দু সমাজকে সাম্যের সমাজ বলিব, না ইংরাজ সমাজকে সাম্যের সমাজ বলিব?

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সাম্যকে লক্ষ্য করিয়া সমাজ গঠন সম্ভব নহে। সাম্য দ্বারা সমাজ বাঁধিতে পারিলে, অর্থাৎ সমাজস্থ সকল লোকের অবস্থা সমান করিতে পারিলে সমাজ বড় সুখের হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে প্রকার গঠন সম্ভব নহে। তবে হিন্দু সমাজে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাম্য নীতি প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। এই সাম্যের অর্থ এমন নহে যে, প্রত্যেকেই এক প্রকার কার্য্য করিবে ও সকলেই এক প্রকার সুখ-সৌকার্য্যের অধিকারী হইবে। ইহার অর্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবে, কিন্তু এক শ্রেণী সবল হইয়া অপরকে নিধন করিবে না। সকলেই আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং পরস্পর এমনই বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে যে, কাহারও অভাবে কাহারও সংসার চলিবে না। এই প্রকার সাম্যকে মূল মন্ত্র করিলে সমাজ যে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলে চলিতে পারে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই ভাবেই হিন্দু সমাজ আবহমানকাল চলিয়া আসিয়াছে। আমরা এমন বলি না যে, জাতিভেদ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন একেবারে আবশ্যক হয় নাই। যখন যেমন আবশ্যক হইয়াছে, সূক্ষ্মদর্শী সমাজ সংস্কারকেরা তখন তেমনই বিধি প্রচলিত করিয়া রুগ্ন সমাজকে আবার সবল ও সতেজ করিয়া প্রবল প্রতাপের সহিত জীবিত রাখিয়াছেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার অতি প্রাচীন কালেই ন্যস্ত হইয়াছে, এবং সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আবাহমান কাল সেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর হিন্দুসমাজে পূর্ব্ব রীতি সতেজ ও সজীব নাই—জাতিভেদ ও জাতিগত কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে এবং হিন্দু সমাজ-বন্ধন এক্ষণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। সমাজ নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল; যুগে যুগে অবশ্যই ইহার শরীরে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন লক্ষিত হইবে। বৈদিক সময়ে হিন্দু সমাজের যেমন অবস্থা ছিল, পৌরাণিক সময়ে তেমন ছিল না; পৌরাণিক সময়ে যে প্রকার অবস্থা ছিল তান্ত্রিক সময়ে সে প্রকার ছিল না। রামায়ণে সমাজের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, মহাভারতে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়; বুদ্ধের সময়ের সমাজ চৈতন্যের সময়ে বিদ্যমান ছিল না। হিন্দু

রাজত্ব সময়ের অবস্থা মুসলমান সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; মুসলমান রাজত্ব সময়ের অবস্থা ইংরাজ শাসন সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অধিক পশ্চাতে যাইতে হইবে কেন ?—রামমোহন রায়ের সময়ে সমাজের যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে সে অবস্থা নাই! জাতিভেদ প্রথা এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার ফলে বিলক্ষণ শিথিল হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা স্বাধীনতার দোহাই দিতে গিয়া সমাজের পক্ষে বড়ই অনিষ্ট করিয়াছে—অসার ও কুশিক্ষা দিয়াছে। জাতিভেদ এক্ষণে হিন্দু-সমাজে দোলায়মান—একের বৃত্তি অন্যে অবলম্বন করিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে—সমাজে ঘোর পরিবর্ত্তন আনায়ন করিয়াছে।

শিক্ষার পরিবর্ত্তনে, ইংরাজী প্রথার অধিষ্ঠানে ও বিদেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রভাবে এ প্রকার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাহাতে আবার ইংরাজ, মুখে সাম্য ও স্বাধীনতার গান করিতে বড়ই পটু। আমরাও নিতান্ত অনুকরণপ্রিয়; তাই ইংরাজী প্রথার অনুকরণ করিতে গিয়া নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ফলত ইংরাজী শিক্ষা, রীতি, নীতি, ব্যবসার, বাণিজ্যাদি যখন হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিল তখন অবশ্যই পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য—ইংরাজকে দেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে আর পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ইংরাজ ব্রাহ্মণকে স্থানচ্যুত করিয়া নিজে অধ্যাপকতা করিতে লাগিলেন—ব্রাহ্মণ উদরান্ন করিয়া খাইতে পায় না—কাজেই তাহাকে যে সে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইতে হইল। ইংরাজ স্বয়ংই দেশ রক্ষক; সুতরাং যুদ্ধ যাহাদিগের ব্যবসায় ছিল, তাহাদিগের অনেককে অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইল। ইংরাজ নিজে ব্যবসায় বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন এবং ভূমিকর্ষণেও মনোযোগ দিলেন;—কৃষক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আপন পাট তুলিয়া দিয়া অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উদরান্ন করিয়া খাইবার জন্য লালায়িত হইল। নানা প্রকারে পরিচর্য্যা করা যাহাদিগের কার্য্য ছিল, ইংরাজ তাহাদিগের কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইলেন; কাজে কাজেই তাহারাও দিগ্বিদিকে আহারান্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইল। ইহার উপর ইংরাজ বলিলেন—সকলেই সমান, যাহার যে বৃত্তি ইচ্ছা সে তাহাই অবলম্বন করিতে পারে। এই শিক্ষার গুণে, যাহার ব্যবসায় বা বৃত্তিতে ইংরাজ প্রতিযোগী হন নাই, সেও আপন ব্যবসায়কে নিকৃষ্ট বোধে তাহা ত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য পথ দেখিতে বাঞ্ছিত হইল—ইংরাজ কর্ত্তৃক যাহার বৃত্তি একেবারে বা কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ত বাধ্য হইয়াই পথান্তর দেখিতে হইয়াছে। ইংরাজের শিক্ষায় আমরা ভুলিলাম—তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় হারিলাম—ইংরাজ রাজা বলিয়া রাজাজ্ঞা দ্বারা আপনার সুবিধা করিয়া আমাদিগকে সকল সুবিধায় বঞ্চিত করিলেন। এই প্রকার নানা কারণে হিন্দু সমাজে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল—হিন্দু সমাজ বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত হইল। মনু পরাশরাদি সমাজসংস্কারকদিগের বিধি ব্যবস্থা অতল অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। তাঁহাদিগের গঠিত

সমাজের এরূপ অবস্থা ঘটিবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বর্ত্তমান কালে সকলেই স্ব-স্ব প্রধান—কেহ কাহাকেও গুরু বলিয়া মানিতে চাহে না—রাজ-শাসন ব্যতীত সমাজ-শাসনের আর ক্ষমতা নাই। এ ঘোর দুর্দ্দিনে কে পথ প্রদর্শক হইবে এবং কে যে পতনোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করিবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন—আমরা এ বিপদে কাণ্ডারী দেখি না।

হিন্দু সমাজে যখন বৃত্তিনাশ জনিত বিপর্য্যয় ঘটিল, তখন কাজে কাজেই জাতিভেদ প্রথা শিথিল হইয়া গেল[illegible]া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল বংশ বি[illegible]ছ। [illegible]তছে। সীমাবদ্ধ না থাকিয়া এক্ষণে সাধ[illegible] ব[illegible] বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। [illegible]হত [illegible]াইতেছে। ম[illegible]াশে প্রতিযোগিতায় ও জা[illegible]র জন্ম সমাজস্থ হিন্দু-সমাজে কষ্টের [illegible]বল মানুষের দোষ সাধারণত প্রত্যহই [illegible]গর প্রতিকার কিরূপে বৃদ্ধি হইতেছে। ই[illegible]ত বুঝিতে পা[illegible] সংখ্যার দিন দিন বৃ[illegible]ত এক জনের উপযুক্ত অন্ন বস্ত্রে বহুজনকে প্রতিপালিত হইতে হইতেছে। জাতি বিশেষে কার্য্য বিশেষ ন্যস্ত থাকাতে যে সুফল, তাহা এক্ষণে দৃষ্ট হয় না। জাতিভেদ প্রথা পুন প্রতিষ্ঠিত করিবার আর উপায় নাই। যাঁহারা রক্ষণশীল সমাজ-সংস্কারক, তাঁহারা বিস্তর শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া জাতিভেদ প্রথা পুন প্রচলিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু যুক্তির সহিত কিছুই করিতে পারিতেছেন না; সুতরাং ফলও কিছুই হইতেছে না। আমাদিগের বিবেচনায়, পূর্ব্ব প্রচলিত রীতি নীতি আর পুন প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে—সমাজ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; পূর্ব্বভাবে এক্ষণে ইহাকে [illegible]রিচালিত করিবার চেষ্টা, ভস্মে ঘৃতাহুতি [illegible]য়া বোধ হয়। ইংরাজ সমাজের অনুকরণে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করিলেও মঙ্গল নাই। কি রক্ষণশীল, কি পরিবর্ত্তনশীল, উভয় পক্ষের কোন সমাজ-সংস্কারই পতনোন্মুখ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে না—আংশিক রক্ষণ ও আংশিক পরিবর্ত্তনশীল সম্প্রদায় যদি কিছু করিতে পারেন তবেই মঙ্গল; নতুবা হিন্দু সমাজ কালের অতল গর্ভে ডুবিল—জগতের ইতিহাসের পূর্ব্বাঙ্ক ভস্মীভূত হইল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

শূন্য কুটীর।

পথিক ফিরিয়া যায়,
কেহ নাহি ডাকি লয়,
উদাস লইয়া বুকে, চাহি কেন ও কুটীর!
উড়িল কি প্রাণ তোর, শুধু পড়ি ও শরীর?

২

কে আজি আদর করে,
কে আর যতনে ধরে!
ধীরি ধীরি পাতাগুলি বাতাসে উড়িয়া যায়,
ওই যে একটী পাখী, তৃণ মুখে শূন্যে ধায়!

৩

কদিন বাঁচিয়া রবে,
বুঝি প্রাণ যাবে যাবে!
ভাঙ্গা বুক, ভাঙ্গা প্রাণে, পড়ি আছ ভবপারে;
লওনা নির্ব্বাণ পদ, অনন্ত কাল সাগরে?

খেলিলে ভবের খেলা,
সহিলে শোকের জ্বালা,
উড়ি গেল প্রিয় জন,একে একে সব হারা!
যে প্রাণ হেথায় ছিল,কোন্ পথে গেল তারা

৫

একটুও মায়া নাই জীবের অন্তরে?
তারা এবে কত দূরে,
তুমি ভাস পারাবারে,
জাগে কি সে পূর্ব্ব কথা পাষাণ অন্তরে?
আনন্দ বাজার তোর,কে ঢাকিল এ আঁধারে!

৬

শূন্য বুকে নেহারিয়া, কি ভাবিছ পথ পানে,
প্রাণের বিহঙ্গ আর ফিরিবে না ও উদ্যানে!
উদাসে ডুবিয়া রই,
জড়-মায়া কাঁদে ওই;
কে আর কাঁদিবে হেথা,মিলিয়া কুটীর সনে,
দেখিয়া মায়ার দশা কে যেন কাঁদে এ প্রাণে

ও কুটীর, আয়, আয়!
আমিও যে তোর্ প্রায়;
একেলা বহিয়া যাই, জনহীন একান্তারে!
তুই আর আমি মাত্র, একাপড়ি ভবপারে!

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

একা।

একাকিত্ব সাধন, সকল সাধনার মূল সাধনা। বহুজনাকীর্ণ সংসারকে না ভুলিতে পারিলে,—সংসারের মনমুগ্ধকর মায়া মোহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে— যশ নিন্দাকে তুচ্ছ করিতে না পারিলে, ধর্ম্ম সাধনই বল, আর যাহাই বল, সকলই অসম্ভব। আমি যদি চতুর্প্রহর তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতে বা তোমার মুখের প্রশংসা শুনিতেই নিমগ্ন রহিলাম, তবে আর আমার কর্ত্তব্য পালন হইবে কি প্রকারে?—আমি যদি সর্ব্বক্ষণ তোমার ভাবেই বিভোর রহিলাম, তবে আর পরমার্থ চিন্তা করি কখন? — আমি যদি তোমার চিন্তার খনিতে নিমগ্ন হইয়া আত্ম-হারা হইয়াই চিরকাল থাকিব, তবে আর আপন চিন্তার উৎকর্ষ সাধিত হইবে কিরূপে? কিন্তু মানুষ সংসারে একাকী থাকিতে চায় না। মানুষ, মানুষে ডুবিয়া আত্মবিস্মৃত হইবার জন্যই লালায়িত। মানুষ, মানুষের প্রশংসার জন্যই ব্যতিব্যস্ত। ইহাতে যে ... ংবাজ বলি উপকার হয় না, তাহা ... মানুষের কোনই ... আজ কাল কত অসংখ্য ...। পৃথিবীতে ... খ্রীষ্টের দল, মহম্ম-দের দল দেখা যাইতেছে, ... দল, গৌরাঙ্গের দল, ... দের দল, নানকের ... জার দল এই সোণার সংসারে দল, হাজার ... রতেছে। মানুষ, মানুষের অস্তিত্বে আপনাকে ডুবাইয়া সুখী হইতেছে; তাই স্পেন্সরের দল,ডারউইনের দল, মিলের দল, কম্‌টীর দল। মানুষ, অন্যের প্রতিভার আদর করিতে যাইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। স্বাধীন চিন্তার আদর নাই, ব্যক্তিত্বের সম্মান নাই। অন্যের মহত্ত্ব দেখা ভাল কার্য্য, কিন্তু আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া তদপেক্ষা মন্দ। পৃথিবীর আদি সময় হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথকত্ব বা একাকিত্ব সাধনা অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে, তাই পৃথিবীতে এত দলের সৃষ্টি। দলের সৃষ্টি হওয়াতে, লোকেরা, দশজনের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া, আর দশজনকে উপেক্ষা করিতে

শিখিয়াছে,—আর দশজনের মহত্ব গ্রহণে অক্ষম হইয়াছে। এই কারণে জ্ঞান বা প্রেম উভয়ই মানব হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা লাভ করিতেছে;—উদারতা বা প্রশস্ততা মানব হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতেছে। দলাদলি পৃথিবীর মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

দলাদলিতে যে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট করিয়াছে, ইহা মানব সন্তানেরা বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু তবুও আবার দলের জন্য লালায়িত হইতেছে। এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য লোক প্রাচীন দলের মমতা ছিঁড়িয়া আবার নূতন দলের সৃষ্টি করিতেছে। ক্রমাগতই দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার সহিত হিংসা বিদ্বেষ, পরনিন্দা বা ঘৃণার রাজত্বও বিস্তৃতি পাইতেছে। মানুষ, মানুষের মহত্ব দেখিবার জন্য সমাজভুক্ত, কিন্তু আজ মানুষ, কেবল মানুষের দোষই দেখিতেছে। এ রোগের প্রতিকার কিরূপে হইবে, সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি না।

মানুষ, মানুষের মহত্ত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছে, কিন্তু আপনার স্বাতন্ত্র্য ডুবাইতে আইসে নাই। পরস্পরের দ্বারা সকলেই উপকৃত হইব বটে, কিন্তু হইব যে আমি, সে আমি পৃথক। মাতার জরায়ু-গর্ভে মাতার শোণিতে আমার সৃষ্টি, কিন্তু মাতা ও আমি পৃথক। পৃথকত্ব যদি সৃষ্টির বিধান না হইত, তবে সকলই একাকার হইয়া যাইত। আকাশে চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্র থাকিত না, বাগানে ফুল ফল থাকিত না, সমুদ্রে তরঙ্গ থাকিত না, নর নারীতে বিভিন্নতা থাকিত না। তুমি ও আমি এক রূপে হইয়া আসিতাম। অসংখ্য ঘুচিয়া এক অখণ্ড জিনিস থাকিত। বৈচিত্র্য ঘুচিয়া মিলন ঘটিত। অসাম্য বা বিভিন্নতা ঘুচিয়া সাম্য বা একরূপত্ব থাকিত। কিন্তু সৃষ্টি-তত্ত্বে কি দেখিতে পাইতেছি? এক পাঠশালায়, এক শিক্ষার অধীন থাকিয়াও কত বিভিন্ন হইতেছি,—তুমি ও আমি। বালক বালিকায় কত বৈষম্য, বালকে বালকে কত পার্থক্য, বালিকায় বালিকায় কত বিভিন্নতা! দুটী হৃদয় একরূপ নয়, দুটী মন একরূপ নয়, দুটী জীবন একরূপ নয়,—দুটী ফুল একরূপ নয়, দুটী ফল একরূপ নয়। সকলই পৃথক, সকলই বিভিন্ন। দেখিব, পাইব, এই জন্য প্রকৃতি সৃষ্ট, কিন্তু তাহাতেও ডুবিয়া মজিব না;—আত্মবিস্মৃত হইব না। ভারি কঠোর সাধনা। তোমার ভালভাব গ্রহণ করিব বলিয়া তোমার মন্দ ভাবে আমার বিশেষত্বকে ডুবাইব কেন? তোমাকে ভালবাসি বলিয়া তোমার সহিত একাত্মক হইয়া যাইব কেন? কবির কল্পনা দূরে রাখ, তোমার কর্ত্তব্য ও আমার কর্ত্তব্য যে পৃথক,—তুমি ও আমি যে পৃথক হইয়াছি, সে কি এই জন্য নয় যে, উভয়েরই দুই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? তবে ডুবাডুবি করিতে, দলাদলি বাঁধিবার জন্য লালায়িত হইতেছ কেন? সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সকলে পৃথক পৃথক হইয়া পড়, সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলিয়া সকলের মহত্ব গ্রহণ করিয়া, একাকিত্ব সাধন করিতেপ্রবৃত্ত হও। হিন্দু কেবল হিন্দুর গুণকীর্ত্তনে রত থাকিবে, খ্রীষ্টানের গুণকীর্ত্তনের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না? মুসলমান কেবল মুসলমানের গুণ গ্রহণে মাতিবে, কাফেরদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না? কি ঘৃণার কথা, কি দুঃখের চিত্র! সকল দল ভাঙ্গিয়া সকল পৃথক পৃথক হউক,—সকলে সকলের

গুণ গ্রহণ করুক, সকলে সকলের বিশেষ বিশেষ মহত্ত্ব গ্রহণ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভে রত থাকুক। কিন্তু হায়, তাহা কি সহজে হইতে পারে? ব্যক্তিত্ব সাধন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। বহু জনের ঘৃণা, বহু জনের নিন্দা, বহু জনের তিরস্কারকে আলিঙ্গন করিতে পারিলে, তবে ত একাকিত্ব সাধনে জয়ী হওয়া যায়! কত জনের ভালবাসা ছিন্ন করিতে হয়,তবেত একাকী হওয়া যায়। কত জনের প্রশংসাকে তুচ্ছ করিতে হয়, তবে ত একাকী থাকা যায়। সকলের উপরে কত জনের সাহায্য উপেক্ষা করিতে হয়, তবে ত একাকিত্ব বা ব্যক্তিত্ব সাধনে জয়লাভ করা যায়। পৃথিবীর অবস্থা এমনই জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ মানুষকে ভালবাসায় দাস করিতে না পারিলে মানুষের কোন প্রকার সাহায্য করিতে চায়না। গোলামগিরি চতুর্দ্দিকে চলিতেছে—দাস-ব্যবসায় সর্ব্বত্র আধিপত্য করিতেছে। এমনই জঘন্য অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে, দাসত্বই যেন সকলের সেব্য হইয়া পড়িয়াছে। পৃথক হইয়া দেখিয়াছি, দল ছাড়িয়া দেখিয়াছি, চতুর্দ্দিকের লোক অমনিই দয়ার হস্ত গুটাইয়া লইয়াছে,অমনিই চতুর্দ্দিকের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সকল দল সম্বন্ধেই এ কথা বলিতেছি। দাস করিবার জন্য কে ইচ্ছুক নয়? যে স্বাধীনতার ধুয়া ধরিয়া বাহিরে চিৎকার করিতেছে, সেও ভিতরে ভিতরে দাসদাসী অন্বেষণে ব্যস্ত। চাকরিকরাকে কেবল দাসত্ব বলা যায়না;—সে দাসত্ব বরং ভাল মতের দাসত্ব, ভালবাসার দাসত্ব বড় ভয়ানক জিনিস। মতের দাসত্ব-ব্যবসা চতুর্দ্দিকে কি ভয়ানক আধিপত্য করিতেছে,একবার দেখ। তুমি আমার মতে যখনই সায় না দেও, তখনই আমি তোমার উপর চটিয়া যাই। গুরু শিষ্যে এই প্রকার কত কাটাকাটি চলিতেছে। দলে দলে মতের মিল না হওয়ায় কত রক্তারক্তি হইতেছে! তোমার মতে না সায় দিলে আর তুমি আমার সাহায্য করিতে চাও না। পৃথিবীর প্রচলিত মতে সায় না দিলে, অমনি পৃথিবীর দয়ার কুটীরে চাবি পড়িয়া যায়। খ্রীষ্ট যখন সকলের মত রক্ষার জন্য আপনার মতকে বলিদান করিতে অস্বীকার করিলেন, তখন পৃথিবীর লোকেরা খ্রীষ্টের বুকে পেরেক বিদ্ধ করিল! এবং সেই হইতে যে জন আপন পথে,আপন মত লইয়া একাকিত্ব সাধন করিতে গিয়াছে, সেই প্রাণে মরিয়াছে! কত সহস্র সহস্র খ্রীষ্টের রক্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিতেছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? এমনই জঘন্য অবস্থা এই পৃথিবীর। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আর সকল সাধনা সহজ, একাকিত্ব সাধনই কঠিন। ধনলোলুপ দস্যুর হস্ত হইতে ধনের বাক্স রক্ষা করা সহজ, রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের হাত এড়াইয়া জীবন রক্ষা করা সহজ, কিন্তু দাসত্ব-লালায়িত পৃথিবীর মতকে উপেক্ষা করিয়া বসবাস করা বড়ই কঠিন। গ্যালিলিও কত উপহাস ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন, কে না জানে? তবেই দেখ, কত শেলাঘাত, কত নির্যাতন সহ্য করিতে পারিলে তবে একাকিত্ব সাধন হয়! কত জনের মুখশ্রী ভুলিতে পারিলে তবে একাকী হওয়া যায়;—কত দাসত্ব, কত ভালবাসাকে, কত সাহায্যকে উপেক্ষা করিলে, এমন কি প্রাণ-মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিলে তবে একাকী হওয়া যায়! এ কঠোর সাধনায় জয়ী হইতে কে পারে? কিন্তু জয়ী হইতে না পারিলেও নিস্তার নাই,—

পৃথিবীতে স্বর্গের আশা নাই, মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই। ধ্রুবই হউন, আর প্রহ্লাদই হউন, খ্রীষ্টই হউন, আর শাক্যই হউন, একাকীর বিজন পথে না যাইলে আর সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। সংসারে ভীষণ গহন অরণ্য সৃষ্টি করিয়া কঠোর তপস্যা না করিলে আর মঙ্গলের আশা নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া যাইতেছে, দিবসের পরে দিবসের অভিনয় শেষ হইয়া যাইতেছে,—একাকীর পথ মানুষের সম্মুখে আসিতেছে! যে একাকী আসিয়াছে, সে কি চিরকালই কোলাহলে মজিয়া, বহুত্বে ডুবিয়া রহিবে? মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম কি সকলই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় চিরকাল ব্যর্থ হইতে থাকিবে? না—প্রকৃতির বিধান তাহা নহে। মানুষ কি চিরকালই দলাদলির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বিশ্বেশ্বরের বিশ্বপ্রেম ভুলিয়া থাকিবে? তাহা অসম্ভব। একাকী যে আসিয়াছে, একাকী যাইবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতেই হইবে। দিন যাইতেছে, রজনী আসিতেছে। রজনী আসিতেছে,—সকলকে ভুলাইতে, সকলকে বিস্মৃতিতে ডুবাইতে। সমস্ত দিবস কলরব, ব্যস্ততা, জনতা; রজনীতে নিস্তব্ধ, নীরব, ও সাম্যভাব। গভীর রজনীতে কল[illegible] পাখী জাগিয়া যখন তান ধরে, তখন সে তানে সংসারের ভাব নাই, তাহাতে পরমার্থ ভাব। গভীর রাত্রে যখন মানুষ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, তখন কি এক আশ্চর্য্য ভাব মনে জাগিয়া উঠে! চতুর্দ্দিক নীরব, সকল নিস্তব্ধ—যেন কেহই নাই, যেন কিছুই নাই;—একাকী সে জাগিতেছে! একাকী সে জনপ্রাণী-হীন কান্তারে ভাসিতেছে! একাকী গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া, তখন সে যে কি বৈচিত্র্যময়ী সাম্য পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে দেখিতে পায়, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। অবিশ্বাসী সে নীরবে, সে নিস্তব্ধতায় দাঁড়াইয়া অন্তত মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাসী হয়, মুহূর্ত্তের জন্য ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলিয়া যায়। কিন্তু রজনীর পরে আবার দিবস জাগিয়া উঠিতেছে যখন, তখন সকল ভাব আবার নিবিতেছে। একাকিত্ব ভুলিয়া মানুষ আবার বহুত্বের আদর করিতেছে। কিন্তু মহারাত্রি বা কালরাত্রির কথা মানুষ তখনও জানিতে পারিতেছে না। জানুক বা না জানুক, বিধাতার লিপিতে মানুষের ভাগ্যে এক অখণ্ড বিধান লিখিত আছে, তাহার হাত আর এড়াইবার যো নাই! মহারাত্রি যখন আসিবে, যখন মানুষের সকল ভেদাভেদ ঘুচিয়া যাইবে—সোণার অঙ্গ শ্মশানে ভস্ম হইবে—সকল নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, তখন স্বর্গ লাভ বা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে। সে বিধান যে মানুষের এড়ানের যো নাই, সে মানুষ কেন জীবন থাকিতে একাকিত্ব সাধন করিবে না? একরূপ, একভাব, এক জ্ঞান, এক ধ্যানে নিমগ্ন হইতে না পারিলে মহেশ্বরের লীলায় কে মজিতে পারে? সংসার মায়া, অবিদ্যার খেলা ভুলিতে না পারিলে কে মহামায়াকে বুঝিতে পারে? সকলের ভিতরেই একরূপ, একভাব, এবং জ্ঞান, এক শক্তির ক্রীড়া যে না দেখিতে পায়, সে কেমনে দ্বেষ হিংসার দাসত্বের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে? বিশ্বপ্রেম না বুঝিলে, মানুষ কেমনে অন্ধ প্রেম ভুলিবে? এই জন্যই বলিতেছিলাম, এ সাধন অতি কঠোর সাধন। কিন্তু হউক কঠোর, এ সাধনায় জয়ী হইতে না পারিলে আর কিছুতেই কিছু হইবে না। কুল না

ছাড়িলে অকূলে ভাসিতে পারিব না, দল না ছিঁড়িলে, দলাদলি-শূন্য উদার বিশ্বপ্রেমসাগরে মজিতে পারিব না, সংসার মমতার জাল না ছিঁড়িতে পারিলে স্বর্গধামের অধিকারী হইতে পারিব না;—মানুষের মমতার জাল ছিন্ন না হইলে মুক্তি বা ঈশ্বর লাভ হইবে না। কিন্তু মানুষের কি সাধ্য যে এই অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবে?—যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পলায়ন করিয়াছেন। সে বুদ্ধও নাই, আর সে খ্রীষ্টও নাই। আজ মানুষ দলাদলির আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে। সংসার মায়া বিষম মায়া; এ মায়াকে ছিন্ন করিতে না পারিলে, এ সাধনায় জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। কুশকাষ্টকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যে প্রস্তুত থাকিতে না পারে, তাহার পক্ষে এ সাধনায় জয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভগবানের কৃপা ভিন্ন কে মৃত্যুর কঠোর হস্তে পড়িয়াও প্রসন্নতাময় শান্তি-স্বপ্নে মাতিতে পারে,—বিষকে সুধা বলিয়া ধরিতে পারে, কষ্ট দুঃখকে সুখ বলিয়া বুঝিতে পারে? কিন্তু ভগবানের কৃপা ভিন্ন, কে অসারের ভিতরে সারকে ধরিতে পারে,—প্রলোভনকে প্রলোভন বলিয়া বুঝিতে পারে,—সংসারসুখকে অসুখের হেতু জানিয়া তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিতে পারে? কৃপাময়ের কৃপার সাধনা কর, তবেই একাকিত্বে সুখ পাইবে; এক রূপে, এক ধ্যানে মত্ত হও, তবেই সকল অসম্ভব সম্ভব হইবে। তবেই দলাদলি বা ঘৃণা বিদ্বেষের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। করুণাময় এই কঠোর সাধনায় আমাদিগের সহায় হউন।

ইন্দুবালা।

নবম পরিচ্ছেদ।

আমাদিগকে আবার ইন্দুবালার উদ্দেশ লইতে হইবে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কেবল, ধরাতল স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। যমুনা নদী তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। অতি নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, প্রশস্ত ক্ষেত্র সম্মুখে—প্রাবৃট-সম্ভূত নব দূর্ব্বাদল শ্যামল মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে—মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পরিষ্কার গৃহ—বোধ হয় কৃষকদিগের আবাসস্থান। ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী অনতিদূরে, আরও দূরে উন্নত গিরিরাজি বিশাল আকাশে মেঘরাশির ন্যায় চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই স্থলে একটী কোমলাঙ্গী অষ্টাদশ বর্ষীয়া ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহার সঙ্গে তাহার ভ্রাতা, উভয়ে গল্প করিতে করিতে নদীর তীর ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িলেন। পশ্চিমদিকের আকাশে একখানা মেঘ দেখা দিল। তাঁহারা ফিরিলেন, দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধেক আকাশ ছাইয়া পড়িল। নির্ম্মল বড় ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন, ইন্দু বৃষ্টি হইতে পারে, শীঘ্র করিয়া কোন স্থানে আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। তাঁহারা একটু অপেক্ষাকৃত বেগে চলিতে লাগিলেন। অল্প কাল মধ্যেই বড়ই অন্ধকার হইয়া শীতল বাতাস উঠিল, এখনি বৃষ্টি আসিবে বুঝা যাইল। নির্ম্মল বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন, বলিলেন, "ইন্দু, একটু বেগে চল,

জল বুঝি আসিল, এত দূর আসা বড় ভুল হইয়াছে, তোমার অসুখ করে এই আমার ভয়।" যাইতে যাইতে ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত সংস্থিত হইল। এদিকে অন্ধকারে নির্ম্মলের পথভুল হইল। গ্রামের দিকে না চলিয়া তাহার বিপরীত দিকে চলিতে লাগিলেন। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল—প্রথমে বড় বড় দুই এক ফোঁটা, তারপর মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অন্ধকারময় আকাশে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন আরম্ভ হইল—তাহা দূরে গিরিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া আরও ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল। দুই জনের মস্তকের জল মুখ বহিয়া বক্ষস্থলে প্রবহমান হইতে লাগিল। রোগের শয্যা হইতে নবোত্থিতা ইন্দু কিয়দ্দূর চলিয়া বলিলেন—"দাদা,আমার পা যে আর চলিতেছে না।" নির্ম্মল বলিলেন "তুমি আমার কাঁধে হাত দেও, কাঁধে ভর দিয়া চলিতে পারিবে।" ইন্দু তাহাই করিলেন,কিন্তু তাহার শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। নির্ম্মল তাহার ভগ্নীকে ধরিয়া সুতরাং ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষীণাঙ্গী ইন্দু কিছুক্ষণ পরে একবারেই চলিতে অক্ষম হইলেন,বলিলেন 'দাদা আমি আর পারি না' তাঁহার হাত শিথিল হইয়া যাইল। নির্ম্মল তাঁহাকে ধরিলেন। কিন্তু ইন্দু অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। নিবিড় অন্ধকার—প্রবল বৃষ্টি—জলকর্দ্দমে পথ দুর্গম,নিকটে আশ্রয়ের চিহ্ন নাই। নির্ম্মল হাত কোলে করিয়া বসিয়া কাঁদিবার লোক নহেন। যদিও সাধারণত তাঁহার জীবন স্বপ্নময় চিন্তাতে অতিবাহিত হইত, বিপদকালে তাঁহার কার্য্যশীলতার অভাব হইত না। তিনি তখন ভগ্নীর লঘু শরীর অনায়াসে হস্তে উত্তোলন করিয়া লইলেন। সেই তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দিয়া সংজ্ঞাহীনা সহোদরাকে ক্রোড়ে লইয়া অনিশ্চিত পথে স্নেহময় ভ্রাতা ধাবমান হইলেন। বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে এক বার মাত্র সহোদরার মুখ দেখিলেন—মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু নিমীলিত ও আর্দ্র-কেশ রাজি সংলগ্ন। নির্ম্মল শীঘ্র কোন গ্রামবাসীর আশ্রয় পাইবেন আশা করিয়াছিলেন। পরে বুঝিতে পারিলেন, পথ হারাইয়াছেন। তখন তাঁহার ভরসা একবারে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এদিকে বৃষ্টিতে, বাতাসে, অন্ধকারে, কর্দ্দমে, জলের স্রোতে চলিয়া তাহার শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। ইন্দুকে বহন করিবার সামর্থ্য যেন হ্রাস হইতে লাগিল। পা কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু জীবন থাকিতে ইন্দুবালাকে সেই জলপ্লাবিত স্থানে কেমন করিয়া রাখেন? নির্ম্মল মনে মনে বলিলেন—"হে ঈশ্বর, অবশেষে ইন্দুকে এই প্রকার মরিতে দেখিতে হইল।" নির্ম্মল ইন্দুকে লইয়া বন্ধুর স্থানে উপস্থিত—আর চলিতে পারেন না, পা বড়ই কাঁপিতেছে, হাত অবশ, সমুদয় শরীর ভারাক্রান্ত। নির্ম্মল ভাবিলেন, আর উপায় নাই, তবে এই স্থানেই দুইজনে মরি। এমন সময় আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত আলোকিত করিয়া একটী বিদ্যুৎরেখা জ্বলিয়া উঠিল। নির্ম্মল দেখিলেন, সম্মুখে একটী অনতি উচ্চ পাষাণস্তূপে একটী ক্ষুদ্র গৃহ। আবার চলিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, বুঝি ঈশ্বর রক্ষা করিলেন। আশার সঞ্চার হওয়াতে বল ফিরিয়া আসিল। ইন্দুকে বহন করিয়া সোপানমার্গে উঠিলেন; দ্বারে আঘাত করিলেন। ভিতর

হইতে একজন গম্ভীরস্বরে বলিল "দ্বারে কে আঘাত কর ?" উত্তর "বিপদগ্রস্ত পথিক।" তখনই দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দৃঢ়কায় মহত্ব ব্যঞ্জক মূর্ত্তি সন্ন্যাসী দ্বারের সম্মুখে— বলিলেন, "ভিতরে আইস।" ভিতরে একটী ক্ষুদ্র আলোক জ্বলিতেছিল। তাহার নিকট অনেকগুলি গ্রন্থ; এক খানি উদ্ঘাটিত ছিল। নির্ম্মল ভিতরে আসিয়া কহিলেন "ইনি আমার ভগ্নী—অসুস্থা—জলে মৃতপ্রায়, এখন আপনার গৃহে আশ্রয়—অনুগ্রহ—ঈশ্বরের ইচ্ছা। সন্ন্যাসী আলোক হস্তে নিকটে আসিয়া প্রথমে নির্ম্মলের মুখের প্রতি, পরে ইন্দুর মুখের প্রতি তাকাইলেন। চমকিত হইয়া বলিলেন—"এই খানে।"নির্ম্মল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ইন্দুকে তাহার হস্তে দিলেন। সন্ন্যাসী ইন্দুকে একটী শয্যায় শোয়াইলেন। পরে"শান্তিশান্তি"বলিয়া ডাকিলেন। একজন বৃদ্ধা আসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, ইহাঁকে আর্দ্র কাপড় ছাড়াইয়া, শরীর ভাল করিয়া মুছাইয়া দেও, শুষ্ক কাপড় পরাও। নির্ম্মলকে বলিলেন, আইস আমরা অন্যঘরে যাই। অন্য ঘরে গিয়া নির্ম্মল এবং পরিব্রাজক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে উভয়ে পরস্পরের মুখ পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া— নির্ম্মল প্রথমে পরিব্রাজককে ভাল চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন ঠিক চিনিলেন, কিছুই বলিলেন না। নির্ম্মল এবং পরিব্রাজক ইন্দুর নিকট আবার আসিলেন, কয় জনে ইন্দুকে অল্প অল্প অগ্নির উত্তাপ দিতে লাগিলেন। নির্ম্মলওপরিব্রাজক উভয়ে অনিমেষ লোচনে ইন্দুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। গতপ্রায় জীবনে আর চৈতন্য ফিরিয়া আইসে কি না, অন্ধকারময় আকাশে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় কি না, তাহাই দেখিতেছিলেন। ক্রমে ইন্দুর জ্ঞানলাভ হইল, বলিলেন "আমি কোথায়?" নির্ম্মল বলিলেন, "ভয় নাই দিদি, আমি তোমার নিকট আছি।" আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার যেন অচেতন হইয়া রহিলেন। পরিব্রাজক ও নির্ম্মল উভয়ে যেন রুদ্ধ শ্বাসে ইন্দুর মুখ পানে তাকাইয়া—ইন্দু আবার চক্ষু খুলিলেন। পরিব্রাজকের উপর দৃষ্টি পড়িল, যেন বিশ্বাস হইল না, যেন সন্দেহ হইতেছে তিনি এখনও স্বপ্ন দেখিতেছেন, এই প্রকার পরিব্রাজককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সন্দেহ থাকিল না, চিনিতে পারিলেন, শোণিতহীন পাণ্ডুবর্ণ বদন কথঞ্চিৎ রক্তবর্ণ হইয়া যাইল, মন্দ-আবেগ হৃদয়ে একটুকু জোরে আঘাত করিতে লাগিল। ইন্দুর সেই শরীরের পক্ষে, মনের এই আবেগ, স্মৃতির এই তরঙ্গ স্রোত, মনকে আকুল করিল। তাহা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি আবার অজ্ঞান। নির্ম্মল পরিব্রাজককে বলিলেন,—"আপনি এক্ষণ কিছু কালের নিমিত্ত এস্থান হইতে অপসৃত হউন।" পরিব্রাজক অনিচ্ছার সহিত সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন। ইন্দুর আবার জ্ঞান হইল। এইবার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নির্ম্মলকে বলিলেন, "দাদা, এখানে আর একজন বসিয়াছিলেন ?" "তিনি এখন নাই, তোমার সহিত পরে আবার সাক্ষাৎ হইবে।" ইন্দু আবার খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"এখন হয় না কি? আমার তাঁহাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।"নির্ম্মল কহিলেন—"আচ্ছা তবে আমি তাঁহাকে ডাকিতেছি।" পরিব্রাজক আসিলেন। ইন্দুর শিয়রে বসিলেন।

দুই জন মুহূর্ত্তকাল পরস্পরের মুখের দিকে অনিমিক্ লোচনে তাকাইয়া। সেই নীরব ভাষার বাগ্মীতা কিরূপে বুঝাইব?—সেই তাড়িতবাহী—হৃদয় কম্পনকারীদৃষ্টির অর্থ,—সেই কত-দুঃখ-যাপিত-দীর্ঘ-বৎসরের চিন্তা, আশা, নৈরাশ্য,—সেই সহস্র অতীত ঘটনার স্মৃতির এককালীন দুর্দ্দমনীয় উচ্ছ্বাস—সেই উভয়ের পরস্পরের প্রাণভূত পদার্থের পরিণাম লাভ,—তাহার যে মর্ম্ম, তাহার যে সুখ, সে সুখের অস্থিরতা, হৃদয়ের চাঞ্চল্য, মস্তিষ্কের মধুময় আবর্ত্তন—তাহা ভাষায় প্রকাশিত হয় না। ইন্দু অধিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। আনন্দে, উল্লাসে, সুখে, লজ্জায় ইন্দুর সমুদায় শরীর কম্পিত হইতেছিল। ইন্দু আবার অচেতন। এবার অনেকক্ষণ অচৈতন্য ভাঙ্গিল না। বোধ হয় পরিশ্রান্ত শরীর নিদ্রাভিভূত হইল। পরিব্রাজক এবং নির্ম্মল উভয়ে পার্শ্বে বসিয়া। বাহিরে—সে ক্ষুদ্র গৃহকে আঘাত করিয়া এখনও ঝটিকা হু হু করিয়া বহিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, পাহাড় হইতে জলের স্রোত ক্ষরিত হইয়া জলপ্রপাতের শব্দ করিতেছে। তখন ইন্দু প্রশান্ত নিদ্রার ক্রোড়ে সুষুপ্তা।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

স্বাস্থ্য-রক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্য-তত্ত্ব,—প্রথমভাগ, ফরিদপুরের সিভিল সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস বসু প্রণীত; মূল্য ২৲। এই অমূল্যগ্রন্থখানিকে সাধারণের উপযোগী করিতে ধর্ম্মদাস বাবু চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। পুস্তকখানি ৩১৪ সমাপ্ত, উত্তম কাগজে মুদ্রিত, কাপড়ের রঙ্গিন মলাটে আবৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে, উপক্রমণিকা; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, জলবায়ু, বায়ু, জল, ভূমি-বাস্তু, বাসগৃহ, খাদ্য এবং পরিধেয়। এই কয়েকটী গুরুতর অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনায় পুস্তকখানি শেষ হইয়াছে। এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গভূমিতে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যিনি যে চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মানুষ, রোগের হস্ত হইতে মুক্তি না পাইলে, ধর্ম্ম চিন্তাই বল আর সংসার-উন্নতির চিন্তার কথাই বল, কোন চিন্তাকেই হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান সকল উন্নতির মূল, অথবা সকল উন্নতি লাভের প্রথম সোপান। আমরা অনেকেই জানি না, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে। না জানার কারণেই যে আমাদের এদেশে যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী দিন দিন দুর্ব্বল, রোগপীড়িত হইতেছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শরীরের দুর্ব্বলতা, মানসিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। আমরা দিন দিন সকল দিকেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। এই দুর্ব্বলতার কারণ কি, ইহা যিনি বহু অর্থ, বহু দিনের পরিশ্রম ব্যয় করিয়া সাধারণের গোচর করিয়াছেন, তিনি যে সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ধর্ম্মদাস বাবু মানব জীবনের সার্থকতা করিয়াছেন,—বঙ্গদেশের এক প্রধান অভাব মোচন করিয়া মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

বাস্তবিক আমরা ধর্ম্মদাস বাবুর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছি। এপর্য্যন্ত স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রচারিত হই-য়াছে,তাহা তেমন বিস্তৃত হয় নাই; কোন কোন স্থলে তাহা শারীরবিদ্যা অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। সে সকল পুস্তকের উপরে বড় একটা নির্ভর করা যায় না। বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত শরীরপালন অবশ্য ভাল গ্রন্থ, কিন্তু তাহাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তির বড় প্রাবল্য নাই;—ধর্ম্ম উপদেশের ন্যায় তাঁহার উপদেশ মানিতে পারিলে কিছু উপকার হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মদাস বাবুর পুস্তকখানি বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ উপদেশে পরিপূর্ণ, অথচ এতই সহজবোধ্য যে, যে সে ইচ্ছা করিলে অতি কঠিন কঠিন বিজ্ঞানের কথা বুঝিতে পারে। পুস্তকখানিতে অনুসন্ধিৎসার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রায় সকলই ইহাতে আছে। এই পুস্তকখানি গৃহে গৃহে পত্রিকার ন্যায় অধীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পুস্তকখানি স্কুলে স্কুলে পাঠ্য রূপে গৃহীত হওয়া প্রার্থনীয়। মূল্য অধিক হইয়াছে বলিয়া অনেকের পক্ষে ক্রয় করা দুঃসাধ্য হইতে পারে,কিন্তু আশা করা যায়, স্কুলের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইলে, ধর্ম্মদাস বাবু ইহার মূল্য কমাইয়া দিবেন। মেডিকেল স্কুল সমূহে এ পুস্তকখানি এখনই পাঠ্য হওয়া উচিত। ধর্ম্মদাস বাবুকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহার বহু-যত্ন প্রসূত এই অমূল্য গ্রন্থখানিকে বঙ্গসন্তানেরা উপেক্ষা করিবে না। বিশেষত যে দুঃসময়ে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, এ সময়ে সকলেই ইহাকে আদর করিবে। তাঁহার এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের দুই এক স্থল উদ্ধৃত না করিয়া আমরা এই সমালোচনা শেষ করিতে পারিলাম না।

"দেখিতে হইবে যে, সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত মনুষ্যের মানসিক ও শারীরিক পরি-শ্রমের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। ইহা বলা বাহুল্য যে, ক্রমশ পরিশ্রমের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে সভ্যতার আগমনে কিরূপে মাংস ভক্ষ-ণের হ্রাস হইতে পারে? মানসিক পরিশ্রম বিনা কেহ সভ্যতার সোপানে উঠিতে পারিবেন না, সুতরাং মাংস ভক্ষণ ব্যতি-রেকেও সভ্যতার সোপানে উত্থিত হইতে পারিবেন, এরূপ ভরসা করা যায় না। * * * * দুগ্ধ, পনির, ডিম্ব ইত্যাদিকেও আমিষ বলিয়া স্বীকার করা উচিত। বিশেষত জীব-হিংসা করিলে যদি পাপ হয়, তবে গাভী, ছাগী, গর্দ্দভী বা মহিষীর বৎসের খাদ্য যে দুগ্ধ,তাহা আমরা কোন্ নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া ব্যবহার করি? মনুষ্য আপন জননী ব্যতীত অন্য কোন জীবের দুগ্ধ পান করিবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কিনা,তাহা বলা কঠিন। * * * * অতএব মনুষ্য এককালে দুগ্ধ-ঘৃত, পনির, ডিম্ব ও মৎস্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল শস্য ও আনাজ ভক্ষণ করিয়া বাস্ত-বিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারেন, তাহার উত্তম রূপ প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে মাংস ভো-জন নিষেধ করা যুক্তি সঙ্গত বলা যায় না।"

আমরা আশা করি, আহারাদি সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিদ্যা-বিশারদ বহুদর্শী ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসুমহাশয় যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সকলের নিকট আদরনীয় হইবে।

অন্যান্য পুস্তক আগামী বারে সমা-লোচিত হইবে।

ভক্তিসূত্র।

জীবত্ব জড়ত্ব মাত্র, জড়ত্ব দুর্ব্বলতামাত্র, দুর্ব্বলতা বিকাশের অভাবজাত। জড় বিকশিত হইলে জীব হয়, জীব বিকশিত হইলে জীবত্ব হইতে মুক্তি পায়, দেবত্ব লাভ-করে। জীববৃত্তি শারীরিক ও মানসিক। শারীরবৃত্তি মানস সাপেক্ষ, মানসবৃত্তি শারীর সাপেক্ষ। শারীর বৃত্তির উন্নতি বা অবনতি স্থূলগ্রাহ্য। সুতরাং শারীর বৃত্তির অনুশীলন বর্ব্বর ও সভ্যকে যুগপৎ আকর্ষণ করে। সর্ব্ববৃত্তির সম্যক অনুশীলনে জড়ত্ব, দুর্ব্বলতা বা জীবত্বের মোচন হয়। তাহার নাম মুক্তি।

শারীরবৃত্তি সাধারণকে আকর্ষণ করে, মানসবৃত্তি কেবল পণ্ডিতগ্রাহ্য। এজন্য পণ্ডিতেরা মানস বৃত্তির অনুশীলনে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। পণ্ডিতেরা আত্ম অনুসারে কেহ জ্ঞানানুশীলনের, কেহ ভক্তি-অনুশীলনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাহারও মতে জ্ঞানে মুক্তি, কাহারও মতে ভক্তিতে মুক্তি। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" পশু ভাব-চালিত, মনুষ্য জ্ঞানচালিত। যুবা ভাব-প্রবণ, বৃদ্ধ বুদ্ধি-প্রবণ; বেদ ভাবুকের কবিতা, উপনিষদ বুদ্ধিমানের দর্শন। এজন্য দার্শনিক জ্ঞানের গুণপণা, কবি ও ধর্ম্ম-প্রচারক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব গান করেন। ভাব প্রাচীনতাকে রক্ষাকরে, জ্ঞান নূতনতাকে উদ্ভাবন করে। ভাবুক স্থিতিশীল, জ্ঞানী উন্নতিশীল; ভাবুক স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রিয়, জ্ঞানী সার্ব্বজনিক ও সার্ব্বদেশীক। ভাবুক প্রফুল্ল, জ্ঞানী বিষন্ন; ভাবুক উন্মত্ত, জ্ঞানী প্রসন্ন। ভাবপ্রবণ মনুষ্য পশু, জ্ঞান-প্রবণ পশু মনুষ্য সদৃশ। ভাবে মনুষ্যকে পশুর সহিত সংযোগ করে, জ্ঞানে পশুকে মনুষ্যের সহিত সংযোগ করে।

কিন্তু জ্ঞানেও জীবত্ব ঘুচেনা, ভক্তিতেও মুক্তি মিলে না। যখন উহারা প্রত্যেকে আপন স্বরূপ হারাইয়া ফেলে,—জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া চিনা যায় না, ভক্তিকে ভক্তি বলিয়া উপলব্ধি হয়না, যখন একটী হইতে অন্যটীকে পৃথক করা যায় না, তখনই মুক্তিলাভ হয়।

মুক্তি কেবল প্রেমে। প্রেম ভক্তি নহে, প্রেম জ্ঞান নহে; ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ে সমভাবে পূর্ণ অনুশীলিত হইলে দুইজনে যখন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া যায়, মনের সেই অবস্থার নাম প্রেম। প্রেমিকের জ্ঞান নাই, প্রেমিকের ভক্তি নাই। সে ক্ষেপা ভোলানাথ। অজ্ঞান, অভক্ত প্রেমিক হইতে পারে না।

আরাধ্য বিষয়ে পরানুরক্তির নাম ভক্তি। অনুরাগের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসকে ভক্তি বলা যায় না; এবং পুত্রকলত্রে যে প্রীতি, তাহাকেও ভক্তি বলা যায় না। জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না। যাহাকে জানি না তাহাকে ভক্তি করি না, তাই বলিয়া যাহাকে জানি তাহাকেই ভক্তি করি না। ভক্তি ও দ্বেষ উভয়ই জ্ঞান মূলক। আরাধ্য বলিয়া জানিলে আরাধ্য বিষয়ে স্বতঃই যে পরানুরক্তি জন্মে, তাহাকে ভক্তি বলা যায়। সুতরাং জড়, অজ্ঞান, বা বাতুলের ভক্তি সম্ভাবনা নাই। এবং জ্ঞানকে ভক্তি বিরোধী বলা যুক্তি-সঙ্গত নহে। তাই বলিয়া জ্ঞানকে ভক্তি

বলা যায় না, জ্ঞান ভক্তির কারণ মাত্র, ভক্তি ভাববৃত্তি, জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তি। যাহাকে ভয় করি, তাহাকে ভক্তি করিনা; ভয় ও ভক্তি বিসম্বাদী। ভয় বিরাগ উৎপাদন করে, ভক্তি অনুরাগের চরম মাত্রা। কিন্তু প্রণয়ীর অনুরাগ ভক্তি নহে, সেখানে সমান সমান, মহতের প্রতি ক্ষুদ্রের পরানুরাগকে ভক্তি-বলি। প্রণয়ীর অনুরাগে স্বর্গলাভ ঘটে, কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না। কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণকে প্রণয়ী বলিয়া ভালবাসিত, ভালবাসার অনুশীলন তাহারা যথেষ্ট করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা ভালবাসার যথেষ্ট উন্নতি বা স্বর্গলাভ করিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণকে আরাধ্য বলিয়া অনুরক্ত হয় নাই, সুতরাং মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। আরাধ্য যত উন্নত হইবে, ভক্তি তত শ্রেষ্ঠতর হইবে, মুক্তি তত নিকট হইবে। বৃক্ষ বা ধেনুকে আরাধ্য বলিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলে স্বর্গলাভ ঘটে, এবং কাহাকেও আরাধ্য বলিয়া বিবেচনা না করা, কাহারও প্রতি ভক্ত না হওয়া অপেক্ষা বৃক্ষ ধেনুভক্তের অবস্থা শ্রেয়স্কর। একদিকে আরাধ্যকে আরাধ্য বলিয়া না জানায়, তাহার ভক্ত না হইয়া কেবল প্রণয়ী হইলে যেমন মুক্তি ঘটে না, পক্ষান্তরে আরাধ্য পদার্থ ভক্তির নিয়ন্তা হওয়ায়, এবং আরাধ্যের প্রকৃতি অনুসারে ভক্তির পরিমাণ সসীম বা অসীম হওয়ায়, যাহার দেবতা যত নিকৃষ্ট, তাহার ভক্তি মুক্তি দিতে তত অক্ষম। জ্ঞান যত অনুশীলিত হইতে থাকে, আরাধ্যের মহত্ব তত অধিক হয়; যাহা পূর্ব্বে আরাধ্য ছিল, তখন আর তাহা আরাধ্য হয় না; কিন্তু তাহার নামে যে ভক্তি কর্ষিত হইয়াছিল, তাহার স্থানে যে উন্নততর প্রকৃতি আরাধ্য রূপে আসন গ্রহণ করেন, তাহার প্রতি সেই কর্ষিত ভক্তি বেগবত্তর রূপে প্রধাবিত হয়। কিন্তু মুক্তি এখনও দূরে। জ্ঞান চর্চ্চার পরিপন্থী ভক্তিস্রোত। জ্ঞান ভক্তির অগ্রগামী, আরাধ্য নিরূপক জ্ঞান উন্নততর হইয়া যত উন্নত আরাধ্য খুঁজিয়া লয়, ভক্তি তত উন্নত হইতে থাকে। শেষে সম্যক কর্ষিত জ্ঞান ঈশ্বরকে আবিষ্কৃত করিলে তাঁহার প্রতি যে পরা ভক্তি উদ্দীপিত হয়, আমরা যাহাকে প্রেম বলিয়াছি, সেই সম্যক জ্ঞান সহচরী পরাভক্তি মুক্তির কারণ। গোবৃক্ষের ন্যায় প্রতিমাভক্তি স্বর্গদানে সমর্থ, কিন্তু মুক্তি দিতে পারে না। জ্ঞান যাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াও যাহার পদানত থাকে, সুতরাং ভক্তিও যাহাকে ছাড়িয়া অগ্রমুখে ছুটিতে পারেনা, সেই চরমলব্ধ পরম আরাধ্য পরাভক্তি মুক্তির একমাত্র কারণ। জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব, ও ভক্তির সম্পূর্ণ অভাব সমাবস্থা, ইহা মুক্তির কারণ নহে, আংশিক জ্ঞান ও ভাবের সমাবস্থা, ইহাও মুক্তির কারণ নহে। উভয়ের পূর্ণতায় উভয়ে যখন অবিচ্ছেদ্যভাবে সমাবস্থ, সে ভাব কেবল অনতিক্রমনীয় ঈশ্বরে সম্ভব, সেই ভক্তি মুক্তির কারণ। অন্য কোন পূর্ণ প্রতীয়মান অপূর্ণ অবস্থায় উহা পাওয়া যায় না। বিবাহে, সন্তান পালনে বা ভক্তিতে স্বর্গমিলে, কিন্তু প্রেম বিনা আর কিছুতে মুক্তি মিলে না। স্বর্গে জীবত্ব থাকে, মুক্তি জীবত্বের নির্ব্বাণ, ব্রহ্মের স্বারূপ্যলাভ। সামীপ্য ও সাযুজ্যভেদে স্বর্গ নানা প্রকার। তবে কি ব্রহ্মদ্বেষী নাই? আছে। দ্বেষেরও কারণ জ্ঞান। সুতরাং ব্রহ্মদ্বেষীরও ব্রহ্ম-

জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞান, রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায়, জ্ঞান রাজ্য হইলেও ভ্রমমাত্র। যাহারা ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানে, তাহারা ব্রহ্মদ্বেষী হয় না। অপূর্ণজ্ঞান বা ভ্রম অনেক সময় দ্বেষের কারণ বলিয়া বুঝা যায়। যে তাঁহাকে জানে, সেই, রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ বলিয়া তাঁহার অনুরাগী হয়। পরাভক্তি ও পরম জ্ঞান অবিচ্ছেদ্য বলিয়া, যেখানে একটী বর্ত্তমান সেখানে অন্যটীর নিরন্তর অবস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন শাস্ত্রে ভক্তি, কোন শাস্ত্রে জ্ঞান মুক্তির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা বিসম্বাদী নহে।

"যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তি সমন্বিতং
তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণমপি যাস্যসি"

বিষ্ণুপুরাণ—১।২০।২৮

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি। নান্যপন্থা বিদ্যতেহয়নায়েত্যত্র।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—৩।৮

ভক্তি জ্ঞান জন্য, জ্ঞান ইচ্ছা জন্য নহে। কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক জ্ঞান উৎপাদন করিতে বা অন্যথা করিতে পারে না। নিদ্রিত ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গ করিতে সমর্থ নহে। যে ভক্তিপ্রবণতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই, সে কখনও ভক্ত হইবে না। জন্ম মুহূর্ত্তে যাহার জ্ঞানের ঘরে শূন্য পড়িয়াছে, সে কখন জ্ঞানলাভ করিবে না। জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মনিয়ত। যাহার ভাগ্যে মুক্তি নাই, তাহাকে নরকভোগ করিতেই হইবে। সৌভাগ্য এই যে, কে সেরূপ দুর্ভাগ্য, কেহ জানে না। দুর্ভাগ্য এই যে, শাসন করিবার সময় সমাজ প্রাক্তন ফল গণনায় আনেনা। সমাজ অন্ধ, জড়জগতের ন্যায় অন্ধ, অন্ধের মত সমাজ ও জড় জগৎ শাসনদণ্ড ঘুরাইতেছে; যে তাহার মধ্যে পড়িবে, তাহার মস্তক চূর্ণীত হইবে। এইরূপ চূর্ণ করাই তাহাদের প্রকৃতি, এইরূপ না করিলে তাহাদের অবস্থান অসম্ভব হইত। জড় জগতের ন্যায় সমাজের হৃদয় নাই, সম্ভবে না। তোমার আমার মত দুর্ভাগ্য একটু মমতার আশা করে; কিন্তু অপরাধীর বাসনা রাজদণ্ডের কোমলতার কারণ হয় না। এরণ্ড, এরণ্ডই থাকিবে, সহস্র চেষ্টা করিলেও উহা আপনাকে অশ্বত্থে পরিণত করিতে পারিবে না। নির্ম্মম হইয়া আগাছা গুলি সমূলে উৎপাটন করাই সমাজের কর্ত্তব্য।

জ্ঞান—ভক্তির কারণ। যাহাকে দেখি নাই, যাহার কথা শুনি নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কিরূপে? যুথিকার কোমল সুষমা যেদিন, দেখিয়াছি, মনমোহন সৌরভের আঘ্রাণ লইয়াছি; সেদিন হইতে যুথিকার অনুরাগী হইয়াছি। কোকিলের পঞ্চস্বরে মোহন সংগীত যে দিন শুনিয়াছি, সেইদিন অবধি তাহা ভাল বাসি। ভক্তি অনুরাগের উন্নত অবস্থা। সুতরাং কাহাকেও ভক্তি করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ভালরূপে জানা আবশ্যক। জানিলেই ভক্তি বা দ্বেষ জন্মে। জানিনা অথচ আরাধ্য, ইহা বিসম্বাদী কথা। ভক্তি করিবার পূর্ব্বে জানা চাই, আরাধ্য বলিয়া জানা চাই।

জ্ঞানের ও ভক্তির অঙ্কুর থাকিলে, কর্ষণে তাহার উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি জ্ঞান বৃদ্ধির উপায়। জ্ঞানের ফল পরাভক্তি। যে পর্য্যন্ত পরাভক্তি না জন্মে, তদবধি জ্ঞান চর্চ্চা করিতে হইবে, অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত জ্ঞান

চর্চ্চা বিধেয়। জ্ঞান চর্চ্চা উপেক্ষা করিলে ভক্তি হীনপ্রভ হইবে। ব্রহ্মকে স্বরূপত জ্ঞাত হওয়া জ্ঞানের পূর্ণতার প্রমাণ, যখন দেখিবে প্রতিকৃতি যথাযথ হইয়াছে, তখন বুঝিবে, দর্পণের স্বচ্ছতা জন্মিয়াছে। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণভক্তি উৎপাদন করে। পূর্ণজ্ঞ পূর্ণভক্তের অবস্থা মুক্তি, তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রভেদ থাকে না। প্রেমিক বিনা আর কেহ অদ্বৈতবাদ বুঝে না। প্রেমের জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বৈতবাদ যুক্তিসিদ্ধ।

জ্ঞান ও ভক্তি বাহ্য লক্ষণ দ্বারা অনুমেয়। যাহার প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মে, তাহার নাম শ্রবণে লোমহর্ষণ হয়, চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে। যাহাকে ভালবাসি; তন্নামবিশিষ্ট, তদ্বর্ণবিশিষ্ট, তদ্‌গুণ বিশিষ্ট তাহার আত্মীয় যে, তাহাকেও ভালবাসি।

"পক্ষপাতেন তন্নাম্নি মৃগে পদ্মেচ তাদৃশি
বভার মেঘে তদ্বর্ণে বহুমানমতিং নৃপ"

নৃসিংহ পুরাণ। ২৫। ২২

সে যাহাকে ভালবাসে, তাঁহাকে ভাল বাসি, তাহার যে সে যেন আমার। সর্ব্বত্র সকলে তাহাকে দেখি। বিশ্ব সংসার তন্ময় হইয়া উঠে। প্রেমে বিরহ নাই, সাগর তরঙ্গ-শূন্য নহে। বিরহ-সংলিপ্ত প্রেম, তরঙ্গ-শূন্য সাগর, বায়ুশূন্য পৃথিবী অসম্ভব কথা। যাহার বিরহ-কাতর মুখশ্রী দেখিবে, বুঝিবে, সে তরুণী। প্রেমের আভাস পাইয়াছে; কিন্তু প্রেমামৃতের স্বাদলাভ ঘটে নাই। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সেই নাম, সেই চিন্তা, সেই ধ্যান; সম্মুখে সে নিত্যমোহন মাধুরী, বিশ্ব তাহাতে পরিপূরিত। চাঁদে তাঁহার রূপ, ফুলে তাঁহার কান্তি, মেঘে তাঁহার গম্ভীরতা, বায়ুতে তাঁহার প্রখরতা, জলে তাঁহার কোমলতা, সর্ব্বত্র তাঁহার আবির্ভাব। "যে দিকে ফিরাই আঁখি, কৃষ্ণময় জগৎ দেখি;" তবে বিরহের সম্ভাবনা কোথায়?

যাহাকে ভালবাসি, তাহার কথায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, অন্য কেহ রত্ন দিলেও ভুলি না।

"অপি কীট পতঙ্গোবা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া
নতু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্যমপিকাময়ে।"

অনুশাসনপর্ব্ব। ১৪।১০১১

যাহাকে ভালবাসি, আপনাকে তাহার মনের মত করিতে চেষ্টা করি, আর সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিতে বাসনা হয়। কখন "দাসী" হইয়া তাঁহার পদ সেবা করি, কখন "সখা" হইয়া তাঁহার সঙ্গে রহস্য আলাপ করি, কখন প্রণয়িনী হইয়া তাঁহাকে মন প্রাণ যথা সর্ব্বস্ব অঞ্জলি বাঁধিয়া ধরিয়া দেই, যেরূপ তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার হইতেই আমার সুখ। তাঁহার মনোরঞ্জনে জীবন সার্থক হয়, তজ্জন্য গৃহ ত্যাগ, কুলত্যাগ, দেশত্যাগ অকিঞ্চিৎকর। যাহাকে ভালবাসি, সে যদি খড়্গাঘাতে হত্যা করে, তবুও বলিব—"Thy will be done" তুমি যে আমার। ভীষ্মকে বধ করিতে শ্রীকৃষ্ণ খড়্গ হস্তে উপস্থিত; ভক্ত ভীষ্ম আদরে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, "এস এস, তোমার যাহাতে সুখ, তাই কর।"

"এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস নমোঽস্তুতে
শারঙ্গ গদাসি পানে। প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথরথাদ্দ্রপ্রাভূত শৌর্য্য সংখ্যে॥"

ভীষ্ম ৫৮।২৬০৪

জ্ঞানের ন্যায় ভক্তিও সাধনায় বৃদ্ধ হয়। তন্নাম শ্রবণ ও তন্নামকীর্ত্তন অনুরাগ জনক। নমস্কার বা নিজ অপকর্ষ স্মরণ এবং উপাসনা বা তদীয় উৎকর্ষ চিন্তনে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।

"সততং কীর্ত্তয়ন্তোমাংযতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।
জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তোমামুপাসতে
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।"
তথা "অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা
পর্য্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং
যোগক্ষেমং বহাম্যহং।" গীতা।

অনন্যমনা ও অনন্যরাগ হইয়া তাঁহার স্বরূপ ধ্যান, ভক্তি সাধনের অন্যতর উপায়। কিন্তু ইহাদিগের যে কাহারও সিদ্ধি হৃদয়ের পবিত্রতার উপর নির্ভর করে। হৃদয় পবিত্র না হইলে ধ্যানে একাগ্রতা বা কীর্ত্তনে তন্ময়তা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অপবিত্র হৃদয় ব্যভিচারী, একজনে রমণ করিবার সময় অন্য জনকে স্মরণ করে, না নিজে তৃপ্ত হয়, না অন্যকে তৃপ্ত করে। আর একটী কথা, এই সকল অঙ্গ সাধনে সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতে হইবে। ধন, পুত্র সৌভাগ্যাদি সঙ্কল্পার্থ অঙ্গ সাধন নিয়োজিত হইলে তাহারা তত্তৎ ফলোৎপাদনেই পর্য্যবসিত হইবে—ভক্তি উৎপাদনে সমর্থ হইবে না। এই জন্য সাধন মার্গে স্বর্গলাভও বাঞ্ছনীয় নহে। স্বর্গ অচিরস্থায়ী, মোক্ষ হইতে বহুদূরে। স্বর্গ জীবের, মুক্ত যে সে দেবতা; দেবতা প্রেমিক, মনুষ্য ভাব-পশু।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

ঊনবিংশ শতাব্দী ও ঈশ্বর বিশ্বাস।

মনুষ্য আদিম কাল হইতে, যে কারণেই হউক, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছিল। কোন দিন প্রশ্ন করে নাই, কেন বিশ্বাস করে, এবং কি কারণেই বা হৃদয়ে এই বিশ্বাসের উদয় হইল। মনের অন্যান্য নানা প্রকার ভাব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ঈশ্বর বিশ্বাস পাইয়াছিল। মৃত ব্যক্তির ভূতের চিন্তায়ই হউক, অথবা পদার্থ মাত্রই আপনার মত জীবনবিশিষ্ট বলিয়াই হউক—স্পেন্সরের কথাই সত্য হউক, না হয়, হারিসনের কথাই সত্য হউক—অসভ্যাবস্থা হইতেই মনুষ্যের হৃদয়ে এই ঈশ্বর বিশ্বাস নিহিত আছে, দেখিতে পাই। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখিল যে, অসভ্যাবস্থায় তাহারা এমনি অনেক ঘটনাকে এরূপ ভাবে মানিয়া লইয়াছিল, যাহা আদৌ সে প্রকৃতিরই নহে। এই বিচারের যুগে—এই বিপ্লবের সময়ে, সকল কথারই বিচার হইতে আরম্ভ হইল, বুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা সর্ব্বত্র লক্ষিত হইল। ঈশ্বর বিশ্বাসও এই সময়ে আক্রান্ত হইতে বাকী রহিল না। তখন ঈশ্বর বিশ্বাসীগণ খুঁজিতে লাগিলেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাসের মূল কি? এবং তাহাও বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে কি না? ফেসিয়ান্ (Fashion) বড় শক্ত জিনিস। যখন যাহার ফেসিয়ান্ উঠে, তখন তাহা সকল বিষয়কেই অধিকার করিয়া থাকে। যখন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের আইন আবিষ্কৃত হইল, তখন সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক, সকল বিষয়ই ঐ আইন দ্বারা প্রমাণিত করিবার একটা ফেসিয়ান পড়িয়া গিয়াছিল। আজ কাল আবার ক্রমবিকাশের আইন সম্বন্ধে ঠিক্ তাহাই ঘটিয়াছে; এখন দেখিতে পাই যে, সকল বিভাগের সকল প্রশ্নেই এক শ্রেণীর লোক এই ক্রমবিকাশের আইন আনিয়া উপস্থিত করেন। যখন নূতন ক্ষেত্রতত্ত্বের

আলোচনা আরম্ভ হইল, তখন এক ঈশ্বর প্রমাণকারী দার্শনিক, "ঈশ্বর প্রমাণ" নামক একটা প্রতিজ্ঞা, সংজ্ঞা ও স্বতসিদ্ধাদি দ্বারা ঠিক ক্ষেত্রতত্ত্বের এক ক্ষেত্র আঁকিয়া, প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ছোট ঘাট বিষয়ে এ দৃষ্টান্তের আর অভাব নাই। যখন সকল কথাই বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতে আরম্ভ হইল, তখন প্রচলিত ফেসিয়ানের অনুরোধে ঈশ্বর-বিশ্বাসীগণ, আপনাদের ঈশ্বরকেও এই বুদ্ধি দ্বারা, অথবা ন্যায় ও দর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উদ্যম ও চেষ্টা কত দূর পর্য্যন্ত অভীষ্ট পথে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বের দুই সংখ্যা নব্যভারতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

দার্শনিক প্রমাণ যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে অপ্রযুক্ত, তবে তুমি ঈশ্বর বিশ্বাস করিবে কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীর এই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। একালের পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক, তোমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, ঈশ্বর আছেন। যদি তুমি এখন কথা বল যে, আবহমান কাল সকল লোকেই ঈশ্বরকে মানিয়া আসিতেছে, অতএব তিনি আছেন; তাহা হইলে এই পণ্ডিতেরা তোমাকে বেখরচা জাহাজে তুলিয়া আফ্রিকার হটেন্‌টট্‌দিগের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করাইতে লইয়া যাইবেন। কিন্তু অপর দিকে আবার দেখিতেছি যে, প্রমাণ দ্বারা (যে কোন প্রমাণই হউক না কেন) ঈশ্বরকে প্রমাণ করিবার চেষ্টার নামই দার্শনিক যুক্তি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে সেই সর্ব্ব প্রকার প্রমাণের অসারত্তা দেখাইবারই চেষ্টা করা গিয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর নিত্য-প্রত্যক্ষ। এই নিত্য-প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ কি? আমার এই হস্তস্থিত লেখনি, এই সম্মুখস্থিত কাগজ যে প্রকার নিত্য-প্রত্যক্ষ, ঈশ্বর কি তেমনি নিত্য-প্রতক্ষ? যদি তাহা হয়, তবে সংসারে লোকে নাস্তিক হয় কেন, সন্দেহবাদী হয় কেন? কাগজ ও কলমের অস্তিত্বে সকলকে যেমন নিঃসন্দিহান দেখি, ঈশ্বর বিষয়ে ত তাহার বিন্দুমাত্রও দেখি না? ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, আমার হস্তস্থিত লেখনি যেমন প্রত্যক্ষ, অন্যান্য পদার্থাদি চক্ষুর সমক্ষে যেমন প্রত্যক্ষ, এই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ; তবে এত দৃষ্টি ভেদ কেন, কেহ দেখিতে পায়, কেহ দেখিতে পায় না কেন, সে কথা সবিস্তারে খুলিয়া বলিতেছি।

আমরা যাহা দ্বারা পদার্থের স্বরূপ অবগত হইতে পারি, তাহারা সকলেই সাধারণত ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত না হইলেও, আমরা সুবিধার জন্য, তাহাদের সকলকেই ইন্দ্রিয় সংজ্ঞা দিব। পদার্থের রূপ রসাদি যেমন আমরা অনুভব করিয়া থাকি, লোকের স্নেহাদি গুণও আমরা তেমনি অনুভব করি। এই কারণে আমার সংজ্ঞায় ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচটী অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া পড়িবে। যাহার যে ইন্দ্রিয়ের অভাব আছে, সে, পদার্থের বা ব্যক্তির সেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ বিষয়ে সম্যক্ অজ্ঞ হয়। এমন প্রাণী আছে, ইন্দ্রিয়ের ন্যূনতা হেতু, যাহাদের নিকট এই জগৎ কেবলই শব্দময়, অথবা কেবলই স্পর্শময়। যদি আর একটী, দুই তিনটী ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব তাহাকে বলে যে, এ জগৎ গন্ধময়ও বটে, তবে সে কি বুঝিবে? অন্ধের কাছে সুচিত্রিত চিত্রপট ধরিলে সে কি দেখিবে? ইত্যাদি,

ইত্যাদি। বহিরিন্দ্রিয় ছাড়িয়া অন্তরেন্দ্রিয়ের কথা বলি ;—মনে করুন, এক জনের মনে পরহিত-সাধিনী-বৃত্তি (altruistic-feeling) নাই, শত বুদ্ধদেবের বক্তৃতায়ও কি সে, আত্মদানের সুখ ও মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে ? গগনের থালে রবি চন্দ্র দেখিয়া নানক ঈশস্তুতি গাইয়াছিলেন, আবার সেই আকাশের চন্দ্র তারকা দেখিয়া, রামনারায়ণ বাবুর বিদূষক লুচি ও মতিচুরের চিন্তায় আকুল হইয়াছিলেন। প্রকৃতির সেই একই শোভা, বিষ্ণু বনচারী অসভ্যের কাছেন বহার শোভা. কৈ, তোমার আমার ম·চেষ্টা৷টা (gr... লোকের কাছে তাহারবরে...ঔকৈ ? আমরাও মনুষ্য, ওয়ার্ডসে...রিয়া উ...তাহাই ; তবে আমরা কেন বাজার খরচ তর্থা ব্যস্ত, এবং প্রকৃতির শোভা বিস্মৃত, আর ওয়ার্ড-...য়ার্থ কেন আমাদের অবস্থা দেখিয়া দুঃখে গাইলেনঃ— য প·

"To her fain works did nature li...
The human soul that through m'...;
And much it grieved my heart t...
What man has made of man." উহা তুমি বলিবে, এসকল শিক্ষার ফল, ...লিয়া ফল। আমি তাহা স্বীকার করি ...রিয়া· যে প্রকারেই হউক, একটী বৃত্তি মনে, থাকিলে ত আর তদুপযোগী ভাব গ্রাহ্য হইতে পারে না ? তুমি কি যুক্তি ও তর্ক দ্বারা সেই বৈজ্ঞানিককে মিল্টনের ...ার্য্য বুঝাইয়া দিতে পার, যিনি সফ হইয়েছেন পড়িয়া বলিয়াছিলেন যে, "W... it after all proves." ঐ যে হৃদয়হীন দার্শনিক, সূক্ষ্মবিশ্লেষণাস্ত্র হস্তে উপবিষ্ট, সন্তানবিয়োগ বিধুরার কাতরোক্তির ব্যাখ্যা যাঁহার কাছে স্বার্থ, অভ্যাস প্রভৃতির যোগফল, উহাকে তুমি মাতার প্রেমের ইতিহাস শুনাইয়া চোখের জল ফেলাইতে পারিবে কি ? যে পৃথিবীতে যীশুখ্রীষ্ট ও চৈতন্যের পদধূলি, স্নিগ্ধতা ও সুবাস নাম ধারণ করিয়াছিল, আমরাও কি সেই পৃথিবীতে কণ্টকবন সাজাইয়া বাস করিতেছি না ? খ্রীষ্ট, চৈতন্য ও কেশবের চক্ষে এজগৎ ঈশ্বরের ছবি কেন ধরিয়াছিল, আর বাক্পটু বুদ্ধি-অভিমানী আমাদের চক্ষে এজগৎ শয়তানের বাসা কেন ? তোমার কারণ-বাদের যুক্তি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু আমার মত লোকের কাছে সকলি ফক্কিকা বলিয়া বোধ হয়।

আরও শুন ; আমরা উদারতার গুণে স্থূলদর্শীই বলি, অথবা সোজা কথায় নিরেট বোকাই বলি,সাংখ্যকার হইতে স্পেন্সার পর্য্যন্ত, সন্দেহবাদীদিগের মুখপাত্রগণ সকলেই- (বুদ্ধি ও প্রতিভার অস্তিত্ব কল্পনা না হইলে) শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান এবং উজ্জ্বলপ্রতিভান্বিত। কেন এই প্রতিভাশালী মহাপুরুষগণ, ঈশ্বর সম্বন্ধে হয় অবিশ্বাসী, আর না হয় অপূর্ণ বিশ্বাসী, আর আমি এই গৌরাবান্বিত প্রবন্ধ লেখক, সেই ঈশ্বর বিশ্বাসের বড়াই করি ? ইহা সকলি অবস্থা ও ঘটনার ফল। ঈশ্বর বিশ্বাসে ও অবিশ্বাসে, উভয়দিকেই সমান শীতল মস্তিষ্ক মানব সমাজের নেতাদিগের নাম করিতে পারা যায়। কাহারও যে, বুঝিবার ত্রুটীতে অর্থাৎ মোটা বুদ্ধি বলিয়া ঐ গোল বাধিয়াছে, আমি ক্ষুদ্র কীট, সাহস করিয়া তাহা বলিতে পারি না। সুধু বলিতে পারি না, তাহা নহে, আদৌ তাহা নহেই। যে কারণে এক জন কবি, আর একজন জমাখরচ লেখক, সেই কারণেই একজন এই জগতের দিকে চাহিয়া

ঈশ্বরকে দেখে, আর একজন নাস্তিক হয়। তোমার কারণবাদ ও কৌশলের কোন যুক্তিতেই নাস্তিকের আস্তিক্যবুদ্ধি দিতে পারে না। যাঁহার জগতের কর্ত্তায় বিশ্বাস ও ভালবাসা আছে, কৌশলের যুক্তি তাঁহারই পক্ষে উপযোগী। নচেৎ আমি যেখানে কৌশল বলিব, নাস্তিক সেখানে অকৌশল বাধাইবে। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। মনে কর, একজন বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ঈশ্বরের কি অপার দয়া, তিনি আমাদের জীবন ধারণের জন্য কত আয়োজন করিতেছেন! আর একজন হয়ত বলিবেন, উঃ! ঈশ্বর কি ভয়ানক নিষ্ঠুর, চারিদিকে দেখিতেছি, আমাদের বাঁচাইয়া রাখিবার আয়োজন, জীবন দুঃখময়, যত অধিকদিন বাঁচিব, ক্লেশ তত অধিক ভোগ করিব! ইত্যাদি, ইত্যাদি! এই জন্যই লাউয়েল বলিয়াছেন, "In the matter of Art as in matters Divine, no truth can be discovered or appreciated if one is not in love with them."

আমরা এতক্ষণে যাহা বলিলাম, তাহা এই, ঈশ্বর দর্শনের স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আছে। সেই ইন্দ্রিয় বা বৃত্তি বা ভাব যতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকের হৃদয়ে অবস্থা ক্রমে ফুটিয়া না উঠে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে সে কিছুতেই পারিবে না! সহস্র দার্শনিক যুক্তি দেও, তোমার যুক্তি তাহার কাছে অলীক বোধ হইবে। আমি যদি সত্য সত্যই অন্ধ, তবে তুমি কোন্ যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিবে যে, আমার সম্মুখেরএই নব্যভারতের মলাটখানা নীলরং বিশিষ্ট? দার্শনিক যুক্তি না দিয়া, যাহাতে মনুষ্যের অন্তরে এই বৃত্তি (যাহাকে ম্যান্সেল্ প্রভৃতি Faith নাম দিয়াছেন) প্রস্ফুটিত হয়, তাহার চেষ্টা প্রয়োজনীয়। এপর্য্যন্ত এতৎ সাধনে যত উপায় দেখা গিয়াছে, তাহার মধ্যে নিজের দৃষ্টি পরিষ্কার করা, এবং নিজে যে কিছু দেখিয়াছি, তাহা স্বতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। সত্য সত্যই তবে দেখিলে, তাহার কথা ...লিতে ভাব... মূর্ত্তি ধারণ করে যে, লোকের দেখিতে পায়... খুলিয়া বলিতঃ একটা এই ভাব হয় যে, ...রা যা...টা সত্যই কিছু দেখিয়াছে। খ্রীষ্ট এ... ভাষার কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া চমকিত হইয়া চারিদিকের লোক বলিয়াছি... য, এ নূতন প্রণালীতে কথা কহে, এ ব্যক্তি Speaks with authority. ...চন্দ্র সেন এই ভাষায় কথা কহিয়া বঙ্গ...ক মুগ্ধ করিয়াছিলেন। হে দার্শনিকের স্নেহ... তুমি নিশ্চয় জানিও, তিনি অপ্রমেয়, ...য়ের সং...র দাম্ভিক বিচার তাঁহাকে কথনও হইয়া পরিমিত করিতে পারিবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নারীজাতির উচ্চশিক্ষা—ইয়ুরোপ।

নারীজাতির অধিকার বিষয়ক প্রশ্নের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পুরুষের ন্যায়, নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষা-লাভে সক্ষম হইবেন না কেন;—চিকিৎসাশাস্ত্র-অধ্যয়নের ও চিকিৎসা-ব্যবসায়-অবলম্বনের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না কেন;—পার্লে-মেন্টের সভ্য মনোনীত হইবার এবং সভ্য-নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পাইবেন না কেন? —এই তিনটী ...ক, উকীল, ও অধ্যাপক হইতে সমর্থ হইবেন না কেন?—ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র এই আন্দোলন চলিতেছে। সুধু আন্দোলন চলিতেছে, এমন নহে; নারীগণ

অনেক স্থলে অভীষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছেন। "গৃহকর্ম্ম ভিন্ন অপর বিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার বা পারদর্শিতা লাভের ক্ষমতা নাই," যাঁহারা ইহা স্থির সত্য বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, সংসার আর অধিক দিন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না। তাঁহারা সত্বর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িবেন।

"মেয়ে জজ, মেয়ে উকীল, মেয়ে ডাক্তার, পার্লেমেণ্টের মেয়ে সভ্য!"— এ বড় নূতন ও হাস্যজনক কথা।" বড় নূতন বলিয়া একথা আরো কিছু দিন হাস্যজনক থাকিবে। বড় নূতন বলিয়া নারীর প্রস্তাবিত অধিকার-লাভ-চেষ্টা আরো কিছু দিন আপত্তি ও বিরোধীদের রোষ্টিও করিবে। কিন্তু ভবিষ্যত্‌ ধরিয়া উচ্ছ্বসিত। ভবিষ্যতে স্ত্রীজাতির জয়লাভ ; তথায়

যে কোন মত বা তত্ত্ব বড় নূতন, তাহাই প্রথম কিছু দিন উপহাসের বিষয়ীভূত থাকে। কলম্বস যখন, "আটলাণ্টিকের পর পারে স্থল আছে" এই বিশ্বাস প্রচার করেন, বড় বড় পণ্ডিতেরা তখন তাঁহাকে "ঘোর মূর্খ" বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। নিউটন যখন আকর্ষণ-তত্ত্ব প্রচার করেন, "উহা অসম্ভব—কল্পনাতেই আসে না" বলিয়া অনেকে দীর্ঘকাল উহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ষ্টিফেনসন যখন ঘোষণা করেন, "এমন যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছি যে তৎসাহায্যে বার মাইল পথ ঘণ্টায় চলিতে পারা যায় ;" তখন পার্লেমেণ্টের গণনীয় সভ্যেরা পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন, "উহা কি হইতে পারে ? ষ্টিফেন্‌সন বাতুল!" হোমিওপাথি আজও গোঁড়া ও অনভিজ্ঞদিগের বিদ্রূপের বিষয়। ডার্বিনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-তত্ত্ব লইয়া আজও অনেকে বৃদ্ধা মাসী পিসীর ও তত্তুল্য পুরুষদিগের আমোদ জন্মাইয়া থাকেন। কিন্তু এ ভাব অল্পকালস্থায়ী। এখন আর কেহ নূতন মহাদ্বীপের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। এখন বালকেরাও নিউটনের আকর্ষণ-তত্ত্ব মানে। এখন কুলবধূরাও, বার মাইল পথ ঘণ্টায় চলা যায়, বিশ্বাস করে। আস্তে আস্তে হোমিওপাথি ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তত্ত্বের প্রতি নিরপেক্ষ-বিচারক অভিজ্ঞ লোকদিগের আস্থা বাড়িতেছে। নারীজাতির অধিকার বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধেও সেইরূপ এখন ইহা পরিহাস ও তুমুল আপত্তির বিষয়ীভূত আছে—ও কিছু দিন থাকিবে। কিন্তু পরিণামে তাঁহাদের জয়লাভ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যে তিন মুখ্য বিষয়ে নারীর অধিকার লইয়া আন্দোলন চলিতেছে—উচ্চ শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যার অনুশীলন, এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ—তাহার প্রথমটী সম্বন্ধে ইয়ুরোপে কোথায় কি হইয়াছে ও হইতেছে, তদ্বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নরওয়ে।—১৮৮০ অব্দে এখানকার প্রথম কুলকন্যা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। তিনি শিক্ষা-সচিবের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। দুই বৎসর পরে অনুমতি প্রদত্ত হয়। তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা দানে কুলবালাদিগের অধিকার জন্মে নাই। বিগত বৎসর এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এখানে নিয়ম আছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ বিচারক, ধর্ম্মযাজক, হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল, বা চিকিৎসক হইতে পারেন

না, সুতরাং নারীগণ এখন ঐ সমস্ত পদ লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন।

ডেনমার্ক।—এখানে একটামাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। স্ত্রীলোকেরা তথায় ধর্ম্ম বিজ্ঞান-ভিন্ন অপর সমস্ত শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া উপাধিলাভ করিতে পারেন। গত বর্ষে ছয়টী কুলকন্যা চিকিৎসা-বিজ্ঞান, একটী দর্শন-শাস্ত্র, এবং তিনটী গ্রীক-লাটিন জর্ম্মন-ফ্রেঞ্চ-প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

সুইডেন।—এখানে ১৮৭০ অব্দে স্ত্রীজাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত ৬০ টীর অধিক নারী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত পূর্ব্ববর্ষে অপ্সালা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারিটী কুলকন্যা বিজ্ঞান ও দর্শন এবং লণ্ড-নগরে দুইটী [illegible]ষ্টকহলমে একটী কুলকন্যা চিকিৎসা-শাস্ত্র [illegible] করিতেছিলেন। বিদ্যোৎসাহী ধ[illegible]নগণ ছাত্রীদিগের জন্যে তিনটী বৃত্তি [illegible]পন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] অধিকারিণীদিগের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে[illegible]

রুসিয়া।—এখানে নারীদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্তু স্থানীয় লোকদিগের যত্নে ও উৎসাহে স্ত্রীশিক্ষার সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে। [illegible]সিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ নগরে, পুরুষদিগকে যে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, কুলকন্যারা তাহা শিখিবার অনুমতি পাইয়াছেন। অধীত বিষয় গুলি দুই ভাগে বিভক্ত (১) বিজ্ঞান এবং (২) সাহিত্য ও ইতিহাস। এই সকল বিষয় বিজ্ঞানের অন্তর্গত— শরীর-তত্ত্ব, উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা, [illegible]বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, খনিজ-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত। গণিতের অতি উচ্চ শাখা সকলও শিক্ষার বিষয়ীভূত। কৃষিতত্ত্ব শিখিবারও বন্দোবস্ত আছে। ছাত্রীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। বর্ষ শেষে প্রত্যেক শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। যাঁহারা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েন, তাঁহারা উপাধি পাইতে পারেন না, সার্টিফিকেট পান। ১৮৮২ অব্দে সার্টিফিকেটের জন্যে প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে ৬২ জন বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং ৯১ জন সাহিত্য ও ইতিহাসের পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। প্রায় ৯০০ ছাত্রী প্রতিবৎসর সেণ্টপিটর্সবর্গ নগরে শিক্ষা [illegible] করিতেছেন। ১৮৮২-৮৩ অব্দের [illegible] মিক[illegible]র খুলিয়া দুই সতের অধিক ছাত্রী উপ[illegible]রা [illegible]ছিলেন।

বেলজিয়ম।—এখানে নারীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ব্রসেল্স্, লীজ, গেণ্ট—এ তিন নগরে ছাত্রীরা শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

হলণ্ড।—এখানে চারিটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। চারিটীতেই নারীরা প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, এবং নানা বিষয় শিখিতেছেন।

সুইটজর্লণ্ড। এখানে জিনিবা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তথায় যে যে বৎসর যত ছাত্রী যে বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার তালিকা—

বর্ষ	বিজ্ঞান	চিকিৎসাশাস্ত্র	সাহিত্য
১৮৭৬-৭৭	১	০	০
১৮৭৭-৭৮	০	৪	০
১৮৭৮-৭৯	৩	২	০
১৮৭৯-৮০	৫	৪	০
১৮৮০-৮১	৬	৭	০
১৮৮১-৮২	৮	৬	০
১৮৮২-৮৩	১২	৮	১

১৮৮২ সন পর্য্যন্ত, বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ৯ জন বি-এ উপাধি, এবং ১ জন চিকিৎসা-তত্ত্বে এম্‌-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ইটালী।—এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উন্মুক্ত। এখানে স্ত্রী-শিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, ইয়ুরোপের অপর কোনস্থলে তেমন হয় নাই। এখানে অনেক "কুলকন্যা" এম্‌-ডি উপাধি, এবং অনেকে সাহিত্যাদি বিষয়ে "ডাক্তার" উপাধি-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৬১ অব্দে মিলান নগরে, এবং ১৮৬৬ অব্দে টিউরিন-নগরে, নারীদিগের জন্যে একটী উচ্চ-শ্রেণীর কালেজ স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৮২ অব্দে রোম ও ফ্লরেন্‌স নগরে একটী করিয়া উচ্চ স্ত্রী-নর্ম্মালস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তথায় ১২টী গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি আছে।

স্পেন।—এদেশে স্ত্রীলোকেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন; কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরীক্ষায় তাঁহা-দিগকে উপাধি দেওয়া হয় না, সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ফ্রান্স।—এখানে এখনও নারী-জাতি উচ্চতম শিক্ষা লাভের অধিকার পান নাই। ১৮৮০ অব্দে সী-সাহেবের বিশেষ যত্নে যে আইন প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার পথ, সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে প্রশস্ত হইয়াছে। এবং নারীগণ আশ্চর্য্য উৎসাহের সহিত শিক্ষা লাভে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৮৮২ অব্দে রুয়াঁ-নগরে তাঁহাদিগের জন্যে যে কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা খুলিবার পূর্ব্বদিনে ২০২ জন প্রবেশার্থিনী ছাত্রীর আবেদন পত্র আসিয়া পহুঁছে। এমিএন নগরে যে কালেজ আছে, তথায় প্রথম কয়েক মাসেই ৬০ জন দৈনিক ছাত্রী এবং ৪০ জন বোর্ডিং-ছাত্রী আসিয়া জুটে। লীয়ন-নগরের কালেজে অতি অল্প দিনের মধ্যে ৪০ জন ছাত্রীর নাম তালিকা-ভুক্ত হয়। মণ্ট-পেলিয়ে নামক স্থানের কালেজে প্রথম কতিপয় মাসে ৭৬ জন, এবং বর্ষশেষের পূর্ব্বে ১০০ জন শিক্ষার্থিনী সমবেত হয়; তাহার অল্প দিন পরে ছাত্রী সংখ্যা ১১২ হইয়া উঠে। সর্‌বন-নগরে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে অল্প দিন মধ্যে তথায় ১৬৫ জন ছাত্রীর সমাগম হয়, ১৮৮১-৮২ অব্দে তাঁহাদের সংখ্যা ২৪৪ হইয়া দাঁড়ায়।

শিক্ষার্থিনীদের যেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হই-তেছে, গবর্ণমেণ্টে এবং ভিন্ন ভিন্ন মিউনি-সিপালিটীও তদ্রূপ উৎসাহের সহিত শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৮৮২ অব্দে গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এককোটী ফ্রাঙ্ক (৪১ লক্ষের অধিক টাকা) দান করেন। রুয়াঁর কালেজ স্থাপন জন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটী ৫ লক্ষ, এবং গবর্ণমেণ্ট ৫ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দান করেন। সী-সাহেবের প্রাগুক্ত আইন প্রচলিত হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার জন্য সেবর-নগরে একটী উচ্চ-শ্রেণীর নর্ম্মালস্কুল ও অন্যান্য স্থলে চারিটী কালেজ স্থাপিত হইয়াছে, অপর ২৬টী নগরে কালেজ স্থাপনের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন ৩৮টী নগরে কালেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চলিতেছে।

ইংলণ্ড।—স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্তে এখানে যত বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে নিউনহাম কালেজ ও গর্টন কালেজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

আমরা শেষোক্ত বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা অতি আবশ্যক, বুঝিয়া, কতকগুলি বিশেষ উৎসাহী লোক, কেম্ব্রিজ-নগরের অনতিদূরে হিচিন নামক স্থলে ১৮৬৯ অব্দে একটী ক্ষুদ্র বাড়ীতে একটী ক্ষুদ্র কালেজ খুলেন। প্রথমে ছয়টী মাত্র ছাত্রী পাঠার্থিনী হয়েন। কেম্ব্রিজের অধ্যাপকগণ আসিয়া শিক্ষাদান করিতেন। ক্রমে ছাত্রী-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সর্ব্ব শেষ পরীক্ষায় ছাত্রীদিগের উত্তর দেখিয়া পরীক্ষকগণ সন্তুষ্ট হইলেন। একটী ছাত্রী গণিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত নম্বর পাইলেন, এবং অপর দুইটী গ্রীক ও লাটিন ভাষায় Honors এর উপযোগী নম্বর লাভ করিলেন।

ক্রমে সেই ক্ষুদ্র বাড়ীতে আর ছাত্রী ধরে না। তখন কেম্ব্রিজ হইতে দুই মাইল দূরে গর্টন-গ্রামে কালেজের জন্য স্থান নেওয়া হইল, এবং গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। বিশ জন ছাত্রীর সমাবেশ হয়, প্রথমত এরূপ গৃহ নির্ম্মিত হইল। বাগানের জন্য ও খেলার জন্য স্থান থাকিল; এবং আবশ্যক হইলে গৃহটী বাড়াইতে পারা যায়, এরূপ বন্দোবস্ত রহিল। ১৮৭৩ অব্দের অক্টোবর মাসে ছাত্রীরা নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে পুনরায় স্থানাভাব হইয়া উঠিল, তখন (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) গৃহটী বাড়াইয়া, পঞ্চাশ জন ছাত্রীর সমাবেশ হয়, এরূপ করা গেল। তাহাতেও স্থান সঙ্কুলন হয় না। তখন পুনরায় বাড়াইয়া, গৃহটীকে, আশীজন পাঠার্থিনী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, এরূপ করা গিয়াছে।

ছাত্রীদিগের উৎসাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত বস্ত্রবয়ন-কোম্পানি ৩টী, চর্ম্ম-ব্যবসায়-কোম্পানি ৩টী, বস্ত্রবিক্রয়-কোম্পানি ৩টী, এবং স্বর্ণকার-কোম্পানি ৩টী বৃত্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজের ছাত্রদিগের যে যে বিষয় পড়িতে হয়, গর্টনের ছাত্রীদিগেরও তাহা অধ্যয়ন করিতে হয়। ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে কেম্ব্রিজে যাইয়া তথাকার লেক্‌চর শুনিতে পারেন। তদ্ভিন্ন গর্টনেও অধ্যাপনার সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। অধ্যাপকগণ অত্যন্ত শ্রম সহকারে ছাত্রীদিগকে পড়াইয়া থাকেন। তাঁহাদের সহিষ্ণুতা আশ্চর্য্য। যাহাতে অধীয়মান বিষয় সুন্দর রূপে বোধগম্য হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কিছু মাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন না।

প্রত্যেক ছাত্রীর বৎসরে ৭০ পাউণ্ডের কিছু অধিক দিতে হয়। ইহাতে শিক্ষার ব্যয়, খাওয়ার ব্যয়, কেম্ব্রিজে যাওয়া আসার ব্যয়, সমস্ত সঙ্কুলন হয়। প্রত্যেক ছাত্রী দুটী করিয়া ঘর পান; একটী শয়নের, অপরটী বসিবার। প্রাতে ঈশ্বরোপাসনা হয়, বেলা ৯ টার সময়ে আহার হয়। আহারান্তে কালেজের অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ হয়, ও ১২ টা বা ১টা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত জলযোগের সময়। জলযোগের পর ইচ্ছানুসারে ছাত্রীরা বেড়ান, বা খেলা করেন। কেহ কেহ বা পাঠ করিয়া থাকেন। ব্যায়ামেরও বন্দোবস্ত আছে। সায়ংকালে ভোজন (ডিনর)। রাত্রি ৯ টার সময় চা-পান। ডিনরের সময়ে

যখন সমস্ত ছাত্রী বড় টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া যান, এবং আহার, গল্প ও হাস্য-কৌতুক চলিতে থাকে, তখন দেখিলে বড় সুন্দর বোধ হয়। চা খাইবার জন্যে হলে সমবেত হইতে হয় না, ঘরে ঘরে চা দেওয়া হইয়া থাকে। এ সময়ে এক ছাত্রী অপর ছাত্রী বা শিক্ষয়িত্রীকে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন। এইরূপ যে ৮।৯ টা ছাত্রীর সমাগম হয়, এবং কৌতুক পূর্ণ আলাপ বা তর্কবিতর্ক ও শাস্ত্রালোচনা হইয়া থাকে, ইহাতে যেমন আমোদ পাওয়া যায়, তেমনই শিক্ষা লাভ হয়।

কালেজে তর্ক-সভা, সঙ্গীত-সভা, এবং লন-টেনিশ রাকেট্‌স্ প্রভৃতি খেলিবার ক্লব, ও অন্যান্য সভা আছে। পুরুষেরা আসিতে পান না। পিতা বা অভিভাবক ভিন্ন কোন পুরুষ দর্শকের কালেজ-গৃহে আসিবার নিয়ম নাই।

গর্টন কালেজের স্থাপন অবধি এ পর্য্যন্ত দুই শতের অধিক ছাত্রী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষয়িত্রীর পদ অবলম্বন করিয়াছেন, বা গ্রন্থ রচনায় লিপ্ত হইয়াছেন, বা চিকিৎসা ব্যবসায়ের আশ্রয় লইয়াছেন; অপরেরা পরোপকার-ব্রতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। অনেকে বিবাহ করিয়াছেন। অবশিষ্টেরা গৃহে অপরবিধ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া কাল যাপন করিতেছেন।

শ্রীশশিভূষণ দত্ত।

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়। *

আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ। কাহারো কাহারো মতে আত্মপ্রত্যয় বলিয়া কোন বস্তু নাই, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য কিছু নাই, সমুদায় সত্যই ইন্দ্রিয়বোধ বা যুক্তি-সম্ভূত। কাহারো কাহারো মতে, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা যুক্তির অতীত, অথচ কোন না কোন প্রকারে তাঁহাদের বিশ্বাসের ভূমি অধিকার করিয়াছে, তাহাই আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ। এই দুই সীমান্তবর্ত্তী মতের মধ্যস্থলে বহুবিধ মত বর্ত্তমান। আমরা এই দুই মতের মধ্যে কোন মতেরই পক্ষপাতী নহে। আমরা বিশ্বাস করি যে,

* "নব্যভারতের" বিগত সংখ্যায় বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লিখিত "উত্তর" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই, ইহার উদ্দেশ্য প্রশস্ততর। কিন্তু বিজয় বাবুর "উত্তরের" প্রত্যুত্তর দিবার জন্য আমি কোন প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করি না, অথচ তদ্বিষয়ে কিছু বলিবার আছে, সুতরাং এই নোটে বলিতে বাধ্য হইলাম। বিজয় বাবু তাঁহার "উত্তরের" শেষ ভাগে যে নিবেদন করিয়াছেন, আশা করি এস্থলে আমার কিছু বলাতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ হইবে না; কেননা আমি তাঁহার প্রবন্ধের ঠিক সমালোচনা করিতেছি না। আমি বিজয় বাবুর "উত্তরের" প্রত্যুত্তর দিতে চাই না এই জন্য যে, তাঁহার "উত্তর" প্রকৃত অর্থে উত্তর নহে; ইহাকে "পুনরুক্তি" বা "আংশিক পুনরুক্তি" বলিলে যথার্থতর নামে অভিহিত করা হয়। পাঠক আমার "ঈশ্বর বিশ্বাস ও দার্শনিক যুক্তি" নামক প্রবন্ধ ও বিজয় বাবুর "উত্তর" এক সঙ্গে পড়িলেই দেখিবেন, আমার অনেক কথা এবং যুক্তির কিছুই উত্তর দেওয়া হয় নাই; কেন দেওয়া হয় নাই, জানি না। বিজয় বাবুর প্রত্যাশিত প্রবন্ধে যে সে সকল কথার উত্তর থাকিবে তাহারও আশা নাই, কেননা সে প্রবন্ধের বিষয় হইবে—আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তির ভূমির অতীত ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তি। সেই প্রত্যাশিত প্রবন্ধের আমি কোন সমালোচনা করিতে চাহিনা। বিজয়বাবু যে

আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য কতকগুলি আছে, অথচ যাহা কিছু সৎযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, অথচ লোকে বিশ্বাস করে অথবা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ বলিতে প্রস্তুত নই। আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে বিস্তৃত সর্ব্বাঙ্গীন্ আলোচনা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ঈশ্বর-

বিশ্বাসের মূল দেখাইবেন, তাহা আমার পক্ষে সন্তোষকর না হইলেও যদি অপরের পক্ষে সন্তোষকর হয়, যদি তাহাতে কোন হৃদয়ে ঈশ্বর বিশ্বাসকে জীবিত রাখিতে পারে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তিতেও ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রমাণিত হয়, ইহা দেখানই আমার মূল উদ্দেশ্য। ২। ১ টী অবান্তর কথা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব, কেননা তাহা বলিবার আর সুবিধা পাইব না; তার জন্য কিছু স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা যায় না। (১) আমি নিজেকে "চিন্তাশীল ও ধর্ম্মানুরাগী" কখনও বলি নাই, আমার মুখে এরূপ কথা তুলিয়া দেওয়া বিজয় বাবুর পক্ষে সুরুচিসঙ্গত হয় নাই। (২) নগেন্দ্র বাবুর অভিজ্ঞতা ও ভক্তি প্রচার এবং আমার "Gleams of the New Light" ও "সাধন বিন্দুর" উল্লেখ "অবলম্বিত স্বীয় প্রচার প্রণালীর" পরিচয় দিবার জন্যই করা হইয়াছিল, আমি এবিষয় ভুল বুঝি নাই। আশ্চর্য্য যে কেশব বাবু প্রভৃতির প্রচার প্রণালী যে নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতির প্রচারপ্রণালীর সঙ্গে একরূপ, তাহা বিজয় বাবু এখনো স্বীকার করিতেছেন না। উভয় দিকেই যুক্তি এবং "ধর্ম্মাভিজ্ঞতা প্রদর্শন" আছে, তবে প্রভেদ কোথায়? (৩) ডাঃ মার্টিনোর প্রচার প্রণালী কেবল "দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি" নহে; তিনি তাঁহার "Endeavours after the Christian Life" ও "Hours of Thought" দ্বারা যে গভীর "ধর্ম্মাভিজ্ঞতা প্রদর্শন" করিতেছেন, বিজয় বাবু কি তার কিছুই জানেন না? (৪) কারণবাদ সম্বন্ধে বিজয় বাবু যাহা বলিয়াছেন, পাঠক তৎবিষয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনেক কথা পাইবেন।

বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ ভাবে সংবদ্ধ কতকগুলি আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য আছে, তাহা সংক্ষেপে দেখানই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। সাময়িক পত্রের প্রস্তাব অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করিবে, নাস্তিককে আস্তিক করিবে, জড়বাদীকে অধ্যাত্মবাদী করিবে, সন্দেহজড়িত মনকে সন্দেহ-মুক্ত করিবে, জ্ঞানপিপাসুর পিপাসা নিবৃত্ত করিবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। ইহাতে যদি আগ্রহশীল পাঠকের মনে একটুও সত্যানুসন্ধান জন্মাইয়া দিতে পারে, জ্ঞান পিপাসুর হৃদয়ে একটীও চিন্তার স্রোত খুলিয়া দিতে পারে, তবেই যথেষ্ট হইল।

যে সত্য বাহ্য বা অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করা যায় না, যাহা যুক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হয় না, তাহাকেই আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য বলি: এই নাম আপত্তিকর হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, অর্থটা স্মরণ থাকিলেই হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, এরূপ সত্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহার লক্ষণ কি? লোকে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়াতীত ও যুক্তির অতীত বিষয়ে বিশ্বাস করে, তাহাই কি আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য? স্পষ্টভাবে একথা বলিবে এরূপ লোক আছে কি না সন্দেহ; কিন্তু কার্য্যত অনেকেরই এই মত। অপরের বিশ্বাসের বেলায় যাহাই হউক, নিজের পোষিত বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেককেই কার্য্যত এই মতের আশ্রয় লইতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, এরূপ মতের কোন মূল্যই নাই। তর্কে হারিলেই যদি আত্মপ্রত্যয়ের দোহাই দিয়া নিস্তার পাওয়া যায়, তবে জ্ঞান ও কুসংস্কার, সত্য ও কল্পনা, আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে কিছুই প্রভেদ থাকে না। তবে আর একেশ্বরবাদী

ও বহুদেববাদী, পৌত্তলিক ও নিরাকারোপাসক, অভ্রান্তশাস্ত্রবাদী ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাবাদী, অনন্ত নরকবাদী ও বিশ্বজনীন্-মুক্তিবাদী, ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। এমন কুসংস্কার অল্পই আছে, যাহা আত্মপ্রত্যয়ের দোহাই দেয় নাই। যদি কল্পনা, অজ্ঞানতা-প্রসূত কুসংস্কার ও আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে, তবে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের একটী সাধারণ লক্ষণ থাকা প্রয়োজন। সে লক্ষণ কি?

বর্ত্তমান সময়ের আত্মপ্রত্যয়-বাদীদিগের, মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে অনেক মতভেদ সত্ত্বেও, একটী বিষয়ে অনেকটা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেরই মত যে, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যের লক্ষণ—বিপরীতের অভাবনীয়তা বা অচিন্তনীয়তা (Inconceivability of the Opposite.) যে বিশ্বাস ইন্দ্রিয়জ্ঞান আত্মদৃষ্টি এবং যুক্তির অতীত, অথচ যাহার বিপরীত মত আদবে চিন্তাই করা যায় না, তাহাই আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত যাহা নহে, সে বিশ্বাসের সত্যতার কোন প্রমাণ নাই। কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই কুযুক্তি বা লোকপরম্পরাগত কিংবদন্তিতে তাহার মূল বাহির করা যায়। যে বিশ্বাস অনতিক্রমনীয় নহে, যাহা ইচ্ছা করিলেই তাড়ান যায়, যাহার বিপরীত স্বচ্ছন্দেই ভাবা যায়, তাহার সত্যতার প্রমাণ কোথায়? তাহা সন্দেহের অতীত হইল কৈ? আবার, অপর দিকে, যাহা অতিক্রম করিতে পার না, যাহার বিপরীত ভাবিতেই পার না, তাহাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা নিতান্তই অনর্থক। ইহার মূল খুঁজিয়া না পাইতে পার, কিন্তু ইহার সত্যতায় তোমাকে কথায় না হউক, কার্য্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এই মতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পরিপোষক হার্বার্টস্পেনসার। নাস্তিক আস্তিক, বিশ্বাসী সন্দেহবাদী, আত্মপ্রত্যয়বাদী . আত্মপ্রত্যয়-বিরোধী, সকলেই এই মতের সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সাক্ষী, কেননা যে সকল বিশ্বাসের বিপরীত অচিন্তনীয়, তাহা কেহই কার্য্যকালে অতিক্রম করিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ সন্দেহবাদী হিউম বলিতেন, "আমার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া জনসমাজে আসিলে আমার সমুদায় যুক্তিতর্ক ব্যর্থ হইয়া যায়, কেননা তখন অযৌক্তিক লৌকিক বিশ্বাস সমূহেও আমি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না।" আমরা দুটী আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের দৃষ্টান্ত দিতেছি, পাঠক দেখুন্ দেখি ইহাদের বিপরীত ভাবিতে পারেন কি না। (১) প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, (২) দুই সরলরেখা স্থান বেষ্টন করিতে পারে না। এই বিশ্বাস দ্বয় যে বাহ্য বা অন্তরেন্দ্রিয়ের অথবা যুক্তির বিষয় নহে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমরা আমাদের দৃষ্ট কার্য্য মাত্রেরই কারণ দেখিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহা হইতে এরূপ সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী বিশ্বাসে কখনই উপস্থিত হওয়া যায় না যে, আমাদের প্রত্যক্ষীভূত বা অপ্রত্যক্ষীভূত কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, অথচ আমরা তাহাই বিশ্বাস করি; যিনি তর্ক দ্বারা এই বিশ্বাস উড়াইয়া দিতে চান, তিনিও কার্য্যকালে ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না; এই বিশ্বাস আমাদের খাওয়া শোওয়া, লেখা পড়া, কথাবার্ত্তা, চলা বসা—সমুদয় দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তিভূমি। দ্বিতীয়

বিশ্বাসটীও তেমনিই ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও যুক্তির অতীত, অথচ সর্ব্বোভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের প্রত্যক্ষীভূত সমুদয় সরলরেখা স্থান বেষ্টনে অক্ষম হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, এমন কোন দুটী সরল রেখা থাকিতে পারে না যাহারা স্থান বেষ্টনে সক্ষম; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তাহাই। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে কোন স্থানে, কোনকালে দুটী সরল রেখা স্থানবেষ্টন করিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সন্দেহ-রুগ্ন দার্শনিকগণ এরূপ স্পষ্ট সত্যের ও অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কিন্তু এই যে "বিপরীতের অভাবনীয়তা" রূপ আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ, ইহাতেও কিঞ্চিৎ অপরিপক্কতা আছে। ইহা অনেকস্থলে সত্য-নির্ণায়ক হইলেও, ইহাকে একেবারে অভ্রান্ত লক্ষণ বলিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, বিপরীতের অভাবনীয়তা জ্ঞানের অভাব বা ভাবযোগের দৃঢ়তা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে; যেস্থলে এরূপ হয়, সেস্থলে একটা বিশ্বাসের বিপরীত অভাবনীয় হইলেও সে বিশ্বাসকে সত্যমূলক বিশ্বাস বলিতে পারি না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। এমন এক সময় ছিল, যখন পৃথিবী শূন্যে থাকিতে পারে, পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকে দুই স্থান থাকিতে পারে, (antipodes) ঘূর্ণায়মান পৃথিবী-পৃষ্ঠে মানুষ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, এই সমুদায় সত্য অধিকাংশের পক্ষে অভাবনীয় ছিল, কিন্তু এখন আর নাই, জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয়ও ভাবনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তখনকার লোকেরা "বিপরীতের অভাবনীয়তার" দোহাই দিয়া যদি বলিত যে "পৃথিবী শূন্যে থাকিতে পারেনা," "antipodes থাকা অসম্ভব," "ঘূর্ণায়মান পৃথিবী পৃষ্ঠে মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না" এই সমুদায় আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী সত্য, তাহা হইলে কি তাহাদের কথা সত্যমূলক হইত? স্পষ্টতই না। আবার ভাবযোগের এমনই দৃঢ়তা যে, অগ্নি সংযোগে সর্ব্বদাই বস্তু দগ্ধ হয়, উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সংযোগে নিত্যই জলের সৃষ্টি হয়, পৃথিবী সর্ব্বদাই বস্তু আকর্ষণ করে, উত্তাপ সংযোগে বস্তু সমূহ নিত্যই প্রসারিত হয়, এই সমুদায় দেখিয়া অনেক দার্শনিকেরও বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, এই সমুদায় ঘটনা অবশ্যম্ভাবী,—ইহাদের বিপরীত অভাবনীয়; অথচ সকলের পক্ষে তাহা ঠিক নহে, অনেকে ইহাদের বিপরীত স্বচ্ছন্দেই ভাবিতে পারে। এই সমুদায় আপত্তির সম্পূর্ণ বিচার আমরা এখন করিতে চাই না; কিন্তু ইটী বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, "বিপরীতের অভাবনীয়তাকে" মূলসত্যের অভ্রান্ত লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করাতে অনেক বিঘ্ন আছে; জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারে, ভাবযোগের দৃঢ়তা ও শিথিলতা অনুসারে "ভাবনীয়তা" "অভাবনীয়তার"ও তারতম্য হয়; সুতরাং এই লক্ষণ দ্বারা বিচার করিতে গেলে অনেক কুসংস্কার ও আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের সম্মান পাইতে পারে। তবেই "বিপরীতের অভাবনীয়তাকে" আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের অভ্রান্ত লক্ষণ বলা যাইতে পারে না।

সুতরাং আর এক পদ অগ্রসর হইতে হইল। কাহারো কাহারো মতে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের লক্ষণ "বিপরীতের

আত্ম-বিরোধিতা" (contradictoriness of the opposite.) আমরা এই মতেরই পক্ষপাতী। এই লক্ষণ অভ্রান্ত। এই পরীক্ষা চূড়ান্ত, ইহাতে প্রবঞ্চিত হওয়া অসম্ভব। এই লক্ষণটী স্পষ্টরূপে বুঝাইতেছি। তর্কশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মাত্রেই Law of Identity, Law of Contradiction, Law of Excluded Middle নামক চিন্তার মৌলিক নিয়ম ত্রয়ের বিষয় জানেন; আমরা সাধারণ পাঠকের জন্য প্রথম দুটী নিয়ম দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। প্রথম নিয়ম এই—

যাহা আছে তাহা আছে
অথবা—যাহা···হয় তাহা···হয়
দৃষ্টান্ত—যাহা কাল" তাহা কাল"
২য় দৃ—যাহা গোল" তাহা গোল"

এই নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে বোধ হয় আর কিছু বলিতে হইবে না; ইহাতে সন্দেহ করা দূরে থাক্, ইহার সরলতা দেখিয়া হয়ত অনেক পাঠক হাস্য করিবেন এবং বলিবেন, ইহা আবার কি কাজে লাগিবে? তাহা পরে দেখিবেন। যাহা হউক, এই নিয়মের মর্ম্ম এই যে, subject এ যাহা কিছু বুঝায়, (স্পষ্টরূপেই হউক, আর গূঢ়রূপেই হউক) তাহা predicate এ উল্লিখিত হইলে অবশ্যই সত্য হইবে। আর একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্—"বৃত্ত মাত্রেরই কেন্দ্র আছে," এই বাক্যটী সম্পূর্ণরূপেই উক্ত নিয়মের অনুযায়ী; "বৃত্ত" কথাটীতে কেন্দ্রের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও আমরা জানি "বৃত্ত" বলিলেই কেন্দ্রশালী বুঝায়, কেন্দ্রশূন্য বৃত্ত অর্থহীন; সুতরাং subject এর সংজ্ঞায় যাহা সংবলিত আছে, তাহা স্পষ্টরূপে predicate এ উল্লিখিত হইলে তাহা অবশ্যই সত্য হইবে। অতঃপর দ্বিতীয় নিয়মের উল্লেখ করা যাইতেছে—

যাহা আছে তাহা নাই হইতে পারে না।
অথবা যাহা হয় তাহা নয় হইতে পারে না।
দৃষ্টান্ত—যাহা কাল" তাহা কাল নয় হইতে পারে না।
যাহা গোল" তাহা গোল-নয় হইতে পারেনা।

অর্থাৎ নিয়মটীর মর্ম্ম এই যে, এক স্থানে, এককালে, একই বস্তু বিপরীত গুণাক্রান্ত হইতে পারে না। [পাঠক "বিবিধ" ও "বিপরীতে" গোল করিবেন না] অথবা—যাহা subject এর সংজ্ঞায় স্পষ্টরূপেই হউক আর অস্পষ্টরূপেই হউক সংবলিত আছে, তাহার বিপরীত কথা predicate এ উক্ত হইতে পারে না। একখানা কাগজের কতক কাল থাকিতে পারে, কতক সাদা [কাল-নয়] থাকিতে পারে; একটী টুকরা কাগজ এক সময় শাদা [কাল-নয়] থাকিতে পারে, অন্য সময়ে উহাকে কাল করা যাইতে পারে, কিন্তু একই টুকরা কাগজ একই সময়ে কাল এবং শাদা [কাল-নয়] হইতে পারে না। একটী বস্তু কখনো উষ্ণ কখন ও শীতল [উষ্ণ-নয়] হইতে পারে, অথবা একই সময়ে এক হাতে উষ্ণ, আর এক হাতে শীতল [উষ্ণ-নয়] বোধ হইতে পারে, কিন্তু একই সময়ে, একই হাতে উষ্ণ এবং শীতল [উষ্ণ-নয়] হইতে পারে না। অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন বাহুল্য মাত্র। এই মৌলিক নিয়মের যাথার্থ্য সকলেই স্বীকার করিবেন; ইহা স্বীকার না করিলে হাঁ না, সত্য অসত্য, জ্ঞান অজ্ঞানতার কিছুই প্রভেদ থাকে না।

পাঠক এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে কোন বিশ্বাস উক্ত নিয়মদ্বয়ের অনুযায়ী তাহা সত্য না হইয়া পারে না, এবং যে কোন বাক্যে উক্ত নিয়মদ্বয় ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা মিথ্যা না হইয়া পারে না। আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—আমি বলিলাম যে, এমন হইতে পারে যে আমাদের দৃষ্টির অতীত কোন সরল রেখাদ্বয় স্থান বেষ্টন করিতে পারে। এই প্রস্তাব (proposition) দ্বিতীয় নিয়মের বিরোধী, সুতরাং ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। দুটী রেখাকে স্থান বেষ্টন করিতে হইলেই তাহাদিগকে বাঁকা অর্থাৎ অসরল হইতে হইবে, দুটী রেখার স্থান বেষ্টনের আর কোন অর্থই নাই; সুতরাং "দুটী সরল রেখা স্থান বেষ্টন করিতে পারে," ইহার প্রকৃত অর্থ—"সরল রেখা অসরল হইতে পারে" ইহা অসম্ভব; সুতরাং উক্ত প্রস্তাব অবশ্যই অসত্য এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ "দুই সরল রেখা স্থান বেষ্টন করিতে পারে না" এই প্রস্তাব সত্য। এই বাক্যের সত্যতার প্রমাণ প্রথম নিয়ম; সরল রেখার সংজ্ঞার ভিতরেই স্থান বেষ্টনের অসামর্থ্য নিহিত রহিয়াছে; subject এ যাহা প্রচ্ছন্ন আছে, predicate এ তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে।*

এখন আমরা দেখাইব যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে সংসৃষ্ট কতকগুলি বিশ্বাস আছে, যাহারা উক্ত মৌলিক নিয়ম দ্বয়ের অনুযায়ী। যদি তাহাই হয়, তবে ঐ সকল বিশ্বাসকে আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধমূল সত্য বলিতে বোধ হয় কাহারো আপত্তি থাকিবে না। যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ঐ সকল মত অনতিক্রমনীয় সত্যরূপে গৃহীত হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। একটী বক্তব্য এই যে, স্পষ্টরূপে প্রস্তাব গুলির অর্থ বুঝার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। আমাদের বিশ্বাস যে, যে সকল বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ, তাহা একবার স্পষ্টরূপে বুঝিলে অস্বীকার করা অসম্ভব; অধিকাংশ সন্দেহ অবিশ্বাসের কারণ অর্থ বোধ সম্বন্ধে গোলমাল। যাহা হউক, উল্লিখিত বিশ্বাস গুলি একে একে উল্লেখ করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, উহারা অবশ্যম্ভাবী মূল সত্য।

১। জড় মাত্রই আত্মার জ্ঞানাধীন (Dependent on perception)

কোন কোন পাঠক বলিবেন, যাহা লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে এত বিবাদ, তাহাকেই আমরা আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ মূল সত্য বলিতেছি, এ কেমন! ইহার উত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লৌকিক ভাষায় যাহাকে জড় বলে, সেই জড়ের সম্বন্ধে আধুনিক দার্শনিকদিগের প্রায় কিছুই মত ভেদ নাই; সাধারণ লোকের অবোধ্য, ইন্দ্রিয়াতীত জড়াধার সম্বন্ধেই যত মতভেদ। যাহা হউক, মত ভেদের কথায় এখন বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমাদের উল্লিখিত প্রস্তাবটী আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। জড়ের লৌকিক অর্থ—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয়; যাহা কিছু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় তারই নাম জড়; আমরাও এই অর্থেই জড় বলিয়াছি। আচ্ছা, ইটি সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞান না হইলে আমাদের জড়ের কোন ভাবই

* পাঠকদিগের মধ্যে কেহ ক্যাণ্ট-শিষ্য থাকিলে হয়ত এই দৃষ্টান্ত আপত্তিকর মনে করিবেন। আমরা ক্যাণ্ট-শিষ্য নহি।

(idea) হইত না, যাহা কিছু জড়ের ভাব তাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতেই; অন্ধের কাছে বর্ণ কিছুই নয়, বধিরের কাছে শব্দ কিছুই নয়, স্পর্শশক্তি-বিরহিতের কাছে উষ্ণতা শীতলতা, কিছুই নয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতেই জড়ের ভাব পাই। ইন্দ্রিয় জ্ঞান আমাদিগকে জড়ের কি ভাব দেয়? জড়ের অর্থ কি? জড়ের অর্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত বস্তু. জড়ের অর্থ দৃষ্টবস্তু, শ্রুত বস্তু, স্পৃষ্ট বস্তু ইত্যাদি; ইহা ব্যতীত জড়ের ভাব আমাদের কিছুই নাই; অন্য কোন জীবের যদি থাকে, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা জড় বলিতে বুঝি, দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট ইত্যাদি, সংক্ষেপত—জ্ঞাত। কিন্তু "জ্ঞাত" অর্থই "আত্মার জ্ঞানাধীন', সুতরাং "জড় মাত্রই আত্মার জ্ঞানাধীন" এই প্রস্তাব উপরোক্ত প্রথম নিয়মাধীন, ইহার subject এ যাহা নিহিত আছে তাহাই predicateও প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা একটী অবশ্যম্ভাবী সত্য। ইহাকে অস্বীকার করিতে যাও, ইহার বিপরীত মত মানিতে যাও, দেখিবে তাহাতে দ্বিতীয় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ হইবে। দেখা যাক্‌। কেহ বলিলেন, 'কেন?—জড় আত্মার জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র রূপেও থাকিতে পারে. অর্থাৎ জড় অজ্ঞাত অবস্থায়ও থাকিতে পারে।' কিন্তু জড় অর্থই —'জ্ঞাত বস্তু' সুতরাং কথাটা এই দাঁড়াইতেছে যে 'জ্ঞাত বস্তু অজ্ঞাত হইতে পারে" ইহাতে দ্বিতীয় নিয়ম স্পষ্টই ভঙ্গ হইতেছে, সুতরাং ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না।

২। জড়জগৎ কোন নিত্য জ্ঞানের অধীন।

জড়জগৎ কখনো আমাদিগের নিকট প্রকাশিত, কখনো আমাদিগের হইতে লুক্কায়িত হইতেছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে জড় জগতের অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, আমরা যখন ইহাকে জানি তখনই যে ইহার উৎপত্তি, এবং যখন জানি না তখনই ইহার বিলয়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না; এই বিশ্বাসের মূল এখন অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন নাই; এই বিশ্বাস সকলেরই আছে; আমরা বিশ্বাস করি যে, জড় জগৎ আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবেও থাকিতে পারে। কিন্তু জড় জগৎ অর্থই—"জ্ঞাত জগৎ" অর্থাৎ জ্ঞানাধীন জগৎ; সুতরাং আমাদের জ্ঞানাধীন না হইলেও ইহা একটী নিত্য জ্ঞানের অধীন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহা অস্বীকার করিলে যে দ্বিতীয় নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহা দেখান বাহুল্য মাত্র। এই নিত্য জ্ঞানের নামই ঈশ্বর।

৩। বিষয়ী মাত্রই বিষয়-সংসৃষ্ট।

'বিষয়ী' অর্থ যে জানে, জ্ঞাতা; 'বিষয়' অর্থ যাহা জানা যায়, জ্ঞাত। জ্ঞান-কার্য্য হইতেই বিষয় ও বিষয়ীর পরিচয়; জ্ঞানের সম্বন্ধেই 'বিষয়' ও 'বিষয়ী' অর্থ-যুক্ত, জ্ঞানের বাহিরে 'বিষয়' ও 'বিষয়ী' অর্থশূন্য; সুতরাং জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া আমরা 'বিষয়' 'বিষয়ীর' সংজ্ঞা করিতে পারি না। জ্ঞানের ভূমিতে বিষয় বিষয়ীর এই পরিচয় পাই যে বিষয়ী জ্ঞাতা, বিষয় জ্ঞাত। জ্ঞাতারই অপর নাম বিষয়ী, জ্ঞাতেরই অপর নাম বিষয়। সুতরাং অ-জ্ঞাতা বিষয়ী [এবং অজ্ঞাত বিষয়] থাকিতে পারে না, জ্ঞান শূন্য আত্মা থাকিতে পারে না; জ্ঞানশূন্য আত্মা থাকিতে পারিলে আত্মা আর জড়ে কোন প্রভেদ থাকিত না। অত-

এব বিষয়ী মাত্রই জ্ঞাতা হওয়া চাই; কিন্তু 'জ্ঞাতা' বলিলেই বিষয়-সংস্পৃষ্ট বুঝায়, কেননা 'জ্ঞাতা' অর্থ 'যে জানিতেছে;' কি জানিতেছে?—একটা কিছু জ্ঞানের বিষয় অবশ্যই থাকা চাই। সুতরাং বিষয়ী মাত্রই বিষয়-সংস্পৃষ্ট। 'বিষয়-সংস্পৃষ্ট' কথাটা পাঠক ভুল বুঝিবেন না, 'বিষয়-সংস্পৃষ্ট' অর্থ 'শরীর যুক্ত' নহে, 'বিষয় সংস্পৃষ্ট' অর্থ—যাহার জ্ঞানাধীনে বিষয় আছে। উপরোক্ত প্রস্তাবটী যে প্রথম নিয়মাধীন একটী মূল সত্য, তাহা আর বোধ হয় বিশেষ করিয়া দেখাইতে হইবে না। পাঠক এই মূল সত্যটীর বিষয় গভীর ভাবে ভাবিলে অনেক আলোক লাভ করিবেন। 'বিষয়' অর্থ যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, ভাবা যায়, কল্পনা করা যায়, সংক্ষেপতঃ—জানা যায়। [দেখা শুনা ইত্যাদি জ্ঞানেরই অবস্থান্তর মাত্র] বিষয়কে 'জড়' বল, আর 'আবির্ভাব' বল, আর 'ভাব' বল, আর 'বোধ' বল, বিশেষ কিছু আসে যায় না, নাম গুলি কেবল জ্ঞানের অবস্থার তারতম্য সূচক মাত্র। 'বিষয়' অর্থ আত্মার অবলম্বিত বস্তু; তেমনি বিষয়ীর অর্থ ও বিষয়ের জ্ঞাতা, ভাবুক, আধার। ভাবিলেই দেখা যায়, বিষয়ী ছাড়া বিষয়ের এবং বিষয় ছাড়া বিষয়ীর কোন ভাব (idea)ই হয়না, কোন অর্থই হয় না। বিষয় ও বিষয়ী একই মৌলিক সত্বার দুটী দিক্ মাত্র—দুটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। এই দুটী দিককে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা যায়, কিন্তু কার্য্যে কিম্বা কল্পনায় কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একটী বলিলে অবশ্যম্ভাবী রূপে আর একটীকে বুঝায়। বিষয় মাত্রই বিষয়ী-সংস্পৃষ্ট, বিষয়ী মাত্রই বিষয়-সংস্পৃষ্ট।

৪। জড় স্বয়ং নিষ্ক্রিয়।

'জড়' অর্থ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাধীন বিষয়—আত্মার অধীনস্থ ভাব বিশেষ; সুতরাং জড়ের প্রকৃতিতেই নিষ্ক্রিয়তা নিহিত রহিয়াছে। স্বয়ং ক্রিয়াবান হইতে হইলেই স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা বুঝায়, কিন্তু জড় স্বাধীন নহে, স্বতন্ত্র নহে, ইহা আত্মার অধীন—আত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্য-রূপে সম্বদ্ধ—ভাব নিচয় মাত্র। যাহার প্রকৃতিই অধীনতা, সে আবার স্বতঃ ক্রিয়াবান অর্থাৎ স্বাধীন হইবে কিরূপে? সুতরাং 'জড় স্বয়ং ক্রিয়াবান' এই কথা বলিলে এই বুঝা যায় যে, অধীন বস্তু স্বাধীন, অর্থাৎ অধীন নহে, ইহাতে স্পষ্টতই দ্বিতীয় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ হয়, সুতরাং ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। অতএব উপরোক্ত প্রস্তাব প্রথম নিয়মাধীন মূল সত্য; ইহার subject এ যাহা নিহিত আছে predicate তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। এই মূল সত্য জড় বিজ্ঞানের ভিত্তি ভূমি; বিজ্ঞান জড়কে নিষ্ক্রিয় ভিন্ন ভাবিতে পারে না, তাহাতেই ক্রিয়াবান "শক্তি" নামক পদার্থে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। স্থূলদর্শী দার্শনিকেরা একদিকে জড়কে 'ভাব' (ideas or sensations) 'আবির্ভাব' (phenomena) 'মনের অবস্থা নিচয়' বলিয়া স্বীকার করিয়া আবার পরক্ষণেই ইহাকে স্বাধীন কার্য্যক্ষম বলিয়া কেবল নিজের স্থূলদর্শিতারই পরিচয় দেন। অন্য নানা অর্থে জড় দুরবগাহ রহস্যময় হইতে পারে; জড় বিস্ময়কর, সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুগ্ধকর হইতে পারে; হইবে না কেন? অনন্ত হৃদয় নিহিত, অনন্ত হৃদয়োত্থিত ভাব রাশি ক্ষুদ্র কীটসম মানুষের পক্ষে দুরবগাহ, বিস্ময়কর, মুগ্ধকর হইবে, ইহা আর বিচিত্র

কি? কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে জড় স্বয়ং ক্রিয়াবান; যে মুহূর্ত্তে ইহাকে sensation বলিলাম, idea বলিলাম, phenomenon বলিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই ইহার অন্য সহস্র বিশেষণ সত্ত্বেও ইহাকে নিষ্ক্রিয় বলিতে বাধ্য হইলাম; আর sensations, ideas, phenomena ভিন্ন জড়ের অন্য কোন অর্থই নাই। সুতরাং যিনি জড়কে কার্য্যক্ষম বলেন, তিনি হয় জড়ের অর্থ জানেন না, না হয় অর্থ অগ্রাহ্য করিয়া, জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া, কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিবার প্রয়াসী।

৫। কার্য্যমাত্রেই কর্ত্তা-সাপেক্ষ।

'কার্য্য' অর্থ পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন বলিলেই আমরা সাধারণত বিষয়ের পরিবর্ত্তন বুঝি, মনের সম্মুখে ভাবের আবির্ভাব, মন হইতে ভাবের তিরোভাব, ভাবের অবস্থান্তর, এই সমুদায়ের নাম পরিবর্ত্তন; কার্য্য এবং পরিবর্ত্তনের অন্য অর্থও থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা এস্থলে এ অর্থই গ্রহণ করিলাম; কার্য্য অর্থ বিষয়ের পরিবর্ত্তন। বিষয় স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তন বলিলেই কোন ক্রিয়াবান বস্তু বা ব্যক্তির কর্তৃত্ব বুঝায়। অতএব উপরোক্ত প্রস্তাবটী একটী মূল সত্য; ইহার প্রকৃত আকার —নিষ্ক্রিয় বস্তুর পরিবর্ত্তন মাত্রেই কর্ত্তা-সাপেক্ষ; ইহার বিপরীত প্রস্তাব স্পষ্টতই দ্বিতীয় নিয়ম-বিরুদ্ধ। এই মূলসত্যই কারণবাদের মূল-সূত্র; সাধারণত ইহা এই আকারে উক্ত হইয়া থাকে—'কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে;' আমরা ইহাকে এই আকারে বসাইতে ইচ্ছা করি না, কেন না ইহাতে অনেক গোলমাল হয়; 'কারণের' অর্থ লইয়া অনেক গোলযোগ হয়। কিন্তু কর্ত্তা ব্যতীত প্রকৃত কারণ আর কিছুই হইতে পারে না, আত্মপ্রত্যয় কর্ত্তাকেই চায় এবং কর্ত্তাকে পাইলেই তৃপ্ত হয়, অন্যবিধ কারণে তৃপ্ত হয় না। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পাঠক "Roots of Faith"এর "Cause—physical and spiritual" নামক প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে, এবং বিগত বর্ষের "নব্যভারতের" "নাস্তিকতা" ও 'আস্তিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্বয়ে দেখিতে পাইবেন।

৬। কর্ত্তা মাত্রেই জ্ঞানী।

'কর্ত্তা' অর্থ কার্য্যের উৎপাদক; 'কার্য্য' অর্থ বিষয়ের পরিবর্ত্তন। 'বিষয়' অর্থ আত্মার ভাবনিচয়। আত্মার ভাব নিচয় ব্যতীত বিষয়ের আর কোন অর্থ নাই। সুতরাং বিষয়ের পরিবর্ত্তন কেবল আত্মাই করিতে পারে, জ্ঞাতের পরিবর্ত্তন কেবল জ্ঞাতাই করিতে পারে।। যাহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ, কেবল সেই বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিতে পারে; বিষয়ীর সহিত বিষয়ের নিত্য সম্বন্ধ, এবং বিষয়ী ভিন্ন আর কাহারো সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, কেন না "জ্ঞাত" ভিন্ন বিষয়ের আর কোন অর্থ নাই, এবং জ্ঞাত বলিলে কেবল জ্ঞাতার সঙ্গেই সম্বন্ধ বুঝায়। সুতরাং "কর্ত্তা মাত্রই জ্ঞানী" এই প্রস্তাবের পূর্ণ আকার —"বিষয় পরিবর্ত্তনকারী মাত্রই জ্ঞানী" অর্থাৎ "বিষয়-সংসৃষ্ট মাত্রই জ্ঞানী" অর্থাৎ বিষয়ী। বিষয় সংসৃষ্ট আর "বিষয়ী" একই কথা। অতএব দেখা যাইতেছে "অন্ধ শক্তি" "অজ্ঞান অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় শক্তি" এই সমুদায় কেবল অর্থহীন কল্পনা মাত্র, জ্ঞানের বেশে অজ্ঞান, আলোকের বেশে অন্ধকার মাত্র। জ্ঞাতা বা জ্ঞানী ছাড়া আর কিছুরই শক্তি, কর্তৃত্ব, কারণত্ব থাকিতে পারে না;

কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞান অবিচ্ছেদ্য। এই বিষয়ের ও সমালোচনা উপরোক্ত পুস্তক ও প্রবন্ধে আছে।

৭। অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। কিছু-না হইতে কিছু হইতে পারে না।

ইহা কারণবাদের মূল সূত্রেরই একটী ভিন্ন আকার; কিন্তু ইহাকে এই স্বতন্ত্র আকারে বুঝা ও ধরা আবশ্যক; ইহা অজ্ঞেয়তাবাদ জড়বাদ প্রভৃতির মূলোচ্ছেদ-কারী। 'অসৎ' অর্থ শূন্য; অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে, ইহার অর্থ শূন্য স্বয়ং পূর্ণ হইতে পারে, বা শূন্য অশূন্য হইতে পারে,—ইহা স্পষ্টতই দ্বিতীয় নিয়ম-বিরুদ্ধ। 'অসৎ' বা 'কিছু-না' ইহাতে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা ও শক্তি-হীনতা বুঝায়, সুতরাং অসৎ বা কিছু না হইতে কিছু হইতে পারে না, ইহা বলিলে subject এ যাহা নিহিত আছে predicate এ তাহাই প্রকাশ করা হয়; সুতরাং উপরোক্ত প্রস্তাব প্রথম নিয়-মানুযায়ী মূল সত্য। এই মূল সত্য কোন না কোন আকারে সকলেই বিশ্বাস করে; প্রত্যেক কার্য্যের উপযুক্ত কারণ খুঁজিবার প্রবৃত্তি এই মূল বিশ্বাস হইতেই উৎপন্ন হয়।

৮। অচেতন হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না।

ইহা উপরোক্ত মূল সত্যেরই একটী প্রয়োগ মাত্র; চৈতন্যের সম্বন্ধে অচেতন অসৎ, অচেতন সহস্র-গুণ সম্পন্ন হইলেও চৈতন্যের সম্বন্ধে ইহা কিছু-নার সমান, সুতরাং অচেতন হইতে চৈতন্য হইতে পারে, ইহা বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয়, অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ কার্য্যের উপযুক্ত কারণ, ফলের উপযোগী বৃক্ষ না পাইলে কখনই তৃপ্ত হয় না, অথচ এই উচ্চতর বিষয়ে বৃথা বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আত্ম-প্রতারিত হয়। বিজ্ঞান অচেতন হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি কেবল যে প্রমাণ করিতে পারে নাই, তাহা নহে, বিজ্ঞানের পক্ষে তাহা প্রমাণ করা অসম্ভব। বিজ্ঞান 'না'কে 'হাঁ' করিতে পারে না, অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে না। মানিলাম যে বিজ্ঞান এত দিন এই বিষয়ে যাহা করিতে পারে নাই তাহাও এককালে করিতে পারে, কিন্তু তাহাতেও উপরোক্ত মূল সত্যকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বিজ্ঞান কত দূর যাইতে পারে? যে স্থলে চৈতন্য বা চৈতন্যের কোন বীজ নাই, বিজ্ঞান এখনো সে স্থলে চৈতন্যের উৎপত্তি দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু মানিলাম যে এক সময় দেখাইতে পারে; কিন্তু তাহাতেও জড়বাদ সপ্রমাণ হইবে না—জড় হইতে চৈতন্য হইল ইহা সপ্রমাণ হইবে না। জড়ের সংযোগ উপলক্ষে চৈতন্যের উপৎত্তি হইতে পারে, কিন্তু এরূপ স্থলে জড়ের সংযোগ উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃত কারণ নহে। চৈতন্যের কারণ কেবল চৈতন্যই হইতে পারে। যাহাতে যাহা নাই সে তাহার কারণ হইতে পারে, ইহা মানিলে কারণের কোন অর্থ থাকে না। এক জন মূর্খকে কোন কালেজের অধ্যাপক করিলে, দুর্নীত অভক্তকে ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত করিলে, এক জন বিজ্ঞানানভিজ্ঞকে রয়েল সোসাইটির বক্তা করিলে জড়বাদী মাত্রই আপত্তি করিবে; অথচ জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহা বলিয়া আত্ম প্রতারিত হইতে এবং লোকের মতিভ্রম জন্মাইতে ত্রুটি করিবেনা।

৯। জড়জগৎ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন।

এস্থলে 'জড়জগৎ' অর্থে আমরা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত জগৎ বুঝিতেছি—যে জগৎ কখনো আমাদের সমক্ষে আবির্ভূত, কখনো আমাদের নিকট হইতে তিরোভূত হইতেছে তাহারই কথা বলিতেছি; জড় আত্মার জ্ঞানাধীন ভাবনিচয় মাত্র, ইহা ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে; জড় জগৎ অর্থ তবে, ভাব জগৎ; Material world অর্থ phenomenal world. এই ভাব জগৎ কোথা হইতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে? কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে? অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে না, সুতরাং এই জগতের কোন কারণ আছে; কিন্তু সেই কারণ অচেতন ভাবশূন্য হইতে পারে না; যিনি অজ্ঞেয়, তাহাতে ভাব আছে কি না জানি না; যাহাতে ভাব নাই তিনি ভাব দিবেন কিরূপে? যাহাতে বিষয় নাই তিনি বিষয়ের কারণ হইবেন কিরূপে? সুতরাং এই প্রবহমান সৃষ্টি কার্য্যের কারণ কেবল পরমাত্মাই হইতে পারেন। যিনি ভাবের আধার, যিনি বিষয়-সংসৃষ্ট, কেবল তিনিই ভাব উৎপাদন করিতে পারেন, বিষয় প্রকাশিত করিতে পারেন।

১০। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন।

জীবাত্মা সৃষ্ট। এই যে পরিমিত জ্ঞানযুক্ত, অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান-বিরহিত, বিস্মৃতি-প্রবণ, বর্দ্ধনশীল, পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষুদ্র আত্মা, ইহা নিশ্চয়ই জাত, সৃষ্ট, কিন্তু ইহা কিছু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই; অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে না। ইহা যে অজ্ঞান বা অজ্ঞেয় কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তাহাও নিশ্চয়, যাহাতে যাহা নাই সে তাহা দিবে কিরূপে? জ্ঞান বস্তু উপাদন করিবার পক্ষে অজ্ঞান বস্তু বা অজ্ঞেয় বস্তু উভয়ই অসৎ; সুতরাং জীবাত্মার কারণ কেবল পরমাত্মাই হইতে পারেন।

অদ্য এইখানেই থামি। যদি পারি, ভবিষ্যতে ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় আরো কতিপয় মূল সত্যের ব্যাখ্যা করিব, অথবা পূর্ব্বোক্ত গুলিকেই আরো বিস্তৃত রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

আত্মহত্যা।

(কোন রমণীর বিষপানে মৃত্যুউপলক্ষে লিখিত)

মানিনি! কি অভিমানে হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়ে বিষ করেছিস্ পান?
এত কি হইল ঘৃণা, গেল না জীবন বিনা,
কোন্ মূর্খ করিয়াছে এত অপমান?
এমন অযত্নে হায়, অনাদরে অবজ্ঞায়
দু'পায় ঠেলিল কেরে মণি মূল্যবান?
সত্যই পাপিষ্ঠ নরে, এত অত্যাচার করে?
মানবের বুকে কিরে দানবের প্রাণ?
আহা হা স্বর্গের দেবি! সে রাক্ষসে নিত্য সেবি
পতিপুত্র ভ্রাতারূপে সাধিস্ কল্যাণ!

তোর মত আছে কেরে, স্বর্গমর্ত্ত্য ত্রিসংসারে
প্রাণময়ী মূর্ত্তিমতী আত্ম বলিদান ?
কোন্ মূর্খ করিয়াছে এত অপমান ?

১

কি দুঃখেরে পাগলিনি! হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়ে বিষ করেছিস্ পান ?
কার সোণামুখী তরী, কারে রে কাঙ্গাল করি
অকালে ডুবিলি বিনা ঝটিকা তুফান ?
কার রে আছিলি তুই, সুধাময়ী বেলি যূঁই
যৌবন বসন্তে ভরা প্রেমের উদ্যান ?
কারে বিধি প্রতিকূল, কার সে স্বর্গীয় ফুল
অকালে খসিলি কার কাঁদাইয়া প্রাণ ?
কে সে হতভাগ্য হায়, প্রেমপূর্ণ পূর্ণিমায়
অকালে যাহার তুই শশী অস্তমান ?
কি খেদেরে পাগলিনি ত্যজিলি পরাণ ?

২

কি দুঃখেরে পাগলিনি হায় হায় হায়,
অমূল্য জীবন দিলি এমন হেলায় ?
স্নেহ ভুলি মায়া ভুলি, স্বহস্তে গরল তুলি
কোন্ প্রাণে হা মানিনি দিলি রসনায় ?
একটু হ'লি না ভীত, একটুকু সশঙ্কিত
একটু কাঁদেনি প্রাণ প্রাণের আশায় ?
প্রাণে এত তুচ্ছ বোধ, হা ক্ষীরোদ! হা নির্ব্বোধ ?
যৌবন জীবনে কিরে শোভা কারো পায় ?
সংসারে জনমে ঘৃণা, দেখিনিরে তোরে বিনা
বালিকা বয়েসে কার বাসনা ফুরায় ?
কি দুঃখে খাইলি বিষ হায় হায় হায়!

৩

কি দুঃখেরে অভাগিনি খাইলি গরল,
নবীন বয়েসে হেন শশী শতদল ?
জীবনের যত আশা, সুখ শান্তি ভালবাসা
প্রাণের পিপাসা কিসে নিবিল সকল ?
বুক ভরা অভিলাষ, সে আনন্দ সে উল্লাস
সকলি জন্মের মত গেল রসাতল ?
হা পাষাণি সর্ব্বনাশি! এমন রূপের রাশি
বিচ্ছিন্ন কুসুম তুল্য করিলি বিফল ?
অই যে রজতকায়, জ্যোছনা মূরছা যায়,
আননে ফুটিয়া আছে শশী নিরমল!
অই যে সুনীল আঁখি, স্নেহ লাজে মাখামাখি
লাবণ্য বন্যায় ছিল নীলাম্বু চঞ্চল!
কমলে গোলাপে গড়া, ও অধর মধুভরা
এখনো—এখনো যেন করে টলমল!
আহা হা এ রূপরাশি, হা পাষাণি সর্ব্বনাশি!
দর্পণে দেখিয়া কভু মুছি অশ্রুজল
করেছিলি সিক্ত নাকি বসন অঞ্চল ?

৪

আহা হা একটু দয়া হ'ল না পাষাণে,
এতকি প্রবলা ঘৃণা অবলার প্রাণে ?
রমণীর এত জেদ, কি এত গভীর খেদ,
ভ্রূক্ষেপে চাহে না কিছু তৃণবৎ জ্ঞানে!
মর কিংবা বাঁচ কেহ, কাহারে নাহিক স্নেহ,
আতঙ্কে করুণা কাঁদে চাহি তার পানে!
এ ব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ বোধে, মহারাগে মহাক্রোধে
চন্দ্র সূর্য্য ভেঙ্গে ফেলে আঘাতি চরণে!
ছিন্নমস্তা আত্মঘাতী, পাষাণী রমণী জাতি
জগৎ জ্বালা'য়ে দেয় মহা অভিমানে!
এত কি প্রবলা ঘৃণা অবলার প্রাণে ?

৫

এই যে শিশুটী তোর কি বলিব হায়,
কাঁদিয়া আকুল দেখ মাটীতে লুটায়!
একটু দেনারে ক্ষীর, শুষ্ক কণ্ঠে শিশুটীর,
ক্ষীরোদ, কোলের বাছা আকুল ক্ষুধায়!
ছি ছি ছি বুকের ধন, এত তারে অযতন ?
শুনিনি জননী হেন পাষাণের প্রায়!
ছেলে যদি "মামা" ডাকে, মায়ের কি রাগ থাকে

স্নেহের সাগর তার উছলিয়া যায়;
ক্ষীরোদ, শিশুটী তোর কাতর ক্ষুধায়!

৬

হা মানিনি! চক্ষু তুলে দেখ একবার,
অভাগিনী জননীরে, কি দশা তাহার!
দেখ একবার চেয়ে, হা পাষাণি চক্ষু খেয়ে
দেখ রে হৃদয় রত্ন ছিলি তুই যার,
পড়িয়া চরণ তলে, সে অভাগা অশ্রুজলে
কাতরে কাঁদিছে কত করি হাহাকার!
কখনো ধরিয়া পায়, দীন ভাবে ক্ষমা চায়,
আতঙ্কে শিহ'রে আহা উঠিছে আবার,
তরলা! হৃদয় রত্ন ছিলি তুই যার!

৭

তবু কি একটু দয়া হয় না পাষাণে?
রমণী কঠিনা কিরে এত অভিমানে?
কি দোষে, কি ক্ষোভে গেলি, পতি পুত্র পায় ঠেলি
চাহিলি না হা নিদয়া কারো মুখ পানে?
মানুষের মত কিরে, নাহি ছিল ও শরীরে
রচিত ধমনী শিরা নর উপাদানে?
ছিলনা হৃদয় ও'তে, দয়া মায়া থাকে যাতে,
কেবলি কি ছিল উহা ভরা অভিমানে?
রমণী কঠিনা হতে এত কিরে জানে?

৮

এত কি জানিস্ তুই হারে ও সরলা?
তবে কিরে মিথ্যা নহে, জ্যোতির্ব্বিদ যাহা কহে
পর্ব্বত প্রস্তরে অই ভরা চন্দ্রকলা?
কাদম্বিনী হাসিমুখে, সত্যই কি রাখে বুকে
লুকাইয়া বজ্রবহ্নি ও নহে চপলা?
এত কি কঠিনা তুই হারে ও সরলা?

৯

ভয়ানক জেদ্ তোর ভয়ানক মান,
বিষম পাপেতে পোরা দারুণ পরাণ!
পরকালে নাহি ভয়, আশঙ্কা কাহারে কয়
জানে নাই যেন অই স্বাধীন পরাণ!
বিমুক্ত বায়ুর প্রায়, পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া যায়,
নাহি তার বাধা বিঘ্ন উচ্চ নীচ জ্ঞান!
রমণী এমনি কিরে কঠিন পরাণ?

১০

ক্ষীরোদ!

আমিও রে তোর মত, উদ্যম করেছি কত,
বাঁধিতে পারিনু কই পরাণে পাষাণ!
বসি অন্ধকার ঘরে, কালকূট নিয়ে করে
প্রাণভরে ডাকিয়াছি—"কোথা ভগবান!
দেখ একবার প্রভু, নিষ্ঠুর সংসার কভু
দেখিল না হৃদয়ের যে মহা শ্মশান,
দেখ সেই দগ্ধ ঠাঁই, সুখ নাই শান্তি নাই,
দেখ সেই ভস্মভরা ধূধূ-করা প্রাণ!
নাহি জানি পাপ পুণ্য, হৃদয় করিয়া শূন্য
বুক ভরা ভালবাসা করিয়াছি দান,
তবু ত নিষ্ঠুর কেহ, একটু দিল না স্নেহ
কাঁদিয়াছি দ্বারে দ্বারে কাঙ্গাল সমান!
তাহাই [illegible]লে, যে চিতা হৃদয়ে জ্বলে
"অবিপ্লুত [illegible]ব করিব নির্ব্বাণ,
অনন্ত [illegible]র শান্তি করিও প্রদান!"

১১

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা মোর হ'লনা সফল,
তোর মত মোর ভাই, অদম্য উদ্যম নাই
নাহিক তেমন এই হৃদয়ের বল!
তেমন সম্মান বোধ, নাহি মোর হা ক্ষীরোদ!
তাহ'লে কি আর সেই তীব্র হলাহল,
কি লজ্জা! ছুঁইতে ঠোঁটে, পরাণ চমকি উঠে,
নিক্ষেপিয়া দূরে ফেলি বর্ষি অশ্রুজল?
ক্ষীরোদ, প্রতিজ্ঞা মোর হল না সফল।

১২

কিন্তু, যদিও তখন—
হয়নি সফল হায় প্রতিজ্ঞা আমার,
*　*　*　*
বসিয়া শ্মশানে তোর, আসিলে রজনী ঘোর,

ঘুমায়ে থাকিবে যবে সমস্ত সংসার,
পরাণে মাখিব ছাই, সে সাহস যদি পাই,
অদম্য উদ্যম সেই শক্তি দুর্নিবার !
সে তেজ অপ্রতিহত, সে আকাঙ্ক্ষা উগ্রকত
বিশ্বনাশী সে বৈরাগ্য বজ্র অঙ্গীকার,
সে একান্ত একাগ্রতা, প্রাণগত নির্ম্মমতা,
দেখিব পাইনি তোর ক্ষুদ্র বালিকার !

১৩

ক্ষীরোদ !
কি তোর বৈরাগ্য ভাব ঘোর অভিমান,
স্মরিতেই ভক্তিভরে নত হয় প্রাণ !
কি তোরে করিবে ঘৃণা, নরক পিশাচ বিনা ?
কেনা বোঝে হৃদয়ের স্বর্গীয় সম্মান ?
আমি তোরে প্রিয় দেবি, হৃদয় মন্দিরে সেবি
শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিত্য করিব প্রদান !
আমি বড় ভালবাসি, ছিন্ন-মস্তা রূপরাশি,
বিশাল বৈরাগ্য ভাবে বড় ..তে প্রাণ
আমি তোরে প্রিয়দেবি, হৃদ...
প্রীতির অঞ্জলি নিত্য করিব এ...
যা তবে ক্ষীরোদ—সেই সুখময়...
স্বর্গীয় শান্তির কোলে জুড়াইবে প্রাণ !

যত ব্রহ্মাপুত্র তীরে, ও সুতনু ধীরে ধীরে
পবিত্র পাবকে হবে ভস্ম অবসান,
গভীর নিশীথকালে, বসি সেই চিতাশালে
তোর ও ভৈরবী মূর্ত্তি করিব ধেয়ান !
অভয়া বরদা বেশে, সে ঘোর শ্মশান দেশে
সিদ্ধির সাধনা রূপে হ'য়ে অধিষ্ঠান,
ভক্তের বাসনানল করিস্ নির্ব্বাণ !

১৫

আহা !
অই যে ডাকিল পাখী আসন্ন সন্ধ্যায়,
বাগানে কুসুম ফোটে, আকাশে তারকা ওঠে,
তেমনি শীতল বায়ু ধীরে বয়ে যায় !
হা ক্ষীরোদ তোর লাগি, কেহ নয় দুখভাগী
এই যে একাকী তুই চলিলি কোথায় !
এই যে চলিলি একা, আর ত হবে না দেখা,
আহা হা স্মরিতে যেন বুক ফে'টে যায় !
পথের সামান্য ধূলি, এ সামান্য তৃণ গুলি
...সকলি রহিল যদি হায় হায় হায়,
...ক্ষীরোদ, একাকী তুই চলিলি কোথায় ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সংস্কার রহস্য।

প্রথম প্রস্তাব।

বিবাহ, পুনর্বিবাহ ও বিধবা বিবাহ।

সংস্কার বিধি স্মৃতি নামক ধর্ম্ম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, বেদে ইহার কোন বিধান বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না। বিবাহ সংস্কারটীও স্মার্ত্ত, তজ্জন্য বেদে ইহার কোন প্রণালী উপদেশ নাই। সুতরাং বৈদিক সময়ের হিন্দু বিবাহ কি প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইত, তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। বিবাহ সংস্কারের প্রচলিত মন্ত্র গুলি প্রায় বৈদিক। সে সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখিলে অনুমান হয় যে, বৈদিক সময়েও কোন এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ভার্য্যাগ্রহণ করা হইত। সেই সকল বেদ মন্ত্রের তাৎপর্য্য লইয়া সূত্রকার ঋষিগণ যে বিবাহ ক্রিয়ার একটী শৃঙ্খলা বা প্রণালী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই প্রণালী আজও হিন্দুসমাজে ব্যবহৃত হইতেছে।

বিবাহ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান প্রচলিত বেদ-

মন্ত্র গুলির অর্থ অন্বেষণ করিলে প্রতীতি হয় যে, উক্ত সময়ে কোন এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অভিমত কুমারীকে পাণিগ্রহণ করা হইত। অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিয়া তৎসম্মুখে প্রণয় গাথা গান, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণন, প্রতিজ্ঞা করণ, অবশেষে পরস্পরের অবিচ্ছেদ কামনা ও পুত্রাদি প্রাপ্তি কামনা করা হইত। এই অদ্ভুত সময়ের পূর্ব্বে, অর্থাৎ অতি আদিম কালে এ সকল অনুষ্ঠান কৃত হইত কি না, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মহাভারতের একটী উপাখ্যান ভাগে লিখিত আছে যে, অতি আদিম কালের স্ত্রীলোক সকল অনাবৃত ছিল অর্থাৎ তাহারা কাহারও নিজস্ব হইয়া থাকিত না। একথা যদি সত্যমূলক হয়, তবে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া বলা যাইতে পারে যে, তখনও পর্য্যন্ত বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয় নাই। ঐ পশুবৎ যাদৃচ্ছিক ব্যবহার নাকি শ্বেত কেতু নামক ঋষিপুত্র হইতে নিবারিত হইয়াছিল, ইহাও মহাভারতোক্ত উক্ত আখ্যানে বর্ণিত আছে। ফল, ক্রমোৎকর্ষ হওয়াই সম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়।

ক্রমে বৈদিক প্রথার মন্দ অংশের পরিবর্ত্তন বা সংস্কার করণ পূর্ব্বক ঋষিরা বিবাহ প্রণালী প্রচার করিলেন। শত শত সভ্যলোক তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। কতক কতক অসভ্য লোক তাহা মান্য করিল না। তৎকারণে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ,—ও গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে দুই প্রকার মাত্র বিবাহ প্রণালী চলিত থাকা দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট ৬ প্রকার প্রণালী একক্ষণে লুপ্ত। পূর্ব্বকালের বিবাহ প্রণালী কিরূপ ও কি প্রকার উদ্দেশ্যযুক্ত, তাহা বর্ণন করা বা অনুসন্ধান করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তৎকারণে আমরা শাস্ত্র লিখিত বিবাহ বিধি ও বর্ত্তমান বৈবাহিক আচার, এই দুয়ের সামঞ্জস্যে পাঠকগণকে নব্য ও প্রাচীন হিন্দু বিবাহের রহস্য উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রত্যেক ধর্ম্মবক্তা ঋষি বিবাহ ব্যবস্থার উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সকল উপদেশের মধ্যে বিবাহ্যা কন্যা, বিবাহ্য বর, বড় কন্যার বিবাহ-যোগ্য বয়স্, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রকার সূক্ষ্ম নির্ণয় আছে, সে সকল আমরা আনুপূর্ব্বী ক্রমে ব্যাখ্যা করিব।

প্রথম কন্যার লক্ষণ।

কিরূপ কন্যা বিবাহ করা উচিত, প্রথমে তাহাই বিবেচ্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাংস্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্য পূর্ব্বিকাংকান্তাং অসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥"

যে কন্যা অনন্য পূর্ব্বিকা অর্থাৎ যে কন্যা সকলরূপে পর পরিগৃহীত হয় নাই, যাহার অন্তর্লক্ষণ ও বাহ্য লক্ষণ উভয়ই উত্তম, যাহার স্ত্রীত্বের পক্ষে সংশয় নাই, যে কন্যা বরের মন ও নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে পারে, যে কন্যা অসপিণ্ডা (যাহার সহিত রক্ত সম্বন্ধ নাই) যে কন্যা বয়ঃকনিষ্ঠা, এরূপ কন্যাই বিবাহ্যা, এতদ্ভিন্ন অবিবাহ্যা। যথা—"অরোগিনীং ভ্রাতৃমতীং অসমানার্ষ গোত্রজাম্॥" [সংস্কার ময়ুখ।

যে কন্যার কোন দুশ্চিকিৎস্য রোগ নাই, যে কন্যা স্বগোত্রোৎপন্না নহে এবং যে কন্যা তুল্য প্রবরা নহে, সেই কন্যাই বিবাহ করিবেক, অন্যথা করিবেক না।

পূর্ব্বকালের ঋষিরা কিরূপ কন্যাকে ভার্য্যা করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা এই বচনদ্বয় দ্বারা জানা যায়। অধিক অন্বেষণ করিতে হয় না। এখনও পর্য্যন্ত হিন্দুরা স্বগোত্রোদ্ভবা, তুল্য-প্রবরা, সপিণ্ড কন্যা ও বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যা বিবাহ করেন না; কিন্তু শীঘ্রই এনিয়ম লুপ্ত হইবে, এরূপ অনুমান হইতেছে। অসাপিণ্ড কন্যা কি? তাহা এস্থলে বিশদ করিয়া বলা উচিত হইতেছে।

"সমানঃ একঃ পিণ্ডো দেহো
যস্যাঃ সা তাদৃশী ন ভবতীত্য সপিণ্ডাতাম্।"

এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা স্থির হইতেছে যে, পূর্ব্বেও এখনও এক শরীরান্বয় অর্থাৎ শরীর বা শারীর রক্ত সম্বন্ধীয় একত্ব লইয়া সাপিণ্ড্য নির্ণয় করা হইত ও হইতেছে। এক শরীরান্বয় শব্দের অভিপ্রেত অর্থ এই যে, এক দেহ হইতে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা পরস্পর সপিণ্ড। এই লক্ষণ অনু-সারে কেবল ভাই ভগ্নীর সপিণ্ডতা স্ফূর্ত্তি পায়, অন্যে পায় না, এরূপ বিবেচনা করি-বেন না। এক শরীরের রক্ত সম্বন্ধ অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত থাকে, তজ্জন্য অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডতা থাকে। কত পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয় এবং বিবাহের জন্য কাহার সহিত কাহার সপিণ্ডতা গ্রহণ করা উচিত, শাস্ত্রকারগণ তাহা নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

১। পুত্রে পিতৃ শরীরের সাক্ষাৎ রক্ত সম্বন্ধ আছে।

২। পিতামহাদি শরীরের সহিত তাহার পরস্পর সম্বন্ধ আছে।

৩। পুত্রে মাতৃ শরীরের অন্বয় বা রক্ত সম্বন্ধ আছে।

৪। মাতামহাদি শরীরের সহিত তাহার পরম্পরা সম্বন্ধ আছে।

৫। মাতৃ ভগিনী (মাসী), মাতৃ ভ্রাতা (মাতুল) ইহাদিগের সঙ্গেও স্বীয় জননী জনক জন্যতারূপ সম্বন্ধের দ্বারা বিবাহ বিষয়ে সপিণ্ডতা আছে।

৬। ঐরূপ পিতৃভগিনী (পিসী) ও পিতৃভ্রাতা (খুড়া) প্রভৃতির সহিত স্বজনক জন্যরূপ সম্বন্ধ থাকায় উক্তবিধ সাপিণ্ড পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

৭। পতি পত্নী উভয়ে মিলিয়া শরীর উৎপাদন করেন, তৎকারণে উক্ত উভয়ের মধ্যেও সাপিণ্ডতা আছে। বিবাহের কালে এইরূপে সাপিণ্ড গণনা করা হয় এবং সাপিণ্ড্যে বাধিলে বড় কন্যার বিবাহ হয় না, ইহা ভারতবর্ষবাসী হিন্দুদিগের বহু পুরাতন প্রথা।

যদি বলেন, ঐরূপ এক শরীর সম্বন্ধ ধরিলে কেহ কাহাকে বিবাহ করিতে পারে না, কেন না, সকল ব্যক্তিই এক ব্রহ্মার সন্তান, সকলের সহিত সকলের পরম্পরা সম্বন্ধে এক শরীরান্বয় বা সাপিণ্ডতা আছে, অতএব যে কোন কন্যা উপস্থিত করিবে, সকল কন্যাই সপিণ্ড কন্যা বলিয়া ত্যাগার্হ হইবে। ইহার প্রত্যুত্তরে ব্যবস্থাপক ঋষি-গণ বলিয়াছেন যে, সাপিণ্ড ব্যবস্থা অনাদি প্রবাহে গৃহীত হইবে না, ৫ পুরুষ ও ৭ পুরুষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃত স্তথা।"

বিষ্ণুস্মৃতিতেও এইরূপ বিধান দৃষ্টহয়। যথা—

মাতৃতস্ত্বা পঞ্চমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতশ্চ সপ্তমাৎ।"

হিন্দুরা যেমন সপিণ্ড কন্যা বিবাহ করেন না, তেমনি, সগোত্রা কন্যা ও সপ্র-

বরা কন্যা উভয়ই অবিবাহ্যা বলিয়া অঙ্গীকার করেন। যথা—[বিষ্ণু, ২৪। ৯।—
"ন সগোত্রাং ন সমানার্ষ প্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত।"

পাঠকগণ এখন মনে করিতে পারেন যে, ঋষিরা "সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবেক; দুর্লক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবেক না"* এইরূপ উপদেশ ও ব্যবস্থা বদ্ধ করায় দুর্লক্ষণাদিগের বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইতে পারে। কেন না সকল ব্যক্তিই সুলক্ষণার অন্বেষণ করিবেক, ভয় প্রযুক্ত কেহই দুর্লক্ষণা কন্যা গ্রহণ করিবেক না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" যে যেমন তাহার তদ্রূপ সংঘটনই হইয়া থাকে; ইচ্ছা করিলেই যে সকল ব্যক্তিই সুলক্ষণা কন্যা পাইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। যুবত বরেরও সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ থাকে, তদনুসারে তদুভয়ের সামঞ্জস্য হইতে পারে। যেমন কন্যা সম্বন্ধে নিয়মিত উপদেশ আছে, তেমনি বর সম্বন্ধেও নিয়মিত উপদেশ আছে। কিরূপ বরে কন্যা সম্প্রদান করা উচিত, শাস্ত্রকারেরা তাহাও উপদেশ করিয়াছেন। যথা—বরের গুণ।

" কুলঞ্চ শীলঞ্চ বরশ্চ বিত্তং
বিদ্যা চ রূপঞ্চ সনাথতা চ॥
এতান্ গুণান্ সপ্ত পরীক্ষ্য দেয়া
কন্যা বুধৈঃ শেষ মচিন্তনীয়ম ॥"[যমস্মৃতি।

সৎকুল, সৎস্বভাব, বিবাহ যোগ্য বরম্, পত্নী পোষণ যোগ্য ধন, বিদ্যা, রূপ ও সনাথতা অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষ সদ্ভাব, এই সাত প্রকার বর-গুণ, এই সাত প্রকার গুণ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া, এই সকল গুণ যদি থাকে, তবে তাদৃশ বরে কন্যা দান করিবেক। অন্য কিছু বিচার করিবেক না।

আশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্রে সর্ব্বাগ্রে কুল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, শুদ্ধ বংশোদ্ভব বরে শুদ্ধ বংশীয়া কন্যা সংগতা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা উন্নত-হৃদয় সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া কুল পবিত্র ও সমাজ উন্নতকরিবেক। যথা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—"যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমংকুলম্। তয়োর্বিবাহো-মৈত্রী চ নোত্তমাধমযোঃ ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ উভয়ের ধনশালিতা তুল্য, যে উভয়ের কুল শীল সমান, সেই দুই জনের বিবাহ ও বন্ধুত্ব সুখাবহ অথবা উচ্চের সহিত হীনের বিবাহ, কি উত্তমের সহিত অধমের বন্ধুতা উভয়ই দোষাবহ হয়।

বিবাহ যোগ্য বয়স।

কত বয়সে বিবাহ করা ও দেওয়া উচিত, মহর্ষি মনু তাহা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি মনুর মতে, ত্রিংশদ্বর্ষীয় যুবার দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করা উচিত। পুরুষের বিবাহ কাল ন্যূনকল্পে ২৪ এবং কন্যার ন্যূন কল্পে ৮। যথা—"ত্রিংশবর্ষো বদেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকাম্। ত্র্যষ্ট বর্ষোহষ্ট বর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥"

ত্র্যষ্টবর্ষ অর্থাৎ ২৪ বৎসর। ২৪ বৎসর বয়সে বিবাহ করিলে ৮ বর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবেক এবং তৎপরে ৩০ বৎসর বয়সে বিবাহ করিলে ১২ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। যদি ত্বরাযুক্ত হয়, অর্থাৎ ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে যদি বিবাহ করি-

* "না কুলীনাং।" "নচ ব্যাধিতাম্।" "না ধিকাঙ্গীম্।" "ন হীনাঙ্গীম্" "নাতি কপিলাম্" "ন বাচাটাম্" "নাতি কপিলাম্" ইত্যাদি ক্রমে অনেক প্রকার নিন্দ্য লক্ষণ প্রত্যেক ব্যবস্থা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

বার জন্ত ব্যগ্র হয়, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও সমাজ ধর্ম্মে ক্লেশ পায়। মনুর এই ব্যবস্থা দেখিলে স্পষ্ট প্রীতীতি হয় যে, পূর্ব্বকালের ঋষিরা বাল্য বিবাহ শুভকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন না, প্রত্যুত গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ও সমাজের হানি কারণ বা অবসন্নদশার হেতু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কন্যা সম্বন্ধে যে অল্প বয়সের কথা বলা হইল, তাহার অভিপ্রায় অন্যবিধ। হিন্দুরা বিবাহের সহিত ধর্ম্মের সংস্রব আছে বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের মতে স্ত্রীর স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিবার অধিকার নাই, অথচ আট বৎসরের পর কি স্ত্রী কি পুরুষ, উভয়েরই ধর্ম্মরাজ্যে পদার্পণ করা উচিত। পুরুষ যেমন অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়া ধর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হয়, স্ত্রীকেও তেমনি আট বৎসরের পর ধর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকের যেমন উপনয়ন সংস্কার নাই, যখন বিবাহই তাহাদের উপনয়ন স্থানীয় ধর্ম্মাধিকার প্রবর্ত্তক সংস্কার, তখন তাহাদের ৮ বৎসর বয়ক্রম কালে বিবাহ হওয়াই উচিত। ৮ বৎসরে বিবাহিতা হইয়া তাহারা পতিকৃত ধর্ম্মের অংশ ভাগিনী মাত্র হইবে, কিন্তু তাহারা রজোদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত সম্বন্ধের অধিকারিণী হইবে না। অতএব, প্রাচীন কালের বিবাহ ব্যবস্থার নিষ্কর্ষ এই যে, পুরুষ ২৪ পূর্ব্বে বিবাহ করিবেন না। ২৪ পরে ৩০ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিবাহ যোগ্য মুখ্যকাল। কন্যাগণ আট বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ সংস্কৃতা হইবে না। ৮ বৎসরের পরে ১২ অথবা রজদর্শন কাল পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহ যোগ্য প্রধান কাল। যদি কোন কারণে সৎপাত্র লাভ না হয়, তাহা হইলে উক্ত কালের অধিককাল অবিবাহিত থাকিলেও দোষ হইবে না।

বিবাহ আট প্রকার।

পূর্ব্বকালে আট প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে আর্য্য সন্তানেরা ৪ প্রকারমাত্র বিবাহ যশস্কর ধর্ম্মকর বলিয়া মনে করিতেন। যথা—"অথাষ্টৌ বিবাহা ভবন্তি। ব্রাহ্ম দৈব আর্ষঃ প্রাজাপত্য গন্ধর্ব্ব আসুরো রাক্ষসশ্চেতি। আহূয় গুণ বরে কন্যা দানং ব্রাহ্মঃ। যজ্ঞস্থ ঋত্বিজে দৈবঃ। গোমিথুন গ্রহণেনার্ষঃ প্রার্থিত প্রদানে প্রাজাপত্যঃ। স্বায়াঃ সকামযো মাতা পিতৃ রহিতো যোগো গান্ধর্ব্বঃ। ক্রয়েণা সুরঃ। যুদ্ধ হরণেন রাক্ষসঃ। সুপ্ত প্রমত্তাভিগমনাৎ পৈশাচ। এতে অষ্ট্যাশ্চত্বারো ধর্ম্ম্যাঃ। গান্ধর্ব্বোহপি রাজন্যানাম্।" [বিষ্ণুস্মৃতি।

এই সকল বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য ও আসুর, এই ত্রিবিধ বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত দেখা যায়।

অসবর্ণ বিবাহ।

পূর্ব্ব কালে এদেশে অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু তন্মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দেখা যায়। যথা—"ব্রাহ্মণস্য বর্ণনানুক্রমেণ চতস্রোভার্য্যা ভবন্তি। তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য। দ্বে বৈশ্যস্য। একা শূদ্রস্য।"

ব্রাহ্মণেরা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন। ক্ষত্রিয়েরা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতেন, ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করিতেন না। এইরূপ বৈশ্যেরা, বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা এবং

শূদ্রেরা কেবল শূদ্র কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন।*

হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা জানা যায় যে, স্বজাতীয় কন্যার পাণি গ্রহণ স্বত্বে বিজাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণে স্বীকৃত হইত না। মহর্ষি মনুর ব্যবস্থায় এই বিষয়টা বিস্পষ্টরূপে অভিহিত হইয়াছে। যথা —

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তা নাসিমাঃ স্যুঃক্রমশোঽবরা॥'
"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃস্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃস্যুস্তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥"

দ্বিজাতিদিগের সবর্ণা কন্যা বিবাহ করাই প্রশস্ত অর্থাৎ ধর্ম্ম্য। সেই জন্য ধার্ম্মিক লোকেরা প্রথমত সবর্ণা কন্যা লাভের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতেন। কামুকেরা কামিত্ব বিধায় ও অং[illegible] করা অলাভ প্রযুক্ত যদি কখন অসবর্ণ বি[illegible] ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুলোম ক্রমেই অসবর্ণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কন্যাকে না পাইলে ক্ষত্রিয় কন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা না পাইলে বৈশ্য কন্যা, এবং ক্রমে বিবাহ করিবেন। এ সম্বন্ধে অন্য এক প্রকার নিয়ম ছিল।

নিয়মটী এই যে, বর সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিলে বিধি বিধানক্রমে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক তৎ সন্নিধানে কন্যার হস্ত ধারণ করিতেন, কিন্তু অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিলে তাহার পাণিগ্রহণ করিতেন না। বরের পাণিগ্রহণের পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয় কন্যা হইলে এক শর কি অন্য কোন অস্ত্র গ্রহণ করিতেন, বৈশ্য কন্যা প্রতোদ (চাবুক) এবং শূদ্র কন্যা হইলে বরের বস্ত্রপ্রান্ত মাত্র ধারণ করিতেন। যথা—মনু বলিতেছেন—

"পাণি গ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণা সুপদিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহ কর্ম্মণি॥
শরঃ ক্ষত্রিয়রাগ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্য কন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে॥"

এরূপ অসবর্ণ বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের নিয়ম সত্য ত্রেতাদি আদিম যুগেই ছিল, কলি প্রারম্ভে ইহা বর্জ্জিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কলিকালের কোনও আর্য্য এই প্রকার অনুগমন করেন নাই। পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, এই অসবর্ণ বিবাহ কলিকালের প্রথমে মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিবারিত হইয়াছিল।

পুনর্বিবাহ।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষি কুলের ব্যবস্থা পুস্তক অনুশীলন করিলে পূর্ব্বকালের বিবাহ তত্ত্ব উত্তম রূপে জানা যায়। সেই সকল আর্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আমরা অনেক কথা বলিয়াছি এবং অনেক কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। এ পর্য্যন্ত যে কিছু বলা হইয়াছে, সমস্তই কন্যা বিবাহের কথা, কিন্তু এক্ষণে স্ত্রী বিবাহ বা পুনর্বিবাহ সম্বন্ধীয় গুটিকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। পুনর্বিবাহ কি? কিরূপ অবস্থায় বিবাহিতা কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহ হইত, তাহা মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিকুলের ব্যবস্থা পুস্তক দেখিলে জানা যায়। আজ কাল যাঁহারা বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে ইচ্ছুক এবং যাঁহারা তাহা নিবারণ করিতে বদ্ধ-পরিকর,

* ক্ষত্রিয়দিগের ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিবার অধিকার ছিল না বটে, কিন্তু দৈবাৎ কোন কোন ঘটনায় এবং কন্যা পিতার অনুমতি ক্রমে কখন কখন ক্ষত্রিয় রাজাগণ ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করিতেন, করিলে দোষ হইত না। যেমন যযাতি রাজা ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানির পাণিগ্রহণ করিয়াও নিন্দনীয় হন নাই।

তাঁহারা উভয়েই এই প্রস্তাব পাঠ করিলে, দেখিবেন, পূর্ব্ব কালের হিন্দুসমাজ কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইত।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কন্যা লক্ষণ বিচারকালে বলিয়াছেন যে, অনন্য পূর্ব্বিকা কন্যাই বিবাহ করিবেক, অন্য পূর্ব্বিকা কন্যা বিবাহ করিবেক না। * এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে দৈবাৎ বা কদাচিৎ কেহ এইরূপ কন্যা বিবাহ করিত, তাহা নিবারণ করাই উদ্দেশ্য। অন্য পূর্ব্বিকা দুই প্রকার হইতে পারে, ইহাও উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"অক্ষতা চ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিণী যাপতিংহিত্বা সবর্ণংকামতঃ শ্রয়েৎ ॥"

অক্ষতা ও ক্ষতা, দুই প্রকার কন্যা বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃতা হইলে পুনর্ভূ বলিয়া গণ্য হইবেক। পরন্তু যে নারী পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম বশগা হইয়া অন্য কোন সবর্ণ পুরুষকে আশ্রয় করে, পতিত্বে গ্রহণ করে, সে স্বৈরিণী বলিয়া গণ্য। ব্যাখ্যাতৃগণ বলিয়াছেন,—"যেনকেনচিৎ পুরুষেণ সহ সঞ্জাত বিবাহ। সংস্কার দূষিতা ন তু তেনোপভুক্তা সাহি অক্ষতা ইত্যুচ্যতে।"

কেবল মাত্র বিবাহ সংস্কার হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকারে পতি সংসর্গিণী হয় নাই, এরূপ নারী অক্ষতা বলিয়া গণ্য। আর যে নারী বিবাহ সংস্কার না হইতেই পুংসংসর্গ দোষে দূষিতা হয়, সে ক্ষতা বলিয়া গণ্য। এই দ্বিবিধ নারীই পুনর্বিবাহের দ্বারা সংস্কৃত হইলে পুনর্ভূ আখ্যা প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যদি কাম প্রযুক্তা হইয়া পতি পূর্ব্বক অন্যকোন সবর্ণ পুরুষের আশ্রয় লয়, পতীত্বে গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে স্বৈরিণী বলিয়া গণ্য; সুতরাং সে পুনর্বিবাহ যোগ্যা নহে।

কি বুঝিলেন? যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে মধ্যে মধ্যে অক্ষতা কন্যার বিবাহ হইত, পরন্তু তাহা কিছু ঘৃণিতা থাকিত। তাদৃশ নারীরা পুনর্ভূ সংজ্ঞায় অভিহিতা হইত, তাহাদের সন্তান ধারাও পৌনর্ভব বলিয়া উপহাসিত হইত। অপিচ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, কিরূপ কারণ বর্ত্তমান থাকিলে সজাতি বিবাহ সংস্কারা অক্ষতা নারীর পুনর্বিবাহ ঘটনা হইতে পারে। বোধ হয় সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, হয় পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, না হয় বিধবা, এই দুয়ের অন্যতর ঘটনা না হইলে তাদৃশী নারীর বিবাহ ঘটনা হইতে পারে না। মহর্ষি মনু বলিয়া গিয়াছেন;—

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥
সা যে দক্ষতযোনিঃস্যাৎগত প্রত্যাগতা পিবা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥"

"স্বেচ্ছয়া পূনর্ভূত্বাঅন্যস্য পুনর্জায়া ভূত্বা যং উৎপাদয়েৎ স পুত্রঃ পৌনর্ভব ইতি যোজনা। সা চেদিতি। সা উভয় বিধাপি স্ত্রী যদি অক্ষত যোনির স্যাৎ তদা পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সহ পুনর্বিবাহাখ্যং সংস্কার মর্হতি। অপি বা যাস্ত্রী গত প্রত্যাগতা কৌমারং পতিং পরিত্যাজ্য অন্য আশ্রিত্য পুনঃ প্রত্যাগতা সতী যদ্যক্ষতা। ভবেৎ সাপিতেন কৌমারেণ ভর্ত্রা পুনর্বিবাহ মর্হতি। এবঞ্চ ক্ষতায়া বিধবায়া সধবায়া বা দ্বিতীয়েন পত্যা সহ পুর্বিবাহো ন ভবত্যাতি মন্বাশয়ঃ।"

এই সকল কথার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, মনুর মতে বিধবাই হউক, পতি পরি-

* বচনটী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

তাক্ত * সধবাই হউক, ক্ষতা হইলে তাহার আর পুনর্বিবাহ নাই, কিন্তু অক্ষতা হইলে তাহার বিবাহ আছে। পরন্তু আর্যকালে তাহা সদাচার বলিয়া গ্রাহ্য ছিল, কেবল পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ তাহাকে কদাচার ও সমাজ বিরুদ্ধ বলিয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহারা পুনর্ভূস্ত্রী ও পৌনর্ভব পুত্র সমাজ মধ্যে অপমান ভাগিনী ও অল্প মানভাগী এরূপ উল্লেখ করিতে সাহসী হইয়াছেন। এই আচার নিষেধ করা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত হইলেও তাঁহাদের সময়ে এককালে নিবারিত হয় নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে—বিধবা বিবাহ শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ নহে, কেবল সামাজিক আচার বিরুদ্ধ। আমরা এ গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু সমাজ সংস্কারক মহোদয়গণ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক উপস্থিত সময়োপযোগী যথা কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া সমাজের হিত সাধন করিবেন।

শ্রীরামদাস সেন।

জ্ঞানী কার্লাইল।

মানব সমাজের এক অবিবর্ত্তিত ও অবিকশিত অবস্থা ছিল, যখন জড়-শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তি মানবের অনুভূতির বিষয় ছিল না। সেই জড়োপাসনার যুগের পরে যখন সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানে ও সৌভাগ্যে উন্নীত হইল,—জ্ঞানের সুবিমল আভা মানবের চিদাকাশে একটু একটু প্রকাশিত হইল, তখন মানবের শক্তি-জ্ঞান আর এক গ্রাম উর্দ্ধে উপনীত হইল,—জড়-শক্তি (material force) ছাড়িয়া জৈবনিক পাশব-শক্তিতে (organic brute force) উপস্থিত হইল। সভ্যতা ও বিজ্ঞান যখন অল্পে অল্পে ঘোর অজ্ঞানান্ধকার ঘুচাইয়া অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি মানব সমাজে বিস্তার করিল, তখনই মানব বুঝিতে পারিল যে, সকল শক্তির মূল শক্তিই চিৎশক্তি (Sychic force.) বর্ত্তমান যুগে কার্লাইল সেই চিৎ-শক্তির প্রাধান্য জগতে জলদ-গম্ভীর স্বরে প্রচার করিয়াছেন। ঐ যে সুশোভিত অট্টালিকা তোমার নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, আর ঐ যে প্রতিমা তাহার রূপচ্ছটায় তোমাকে বিমুগ্ধ করিতেছে,—সংক্ষেপত যে সমস্ত মানবীয় ক্রিয়া কলাপ বিশ্ব সংসার ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সমস্তই মানবের চিৎ-শক্তির ক্রিয়া,—চিৎ-শক্তি জৈবনিক শক্তিতে, এবং জৈবনিক শক্তি, জড়-শক্তিতে পরিণত হইয়া এই সমস্ত আশ্চর্য্য ও আনন্দজনক ব্যাপার সংঘটিত করিতেছে। চিন্তা-শক্তি ও চিৎশক্তি অবিকৃত ভাবে সাহিত্যে সংনিবদ্ধ। তজ্জন্যই, বর্ত্তমান যুগে মানব সমাজের উন্নতির যত প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাহিত্য তন্মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। মানব সমাজে সাহিত্যের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। যখনই কোন সুপণ্ডিত চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁহার ভাব-শিশু গুলিকে সাহিত্যের সুরম্য পরিচ্ছদে সুশোভিত করিয়া জগৎকে উপহার দেন, তখনই কোন গূঢ় অলক্ষিত শক্তি জগতে

* "পতি পরিত্যক্তা" উল্লেখের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় পূর্ব্বকালে ডাইভোর্স আইন প্রচলিত ছিল।

প্রবেশ করে। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের যাথার্থ্য অনুভব করিতে হইলে, বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্য জগতের ইতিহাস কথঞ্চিত পর্য্যালোচনা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ইংলণ্ডে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, ও ফ্রান্সে অগস্ত্য কোমৎ কি দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে মানবের চিন্তা-রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা কাহারই অবিদিত নাই। তাহার পূর্ব্বে ফরাসী দেশে রুশো ও ভল্টেয়ার, তাঁহাদের লেখনী প্রভাবে যে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠজ্ঞ তাহাও অবগত আছেন। আজ কাল স্পেন্সার, হাক্সলে প্রভৃতি লেখকগণ শিক্ষিত সমাজে কিরূপ বন্দনীয়, তাহাও সকলে জানেন। বর্ত্তমান যুগে সাহিত্য জগতে প্রথিত-নামা ব্যক্তিদিগের মধ্যে কার্লাইল অদ্বিতীয়; সচরাচর তিনি চেল্শিয়ার ভবিষ্যদ্বক্তা (Chelsian prophet) বলিয়া অভিহিত হন। মিরাবোর বর্ণনায় তিনি বলিয়াছিলেন—"He was a man, not with logic spectacles but with eyes." এই কথা সর্ব্বথা তাহাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। বাস্তবিকই তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা। নৈয়ায়িকেরা যুক্তি মার্গে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন, কিন্তু তিনি একদৃষ্টিতে সমস্ত বিষয় দেখিতেন। যদি তাঁহাকে দার্শনিক শ্রেণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে হয়, তবে তাঁহাকে (Subjective idealists) শ্রেণীর অন্তর্ভূত করিতে হইবে।

জ্ঞানী কার্লাইল শিশুকাল হইতে তাঁহার প্রৌঢ়-সুলভ চিন্তাশীলতার ও মৌলিকতার নিদর্শন জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সরলতায় বর্দ্ধিত ও সরলতায়ই পরিণত, তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে আপনাকে উন্নত করেন। যেমন প্রকৃতির ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন, আর্য্য-কবিদিগের আদরের নলিনী, পঙ্ক হইতেই উৎপন্ন হয়, তেমনি প্রকৃতির বর-পুত্র, জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ কার্লাইল, স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডাম্ফ্রেসেয়ারের সজল প্রদেশ হইতে সমুদ্ভূত। তিনি অতি সামান্য আহার বিহারে পরিতুষ্ট থাকিতেন। কার্লাইলের জীবনের ঘটনা লিপি বদ্ধ করা অপেক্ষা, তাঁহার চিন্তা-কাননে প্রবেশ করিয়া ফুল্ল কুসুম সংগ্রহ করা উচিত। তাহাদের সৌরভ অনন্ত কাল জগতে পরিব্যাপ্ত থাকিবে। তাঁহার চিন্তা প্রসূত গ্রন্থ নিচয় দুই মহাভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, (১ম) সাধারণ গবেষণা ও চিন্তা পূর্ণ গ্রন্থ, (২য়) ঐতিহাসিক গ্রন্থ। প্রথমোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থাবলির মধ্যে Sartor Resartus ও Hero-worship সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। Sartor Resartus সাহিত্য জগতে এক অপূর্ব্ব রত্ন। মানব-প্রতিভার অচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক মিশরের জগদ্বিখ্যাত পিরামিড্ কালের অনন্তসাগরে বিলীন হইতে পারে, মুসলমান রাজত্বের সৌভাগ্য-চিহ্ন আগ্রার সুরম্য তাজমহলও কালে শূন্যে মিলাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই গ্রন্থের গভীর ভাবগুলি মানবের চিন্তা রাজ্য হইতে কখনও আর ধ্বংশ হইবে না। যত কাল পৃথিবীতে মানব প্রতিভার আদর থাকিবে, ততকাল কার্লাইলের গভীর চিন্তার আদর থাকিবে। এই গ্রন্থ পর্ব্বতের নিভৃত কন্দরে রচিত হইয়াছিল। জগতে, অনেক সময়ে যে মহামূল্য রত্নরাজিও নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া উপেক্ষিত হয়, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কার্লাইলের Sartor Resartus; প্রথমে কোন প্রকাশকই

এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হন নাই, শেষে অতি কষ্টে ফ্রেজারস্ মেগেজিন্ নামক সাময়িক পত্রে খণ্ডশ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে এমেরিকায় এমার্শনের প্রযত্নে ঐ সমস্ত প্রবন্ধ,পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আজ কাল ইংরেজী-পাঠজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ইহার আদর করিয়া থাকেন। গিরিশৃঙ্গের বিজন চিন্তার ফল এই মহা গ্রন্থ ১৮৩১ অব্দে রচিত হয়। এই পুস্তক খানি এক বিবিধ-পণ্য-পরিপূর্ণ বিপণি, জীবনবেদের যে অধ্যায়ের দিকে চাও, তাহারই কিছুনা কিছু গূঢ় রহস্য ইহাতে অভিব্যক্ত দেখিবে।

কার্লাইল, প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, প্রকৃতির যবনিকার অন্তরালস্থিত পুরুষকে ভাবিলেন এবং অদ্বৈতবাদীদিগের ন্যায় প্রকৃতি ও পুরুষকে এক করিয়া বলিলেন ;—"Or what is Nature? Ha why do I not name thee God? Art not thou the living garment of God?" "অথবা প্রকৃতি কি ? আ ! তোমাকেই কেন ঈশ্বর বলি না। তুমিই কি ঈশ্বরের জীবন্ত পরিচ্ছদ নও ?"

"চিন্তাশীল মনুষ্যের জীবনে, এমন এক চিন্তা পরিপূর্ণ, মধুর অথচ ভয়াবহ সময় উপস্থিত হয়, যখন ভয়ে ও বিস্ময়ে সে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করে, আমি কে, তখন সংসার তাহার কোলাহলময় ব্যাপার লইয়া দূরে পলায়ন করে ; তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই শূন্য আকাশময় গাম্ভীর্য্যে উপনীত হয়, তখন জগৎ আর সেই একাকী সংলাপ করে,— আমি কে ? একটী শব্দ, একটী গতি, অথবা একটী ছায়া,অথবা অবিনাশী আত্মার একটী শরীরী পরিদৃশ্যমান ভাব ? আমি চিন্তা করি, অতএবই আমি আছি। বাস্তবিকই আমি এখন আছি এবং কিছু পূর্ব্বে ছিলাম না, কিন্তু কোথা হইতে আসিলাম ? কি রকমেই বা আসিলাম ? এবং কোথাই বা যাইব ?"

"কস্য ত্বংবা কুত আয়াতঃ ?
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

"এই প্রশ্নের উত্তর সহস্র রূপী, সহস্র-ভাষী সমঞ্জস প্রকৃতির সমস্ত বর্ণে ও সমস্ত গতিতে লিখিত ও প্রত্যেক আনন্দ ও শোকের ধ্বনিতে উচ্চারিত। কিন্তু যাহার দ্বারা এই ঈশ্বর লিখিত গ্রন্থের ভাব উদ্ধার হইতে পারে, এমন চক্ষু ও কর্ণ কোথায় ? আমরা যেন এক অসীম ছায়াবাজির গৃহে অথবা এক স্বপ্ন কাননে বসিয়া আছি ; কিন্তু সেই জাগ্রত পুরুষ, এই সমস্ত স্বপ্ন যাঁহার ক্রিয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাই না।" আবার তিনি মনোবিজ্ঞান, গণিত ও সমাজ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য গুলিকে কেমন তন্ন তন্ন করিয়া তাহাদের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

কার্লাইল দেখিলেন, মানব সুখ সুখ করিয়া উন্মাদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যতই সুখ ভোগ করিতেছে, ততই সুখ-লালসা বৃদ্ধি হইতেছে—তৃপ্তি কিছুতেই হয় না, তাই বলিতেছেন ;—

"The fraction of life can be increased in value not so much by increasing your Numerator as by lessening your Denominator. Unity itself divided by zero will give infinity. Make thy claim of wages a zero, then thou hast the whole world under thy foot."

কি চমৎকার রহস্য, অতি সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত হইল ! তিনি বলিতেছেন, হর ন্যূন করিলে মানব জীবন-ভগ্নাংশের

মানের যত বৃদ্ধি হয়, লব বৃদ্ধি করিলে তত হয় না, এক (১) এই সংখ্যাও যদি শূন্য দ্বারা বিভক্ত হয়, তবে ভাগ ফল অনন্ত হইবে। ($\frac{1}{0}$= L অথবা অনন্ত)। তোমার পারিশ্রমিকের আশা শূন্য কর, সমস্ত জগত তোমার পদতলে আসিবে। হে মানব, কেবল সুখ লালসাকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে কেন অধিরোহণ করাও। ঐ লালসাই তোমার সুখের পথে কণ্টক, বাসনা যতই বর্দ্ধিষ্ণু হইবে, তোমার সুখ-লাভের সম্ভাবনা ততই হ্রস্ব হইবে। আর্য্য নীতিজ্ঞেরাও তাই বলিয়াছেন—"নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণ—বর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে।" কি আশ্চর্য্য! এই মহামন্ত্র সাধন করিবার জন্যই না গৌতম, রাজ্য সম্পদে পদাঘাত করিয়া, অঙ্কশায়িনী সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পিতা শুদ্ধোদন ও মাতা মায়াদেবীকে ঘোর শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া, গহন কাননে ও পর্ব্বত কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করেন? বৌদ্ধ-যোগীরাও এই মহাসত্য লাভ করিয়া নির্ব্বাণের জন্য ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিতেন।

একদা এই সত্য, যোগীতুল্য নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হিমাচলের পাদদেশে নিনাদিত হইয়াছিল। আর ধীমান কার্লাইল স্কট্‌ল্যাণ্ডের পঙ্কিলময় প্রদেশে এই সত্য অন্যভাবে জগতকে উপহার দিলেন। ইহার সার মর্ম্ম ইয়ুরোপ এখনও বুঝিতে পারে নাই, দর্শন-জনয়িত্রী ভারত ভূমিই এই সত্য প্রচারের লীলাক্ষেত্র। বাস্তবিকই যদি আমাদের সুখলালসা খর্ব্ব করি, ও জীবনের সুখ-সেব্য বিষয় গুলি বিশ্ব-স্রষ্টার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করি, তবে কি আমাদের জীবন স্পৃহনীয় ও মধুময় হয় না? কার্লাইল বলিতেছেন;—"Love not pleasure—love God, this is the everlasting yea, wherein all Contradiction is solved, wherein whoso works and walks it is well with him."

অর্থ—"সুখ-ভোগেই ভালবাসা অর্পণ করিও না; ব্রহ্মকে প্রেম কর, ইহাই নিত্য সত্য, এখানে সমস্ত বৈপরীত্য দূর হয় (সমস্ত বিবাদ ভঞ্জন হয়) এবং এই ভাবে যিনি জীবন-পথে বিচরণ করেন এবং জীবনের কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ নিরাময় হয়।"

কার্লাইলের ধর্ম্ম মত কি ছিল, তাহা লইয়া তাঁহার জীবনী-লেখকদিগের মধ্যে ঘোরতর মত দ্বৈধ আছে। কেহ তাঁহার উপহাসের তীব্রতা, সাম্প্রদায়িকতার প্রতি কটাক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে নাস্তিক শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করেন, আবার কেহ তাঁহাকে অজ্ঞেয়তাবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু যে কেহ তাঁহার গ্রন্থ সকল যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস, অনন্তে উচ্ছ্বাস ও আরাধনার ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। প্রাণগত ধর্ম্ম কখনও বাহিরে প্রকাশ পায় না, এবং আমরা যে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হই না, আমাদের আত্মার গঠন যেমন ভিন্ন ভিন্ন, আমাদের ধর্ম্মমতও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন হইবে। জগতের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সমূহ, সৃষ্টি কৌশল, প্রভৃতি দেখিয়া কার্লাইল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া—নিরন্তর আরাধনা করিতেন। এই আরাধনার অভাব হেতু, বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার প্রতি তাঁহার

এত বিদ্বেষ,এবং লোকের প্রশংসা করিবার শক্তি বিলোপ পাইতেছে বলিয়াই কার্লাইল নিরন্তর শোকাশ্রু ফেলিতেন। বর্ত্তবর্ত্তমান যুগের নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, জগতের কোন (Mystic element) দুর্জ্ঞেয় রহস্যই নাই বলিলে তিনি ক্রোধে সংজ্ঞাশূন্য হইতেন। বৈজ্ঞানিকের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য কার্লাইল বলিতেছেন;—

"Science is the accumulated records of man's experience. These Scientific individuals have been nowhere, but where we also are, have seen some hand-breaths deeper than we see into the Deep that is infinite, without bottom, and without shore."

বিজ্ঞানকে কেমন উপযুক্ত সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা "করিয়া তিনি বলিতেছেন,—বিজ্ঞান মানবের সঞ্চিত ভূয়োদর্শনের লিপিবদ্ধ বিবরণ; জ্ঞানসম্বন্ধে এসমস্ত বৈজ্ঞানিকেরাও যেস্থানে আমরা ও সেই স্থানে। এই অতলস্পর্শ, তীরশূন্য অনন্ত সাগরের আমাদের অপেক্ষা হস্ত পরিমিত গভীরতর স্থান তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র।" বর্ত্তমান সময়ে অনেক জ্ঞানাভিমানী, স্থূলদর্শী বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের অতি সামান্য জ্ঞানে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া এই দুর্জ্ঞেয়, অসীম, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ব অবগত হইয়াছেন বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহারা যদি কার্লাইলের এই মহাবাক্য প্রাণের অন্তরতম স্থানে মুদ্রিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে বিনয় শিক্ষা হইবে এবং জ্ঞান গরিমাও খর্ব্ব হইবে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর স্পর্দ্ধিত বৈজ্ঞানিকদিগকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিবার শক্তি ও বিষয় প্রকাশের শক্তির অভাবের জন্য কতই ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে বলিয়াই যে সেগুলি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এমত নহে, জগতের সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয়তা ও অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের বিষয় সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এই সৃষ্টিও যদি দুইবার ঘটে, তবে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই থাকে না। কি মূর্খতা! কার্লাইল বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করিতে পারে না, অথবা স্বভাবতই বিস্ময় প্রকাশ (এবং আরাধনা) করে না, সে অসংখ্য রয়াল সোসাইটির (ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সমিতির) সভাপতি হইলেও এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের গভীর তত্ত্ব সমূহ তাহার মস্তিষ্কের আয়ত্ত হইলেও তিনি এক জোড়া চস্‌মা—তাহার পশ্চাতে চক্ষু নাই।

প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার মত অত্যন্ত উন্নত। প্রেমের বিজ্ঞানীন ভাব তিনি অতি দৃঢ় ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। "Love is not altogether a delirium, yet has it many points in common therewith. I call it rather a discerning of the infinite in the finite, * * which discerning may be either true or false, either seraphic or demonaic, Inspiration or Insanity." "প্রেম একেবারেই এক অস্বাভাবিক উত্তেজনা নয়,কিন্তু অনেক বিষয়ে ইহার সহিত সৌসাদৃশ্য আছে, আমি ইহাকে বরং সসীমে অনন্ত নিরীক্ষণ বলিব। এই নিরীক্ষণ সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, দৈব ক্রিয়াও হইতে পারে, পৈশাচিক ক্রিয়াও হইতে পারে, অনুপ্রাণনাও হইতে পারে, উন্মত্ততা হইতে পারে।"

সংসার-রঙ্গভূমিতে মানব যে যে ভাবে

অবতীর্ণ হইয়া অভিনয় ব্যাপার সম্পন্ন করে, কার্লাইল সেই সমস্ত ভাব বিন্যাসে অত্যাশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতির যবনিকা উত্তোলন করিয়া, তদন্তরালস্থিত মহাপুরুষকে সন্দর্শন করাই তাঁহার জীবনের উচ্চতম ব্রত হইয়াছিল। প্রকৃতির অবিকৃত ও অকৃত্রিম শোভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে তিনি এত আনন্দ প্রকাশ করিতেন যে, সে আনন্দ সময়ে সময়ে বাতুলতায় পরিণত হইত। পরস্পর বিরোধী ভাবের সমাবেশই তাহার রচনার প্রাণ-মন-মুগ্ধকারিতার বিশেষ কারণ। কোথাও ভাবস্রোত অনাবিল ভাবে, মৃদুমন্দ গমনে নাচিয়া নাচিয়া পাঠকের মনে প্রীতির সঞ্চার করে, কোথাও ইহার প্রচণ্ড তরঙ্গ-নিচয় বীভৎস ভাবের উদ্রেক করে, আবার কোথাও বা, নিন্দা ও শ্লেষের কষাঘাতে দাম্ভিকের অভিমান বিদূরিত করিয়া দেয়- শেষোক্ত শ্রেণীর রচনাই কার্লাইলের বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক, এ বিষয়ে তিনি বাট্‌লার চুইফট, লুসিয়ান প্রভৃতির সমকক্ষ।

একটী বৃন্তে যেমন তিনটী ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া বনের তিন দিক্ আমোদিত করে, তেমনি, একই ভাবের প্রচারক, ইংলণ্ডে কার্লাইল, এমেরিকায় এমার্শন এবং ফ্রান্সে ভিক্টর হুগো, তিন সুসভ্য দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার পূতিগন্ধময় দাম্ভিকতা প্রশমিত করিয়া, বিনয় বিমিশ্র-সৌরভ বিস্তার করিয়াছিলেন; তিন জনেই মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নিরালম্ব ভাব, এবং প্রকৃতির দুজ্ঞেয়তা ও মহত্ত্ব প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই সত্য প্রচারই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যের কর্ম্ম কাণ্ড সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক মতের অবতারণা করিয়াছেন। কেহ কেহ লোকের কর্ম্মকারিতাকেই জীবনের সুখের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আবার কেহ বা এইরূপও বলেন যে,জীবনে বিশ্রামান্বেষণই মানবের স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, মানব বিশ্রামান্বেষণ করে বলিয়াই যন্ত্রাদির অবতারণা। কার্লাইল পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান এবং স্পেন্সার পশ্চাত্তোক্ত শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দুই মতের মধ্যে কোন মত সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, তাহা চিন্তাশীল পাঠক নির্দ্ধারণ করিবেন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে,মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কার্লাইল যেমন সুন্দর যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন, এমন আর কেহই বলেন নাই। তিনি জলদগম্ভীর স্বরে মানবকে বলিতেছেন ;—

"Do the duty which lies nearest thee. Work while it is called to day, for the Night cometh, wherein no man can work."তোমার নিকটতম কর্ত্তব্য সম্পাদন কর—অদ্যই কর্ম্মকর, কারণ নিশা আগমন করিতেছে। এবং নিশাগমে কোন মানবেরই কর্ম্ম করিবার সাধ্য নাই।" সমাজ সংস্কার, ও জগতের অন্যান্য কল্যাণকর ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা লইয়াও আজ কাল চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটু মতের বৈপরীত্য আছে। কেহ কেহ বলেন, সমাজ আপনা হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইতেছে। আমরা এই বিশাল সমাজ-বারিধির বুদ্বুদ, আমাদের উৎপত্তি, অবনতি ও ক্রিয়া কলাপ সমস্তই সেই বারিধির ক্রিয়া সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। কোন সংস্কারকই সমা-

জকে অভিলষিত অবস্থায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারেন না। যাঁহারা সমাজকে একটী বিস্তীর্ণ জৈবনিক (Organism) বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মতে যে অনেক সত্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেই এই মতের প্ররোচনায় সংস্কার কার্য্য হইতে বিরত হন। কার্লাইল তাঁহার প্রতিভা-পূজা নামক প্রবন্ধে এই ভ্রম-সঙ্কুল মতের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

পিউরিটান সম্প্রদায়ের নেতা ক্রমোয়েল সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক ও সমালোচকেরই ভ্রম-সঙ্কুল বিশ্বাস ছিল, সকলেই তাঁহাকে ঘোর কপটী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব ও গভীর আধ্যাত্মিকতা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রতিভা-পূজক কার্লাইল, পূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি অদম্য উৎসাহ ও প্রভূত অধ্যবসায়ের সহিত তৎকালীয় পার্লেমেণ্টের কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। বহুকাল-ব্যাপী গবেষণার পর, তিনি ক্রমোয়েলের জীবনী প্রকাশ করেন। তিনি ক্রমোয়েলের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায়, তাঁহার সরলতা ও অত্যাচারীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার ভাব দেখাইয়াছেন। যে ব্যক্তি অতি সামান্য অবস্থা হইতে, সরলতার ও স্বদেশ-হিতৈষণার প্রভাবে রাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কপটী বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করা তাঁহার নিকট অত্যন্ত একদেশ-দর্শিতার কার্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। প্রতিভা-পূজা নামক প্রবন্ধ, নিপুণ শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছে। ইংরাজী ভাষায়, এই রূপ গ্রন্থ আর কয় খানি আছে, জানি না। ইংরেজী ভাষায় বার্ক ও সেরিডেনের বহ্নিময়ী বক্তৃতা জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু কার্লাইলের এই গ্রন্থ ঐ সমস্ত বক্তৃতা অপেক্ষাও অধিক মনোহর ও উদ্দীপনা পূর্ণ। সাধু ও মহাজনগণের মাহাত্ম্য তিনি যত উপলব্ধি করিয়াছেন, আর কেহ তাহা করিবেন না। বিভিন্ন দেশের কবি, সমাজ সংস্কারক, ধর্ম্ম সংস্থাপক, ও লেখকদিগের মহত্ত্ব ও প্রতিভা তিনি যে প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, আর কে সেরূপ পারিবে? মহম্মদ, কবি বার্নস, নেপোলিয়ান্, গেটে, জন্‌সন্ প্রভৃতির জীবনচরিত ত অনেকেই পাঠ করিয়া থাকেন, কে তাঁহাদের প্রতিভা, শক্তি ও প্রভাব এ প্রকার অনুভব করিয়া থাকেন? তিনি দোষ গ্রহণে ও অন্যান্য খুঁটি নাটি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। আর্য্য কবি বলিয়াছেন;—

"অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং।
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ॥
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং।
হংসো যথা ক্ষীর মিবাম্বুমিশ্রম্॥" শঙ্কর।

অনেকেইত জীবনচরিত পাঠ করিয়া থাকেন, কি গুণে মহাজনগণ বন্দনীয়, তাহা কয়জনে অনুধাবন করিয়া থাকেন? কার্লাইল সত্য সত্যই জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধ টুকু চুষিয়া লইতেন, তিনি প্রত্যেক মহা পুরুষদিগের জীবনেই এই সত্যটী প্রতিভাত দেখিয়াছেন যে, সরলতা, ও চরিত্রের স্থৈর্য্য ব্যতীত প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ হয় না। "মানব-জীবন, অজাত-শ্মশ্রু বালকের ক্রীড়া কন্দুক নয়—ইহা সেই দুর্জ্ঞেয় আদি-কারণের একটী বিধান।" আজ কাল অনেক স্থূলদর্শী দার্শনিক মানব-জীবনকে

এক আণবিক ক্রিয়া মনে করেন, ইহার মহত্ব ও গুরুত্ব তাঁহাদের অনুভূতির বিষয় নহে, তাঁহারা কার্লাইলের এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে মানবের স্বাভাবিকী শক্তি ও প্রতিভা কতদূর বিকশিত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, জগতের ইতিহাস কার্য্যত এই মহাপুরুষদিগের জীবন কাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কার্লাইল মানব প্রতিভার অনির্ব্বচনীয় শক্তি-মত্তা বিলোকন করিয়াই বোধ করি মহাপুরুষদিগের জীবনের ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বিশেষত্ব—মতের অবতারণা করিয়াছেন। এই মতটী ভ্রমাত্মক কি না, তাহা বলিতে চাই না; কিন্তু যিনি জ্ঞাননেত্রে একবার মানবের ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শন করেন, তিনিই ইহার দূরদর্শীতা দেখিয়া অবাক্ হইবেন। যখনই ভাবা যায় যে, মানব, প্রকৃতির শক্তি গুলিকে করায়ত্ত করিয়া, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সমস্ত সম্পাদন করিতেছে, তখনই মানব শক্তি অসীম বলিয়া প্রতীত হয়। ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া, ইহা কোথায় যাইয়া পৌছিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এমন লোক কি কেহ আছেন, যিনি বলিতে পারেন, মানব শক্তির এই সীমা, ইহার পর পারে আর তাহার যাইবার সাধ্য নাই (Thus for and no further.)? মানব জাতির এই আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া প্রত্যক্ষ-বাদীরা মানব-জাতি সাধারণকে পূজা করিয়া থাকেন। আর এক দিকে যখন ভাবা যায় যে, আমি একাকী, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার বলিবার কিছুই নাই, তখনই সমস্ত স্পর্দ্ধা ও গর্ব্ব শূন্যে মিশাইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ।—ঐতিহাসিক গ্রন্থ নিচয়— ইহাদের মধ্যে ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই গ্রন্থ খানিকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ নিচয়ের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও বোধ হয় যথেষ্ট হয় না। ঘটনার উল্লেখ প্রভৃতিতে অন্যান্য অনেক গ্রন্থ ইহা অপেক্ষা উচ্চ, কিন্তু ইতিহাস-বিজ্ঞান বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা এই খানিই। গিবনের রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের ইতিহাস অনেক পরিমাণে একখানি উপাদেয় ইতিহাস-বিজ্ঞান। কেবল কতকগুলি শুষ্ক নীরস ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলেই কি ইতিহাস লেখা হয়? যে সমস্ত গূঢ় ঘটনা এক এক জাতির উন্নতি ও অবনতির নিদান, তাহা কয়খানি-ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে? কেবল রাজা ও সম্রাটদিগের জন্ম মৃত্যু, ব্যভিচার বা অত্যাচারের কাহিনীই কি ইতিহাস? কার্লাইল তাঁহার গ্রন্থে, প্রকৃত ইতিহাস কি, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। বাস্তবিক আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি, তাহা কতকগুলি অর্থশূন্য কিম্বদন্তী মাত্র। এই ইতিহাসে জগতের একটী অনির্ব্বচনীয় ঘটনার আমূল বিবরণ কার্য্য-কারণ সূত্রে এবং দার্শনিকভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে কোথাও কবিজনোচিত মনোহারিণী বর্ণনা, কোথাও গণিতজ্ঞের সূক্ষ্ম গণনা, আর কোথায় নিন্দুকের তীব্র উপহাস। তিনি তাঁহার উপযুক্ত বিষয়ই বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি অতি সুন্দররূপে জাতীয় জীবনে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষার অঙ্কুরোদ্গম, অত্যাচার প্রশমনার্থ দুর্ব্বলের প্রাণগত যত্ন ও অধ্যবসায়, এবং মত্ততার ক্ষীণবুদ্ধি প্রজার রুধির-পিপাসা বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই ইতিহাস এবং ইটালীর অভ্যুত্থানের ইতি-

হাস এবং হৃদয়বান্ ম্যাট্সিনি ও বীরশ্রেষ্ঠ গারিবল্ডির স্বজাতি-প্রেমের বিবরণ, প্রত্যেকের অধ্যয়নীয়। এই ইতিহাসখানির সম্যক পর্য্যালোচনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। কার্লাইলই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে জর্ম্মান্ লেখকদিগের গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ লেখার স্বাদ গ্রহণ করেন। যদিও স্কট্ প্রভৃতি অনেক খ্যাত-নামা ব্যক্তি জর্ম্মান্ সাহিত্য ও দর্শনে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্লাইল ভিন্ন কেহই জর্ম্মানদিগের চিন্তা-সুধা পান করেন নাই। আমাদের দেশে যাঁহারা বাস্তবিক বীণাপানির অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের উচিত যে, উপযুক্ত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে জর্ম্মান্ ভাষায় অধিকার লাভে প্রয়াসী হন। জর্ম্মানেরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের দর্শন কাব্য প্রভৃতি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন, আমাদেরও কর্ত্তব্য যে তাহাদের চিন্তা কাননে প্রবেশ করি। ভাবরাজ্যে অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতি অপেক্ষা জর্ম্মান দেশের সহিত আমাদের মিলন হইবার অধিক সম্ভাবনা। মনোবিজ্ঞান, ও ভাষা বিজ্ঞান আর কোন দেশে এত উন্নতি লাভ করে নাই। আর যে দেশের সাহিত্যে গেটে, সিলার, ফিক্টে, হিগেল, কাণ্ট প্রভৃতি মনস্বীগণের চিন্তা ও বাক্য নিবদ্ধ, তাহার অনুশীলন করিতে কাহার না সাধ হয়?

কয়েক দিন হইল, সুবিখ্যাত ইতিহাস-লেখক ফ্রুড্, কার্লাইলের জীবনী সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। কার্লাইলের প্রতি যাঁহাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহারাও বীত-শ্রদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, মানবের প্রতিভা যতই কেন উচ্চ শ্রেণীর হউক না, হৃদয়-রাজ্যের উপযুক্ত শাসনের অভাবে, অনেকেই এই সংসার-সাগরে অশিক্ষিত কর্ণধারের ন্যায়, জীবনতরী সময়ে সময়ে বিপথগামী করেন। অতএব আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস।

ভবভূতি।

বীরচরিত।

রামচন্দ্রের লোকাতীত বিক্রমে, পরশুরাম পরাজিত হইলেন। ব্রহ্মতেজ, ক্ষত্রতেজের নিকট অভূতপূর্ব্ব পরাভব প্রাপ্ত হইল। আমরা বলিয়াছি যে, পরশু রাম অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি; জগতে যে তাঁহার অপেক্ষা কেহ বীর আছে, ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। তিনি তপোবলে সকলকেই অবজ্ঞা করেন; অন্যের কথা দূরে থাকুক, সমগুণ-প্রধান, গোত্র নিদান বশিষ্ঠ দেবের প্রাধান্য স্বীকার করিতেও তাঁহার অপমান বোধ হয়। যে দুর্জ্জয় অহঙ্কারে তিনি জগতস্থ প্রাণীগণকে তৃণ জ্ঞান করিতেন, রামচন্দ্রের ভুজবলে তাহা চূর্ণীকৃত হইল। পরশুরামের জীবনে, একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন, উপস্থিত হইল। গর্ব্বিত মাতৃহন্তা পরশু-রাম, বিনীত ঋষি কুমার জামদগ্ন্যে পরিবর্ত্তিত হইলেন। কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রামচন্দ্রের হৃদয়ে জয়লাভ করিয়াও অহঙ্কার

নাই, আত্মাভিমান নাই, ভুবনৈক ধনুর্দ্ধর পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছি বলিয়া, গর্ব্ব নাই, গর্ব্বের কথা দূরে থাকুক, উল্লাস পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার প্রশংসা শব্দে বিদেহ নগর মুখরিত হইতেছিল; পিতা দশরথ, শ্বশুর জনক, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন; আত্মীয়গণ, তাঁহার অলৌকিক কর্ম্মে বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে অভিনন্দন ও আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ পর্য্যন্ত নাই। তিনি যে কোন অমানুষ কার্য্য করিয়াছেন, যেন এ বিশ্বাসও তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইতেছিল না। উল্লাস অনুভব দূরে থাকুক, তিনি আরও আত্মকৃত কার্য্যের জন্য কুণ্ঠিত।

তিনি পরশুরামকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, ভগবন্, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যদি না বুঝিয়া অপরাধ করিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করুন্।

"দৈবাৎ কৃত স্তুয়িময়া বিনয়াপরাধ
স্তত্বং প্রসীদ ভগবন্ অয়মঞ্জলিস্তে।"

পরশুরাম, রামচন্দ্রের পরাক্রমে বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বিনয় বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বলিলেন বৎস, তুমি আমার নিকট অপরাধ করিয়াছ? না,—বরং উপকারই করিয়াছ।

"অপরাদ্ধং বৎস; ত্বয়া জামদগ্ন্যস্য?
ন উপকৃতম।"

এই রূপ কথোপকথনের পর রামচন্দ্র ও পরশুরাম, উভয়ে একত্রে, বশিষ্ঠ,দশরথ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। পরশুরাম আত্মাভিমানের অবতার ছিলেন, এক্ষণে তিনি বিনয়ের অবতার। অকৃতাপরাধে বশিষ্ঠ দেবের অপমান করা যে, তাঁহার কর্ত্তব্য হয় নাই, দুর্জ্জয় অহঙ্কারে একথা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন তাঁহার হৃদয়ে সে জ্ঞান সমুদিত হইল। পানাসক্ত ব্যক্তি যেমন মদিরার উত্তেজনায় দুষ্কর্ম্ম করিয়া অবশেষে তাহার জন্য অনুতাপ করে, তিনি তেমনই আত্মকৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি বশিষ্ঠ দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্ মৈত্রাবরুণ, এষ জমদগ্নিপুত্রঃ প্রণম্য কৌশিকেন সাদরমত্রভবতো বিজ্ঞাপয়ামি।"

বৃদ্ধাতিক্রম সংভৃতস্য মহতো নির্ণিক্তয়ে
পাপ্মনঃ
প্রায়শ্চেতন মাদিশন্ত গুরবো রামেণ দান্তস্য যে
প্রাপ্তস্যস্য ভবন্তএব পরম দ্রষ্টার আসন্ পুরা
লব্ধজ্ঞানমনেকধা প্রবচনৈর্নম্বাদয়ঃপ্রাণয়ন্।

পরশুরামের কথা শুনিয়া, শমগুণ-প্রধান বশিষ্ঠদেব আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। পরশুরামের দুর্ব্ব্যবহারে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বিনয় বাক্য শুনিয়া, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

যখন পরশুরামের উদ্ধত ব্যবহার দর্শনে জনক, দশরথ, শতানন্দ, এমন কি বিশ্বামিত্র পর্য্যন্তও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, বশিষ্টদেব তখনও অবিচলিত ছিলেন। অন্তরে বেদনা পাইলেও তাহার প্রকৃতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি পরশুরামের অশিষ্টব্যবহার দর্শনে কেবল মাত্র বলিয়াছিলেন;—

"সংদুষিতেন চময়া মুহুরীক্ষিতশ্চেৎ
বৎসস্য ভার্গবশিশো দুরিতং হি তৎস্যাৎ॥"

"হউক্, পরশুরাম আমার অপমান করিতেছে করুক্, কিন্তু আমি তাহার দিকে ক্রোধ কটাক্ষপাত করিলেই, বৎসের আমার

অমঙ্গল ঘটিবে; আমি তাহাকে কিছু বলিব না।”

এক্ষণে সেই পরশুরামই যে, এতদূর বিনীত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি পরশুরামকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা জনক ও দশরথও যথোচিত মিষ্ট বাক্যে পরশুরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরশুরামও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া, এবং সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, তপোবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়, রামচন্দ্রকে আপনার দুর্জ্জয় শরাসন প্রদান করিয়া, বলিয়া গেলেন; “বৎস, আজ হইতে আমি শস্ত্র ত্যাগ করিলাম; আমারই শস্ত্র প্রভাবে দণ্ডকাবাসী রাক্ষসগণ, ঋষিগণের উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। তাঁহারা নিরাশ্রয়,তাঁহাদিগের অপর রক্ষক নাই,আজ হইতে তাঁহাদিগের রক্ষার ভার তোমারই উপর অর্পিত হইল; তুমি তাঁহাদিগকে রাক্ষস হস্ত হইতে রক্ষা করিও।” পরশুরাম প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠও স্ব স্ব তপোবনাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রস্থান কালীন কথোপকথন অতি সুন্দর; কিন্তু প্রত্যেক সুন্দর স্থল উদ্ধৃত করিতে হইলে, আমাদিগের প্রবন্ধে স্থানাভাব হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আমরা সেই সকল স্থল, পাঠক মহাশয়কে স্বয়ংই অবলোকন করিবার জন্য অনুরোধ করি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভবভূতি সকল স্থলে বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই; স্থানে স্থানে তাঁহাদিগের পার্থক্য, অতি গুরুতর। রামচন্দ্রের বনপ্রয়াণ, এবং বালীবধ, ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্রের বিবাহের বহুদিন পরেই, রাজা দশরথ, তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিলেন; কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে ঈর্ষা পরবশ হইয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত প্রদান করিলেন। রামচন্দ্রের অভিষেক অসম্পন্ন রহিল, তিনি পিতার সত্য রক্ষার উদ্দেশে, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য, নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভবভূতি, বীরচরিতে রামচন্দ্রের বনপ্রয়াণ, সম্পূর্ণরূপ স্বতন্ত্র ভাবে সংঘটিত করিয়াছেন; করিবারও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, আমরা নিম্নে তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা বলিয়াছি যে, উৎকর্ষতা গুণে বাল্মীকির সৃষ্টি অতিক্রম করা মনুষ্যশক্তির অতীত। বাল্মীকি একবার যাহা লিখিয়াছেন, জগতের অপর কোন কবির পক্ষেই তাহতে নূতনত্বের সমাবেশ করা সহজ কথা নহে, ভবভূতিও তাহা জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়াই, তিনি আপনার নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য নূতন পথ আবিষ্কৃত করিতে এবং স্থানে স্থানে বাল্মীকি-বর্ণিত ব্যক্তিগণকে নূতন ভাবে সমাবেশিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঈর্ষাপরায়ণা কৈকেয়ীর সহিত পুত্রবৎসল পত্নী-ভীত দশরথের কথোপকথন,রামায়ণের একটী অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। নাটকাংশে ইহা অতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রমণীর স্বভাবত কোমল হৃদয়, ঈর্ষায় এবং লোভে যে কতদূর কঠিন হইতে পারে, সত্যপরায়ণ অথচ স্নেহ-প্রবণ হৃদয় যে সমস্যার মধ্যে পতিত হইলে আত্মার সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়া, হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়,

বাল্মীকি রামচন্দ্রের বন-প্রয়াণ কালে তাহা অতি সুন্দর রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এক্ষণে স্বভাবতই পাঠকের হৃদয়ে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, ভবভূতি, এরূপ সুন্দর অবসর প্রাপ্ত হইয়াও আপনার নৈপুণ্য প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। বাল্মীকি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তাহাতে নূতন কথা কিছু বলিবার নাই; বনমল্লিকায় অটোডি রোজ মাখাইলে, তাহার সুগন্ধের উৎকর্ষতা সাধন হয় না। ভবভূতি সেই জন্যই, জানিয়া শুনিয়া, অসাধ্য সাধনে বিরত হইয়াছেন। ভবভূতির আরও একটী উদ্দেশ্য ছিল, আমরা উপযুক্ত স্থলে তাহার উল্লেখ করিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জামদগ্ন্য পরাভব, সীতা হরণ এবং লঙ্কাজয়, সকলই মাল্যবানের কূটমন্ত্রণার বিষময় ফল। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য এবং দৌহিত্র রাবণের শ্রীবৃদ্ধিআকাঙ্ক্ষায় তিনি অকৃতাপরাধে রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশে এবং খরদূষণ প্রভৃতি জ্ঞাতিগণের উৎসাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন্ সাধু রাজনীতিজ্ঞ অন্যের সর্ব্বনাশ করিলে, যদি স্বপ্রভুর মঙ্গল সাধিত হয়, তবে সে লোভে বিরত থাকিতে পারেন? মাল্যবান্, পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের হরশরাসন ভঙ্গজনিত অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দিবার জন্য, পরশুরামকে তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন! আমরা পূর্ব্বে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মাল্যবানের উদ্দেশ্য বিফল হইল; তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, রাবণের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিল না, রামচন্দ্রের বিক্রমে পরশুরাম পরাভূত হইলেন; তখন মাল্যবান আবার নূতন পাশ প্রসারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নিজেই তাহাতে আবদ্ধ হইলেন। মাল্যবান, রামচন্দ্র এবং পরশুরাম, উভয়ের মধ্যে বিবাদ উত্থাপন করিয়া দিয়া, তাহার পরিণাম কি হয়, দেখিবার জন্য আকাশ মার্গে শূর্পণখার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ রামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হইল; সে শব্দ বজ্রনিনাদের ন্যায় মাল্যবানের কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি চমকিত হইলেন; এবং শূর্পণখাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসে, দেখিলে দেবগণের ব্যবহার, ইন্দ্র প্রভৃতিও বন্দীর ন্যায় রামের উপাসনা করিতেছে।" শূর্পণখা বলিলেন, "মাতামহ, সে কথা আর বলিতেছেন কেন, এই জয় শব্দে আমারও হৃদয় উৎকম্পিত হইতেছে।" তখন মাতামহ ও দৌহিত্রী রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশের জন্য পুনর্ব্বার পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্রকে বিনষ্ট করাই উভয়ের শেষ সিদ্ধান্ত হইল। রাজা দশরথ, ইতি পূর্ব্বে কৈকেয়ীর পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে বরদ্বয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, মাল্যবান তাহা অবগত ছিলেন। তিনি শূর্পণখাকে, কৈকেয়ীর পরিচারিকা মন্থরার বেশ ধারণ করিয়া, রাজা দশরথের নিকট সেই বরদ্বয় প্রার্থনা করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। মাল্যবান ভাবিয়াছিলেন যে, যদি একবার রামচন্দ্রকে, অযোধ্যা হইতে বহুদূরে বিরাধ দনু কবন্ধাধিষ্ঠিত দণ্ডকারণ্যে, অসহায় অবস্থায়, লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহার আর নিস্তার লাভের সম্ভাবনা নাই।

শূর্পণখা রাক্ষসী হইলেও রমণী; মাল্যবানের কূট মন্ত্রণার অর্থ, তাহার বোধগম্য হইল না। শূর্পণখা জিজ্ঞাসা করিল "মাতামহ, রামের ন্যায় প্রবল শত্রুকে দেশের নিকট লইয়া যাইবার আবশ্যক কি? বিশেষত রাম ত এখনও আমাদিগের কোন অহিতাচরণ করে নাই, তবে তাহার প্রতি এই মর্ম্মান্তিক "অপ্রতিসমাধেয়" বৈরাচরণের লাভ কি? মাল্যবান বলিলেন, "বৎসে, তুমি বুঝিতেছ না। রাম আমাদিগের অনিষ্ট করে নাই, এ কথাই বা আর কেমন করিয়া বলিব? যে দিন সে তাড়কাকে বধ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ত তাহার সহিত আমাদিগের শত্রুতার সূত্রপাত হইয়াছে, বিশেষত রাম আমাদিগের প্রকৃতি বৈরী। রাম ধর্ম্মরক্ষক, আমরা ধর্ম্মদ্বেষী, তবে রামের সহিত আমাদিগের সদ্ভাবের সম্ভাবনা কোথায়? ছলে বলে, অথবা কৌশলে, তাহার বিনাশ সাধন আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। একবার রামকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাইতে পারিলে, বিরাধ দনু কবন্ধ প্রভৃতি হিংস্র স্বভাব রাক্ষসগণের হস্তে তাহার পরিত্রাণ নাই। যদিই বা রাম ভাগ্য ক্রমে তাহাদিগের নিকট নিস্তার পায়, কিন্তু মহাবীর বালীর হস্তে কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। বালী রাবণের বাল্য সখা; আমি তাহাকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিব। জগতে বালীর সমকক্ষ যোদ্ধা কেহই নাই, রাম তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।" কূট বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞগণ, বুদ্ধিমান হইলেও বড় একদেশদর্শী, তাঁহারা সকল বিষয়েরই কেবল একদিক দেখিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন। মাল্যবানও কেবলই একদিক্ দেখিয়াছিলেন; আপনার কূট মন্ত্রণার বিপর্য্যাসে যে কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হইবে, সে কথা ভাবিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। তিনি শূর্পণখাকে মন্থরা বেশে দশরথকে প্রতারিত করিবার জন্য পরামর্শ দিয়া, লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন। মাতামহের যুক্তি শূর্পণখার বড় ভাল বোধ হইল না, কিন্তু তাঁহার আদেশ উল্লঙ্ঘন করা অকর্ত্তব্য ভাবিয়া, শূর্পণখা মন্থরা বেশে রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইল।

পরশুরাম, বন গমনের সময়, রামচন্দ্রের নিকট যে প্রার্থনা করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিস্মৃত হন্ নাই। তাঁহার করুণ হৃদয়, অসহায় ঋষিগণের অবস্থা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছিল। রাক্ষসগণের ক্রূর প্রকৃতি এবং নিষ্ঠুরাচারের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি তাহাদিগের অপরাধের প্রতিবিধানের জন্য, উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে চিন্তা হইল যে, তাঁহার গুরুজনগণ যেরূপ স্নেহ-পরায়ণ, তাহাতে তাঁহারা যে, তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে অনুমতি দিবেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। পরশুরাম শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও গুরুজনদিগের উপরোধ অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না; তাঁহার মনে চিন্তা হইল, তবে সেই অসহায় ঋষিগণের উপায় কি হইতেছে? হয় ত তাঁহারা ক্রূরস্বভাব রাক্ষসগণের হস্তে উৎসাদিত হইয়াছেন। তিনি ভাবিতেছিলেন;—

"ন্যস্তশস্ত্রে ভৃগুপতৌ পরতন্ত্রে তথা ময়ি
কষ্টমুৎসারিতাঃ ক্রূরৈর্যাতুধানৈ স্তপোধনাঃ।

এমন সময় লক্ষ্মণ, মন্থরা বেশধারিণী শূর্পনখাকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাম মন্থরাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া, বিমাতার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্থরাও রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিয়া, কৈকেয়ী প্রেরিত একখানি পত্র প্রদান করিল। সেই পত্রে কৈকেয়ী, দশরথস্বীকৃত বরদ্বয়ের উপলক্ষ করিয়া, সসীত, সলক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ পত্রপাঠ করিয়া চমকিত হইলেন; কিন্তু রামচন্দ্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না। দণ্ডকারণ্যে গমন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইতেছিল, এক্ষণে কৈকেয়ীর আদেশ, তাঁহার পক্ষে উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল দৈবানুগ্রহ বলিয়া বোধ হইল। তিনি যে অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বিধাতা স্বয়ংই যেন তাহা উপস্থিত করিয়া দিলেন। তিনি পুলকিত হৃদয়ে পিতার আদেশ লাভ করিবার জন্য, তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। এদিকে রাজা দশরথ, ভরত ও যুধাজিতের অনুরোধে রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিসিক্ত করিবার জন্য সমস্ত আয়োজনের আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল; রামচন্দ্রের ন্যায় পুত্রের পিতা হইয়া, আনন্দে উৎফুল্ল না হয় কে? তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"সুমন্ত্র, রামের অভিষেক সামগ্রীর আয়োজন কর, এবং যে আমার নিকট যাহা আশা করিয়া আসিয়াছে, তাহার সে আশা পূর্ণ কর।" এই সময় রামচন্দ্র, পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'বাবা, আপনার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে।" দশরথ বলিলেন,—"বৎস, তোমার আবার প্রার্থনা কি?" রামচন্দ্র পিতার কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আপনি মধ্যমা মাতাকে যে বরদ্বয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, আজি তাহা পূর্ণ করুন্, এই আমার প্রার্থনা।" দশরথ পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন; "বৎস ইহা আর অধিক কথা কি?

"সত্যসন্ধা হিরঘবঃ কিং বৎস, বিচিকিৎসসে।

ত্বয়ি দূতেৎপি কস্তস্য প্রাণানপি ধনায়তে?"

কৈকেয়ীর ন্যায় প্রিয়তমা পত্নীর উপরোধ, রামচন্দ্রের ন্যায় পুত্রপ্রার্থী দশরথের পক্ষে আর কি বলা সম্ভব? তিনি জানিতেন না যে, বারিগর্ভ মেঘের অভ্যন্তর হইতেও বজ্র নিপতিত হয়। সরলস্বভাব বৃদ্ধ রামচন্দ্রের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। লক্ষ্মণ, অগ্রজের আদেশে সেই বজ্রময়ী লিপি পাঠ করিলেন। যদি কেহ সে সময় দশরথের নিকট তাঁহার বধাজ্ঞা পাঠ করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি অধিকতর আকুলিত হইতেন না। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ পিতাকে সমাশ্বস্ত করিতে লাগিলেন; রাজা জনকও সে সময়ে সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একেবারেই মর্ম্মাহত হইলেন। রঘুবংশে এরূপ রাক্ষসাচার তিনি প্রত্যাশা করেন নাই; তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু ভবিতব্যের অন্যথাচরণ করিবার সাধ্য কাহার? রামচন্দ্রের বন গমনই স্থির হইল। লক্ষ্মণ, অগ্রজের আদেশে সীতাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ভরত এতক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় এক দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিল, তিনি ভাবিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে রাজপদে প্রতি-

ষ্ঠিত দেখিয়া, জীবন সার্থক করিবেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে সে সুখ ঘটিল না; তাঁহারই মাতার আদেশে রামচন্দ্রকে জটা-চীরধারী বেশে বন গমন করিতে হইল, তিনি উদাসীনের ন্যায় নীরবে সে দৃশ্য দেখিতে বাধ্য হইলেন। তিনি এতক্ষণ হৃদয়ের বেগ নীরোধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। যুধাজিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মামা, মামা, এই কি তোমাদিগের বংশের উপযুক্ত? যুধাজিৎও ভগ্নীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; তিনি বলিলেন—"বৎস কি বলিব, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেখিয়া শুনিয়া, আমি জ্ঞান শূন্য হইয়াছি।" ভরত এবং যুধাজিৎ, উভয়েই রামচন্দ্রকে বন গমন সঙ্কল্প হইতে নিবারণ করিবার জন্য যথা সাধ্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মপরায়ণ ভরতের হৃদয়ে মাতার দুর্ব্যবহার, বৃশ্চিকবৎ দংশন করিতেছিল; রামচন্দ্রকে বন গমনোন্মুখ দেখিয়া তিনি অধীর হইলেন। আত্ম জীবনে মাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন। মাতুলের পরামর্শে, তিনি রামচন্দ্রের পাদুকা যুগল সিংহাসনে স্থাপন করিয়া জটাচীর ধারণ পূর্ব্বক প্রতিভূরূপে অযোধ্যা রাজ্য পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন। জগতে লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতা দুর্ল্লভ, কিন্তু ভরতের ন্যায় ভ্রাতা অপ্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লক্ষ্মণ ও ভরত, উভয়েই অগ্রজকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন এবং দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন; উভয়েই তাঁহার অনুরোধে, সংসারের সুখ, যৌবনের ভোগাভিলাষ; বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; কিন্তু লক্ষ্মণের জীবনে তবু শান্তি ছিল, ভরতের জীবনে তাহারও অসদ্ভাব। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মুখ দেখিয়া এবং তাঁহাদিগের সেবা করিয়া, লক্ষ্মণ, সকল ক্লেশ বিস্মৃত হইতেন, কিন্তু ভরতের জীবনে সে সুখও ছিল না। পথশ্রান্ত ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃজায়ার সেবা করিয়া যে তিনি হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবেন, বিধাতা সে সুখও তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই। পিতা দশরথ, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বনগমনের অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ উভয়েই বিদেশে; অযোধ্যার সেই কোলাহল পূর্ণ বিশাল রাজভবন শূন্যময় হইল। ভরত সেই শূন্যময় পুরীর মধ্যে শ্মশানস্থিত সন্ন্যাসীর ন্যায়, জননীর পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তাঁহার অভিলাষ সম্পন্ন হইল। তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী তপস্যায় দেবতা পরিতুষ্ট হইলেন; রামচন্দ্র আবার নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অগ্রজের বনগমনের পর ভরত অযোধ্যা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেখানকার দৃশ্য তাঁহার নিকট বড় শোচনীয়। যে ক্রীড়াভবনে চারি ভ্রাতায় একত্রে ক্রীড়া করিতেন, এখন তাহা শূন্য; সেখানে প্রবেশ করিতে তাঁহার ক্লেশ বোধ হইত। সভাগৃহে সেই শূন্য সিংহাসনের দিকে চাহিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত; পিতার কথা তাঁহার মনে পড়িত, পিতৃসম জ্যেষ্ঠের ক্লেশ তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইত, মাতার নৃশংস আচরণ স্মরণ করিয়া, লজ্জায় এবং ক্ষোভে তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। তিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে রাজপদ স্থাপন

করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রাজা হইয়াও তিনি তপস্বী, সম্রাট হইয়াও তিনি ভিক্ষুক। রামচন্দ্র পিতৃসত্য প্রতিপালন জন্যই জটাচীর গ্রহণ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু ভরত ইচ্ছাক্রমেই সংসারের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া, ভ্রাতার সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইলেন। আমরা সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, জগতে ভরতের ন্যায় ভ্রাতা, অপ্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্মীকি তুমি ধন্য, মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তুমি অমর, তোমাকে নমস্কার। যে আদর্শচিত্র, তুমি তোমার সন্তানগণের জন্য আলিখিত করিয়া গিয়াছ, জগৎ হইতে তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না। যে পবিত্র রত্ন, তুমি তোমার উত্তরাধিকারীগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছ, তাহা চির সমুজ্জ্বল; যুগ যুগান্তের ঘর্ষণেও তাহা বিমলিন হইবে না। যে জাতি তোমার প্রাণে অনুপ্রাণিত, শত শত বৎসরের নিষ্পেষণেও তাহা গতজীব হইবে না; তোমার অমৃতময় কাব্য, সেই মৃতপ্রায় দেহে আবার নবজীবন সঞ্চারিত করিবে।

রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনগমনের জন্য পুরজনদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে তদবস্থায় বনগমন করিতে দেখিয়া, দশরথ স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন; ভরত ও জনক, তাঁহাকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করিলেন। রামচন্দ্রের বনগমন সংবাদ, ক্ষণকালের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইল। বিদেহনগর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাঁহার অভিষেক কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহার বনগমন সংবাদে তাহা একেবারেই পর্য্যাকুল হইল। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ পাত্র স্কন্ধে লইয়া, বাজপেয়ার্জ্জিত ছত্রে রামচন্দ্রের আতপ ক্লেশ নিবারণের জন্য ধাবিত হইলেন। অযোধ্যার পুরবাসীগণ পত্নী গৃহীত হোমাগ্নির সহিত সৈনিকগণের সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হইলেন। * এমন কি, গলিত বয়স্ক ব্যক্তিগণ পর্য্যন্তও হোমধেনু অগ্রে লইয়া, রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার উদ্যোগ করিলেন। রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত, আত্মীয়গণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, দণ্ডকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীরচরিতের চতুর্থ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল।

চতুর্থ অঙ্কের অনেক স্থলেই ভবভূতি বাল্মীকি বর্ণিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, আত্মশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য, আমরা ইতি পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু বাল্মীকির অনুসরণ না করিয়া, অন্যান্য স্থলে তিনি যেমন নৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম হইয়াছেন, চতুর্থ অঙ্কে সেরূপ হইতে পারেন নাই। রামচন্দ্রের চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধন করিতে যাইয়া, তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়াছে। স্থানে স্থানে কবিত্বের ও কল্পনার বিকাশ সত্বেও তাঁহার বীরচরিতের চতুর্থ অঙ্ক, আমাদিগের বিবেচনায় অস্বাভাবিক এবং গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের বস্তু সমর্থনের অনুপযোগী। আমরা এত দিন পর্য্যন্ত ভবভূতির দোষোৎঘাটনের অবসর পাই নাই। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া, আমরা তাঁহার

* স্কন্ধারোপিত যজ্ঞপাত্র নিচয়াঃ স্বৈর্বাজপেয়ার্জ্জিতৈঃ ছত্রৈর্বারয়িতুং তবার্ককিরণানেতে মহাব্রাহ্মণাঃ। সাকেতাঃ সহ সৈনিকের সুপতত্ত্পত্নী গৃহীতাগ্নয়ঃ প্রাক্প্রস্থাপিত হোমধেনব ইমে ধাবন্তি বৃদ্ধা অপি॥

প্রশংসা করিয়াই আসিতেছি; কিন্তু প্রশংসার সঙ্গে, দোষের বিষয় দেখিতে পাইলে তাহার উল্লেখ করিতেও আমরা বাধ্য। আমরা সেই জন্য চতুর্থ অঙ্কে সমুল্লিখিত বিষয়ের দোষালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

১ম। রামায়ণের মন্থরা, ঈর্ষা-কলুষিতা কুটিলমতি রমণী; তাঁহারই কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সমগ্র রামায়ণই মন্থরার কুপরামর্শের বিষময় পরিণতি মাত্র। বাল্মীকি মন্থরাকে উপলক্ষ করিলেও কৈকেয়ীকে কুবুদ্ধি হইতে নিষ্কৃতি দেন নাই। স্ত্রী চরিত্র যে কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল, এবং রমণী হৃদয় যে কত কুসুম সুকুমার এবং বজ্রসারময় পদার্থে সংগঠিত, রামায়ণের কৈকেয়ী তাহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ভবভূতি, কৈকেয়ী, এমন কি মন্থরাকেও পর্য্যন্ত অপরাধিনী করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার মতে রামচন্দ্রের বনবাস, মাল্যবানও শূর্পণখার কুপরামর্শের ফল। আর্য্যরমণীর পক্ষে যে এরূপ রাক্ষসাচার সম্ভব, ভবভূতি তাহা ভাবিতে পারেন নাই; তিনি সেই নৃশংস আচরণের পাপ, অনার্য্যবংশীয়া শূর্পণখার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছিলাম যে, বিভিন্ন বংশীয় ও বিভিন্ন প্রকৃতি ব্যক্তিগণের চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া, তাঁহাদিগকে আরোপিত দোষে দূষিত করিবার লোভ অনেকেই সম্বরণ করিতে পারেন না; ভবভূতি অন্যান্য স্থলে কৃতকার্য্য হইলেও এই সার্ব্বজনীন দোষের নিকট এস্থলে পরাভূত হইয়াছেন; আমরা তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করি।

২। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রাজা দশরথ; রামচন্দ্রের বিবাহের অনেক দিন পরেই তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বীরচরিতে, দশরথ, পুত্রের বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। আমাদিগের বিবেচনায় ইহা কোন ক্রমেই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষত রামচন্দ্রের অভিষেক অযোধ্যায় না হইয়া বিদেহনগরে হওয়া যে কতদূর যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সূর্য্যবংশীয় রাজকুমারের অভিষেক, একটী সামান্য বিষয় নয়। কত দেশের কত রাজা, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইবেন, কত সমারোহ আনন্দ উৎসব হইবে; কত দিগ্‌দিগন্তরের ঋষি, মুনি, লোক জন আসিয়া রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ ও অভ্যর্থনা করিবেন। কতদিন ধরিয়া সেই বৃহৎব্যাপারের আয়োজন করিতে হইবে। তাহা না হইয়া, অকস্মাৎ বিদেহনগরে, পরাধিকারে তাহা সম্পন্ন হওয়া কতদূর সম্ভব, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বিশেষত ভবভূতি ত কোন স্থানেই বলেন নাই যে, রামচন্দ্রের বিবাহের সময় কৌশল্যা প্রভৃতিও, দশরথের সঙ্গে, মিথিলা নগরে আসিয়াছিলেন। তবে দশরথ, তাঁহাদিগের অসাক্ষাতে, হঠাৎ পুত্রের জীবনের এরূপ একটী সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন কেন? গৃহিণীর অসাক্ষাতে সংসারের একটী ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্ন হইবার রীতিও হিন্দুসংসারে নাই; তবে দশরথ অকারণে সেই চিরপ্রচলিত প্রথার অন্যথাচরণ করিবেন কি জন্য? কৌশল্যা তাঁহার সর্ব্বপ্রধানা মহিষী; রাম, কৌশল্যার একমাত্র পুত্র। একমাত্র

পুত্রের অভিষেক, এরূপ লোকের অজ্ঞাত ও অশ্রুত ভাবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি কৌশল্যার হৃদয়ে বেদনা দিবেন কি জন্য? বিশেষত বৃদ্ধাবস্থায় পত্নীর সহিত উপযুক্ত পুত্র ও পুত্রবধূকে সংযত ও পট্টবস্ত্রে সজ্জিত দেখিতে কতই আনন্দ। যৌবনের সুখ, পত্নীকে লইয়া, প্রৌঢ়াবস্থার সুখ, পত্নীর সহিত পুত্র ও পুত্রবধূকে সুখী দেখিয়া; দশরথ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে সে সুখে বঞ্চিত করিবেন কেন? আমরা সেই জন্যই বলিয়াছি যে,কৌশল্যার অসাক্ষাতে,বিদেহনগরে রামচন্দ্রের অভিষেক সম্পাদন,আমাদিগের বিবেচনায় কোন ক্রমেই সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না।

৩। আমরা বলিয়াছি যে, ভবভূতি, যে সকল স্থলে বাল্মীকির অনুসরণে বিরত হইয়াছেন, সেই সকল স্থলেই আপনার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বনপ্রয়াণের জন্য তিনি যে কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতিভার সম্যক্‌রূপ উপযুক্ত হয় নাই। রামচন্দ্রের চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত কৌশলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয় নাই। তিনি বর্ণন করিয়াছেন যে, রামচন্দ্র পরশুরামের মুখে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের অসহায় অবস্থা এবং রাক্ষসগণের নিষ্ঠুরাচারের কথা অবগত হইয়া, দণ্ডকারণ্যগমনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এমন সময়ে ঘটনা সমবায়ে, তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবার সুবিধা উপস্থিত হইল। তিনি যাহার জন্য উৎসুক ছিলেন, ভাগ্যক্রমে তাহা বিধাতা মিলাইয়া দিলেন! তিনি আপনার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বন গমন করিলেন, বনবাসের ক্লেশ তাঁহাকে উদ্দেশ্য সাধনে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না। ইহা হইতে আমরা রামচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে কি বুঝিব? নিশ্চয়ই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে,রামচন্দ্র বড় করুণ স্বভাব, রাজ পুত্র হইয়াও তিনি পর দুঃখে দুঃখী, অন্যের কষ্ট দূর করিবার জন্য, অত্যাচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য, তিনি নিজের সুখ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত। তাঁহার এই সকল সদ্‌গুণের কথাই, আমাদিগের মনে উদিত হইবে। এ সকল সামান্য সদ্‌গুণের কথা নয়; নব বিবাহিতা গুণবতী পত্নী, স্নেহপরায়ণা পিতামাতা, অতুল ঐশ্বর্য্য, এ সকল পরিত্যাগ করা, অল্প প্রাণের কার্য্য নহে। অরণ্যবাসের কষ্ট, রামচন্দ্র অবগত ছিলেন না, তাহা নহে। রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধের ক্লেশ, তাঁহার জানা ছিলনা, তাহা নয়। কিন্তু সকল জানিয়া শুনিয়াও, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক অরণ্য গমনে প্রস্তুত হইলেন; অবশ্যই এ সকল মহাপ্রাণের কার্য্য। যদি বাল্মীকির সমুদ্ভাবিত উপায় আমরা অবগত না থাকিতাম, তাহা হইলে হয়ত ইহাকেই মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষতার উচ্চতম আদর্শ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু ভবভূতির চিত্র, মনুষ্যলোকে দুর্লভ হইলেও অপ্রাপ্য নহে, বাল্মীকির চিত্র,মনুষ্যলোকে অপ্রাপ্য। ভবভূতি, রামচন্দ্রের চরিত্রের উৎকৃষ্টাংশই প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা ঐকদেশিক। এ সংসারে পরীক্ষা দান, সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। কেহ কেহ সংসারের সুখ এবং সম্পদ ভোগ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়া যান; সংসারের দুঃখের অংশ তাঁহাদিগের চক্ষুতে পতিত হয় না। আবার

কেহ বা, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করিয়া, কেবলই দুঃখ ভোগ করিয়াই জীবন শেষ করেন; তাঁহাদিগের জীবনে সুখ ঘটেনা। এই উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে কাহারও চরিত্র পরীক্ষিত হয় না। সুখ এবং দুঃখের সন্ধিস্থলই, মনুষ্য চরিত্রের পরীক্ষার স্থান; ভাগ্য বিপর্য্যয়েই লোকের চরিত্র পরীক্ষিত হয়। রামচন্দ্রের জীবন, বাল্মীকি কেবলই সেই সন্ধিস্থলে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। রামচন্দ্র, সেই সকল স্থলে অনন্যসাধারণ ধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই, তিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতা; তাঁহার চরিত্র, হিন্দুসন্তানের আদর্শ। বনগমন কালীন রামচন্দ্রের অবিচলিত গাম্ভীর্য্য, তাঁহার সমাসাপূর্ণ জীবনের একটী উৎকৃষ্টতম পরিচয় স্থল। কোথায় সংযমের পর তিনি পৃথিবীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন, না তাঁহাকে বনচর হইতে হইল। পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া, কোথায় তিনি অভিষেকের মন্ত্রপাঠ করিতে বসিবেন, না তাঁহাকে জটাচীর সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইতে হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মনুষ্য জীবনে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে? কিন্তু রামচন্দ্র সেরূপ অবস্থায়ও অকুণ্ঠিত; তাঁহার মুখে বিষাদ নাই, হৃদয়ে উদ্বেগ নাই, তিনি বন গমন করিলে যে পিতার সত্য রক্ষা হয়, তিনি সুখী হন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কার। তিনি অনুদ্বিগ্ন চিত্তে পিতামাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বনবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমরা বলিয়াছি যে, রামচন্দ্র মনুষ্য; কিন্তু মনুষ্য হইলেও হৃদয়ের সমতায় তিনি দেবতা। যত দিন জগতে হৃদয়ের পূজা প্রচলিত থাকিবে, ততদিনই তিনি মনুষ্যজাতির পবিত্র ভক্তি-উপহার প্রাপ্ত হইবেন।

আমাদিগের এ সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভবভূতি তাঁহার রামচন্দ্রের বন গমন কালে এই পরীক্ষা স্থলের সমাবেশ করেন নাই। বীরচরিতের রামচন্দ্র, বন গমনের জন্য একান্ত ব্যগ্র ছিলেন; সাংসারিক সুখ অপেক্ষা, রাক্ষসদিগকে জয় করিয়া কীর্ত্তি লাভ এবং তাহার সঙ্গে পরোপকার সাধন, তাঁহার নিকট উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। দণ্ডকারণ্যে গমন করিবার জন্য, তিনি কেবল উপযুক্ত অবসরেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এমন সময় কৈকেয়ীর আদেশ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, সুতরাং তাহা তাঁহার পক্ষে একরূপ অনুকূল অবস্থাই হইল। সুখের প্রত্যাশা করিয়া, অকস্মাৎ দুঃখের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে লোকে যেরূপ চকিত হয়, তাঁহার জীবনে তাহা ঘটিল না। প্রোজ্জ্বল আলোক হইতে হঠাৎ তাঁহাকে নিবিড় অন্ধকারে আসিতে হইল না। তাঁহার প্রার্থনার অনুকূল বস্তুই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সুতরাং সুখ দুঃখের সন্ধিস্থলে পাতিত করিয়া, বাল্মীকি তাঁহার রামচন্দ্রকে যে কঠোর পরীক্ষা হইতে নিরাপদে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন, ভবভূতির রামচন্দ্রের তাহা ঘটিল না। বিপদে পতিত হইয়া, তাঁহার রামচন্দ্র কিরূপ ক্লেশ সহিষ্ণু, কিরূপ ধৈর্য্যশীল, তাহা লোকে জানিতে পারিল না। ভবভূতি তাঁহার রামচন্দ্রের পরদুঃখ কাতরতা, স্বার্থ ত্যাগ, করুণ স্বভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছেন সত্য; কিন্তু যাহাতে মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,

তিনি তাঁহার রামচন্দ্রের সেই অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের কথার উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার চিত্র, সুন্দর হইলেও আদর্শ চিত্র নহে। আমরা সেই জন্যই বলিয়াছি যে, ভবভূতি বাল্মীকির অনুসরণ না করিয়া, অন্যান্য স্থলে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, চতুর্থ অঙ্কে তদ্রূপ করিতে সমর্থ হন নাই। উপযুক্ত স্থানে আমরা আর একবার এ সকল কথার উল্লেখ করিব। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

পরীক্ষিত কথা।

১। যে সত্য সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ বা দ্বিধা নাই, তাহা প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা কর। একটী সত্য পালিত হইলে তবে অন্য সত্য পাইবে। সত্য বুঝা ও সত্য পালন করা, দুই স্বতন্ত্র জিনিষ। যে সত্য বুঝিয়াও তাহা পালন করে না, তাহার উন্নতি হইবে কিরূপে?

২। দলাদলিতে বা অন্যের দোষানুসন্ধানে মজিয়া আত্ম-হারা হইবে না। আপনাকে বজায় না রাখিতে পারিলে কিছুতেই উন্নতি হইবে না।

৩। অন্যের দোষ কিম্বা ক্রটীর বিষয় যখনই হৃদয়ে উপস্থিত হইবে, তখনই আপন দোষ বা ক্রটীর কথা মনে করিবে; কারণ, অন্যের দোষ স্মরণে হৃদয় অবনতি প্রাপ্ত হয়। অন্যের মহত্ত্ব চিন্তনে হৃদয়কে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিবে, কারণ মহত্ত্বের আদর্শে হৃদয় মন উন্নত হয়। আপনার দোষ বা ক্রটী স্মরণ করিতে করিতে অনুতাপ উপস্থিত হয়। অনুতাপ-অশ্রুপাত ভিন্ন হৃদয়ের মলিনতা ধৌত করিতে কেহ পারে না। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহাতে বিশেষত্বময় মহত্ত্ব নাই! এমন মানবই বা কে আছে, যে আপনার জীবনে ক্রটী বা দোষ দেখিতে পায় না। আপন ক্রটী এবং অন্যের মহত্ত্ব চিন্তাকে জীবনের সম্বল কর।

৪। প্রত্যেকের ভিতরেই কিছু কিছু পাইবার আছে, স্মরণ রাখিবে। যাহাকে ভয়ানক পাপে লিপ্ত দেখিতেছ, তাহার মধ্যেও এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা আর কোথাও পাইবে না; কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সকলেরই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহা মনে রাখিয়া সকলকেই হৃদয় পাতিয়া আলিঙ্গন করিবে। পাপীকে ঘৃণা করিবার অধিকার পাপীর নাই। ঘৃণা যেখানে, অহঙ্কারও সেখানে। অন্যকে ঘৃণা করিতে গেলেই অহঙ্কারী হইয়া পড়িবে। অহঙ্কার মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। অহঙ্কার মানুষের অভাবকে ঢাকিয়া রাখে। আপনার অভাব যে দেখিতে পায় না, সে আর কি প্রকারে উন্নতি লাভ করিবে?

৫। সৃষ্টির সকল জীবকেই ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু কেহকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবে না। সকল পদার্থ বা জীবেই ঈশ্বরের সত্তা বিদ্যমান, কিন্তু কোন সৃষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে ঈশ্বরত্ব লোপ পাইয়া যাইবে। সাগরের এক গণ্ডূষ বারি হাতে পাইয়া, কখনও মনে করিবে না, সাগর পাইয়াছি। যে যাহা, তাহাকে তাহা জানিয়াই আদর করিবে। একেকে অন্য বলিয়া ভুল করিবে না।

৬। যত দূর সম্ভব, সকল প্রকার সৎ-

কার্য্যে যোগ রাখিতে চেষ্টা করিবে; কার্য্যের স্রোতে নিমগ্ন থাকিলে পাপ-প্রলোভন বা রিপু তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। সৎকার্য্যের সোপান ধরিলে তবে শেষে নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।

৭। এটা বড়, ওটা ছোট, কখনই এ গণনা করিবে না। এক জনের বা এক বস্তুর কার্য্য যখন অপর জন বা অপর বস্তুর দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, তখন কে ছোট, কে বড়? আপনাপন বিশেষ কার্য্য-সাধনের জন্য সকলেই বড়। আবার ঈশ্বরের সহিত তুলনায় সকলেই ছোট—অকিঞ্চিৎ। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য—বৈচিত্র্যে; সুতরাং বৈচিত্র্যের আদর করিতে শিখিবে।

৮। মুখে এক, ভিতরে এক, রাখিবে না। ভিতরে ও বাহিরে স্বরূপ হইতে চেষ্টা করিবে। যে সত্য হইবার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত, সে সত্য মুখে বলিও না; কারণ তাহা তোমার হৃদ্‌বোধ হয় নাই। সত্য শুনা ও সুতো বিশ্বাস, দুই এক কথা নহে।

৯। কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া মানুষের ধর্ম্ম নহে, আপন কর্ত্তব্য পালন করাই ধর্ম্ম। আমার কর্ত্তব্য পালন করিলে তুমি যদি মনে কষ্ট পাও, নাচার, কি করিব? তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার কর্ত্তব্য পালনে বিরত থাকিতে পারি না; এইরূপ নির্ভীক হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিবে। ধর্ম্মানুমোদিত কোন কর্ত্তব্যেরই উদ্দেশ্য অন্যকে কষ্ট দেওয়া হইতে পারে না।

১০। একজনের কথা শুনিয়া আর এক জনের প্রতি বিরক্ত হইবে না। মানুষ মানুষকে সকল সময়ে চিনিতে পারে না। যে যেরূপ চিন্তায় রত, সে অন্যের মধ্যে তাহারই অনুরূপ দেখে, আর কিছুই দেখিতে পায় না; সুতরাং মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব বা প্রকৃত দোষ মানুষের পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন।

১১। যে কেবলই পর-নিন্দা করে, পর ছিদ্র অন্বেষণ করে, সে নিজে ভয়ানক পাপী, মনে রাখিবে। আপন পাপকে ঢাকিবার জন্যই সে অন্যের নিন্দা প্রচার করে। সুতরাং পর-নিন্দুকের প্রতি আস্থাবান হইয়া অন্যের প্রতি বিরক্ত হইবে না। যে উচ্চরবে অন্যের দোষ কীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত থাকে, দেখিয়াছি, তাহার মনের ভিতরে বিষম পাপ-গরল পোষিত হইতেছিল। নিন্দুকের ন্যায় প্রবঞ্চক ও কপট পৃথিবীতে আর নাই।

১২। সৎপ্রসঙ্গ বা সদালাপ মনোযোগ সহকারে শুনিবে, শুনিয়া সার সংগ্রহ করিবে। বৃথা কূটতর্কে কখনও রত হইবে না। কূট তর্ক সত্য আবিষ্কারের পরিবর্ত্তে সত্যকে ঢাকিয়া রাখে। সত্যপালনই সত্য-আবিষ্কারের মূল মন্ত্র।

১৩। বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রতি কখনই অনুরাগ দেখাইবে না। দেখা গিয়াছে, বাহিরের অনুষ্ঠানে মাতিয়া অনেকে হৃদয়কে হারাইয়া ফেলিয়াছে, —লক্ষ্য ভুলিয়াছে। লক্ষ্যকে প্রাণের মূলে রাখিয়া সাধন করিবে, ভিতরের দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবে,—আত্মচিন্তা ভুলিয়া বাহ্য অনুষ্ঠানের চিন্তা করিবে না। মূল কথা, যাগযজ্ঞে, গৈরিক বস্ত্রে, বা বাহ্য-দীক্ষায় তাহার কি করিবে, যে হৃদয়ে গরল পোষণ করিতেছে!

১৪। প্রেম ভক্তি হৃদয়ে সমুদিত হইলে মত-মূলক ঘৃণা বিদ্বেষ আর থাকিতে পারে না;—মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সকলের

প্রতিই ভালবাসা যায়। আত্মানুসন্ধান করিয়া সর্ব্বদাই জানিতে চেষ্টা করিবে যে, সাধনার সহিত ঘৃণা বিদ্বেষ লোপ পাইতেছে কি না ? যদি লোপ না পাইয়া থাকে, তবে আরো কঠোর তপস্যা করিবে। যখন ঘৃণা বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে, তখন প্রেমময়ের বিশ্ব-প্রেম হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে। ঘৃণা বিদ্বেষ যত দিন আছে, ততদিন আত্মসংযম রূপ কঠোর তপস্যা করিবে।

১৫। সাধনার বা মুক্তির পথ, লোকাদিষ্ট পথ নহে। প্রাণের ভিতরে ডুবিয়া যে পথ পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইবে, সেই পথই ধরিবে। লোকের ভয়ে, সমাজের ভয়ে যদি বিবেকের আদিষ্ট পথ পরিত্যাগ কর, তবে তোমার বিশেষত্বের রাজ্য তুমি পাইবে না,—ঈশ্বরের উদ্দেশ্য তোমা দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। এই জন্যই পৃথিবীতে এত পাপের সৃষ্টি হইতেছে। মানুষের কথায় ভুলিয়া মানুষ কত জঘন্য কার্য্যই করিতেছে। মানুষের আদিষ্ট পথে না গেলে মানুষ কখনও পাপের পথ পাইত কি না, সন্দেহ। অতএব মানুষের কথা না শুনিয়া সর্ব্বদাই বিবেকের কথা শুনিবে। বিবেকের কথা না মানিলে ধর্ম্ম টিকে না।

১৬। যদি ধর্ম্ম চাও, তবে সংসারকে উপেক্ষা করিতে শিখিবে ;—অন্যের প্রশংসা বা নিন্দা শ্রবণে কখনই বিচলিত হইবে না ; কারণ উহাদের কোনই মূল্য নাই ;—মানুষ মানুষকে প্রকৃতরূপে চিনিতে পারে না। সকল বস্তুকেই ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া জানিয়া ভালবাসিবে, কিন্তু কাহারও আসক্তিতে মজিবে না। ভালবাসা এবং আসক্তিতে মজা, এক কথা নহে। ভালবাসার মায়ায় বদ্ধ হইয়া যখনই বুঝিবে যে, কর্ত্তব্য পালনে আর বল পাইতেছ না, তখনই বুঝিবে, আসক্তি তোমাকে ঘিরিয়াছে ;—সাগরের ন্যায় তখন আসক্তি দড়ি ছিঁড়িতে সক্ষম ত বীরত্ব এইখানে। কর্ত্তব্য পালনই ধর্ম্মের প্রধান সোপান। বিবেক, কর্ত্তব্যের নেতা। এই সোপান অবলম্বন করিয়া থাকিবে, কখনই যেন পা পিছলিয়া না যায়। কর্ত্তব্য পালনের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বস্ব যখন পরিত্যাগ করিতে পারিবে, তখনই বুঝিবে, তোমার আসক্তি দড়ি ছিঁড়িয়াছে ; নচেৎ সুস্থির থাকিবে না, ক্রমাগত চেষ্টা করিবে। কর্ত্তব্য পালনের জন্য দেহ বিসর্জ্জন দিয়াই খ্রীষ্ট বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন, মনে রাখিবে। ক্রমশঃ

গোলাপ ফুল।

সাধে কি গোলাপ ফুলে
আমি ভালবাসি সই ;
আমার মনের কথা,
শোন্ সখি তোরে কই।
—আমি যাঁরে ভালবাসি,
তাঁর মৃদু মৃদু হাসি,
সুধাংশু কিরণ সম
মাঝে মাঝে পড়ে খসি ;
সে অমূল্য ধন পেয়ে
চির পিপাসিত হিয়ে,
পৃথিবী হৃদয় মাঝে
রাখে সখি লুকাইয়ে ;
সে হাসি জমাট হয়ে
ধরা বক্ষ বিদারিয়ে,
বাগানে গোলাপ রূপে
ফুটে ফুটে উঠে ওই।

শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র।

ইন্দুবালা।

দশম পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাত হইয়াছে,—আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। নবস্নাতা প্রকৃতি প্রফুল্ল অরুণ কিরণে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ইন্দুর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, নিদ্রাতে শরীর অনেকটা বিগত-শ্রম বোধ হইতেছে। তিনি এখন পরিব্রাজক এবং নির্ম্মলের সহিত অল্প অল্প কথা কহিতেছিলেন। তাঁহার মুখে কখন কখন ক্ষীণ রশ্মিবৎ হাসি দেখা যাইতেছিল। তিনি বলিলেন, তাহার শরীর অনেক ভাল, তবে বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছে। কিন্তু পরিব্রাজক এবং নির্ম্মলের বোধ হইল, তাঁহার একটু জ্বর হইয়াছে। বস্তুত তাঁহার একটুক জ্বর হইয়াছিল। সে দিন ঐ প্রকারে যাইল, পরে অল্প অল্প কাশি দেখা দিল, বৈকালে প্রতি দিন অল্প জ্বর ও মুখ লাল হইতে লাগিল, ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দু বলিতেন যে, তাঁহার শরীর ভাল আছে, কোন উদ্বেগের কারণ নাই। তাঁহার নিকট পরিব্রাজক, না হয় নির্ম্মল, এক জন বসিয়া থাকিতেন। বড় আশঙ্কা হইল। পরিব্রাজক ইন্দুর পীড়ার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত নির্ম্মলের নিকট শুনিলেন। উভয়েরই বড় আশঙ্কা হইল। নির্ম্মলের নিকট ইন্দুর ঔষধ ছিল সেই ঔষধ, পূর্ব্বে কলিকাতার যে প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ব্যবস্থা ও নিয়ম অনুসারে সেবন করান হইতে লাগিল। তাহাতে কিছু উপকার বোধ হইল। ক্রমে ক্রমে কিছু সবল হইলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ আবার জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দু এক্ষণ অনেকক্ষণ গল্প করিতেন, তাঁহার মন যেন প্রফুল্ল হইল। পরিব্রাজক কোন্ কোন্ দেশে কি কি করিয়াছিলেন, ও কি কি দেখিয়াছিলেন, তাহা শুনিতেন। তাঁহার সেই অমৃত সমান মধুর বচন পান করিয়া তৃপ্ত হইতেন না। পরিব্রাজক ইন্দুকে প্রায় কথা কহিতে দিতেন না। যখন তাঁহার শরীর কতকটা সহজ হইয়াছে, তখন একদিন ইন্দু পরিব্রাজককে বলিলেন,—"অমল, আমরা দেশে ফিরিয়া যাইলে তুমি কি আমাদের সহিত যাইবে?"

অমল বলিলেন—"যাইব।"

ইন্দু।—"[illegible]কিবে?"

অমল। [illegible]থাকিব।"

ইন্দু।—"তবে আমি মরিব না।"

অমল।—"আমি তোমাকে মরিতে দিব না।"

ইন্দু।—অমলের হাত ধরিয়া চক্ষু নিমীলিত করিলেন। পরে বলিলেন, "অমল, আমার সঙ্গে যাইবে ত?"

অমল।—"যাইব।"

ইন্দু।—"আমায় আর ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে না ত?"

অমল।—না।"

।—"তুমি জান অমল, এই দীর্ঘ বৎসরে আমি তোমার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, কত কাঁদিয়াছি?"

অমল 'জানি

ইন্দু।—"কাহার জন্য আমার শরীর এই বয়সে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কাহার জন্য এই জীবনের আরম্ভ না হইতে মরিলাম!"

অমল।—ইন্দু—ও কি কথা বলিতেছ?—তোমার শরীর ত দিন দিন সুস্থ হইতেছে।

ইন্দু।—অমল, মিথ্যা আশায় আর আমি আমাকে প্রতারিত করিব না, তোমাকেও করিব না। আমার সংসারের যে কয়েক দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা ফুরাইয়া আসিতেছে। তোমার সহিত ইহলোকে আমার আর অধিক দিন সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। কল্য আমি একটী স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

অমল।—কি—"স্বপ্ন?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

ইন্দু বলিতে আরম্ভ করিলেন—"যেন শৈশবে তোমার সহিত অ‍ামার যেখানে দেখা হয়—আমাদের উদ্যানে—আমি আর তুমি দাঁড়াইয়া, আবার যেন তোমার আর আমার সেই অল্প বয়স হইয়াছে। তোমার এক হাত আমার কাঁদে, আর এক হাত একটা নক্ষত্রের পানে। তুমি নক্ষত্রের ও অদৃষ্টের কথা কি বলিলে, আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তখন সেই চন্দ্রালোকে তুমি আর আমি ঘাসের উপর বসিলাম। তুমি উঠিলে আবার বসিলে; তোমার ও আমার মধ্যে এক খণ্ড তৃণ পড়িয়াছিল। সেই তৃণটী দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া যাইল, ক্রমে দেখি তাহা তৃণ নহে, তাহা নদী,—ভয়ানক বিস্তৃত, ভয়ানক বেগে বহিতেছে। আর চন্দ্রালোক নহে, প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন রবি—বালুকাময় সৈকত—তুমি এক পারে আমি অপর পারে;—আর মধ্যে সেই ভয়ানক বিস্তৃত নদী গর্জ্জিয়া বহিয়া যাইতেছে। নদী এত বিস্তৃত যে এপার হইতে ওপারের কথা ভাল শুনা যায় না, দৃষ্টি ভাল চলে না। আমি যেন বালুকাময় সৈকত হইতে তোমাকে দেখিতে লাগিলাম। আমি অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলাম, ভাবিলাম, তুমি সাঁতার দিয়া আসিবে, কিন্তু নদীর যে প্রখর স্রোত, ভীষণ আবর্ত্তন—ক্রমে আশা রহিল না। তবু ভাবিলাম, তুমি বীর-পুরুষ, দৈববল-সম্পন্ন, আসিবে। তুমি যেন হাত দিয়া আমাকে চলিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলে, আর আকাশের দিকে হাত তুলিলে, এবং আমাকে তোমাকে হাত দিয়া লক্ষ্য করিলে। আবার আমাকে চলিয়া যাইবার জন্য সঙ্কেত করিলে। আমি শুনিলাম না, আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তুমি আমার দিকে চাহিয়া থাকিলে, ক্রমে যেন তোমার মুখ বড়ই বিষণ্ণ হইয়া আসিল। তুমি কিছু বলিলে না, পিছন ফিরিয়া দূরে চলিয়া যাইলে। যেমন দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, আমি সাঁতরাইয়া তোমাকে ধরিবার নিমিত্ত জলে পড়িলাম। অমনি যেন আকাশ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া একটা কি শব্দ হইল! আমাকে জলের আবর্ত্তনে কোথায় লইয়া গেল—আমার স্মরণ নাই। তাহার পর আমি দেখি, আমি আবার সেই সৈকতে অগ্নিসম বালুকার উপর পড়িয়া রহিয়াছি। মাথার উপর অগ্নিবর্ষী সূর্য্য—তৃষ্ণায় প্রাণ যায়—শরীর অবশ—উঠিবার শক্তি নাই। সূর্য্য অস্ত যাইল। অন্ধকার সম্মুখে স্বপের মত একটা কি দেখিলাম,—অতি উচ্চ আকাশে ভেদ করিয়াছে। আকাশের এক স্থানে একটী আলোকময় ছিদ্র

দেখিলাম। তাহা হইতে রশ্মির প্রপাত নির্গত হইল, সূক্ষ্ম সুবর্ণ সূতার ন্যায় অনেক রশ্মি ক্ষরিত হইতেছে। তাহার মধ্যে একটী রশ্মি বাম হস্তে ধরিয়া একটী স্বর্গীয় দেবকন্যা, আমি নীচে যেখানে ছিলাম,সেইখানে আসিলেন ; আমার হস্ত, বাম হস্ত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দু, তোমাকে আর সংসারে দুঃখ সহিতে হইবে না। তাঁহার স্পর্শমাত্রে আমার শরীর লঘু হইয়া যাইল। তিনি আমাকে লইয়া উঠিলেন। আমি পশ্চাতে তাকাইলাম। দেবকন্যা বলিলেন, তুমি যাঁহার নিমিত্ত পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ, তাঁহাকে শীঘ্র পাইবে। আমি তাঁহার সহিত উঠিলাম। দেখিলাম, সেই ছিদ্র একটী প্রশস্ত দ্বার। তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, অনন্ত অসীম শোভা, কিন্তু তোমায় না দেখিয়া মন অস্থির হইল। দেবকন্যার মুখের পানে বিনীত ভাবে তাকাইলাম। দেবকন্যা অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। দেখিলাম, এক খানা আদর্শ, তাহাতে তোমার মূর্ত্তি। দেবকন্যা বলিলেন, যে কয়েক দিন উঁহার আসিতে বিলম্ব হইবে, তুমি উঁহাকে আদর্শে দেখিতে পাইবে। তিনি মর্ত্ত্যলোকে কি করিতেছেন, তাহা তুমি উহার মধ্যে দেখিতে পাইবে। আমি যাহা দেখিলাম, তাহা বলিব না। আমার শোকে তোমার বড় যন্ত্রণা। তার পর কি যন্ত্র বাজিয়া উঠিল, অমনি একটী দেবদূত কি গান করিতে করিতে একটী রশ্মি ধরিয়া নামিলেন, গান করিতে করিতে তোমাকে আমার নিকট আনিয়া দিলেন। অমনি আবার কি বাজিয়া উঠিল, অমনি তিনটী দেবকন্যা আর তিনটী দেবপুত্র আমাদিগের দুইজনের হাত ধরিয়া মধুর মিলন গান গাইতে ২ আমাদিগকে লইয়া যাইলেন। একটা অপূর্ব্ব কুঞ্জবনে আমাদিগের আবাসস্থান দিলেন। সেখানে অনেক দেবকন্যা, অনেক দেবতনয়, অনেক পণ্ডিত ধার্ম্মিক মনুষ্য—অনেক সঙ্গীত, অনেক কবিত্ব ও অনেক অনেক জ্ঞান,—অনন্ত শোভা ;—এই সকল ভাব করিয়া না দেখিতে দেখিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এইটী বোধ হয় তোমার এবং আমার জীবন বৃত্তান্তের সাঙ্কেতিক বর্ণনা। আমার আর মরিতে কিছু কষ্ট হয় না। তোমাতে আমাতে আবার স্বর্গে সাক্ষাৎ হইবে—সেই কি সুখের দিন !

অমলেন্দু নিস্তব্ধ ও বিস্মিত হইয়া শুনিতেছিলেন। দেখিলেন, ইন্দুর মুখ রক্তবর্ণে প্লাবিত হইয়াছে ; চক্ষু উজ্জ্বল হইয়াছে, ও বেগে নিশ্বাস পড়িতেছে। বলিলেন—"ইন্দু, একটু বিশ্রাম কর, নতুবা বড় কষ্ট হইবে।"

ইন্দু। "না, কষ্ট হইবে না। অমল আর দুই একটী কথা আছে। আজিগে বলিয়া থুই। শরীরের যে অবস্থা, কবে চলিয়া যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। দাদা আমাকে বড় ভালবাসেন। এ জীবনে সকল আশা ভরসা, সুখ প্রতিপত্তি আমার নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আমার শুশ্রূষা করিয়াছেন, এবং আমার বিন্দু মাত্র সুখের নিমিত্ত নিজের প্রাণ দিতে সকল সময় প্রস্তুত আছেন। আমি মরিয়া যাইলে তাঁহার মনে বড়ই আঘাত লাগিবে। হয়ত সেই আঘাতে তাঁহার মৃত্যুও হইতে পারে। তোমার মানসিক বল আছে, তুমি তাহাকে দেখিও। বাবা এবং মা বোধ হয় শীঘ্রই আসিবেন। তাহা হইলে তোমাকে আর দেখিতে হইবে না। আমি

তাঁহার নিকট আমার প্রকৃত অবস্থা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।" এই বলিয়া ইন্দু চুপ করিলেন। নির্ম্মল ইন্দুর নিমিত্ত কতকগুলি জিনিষ আনিতে বাসায় গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিলেন, ইন্দু বলিলেন, দাদা আমার জন্য আপনি অত কষ্ট স্বীকার কেন করেন? ———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামের ৫ ক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। সেই খানে নির্ম্মল, ইন্দুর পীড়ার বিষয় টেলিগ্রাফ করিতে গিয়াছিলেন। টেলিগ্রাফ এই—"ইন্দু আবার বড় অসুস্থ, একজন ডাক্তার আর আপনি শীঘ্র আসিবেন।" আর কয়েক দিন যাইল। ইন্দুর জীবন নিবু নিবু করিতেছে, মুখচ্ছবি ম্লান হইয়া আসিতেছে। আর আশা নাই—

ইন্দু।—"দাদা, মা কবে আসিবেন?"

নির্ম্মল।—"বোধ হয় অদ্য রাত্রিতে।"

ইন্দু।—"অদ্য রাত্রিতে আসিলে সাক্ষাৎ হইতে পারে। কল্য আসিলে সাক্ষাৎ হইবে কি না সন্দেহ। দাদা, আপনাকে একটা কথা বলিব ভাবিতেছি।"

নির্ম্মল।—"কি কথা দিদি!"

ইন্দু।—"কয়েক দিন পরে এ সংসারে আমি আর থাকিব না। আমার অবর্ত্তমানে আপনি মার একমাত্র সম্বল ও অবলম্বন। আমাকে অকালে মরিতে হইল। বাবা ও মার পক্ষে, আপনারও পক্ষে ইহা বড়ই শোকের কারণ, তাহা আমি জানি। কিন্তু ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইল। আমি জানি, আপনি আমাকে বড় ভাল বাসেন, আমি আপনাকে কত ভালবাসি তাহা হয়ত প্রকাশ হয় নাই, কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ হইল না। কিন্তু আপনার ইষ্টের জন্যে আমি অনায়াসে সকল সময় আমার প্রাণ দিতে পারিতাম। কিন্তু তথাচ আমার জীবন বড়ই স্বার্থপর বোধ হইতেছে। সকল সময়ই নিজের দুঃখেতে আমি বড়ই মগ্ন ছিলাম। অনেক সময় আমি কর্ত্তব্য কাজও করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার দুঃখময় জীবনের সকল ঘটনাত আপনি জানেন, আপনাকে আর কি বলিব? তবে যা বলিতেছিলাম—দাদা, আমি মরিলে মা বড় শোকাকুলা—"

নির্ম্মল এতক্ষণ অতি কষ্টে চক্ষুর জল চক্ষেতে রাখিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইন্দু বলিল,—দাদা, একটু স্থির হইয়া আমার কথা শুনুন। এ সংসারে আমার আর অতি অল্প সময় আছে। আপনি কাতর হইবেন না। আমি বলিতেছিলাম, আপনি আমার মৃত্যুর পর আপনার জীবনের প্রতি উপেক্ষা করিবেন না, আপনি সংসারে উদাসীন হইবেন না। আপনার নিজের জন্যে যদি জীবনে আস্থা না করেন, দুঃখিনী মাকে ভুলিবেন না, তাহার জন্য আপনি সংসারে থাকিবেন। আর—আর আপনি বিবাহ করিবেন। কেন না করিবেন?"

নির্ম্মল।—ইন্দু, থাকুক, তোমার বড় পরিশ্রম হইতেছে।

ইন্দু।—আর একটা কথা। পিতা আমার নিমিত্ত যথেষ্ঠ অনুতাপ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার জন্য আপনি আমার কথা লইয়া তাঁহাকে কখন কষ্ট দিবেন না।

নির্ম্মল।—ইন্দু, তুমি এখন আর কথা কহিও না।

ইন্দু ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রা যাইলেন।

সন্ধ্যার সময় ইন্দুবালা জাগিয়া বলিলেন, "দাদা, মা আসিয়াছেন ?"

নিৰ্ম্মল।—'মা এখনও আসেন নাই, 'আসিবার সময় যায় নাই।'

ইন্দু।—বোধ হয় তবে দেখা হইল না।

রাত্রি নয়টার সময় ইন্দুর জনক জননী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দু কেমন ?

নিৰ্ম্মল।—"ভাল নহে।"

জননীর নেত্র হইতে অবিরত জল পড়িতেছে—"নির্ম্মল আমার ইন্দু কোথায় ?"

নিৰ্ম্মল।—"মা, ইন্দু ঘুমাইয়াছে।"

জননী।—আমি ইন্দুর ঘরে যাইব।

নিৰ্ম্মল।—আসুন।

নিঃশব্দে উভয়ে ঘরে যাইলেন। ঘরে একটী ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ইন্দুর জননী বসিলেন, ইন্দুর আয়ত চক্ষু নিমীলিত, কান্তি মলিন, ওষ্ঠ গণ্ডস্থল মাংস হীন। জননীর চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল, সে বাষ্পবারি মধ্য দিয়া নীরবে ইন্দুর বদন অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। ইন্দু জাগিলেন, তাঁহার মাকে দেখিলেন। "মা মা মা, তুমি আসিয়াছ, আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার সহিত আমার আর দেখা হইল না।" জননীর উচ্ছলিত শোক আর সংরুদ্ধ থাকিল না, তিনি ইন্দুর বক্ষে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"ইন্দু আমায় ছেড়ে তুই কোথায় যাবি, তোর মনে কি এই ছিল!" ইন্দু গলায় হাত দিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিলেন। জননী অশ্রুসিক্ত নয়নে ইন্দুকে বারম্বার চুম্বন করিলেন। ইন্দুর গালের উপর গাল রাখিলেন। দুই জনের চক্ষের জলে দুই জনের মুখ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। নির্ম্মল গম্ভীর ভাবে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া; চক্ষে নীরবে অশ্রু ধারা বহিতেছে। অবশেষে নির্ম্মল বলিলেন—"মা মা, আপনি অত অস্থির হইবেন না।" নিৰ্ম্মল পশ্চাতে বসিলেন। ইন্দুর আবার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল। মধ্যে মধ্যে মধ্যে "মা মা" বলিয়া দুই একবার ডাকিলেন। পরদিন প্রত্যুষে ইন্দু বলিলেন—"বাবা আসিয়াছেন ?"

জননী।—হাঁ আসিয়াছেন ?

ইন্দু।—আমার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।

তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পিতা ও কন্যার শেষ দেখা হইল!

সূর্য্য অস্ত যাইবে যাইবে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অমল ও নির্ম্মল শয্যার দুই পাশে। জীবনের স্রোত থামিবে থামিবে হইয়াছে। "অমল! দাদাকে যদি সুখী করিতে পার, তোমার নিকট থাকিলেন—দেখিও—দাদা মাকে ভুলিও না। অমল—দাদা—মা—"

* * *

ইন্দুর আত্মা শোক দুঃখ পশ্চাতে রাখিয়া ইহলোক হইতে পরলোক চলিয়া গিয়াছে।

* * *

পর দিন প্রাতে দুইটী মৃত দেহ ধীরে নদী তীরে নীত হইল—ইন্দুবালার আর—সন্ন্যাসীর। সেই রাত্রিতেই সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয়। নিস্তব্ধ যমুনা তীরে—এক সময়ে—এক স্থানে—ইন্দুবালা ও সন্ন্যাসীর দেহ চিতাতে দগ্ধ হইল—এবং পবিত্র যমুনা-তরঙ্গে উভয়ের ভস্ম মিশ্রিত হইল—সুরলোকে দুই আত্মা এক হইল।

সমাপ্ত।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও হিন্দুধর্ম্ম।

ঘাতের পর প্রতিঘাত নৈসর্গিক নিয়ম। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইংরাজিশিক্ষার নবীন-আলোকে অঙ্কিত-দৃষ্টি যুবকগণের চক্ষে হিন্দুধর্ম্ম হেয়, অপকৃষ্ট, কুসংস্কারের সমষ্টিমাত্র বোধ হইত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে আবার সেই হিন্দুধর্ম্ম কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অদ্ভুত মহিমাপূর্ণ, জ্ঞানখনি, ও বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ বলিয়া প্রতিভাত। শুধু ইহাই নহে, হিন্দুধর্ম্ম অবমাননার কালে, গভীর নিনাদে পাশ্চাত্য শিক্ষার মহিমা ঘোষিত হইয়াছিল; হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে আবার পাশ্চাত্যশিক্ষার সংকীর্ণতা ও অনুদারতার উপর রোষ-কষায়িত তীব্র কটাক্ষ। একের সম্মান, অন্যের অপমান,—পূর্ব্বে হইয়াছে, এখনও হইতেছে। দুইয়ের সামঞ্জস্য কখন হইল না।

আমরা এখানে 'হিন্দুধর্ম্ম' এই বাক্যে গভীর দর্শনশাস্ত্র-নিহিত ব্রহ্মজ্ঞান বুঝিতেছি না; হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যকলাপ, হিন্দুপদবাচ্য ব্যক্তিগণের আচার ব্যবহার, ও হিন্দুসমাজের চিরন্তন বিশ্বাস-পরম্পরা বুঝিতেছি।

কেনই বা পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রথমাবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণিত হইয়াছিল? কেনই বা আবার অধুনা স্থল বিশেষে আদৃত হইতেছে? এই প্রশ্নদ্বয় উত্তর করিতে হইলে অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

মনুষ্যচরিত্র বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাবৃত্তি, অহঙ্কার, রিপু প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী মনোভাব লইয়া মানব চরিত্র নির্ম্মিত। ইহাদের মধ্যে কোন একটীর অযথা প্রাবল্য হইলে অপরগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায় না। ইচ্ছা অদম্য হইলে, বুদ্ধি পরিচালনার ব্যাঘাত ঘটে। অহঙ্কার বা রিপু উচ্ছৃঙ্খল হইলে, পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিদ্বয় সম্যক্ কার্য্যকরণে অক্ষম হয়। বিচারশক্তির স্থির বিকাশের নিমিত্ত সমুদায় মানসিক উপকরণের সামঞ্জস্য আবশ্যক। কিন্তু এই প্রকার সামঞ্জস্য সাধারণত অসম্ভব। পূর্ব্বসংস্কারের প্রবল আকর্ষণী শক্তি, নূতনত্বের রুচির কান্তি, ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কারণহীন দৃঢ়তা, অনেক স্থলে মানসিক স্থৈর্য্য বিনাশ করিয়া ধীর বিবেচনা বিলোপ করে। কোন একটী বিষয়ের গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মনকে সুপ্ত মীন হ্রদের ন্যায় অচঞ্চল রাখিতে হয়। তাহা হইলেই হ্রদবক্ষের উপর গগন-বিরাজিত শশিকলার ন্যায়, মনে সম্পূর্ণ সত্য প্রতিবিম্বিত হয়। অন্যথা হইলে,—অহঙ্কার-লোষ্ট্র-বিক্ষেপে তরঙ্গায়িত হইলে,—প্রতিফলিত-চন্দ্র-বৎ, সত্য শতখণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, ও স্থিরজ্যোতি বিকীরণে পরাঙ্মুখ হইয়া এক প্রকার অস্ফুট চঞ্চল আলোকমাত্র প্রদান করে।

মানব কেবলমাত্র বুদ্ধিমান্ না হইয়া, বিসদৃশ মনোবৃত্তি সমূহে নির্ম্মিত হওয়ায়, সূক্ষ্মদর্শী বিচারে প্রায়শঃ অপারক। বিশেষত কোন একটী সামাজিক অথবা মানসিক বিপ্লবের সাধারণ আলোড়নে বিধ্বস্ত হইলে, বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ আরও হ্রাস হয়, ও অন্যান্য বৃত্তিসকলের প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব যথার্থ বিবেচনা, যথার্থ সত্যনির্ব্বাচন আরও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। নবীন জীবনের

প্রবল প্রবাহে পূর্ব্ববিশ্বাসের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। চিরবদ্ধ বারিরাশি, অকস্মাৎ নব-আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান হইলে, আপনার বেগ ধারণ করিতে পারে না ; বাঁধ ভাঙ্গিয়া, কূল উছলিয়া, গ্রাম ডুবাইয়া, প্রলয়োর্ম্মির ন্যায় অগ্রসর হয়। কোথায় বা ধানের ক্ষেত, কোথায় বা উলুর বন ; গাছ, আগাছা ; ভাল মন্দ ; প্রয়োজনীয়, নিষ্প্রয়োজনীয়, কিছুই বিচার করে না,—সমুদায়ই উন্মত্ত তরঙ্গে প্লাবিত করিয়া যায়। এখানে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। পূর্ব্বাবস্থার নিশ্চেষ্টতা যত অধিক, পরবর্ত্তী বিপ্লব সেই পরিমাণে ভীষণ হইবে। পূর্ব্ববিশ্বাস যে পরিমাণে একদেশী, তাহার বিপক্ষে প্রতিঘাতও সেই পরিমাণে অপরদেশী হইবে।

এখন দেখা যাউক, ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে আমাদের দেশের অবস্থা কি প্রকার ছিল। মুসলমান রাজ্যের ভগ্নাবস্থা ও ইংরাজ-রাজ্যদৃঢ়ীকরণের মধ্যবর্ত্তী সময়, বাঙ্গালী মনোবৃত্তির ইতিহাসে মরুভূমি। পূর্ব্বাবধিই পক্ষপাতী শাস্ত্রকারের কঠোর শাসনে জনসাধারণের জ্ঞানার্জ্জন এক প্রকার অসম্ভব ও উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ একদেশী ছিল। কিন্তু যাহাও ছিল, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর তীব্র তাড়নে তাহারও উচ্ছেদ হইবার উপক্রম হইল। বিপ্লবের পর বিপ্লব,—মুসলমানের পর ইংরাজ, পলাশীর পর দাওয়ানী, দাওয়ানীর পর দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষের পর নন্দকুমার, দশশালা ও চিরস্থায়ী,—মনের শান্তি বিনাশ করিল, বুদ্ধি অস্থির করিল। যখন সকলে আপনার ধন, মান, প্রাণ লইয়া ব্যস্ত, তখন লেখাপড়ায় মন দিবার সময় কোথায়? এই সময়ে শিক্ষার অবস্থা যথার্থই শোচনীয় ছিল। বাঙ্গালা শিক্ষা ত প্রচলিত ছিলই না ; বরং পণ্ডিতাভিমানী টোলাধ্যাপকেরা বাঙ্গালাকে "ভাষা" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। যে টুকু সংস্কৃত বিদ্যা ছিল, টোলেই তাহার উৎপত্তি, টোলেই নিবৃত্তি। বুদ্ধিবৃত্তির বলাধানের জন্য যে প্রকার মনশ্চালনা প্রয়োজন, তাহার কিছুই ছিল না। অনর্থক তর্ক যাহাকে "বিচার" উপাধি দেওয়া হইত, শূন্য বাগাড়ম্বর যাহাকে পাণ্ডিত্য বলা যাইত, দশ বৎসর ব্যাকরণ মুখস্থ করা যাহাকে লোকে বিদ্যোপার্জ্জন কহিত, পুথি হইতে গোটাকতক শ্লোকাবৃত্তি যাহা দ্বারা ধনী মহলে মান বৃদ্ধি হইত,—এইত সংস্কৃত বিদ্যার অবস্থা! ইহাও আবার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি শিখিত না, এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে অতি যৎসামান্য ভগ্নাংশ শিখিত ; অতএব ইহার বিস্তৃতি কতদূর ছিল, ও কি পরিমাণে দেশের উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইত, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার ত কথাই নাই। কড়ি, বিছুটি ও নাড়ুগোপাল প্রভৃতি দ্বারা যিনি শুভঙ্করের বাজার হিসাব মুখস্থ করিতে পারিলেন, তিনি একজন দিগগজ মুহুরি হইলেন, ও জমীদারী সেরেস্তায় নায়েবীপদের উপযুক্ত হইলেন। যিনি দাতাকর্ণ ও গুরুদক্ষিণা পড়িয়া বঙ্গভাষায় মোক্ষমূলর হইলেন, ও লিখিতে বসিলেই বানান ও ব্যাকরণে উক্ত ভাষার পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিতে পারিলেন, তিনি পাড়ার মধ্যে গণ্য ও পরামর্শদাতা হইয়া পড়িলেন। ইহার উপর যদি দুই একটা চাণক্যশ্লোক ভাঙা সংস্কৃততে আওড়াইবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আপনাকে নবদ্বীপের বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সমকক্ষ মনে করিতেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা ইংরাজের

চাকরী করিবার মানসে ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিলেন. বৃদ্ধ মহলে তাঁহাদের বড়ই মান।. "সেল্‌ফ্‌ ইন্‌ষ্ট্রক্টর". "টামোস্‌ ভাইস" ও "ইস্‌মাল মারে" পড়িয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের সাহায্যে যাঁহার দুই চারিটা ইংরাজী কথা জুড়িবার ক্ষমতা জন্মাইল, ও প্রভূত অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা সাহেবের নিকট আপনার মনের ভাব কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইলেন, তিনি "হউসে" কেরানীগিরি করিতে ও পাড়ার দরখাস্ত লিখিতে লাগিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, রীতি মত ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে যে শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর। উদরান্নের চেষ্টাতেই উহা পর্য্যবসিত হইত। মানুষের যে মন বলিয়া একটা পদার্থ আছে, যাহার উন্নতি করিতে হয়, যাহার উন্নতিই মানুষের সুখের প্রধানতম কারণ, যাহাতে নানাবিধ সুন্দর ও গভীর ভাব নিহিত আছে, শরীরের ন্যায় যাহার ক্ষুৎপিপাসা আছে, ও শরীরের ন্যায় যাহার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতে হয়, এ সকল তাঁহারা আদৌ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন বিশ্বাস অন্ধ হইয়া, বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া, মন শূন্য শরীর লইয়া তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিতেন। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, (সওয়ায়-কৃত্তিবাস, কাশীরাম, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র) প্রকৃতির সমস্যা, মানবের তত্ত্ব, সমাজের গতি—কিছুরই ধার ধারিতেন না। তাঁহারা অনেক বিষয় বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু জানিতেন না কি কারণে অনেক কার্য্য করিতেন, কিন্তু লোকে করে বলিয়া করিতেন। দেব দেবীকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন, কিন্তু মূল তত্ত্বের দিকে কখনও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না। মহাসমারোহের সহিত বুলবুলের লড়াই, প্রভৃত বাদ্যভাণ্ড সহকারে ঘুড়ি ওড়ান, কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা, হরুঠাকুরের পাঁচালী, ফুল আকড়াই, কৃষ্ণ যাত্রা, তরজা, লইয়া অবসর সময় কাটাইতেন। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, তাঁহাদের প্রসংশনীয় কিছুই ছিলনা। কেবল মাত্র ইহাই বলিতে চাই যে, ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে বঙ্গের মনোবৃত্তির স্রোতে গভীর ভাঁটা পড়িয়াছিল। অচিরে বাণ ডাকিল। শীর্ণ স্রোতস্বতী হিমালয়ের তুষারচ্যুত স্নিগ্ধ বারিরাশিতে পূর্ণ হইল না। সমুদ্রের অপর পার হইতে লবণ সলিল উত্তাল-তরঙ্গে ক্ষীণ স্রোতের বাধা অতিক্রম করিয়া নদী বক্ষ স্ফীত করিল। স্রোত ফিরিল; পূর্ব্বের স্রোত প্রতিকুলগামী হইল। ইংরাজী শিক্ষা আসিয়া বঙ্গের শিক্ষার শূন্য সিংহাসন গ্রহণ করিল।

যখন ইংরাজী শিক্ষা আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিল, তৎকালীন বঙ্গের মানসিক অবস্থার কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী উচ্চশিক্ষা পাইলেন, তাঁহাদের স্বদেশ, স্বভাষা, স্বপ্রথা সমূহের প্রতি কিরূপ ভাব হইতে পারে, দেখা উচিত। আমরা বলিতে চাইনা যে, তাঁহারা তাহাদের প্রতি যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা উচিত হইয়াছিল। আমরা কেবল দেখিব, তাহা স্বাভাবিক কিনা। তাঁহারা তিমিরাচ্ছন্ন অজ্ঞানকারা হইতে বিজাতীয় হস্তদ্বারা বিজাতীয় আলোকে নীত হইয়াছিলেন। কারণহীন বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে, তাঁহারা সকারণ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালায় সাহিত্য আলোচনা ছিল, না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তখন সেক্সপিয়র-প্রমুখ অসীম সাহিত্য

ভাণ্ডার তাঁহাদের সম্মুখে মুক্তদ্বার। যখন জমাওয়াশীল-বাকী বঙ্গের চূড়ান্ত অঙ্কশাস্ত্র, তখন তাঁহারা নিউটনের "প্রিনসিপিয়া''র গভীর তত্ত্বে মগ্ন। ইতিহাস পড়িলেন,—দেখিলেন, ইংলণ্ডের শাসন নীতি ও সমাজ-নীতি; বুঝিলেন, ইউরোপে সভ্যতার ক্রমিক অথচ অনিবার্য্য বিস্তারের কারণ; জানিলেন, স্বাধীনচিন্তা ও বিদ্যাচর্চ্চা উন্নতির একমাত্র উপায়। দর্শন পড়িলেন; তর্ক করিতে শিখিলেন; সন্দেহ জন্মিল; অবিশ্বাস প্রশ্রয় পাইল। বিজ্ঞানের সহায়ে প্রকৃতি-তত্ত্ববিষয়ে ভ্রমান্ধকার দূর হইল। প্রাক্তনের—ইংরাজী শিক্ষায় তাহাদের বিবেচনায় পুনর্জ্জন্ম,—প্রাক্তনের বিশ্বাস সকল অতীব ঘৃনার্হ বোধ হইল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের মনে যে উচ্চ-আদর্শ বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় চতুষ্পার্শ্বে যাহা দেখেন, সকলই যেন অসম্পূর্ণ, অকিঞ্চিৎকর, অসার। মন এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে ধাবিত হইল। এই প্রকাণ্ড আলোড়নে বুদ্ধিবৃত্তি কথনই সুস্থির থাকিতে পারে না। ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; বিচারশক্তি-ভ্রংশ হইল। তাঁহারা দেখিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত কতকগুলি বিষয় পাশ্চাত্য-শিক্ষাজনিত জ্ঞানের বিরোধী; তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম সারহীন, মূর্খতাপূর্ণ, ও ভণ্ডামিপূর্ণ। আরও একটী কারণ ছিল, যাহার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত না হইয়া বরং অধিকতর বদ্ধমূল হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইংরাজীশিক্ষার পূর্ব্বে লোকে অনেক বিষয় বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু জানিতেন না, কি কারণে। যদি কেহ অনুসন্ধিৎসু হইয়া কখন কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতেন, তাহা হইলে উত্তর পাইতেন—"বচন রহিয়াছে," "শাস্ত্রকারের মত," "করিতে হয়" ইত্যাদি, ইত্যাদি। সুতরাং মূল শূন্য কাণ্ডের ন্যায় তাঁহাদের মনে কতকগুলি কারণশূন্য বিশ্বাস প্রোথিত ছিল মাত্র। একত্র অবস্থান ভিন্ন এই সকল বিশ্বাসের সহিত মনের অন্য কোন গূঢ়তর জৈবনিক সম্বন্ধ ছিল না। হইতে পারে যে, বহুকাল একত্র অবস্থানে পরস্পরের সহিত এতই অনুরক্তি জন্মিয়াছিল যে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করা অনেক স্থলে আয়াসসাধ্য; এবং যেমন চলিয়া আসিতেছিল, সেই প্রকার চলিয়া আসিলে হয়ত শতাব্দীতেও পরস্পরের বিচ্ছেদ সাধিত হইত না। কিন্তু গূঢ় জৈবনিক সম্বন্ধ অভাবে বিজাতীয় আক্রমণে সেই বিশ্বাস পরম্পরা মনে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা রাখিতে পারিল না। ইংরাজী শিক্ষার স্রোত আসিয়া ক্রমে গোঁড়া আলগা করিল, অবশেষে উৎপাটন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। বিশ্বাস সুদৃঢ় কারণ-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইলে কথনই এইরূপ আকস্মিক লয় প্রাপ্ত হয় না। জৈবনিক সম্বন্ধ থাকিলে কথনই এমন অকাতরে বিসর্জ্জন দেওয়া যাইত না। ইংরাজীশিক্ষা প্রণালী জয় লাভ করিল। হিন্দু ধর্ম্ম বলিল—"যা বলি বিশ্বাস কর, কারণ জিজ্ঞাসিও না," ইংরাজি শিক্ষা বলিল—"যা বলি বিশ্বাস করিও না, কারণ না জানিলে।" দাসত্ব হইতে স্বাধীনতা যেরূপ প্রিয়, ইংরাজী শিক্ষা হিন্দুধর্ম্ম হইতে সেই রূপ প্রিয় হইল। কেবল যে পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রিয় হইল, তাহা নহে; হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণিত হইল। ইংরাজি

শিক্ষিত যুবারা ভাবিলেন,—কঠোর শিক্ষয়িত্রি! তুমি এত কাল মানবের সারবস্তু মনকে জঘন্য দাসত্বে বদ্ধ রাখিয়াছিলে? প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া হিন্দুধর্ম্ম নির্যাতনে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দুবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না; হিন্দুবিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করিতে লাগিলেন। ডিরোজিওর (Derozio) মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অসারতা ও অমূলকতা গভীর গর্জ্জনে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। যেন অবতীর্ণ মেফিষ্টফিলিস্ (Mephistopheles) অধীর ক্রোধে, অসীম ঘৃণায়, পূর্ব্বসৃষ্টি একাকারে ডুবাইবার মানসে অট্টহাসিল। হিন্দুর যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু মূল্যবান্, সকলই ঘোরতর অবজ্ঞার পাত্র হইল। "Beef and Burgundy!" বলিয়া চীৎকার করত Young Bengal রাজপথে দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। "Down with Hinduism!" এই মহামন্ত্র বজ্রনাদে ঘোষিত হইল। হিন্দুর চির-প্রচলিত আচার ব্যবহার, হিন্দুর চির-পূজ্য রীতি নীতি, নব্যেরা বিষচক্ষে দেখিলেন। গরু খাও, বিধবার বিবাহ দাও, পুরনারীকে অন্দর হইতে বাহিরে আন, বিবাহে স্বাধীনতা দাও, স্ত্রীধর্ম্মাপ্রাপ্ত কুমারীর পরিণয় স্থগিত রাখ,—এই রব চারিদিকে। হিন্দুসমাজ সংস্করণের জন্য ইংরাজী কেতার সভা সৃষ্টি হইতে লাগিল। সভাপতি, সম্পাদক, মেম্বর,—ইহাঁদের বা কতই মান। ইংরাজীতে বক্তৃতা, ইংরাজীতে নিমন্ত্রন, ইংরাজী আদব কায়দা,—সকলেতেই ইংরাজীর দ্বিতীয় সংস্করণ। Native—অপদার্থ। বাঙ্গালায় কথা কহা—ইংরাজী শিক্ষার অপমান। বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা—পাশ্চাত্য জ্ঞানের অপমান। দেব দেবীপূজা—কলঙ্কময় পৌত্তলিকতা। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করা—কুসংস্কারের চরম সীমা। হৃদয়কে শূন্য করিয়া পূর্ব্ব সংস্কার সকলকে বিদূরিত করা হইয়াছিল; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন গভীর বিশ্বাস বদ্ধমূল না হওয়ায় ব্যালাষ্ট (ballast) হীন নৌকার ন্যায় অনেকের মন সন্দেহ-সাগরে টলমল করিতেছিল। এই শূন্যতায় হতাশ হইয়া, কতিপয় ধর্ম্মভীত আত্মা বিভিন্ন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। খ্রীষ্টের বাঙ্গালী শিষ্য জুটিল। রামমোহন রায়ের নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-দলভুক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ক্রমশঃ।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

আসাম ও বাঙ্গালী।

আসাম প্রকৃতির 'কাম্য কানন'—স্বাধীন জীবের লীলাভূমি। অভ্রভেদী বিশাল বিস্তৃত হিমালয়ের শেষ সীমা হইতে কতই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী উদ্ভূত,—কতই অসভ্য স্বাধীন জাতি সকলের বিহার ক্ষেত্র সুশোভিত। কামাক্ষ্যা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গ ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইলে, আসামের কি এক অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। কামাক্ষ্যা পাহাড়ের পাদমূলে, কলনাদী, স্মৃতিময় ব্রহ্মপুত্র কুল কুল রবে বহিতেছে,—তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উমানন্দ পাহাড় আপন মস্তক নদী-গর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়াছে! সোণায় সোহাগা,—রূপে অপরূপ মিশিয়া

রহিয়াছে। দক্ষিণে গারো পাহাড় শ্রেণী, পূর্ব্ব দক্ষিণে খাসিয়া পাহাড়শ্রেণীর সুদূরস্থিত ঘন মেঘ রাজির ন্যায় মনোহর দৃশ্য, উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ের ভোট সীমান্তের গগন-ভেদী প্রকাণ্ড পর্ব্বত,—সকলের মধ্যে অশ্বকাণ্ড প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী। মহান এবং ক্ষুদ্র—বড় এবং ছোট, শাদা এবং কাল, তরল আর কঠিন একত্রে মিলাইয়া প্রকৃতি অপরূপ সাজিয়া রহিয়াছে! প্রকৃতিদেবীর সমস্ত সম্বল অঙ্গাভরণ যেন ক্লান্ত হইয়া আসামে খুলিয়া রাখিয়াছেন! আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতে পারে, এমন কবি দেখি নাই। আসামের যে সকল মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছি, প্রাণ খুলিয়া, হৃদয় ঢালিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারি, সে শক্তি নাই। কোন কোন পুস্তক খুলিয়া আসামের বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহা যেন আমার নিকট কিছুই-নয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। আমি আবার চেষ্টা করিয়া অন্যের হাস্যাস্পদ হইব কেন? কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছাসকে কে সকল সময়ে প্রশমিত করিয়া রাখিতে পারে? একবার সে চেষ্টা করিব।

আমি বলিয়াছি, আসাম প্রকৃতির কাম্য কানন। আসামে শোভা সৌন্দর্য্যের অভাব কোথাও নাই। যেখানে যাও, যে দিকে চাও, সেই দিকেই অতুল শোভা। শোভার উপরে আরো শোভা,—রূপের উপরে আরো রূপ—ঘনীভূত—বিজড়িত। ব্রহ্মপুত্র আসামে যে কি লীলাই খেলিতেছেন, কি ভাবই ঢালিতেছেন, কি আনন্দই প্রচার করিতেছেন, যে না দেখিয়াছে, সে বুঝিবে না। আসামের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত তরঙ্গায়িত ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত,—উভয় কূলে পাহাড় শ্রেণী—সুদূরে এবং নিকটে। কোথাও ব্রহ্মপুত্র পাহাড়ের পদচুম্বন করিতেছেন, কোথাও পাহাড়কে বুকে করিয়া রহিয়াছেন,—কোথাও আপন অঙ্কে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। পাহাড়ে ও নদীতে এমন কোলাকুলি, এমন ঢলাঢলি আর কোথা আছে? যেখানে উভয় কূলে পাহাড়, সেখানে সঙ্কুচিত হইয়া নদী যেন পাহাড়ের জন্য স্থান করিয়া দিতেছেন;—আর যেখানে পাহাড় অনেক দূরে, সেখানে উন্মাদের ন্যায় তরঙ্গ-বিহ্বল হৃদয়কে আরো প্রসারিত করিয়া ছুটিতেছেন;—যেন পাহাড়-বিরহে ক্রোধোন্মত্ত। পাহাড় আর ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন যে সকল স্থান আছে,—তাহা প্রায়ই অরণ্যময়। সর্ব্বত্রই গভীর বনরাজি—বিশাল হইতেও বিশালতর। আসামের শাল বনে বন্য হরিণ, বন্য ভল্লুক, বন্য ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ বা বন্য বরাহ,—এই সকল স্বাধীন জীব তোমার জীবননাশের জন্য বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইবে; কিন্তু লোকের সমাগম বড় একটা দেখিতে পাইবে না। প্রকৃতির যে অমৃতময় ভাণ্ডারে কাম রূপ পাইয়াছিলেন, সে কামরূপময় আসাম আজ লোকসমাগম-হীন, কেবল স্বাধীন অসভ্য জীবের এবং পশুর আবাস ভূমি। নদীতে স্বাধীন জলচর জীব, অরণ্যে স্বাধীন বন্য জন্তু, পাহাড়ে স্বাধীন অসভ্য জাতি। কিন্তু আসাম-উপত্যকা-প্রদেশ একপ্রকার পুরুষত্ব-হীন—নীতিহীন,—চরিত্রহীন। আসাম তিন ভাগে বিভক্ত;—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা-প্রদেশ, পাহাড়-প্রদেশ, এবং সুরমা উপত্যকা প্রদেশ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা-প্রদেশ সকল আবার উপর আসাম এবং নিম্ন আসাম নামে খ্যাত। গোয়ালপাড়া, কাম-

রূপ, তেজপুর, শিবসাগর, নওগাও ও ডিব্রুগড়—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভুক্ত। গারো-পাহাড়, খাসিয়া এবং জৈন্তা পাহাড় এবং নাগা পাহাড়, পাহাড়-প্রদেশ নামে খ্যাত; এবং শ্রীহট্ট ও কাচার সুরমা-উপত্যকা-প্রদেশ ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন আকা, লুসাই প্রভৃতি নামধারী অসংখ্য অসংখ্য স্বাধীন জীব-নিবাস আছে। সাধারণত আসামের লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অনেক স্থানই জঙ্গলে পরিপূর্ণ;—আবাদ হয় না, চাষ হয় না। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভূমিতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজ কাল ইংরাজি শিখিয়া, সদাশয়, মিষ্টভাষী হইয়াছেন, কেহ কেহ বা হ্যাট্‌কোটধারী হইয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন। খুব ভাল লোকও দুই চারি জন দেখিলাম, কিন্তু সে যেন সমুদ্রে শিশির বিন্দু। অজ্ঞানতা ও অসভ্যতা বিজড়িত। উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই, বলিলেই ঠিক কথা বলা হয়। বিহু-প্রথার কথা শ্রবণ করিলে সকলেরই হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয়। সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলা যায় না। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধারণত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা-প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নীতি-হীন, চরিত্র হীন, ধর্ম্ম হীন,—মনুষ্যত্ব হীন। ব্যভিচার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দোষ বলিয়াই গণ্য নহে,—পিতা কন্যাকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্ম-প্রাপ্ত বড় লোকের সহবাসে রাখিতে পারিলে সম্মান বোধ করে! পুরুষ জাতি সাধারণত নির্জ্জীব—আশাশূন্য,—স্ত্রীলোকের পদানত। স্ত্রীস্বাধীনতা আসামের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা উপার্জ্জন করে, পুরুষেরা ঘরে বসিয়া খায়। পাঠকগণ শুনিয়া চমকিত হইবেন, আসামের অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ্য বেশ্যা নাই;—তাহার কারণ, ভদ্র পরিবার ভিন্ন, বাড়ীতে বাড়ীতে সকলে ঐ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। অহিফেন সেবনে পুরুষজাতির চরিত্র মহত্ত্ব একেবারে লোপ পাইয়াছে। আতিথ্য-প্রথা কোথাও নাই, বন্য জন্তুর হাতে তোমার প্রাণ যায় যাউক, তবু কেহ তোমাকে বাড়ীতে স্থান দিবে না। তবে গুপ্ত-প্রণয় খুলিতে পারিলে, দ্বার অবারিত! বাঙ্গালীর প্রতি আসামীদিগের ভয়ানক ঘৃণা! ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পূর্ব্বে অনেক চরিত্রহীন বাঙ্গালী কামরূপে যাইয়া ভেড়া হইয়া যে মহা অনিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, সে অনিষ্টের কথা ইহারা সহজে ভুলিতে পারিতেছে না। আজও তাহারা এমন বাঙ্গালীর আদর্শ পায় নাই, যাহা দেখিয়া গত কথা ভুলিতে পারে। তাই বিজাতীয় ঘৃণা। আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছিলাম। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা-বাসীদিগের চরিত্র হীনতার কথা শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। তারপরে যখন শুনিলাম, বাঙ্গালীদিগের প্রতি ইহাদিগের বিজাতীয় ঘৃণা, তখন প্রাণ বড়ই অস্থির হইল। যে বাঙ্গালীর সহবাস ভিন্ন আসামের আর মঙ্গলের পথ নাই, সেই বাঙ্গালীর প্রতি ইহাদের বিজাতীয় ঘৃণা প্রাণে বড়ই যাতনা দিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সাধ্যানুসারে বাঙ্গালী বিদ্বেষে ইন্ধন দিতেছেন দেখিয়া আরো কষ্ট হইল। ভাষাভেদ করিয়া উভয় জাতির মধ্যে এক গভীর অন্তরায় খুলিয়াছেন! কূট রাজনীতির যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ভারতের দুই জাতি কোন

রকমে এক না হয়। এই সকল দেখিয়া নীরবে অনেক অশ্রুপাত করিয়াছি! কিন্তু সে সকল কথা এখন থাকুক।

আসামে আতিথ্য প্রথা নাই বলিয়া আমরা বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম,—অনেক দিন উদরে অন্ন পড়ে নাই,—অনেকসময় কেবল প্রকৃতির শোভা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। দুপ্রহরের রৌদ্র-দগ্ধ শরীর লইয়া, ভুবনেশ্বরীর মন্দির, বশিষ্টাশ্রম, অশ্বকান্ত প্রভৃতি পাহাড় সন্দর্শনে অনেক সময় ক্ষুধায় যে কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। পয়সা দিয়াও অনেক স্থানে কিছুই পাওয়া যায় নাই। প্রাণান্তেও লোকেরা কাহাকেও সাহায্য করিবে না। ব্যবসা বাণিজ্যও ইহারা বুঝে না। খাটী আসামীর দ্বারা পরিচালিত দোকান আমরা উপত্যকা প্রদেশে কোথাও দেখিলাম না। পথক্লান্ত বাঙ্গালী পথিক যদি আসাম-গৃহীর গৃহে ক্লান্তি দূর করিতে পারিত, তবে অনেক সহৃদয় সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয় যে ইহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আসামীদিগের নিকট বাঙ্গালীরা যেমন ব্যবহার পায়, বাঙ্গালীরাও আজকাল তেমনই ব্যবহার করেন। কেহ কাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না, করিলেও ইহাদিগকে প্রায়ই উপেক্ষা করিয়া থাকে। কেহই ইহাদের উন্নতির কথা ভাবে না। আসামের উন্নতি কেমনে হইবে, জানি না।

পাহাড়ীদিগের মধ্যে গারো, খাসিয়া, নাগারাই প্রধান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরো অনেক সামান্যং পাহাড়ী জাতি আছে;—ইহারাপ্রায়ই নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, সদিয়া হইতে ব্রহ্মকুণ্ড (ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান) তীর্থে যাঁহারা গমন করে, তাঁহাদের অনেকেরই ভাগ্যে স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে না। পাহাড়ীজাতিদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই চেষ্টিত, কিন্তু আজও সম্যক কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বলা যায় না। তবে অনেকটা যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গারো পাহাড়, খাসিয়া পাহাড় একপ্রকার গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিয়াছে। নাগা পাহাড় কতকাংশ গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়াছেন, কতক এখনও স্বাধীন। এই অসভ্য জাতি সকল নামত গবর্ণমেণ্টের অধীন হইলেও, ইহারা একপ্রকার স্বাধীন। খাসিয়া পাহাড়ের কথা এই প্রবন্ধে আমরা কিছু বিশেষ করিয়া বলিব। খাসিয়া পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে শিলং নামক স্থানে আসামের প্রধান কমিসনারের আফিসাদি স্থাপিত। খাসিয়া পাহাড় শ্রেণীর গৌহাটীর দিকের অংশ অরণ্যময়, বন্য হিংস্র জন্তু পরি পূর্ণ। শিলং পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ বৃক্ষশূন্য। শিলং পাহাড়ে কেবল অনেক সরল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌহাটী হইতে শিলং ৬৩ মাইল পথ; আবার শিলং হইতে শ্রীহট্ট ৬০ মাইল পথ; এই সমস্ত পথ আমরা হাটিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। গৌহাটি হইতে শিলং যাইতে বর্ণিহাট, নংপো, নয়াবাঙ্গলা প্রভৃতি কয়েকটী আড্ডা আছে। প্রত্যেক আড্ডায় গবর্ণমেণ্টের ডাক বাঙ্গালা আছে, এবং ইতর লোকদিগের জন্য এক এক খানি প্রকাণ্ড সরাই ঘর আছে। এই জনপ্রাণীহীন ভীষণ অরণ্যময় পাহাড়ে গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে এই রূপ সরাই স্থাপন করিয়া পথিকদিগের যে কি মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহা এক মুখে

বলা যায় না। মধ্যে মধ্যে এই রূপ আড্ডা না থাকিলে কেহ সে ভীষণ পথে চলিতে পারিত না, কেহ বন্য জন্তুর করাল গ্রাস হইতে রজনীতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিত না। অনেকে গৌহাটী হইতে শিলং পর্য্যন্ত টোঙ্গাতে এক দিনে গমন করেন; তাঁহাদের ভাগ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখা ঘটে কিনা,জানি না। গভীর নিস্তব্ধ ঘন বৃক্ষ রাজির ভিতরে ঝরণার কুল কুল শব্দ,প্রপাতের ঝর ঝর শব্দ,প্রভাত পাখীর মধুর কণ্ঠের স্বাধীন সঙ্গীত—প্রকৃতির মনোহর রূপ দেখিতে দেখিতে, উপভোগ করিতে করিতে যে কখনও সে বিজন পথে যায় নাই, সে নীরব জগতের ফুটিত সে গভীর সৌন্দর্য্য কি বুঝিবে? আমরা অনাহার ও অনিদ্রার পথকষ্ট সকলই ভুলিয়াছিলাম—প্রকৃতির সে নীরব অথচ জীবন্ত, ভীতিযুক্ত অথচ মধুময় শোভার মধুরিমা উপভোগ করিয়া। কখনও পদতল হইতে শ্বেতাভ পাতলা মেঘ ভাসিয়া উঠিতেছে,—কখনও ঘন গভীর কাল মেঘ ভীমরবে ডাকিয়া ডাকিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে,—কখনও বৃক্ষের ভিতর দিয়া মেঘ-রঞ্জিত ক্ষুদ্র সূর্য্যের রশ্মি বৃক্ষে বৃক্ষে পড়িতেছে, কোথাও ঝরণার কল কল নাদ, প্রস্তরভেদী প্রপাতের ঝর-ঝর রব আকাশে উঠিতেছে! পথ-কষ্ট ত দূরের কথা, জীবনের সকল সকল দুঃখ কয়েক দিনের জন্য ভুলিয়াছিলাম, সেই শিলং এবং চেরাপুঞ্জের বিজন পথে।

শিলং পাহাড়ের দৃশ্য অতি চমৎকার। সেখানে ভীতিযুক্ত অরণ্য নাই,—হিংস্র জন্তু নাই, ব্যাঘ্র ভল্লুক নাই, দস্যুর ভয় নাই। ঈশ্বরের কৃপায় তিন দিনের দিন আমরা সকল প্রকার হিংস্র জন্তুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শিলং পৌঁছিলাম। চতুর্দ্দিকে সরল বৃক্ষ শ্রেণী সোঁ সোঁ রবে বায়ু ভরে হেলিয়া দুলিয়া কত কি বলিতেছে,—কত কি নিস্তব্ধ ভাব ঢালিতেছে,—কত কি সুখের কথা প্রচার করিতেছে। দুই তিন দিন থাকিয়া আমরা দৃশ্য স্থানগুলি দেখিলাম। বাঙ্গালী এবং আসামী অনেক বন্ধুর সহিত হৃদ্যতা জন্মিল। যে কয়েকটী জলপ্রপাত সেখানে গভীর ভাব-মুক্তা ঢালিতেছে, তাহা দেখিলাম। শিলং-পিক নামক সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিরোহণ করিয়া অনন্ত পাহাড় শ্রেণীর অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিলাম। যেরূপ ভাষায় ব্যক্ত হয় না, যে সৌন্দর্য্য কথা বদ্ধ হয় না, তাহা বাস্তবিকই অনন্ত। পাহাড়ের নিম্নে পাহাড়, তাহার নিম্নে পাহাড়, তাহার নিম্নে আরো পাহাড়,—ক্রমাগত চতুর্দ্দিকে ক্রম-নিম্ন খোলা পাহাড় শ্রেণী শোভা পাইতেছে। সকলেরই উপরে সূর্য্যের রশ্মি প্রতিফলিত, সকলেরই উপরে বায়ু ভীষণরবে প্রবাহিত,—তাহার উপরে আমরা। কোথাও বৃক্ষ দৃষ্টিতে পড়েনা,—সব-শূন্য, সব অনাবৃত,—সব অনন্ত। অনন্তদেবের অনন্তরূপ সেখানে ফুটিয়া ফুটিয়া যেন পড়িতেছে! দেখিতে দেখিতে মেঘ উঠিল,—অনেক পাহাড়কে ঢাকিয়া ফেলিল। অনেক সময়, দেখিতে দেখিতে পাহাড় মেঘে যেমন সমুদ্রের ন্যায় হইয়া যায়; সে দিন তেমন হইল না। সূর্য্যের রশ্মি মাখা বায়ুর সহিত মেঘের ক্রীড়া বড়ই আনন্দপ্রদ বোধ হইয়াছিল। শিলং দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে তাহা কিছুই হয় নাই। আমার মন এক স্বাধীন জাতির ভবিষ্যত্ চিন্তায়

সদাই নিমগ্ন ছিল। সে জাতির নাম খাসিয়া জাতি। খাসিয়া পাহাড় শ্রেণী সমস্তই এক প্রকার স্বাধীন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল রাজা আছে, তাঁহারা অশিক্ষিত এবং অসভ্য, কিন্তু স্বাধীন। তাহারা গবর্ণমেণ্টকে কোন প্রকার কর দেয় না, বিচার বিধি ব্যবস্থা নিজেরাই করে, তবে হত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার-ভার গবর্ণমেণ্টের উপর তাহারা ন্যস্ত করে। প্রজারা নামত রাজার অধীন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা সকলেই এক প্রকার স্বাধীন। তাহাদিগকে জমীর খাজনা রাজাকে দিতে হয় না;—যাহার যত ইচ্ছা খোলা পাহাড়ে চাষ করিতে পারে। শিলং নগরের জন্য গবর্ণমেণ্ট কতকটা স্থান রাজার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন;—আর সমস্তই রাজার জমী। শিলং নগরে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে গৃহ-হিসাবে কিছু কিছু দিতে হয়। খাসিয়া পাহাড়ে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আলুর চাষ হইয়া থাকে। আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসে গিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, কোন স্থান হইতে কৃষকেরা আলু তুলিতেছে, আর কোথাও বা রোপণ করিতেছে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই চাষ করে। কোথাও কোথাও ধানের চাষও হয়। শিলং থাকিতে থাকিতেই, হাটে বাজারে, রাস্তা ঘাটে খাসিয়া স্ত্রী পুরুষ দেখিলাম। তাহাদিগের বলিষ্ঠ কর্ম্মপটু শরীর দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সবলকায়,—দৃঢ়, কর্ম্মঠ। স্ত্রী পুরুষ সকলেই চাষ বাস করিয়া থাকে, কাঠ কাটে, অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্যই করে। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই, বাল্যবিবাহ নাই, বিধবা বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত আছে। আসামের উপত্যকার নিম্ন জাতি সকল যেমনই নীতিহীনতার পূর্ণ বিকাশ, খাসিয়া জাতি তেমন নহে। ইহাদের নিকট সতীত্বের আদর আছে। দুঃখের বিষয়, শিলং নগরে, সাহেব এবং বাঙ্গালীর দৌরাত্ম্যে, কোন কোন খাসিয়া রমণী স্বৈরিণীর ঘৃণিত ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। খাসিয়া জাতির বর্ণ উজ্জ্বল—রক্তাভ কাঁচা সোণার ন্যায়। রমণীদিগের মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পুতুল পূজা করে না। রূপান্তরে এক ঈশ্বরকেই মানে। পূজা অর্চ্চনা বড় একটা করে না। ইহাদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অনেক নিঃস্বার্থ ইংরাজ-মিশনরি খাসিয়াপাহাড়ে বাস করিতেছেন। ইহাদিগের চেষ্টায় অনেকে শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, সভ্যতার আস্বাদন পাইয়াছে। অনেকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মও পাইয়াছে।

আমরা শিলং হইতে চেরাপুঞ্জি যখন রওয়ানা হইলাম, তখন কোন বন্ধু আমাদিগের সহিত দুইজন রমণী মুটে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদিগের ভাষা আমরা বুঝি না, আমাদের ভাষা তাহারা বুঝে না, অথচ আমরা অপরিচিত রাজ্যে ইহাদিগের সহিত চলিলাম। বিশ্বাস এইছিল যে, ইহারা কখনও প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা করিবে না। বন্ধুদিগের সকলেই বলিয়াছিলেন, ইহারা প্রবঞ্চনা করিতে জানে না। শুনিয়াছি, কার্য্যোপলক্ষে ইহারা সরকারী জেলখানা হইতে সময়ে সময়ে পলায়ন করে বটে, কিন্তু কার্য্য শেষে আপনাআপনি আবার ফিরিয়া আসিয়া থাকে। শিলং হইতে চেরাপুঞ্জির পথ বড়ই সুন্দর—বৃক্ষ হীন, সাড়া শব্দ হীন—প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধ

ভাবে পূর্ণ। এমন গভীর জীবন্ত নিস্তব্ধতা আমি আর কোথাও দেখি নাই। গিরি-শঙ্কটের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের গায়ে গায়ে পড়িয়া মধ্যে মধ্যে ঝরণার সোঁ সোঁ শব্দ সে নিস্তব্ধতাকে ভেদ করিতেছে, শুনা যায়। সে যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমি লিখিতে পারি না। এই পথে দ্বিতীয় দিনে কিছু জনতা দেখিলাম। মন্‌ক্রিন নামক স্থানের রাজার বাড়ীতে নৃত্য হইবে, আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। পথের মধ্যে দেখিলাম, দলে দলে স্ত্রীপুরুষ, কেহ বা হাটিয়া, কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা লোকের পৃষ্ঠে * মন্‌ক্রিনের দিকে যাইতেছে। খাসিয়া রমণীদিগের বস্ত্র-ব্যবহার প্রণালী অতি সুন্দর, অতি পরিপাটী। কোন সভ্য জাতির মধ্যেও এরূপ কাপড় পরার রীতি আছে কি না, সন্দেহ। মস্তক ভিন্ন ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে সুপ্রণালীতে আবৃত। ইয়ুরোপীয় মহিলাগণের বক্ষস্থল আবৃত থাকিয়াও যে প্রকার কুৎসিত রুচির পরিচয় দেয়, ইহারা তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। ইহাদিগের কোন অঙ্গই ঐরূপ কুরুচির পরিচয় দেয় না। রমণীদিগকে প্রফুল্ল, বলিষ্ঠ, সুস্থ, মিষ্টভাষী, ও বিনয়ী বলিয়া বোধ হইল। অনেকের নিকট ইহাদিগের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিলাম। ভারতবর্ষের অসভ্য জাতি খাসিয়া রমণীদিগকে স্বাধীন ভাবে ভ্রমণ করিতে, কার্য্য করিতে দেখিয়া প্রাণে যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব? দেখিলাম, কোথাও ইহারা কাঠ কাটিতেছে, কোথাও মাটী খুড়িতেছে, কোথাও মোট বহিয়া যাইতেছে। আমরা এই আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে, পাহাড়ের উপর দিয়া হাটিয়া, যথা সময়ে চেরাপুঞ্জি পৌছিলাম। চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই খানেই ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের প্রধান আড্ডা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টিপাতের জন্য গবর্ণমেণ্টের আফিসাদি উঠিয়া শিলং গিয়াছে। চেরাপুঞ্জি খাসিয়াদিগের প্রধান পুঞ্জি। এখানে খ্রীষ্টানদিগের একটী স্কুল আছে, রাজারবাড়ী আছে, পোষ্টাফিস আছে। এতদ্ভিন্ন ডাকবাঙ্গালা ও পূর্ব্বের ভগ্ন অট্টালিকার অবশিষ্টাংশ অনেক আছে। চেরাপুঞ্জির প্রাকৃতিক শোভা মনোহর। এখানে প্রায় বার মাস কিছু কিছু শীত থাকে। কয়েলার খনি, চূণের খনি, চেরাপুঞ্জিতে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। চেরাপুঞ্জির অতি নিকটে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মস্‌মাই-জল-প্রপাত! উচ্চতায় ইহার সমান জল-প্রপাত পৃথিবীতে আর নাই। থারিয়াঘাট হইতে চেরাপুঞ্জি পর্য্যন্ত ট্রাম রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, সত্বরই খুলিবে। স্থানে স্থানে ট্রাম রাস্তা ৫০০,৬০০ শত ফিট প্রায়-লম্বভাবে উঠিয়াছে। এ প্রকার ট্রাম পৃথিবীর মধ্যে আর কেবল আল্পস্‌-পর্ব্বতে আছে। যে সকল স্থানে রাস্তা প্রায়-লম্ব ভাবে উঠিয়াছে, সে সকল স্থানে হাইড্রলিক-প্রেসার দ্বারা গাড়ী টানিয়া তোলা হইবে। ট্রাম রাস্তা খুলিলে চেরাপুঞ্জি একটা বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইয়া উঠিবে। চেরাপুঞ্জিতে খ্রীষ্টান মিসনরিগণ প্রভূত কার্য্য করিয়াছেন;—অনেক গুলি পরিবারকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একটী

* শিলং অঞ্চলে, থারিয়াঘাট পর্য্যন্ত থোবার চলন আছে। বাহকেরা পীঠে মোড়ায় বসাইয়া পথিকদিগকে লইয়া যায়।

নূতন পল্লী সংস্থাপন করিয়াছেন। চেরাপুঞ্জির স্বাধীন রাজার ভ্রাতা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। যাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য। ইহাদের মধ্যে বড় ছোট ভেদাভেদ নাই;—রাজ পরিবারের মেয়েরা পর্য্যন্ত বাজারে যাইয়া ক্রয় বিক্রয় করে। যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত অপর খাসিয়াদিগের আদান প্রদান এবং আহার বিহার চলিয়া থাকে। খাসিয়ারা বরাহ মাংস প্রিয়। এই জন্য ইহাদিগের প্রতি কাহারও কাহারও ঘৃণা দেখা যায়; কিন্তু ইহাদিগের স্বভাব চরিত্র বড় ভাল। খাসিয়া-রমণীর সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ অনেক বাঙ্গালী ইহাদিগের সহবাস-লালায়িত, কিন্তু সামাজিক শাসনের ভয়ে কেহই ইহাদিগকে প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নয়। শ্রীহট্ট-বাসী এক জন সম্ভ্রান্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মা কেবল প্রকাশ্যে খাসিয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটী কন্যা হইয়াছে; আজিও তাহাদিগের বিবাহ হয় নাই। খাসিয়ারা বড়ই বাঙ্গালী ভক্ত—বাঙ্গালীদিগকে ইহারা বড়ই শ্রদ্ধা করে। যে সকল খাসিয়া শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাদিগের ইচ্ছা, বাঙ্গালীর সহিত আদান প্রদান চলে,—বাঙ্গালীর সহিত বিবাহাদি দিতে অনেকেরই ইচ্ছা। বাঙ্গালীকে বিবাহ করিতে অনেক বালিকার বাসনা আছে। খ্রীষ্টিয় মিসনারিরা যে প্রকার স্কুল করিয়াছেন, কোন বাঙ্গালী যদি সেই প্রকার চেরাপুঞ্জিতে একটী স্কুল স্থাপন করেন, তবে অনেক বালক বালিকা বাঙ্গালা পড়িতে প্রস্তুত আছে। শুনিলাম, চেরাপুঞ্জির রাজার আন্তরিক ইচ্ছা, সেখানে একটী বাঙ্গালা স্কুল হয়। আমরা রাজার সহিত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু রাজা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। এই অসভ্য জাতির মধ্যে এমন অনেক মহত্ত্বের অস্ফুট লক্ষণ দেখা যায়, যাহাতে স্পষ্ট মনে হয়, সুশিক্ষিত হইলে, বলে কৌশলে, বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহারা কালে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, ইহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার লিখিতে পারিলাম না। বাল্য বিবাহ প্রচলিত না থাকায়,ইহাদিগের মধ্যে মনোনয়ন প্রথা মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহভঙ্গ প্রথাও প্রচলিত আছে। কিন্তু যত দিন প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ ভঙ্গ না হইবে, তত দিন ইহারা অন্য কাহারও সহবাস করে না। মৃত ব্যক্তির প্রতি ইহাদের বড়ই সম্মান। পরিবারের কেহ মরিলে, যত দিন সমস্ত আত্মীয় বান্ধব মিলিত না হয়, তত দিন তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয় না। এই প্রকারে কখনও কখনও এক বৎসর, কখনও বা দুই বৎসর পর্য্যন্ত, মৃত দেহ রক্ষিত হয়। সমাধির উপরে ইহারা বড় বড় প্রস্তর খণ্ড চিহ্ন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারা যুদ্ধের সময় তীর ধনুক ব্যবহার করিয়া থাকে।

আমার মনে এই গভীর প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল, এবং আজও তাহা মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছে,—আমাদের মধ্যে কেহ কি এমন ব্যক্তি নাই, যিনি এই খাসিয়া জাতির উন্নতির জন্য জীবন ক্ষয় করিতে পারেন? আমরা আজ কাল বড়ই সাহেব-ঘৃণা শিখিয়াছি, কথায় কথায় সাহেবদিগের নিন্দা করিয়া থাকি, কিন্তু এই সাহেবদিগের কত মহাত্মা, জীবনের

সকল প্রকার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া যে ভারতের কত অসভ্য জাতির কত মহৎ উপকার করিতেছেন, ভাবিলে অবাক হইতে হয়! আমরা আমাদের দেশীয়দিগের জন্য কিছুই করিতে পারি না, আর ইহাঁরা, একমাত্র ধর্ম্মের আকর্ষণে,কত দূর দেশ হইতে আসিয়া কি মহৎ কার্য্য করিতেছেন। বাঙ্গালা প্রদেশ লোকসংখ্যার আধিক্যে প্রপীড়িত, কিন্তু আসাম অরণ্যে পরিপূর্ণ, চাষ করিবার লোক নাই। কেহ মনে ভাবিবেন না, আসাম অনুর্ব্বর ক্ষেত্র। আসামের ন্যায় উর্ব্বর ক্ষেত্র বাঙ্গালায় নাই। এই আসামের অর্দ্ধেকেরও অধিক স্থান অনাবাদি পড়িয়া আছে। খাসিয়াপাহাড় অনেক স্থানেই অনাবাদি। আমাদের দেশের কোন কোন মহাত্মা যদি আসামকে জীবনের লক্ষ্য করিতে পারেন, তবে সে সকল দেশেরও উপকার হয়, আমাদের দারিদ্র্য ও দূর হয়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, একজন বাঙ্গালীকে দেখিলাম না, যিনি আসামের উন্নতির জন্য বিশেষতঃ উর্ব্বর কর্ষিত-ক্ষেত্র খাসিয়াদিগের উন্নতির জন্য কিছু করিতেছেন! এ কলঙ্ক, এদুঃখ আর রাখিবার স্থান নাই। গৃহের পার্শ্বে, বঙ্গের কোলে, আসামের কত অভাব দেখিয়া আমরা কিছুই করিতেছি না! কেবল কথায় কি দেশ উদ্ধার করা হয়? জীবন-রক্ত ঢালিয়া দিয়া যদি আসামের উন্নতির জন্য কেহ চেষ্টা করিতে পারেন, তবে তিনিই দেশ উদ্ধারের বীজমন্ত্র বপন করিবেন। এমন উর্ব্বর অনাবিল ক্ষেত্র ভারতের আর কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। এই সময়ে কেহ যদি এই বিভাগে কর্ত্তব্য-চক্ষুকে ফিরান, তবে দেখিবেন, বুঝিবেন, তাঁহার দ্বারা কি মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। চেরাপুঞ্জিতে একটী স্কুল স্থাপন করিয়া, খাসিয়াদিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিতে পারিলে এবং বাঙ্গালীর রক্তে খাসিয়ার রক্ত মিশ্রিত হইলে যে বংশ উৎপন্ন হইবে, তাহাদের দ্বারা ভারতের অনেক অভাব দূর হইতে পারিবে। নিশ্চয় দূর হইবে। চেরাপুঞ্জির বায়ু কোন অংশে দারজিলিঙ্গ অপেক্ষা মন্দ নহে। ক্ষেত্রের ত কথাই নাই। এই স্থানে যদি ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত বাঙ্গলার দরিদ্র পরিবার সকল যাইয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন, এবং খাসিয়াদিগের সহিত সামাজিক আচার ব্যবহারে মিলিত হন, তবে কালে বাঙ্গালীর আদর্শে, ইহাদিগের অনেক উপকার হইবে, এবং কালে ইহাদিগের দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। কিন্তু বাঙ্গলায় এমন লোক কোথায়? এমন সহৃদয়, সমদুঃখী কে আছেন, যিনি বক্তৃতা ছাড়িয়া কার্য্যে মনোযোগী হইবেন,—যশের আশা ছাড়িয়া জীবনকে নির্জ্জন প্রদেশে ভাসাইবেন,—কল্পিত সুখকে উপেক্ষা করিয়া পরের উপকারে মনোযোগী হইবেন! যত দিন এপ্রকার লোকের অভ্যুদয় অসম্ভব, ততদিন যেন বাঙ্গালী ইংরাজকে ঘৃণা না করে। হায়, যে ইংরাজদের অসংখ্য অসংখ্য মহাত্মা পরের উন্নতির জন্য অক্লেশে জীবন দিতেছেন, তাঁহাদের মহত্বে কি ভারত কখনও দীক্ষিত হইবে না? ইংরাজের দোষালোচনা লইয়াই কেবল যে রহিল, সে আর এই জাতির মহত্ব কি বুঝিবে?

আমি-তত্ত্ব।

পৃথিবীতে আমি মহাশয়ের বড়ই দৌরাত্ম্য। ইহাঁর গৌরবের ঘটায়, বাক্যের ছটায় প্রাণ জ্বালাতন, হাড় ভাজা ভাজা। ঐ যে দেখিতেছ, অমুক ব্যক্তি, আজ কাল বড়মানুষ বিদ্বান্ যশস্বী হইয়া লোকের প্রশংসা সংগ্রহ করিতেছে, উহাকে এত বড় করিল কে বল দেখি? শর্ম্মারাম! আমিই উহাকে মানুষ করিয়াছি, কিন্তু এখন সে তাহা স্বীকার করে না। বঙ্গ-সমাজের মধ্যে যে কিছু উন্নতি দেখিতে পাও, ইহার অধিকাংশ আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। আর একটা আমি সে কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, কি! এমন কথা! ও কি জানে না কাহার অন্নে ও মানুষ? আমার পিতামহ মানগোবিন্দ মজুমদারের বাসায় উহার বাপ সরকার ছিল, মা ছিল রাঁধুনী ব্রাহ্মণী, সে কথা কি অকৃতজ্ঞ জীব এখন ভুলিয়া গিয়াছে? কোন আমি মহাশয়ের পদই নিরাপদ নহে। উভয় আমির বিবাদ দেখিয়া তৃতীয় আমি বলিলেন, ডারুইনের মতে তোমরা দুইজনই হনুমানের প্রপৌত্র, বনমানুষের পৌত্র এবং ধাঙ্গড়ের পুত্র, কেন আর তবে আমি আমি করিয়া মরিতেছ, আমিটে কে তাহা অগ্রে অন্বেষণ করিয়া দেখ।

তাঁহার কথায় প্রথম আমিটে আরো চটিয়া উঠিল, এবং আত্মগৌরবে স্ফীত হইয়া সে আপনাকে আরও বড় মনে করিতে লাগিল। কিন্তু দ্বিতীয় আমি নীরব হইল, এবং চিন্তা করিতে লাগিল। যখন চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল, তখন তৃতীয় আমির কথায় আর সে রাগ করিতে পারিল না। বরং বিমর্ষভাবে মানবজীবনের আদিতত্ত্ব অনুসন্ধানে আরও নিমগ্ন হইল। যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই আমি মহাশয়ের বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত স্থূল দেহ খানি ক্রমে যেন শুষ্ক হইতে লাগিল। রাজ্য ঐশ্বর্য্য, মান সম্ভ্রম ক্রমে কমিয়া আসিল। যে দেহের এবং যে বংশমর্য্যাদা ও জাতি কুলের অভিমানে এত দিন তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইত, তাহার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দেখিলেন, তৃতীয় আমি যাহা বলিয়াছে তাহা নিতান্ত সত্য কথা। তখন তাঁহার মনে বৈরাগ্য এবং তৎসঙ্গে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার-ব্যবহার পাঠ করিয়া শেষ আপনার প্রতি স তাঁহার মহা ঘৃণা জন্মিল, তখন ভাবিলেন, হায়! এই দেহের এত অহঙ্কার! যখন বংশ, দেহ, জাতি কুলের অভিমান এইরূপে চূর্ণ হইল, তখন তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মহা অন্ধকার, অনন্ত অন্ধকার, অকূল অসীম আকাশের ঊর্দ্ধে অধোতে কেবলই অন্ধকার।

অনন্তর আমি মহাশয় সেই নিবিড় অন্ধকার সাগরে পথহারা হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল বিচরণের পর দেখিলেন, সেই অন্ধকার রাশির মধ্যে আমি ভূত হইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে! বিচারালোকের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সে ক্ষণকালের জন্য আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু মরে নাই। জ্ঞানালোকের অন্তরালে

যে কিঞ্চিৎ অন্ধকার সঞ্চিত ছিল, তাহার মধ্যে বসিয়া সে এক একবার দাঁত খিচাইতে লাগিল। তাহার হনুমানপ্রকৃতি তথনও যায় নাই, কেবল একটু দুর্ব্বল হইয়াছে মাত্র। আমি মহাশয় অন্ধকারে ভূত হইয়া কখন বিকট বদনে লম্ফ ঝম্প প্রদান করেন, কখন আবার আপনি আপনার মুর্ত্তি দেখিয়া ভীত হন। শেষ তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন,বানরবংশসম্ভূত দেহ ব্যতীত আর এক সূক্ষ্ম আমি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে আমিত্ব ভূত ঘাড়ে চাপিয়া দেহাভিমান জন্মাইয়াছিল, এখনও সে আত্মাভিমানে বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি আত্মতত্বানুসন্ধানের জন্য আরও একটী নিম্ন স্তরে অবরোহণ করিলেন।

এইরূপে নামিতে নামিতে যতই তিনি আপনি আপনার নিকট পৌছিতে লাগিলেন, ততই বুঝিতে পারিলেন, সমস্তই মায়ার খেলা। দেহাভিমান, আত্মাভিমান, কেবলই ফাঁকির ব্যাপার। এখন তিনি যেখানে যান, যেটা ধরেন, দেখেন যে সকলেই বলে ব্রহ্ম! ব্রহ্ম! আমির আর নাম গন্ধ সেখানে নাই, তাহার পর অনেক দূর নীচে নামিয়া দেখিলেন, অতি সামান্য একটু খানি রাজ্য, গোটা কতক সিপাই তাহার চারিদিকে প্রহরী, বিশেষ জাক জমক কিছুই নাই। কিন্তু তাহারই ভিতর আবার আমি মহাশয় এক জন আমীর এবং স্বাধীন রাজা। তিনি সেখানে স্বাধীন বলিলেও হয়, আবার একান্ত অধীন দাস বলিলেও হয়। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল, সে সিপাই গুলিও তাঁহার নিজের নয়, যিনি সেখানে রেসিডেন্ট থাকেন, তাঁহারই। রাজা বাহাদুর যদি একটু অন্যায় কাজ বা মন্দ চিন্তা করেন, অমনি রেসিডেন্ট তাঁহার কাণ মলিয়া দিতে আইসে। রাজার সমস্ত কার্য্যের সাক্ষী হইয়া সে বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে, একটু দোষ পাইলে তৎক্ষণাৎ অমনি তাহা সম্রাটের নিকট বলিয়া পাঠাইবে। এই সমস্ত দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, এবং স্বচক্ষে রাজার দুর্গতি দেখিয়া আমি মহাশয় কপালে হাত দিয়া বলিলেন, হা দশা! এই বুঝি তোমার স্বাধীন রাজত্ব! ইহারই আবার এত বড়াই! রেসিডেন্টের নাম শ্রীবিবেকচন্দ্র রায় বাহাদুর। তাঁহার তাড়নার উৎপাতে রাজা সর্ব্বদাই অস্থির।

অবশেষে এই স্থির হইল, আমি যিনি, তিনি সমস্তই ফাঁকি; কেবল বৃথা গোল করিয়া পৃথিবীতে এত দিন বেড়াইয়াছেন। এক অঙ্গুলি স্থানও তাঁহার নাই, স্বাধীনতা কেবল তাঁহার নাম মাত্র। আত্মচিন্তাকে কমিসন্ নিযুক্ত করাতে এত দিনে তাঁহার সকল জুয়াচুরি প্রতারণা ধরা পড়িল। কাজেই তিনি লজ্জায় আর তখন মাথা তুলিতে পারেন না, অপমানে তৃণ হইয়া মাটীতে মিশাইয়া গেলেন। আমি মহাশয় নিজের নামে যে কিছু কার্য্য পৃথিবীতে এত দিন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিমিত্ত বিষম দণ্ড প্রতীক্ষা করিতেছে। হিসাব নিষ্পত্তির পর অবশিষ্ট যাহা কিছু তাঁহার রহিল, তাহার লক্ষণ এই ;—তিনি সর্ব্বগত এক অনন্ত জলদগ্নি রাশির কিঞ্চিৎ উত্তাপ, মহাসমুদ্রের এক বিন্দু বারি, বিশ্বব্যাপী এক প্রকাণ্ড পদার্থের ছায়া, বিস্তীর্ণ আকাশে অসীম বায়ু মণ্ডলস্থ নিত্যস্থায়ী এক মহানাদের ক্ষণস্থায়ী প্রতিধ্বনি ও অনন্ত কল্পতরুর শাখাগ্রভাগের

একটী ক্ষুদ্র পল্লবাঙ্কুর। ইহা ভিন্ন আর তিনি কিছুই নহেন। এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়া, দেখিয়া বুঝিয়া পুনরায় যদি আমি মহাশয় পূর্ব্ববৎ গ্রীবা বক্র এবং শিরঃ সঞ্চালন করেন, তাহা হইলে তিনি নিতান্ত মূর্খ, নির্লজ্জ এবং ভূতগ্রস্ত জীব।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা

সামাজিক ব্যাধি।

রোগের কারণ নির্ণয়।

বর্ত্তমান সময় ইংলণ্ড ও এদেশে আন্দোলন চলিতেছে। এই উভয় আন্দোলনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রকৃতি এক। ইংরাজগণ আপনাদের বালিকাদের নীতি রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন—বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ এতদ্দেশীয় বালকদিগের নীতি রক্ষার জন্য চিন্তা করিতেছেন। ইংরাজী সংবাদ পত্র পাঠ করা যাঁহাদের অভ্যাস আছে, তাঁহারা ইংলণ্ডের বর্ত্তমান আন্দোলন বিষয়ক অনেক কথাই জানিয়াছেন, সে সকলের পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন; তথাপি অপরাপর পাঠকদিগের অবগতির জন্য তৎসংক্রান্ত স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ব্যাপারটা এই;—ইংলণ্ডে অনেক দরিদ্রের কন্যা, কর্ম্ম কাজের আশায় মফস্বল হইতে লণ্ডন সহরে আসিয়া থাকে। এই সকল বালিকাদিগের মধ্যে কেহ বা দরজীর দোকানে, কেহ বা পোষাক-বিক্রেতার দোকানে, কেহ বা মনিহারীর দোকানে, কেহ বা কলে, কেহ বা লোকের বাড়ীতে দাসীরূপে কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। আজি কালি অনেক বালিকা টেলিগ্রাফ আপীষে, ও অন্যান্য আপীষে কর্ম্ম করিয়া থাকে। এই সকল বালিকাদের অধিকাংশের বয়ক্রম ১২। ১৩ হইতে ২৪।২৫ পর্য্যন্ত। ইহাদের অনেকের পিতামাতা সঙ্গে থাকে না। ইহারা অনেক সময় স্বীয় স্বীয় দোকানের অধ্যক্ষদিগের অধীন বাসা বাড়ীতে বাস করে, কোন কোন স্থলে এক এক জন বাড়ীওয়ালীর ভাড়াটিয়া ভবনে দশ বারটী মেয়ে একত্র হইয়া বাস করে। যাহাদের জনক জননীগণও সহরে আছে, তাহাদিগকেও দৈহিক শ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়; তদ্ভিন্ন তাহাদের পিতামাতা সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না।

বিগত কয়েক বৎসর একটী বিশেষ কারণে এই শ্রমিক বালিকার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ইংলণ্ডে "ট্রেড ইউনিয়ন" নামে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মঘট আছে। শ্রমিকদিগের মাহিয়ানার হার বৃদ্ধি করা ঐ ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে কল বা অন্যান্য কারখানার অধ্যক্ষগণ স্বীয় স্বীয় অধীনস্থ শ্রমিকদিগকে গুরুতর পরিশ্রম করাইতেন, অথচ উপযুক্ত রূপ বেতন দিতেন না। সেই জন্য শ্রমজীবীগণ "ট্রেড ইউনিয়ন" নামক সভা স্থাপন করিয়া, ধর্ম্ম-ঘট পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় বেতন বৃদ্ধি করিয়াছে। পুরুষ শ্রমিক-

দিগের অধিকাংশই এই ধর্ম্ম-ঘটের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিয়া কর্ম্ম করান দুষ্কর। কারখানার অধ্যক্ষগণ দেখিয়াছেন যে, পুরুষদিগের দ্বারা যে কাজ হইত, সুস্থ ও সবল বালিকাদিগের দ্বারা সেই কাজ অল্প ব্যয়ে হইতে পারে; এই জন্য অনেক কারখানাতে পুরুষের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোক শ্রমিক লওয়া হইয়াছে। এইরূপে লণ্ডন সহরে শ্রমার্থিনী যুবতীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইংলণ্ড মফস্বলের গ্রাম ও জনপদ সমূহে এই বার্ত্তা প্রচার হইয়াছে যে, লণ্ডন সহরে গেলেই কর্ম্ম জুটিতে পারে। এই বার্ত্তা প্রচার হওয়াতে, দলে দলে অরক্ষিতা যুবতী স্ত্রীলোক, এমন কি অনেক সুকুমারমতি বালিকা, কোন এক জন বন্ধুকে অবলম্বনমাত্র করিয়া লণ্ডনে আসিতেছে। এতদ্দেশে যেমন বর্দ্ধমান, হুগলী নদীয়া, প্রভৃতি জেলার অনেক চাষা লোকের মেয়ে ঝি হইবার আশায় কলিকাতার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেখানেও সেইরূপ বহু সংখ্যক পাড়াগেঁয়ে মেয়ে লণ্ডন সহরে আসিয়া থাকে। এই যে সহস্র সহস্র দরিদ্রের কন্যা কর্ম্মের প্রত্যাশায় সহরে আসে, ইহাদের পথে এক ঘোর বিপদ আছে। ইহারা যখন কর্ম্মের প্রত্যাশায় নিরাশ অন্তরে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন একদল পাপ পিশাচের অনুচর নরশত্রু ইহাদিগকে ধরে। এতদ্দেশে কুলি এজেণ্ট ও আড়কাটিদিগের প্রতারণার কথা অনেকেই জানেন। কখনও বা শুনা গেল যে, একজন দরিদ্র কায়স্থের সন্তান কর্ম্মের আশায় কলিকাতায় আসিতেছিল, একটী দোকানে কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য বসিয়া আছে, এমন সময়ে এক জন ভদ্র বেশধারী লোক আসিয়া অনেক মিষ্ট আলাপে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া বলিল;—"মহাশয়, আমি আপনাকে একটী উৎকৃষ্ট স্থানে কর্ম্ম জুটাইয়া দিতে পারি, কলিকাতা হইতে গাড়িতে কিছু দূরে যাইতে হইবে, সেখানে গিয়া সকল প্রকার সুবিধা পাইবেন। তবে অগ্রে আমি একজন সাহেবের নিকট লইয়া যাইব, সে আপনাকে ভয় দেখাইয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে আপনি ফিরিবেন না, আমি যেখানে হাঁ বলিতে বলিব, সেখানে হাঁ বলিবেন, যেখানে না বলিতে বলিব, সেখানে 'না' বলিবেন।" এইরূপে গড়িয়া পিটিয়া, বুঝাইয়া শিখাইয়া, সেই হতভাগাকে কুলি ইনস্পেক্টরের নিকট উপস্থিত করিল। ইনস্পেক্টর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাইতেছে। বিশেষ সমুদায় ঠিক হইয়া গেল; হতভাগ্য ব্যক্তি জাহাজে বা গাড়িতে আরোহণ করিল, ক্রমে আসামের চা বাগানে গিয়া উপনীত হইল। তখন দেখে, সে চা বাগানে দাসত্ব করিবার জন্য কয়েক বৎসরের মত বিক্রীত হইয়াছে। যে নীচ কার্য্য জীবনে করে নাই, তাহা করিতে হইতেছে; যে নীচ সঙ্গে কখনও মেশে নাই, সেরূপ সঙ্গে মিশিতে হইতেছে। আড়কাটিদিগের এইরূপ প্রবঞ্চনার কথা শ্রবণ করিয়া আমরা সময়ে সময়ে মনে কত কষ্ট পাইয়াছি!

লণ্ডনে যে সকল বালিকা কর্ম্ম-প্রার্থিনী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের অনেকেরও এই দশা ঘটে। তাহাদের অধিকাংশই একে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, তাহাতে দারিদ্র্যের ভাবনায় প্রাণ অস্থির। এই সুযোগ পাইয়া উক্ত নরপিশাচদিগের অনুচরগণ ইহাদি-

গকে আসিয়া ধরে। ইন্দ্রিয়াসক্ত ধনিদিগের ইন্দ্রিয় সেবার জন্য বালিকা ধরিয়া দেওয়া ইহাদের ব্যবসায়। এই ব্যবসায় দ্বারা ইহারা বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করে। চতুর শৃগাল যেমন মেষের খোঁয়াড়ের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ এই বিকৃত-হৃদয়, দয়ামায়াহীন নরনারীগণ, লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় বালিকা ও যুবতী ধরিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি কোন মেয়েকে হাবা হাবা বা বিষন্ন বা পোষাকপ্রিয় ও হাব-ভাব-শালিনী দেখিতে পায়, অমনি তাহাকে বধ্য বলিয়া স্থির করে ও অমৃত সুধা রসনাতে লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়; এবং বাৎসল্য ও স্নেহ দেখাইয়া তাহাদিগের মন মুগ্ধ করে। তৎপরে হয় তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিতে সম্মত করে, না হয়, প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক একটা বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিপদে ফেলিয়া ঐ কার্য্যে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করে। কখন কখনও ইহাদের অনেককে এই জঘন্য কার্য্যের জন্য ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশে প্রেরণ করা যায়। ধনিদিগের হৃদয় কি নিদারুণ! এই সকল অসহায়া, সরলমতি ও নির্ব্বোধ বালিকার সর্ব্বনাশ করাতে ইহাঁদের বিশেষ আনন্দ! যাহার নীতি দূষিত হয় নাই, তাহাকে দূষিত করাতে বিশেষ আমোদ! যে সুকোমল বয়সে প্রত্যেক বালিকা কৃপা ও স্নেহের পাত্রী, তাঁহাদের নিজের গৃহে যে বয়সের বালক বালিকাগণ তাঁহাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সুখে বাস করিতেছে, সেই সুকোমল বয়সে, তাঁহারা সরলমতি বালিকাদিগকে জন্মের মত কুলের বাহির করিয়া ও পাপে প্রবৃত্ত করিয়া আনন্দ লাভ করেন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, এক লণ্ডন সহরে অন্ততঃ ৫০০০ বালিকা আছে, যাহাদের বয়ঃক্রম ১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে, অথচ যাহারা ইতি মধ্যেই পাপ পথে পদার্পণ করিয়াছে। হা ধর্ম্ম! মানব সমাজে এত অত্যাচারও সহ্য হয়!

এই রূপ ব্যাপার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডের সহৃদয় ব্যক্তিগণ পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে এই জঘন্য আচরণ নিবারণের জন্য অনেক প্রস্তাব ও উপস্থিত করা হইয়াছে। সম্প্রতি পার্লেমেণ্ট সভায় এতদর্থে একটী নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইবার কথা হয়। এই সুযোগে "পেল মেল গেজেট" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক এতৎ সংক্রান্ত কতকগুলি ভয়ানক বীভৎস ব্যাপারের বিবরণ মুদ্রিত করেন। এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। লোকের মন কতদূর উত্তেজিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বালিকাদিগের রক্ষার জন্য কিছু দিন হইল পার্লেমেণ্ট মহা সভায় একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হয়, তাহাতে এত লোকে স্বাক্ষর করিয়াছে যে, স্বাক্ষরের কাগজে কাগজ যুড়িতে যুড়িতে কয়েক মাইল লম্বা হইয়াছে; শত শত ব্যক্তি বাদ্যোদ্যম সহকারে ঐ আবেদন বহন করিয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করে। (২য়) পেল মেল গেজেটের যে যে সংখ্যক পত্র ঐ সকল বিষয় প্রকাশিত

হয়, তাহা কিনিবার জন্য এত লোকের ভিড় হইয়াছিল যে, মুদ্রাকরগণ লক্ষ লক্ষ কাগজ মুদ্রিত করিয়াও যোগাইতে পারে নাই। অবশেষে সমাগত লোকগণ অসহিষ্ণু হইয়া উক্ত পত্রের আপীষের জানালা দরজা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। (৩য়) এই জঘন্য পাপাচার নিবারণের জন্য হাইড পার্ক নামক উদ্যানে অনাবৃত স্থানে এক মেলা হয়, তাহাতে প্রায় এক লক্ষের উপরে লোক সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে ৩৩ দল ব্যাণ্ড, ও ১৪০ টী নিশান ছিল, এমন উত্তেজনা কেহ কখনও দেখে নাই। ইংলণ্ডের নর নারী যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে,কেবল একই কথা। সকলেই বলিতেছে—'এরূপ পাপাচরণ ত্বরায় দমন কর। আমাদের কন্যাদিগকে ধনিদের অত্যাচার হইতে রক্ষা কর।' বজ্র নির্ঘোষে এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে। সুপ্তোত্থিত প্রকুপিত সিংহের ন্যায় সমুদায় ইংলণ্ড গাত্র বিধূনন করিয়া মর্ম্মর ধ্বনিতে গগন মেদিনী কাঁপাইতেছে। কি ভয়ানক আন্দোলন!! এই আন্দোলনের শুভফল ইতি মধ্যেই ফলিয়াছে। যে নূতন রাজবিধি পার্লেমেণ্ট মহাসভার বিচারাধীন ছিল, তাহাতে অনেক কঠিন নিয়ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত কঠোর নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

(১ম) ১৩ বৎসরের ও ন্যূন বয়স্কা বালিকাকে যদি কেহ তাহার সম্মতি বা অসম্মতিতে বিপথে প্রবৃত্ত করে, তাহাকে যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত করা হইবে।

(২য়) ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকাকে তাহার সম্মতি বা অসম্মতিতে ঐ রূপ করিলে, দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

৩। অল্প বয়স্ক বালকগণকে ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকার প্রতি ঐরূপ অন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিলে বেত্রাঘাত দণ্ড করা হইবে।

৪। কোন ভদ্র লোকের যদি এরূপ সন্দেহ হয় যে, কোন কুস্থানে কোন বালিকাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তবে তিনি অনুসন্ধান বিষয়ে পুলিষের সাহায্য পাইবেন।

৫। যদি ২১ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকাকে কেহ প্রলোভন দেখাইয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়, তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হইবে।

৬। যদি কোন স্ত্রীলোককে (বয়স যতই হউক না কেন) কোন কুস্থানে প্রবেশ করিতে বাধ্য করা হয়, কিম্বা বিপদে ফেলিয়া ধরিয়া রাখা হয়, প্রমাণ হইলে, দুই বৎসর কারাদণ্ড হইবে।

৭। বয়স যতই হউক না কেন, কোন স্ত্রীলোককে যদি প্রতারণা পূর্ব্বক বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা কেহ তাহার সতীত্ব বিক্রয় করাইবার প্রয়াস পায়, তাহার দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ভোগ করিতে হইবে।

এই সকল নিয়মেও ইংলণ্ডের লোক সন্তুষ্ট হন নাই। এখনও আন্দোলন চলিতেছে। পার্লেমেণ্টের নূতন সভ্য নির্ব্বাচনের সময় সন্নিকট, অনেকে আশা করিতেছেন যে, আগামী পার্লেমেণ্টে আরও কঠিনতর নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত হইবে।

আমাদের দেশের আন্দোলনটী আর এক কারণে উপস্থিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল, একটী অল্পবয়স্ক যুবক, যাহার বয়ঃক্রম

বিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না—এক বারাঙ্গনাকে হত্যা করিয়া প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছে। মকদ্দমাতে এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ বালিকাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে, বিগত তিন বৎসর ধরিয়া সে তাহার প্রতি আসক্ত ছিল। সুতরাং সে যখন ১৬ কি ১৭ বৎসরের বালক, তখন হইতে বিপথে পদার্পণ করিতে শিক্ষা করে। অথচ তাহার পিতা মাতা কলিকাতা বাসী এবং সে নিজে কলিকাতার একটী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। যাহার পিতা মাতা সর্ব্বদা নিকটে এবং যে বিদ্যালয়ের ছাত্র, সেও যদি ১৬। ১৭ বৎসরে পাপপথে পদার্পণ করিল, তবে যাহারা অভিভাবক-হীন হইয়া সহরে থাকে, তাহাদের দশা না জানি কি হইবে, এই ভাবিয়া দেশের লোকে চমকিয়া উঠিয়াছেন এবং যুবকদিগের নীতির উন্নতির জন্য সকলে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ভালই, কিন্তু শারীরিক রোগের চিকিৎসার সময় যেমন বিজ্ঞ চিকিৎসক সর্ব্বাগ্রে রোগের কারণ নির্ণয় করিবার প্রয়াস পান, সেইরূপ কোন প্রকার সামাজিক ব্যাধি দূর করিতে হইলেও তাহার মূলীভূত কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করাও কর্ত্তব্য। এই আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাইব, উভয় দেশেই এক বিধ কারণ বর্ত্তমান।

প্রথম কারণ সহরে বাস। বর্ত্তমান সভ্যতার একটী প্রধান লক্ষণ, বড় বড় সহরের সৃষ্টি। মানব দেহ সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেহের যে অঙ্গের চালনা অধিক হয়, অপরাপর অঙ্গ হইতে রক্ত স্রোত অধিক পরিমাণে সেই অঙ্গের দিকে ধাবিত হয়; জ্বর বিকারে মস্তিষ্কের অবস্থা যখন অত্যুষ্ণ হয়, তখন মস্তিষ্কের চারি দিকে রক্ত সঞ্চার হইতে থাকে। বর্ত্তমান সহরগুলি ঠিক বিকারগ্রস্ত রোগীর উষ্ণ মস্তিষ্কের ন্যায়। সহরে বাণিজ্য, সহরে বিদ্যোপার্জ্জন, সহরে শ্রমিকের শ্রমের সুবিধা, সহরে কল কারখানার ভিড়, সুতরাং চতুর্দ্দিকের পল্লী গ্রাম হইতে জন-স্রোত নিরন্তর সহরের দিকেই বহিয়া থাকে। যাহারা শ্রম করে, তাহারা সহরে আসে; যাহাদের পয়সা আছে, যাহারা আমোদ চায়, তাহারাও সহরে আসে। যেখানে বহুলোকের সমাগম, সেখানে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সুতরাং যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে না, সে অবৈধ উপায়ে উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করে। এই কারণে, সহরে প্রতারক ও পাপাচারী লোকের সং[illegible] বাড়িতে থাকে। বণিক বাণিজ্য [illegible]ক কিনি[illegible] প্রত[illegible]য় দেখাইব[illegible]ার্থী বিদ্যালাভ কামনায় যেমন [illegible]ক সর[illegible]ুসে, অধর্ম্মের অনুচরগণও তেমনি আপনাদের কুক্রিয়ার দ্বারা ধন লাভ করিবার জন্য সহরে আগমন করে। এইরূপে ইংলণ্ডের শ্রমার্থিনী বালিকাগণ দারিদ্র্যের তাড়নায়, জনক জননীর দুঃখ বিমোচন বাসনায়, অনন্যগতি হইয়া লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা করে। সহরে পিতামাতা ও অন্য অভিভাবকগণ সঙ্গে থাকে না; তাহারা দলবদ্ধ হইয়া এক এক স্থলে বাস করিতে থাকে; সেখানে সকলেই হয়ত পর ও অধিকাংশ সমবয়স্ক। সমবয়স্কদিগের দ্বারা লোকের চরিত্রের শাসন হয় না; বরং আমোদ প্রবৃত্তিরই সহায়তা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যখন দুষ্ট লোকের হাতে পড়িয়া যায়, তখন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকে না।

সহরের আর একটা অসুবিধা এই যে, এখানে কোথায় কে কি করে, তাহা জানিবার উপায় নাই। এত বিপুল জনপুঞ্জের গতি বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখা সহজ ব্যাপার নহে; সুতরাং সহরে যে যে পথে চলিতে ইচ্ছা করে, সে সে পথে চলিতে পারে; দেখিবার ও বলিবার কেহ থাকে না। এই কারণে হতভাগিনী ইংরাজ বালিকাগণ যখন বিপথগামিনী হয়, তখন তাহাদিগকে সতর্ক করিবার ও প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কেহ থাকে না।

বঙ্গদেশের যুবকদিগের নীতি দূষিত হইবার পক্ষেও এই কারণ বিদ্যমান। পুরাকালে এতদ্দেশে এই প্রথা ছিল যে, ছাত্রগণ বিদ্যার্থী হইয়া গুরুকুলে বাস করিত। এই রূপ এক এক আচার্য্যের গৃহে দশ, বিশ, পঁচিশ, শত, দুই শত, কোন কোন ঋষির সদনে সহস্রাধিক শিষ্য থাকিত, শুনা গিয়াছে। গুরুকুলে বাস কালে ছাত্রগণের প্রতি অতি কঠিন নিয়ম থাকিত। আমাদের ভক্তিভাজন পূর্ব্ব-পুরুষগণ বুঝিতেন, ইন্দ্রিয়-সংযম না হইলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না; এই জন্য বিদ্যাশিক্ষার্থীর ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করিয়াছিলেন। মনু বলিয়াছেন;—

'গুরুপত্নীতু যুবতি নাভি বাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণ-বিংশতি-বর্ষেণ গুণ দোষৌ বিজানতা॥'

অর্থাৎ;—"যে ছাত্রের বয়ঃক্রম পূর্ণ বিংশতি বর্ষ হইয়াছে, এবং গুণ দোষ জানে সে কখনও যুবতী গুরু পত্নীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে না।" পাঠাবস্থায় পাছে কোন ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হয়, এই জন্য এতদূর কঠোর শাসন ছিল। বাস্তবিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযম ও হৃদয় মনের পবিত্রতা যে কতদূর আবশ্যক, অতি অল্প লোকেই তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানের ত কথা নাই, পারমার্থিক বিষয়ের চর্চ্চা দূরে থাকুক, সামান্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিও মানুষ ইন্দ্রিয়-সংযম ও আত্মশুদ্ধি ব্যতীত সম্পূর্ণ রূপে অধিগত করিতে পারে না। যে চিত্তে অশাসিত প্রবৃত্তির উত্তেজনা, যাহাতে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার কলুষিত ভাব, তাহার জ্ঞান চক্ষু ঘন কুজ্ঝটিকাতে আবৃত; সে জ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব বোধে অসমর্থ, আত্ম-তত্ত্বের গভীর সত্য গ্রহণে অক্ষম।

যাহা হউক, এইরূপ কঠোর শাসন থাকাতে ও সর্ব্বদা গুরুর পরিবার পরিজনের মধ্যে থাকাতে ছাত্রগণের নীতি দূষিত হইত না। তাহারা সর্ব্বদাই সৎপথে থাকিত। এক্ষণে সেই প্রাচীন রীতি রহিত হইয়াছে। এখন গুরুকুলে বাসের রীতি নাই। ইংলণ্ডে বরং বালকদিগের বোর্ডিংস্কুল আছে, সেখানে বালকগণ গুরু ও গুরুপত্নীর আশ্রয়ে থাকে; এদেশে সে প্রথা নাই, এখানে বহুসংখ্যক ছাত্র দশদিক হইতে বিদ্যালয়ে আসে; সেখানে দিবা ভাগের কয়েক ঘণ্টা একত্র যাপন করে; তৎপরে দশদিকে চলিয়া যায়। তদনন্তর তাহাদের সঙ্গেও শিক্ষকদিগের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। এরূপে সহস্র সহস্র যুবক শিক্ষার্থী হইয়া কলিকাতায় আসে, তাহারা কোথায় থাকে, কাহার তত্ত্বাবধানে থাকে, কিরূপে দিন যাপন করে, তাহা শিক্ষকেরা জানেন না। অধিকাংশ যুবকের পিতামাতা পল্লীগ্রামে থাকেন, তাঁহারাও দেখিতে আসেন না যে, সন্তানগণ কিরূপে থাকে ও কিরূপে দিন যাপন করে। যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া এক এক স্থানে বাস করে, সেখানে

অধিকাংশই সমবয়স্ক, গুরুজন কেহ থাকে না; সুতরাং সহরের সহস্র প্রকার প্রলোভনের মধ্যে তাহাদের অনেকের কি দশা ঘটিতে পারে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

আর একটী কারণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান। ইংলণ্ডের দরিদ্র শ্রমজীবিগণ যেরূপ অবস্থাতে ও যেরূপ ঘরে বাস করে, তাহাতে তাহাদের মনের কোন ভাল ভাবই স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। মানব মন সুখে থাকিবার জন্য স্বভাবত যে সকল পদার্থ চায়, বিশেষত যুবক যুবতীদিগের মনে যে সকল পদার্থের আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে, তাহার অল্পই ঐ সকল দরিদ্র লোক পায়। গীত বাদ্য ও বক্তৃতার সুখ, প্রীতিভোজনের সুখ, সপরিবারে ভাল ভাল স্থান দর্শনের সুখ দূরে থাকুক, শীতের প্রকোপ নিবারণের জন্য বৎসরে যদি পাঁচ সুট কাপড়ের প্রয়োজন হয়, তাহাও তাহারা পায় না। যে সকল ঘরে তাহারা থাকে, তাহারও অবস্থা অতি শোচনীয়। অনেক স্থলে ৫।৭টী বয়ঃ-প্রাপ্ত বালক বালিকার সহিত একজন শ্রমজীবিকে এক ঘরে থাকিতে হয়। সেই ঘরের মধ্যেই ভাঁড়ার, সেই ঘরেই শয্যা, সেই ঘরেই সমুদায়, এরূপ অবস্থাতে লোকের মন কিরূপে থাকে, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। পরিশ্রমের পর আর কি কাহারও এরূপ বাড়ীতে পা দিতে ইচ্ছা করে? এই কারণেই ইংলণ্ডের অনেক শ্রমজীবী সন্ধ্যাকালে আর বাড়ীতে আসে না, কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার সময় কোন সুঁড়ীর দোকানে প্রবেশ করে। সেখানে আলাপ করিবার দুই দশজন লোক পায়, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসিবার স্থান পায়, দুটা খবর শুনিতে পায়, এবং সুরার মাদকতা শক্তির দ্বারা নিজের সাংসারিক দুর্গতির চিন্তা নিবারণ করিতে পারে। সুঁড়ীর দোকানে আমোদ প্রমোদ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় টলিতে টলিতে বাড়ীতে আসে, কিম্বা ধরিয়া তুলিয়া আনিতে হয়। এদিকে পরিবারগণ অন্ন বস্ত্র বিহীন; গোরুর গোয়ালের ন্যায় এক অন্ধকার ও অপরিষ্কৃত ঘরে যুবক যুবতী দলবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদের দশা কি, তাহা একবার চিন্তা কর। এইরূপ গৃহে যে বালিকারা বর্দ্ধিত হয়, তাহারা যদি একটু সুখের আশা পায়, সে প্রলোভন তাহাদের পক্ষে কত কঠিন, তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। যদি কেহ আসিয়া বলে, আমি তোমাকে ভালবাসিব, তোমাকে ভাল পোষাক কিনিয়া দিব, তোমাকে রঙ্গভূমির অভিনয় দেখাইব, তোমাকে বিবাহ করিব, তবে অজ্ঞ সরলমতি বালিকার পক্ষে প্রতারিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং তাহারা হঠাৎ ভুলিয়া যায় ও ধনিদের ফাঁদে পড়ে।

আমি অগ্রেই বলিয়াছি, এদেশেও এই কারণ বর্ত্তমান। একদিন কোন কালেজের ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "তোমরা যে দুই মাসের ছুটী পাও, তাহাতে স্বীয় স্বীয় গ্রামে গিয়া কি রূপে দিন যাপন কর?" তাহারা উত্তর করিল—"ছুটীর প্রথম প্রথম কয়েকদিন ভাল লাগে, তৎপরে প্রাণ অস্থির হইতে থাকে, কবে কালেজ খুলিবে, সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে থাকি।"— কি ভয়ানক কথা! সম্বৎসরের পর যুবকগণ দুই মাসের জন্য ছুটী পায়, সম্বৎসরের মধ্যে একবার মাতা ভাই ভগিনী, খুড়া জেঠা,

প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে পায়, এরূপ স্থলে তাঁহাদের সহবাসে গিয়া এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করাই মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। সে আনন্দ যে ত্বরায় বিরক্তিতে পরিণত হয়,ইহা কি স্বাভাবিক? যাহা শুনিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, —এবং আপনাপন জীবনেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়—তবে এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে,আমাদের পরিবার সকল এরূপ নয় যেখানে থাকিয়া একজন শিক্ষিত যুবকের প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে। অর্থাৎ মানব চিত্ত সম্পূর্ণ সুখে বাস করিবার জন্য যে যে পদার্থ চায়, আমাদের যুবকগণ গৃহের মধ্যে তাহা পায় না। সে পদার্থ কি? যুবকেরা জনক জননীর সঙ্গ অপেক্ষা কালেজের সহাধ্যায়ীদিগের সঙ্গ অধিক ভাল বাসিতেছে কেন? ইহার উত্তর;— কালেজের সহাধ্যায়ীদের নিকট অবাধে মন খুলিতে পারে, কত বিষয়ে কথোপকথন, তর্ক বিতর্ক এবং ভাব ও চিন্তা বিনিময় করিতে পারে। ইহা মানব জীবনের একটা প্রধান সুখ। এসুখটা আমাদের ঘরে নাই। আমাদের সামাজিক রীতি নীতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পিতার নিকট পুত্র মন খুলিতে পারে না, তাঁহার সমক্ষে আমোদ প্রমোদ করিতে পারে না, গাইতে বাজাইতে, হাসিতে খেলিতে পারে না, ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়। যেখানে ভয় ও সঙ্কোচ, যেখানে অসুখ। সুতরাং আমাদের যুবকের ঘরে সুখ নাই। বাড়ীতে চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের সম্ভাবনা নাই। বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বধূদিগের সহিত যুবকের আলাপও হয় না; মাতা ও ভগিনী প্রভৃতি আলাপ্য রমণীদিগের সকলেই অশিক্ষিতা, এমন কি বিষয়ে কথা হইবে, যাহাতে তাঁহাদের শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবক মনের সহিত যোগ দিতে পারে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পারিবারিক সুখের অভাব, আমাদের দেশের অনেক পুরুষের দুর্নীতির প্রধান কারণ। বাসের বাড়ীতে আমোদ পাইলে, যে রঙ্গভূমিতে ভদ্রলোকের সন্তানেরা প্রকাশ্য ভাবে বারাঙ্গনাদিগের সহিত মিশিয়া আমোদ প্রমোদ করে, সে রঙ্গভূমির ত্রিসীমার মধ্যে কোন ভদ্রলোকের সন্তানকে দেখিতে পাওয়া যাইত না,—সেই রঙ্গ ভূমিকে এত লোকে প্রশ্রয় দিত না। অতএব উভয় স্থলেই পারিবারিক সুখের অভাব, দুর্নীতির একটী কারণ।

তৃতীয় কারণ, বাল্যকালে ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব। অনেকের ধারণা আছে যে,ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচার, সেখানকার লোক সুসভ্য ও উন্নত, সুতরাং সেখানে আপামর সাধারণ সকলেই ধর্ম্ম-শিক্ষা পাইয়া থাকে। তাহা নহে। সেখানে সভ্যতার পার্শ্বে বিষম বর্ব্বরতা,—জ্ঞানালোকের পার্শ্বে ঘন নিবিড় অন্ধকার। সেখানকার নিম্ন শ্রেণীর বালক বালিকারা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মোপদেশে বঞ্চিত। নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞতা কতদূর, তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। একবার ইংলণ্ডের এক বিচারালয়ে একটী চমৎকার মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। একটী স্ত্রীলোকের নামে বহুবিবাহের অপরাধে নালিশ হয়। ব্যাপারটা এই,—একজন মাতাল এক বোতল মদের জন্য আপনার স্ত্রীকে অপর একজনকে দেয়। সে স্ত্রীলোকও আপনাকে দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রী জানিয়া তাহার

সহিত বিবাহিত হয়। মাজিষ্ট্রেট যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কার স্ত্রী, তখন সে বলিল;—"আমি আগে ছিলাম প্রথমোক্ত ব্যক্তির স্ত্রী, এখন এই দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রী। মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন;—"প্রথম ব্যক্তির সহিত তোমার বিবাহ ভঙ্গ হইল কিরূপে?" স্ত্রীলোকটী বলিল—"কেন, সেত আমাকে এক বোতল বিয়ার লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সে রমণী সরল ভাবেই ভাবিয়াছিল যে, এক বোতল সুরার জন্য সে বিক্রীত হইয়াছে এবং তাহার দাম্পত্য সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেখানকার সামান্য লোকদিগের মধ্যে এতদূর অজ্ঞতা। ইহাদের বালক বালিকা কিরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতে পারে, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। এইজন্য কোন প্রকার প্রলোভন দেখাইলেই তাহারা কোন কোন ভাবে বিশ্বাস করিয়া মৃত্যুর মুখে গিয়া প্রবিষ্ট হয়।

আমাদের দেশেও দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমান সময়ে এই কারণ বিদ্যমান। গৃহের বালক বালিকাকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া এক প্রকার রহিত হইতেছে বলিলে হয়। প্রাচীন হিন্দুদিগের প্রথা ছিল যে, তাঁহারা গৃহের শিশুদিগকে শৈশব হইতেই ধর্ম্মোপদেশ দিতেন; চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করাইতেন, পৌরাণিক কাহিনী সকল বলিতেন। ব্রাহ্মণের সন্তানদিগকে অষ্টম বর্ষে উপনয়ন দিয়াই রীতিমত ধর্ম্মের নিয়ম সকল রক্ষা করিতে হইত। পূর্ব্বে একটী প্রকৃত হিন্দু গৃহের কোন বালকের বয়ঃক্রম যখন ৭।৮ বৎসর, তখন হয়ত কৃত্তিবাসের রামায়ণের অধিকাংশই তাহার কণ্ঠস্থ থাকিত। মাতা ঠাকুরাণী মুখে মুখে কত পুরাণের কথা শুনাইতেন, রামায়ণ মুখস্থ বলিতেন ও তাহাকে হয়ত মুখস্থ করিতে আদেশ করিতেন। এইরূপে তাহার চরিত্র ও নীতি সর্ব্ব প্রথমে রামায়ণের দ্বারা গঠিত হইত। পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি গৃহের বৃদ্ধগণ নিষ্কর্ম্মা হইয়া গৃহে বসিয়া বালকগণকে অতি শৈশবকাল হইতে, এমন কি হাঁটিতে শিখিলেই, কোলে করিয়া মুখে মুখে চাণক্য শ্লোক ও কত স্তব কবচ শিখাইতেন। আমি স্বচক্ষে এমন গৃহ অনেক দেখিয়াছি। এখন দেখিতেছি, বর্ত্তমানের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পরিবার হইতে এই সকল সুব্যবস্থা তিরোহিত হইতেছে। লোকে ভাবিতেছেন, কোন ধর্ম্মেই যখন বিশ্বাস নাই, তখন আর ধর্ম্ম শিক্ষা দিব কি? এখন বালক বালিকগণ বিদ্যালয়ে গতায়াত করে, এইমাত্র। তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য যে পিতা মাতা দায়ী, তাহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। "ধর্ম্ম বিষয়ে কিরূপ চিন্তা কর" এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে এক দিন একটী সচ্চরিত্র সত্যবাদী যুবক এই বলিয়া উত্তর দিল—"ধর্ম্মবিষয়ে কখনও কিছু ভাবি নাই, বাড়ীতে পূজা আদি হইতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু বাবা ও অন্যান্য অভিভাবকগণ তাহাতে বিশ্বাস করেন না; সুতরাং তাহাতে আমারও কখনও বিশ্বাস হয় নাই।" এইটী সত্য কথা, আমাদের দেশের এইরূপ হাজার হাজার যুবক ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার ফল যাহা ঘটিতে পারে, তাহাই ঘটিতেছে। এখন আর শোক করিলে কি হইবে? (১) আমাদের যুবকদিগের নীতির উন্নতির উপায় কি (২) পারি-

বারিক ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত? (৩) বর্ত্তমান রঙ্গভূমি গুলির প্রতি আপত্তি কেন? পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই সকল প্রশ্ন স্বভাবত পাঠকের মনে উদিত হইয়াছে। এবারে আর এগুলির বিচারে প্রবেশ করিবার সময় নাই। ক্রমে এই সকল প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

বাসনার উচ্ছ্বাস।

মানুষ, যতই সূক্ষ্মদর্শী হউক না কেন, সে কখনই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না। সংসারের সর্ব্বত্রই শুনা যায়, যাহার মন পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিলাম, সেও আমাকে চরণে ঠেলিল। পৃথিবীর পৌণে ষোল আনা ঝগড়া বিবাদের কারণ, মানুষ মানুষকে প্রকৃত ছবিতে চিনিতে না পারার দরুণ সমুৎপন্ন। এই যে মানুষ মানুষকে প্রকৃতপক্ষে চিনিতে পারে না, ইহারও গভীর কারণ আছে। মানুষ কি ভাবিয়া কি উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য্য করে, তাহা মানুষের পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন। সকলেই আপন বুদ্ধির চালনা করিয়া, আপন প্রকৃতির প্রতিবিম্ব বা ছবি অন্যের মধ্যে দেখিতে চায়;—অথবা যাহার মন যেরূপ, সে অন্যকেও সেই রূপ দেখিতে ভালবাসে। তাহার প্রকৃতি যতই বিভিন্ন হউক না, সে বিভিন্ন প্রকৃতির ভিতরেই তাহার সমতুল্য প্রকৃতি দেখিতে চাহিবে। এইজন্য, যে যে প্রকার, সে অন্যকেও সেই প্রকার দেখে। একজন ভাললোক অন্যের মন্দ ভাব বা দুরভিসন্ধি তেমন বুঝিতে পারে না, বা একজন মন্দ লোক একজনের সাধু অভিপ্রায়ের মর্ম্মভেদ করিতে পারে না। একজন দুষ্ট লোক এক জন প্রকৃত সৎ লোকের মহত্ত্ব যেমন বুঝিতে পারে না, একজন মহৎ ব্যক্তি এক জন দুষ্ট লোকের মন্দ অভিপ্রায় তেমনই বুঝেন না শিশুর হাসির মর্ম্ম, বালক বুঝে না। শিশুর হাসি দেখিয়া বালক কল্পনা করে, আমি যে কারণে হাসিতেছি, শিশুও সেই কারণেই হাসিতেছে। কিন্তু উভয়ের হাসির কারণ কত পৃথক, কত বিভিন্ন! এই প্রকার, পুরুষের মহত্ত্ব, রমণীর কল্পনায় ভিন্ন, মনে স্থান পায় না; রমণীর মহত্ত্ব পুরুষ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ভাবিতে পারে না। পুরুষ, স্ত্রীকে পুরুষ কটাক্ষে অনুরঞ্জিত করিয়া, চিন্তা করে; স্ত্রীও অলঙ্কৃত পুরুষত্বের মনোমোহিনী চিত্রে আঁকিয়া মোহিত হইতে চায়। যে যাহা নয়, তাহাই লোকে তাহাকে ভাবে; ভাবিয়া যখন প্রতারিত হয়, তখনই মহা বিবাদ বাধে;—বৈষম্য-সঙ্গীতের উচ্চরবে মানবকণ্ঠ বিদীর্ণ হয়। তোমাকে আমি আমার ছবিতে দেখি;—তুমিও আমাকে তোমার ছবিতে দেখিতে চাও। মানুষের বিভিন্ন রূপ, মানুষের প্রাণে সয় না। মানুষ বুঝিয়াও বুঝে না যে, পরস্পর বিভিন্ন না হইলে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার কোনই আকর্ষণ থাকে না। এই জন্যই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত ছবি, মানুষের নিকট চিরপ্রচ্ছন্ন। এ গভীর রহস্য কেন? প্রকৃতি কেন এমন হইল যে, এক জনের ভাব, এক জনের মহত্ত্ব অন্যে বুঝিবে না? কেন প্রেমিক জ্ঞানীকে ঘৃণা করেন, কেন জ্ঞানী ভক্তকে তুচ্ছ করেন? আমি ভাবিয়া

চিন্তিয়া কিছুই ঠিক পাই না;—এ গভীর রহস্যের গভীর মর্ম্ম ভেদ করিতে পারি না।

মানুষ, প্রকৃত প্রস্তাবে যেন মানুষের জন্য নয়;—তুমিও যেন আমার জন্য নও, আমিও তোমার জন্য নই। আর একটা কি যেন উদ্দেশ্য আছে। অথচ তোমার কাছে আমি থাকিতে সুখ পাই, তুমি আমার ধারে বসিতে ভালবাস। কি এক ছবি, কি এক অমৃত-ধ্বনি প্রত্যেকের ভিতরে রহিয়াছে, যাহাতে প্রত্যেককে প্রত্যেকের অনুরক্ত করিবেই করিবে। কত পার্থক্য, কত বিভিন্নতা, কত আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তবুও স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের জন্য স্বামীর হৃদয় ব্যাকুল,—মাতার হাসির জন্য শিশুর মন ব্যাকুল,—শিশুর অস্ফুট হাসির জন্য মাতা লালায়িত। তোমাকে ত প্রকৃত প্রস্তাবে চিনিতে পারিতেছি না—তুমি যখন কোল পাতিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছ, তখন তোমাকে স্বার্থের দাস বলিয়া ভ্রম করিতেছি; কিন্তু বল ত ভাই, তবুও তোমার জন্য আমি লালায়িত কেন? তুমিও আমার ভাল ভাব হইতে কত দুরভিসন্ধির অঙ্কুর বাহির করিয়া কত নিন্দা রটনা করিয়াছ, কিন্তু তবুও তুমি আমার সহবাসের জন্য কেন অস্থির? মানুষ যে মানুষের জন্য অস্থির, তাহাতে আর কোনই ভ্রম নাই। তাহা না হইলে পৃথিবী শূন্য পড়িয়া থাকিত, —গৃহ শূন্য, গ্রাম শূন্য,—দেশ শূন্য—নগর শূন্য। মানুষ, মানুষের জন্য লালায়িত না হইলে, কখনই এত কষ্ট যন্ত্রণা সহিয়া, এত বিপদ ভার বহিয়া সংসার পাতিত না। এই অস্থিরতা কেন?—এই ব্যাকুলতা কেন?—কে উত্তর করিবে, কেন?

মানুষের কি লক্ষ্য আছে, কি উদ্দেশ্য আছে, মানুষ তাহা বুঝে না। আমার বোধ হয়, এই যে বৈষম্য, ইহারই মধ্যে সমতা আছে। জ্ঞানালোক সকলকে পৃথক পৃথক বুঝায়, প্রেমান্ধকার সকলকে এক করিয়া মজাইতে চায়। প্রেম, সকলকে এমন করিতে চায়, যেন গাঢ় আঁধারে সকল ঢাকা। আঁধার কি? না—ঘনীভূত ছায়া। প্রেম, সকলকে এক ঘনীভূত ছায়াতে পরিণত করিতে চায়। প্রেমের জন্য সকলেই লালায়িত, সুতরাং বিভিন্ন হইয়াও লোক একত্ব, সমত্ব চায়। কিন্তু ছায়ার ভিতরে যে কায়া আছে, একথা জগৎ বুঝে না। আঁধারের ভিতরও জ্যোতি আছে। জ্ঞানে যদি একটু জ্যোতি থাকে, প্রেম-আঁধারে তবে আরো জ্যোতি আছে; কিন্তু ইহা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। জ্ঞানে বিভিন্নতা; প্রেমে, একতা—একাকার। একাকারই ছায়া বা আঁধার। পথ-ক্লিষ্ট, রৌদ্র-দগ্ধ পথিক ক্ষুধাকাতর হইয়া যখন শীতল বট-ছায়ায় আশ্রয় লয়,—শূন্যে দেহকে রাখে, তখন কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, সেই শূন্য, সেই কিছুই নয়, সেই ছায়া প্রদান করে, কে জানে? ঘোর দিগন্ত-ব্যাপিনী, বৈষম্য-নাশিনী, কুল-প্লাবনী আঁধার আসিয়া ঘেরিয়া যখন পৃথিবীতে রাজত্ব বিস্তার করে, তখন অনন্ত-পূজক মানব তাহারই ভিতরে যে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখে, কে তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে? পৃথিবীর ঘোর বৈষম্যময় নরনারীর মধ্যে বাস করিয়াও মানুষ যে কি সুখশান্তি পায়, কে বুঝে? বিজ্ঞান দর্শনের কথা তবে দূর হউক। এই পৃথিবী, শীতল বট ছায়া। ছায়াকে যে কেবল শূন্য বলে, সে মূর্খ। তুমি ছায়া আমি ছায়া—সকলই ছায়াময়। তোমার ছায়াতে আমার উষ্ণত্ব ঘুচে, আমার ছায়ায় তোমার অশান্তি দূর হয়। তুমি কে, আমি কে?—ছায়াবই

কে মায়া বাড়াইতে পারে? তোমার তুমিত্ব আমি ব্যাখ্যা করিতে পারি না, আমার আমিত্বও তুমি বুঝ না—কিন্তু তবুও আমরা আছি। যাহা আছে, তাহারই উদ্দেশ্য আছে, তাহাই শূন্য বা কিছুই-নয় নহে। কি আছে, কে আছে, গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, ছায়ার ভিতরে এক অবিনশ্বর কায়া আছে;—তাই ছায়াতে মায়া আছে। কেবলই ছায়া ভিন্ন আর কিছুই কি গণনা করিতে পার? তাহা তোমার অসাধ্য। তুমি তোমার ভাব বই আর কিছুই গণিতে পার না। যাহা দেখিতেছ, উহা যে তোমার দেখারই অনুরূপ, তাহা ঠিক বলিতে পার না; যাহা শুনিতেছ, তাহা যে তোমার শুনারই মত, তাহাও নিশ্চয় জান না। তুমি যাহা যেরূপ দেখিতেছ, আমিও যে তাহা ঠিক সেইরূপই দেখিতেছি, তাহা তুমি নিশ্চয় বলিতে পার না। তোমার সুস্বর আমার নিকট যে কুস্বর নয় এবং আমার ভাল যে তোমার নিকট মন্দ নয়, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। ভাল মন্দ সকলই মনের একটী অবস্থা;—পাপ পুণ্য মনের অবস্থা বই আর কিছুই নহে। তবেই দেখ,—সকলই ছায়ার ন্যায়, অবস্থাভেদে, পাত্রভেদে, সময় ভেদে, বায়ু ভেদে, ছায়াই ভিন্ন ভিন্ন কায়া ধরিতেছে,—তোমার ও আমার নিকটে। অথবা ছায়ার ভিতর হইতেই কায়া ফুটিয়া পড়িতেছে। গগনভেদী বটবৃক্ষ না থাকিলে শীতল ছায়া কখনই পৃথিবীর অশান্তি হরণ করিতে পারিত না। সকল ছায়ার পশ্চাতেই কায়া লুক্কায়িত। সেই কায়ার মায়াতেই আমরা ঘুরিতেছি, উঠিতেছি, বসিতেছি। সেই কায়ার মায়াতেই আমরা সংসার সাধন করিতেছি। কায়া ভিন্ন ছায়া নাই—তুমি নাই—আমি নাই; আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু কায়া কি? কে জানে কি?—ক্ষুদ্র মানুষ কেমনে জানিবে, কায়া কি? কিন্তু একজন যে আছেন, তাতে সন্দেহ নাই। একজনের, এক কায়ারই ছায়া—এই পৃথিবীর অসংখ্য জীব জন্তু, পশু পক্ষী, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া সমস্ত খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তবে কিসের অহঙ্কার? মানুষ যদি কেবলই কায়ার ছায়া, তবে মানুষের অহঙ্কার কিসের? অহঙ্কার—একমাত্র কায়ার। কায়াকে ভুলিলে যে অহঙ্কার থাকে, তাহা কিছুই নহে,—তাহা নরক,—তাহা অসার। আর রাজাধিরাজ মহারাজ বিশ্বপতির ছায়া তুমি, ইহা ভাবিয়া যদি আত্মাভিমানী হইয়া থাক, হও, আপত্তি নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিও, তুমি যাঁহার ছায়া, আমিও তাঁহারই ছায়া;—যে কিছু ভেদাভেদ দেখিতেছ, উহা অবস্থা ও সময়ের ঘোর ফের মাত্র;—তোমার আমার চখের বা ভাবের দোষ মাত্র। তুমিও যাঁহার ছায়া, আমিও তাঁহারই ছায়া। কিন্তু ছায়াই কায়া নহে, মনে রাখা উচিত। বড় বড় পণ্ডিতেরা এই স্থানে বড়ই ভুল বুঝিয়া গিয়াছেন;—ছায়াকেই তাঁহারা কায়ার ন্যায় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা মহাভুল। কায়া ও ছায়া পৃথক। সকল ছায়াই একরূপ,—বটের ছায়া ও হিজলের ছায়াতে বিভিন্নতা নাই;—সবই অনন্তের প্রতিবিম্ব। ভেদাভেদ, অশান্তি, অপ্রেম, কুজ্ঞান, কুতর্ক, এ সকল গভীর চিন্তাশীলের নিকট কি আর স্থান পায়?—সেখানে সব একাকার হইয়া যায়।

আমার বড় ইচ্ছা, আমি যে ছায়া, ইহা আমি প্রকৃত পক্ষে বুঝিতে পারি। ছায়াকে যেরূপ লোকে শূন্য বলিয়া মনে করে, আমার বড় ইচ্ছা, আমিও সেই রূপ শূন্য

হইয়া, আমিত্ব ভুলিয়া, পড়িয়া থাকি। তাঁহাতে ডুবিয়া আমার সকলই শূন্য হইয়া যাইবে;—অনন্ত বিশ্ব ছায়াতে বিন্দু-ছায়া মিলাইয়া যাইবে। বাসনা এই, আমার গৃহে যেন সাড়া শব্দ নাই,—শরীরে স্পন্দন নাই,—হৃদয়ে সুখবিলাস নাই,—শোক দুঃখ নাই, ইচ্ছা কামনা নাই, তাঁহাতে আমিত্ব ডুবাইয়া পড়িয়া থাকি। ইচ্ছা এই, সকলের প্রাণে ডুবিয়া—পাতায় পাতায় মজিয়া এমন হইয়া যাই যে,কেহ ডাকিয়াও যেন আসক্তিময় পৃথকত্ব না পায়। আমি সকলের হইয়া যাইব—আমার নিজের কিছুই থাকিবে না। আমার অস্তিত্বে তাঁহারই অস্তিত্ব প্রচারিত হইবে, আমার তিরোধানে তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তিত হইবে। আত্ম-মনকে উড়াইয়া শীতল ছায়া হইয়া বসিয়া থাকি, এই ইচ্ছা। ছায়ার কাজ, পৃথিবীর তাপ-দগ্ধ নরনারীকে কেবল শীতল করা। আমার ইচ্ছা, আমার কাজও তাহাই হউক। আমি করি, আমি ভাবি, আমি উঠি, আমি বসি, এই প্রকার না ভাবিয়া, ভাবিব,—তিনি করান, তিনি ভাবান,তিনি উঠান, তিনি বসান। ভাবিব, তিনি কায়া, আমি ছায়া। ছায়াতে কায়ার জলন্ত ভাব দেখিব; কিন্তু ছায়াকেই কায়া বলিব না। কায়া আছে বলিয়াই আমি-ছায়া আছি, ইহা ভাবিব। কিন্তু ছায়া না থাকিলে কায়া থাকেন না, ইহা কখনই ভাবিব না। এমনই হইবা যাইতে ইচ্ছা,—কেহ আমার রূপ দেখিবে না, আসক্তি-ময় অস্তিত্ব দেখিবে না—আমার শীতল ছায়ায় বসিয়া সকলেরই অশান্তি, নিরানন্দ ঘুচিবে—সকলেরই মনে বিশ্বাসের কথা জাগিবে। এ ভবন আনন্দের ভবন হইবে, এ আশ্রম আনন্দময়ের আশ্রম হইবে। আমার জিনিষে সকলেরই সমান অধিকার হইবে। মানব-জন্ম পাইয়া যদি দেবদুর্লভ পরম ধনের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে না পারিব, তবে কি হইবে? এই অসার জীবন বিনিময়ে যদি সারাৎসারকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তবে আর কি হইল! তাঁহার জন্য আত্ম-বোধকে যদি ডুবাইতে না পারি,তবে আমার জীবন বৃথা! এ কঠোর সাধনায় দীনবন্ধু সহায় হউন।

নভেল কত প্রকার।

পূর্ব্বে, চরিত্রচিত্রই যে নভেলের মূলসূত্র ছিল,—তাহা বলিয়াছি। এই চরিত্রচিত্র যে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিল্পকৌশল বা কবিত্ব—নভেলের প্রাণ স্বরূপ। এই শিল্পকৌশলের উৎকর্ষাপকর্ষের উপরই নভেলের প্রকৃত উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে, তাহাও উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণ নভেল সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিব।

প্রথমে, নভেলের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। সচরাচর নভেলে যে বিষয়ে প্রাধান্য থাকে—তাহা হইতেই নভেলের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। ইহা-ব্যতীত অনেকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বা নভেলের ভিন্ন ভিন্ন মূল অবলম্বন করিয়া নভেলের শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,নভেলে চরিত্র ও বাহ্যজগৎ, এই দুইটীর ঘাত প্রতিঘাতেই নভেলের চরিত্র চিত্রিত হয়। সুতরাং নভেলে চরিত্র

ও বাহ্যজগৎ—দুইটী থাকা আবশ্যক। আবার এই বাহ্যজগৎকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। এক ভৌতিক জগৎ, আর এক সমাজ। সুতরাং সকল নভেলেই আমরা এই তিনটী দেখিতে পাইব, ভৌতিক জগৎ, মনুষ্য চরিত্র, আর সমাজচিত্র। এই তিনের সমবায়েই নভেল লিখিত হয়। তবে ইহাদের মধ্যে কখন ভৌতিক জগৎ ও তাহার চিত্রের প্রাধান্য, কখন বা সমাজের প্রাধান্য, আর কখন বা চরিত্রের প্রাধান্য অঙ্কিত থাকে। বলিয়াছি ত, কবি-শিল্পী কখন চরিত্রকে ও সমাজকে বাহ্যজগত মধ্যে ডুবাইয়া রাখেন;—যেন আমরা তাহাদের স্বতন্ত্র সত্বা খুঁজিয়া পাই না,—কি একটা প্রকাণ্ড নিয়ম—একটা অনন্ত সত্য মধ্যে তাহাদিগকে ডুবাইয়া দেন। কেহ কেহ আবার সমাজকেই শ্রেষ্ঠ করেন; সমাজের জন্যই চরিত্র গড়েন—সমাজের জন্যই জগৎ চিত্র করেন, সমাজের মধ্যে চরিত্র ও জগৎ, উভয়কেই ডুবাইয়া রাখিতে যান। আর যাঁহারা উৎকৃষ্ট কবি-শিল্পী, তাঁহারা চরিত্রকেই সর্ব্বময় করেন, এই চরিত্রের গতি, শক্তি ও কার্য্যপ্রণালী দেখাইবার জন্যই সমাজ ও জগৎ চিত্র করেন। এইরূপে শ্রেণী বিভাগ করিলে নভেলকে তিন শ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায় (১) স্বভাব-বর্ণনা-প্রধান নভেল (২) চরিত্র-প্রধান নভেল, (৩) সমাজ-প্রধান নভেল। স্বভাব-বর্ণনা-প্রধান নভেলের সংখ্যা বড় অল্প। সত্য বটে, বাহ্যজগৎ কবির অনন্তভাণ্ডার,—শান্ত, ঘোর, প্রসন্ন, গভীর, সুন্দর,—এমন কোন ভাব নাই যাহা বাহ্যজগতে প্রকটিত হয় না। অনন্ত আকাশ হইতে ক্ষুদ্রতর বালুকণা পর্য্যন্ত—সকলেই এক এক অনন্ত রাজ্য নিহিত রহিয়াছে,—যে কবি, সেই তাহা দেখিতে পায়। আর এক কথা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানবলে স্বভাবের নিয়ম আমরা অনেকটা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি—স্বভাবের অসংখ্য ভাব আমরা ইচ্ছা করিলেই উপলব্ধি করিতে পারি—এই জন্য স্বভাব বর্ণনা কবিদিগের অনেকটা আয়ত্তাধীন। এই স্বভাব বর্ণনার কথা পরে বলিব। কিন্তু তথাপি এশ্রেণীর নভেলের সংখ্যা বড় অল্প। বাঙ্গালায় বোধ হয় মাধবীলতা ব্যতীত আর এ শ্রেণীর নভেল অধিক নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চরিত্র চিত্রই নভেলের প্রধান অঙ্গ, ইহাই নভেলের মজ্জাস্বরূপ। সুতরাং চরিত্র-প্রধান নভেলই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। আমরা পূর্ব্বে চরিত্র চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি। দেখাইয়াছি যে, চরিত্র চিত্র সাধারণত চারি প্রকার। আরও বলা হইয়াছে যে, চরিত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—কতকগুলি চরিত্র বুদ্ধি প্রধান, হৃদয়বৃত্তি বা ইচ্ছা ও কার্য্যশক্তি ইহাদের অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় পরিস্ফুট হয়। সেইরূপ কতকগুলি চরিত্র আবার হৃদয়বৃত্তি-প্রধান, ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তির আধিক্যে অভিভূত থাকে। আর কতকগুলি চরিত্র ইচ্ছা বা ক্রিয়া শক্তি প্রধান—ইহাদের বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি ভালরূপ পরিস্ফুট হয় না। সত্য বটে, মনোবিজ্ঞানানুসারে বুদ্ধি হইতেই হৃদয়বৃত্তি উত্তেজিত হয়, আর হৃদয় বৃত্তি উত্তেজিত হইলে তবে কার্য্য করিতে ইচ্ছা জন্মে ও কার্য্যশক্তি আবির্ভূত হয়। তথাপি আমাদের অন্তঃকরণের এই তিন ভাগের মধ্যে একের আধিক্য ও অপ-

রের হ্রাস হয়, তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এ স্থলে সে কথা উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। হ্যামলেটের বুদ্ধিবৃত্তির অধিক স্ফূর্ত্তি থাকিলেও তাহার কার্য্যকারিণী শক্তির কত অভাব ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। ফষ্টেরও প্রায় এই দশা ছিল। বাস্তবিক চিন্তা-জগতে থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রে সুচারুরূপে বিচরণ করা যায় না, আবার কর্ম্ম মধ্যে বিশেষ রূপ লিপ্ত হইলে, চিন্তার অধিক স্ফূর্ত্তি হয় না। আর যাহার হৃদয় বৃত্তি উত্তেজিত, মন অভিভূত, বিষয় বিশেষে স্পৃহাবতী, তাহার চিন্তা করিবারও সময় থাকে না—আবার কার্য্য করিবারও অবসর মিলে না। সেই জন্য এই তিনের সামঞ্জস্য রাখিয়া মনের স্ফূর্ত্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র।

এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সকল চরিত্র হৃদয় বৃত্তি প্রধান, তাহারাই নভেলের বিশেষ উপযোগী। বাহ্য জগতের দ্বারা আকৃষ্ট বা অভিভূত হইলেই হৃদয় বৃত্তি উত্তেজিত হয়। এই আকর্ষণেই বাহ্য জগতের সহিত চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত হয়—এবং এই ঘাত প্রতিঘাত দেখাইয়াই চরিত্রের স্ফূর্ত্তি করা হয়। সুতরাং নভেলের অধিকাংশ চরিত্রই হৃদয় বৃত্তি প্রধান। যে নভেল দেখ, তাহাতে অধিকাংশ চরিত্রই এইরূপ দেখিতে পাইবে। আমরা পূর্ব্বে যে চতুর্থ শ্রেণীর চরিত্রের কথা বলিয়াছি, তাহা সহজেই এইরূপ হৃদয়-প্রধান। অন্যান্য শ্রেণীর চরিত্রেও এইরূপ চরিত্রের চিত্র কিছু অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

ইচ্ছা ও কার্য্যকারিণী শক্তি প্রধান চরিত্র এক্ষণে সচরাচর নভেলে দেখা যায় না। রোমান্স বা ঐতিহাসিক নভেলে এই শ্রেণীর চরিত্র অধিক দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু যে সময় হইতে নভেলে তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্র আরম্ভ হইয়াছে—যে সময় হইতে সংগঠনী শক্তি গুলির স্ফূর্ত্তি করা নভেলের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সময় হইতেই এ শ্রেণীর চরিত্র নভেলে অধিক পরিমাণে স্থান পায় না। আমরা এস্থলে রেনল্ড প্রভৃতি নভেল লেখকের কথা ধরিতেছি না; কারণ এ সকল নভেলকে প্রকৃত নভেল বলা যায়, এমন কোন গুণ নাই; তবে ইহাতে এইরূপ চরিত্র চিত্রের অনেকটা চেষ্টা করা হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু শৈবলিনীর চরিত্র ব্যতীত এ শ্রেণীর চরিত্র ভাল রূপে স্ফূর্ত্তি করেন নাই।

সে কথা যাউক। এইরূপ চরিত্র ব্যতীত বুদ্ধিবৃত্তি মূলক চরিত্রও কখন কখন নভেলে অঙ্কিত হইয়া থাকে। তবে এইরূপ চরিত্রও নভেলের বেশী উপযোগী নহে। এই স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, পূর্ব্বে বিলাতে এইরূপ নভেল লেখার কিছু প্রাদুর্ভাব ছিল। ডিফোর রবিন্সন ক্রুসো প্রভৃতি নভেলগুলি অনেকটা এই শ্রেণীর। একজন লোক অবস্থা বিশেষে পড়িয়া স্বীয় বুদ্ধি বলে যে বিপদে কিরূপ কার্য্য করে, তাহা দেখান কতকটা এই শ্রেণীর নভেলের উদ্দেশ্য। এরূপ নভেলে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনার প্রাধান্য আছে সত্য, আবার ঘটনা গুলিও এরূপ যে, তাহা দ্বারা চরিত্রের উপর বড় বেশী ঘাত প্রতিঘাত হয় না,—নানরূপ (complex) ক্রিয়াও হয় না, তথাপি ইহাতে

চরিত্রের এই বুদ্ধি ও কার্য্য বৃত্তির বিকাশ বেশ দেখান হয়। আজ কাল আর এক জন লেখক এই শ্রেণীর নভেল লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এগুলিকে বিজ্ঞান বলিব কি নভেল বলিব, সহজে বুঝা যায় না। তবে এ গুলিকে বৈজ্ঞানিক নভেল বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত জুল ভার্নের কয়খানি বৈজ্ঞানিক নভেল, ক্রুসোর অনেকটা অনুরূপ; তবে এ স্থলে চরিত্র গুলিতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহায্যেই বুদ্ধি বৃত্তির স্ফূর্ত্তি করা হইয়াছে। আর এক কথা, এ সমস্ত নভেলে নভেলের আকারে বৈজ্ঞানিক সত্য শিক্ষা দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং আমরা ইহাদিগকে নভেল মধ্যে ধরিব না। তবে যদি রবিন্সন ক্রুসো বা জুল ভার্নের নভেলগুলিকে একান্তই নভেল বলিতে হয়,তবে বলিয়াছি ত প্রথম গুলিকে বৈষয়িক (practical) আর দ্বিতীয় গুলিকে বৈজ্ঞানিক নভেল বলা উচিত। বাঙ্গালাতে এরূপ নভেল আজিও লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহাদের কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।

সে যাহা হউক, এই চরিত্রের বিভিন্নতা জন্য নভেলেরও শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। কতকগুলি কার্য্য-প্রধান নভেল— ইহাতেই ইচ্ছা ও কার্য্যকারিণী-বৃত্তি প্রধান-চরিত্র প্রধানত অঙ্কিত হয়। কতকগুলি জ্ঞান-প্রধান নভেল, ইহাতেই চরিত্রের বুদ্ধি বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি করা হয়। আর কতকগুলি চিত্তবৃত্তি প্রধান নভেল—ইহাতে চরিত্রের হৃদয় বৃত্তি গুলি বিশদরূপে পরিস্ফুট করা হয়।

আবার কেহ কেহ চরিত্রকে অন্যরূপ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক স্বাভাবিক বা হৃদয় বৃত্তি মূলক চরিত্র, আর এক অস্বাভাবিক বা বুদ্ধি ও কার্য্য মূলক চরিত্র, (natural বা instinctive এবং artificial বা positive)। * তাঁহাদের মতে যে গুলি স্বাভাবিক চরিত্র, তাহারা ঘটনা বিশেষ দ্বরা রীতিমত আকৃষ্ট হইবে—বাহ্য জগতের প্রভাব নিরোধ করিতে পারিবে না। এই সকল চরিত্রই হৃদয়বৃত্তি প্রধান। কেন না, আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য জগৎ অনুভব করি, এবং এই অনুভব হইতে নানা কারণে এই সকল অনুভূত বিষয়ের উপর আমাদের মন আকৃষ্ট হয়—না হয় তাহার বিকার উৎপন্ন হয়। এই রূপে মন রঞ্জিত হইলেই, আমাদের হৃদয় বৃত্তি উত্তেজিত হয়; আর এই উত্তেজনার দ্বারা স্বভাবের নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি, এই জন্য, এই সকল স্বাভাবিক চরিত্র হৃদয় বৃত্তি প্রধান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই রূপে অস্বাভাবিক বা Artificial চরিত্র বলিলে যে উক্ত রূপ স্বাভাবিক উত্তেজনাকে নিবৃত্তি করিতে পারে, তাহাকেই বুঝায়। বলিয়াছি ত এই সকল চরিত্রের নিরোধ শক্তি অত্যন্ত অধিক। মনে কর, পুত্রের প্রতি স্বভাবতই স্নেহ বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে; এখন যদি কেহ এরূপ চরিত্রের থাকে যে, কোন বিশেষ কারণে তাহার এ বৃত্তি উত্তেজিত হইল না, তখন তাহাকে অস্বাভাবিক চরিত্রের লোক বলিব। সাধারণত দেখা যায় যে, এই চরিত্র গুলিই বুদ্ধি বৃত্তি মূলক। কোন্

* পণ্ডিত টেন সাহেব তাঁহার History of English Literature নামক গ্রন্থে এইরূপে চরিত্র বিভাগ করিয়াছেন।

স্থানে কিরূপ কার্য্য করা উচিত বা অনুচিত, ইহা বিবেচনা করিয়া যে কার্য্য করিতে পারে, যে স্বাভাবিক বৃত্তি গুলিকে দমন করিতে পারে, সে চরিত্রে বুদ্ধিই প্রধান, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই অস্বাভাবিক চরিত্র বুদ্ধি বৃত্তি মূলক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই Artificial চরিত্র চিত্রিত করাতে শিল্পের যে কোন রূপ হানি হয়, এরূপ যেন কেহ বিবেচনা না করেন। কারণ যে চরিত্রকে এস্থলে অস্বাভাবিক বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত অস্বাভাবিক নহে, তাহা প্রকৃত স্বভাবের নিয়মের সম্পূর্ণ অনুযায়ী। সচরাচর আমরা যাহা দেখিতে পাই, এচরিত্র গুলি তাহার কিছু বিপরীত বলিয়া, এ চরিত্র কতকটা অসাধারণ বলিয়া, ইহাদিগকে অস্বাভাবিক চরিত্র বলা হইয়াছে।

সে যাহা হউক, ইহা ব্যতীত চরিত্র গুলিকে আর একরূপে পণ্ডিতেরা বিভাগ করিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন যে, এক-শ্রেণীর চরিত্রের হৃদয় বৃত্তি এতদূর পরিস্ফুট হয় এবং ইহার সহিত তাহার কার্য্যকারিণী শক্তিও এরূপে স্ফূর্ত্তি পায় যে, তাহারা সমাজের বাধা বিঘ্ন কিছুই মানে না, সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বীয় বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। এ শ্রেণীর চরিত্র কতকটা স্বাধীন প্রবৃত্তি বিশিষ্ট বটে। আবার এদিকে আর এক শ্রেণীর চরিত্র আছে, ইহারা সমাজের দাস—কার্য্যকারিণী শক্তির স্ফূর্ত্তির অভাবে ইহারা বুদ্ধি বৃত্তির প্রভাবে কোন কাজ ভাল বুঝিলেও তাহা করিতে পারেনা। অথবা হৃদয় বৃত্তি উত্তেজিত হইলেও কার্য্যকারিণী বৃত্তির অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। সমাজের কঠোর শাসন বলে ইহাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং যাহারা সমাজের এই সকল নিয়ম মত কার্য্য করে—স্বাধীন ইচ্ছায় কার্য্য করিতে পারে না, অথবা প্রবৃত্তি হয় না—ইহারা নভেলের উপযোগী উৎকৃষ্ট চরিত্র নহে। তবে সামাজিক নভেলে এরূপ চরিত্র চিত্রের বিশেষ আবশ্যক হয় বটে, তাহা আমরা যথা স্থানে উল্লেখ করিব।

সে যাহা হউক, আমরা স্বভাব বর্ণনা-প্রধান ও চরিত্র প্রধান নভেলের কথা বলিলাম; এক্ষণে সমাজ-প্রধান অথবা সামাজিক নভেলের কথা বলিতেছি। ইহার মধ্যে উদ্দেশ্য মূলক নভেল গুলিই প্রধান। এই উদ্দেশ্য মূলক নভেলের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমাজের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া এ সকল নভেলের প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের যে গুলি দোষ তাহা দূর করা,—অথবা সমাজের যাহা আবশ্যক, তাহাই উপযোগী বা দেখাইয়া দেওয়া—এই শ্রেণীর নভেলের প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের দোষ গুলি দেখাইতে হইলে তাহার কুফল এরূপ ভাবে চিত্রিত করিতে হয় যে, সাধারণ পাঠক মাত্রেই তাহার উপকারিতা বুঝিতে পারে। আবার সুধু বুঝিতে পারিলেই হইল না। ইহাদের বিরুদ্ধে পাঠকের মন এরূপ ভাবে উত্তেজিত হওয়া চাই যে, সে দোষ দূর করিবার জন্য তাঁহাদের কার্য্যকারিণী বৃত্তি গুলি বিশেষ রূপে উত্তেজিত হয়। এই রূপ হইলেই উদ্দেশ্য মূলক নভেলের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল। ইংরাজীতে Uncle Tom's Cabin নামক নভেল এই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। এ নভেল পড়িয়া দাস ব্যব-

সায়ের উপর আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্‌-বাসীদিগের মন এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহারা দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিতে সত্য সত্যই বদ্ধপরিকর হয়—শেষে মহা সমরানল পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হয়; আর সেই সমরের ফলেই তথায় দাস ব্যবসা উঠিয়া যায়। এই রূপেই উদ্দেশ্য মূলক নভেলের সফলতা সম্পাদন হয়। আমাদের দেশে উদ্দেশ্য মূলক নভেল এক খানিও নাই। তবে দীনবন্ধু বাবুর 'নীলদর্পণ' নামক নাটক এই রূপ উদ্দেশ্য মূলক। ইহার সফলতা কতদূর হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন।

এই রূপে সমাজের যাহা উপকারী, অথচ যহা সমাজে প্রচলিত হয় নাই, তাহার উপকারিতা বুঝাইবার জন্যও অনেক সময় নভেল লিখিত হয়। এগুলিও উদ্দেশ্য-মূলক নভেলের এক অঙ্গ বিশেষ।

এই সকল উদ্দেশ্য মূলক নভেলে চরিত্রের তত অধিক স্ফূর্ত্তি হয় না। আর উদ্দেশ্য-মূলক নভেলে চরিত্র চিত্র করিবারও তত সুবিধা নাই। সমাজ শরীরে চরিত্রকে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। সকলেই জানেন, সমাজ শরীরী। ইংরাজীতে ইহাকে Super-organic creation বলে। যেমন একটী একটী পরমাণু লইয়া বৃহৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়—যেমন বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র হয়, সেই রূপ একটী একটী মনুষ্য একত্র করিয়াই সমাজ সৃষ্টি হয়। আবার সমাজে মানুষের স্বতন্ত্র সত্বা, তাহার স্বাধীনতা ডুবিয়া থাকে, নতুবা সমাজ সংঘটিত হইতে পারে না। যেমন বহু সংখ্যক ইট, কাট, চুণ, সুরকি প্রভৃতি লইয়া একটা বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, সে অট্টালিকার গঠন, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার বাসোপযোগীতা প্রভৃতি দেখিতে গেলে এক এক খানি ইট বা কাষ্ঠ দেখা সম্ভব হয় না;—সেইরূপ সমাজ চিত্র করিতে গেলে যে এক একটী মানুষ লইয়া সমাজ হয়, তাহা চিত্র করা হয় না। এই জন্য সামাজিক নভেলে চরিত্র চিত্রের তত সুবিধা নাই। বরং উভয় কার্য্য পরস্পর এক রূপ বিরোধী। আবার সমাজ চিত্রিত করিতে হইলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিষয় উল্লেখ করা হয় না—আবার স্বাধীন মানুষ চিত্রিত করিতে হইলে সমাজে তাহার যে অধীনতা, তাহাও চিত্র করা হয় না। সকলেই জানেন, স্বাধীনতাতেই মানুষের স্বাতন্ত্র্য, আর অধীনতাতেই—মানুষের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াই সমাজ সৃষ্টি। দেখ, সমাজের রীতি, নীতি, অবস্থা বা কার্য্য প্রণালী চিত্রিত করিতে যদি তুমি কেবল ব্যক্তি বিশেষের যাহা বিশেষ গুণ—অথবা তাহার বিশেষ কার্য্য চিত্রিত করিতে যাও, তবে সমাজের চিত্র করা হইল কই? সমাজের রীতি নীতি, কার্য্য প্রণালী ত সাধারণ রীতি নীতি ও কার্য্য প্রণালী—তাহা সুধু মানুষ বিশেষে নহে, সাধারণে তাহা দেখিতে পাইবে। কিন্তু কোন বিশেষ চরিত্রের বিশেষ অবস্থা, নীতি ও কার্য্য প্রণালী কিছু সমাজের সাধারণ বিষয় হইতে পারে না। আর তাহা হইলেও সে চরিত্রের বিশেষত্ব রহিল কোথায়? এই জন্য সামাজিক বা উদ্দেশ্যমূলক নভেলে চরিত্রস্ফূর্ত্তির বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

স্থানাভাব প্রযুক্ত এবারও পুস্তকাদির সমালোচনা গেলনা, গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

নভেল কত প্রকার।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

পূর্ব্বে নভেলের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া আমরা স্বভাব-বর্ণনা-প্রধান ও চরিত্র-প্রধান নভেলের কথা বলিয়াছি। ইহা ব্যতীত সমাজ-প্রধান নভেলের মধ্যে যেগুলি উদ্দেশ্যমূলক, তাহাদের কথাও বলা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা সামাজিক নভেল সম্বন্ধে অন্য কথা বলিব।

সামাজিক নভেলের মধ্যে আর এক-রূপ নভেল আছে। ইহাদিগকে নীতি-মূলক নভেল বলে। আমরা পূর্ব্বে নীতি-মূলক নভেলের কথা বলিয়াছি, দেখাইয়াছি যে, এরূপ নভেলে শিল্পের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, সকল শ্রেণীর সামাজিক নভেলেই শিল্পের ভাল স্ফূর্ত্তি হয় না। চরিত্রকে স্বরূপে দেখান-তেই—চরিত্রের মূল সূত্র তাহার আভ্যন্তরিক শক্তি-ক্রিয়ার স্বরূপ দেখানতেই শিল্পের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়। এরূপ নভেলে চরি-ত্রের স্বাভাবিক চিত্র থাকে না। ইহাতে সমাজের জন্য চরিত্রের এক অংশ বাদ দিয়া এক অংশ মাত্র চিত্রিত করা হয়—তাহা কখন স্বাভাবিক হয় না। এই জন্যই এই শ্রেণীর নভেলে বিশেষ শিল্প-চাতুর্য্য থাকে না। এই জন্যই ইহারা প্রকৃত পক্ষে নিকৃষ্ট শ্রেণীর নভেল। কারণ শিল্পই নভে-লের প্রাণ।

এই নৈতিক নভেল গুলিও কতকটা উদ্দেশ্যমূলক। কারণ সমাজের মধ্যে যাহাতে বিশৃঙ্খলা না হয়—যাহাতে সকলে ধর্ম্মপথে নীত হয়—তাহাই এই সকল নৈতিক নভে-লের উদ্দেশ্য। যদি সাধারণে অধার্ম্মিক হয়, সমাজ বন্ধন না মানে—সাধারণের যাহাতে অপকার হইবে—বা সাধারণের সুখের পথে যাহা অন্তরায় হইবে, যদি অধিকাংশ লোকে এরূপ কাজ করে, তবে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া যায়—সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। অবশেষে যদি তাহার প্রতি-বিধান না হয়, তবে ধ্বংসের দিকে সমাজের গতি হয়। যাহাতে সমাজের এরূপ দুর্দ্দশা না হয়—যাহাতে লোকের সুনীতি বজায় থাকে—যাহাতে লোকে সমাজের হিতকারী নিয়ম গুলিকে লঙ্ঘন না করে—নৈতিক নভেলের তাহাই উদ্দেশ্য।

সকলেই জানেন যে, প্রধানত সমা-জের জন্যই নীতির আবশ্যক। মনে কর, আমি যদি চুরি করি (অন্তত নিষ্কাম ভাবে অথবা দোষ করিতেছি মনে না করিয়াও চুরি করি, অথবা যদি তাহাতে আমার বিক্ষেপ শক্তির বিশেষ উত্তেজনা না হয়) তাহাতে অবস্থাবিশেষে আমার বিশেষ হানি না হইতে পারে, কিন্তু সাধা-রণের তাহাতে নানা কারণে বিশেষ ক্ষতি। এই জন্য চুরি প্রভৃতি দোষ গুলিকে প্রধা-নত সমাজ সম্বন্ধে অপরাধ বলা যায়। এই রূপ নানাকারণে সহজেই বুঝা যায় যে, সমাজের জন্য নীতির যতদূর আবশ্যক,ব্যক্তি বিশেষের জন্য ততদূর নহে। সুতরাং নীতি-প্রধান-নভেল গুলিতেও চরিত্র স্ফূর্ত্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় না। চরিত্রের মধ্যে নৈ-তিক বৃত্তির ক্রিয়া যতটুকু, প্রধানত তাহাই দেখাইয়া দেওয়া হয়; সে চরিত্রের নৈতিক ভাব, নৈতিক চিন্তা, বা নৈতিক কার্য্যই

চিত্রিত করা হয়। চরিত্রের মধ্যে যেটুকু সুনীতি বা কুনীতি মূলক বৃত্তি বা কার্য্য, তাহাই অঙ্কিত করিয়া তাহার ঘাত প্রতিঘাত, তাহার ফলাফল, অন্য চরিত্রের উপর বা সমাজের উপর তাহার ফলাফল দেখাইয়া দেওয়া হয়। সকলেই জানেন, মনোবৃত্তিই আমাদের নৈতিক ভাবের উত্তেজক। যদি আমাদের পরার্থপর বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তবে আমরা সুনীতির অনুসরণ করি। আর যদি স্বার্থপর বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তবে আমরা প্রায়ই কুনীতির বশবর্ত্তী হই, নিজের স্বার্থের জন্য পরের কষ্ট—পরের দুঃখের দিকে কটাক্ষও করি না। এই জন্য নীতিমূলক সামাজিক নভেলে চরিত্রের স্বার্থপর ও পরার্থপর বৃত্তিরই কার্য্যপ্রণালী বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, এবং সেরূপ কার্য্যে সমাজের বা সে চরিত্রের কিরূপ ইষ্ট বা অনিষ্ট হয়, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অতএব এরূপ নভেলে, চরিত্রের অন্য সমস্ত মানসিক বৃত্তির কার্য্যপ্রণালী, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি বা সম্বন্ধ দেখাইয়া দেওয়া হয় না। অথবা স্বার্থপর বা পরার্থপর বৃত্তি গুলিরও স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়া দেওয়া হয় না।

আর এক কথা, সংসারে সকল সময়ে কিছু পাপীর শাস্তি বা পুণ্যাত্মার পুরস্কার হয় না; বরং সচরাচর পাপী স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া যায়—আর পুণ্যাত্মা বরাবর দুঃখ পায়—ইহাই দেখিতে পাই। প্রকৃত কবি-শিল্পী কিছু সংসারে যাহা ঘটে, তাহার বিপরীত বর্ণনা করিতে পারেন না। কিন্তু নৈতিক নভেল-লেখকের সেরূপ না করিলে চলে না। এই সংসারেই পাপের দুর্দ্দশা ও পুণ্যের পুরস্কার করিতে হইবে। সৎকার্য্যের সুফল ও অসৎ কার্য্যের কুফল দেখাইতে হইবে। কাজেই এই শ্রেণীর নভেল-লেখকের শিল্প কৌশলের দিকে দৃষ্টি করিলে চলে না। এই জন্যই এরূপ নভেলে চরিত্র চিত্রের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয় না।

এই শ্রেণীর অধিকাংশ নভেলের এক দোষ এই যে, যাহাতে সমাজের কোন পরিবর্ত্তন হয়—বা সমাজ যে পথে চলিতেছিল তাহার অন্যথা হইবার সম্ভব হয়, ইহাতে এরূপ কার্য্য বা এরূপ ঘটনা দেখান হয় না। সুতরাং চরিত্রের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি—বা তাহার স্বাধীন ক্রিয়া দেখান এ শ্রেণীর নভেলের উদ্দেশ্য নহে। টেন্ সাহেব বলিয়াছেন যে, এরূপ নভেল-লেখকগণ সচরাচর রক্ষণশীল প্রকৃতি (conservative) সম্পন্ন হয়। পাছে চরিত্রের স্বাধীন ক্রিয়া দেখিয়া লোকে স্বাধীন ভাবে চলিতে ইচ্ছা করে, পাছে তাহারা সমাজের নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হয়—পাছে চলিত নীতির উপর তাহাদের আদর না থাকে, এই ভয়ে তাঁহারা এরূপ চরিত্র আঁকিতে সাহস করেন না। আবার আর এক দিক দিয়া দেখিলে এই শ্রেণীর কোন কোন নভেলে ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায়। মনে কর প্রায় সকল সমাজে এরূপ অনেক রীতি বা ব্যবহার প্রচলিত আছে,যাহা উন্নত নীতির অনুমোদিত নহে। নভেল-লেখক যদি সমাজ সংস্কারকের পথে দাঁড়াইতে যান—তবে তিনি এই সকল কুনীতির দোষ দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন—যাহাতে লোকের মনে সমাজের এ প্রথাগুলিকে কুরীতি বলিয়া বিশেষ রূপে ধারণা হয়, তাহা করিতে চেষ্টা করিবেন। এরূপ

অবস্থায় সমাজের তদানিন্তন অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করায়, চরিত্র গুলি অতিরঞ্জিত হইয়া যায়, একটী চরিত্র লইয়া তাহার স্বাধীন স্ফূর্ত্তি করিতে হইলে—এ কথা ভাল করিয়া বুঝান যায় না। বলিয়াছিত এ গুলিও এক শ্রেণীর উদ্দেশ্য মূলক নভেল। সুতরাং উদ্দেশ্যমূলক নভেলের যে দোষ আছে,ইহাতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। আর যখন এরূপ নভেলে শিল্পই বিশেষ বিকৃত হয়, তখন ইহাদের প্রকৃত নভেলত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

আবার এই নীতি মূলক নভেলেই ব্যঙ্গের অবতারণার বিশেষ প্রয়োজন হয়। দুর্নীতিকে ব্যঙ্গ করিয়া তাহাকে অপদস্থ করা—তাহার প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেওয়া এরূপ নভেলের একটী প্রধান অঙ্গ। কতক কথা অতিরঞ্জিত করিয়া, আবার কতকগুলি বিষয় অল্প রঞ্জিত করিয়া নভেল-লেখক আপনার উদ্দেশ্য সাধন করেন। বিশেষতঃ অনেক সময়ে দোষ দমন করিতে হইলে, ব্যঙ্গ বা এইরূপে তাহাদিগকে অতিরঞ্জিত (caricature) করাই নভেল-লেখকের প্রধান অস্ত্র হইয়া থাকে। বিলাতে স্মোলেট, ডিকেন্স, থেকারেরি প্রভৃতি অধিকাংশ নৈতিক নভেল লেখকই এই উপায়ে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বলিয়াছিত এরূপ নভেলে শিল্প কৌশল বিকৃত হয়—যাহাতে নভেলের নভেলত্ব, তাহাই নষ্ট হইয়া যায়।

এই নৈতিক নভেলের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে, এসম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে নভেলের রুচি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছি। এই শ্রেণীর নভেলে অনেক সময়ে রুচি বজায় থাকে না। কারণ পাপকে অরুচিকর ন্যক্কার জনক করিয়া বর্ণনা না করিলে সাধারণের তাহার প্রতি ঘৃণা বা অরুচি হইবে কেন? এই জন্য এই সকল সদুদ্দেশ্যপূর্ণ নভেলেও অনেক সময়ে খ্যাত-নামা নভেল লেখকগণও রুচি-বিরুদ্ধ অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কথাটা কিছু আশ্চর্য্য জনক বটে। নীতির জন্য দুর্নীতি দেখাইতে হয়, রুচির জন্য অরুচিকর বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়—স্বর্গের পথে নরকের ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া যাইতে হয়। পাকা লেখকের হাতে অনেক সময়েই এই রুচিবিরুদ্ধ বিষয়ের বর্ণনাই বিশেষ ফলোপযোগী হয়। কিন্তু সাধারণ লেখকগণ এ পন্থা অবলম্বন করিলে প্রায়ই বিফল মনোরথ হন, এবং তাহাতে সাধারনকে পাপের দিকে আরও অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। হয়ত রেনল্ডের নভেলে,পাপের কদাচার বর্ণনা করিয়া সাধারণের যাহাতে পাপের উপর ঘৃণা জন্মায়, তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে—হইতে পারে এগুলির উদ্দেশ্য সুনীতি বিস্তার করা। কিন্তু গ্রন্থকার তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বিফল মনোরথ হইয়াছেন। আবার দেখুন, বঙ্কিম বাবু চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর প্রতাপাভিসরণের পাপময় চিত্র অঙ্কিত করিলেও, তাহাতে এরূপ পাপের উপর ঘৃণা আমাদের আরও বর্দ্ধিত হয়—সুরুচির প্রশ্রয় দেওয়া হয়—ইহাতে আমাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে, অথচ অধর্ম্মের দিকে মনকে আকর্ষণ করে না। রোহিণী বা হীরার চরিত্র সম্বন্ধেও অনেকটা একথা বলা যাইতে পারে। তাই বলিতেছি, এই নীতি-মূলক নভেলেও অনেক সময়ে কুরুচির অবতারণা করিয়া

নভেল-লেখক স্বীয় অভীষ্ট সাধন করেন।* তবে যখন এই কুরুচি আমাদের কুরুচি বৃদ্ধি করে—আমাদের পাপ বৃত্তির উত্তেজনা করে, তখনই ইহা বিশেষ নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমরা ইহার দ্বারা স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে পারি, সমাজের কণ্টক (কণ্টক দ্বারা) দূর করিতে পারি, তখন নভেলে ইহাদিগের অবতারণা নিন্দনীয় হওয়া উচিত নহে। তবে এক কথা এই যে, সাধারণ লেখকের হাতে কুরুচি বড়ই কুফল প্রসব করে। কৌশলী লেখকের সংখ্যা বড় অল্প, এই জন্যই সাধারণত সর্ব্বত্রই কুরুচির অবতারণা না করা উচিত। আর এক কথা, যেখানে কুরুচির অবতারণা না করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন—সহজ উপায়ে পাপের দুরবস্থা বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে সে স্থলে ইহার অবতারণা না করাই কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত কুরুচি অবতারণা করিবার একটা সীমা আছে—যাহা গ্রন্থকার কোন কারণেই অতিক্রম করিতে পারেন না। তবে এই সীমা সমাজের অবস্থা-বিশেষে পরিবর্ত্তন হয় এই মাত্র। পাঠকগণ ইহাতে যেন মনে না করেন যে, আমরা কোন রূপে কুরুচির পোষকতা করিলাম। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, শিল্পের জন্য—প্রকৃত কবিত্বের জন্য, যতটুকু প্রয়োজন, তাহাকে কুরুচি বলা যায় না। কার্লাইলের মত কঠোর নীতিবেত্তা ও ধর্ম্মভীরু লেখকও তাহাকে কুরুচি বলেন না। আমরা এস্থলে দেখাইলাম যে, অতি সদুদ্দেশে সুনীতি প্রচারের জন্যই কোন কোন খ্যাতনামা লেখকও কুরুচির অবতারণা করিয়া থাকেন। যতক্ষণ ইহা স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হয়, ততক্ষণ ইহা দূষনীয় নহে। * নতুবা অন্য সকল অবস্থাতেই ইহার অবতারণা নিতান্ত অন্যায় ও অপকারী—দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার দমন হওয়াই উচিত, ও সমাজের সুশৃঙ্খলার জন্য বিশেষ আবশ্যক।

এই সামাজিক নভেলের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক নভেল ব্যতীত আর এক শ্রেণীর

---

* W. Forsyth, তাঁহার Novel and Novelist নামক পুস্তকে বলিয়াছেনঃ—

"What is the character of most of these novels, which were to correct follies and regulate morality? Of a great many of them, and specially those of Fielding and Smolltte, the prevailing features are grossness and licenciousness. Love degenerates into a mere animal passion.........The language of the characters abounds in oaths and gross expressions...... The heroines allow themselves to take part in conversations which no modest woman would have heard without a blush."

* W Forsyth তাঁহার Novel and Novelist নামক পুস্তকের এক স্থানে বলিয়াছেনঃ—

"The novels to correct follies and regulate morality, whose prevailing features were grossness and licenciousness, were the delight of by-gone generation and were greedily devoured by women as well as man. Are we therefore to conclude that our great-great-grand fathers.........were less chaste and moral, than their female posterity? I answer certainly not; but we must infer that they were inferior to them in delicacy and refinement. They were accustomed to hear a spade called a spade, and words which would shock the most fastedious ear in the reign of Queen Victoria, were then in common and daily use."

আমাদেরও কতকগুলি পুরাতন "কুরুচিপূর্ণ" কাব্য সম্বন্ধে এ কথাটা বলা যাইতে পারে।

নভেল আছে। সমাজের আচার ব্যবহার বা রীতি নীতি বর্ণনা করাই এ শ্রেণীর নভেলের উদ্দেশ্য। ইহাদিগকে আমরা সামাজিক আচার-মূলক নভেল বলিতে পারি। ইংরাজিতে ইহাদিগকে Novel of Manners বলে। বাস্তবিক এ বিষয়ে ইতিহাস ও নভেলে বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। ইতিহাসে ও সমাজের চিত্র অঙ্কিত করা প্রধান উদ্দেশ্য—অন্তত আজ কাল ইতিহাসের এইরূপ অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শ্রেণীর নভেলেরও তাহাই উদ্দেশ্য। উভয়েই সমাজের রীতি নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি অঙ্কিত থাকে। এই চিত্র যত স্বাভাবিক, পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হয়—ইতিহাস বা এই শ্রেণীর নভেলের আদর তত অধিক হয়। ঐতিহাসিক নভেল গুলি এই শ্রেণীর। তবে এক কথা এই যে, নভেলে এই সকল সামাজিক আচার ব্যবহার—লোক সাধারণের কার্য্য প্রণালী যত সুন্দর রূপে চিত্রিত করিবার সুবিধা হয়, ইতিহাসের ততদূর হওয়া সম্ভব নহে।

এই শ্রেণীর নভেল গুলিই সমাজের প্রকৃত দর্পণ স্বরূপ। কোন জাতি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থা ছিল—তাহাদের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল—তাহাদের জাতীয় জীবন কি প্রকার ছিল—তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নভেল হইতেই আমরা তাহা জানিতে পারি। বলিয়াছিত ইতিহাসে কোন সময়েই ইহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না—তাহাতে এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নহে। এজন্য তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রথম শ্রেণীর চরিত্র চিত্রের কথা পূর্ব্বে আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রথম শ্রেণীর চরিত্র চিত্রই এই শ্রেণীর নভেলের বিশেষ উপযোগী। বলিয়াছিত এইরূপ সাধারণ চরিত্রচিত্রে, কোন্ প্রকার চরিত্রের লোক কোন্ বিশেষ ঘটনায় কিরূপ কার্য্য করে, তাহাই দেখান হয় মাত্র। চরিত্রের স্ফূর্ত্তি ও পরিবর্ত্তনের দিকে সেরূপ দৃষ্টি রাখা হয় না। সেই জন্যই এই সকল নভেলে এই শ্রেণীর চরিত্র চিত্রিত হয়।

আবার ইহাতে চরিত্র চিত্রের প্রতিও তত লক্ষ্য রাখা হয় না। কারণ সামাজিক রীতি নীতি বর্ণনা করিতে যতদূর চরিত্রের স্ফূর্ত্তির আবশ্যক—বা তাহার চিত্রের প্রয়োজন হয়, তাহার অধিক চরিত্র স্ফূর্ত্তি করিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না। আবার গ্রন্থকার চরিত্রের স্ফূর্ত্তির দিকে—শিল্পের দিকে দৃষ্টি রাখিলে—সমাজের রীতি নীতি, প্রভৃতি প্রায়ই বিশেষ পরিস্ফুট করিতে পারেন না।

ইহা ব্যতীত, সমাজের আচার ব্যবহার বর্ণনা করিতে হইলে টাইপ চরিত্রের অবতারণা করিতে হয়। মনে কর কোন বিশেষ সময়ের বাঙ্গালার সমাজের অবস্থা চিত্র করা যদি কোন গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই সময়ের জাতীয় চরিত্রই গ্রন্থকারকে চিত্রিত করিতে হইবে। তখন সেই সময়ের যাহারা খাঁটী বাঙ্গালী—তাহাদিগকেই চিত্রিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। বলিয়াছিত এই টাইপ চরিত্র—এই জাতীয় চরিত্র, প্রথমশ্রেণীর চরিত্রচিত্রের অন্তর্বর্ত্তী। কিন্তু এরূপ জাতীয় চরিত্রের সকল সময়ে বিশেষত্ব রাখা যায় না। আবার বিশেষত্ব রাখিতে গেলেও সাধারণ সামাজিক রীতি নীতি বা আচার ব্যবহার ভালরূপে চিত্রিত করিতে পারা যায় না। আর যদি

এই সমস্ত টাইপ চরিত্রের অধিক বিশেষত্ব থাকে—তবে তাহা টাইপ হইতে বড় দূরে গিয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদ্বারা সমাজ বর্ণনা চলে না।

এই সামাজিক আচার ব্যবহার মূলক নভেলকেও আবার তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়। যে সময়ে সমাজের প্রথম স্ফূর্ত্তির অবস্থা থাকে, অথবা যত দিন পর্য্যন্ত সেখানে বীরত্বের গৌরব থাকে—সাধারণ লোকে সচরাচরই শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে,—আত্মরক্ষার্থে হউক, অন্য লোককে রক্ষার্থ হউক—সমাজে যত দিন বীরত্বের বিশেষ আবশ্যক থাকে, এক কথায় যত দিন পর্য্যন্ত সমাজে বিশৃঙ্খল ও বীরত্বের সময় থাকে, সে সময়ের সামাজিক অবস্থা চিত্রিত করিতে হইলেই বীর কাহিনীর বিশেষ অবতারণা করিতে হয়। তখন সমাজ চিত্র করিতে হইলে বিপদ, উৎ-শৃঙ্খলতা, অত্যাচার, কার্য্যতৎপরতা, ধন প্রাণের অরক্ষিত অবস্থা ও অশান্তি, এই সকলই চিত্রিত করিতে হয়। মহা ঝটিকা মধ্যে সমুদ্রে জাহাজ যেমন আকুলিত হয়—মানুষও তেমনি বিপদে পড়িয়া আপনা হারা হইয়া পড়ে। তখন স্বাধীন মনের স্ফূর্ত্তি কোথায়—স্বাধীন কার্য্যের স্থান কোথায়? সুতরাং এরূপ অবস্থায় চরিত্রের স্ফূর্ত্তি হয় না—বা যে নভেলে এরূপ সমাজের চিত্র থাকে, তাহাতেও চরিত্র চিত্র করা সম্ভব হয় না। তবে এ সময়ের সকল সমাজেই, সকল জাতিতেই দেখিতে পাই, কতকগুলি বীর পুরুষ এই বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া, আপনার বিপদ তাচ্ছিল্য করিয়া, বিপন্নকে রক্ষা করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন। সমাজের অন্ধকার রজনীতে তখন এই কয়টী মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। সেই জন্য এসময়ের নভেলে প্রধানত এইরূপ চরিত্রই অধিক পরিমাণে চিত্রিত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ত এইরূপ নভেল গুলিকে ইংরাজীতে রোমান্স বলে। আর এই সময়ের সমাজের রীতি নীতি বা অবস্থাকে ইংরাজিতে Chivalrous manners বলে। সুতরাং এরূপ নভেলগুলিকে novel of Chivalrous manners বলা যায়।

ইহার পর সমাজের আর এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়—এই অবস্থাই সমাজে অধিক দিন থাকে। এসময়ে পূর্ব্বেকার বিশৃঙ্খলতা দূর হইয়া যায়। সমাজের মধ্যে আর এত অশান্তি, অরাজকতা বিরাজ করে না। তখন রাজার অধীন থাকিয়া, রাজার সুশাসনে থাকিয়া সমাজ শান্তি ভোগ করে। কিন্তু এ সময়ে রাজার ক্ষমতা অসীম—সমাজ সবে মাত্র অশান্তি হইতে শান্তিতে আসিয়াছে—যাহার দ্বারা সমাজের সুবন্দোবস্ত হইল, তাহাকে সমাজের লোক এ সময়ে দেবতা বলিয়া পূজা করে। আরও তখন সমাজ একরূপ কিছুই নহে, রাজাই সর্ব্বে সর্ব্বা। তখন সমাজের রীতি নীতি বা আচার ব্যবহারের বড় বিশেষ অস্তিত্ব কিছুই নাই—রাজার রীতিনীতিতেই, তাঁহার আচার ব্যবহারেই সমাজ পরিচালিত হয়। বাস্তবিক তখন কোন বিষয়েই সাধারণ লোকের বিশেষ অস্তিত্ব নাই, অথবা তাহা বড় দেখা যায় না—তাহা ফল্গু নদীর ন্যায় অদৃশ্য ভাবে বহিতে থাকে, বাহিরের লোক তাহা দেখিতে পায় না। এই জন্য এ সময়ে সমাজের ইতিহাস বা দেশের ইতিহাস, রাজাদের কাহিনী বই

আর কিছুই নহে। তখন রাজাদের চরিত্রই সাধারণের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এ সময়ের নভেলও সমাজ চিত্র করিতে গিয়া রাজাদের চরিত্র অঙ্কিত করে। এ সময়ে সামাজিক নভেলগুলি ঐতিহাসিক নভেল মাত্র। এই সময়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতিকে ইংরাজীতে Monarchical manners, ও এইরূপ নভেলকে Novel of Monarchical manners বলে।

আবার যখন সমাজের এই রূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তখন এ শ্রেণীর নভেলেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। পূর্ব্ব রূপ সমাজের অবস্থা বহুদিন থাকিলেও কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া, সাধারণ লোকের চরিত্র পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়। মানুষ, ক্রমে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে শিখে। এই সময় হইতেই রাজার প্রভুত্ব ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। মানুষ, আপনার অধিকার, আপনার স্বার্থ বুঝিতে শিখে। যদি রাজা এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব সম্মান বজায় করিতে চেষ্টা করেন, তবেই সমাজে মহা আলোড়ন উপস্থিত হয়। কখন বা সেই আন্দোলনে রাজা বা মন্ত্রী কোথায় ভাসিয়া যায়। ইংলণ্ড ও ফরাসীর রাষ্ট্রবিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা এই কারণেই ঘটিয়াছিল।

আসল কথা, এই সময় হইতেই সমাজের উপর রাজার একাধিপত্য হ্রাস হয়, লোকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া,সমাজকে আপনার ইচ্ছামত গড়িয়া লইতে আরম্ভ করে। এই জন্য এ সময়ের ইতিহাসে শুধু রাজার কাহিনী বা বড় লোকের জীবনী ব্যতীত সমাজের সাধারণ লোকের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও কার্য্য, সমস্তই বিবৃত হইতে আরম্ভ হয়।

এই সময় হইতেই নভেলে সাধারণ চরিত্রের উপর দৃষ্টি পড়ে। চরিত্র চিত্রই নভেলের মূল সূত্র, এজন্য এই সময় হইতেই প্রকৃত নভেল লেখা আরম্ভ হয়। ইহা ব্যতীত সামাজিক নভেলে তখন সমাজের রীতি নীতি আচার প্রভৃতি চিত্রিত করিতে হইলে সাধারণ লোকের রীতি নীতি আচার ব্যবহার চিত্রিত করিতে হয়। সেই সময় হইতে যেমন সাধারণ লোকের hero-worship বা মহাপুরুষ ভক্তি অনেকটা কমিয়া আসে—নভেলেও তাহাদিগের চিত্র অঙ্কিত করিবার তত চেষ্টা করা হয় না। বলিয়াছিত তখন আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত ঘটনার উপর সাধারণের স্পৃহা বড়ই কমিয়া যায়। এই সকল নানা কারণে তখন সাধারণ লোকের রীতি নীতিই নভেলে চিত্রিত হয়। সমাজের এই অবস্থার রীতি নীতিকে ইংরাজীতে citizen manners বলে, আর যে সকল নভেলে তাহার বিশেষ বর্ণনা করা হয়, তাহাদিগকে novel of citizen manners বলা হয়। আমরা ইহাদিগকেই গার্হস্থ্য নভেল বলিয়া থাকি।

অতএব দেখা গেল, নভেলকে অনেক রূপে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। আমরা দেখাইয়াছি যে প্রথমত নভেলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) বাহ্য জগৎ প্রধান (২) চরিত্র প্রধান ও (৩) সমাজ প্রধান। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চরিত্র প্রধান নভেলের চরিত্র চিত্র চারি প্রকার—(১) সাধারণ চরিত্রের প্রতিচিত্র (২)চরিত্রের কাল্পনিক প্রতি-চিত্র, (৩) সাধারণ ও কাল্-

নিক চরিত্রের স্ফূর্ত্তি ও পরিণতির চিত্র, আর (৪) চরিত্রের বৃত্তি বিশেষের চিত্র। এই চরিত্র চিত্র অনুসারে নভেলও চারিপ্রকার হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত চরিত্রকে যেরূপে চিত্রিত করা হয়, তদনুসারেও নভেলকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায় (১) বুদ্ধি-মূলক চরিত্র প্রধান নভেল, (২) বৃত্তি মূলক চরিত্র প্রধান নভেল, আর (৩) কার্য্য-মূলক চরিত্র প্রধান নভেল, আবার সামাজিক নভেলের মধ্যেও এক শ্রেণীর নভেল, (১) উদ্দেশ্য মূলক, কেহবা (২) নীতিমূলক আর এক শ্রেণীর সামাজিক আচার ব্যবহার মূলক নভেলের মধ্যে কতকগুলি বা (৩) রোমান্স, কেহ (৪) ঐতিহাসিক নভেল, আর কেহ (৫) গার্হস্থ্য নভেল। ইহা ব্যতীত নভেল গুলিকে আবার (১) কাল্পনিক (idealistic) (২) স্বাভাবিক (realistic) (৩) সাধারণের উপযোগী (practical) ও (৪) বৈজ্ঞানিক (scientific) এরূপ ভাগেও বিভক্ত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, প্রধান কথা এই যে, শিল্প কৌশল দেখিয়াই উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট নভেল বাছিয়া লইতে হয়। অন্য কথা বারান্তরে বলিব।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু

সময়-ক্রিয়া।

দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার জগতের নিত্য ঘটনা। সারিকা দুর্ব্বল পতঙ্গ বধ করিয়া ভক্ষণ করে, সে কীট ক্ষুদ্রতর কীটাণু বা উদ্ভিদ-জীবী। পক্ষান্তরে সারিকা শ্যেনের ভক্ষ্য, সে শ্যেন আবার ব্যাধের খরশান বাণ প্রহারে হত হয়। আমার কত সাধের আনন্দ-কুটীর ভূকম্পনে ধরাশায়ী হইল, প্রমোদ কুঞ্জ ঝটিকাঘাতে ছার খার হইল, বনমালা নিদাঘ তাপে শুখাইয়া যাইল। যাহাকে ধন প্রাণ, মন বল, যৌবন স্বাস্থ্য, সকলি উৎসর্গ করিয়া লালন পালন করিলাম, বুকের আঁধার আলো করিবার একমাত্র কোহিনুর, অন্ধের চক্ষু, খঞ্জের যষ্টি, আমার সে সুকুমারকে আমার বুক ছিনিয়া দেবতা লইয়া যাইলেন! কে বলে দয়ামায়া দেবতার আছে? তুমি বাঙ্গালার সিরাজউদ্দৌলা, সহরের সাহেব, গ্রামের জমীদার, তোমার ধনবল ও লোক বলের অভাব নাই, আমি দীন হীন দরিদ্র অসহায়, আমার দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর ছিল, তুমি তাহা কাড়িয়া লইলে। আমার ঘরে পতিপ্রাণা প্রেমময়ী ছিল, তোমার দুর্দ্দাম লালসা চরিতার্থ করিতে তুমি আমার মস্তকে লাঠী ও বুকে ছুরিকা আঘাত করিয়া, তাহাকে অপহরণ করিলে। আমার সর্ব্বনাশ করিলে আমি রাজার শরণ লইলাম, রাজা তোমারই সহায় হইলেন। দেবতার ন্যায় মনুষ্য, মনুষ্যের ন্যায় পশুপক্ষী সকলেই নির্ম্মম, নির্দ্দয়। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার জগতের নিত্য ঘটনা।

যাহা নিত্য ঘটনা, যাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই, তাহাই স্বাভাবিক, তাহাই জগতের নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বনবাসী আদিম দার্শনিক, যখন বনবাসী বর্ব্বর সমীপে দর্শন শাস্ত্রের প্রথম বীজ বপন করিয়াছিলেন, প্রতিবেশী ও সন্তানগণ অনিবার্য্য দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে যখন কাতর

চক্ষে চাহিয়া থাকিত, তখন ইহাই বলিয়া দার্শনিক মণ্ডল তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন। আজ সভ্য সমাজে বসিয়া আমরা যে বড় অধিক শান্তিপ্রদ হৃদয়গ্রাহী কোন মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছি, বোধ হয় না। কপাল বল, কর্ম্মফল বল, স্বভাবের নিয়ম বল, দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি দিতে সকলেই সমান। মানবের অনন্ত নরক ভোগ কিছুতেই প্রশমিত হইবার নহে।

সে যাহা হউক, প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিবে, ইহা স্বভাবের নিয়ম বলিয়া নানা বর্ব্বর সমাজে প্রচারিত আছে। অত্যাচার সফল না হইলে, দুর্ব্বলকে মনের সাধ মিটাইয়া যন্ত্রণা দিতে না পারিলেই প্রবলের অনুতাপ। কারণ সে যে প্রবল নহে, অন্তত যত বলবান বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল সে যে তত বলবান নহে, ইপ্সিত সাধনে বিফলতাই তাহার প্রমাণ। এই বিফলতা তাহার সমাজে তাহার নিন্দার কারণ, এবং তাহার পদহানির কারণ। সুতরাং যে দুর্ব্বল তাহার মনোবাঞ্ছা বিফল করে, তাহার প্রতি তাহার মর্ম্মান্তিক আক্রোশ রয়, সে জীবনে মরণে, দেশে বিদেশে, বনবাসে ও মরুস্থলে, নদীস্রোতে ও সাগর গর্ভে বজ্র হস্তে তাহার অনুসরণ করে।

দুর্ব্বলের নালিশ নাই, কাঁদিবার নাই, ভাবিবার নাই। যদি স্বহস্তে সে অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে পারে, তবেই যাহা হউক। দেবতা হউক, মনুষ্য হউক, আর পশু পক্ষীই হউক, যদি আপন বলে অত্যাচারীকে দণ্ড দিতে পারিলাম ত ভাল, নতুবা পড়িয়া পড়িয়া প্রহার সহ্য করিতে হইবে, আর কেহ আমার হইয়া সাহায্য করিবে না, সাহায্য করা দূরে থাকুক, 'আহা'' বলিয়া কেহ এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবে না। প্রবল-পীড়িত আমি বর্ব্বর সমাজের কুষ্ঠরোগী, অত্যাচারী দেবতাকে শাসন করিতে আমি, মনুষ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে আমি, শ্বাপদের হিংসা দমন করিতে আমি। অত্যাচার ও প্রতিহিংসা, অসভ্য সমাজের ঐতিহাসিক ঘটনা এই দুইটী মাত্র। বিবাদ কলহ সংগ্রাম, তাহার নৈতিক অবস্থা। আপন বল বুঝিতে পারি, অত্যাচারের সহিত প্রতিহিংসার অনুপাত অন্তত সমান রাখিতে পারি, তবে টিকিয়া যাইব, নতুবা সংসারের কুরুক্ষেত্রে আমাকে স্ববংশে নির্ব্বংশ হইতে হইবে, শত্রু হাস্য মুখে আমার মৃতদেহে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যাইবে। প্রতিহিংসা—হাতের বদলে হাত, চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ,—অনন্য সহায়ে, স্বহস্তে, এই অসভ্য সমাজের আইন কানুন। সেখানে দুকুড়ি পাঁচ আইন নাই; জজ নাই, মাজিষ্ট্রেট নাই। তুমিই তোমার সকলি। আপনি আপনাকে রক্ষা করিতে পার, তুমি তোমার মিত্র; না পার, তুমি তোমার শত্রু; আর সকলেও তোমার পক্ষে যাহা, তুমিও তোমার পক্ষে তাহা। পুরুষ স্ত্রী, বালক, বর্ব্বর সমাজে সকলেই প্রতিহিংসা-প্রিয়, সকলেই সমর-প্রিয়—প্রতিহিংসা সামরিকতার জননী—কাহাকে একটী কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। জীবন থাকিতে একদিন না একদিন সে প্রতিশোধ লইবেই লইবে।

প্রথমে স্বহস্তে প্রতিশোধ, তাহার পর পরহস্তে প্রতিনিধির দ্বারা প্রতিশোধ। তোমার হস্তে আমার পিতা হত হইয়াছেন, তিনি প্রতিশোধ লইতে পারেন নাই, আমি

তাঁহার প্রতিশোধ লইব। যতদিন মনুষ্য পশু পক্ষীর ন্যায় প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বাস করিত, ততদিন প্রত্যেকে স্বহস্তে প্রতিশোধ লইত। সুতরাং শত্রু পরাস্ত, হত বা তাড়িত হইলে প্রতিশোধ পরিসমাপ্ত হইত। যখন মনুষ্য পরিবার লইয়া বাস করিতে শিখিল, তখন অবধি পরিবারের যে কেহ যে কাহারও প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিল। পরিবারের একজনের সহিত যাহার বিবাদ, পরিবারের সকলের সহিত তাহার বিবাদ। পরিবারের একজনের অপমানে সমস্ত পরিবার কলঙ্কিত, সুতরাং একটী পরিবার নির্ম্মূল না হইলে প্রতিশোধের সম্ভাবনা শেষ হইত না। এমন অবস্থায় পরিবারের মধ্যে বলবীর্য্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাহারই নিকট প্রতিশোধ প্রত্যাশা করিবার সম্ভাবনা। বিবাদমান দুইটী পরিবারের সম্মুখ যুদ্ধে প্রত্যেক পরিবারের সকলে, বাল বৃদ্ধ নারী, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। হতভাগ্য কাপুরুষ সে যে পরিবারের কলঙ্ক মোচন উপেক্ষা করে। কখন কোনও কারণে বা বিবাদমান পরিবারের এক এক জন সমস্ত পরিবারের প্রতিনিধি রূপে দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। সেই প্রতিনিধির পরাজয়ে, সমস্ত পরিবার পরাস্ত, তাহার বিজয়ে সকলে গৌরবান্বিত হইত।

প্রতিনিধি প্রথা আরম্ভ হইলে ক্রমে তাহার বিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। মিত্র, পরিবারের আত্মীয়, এক গোত্র-সম্ভূত বিদেশী ক্রমে পরিবারের প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত হইতে থাকে। সাধারণত প্রতিশোধকারী পরিবারের কেহ হইলে পরিবার গৌরবান্বিত হয়। সেই গৌরব রক্ষার্থ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রধানত পরিবার মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পরিবারে উপযুক্ত লোকের অভাব হইলে পরিবারের নিকট আত্মীয় বা মিত্র প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত হয়। ক্রমে বেতনভোগী ভৃত্য পরিবারের হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। পরিবারের কেহ পরিবারের যুদ্ধ করিলে যত গৌরব হয়, আত্মীয় করিলে তত হয় না। আবার আত্মীয় অপেক্ষা মিত্র হীনতর, এবং ভৃত্য হীনতম প্রতিনিধি। সামরিক প্রবৃত্তি হীনতার লক্ষণ এবং ধন বৃদ্ধির চিহ্ন বেতনভোগী সৈন্য। যে পরিবার, যে জাতি বা যে রাজ্যে বাহুবল যত হীন হয় এবং ধন বল যত বলীয়ান হইতে থাকে, সে পরিবার, গোত্র বা জাতির বাহিরের লোক লইয়া ততই যুদ্ধ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

পরিবার সম্বন্ধে যে নিয়ম, কয়েকটী পরিবার একত্র হইয়া যখন একটী জাতি গঠিত হয়, তখনও সেই নিয়ম চলিতে থাকে। দুই জাতিতে যুদ্ধ হইলে, এক জাতির সকলে বা তাহাদের প্রতিনিধিগণ যুদ্ধ করে, এবং প্রতিনিধির জয় পরাজয় সমস্ত জাতির জয় পরাজয় রূপে গণ্য হয়। দ্বন্দ যুদ্ধে একজন পরাস্ত হইলে, সে যাহাদের প্রতিনিধি, সে জাতির সকলে বিজয়ী জাতির অধীনতা স্বীকার করে। কালক্রমে প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে বেতন-ভুক্ত সৈন্য পোষিত হয় এবং তাহাদিগের তত্বাবধারণার্থ সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনাপতি নিয়োজিত হইয়া থাকে।

যুদ্ধের পর পরাজয়ে দোষীর দোষ সাব্যস্ত হয়। পরাজয় কেবল শারীরিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে, নৈতিক দুর্ব্বলতারও পরিচায়ক। তুমি দোষী না হইলে

যুদ্ধে তুমি পরাস্ত হইবে কেন? বস্তুত বর্ব্বর সমাজে ন্যায় অন্যায়ের অন্য অর্থ নাই, অন্য বিচার নাই। তুমি আমার ক্ষতি করিয়াছ, আমি তাহার প্রতিশোধ লইব; পরকালে আর একজন দণ্ড দিবেন, এ সব কূট তার্কিকতা বর্ব্বর হৃদয়ে স্থান পায় না। তুমি আমার ক্ষতি করিয়াছ, আমি তাহা পূরণ করিব। ক্ষতি করিয়াছ কি না তাহার প্রমাণ তোমার জয় পরাজয়। তুমি জয়ী হইলে বুঝিব, ক্ষতি করিতে তোমার অধিকার ছিল, অথবা তুমি ক্ষতি কর নাই অন্যে করিয়াছে, পরাজিত হইলে তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। পরাজয়-জনিত তোমার কলঙ্ক কখনও আমার ক্ষতি পূরণ করে, কখনও বা তুমি আজীবন আমার দাসত্ব করিয়া তাহার পূরণ কর। কখনও বা অঙ্গের বদলে অঙ্গ, প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ লইয়া ক্ষতিপূরণ করা হয়। কখনও বা অঙ্গ বা প্রাণের মূল্য লইয়াও তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। এই রূপে প্রতিশোধ লইলেই সকল দাবী দাওয়া মিটিয়া যায়, ইহকালে পরকালে আর তুমি আমার নিকট ঋণী রহিলে না। আমার নিকট ভিন্ন আর কাহারও নিকট তোমার জবাব দিহি করিতে হয় না। সমাজ বা সমাজের প্রতিনিধি রাজার নিকট দোষী ব্যক্তি অপরাধী; অপরাধ ব্যক্তিগত নহে, সমাজগত, এ চিন্তা সভ্য-সমাজোচিত। আমার নিকট তুমি দোষ করিয়াছ, আমার সঙ্গে তোমার হিসাব, আমি যে প্রকারে পারি সে হিসাব মিটাইব, অন্যের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই; আমার সঙ্গে হিসাব মিটিলেই হইল, আমার নিকট অপরাধ করিলে তুমি আর কাহারও নিকট হিসাব দিতে বাধ্য নহ, ইহাই বর্ব্বর সমাজের নিয়ম। ক্রমে এই আমি আমার পরিবারে, পরিবার জাতিতে, জাতি সমাজে পরিণত হয়। তখন আমি তোমাকে ক্ষমা করিলেও সমাজ তোমাকে ছাড়ে না, রাজা তোমাকে দণ্ড দেন। প্রথমে অঙ্গের পরিবর্ত্তে অঙ্গ লইতাম, তাহার পর মূল্য লইতাম, এখন তাহাই জরিমানা রূপে সমাজের প্রতিনিধি রাজার নিকটে দিতে হয়। প্রাচীন দাসত্ব এখন কারাবাসে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ন্যায়ান্যায়ের বিচার হইত, যে হারিত সেই দোষী বলিয়া গণ্য হইত। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরিবর্ত্তে সময়-ক্রিয়া, দিব্য, মহা পরীক্ষা বা Ordeal দ্বারাও এক সময়ে সকল দেশে ন্যায় অন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইত। বস্তুত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ এক প্রকার সময়-ক্রিয়া মাত্র। প্রথমে প্রবলতা ন্যায়ের পরিচায়ক ও দুর্ব্বলতা অন্যায়ের নিদর্শক বলিয়া গণ্য হইত। এখন ন্যায়ই প্রবলতার এবং অন্যায়ই দুর্ব্বলতার কারণ বলিয়া গণ্য হয়। তুমি দুর্ব্বল হইলেও ন্যায়ের সাহায্যে তুমি বলবানকে পরাস্ত করিতে পার। অপেক্ষাকৃত সভ্যতর সমজে এই কারণেই ন্যায়ান্যায়ের বিচার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিষ্পন্ন হইত। আবার ন্যায় সাহায্যে দুর্ব্বল যদি প্রবলকে পরাভূত করিতে পারে, স্বভাবের নিয়ম বিপর্য্যস্ত করিতে পারে, তবে ন্যায় বলে স্বভাবের অন্যান্য নিয়ম কেন বিপর্য্যস্ত করা যাইবে না? অগ্নিতে দাহ করে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু ন্যায়ের সাহায্যে আমি ইহারও ব্যতিক্রম করিতে পারি, ধর্ম্ম কি প্রাকৃত নিয়ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? এরূপ

যুক্তি এখন আমরা উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু এক সময়ে অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজেও এই রূপ যুক্তি হেতু সময়-ক্রিয়া বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সভ্য সমাজে সাক্ষ্য লইয়া বিচার নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু অনেক অপরাধ আছে যাহার সাক্ষ্য মিলে না। সভ্য সমাজে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিতে হয়। এক শত জন অপরাধী নিষ্কৃতি পায়, সেও ভাল, এক জন নিরপরাধীর দণ্ড না হয়, ইহা সহৃদয় সভ্য সমাজের নিয়ম। যেখানে সাক্ষ্য মিলিত না, পূর্ব্বে সভ্যতর জাতির মধ্যেও সময়-ক্রিয়া দ্বারা সে সকল মোকদ্দমার বিচার হইত। তখন বিশ্বাস ছিল, দেবতা মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই দোষী নির্ব্বাচনে সাহায্য করিবেন বলিয়া সকলে আশা করিত। যখন শিক্ষাগুণে রাজ বিচারে সময়-ক্রিয়া উপেক্ষিত হয়—তখনও সাধারণের মন হইতে উহার প্রভাব তিরোহিত হয় না। ইংলণ্ডে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহা পরীক্ষা রাজ দরবার হইতে দূরীভূত হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতেও সাধারণ লোকে সময়-ক্রিয়া দ্বারা ডাকিনী প্রেতিনী নির্ণয় করিত। উনবিংশ শতাব্দীতেও ইংলণ্ডে ও ইংলণ্ডের ন্যায় সভ্যতাভিমানী য়ুরোপিয় অন্যান্য দেশে মহা পরীক্ষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালে য়িহুদী জাতির মধ্যে কোন রমণীকে ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ করিলে তাহাকে মন্ত্রপূত জল পান করান হইত, গোলড্‌কোষ্টবাসী অসভ্যদিগের মধ্যে এই প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। টাসিটাস বলেন, পূর্ব্বে জর্ম্মণদিগের মধ্যে মহাপরীক্ষা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। স্যাক্সন জাতি অগ্নি পরীক্ষা বা জল পরীক্ষা দ্বারা দোষী নির্দ্দোষী নির্ণয় করিত। অগ্নি-পরীক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে (Free men) এবং জল পরীক্ষা নিম্ন শ্রেণীতে (Villain) আবদ্ধ ছিল। দোষী ব্যক্তি পরীক্ষা দিবার জন্য আবশ্যক হইলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিত, কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইত। কিছু পয়সা পাইয়া বা বন্ধুতা করিয়া প্রতিনিধি পরীক্ষা দিবার জন্য কিছু শারীরিক কষ্ট মাত্র সহ্য করিত। অগ্নি পরীক্ষার দুইটী প্রণালী ছিল। আধ সের একসের বা দেড়সের অগ্নি-প্রায় উত্তপ্ত লৌহ হাতে তুলিয়া লইলে যদি হাতে কোন ক্ষত না হইত, অথবা অগ্নিপ্রায় উত্তপ্ত নয় খানি লাঙ্গলের অর দূরে দূরে লম্ব ভাবে সাজাইয়া চোখে কাপড় বাঁধিয়া রিক্ত পদে তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইলে পায়ে যদি কোন ক্ষত না হইত, তবে পরীক্ষিত ব্যক্তি নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। ইংলণ্ডের রাজা এড্‌বার্ড কন্‌ফেসারের জননী রাণী এমা বিশপ আলুইনের সহিত ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া লোকে সন্দেহ করিলে রাজার মাতা এই দ্বিতীয় প্রণালীতে অগ্নি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় বিলিয়াসের রাজত্ব কালে হরিণ চুরী অপরাধে পঞ্চাশ জন লোককে অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় জল পরীক্ষাও দুই প্রকার ছিল। কেহ উত্তপ্ত জলে হাত ডুবাইয়া হাতে ক্ষত না হইলে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইত। কাহাকেও বা পুকুরে বা নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইত। সাঁতার না দিয়া সে ব্যক্তি জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে তাহাকে দোষী বলিয়া দণ্ড

দেওয়া হইত, জলে ডুবিয়া যাইলে নির্দ্দোষিতার সন্দেহ থাকিত না। আরল গডবিন রাজা এডবার্ডের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া সন্দেহ হইলে আধ ছটাক ওজনের এক খণ্ড মন্ত্রপূত রুটী তাঁহাকে খাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। রুটী খানি না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে হইত। রুটীখানি গলায় বাধিয়া গডবিনের মৃত্যু হয়—সুতরাং তিনিই যে প্রকৃত অপরাধী, সে বিষয়ে কাহারই আর সন্দেহ ছিল না। খাইবার সময় যদি শরীর কাঁপিত বা মুখ বিবর্ণ হইত, তাহা হইলেও তাঁহাকে দোষী বলিয়া স্থির করা হইত। নর্ম্মানেরা ইংলণ্ড অধিকার করিবার পর দোষী নির্দ্দোষী বা অপরাধী ও অনধিকারী দ্বন্দ যুদ্ধে নির্ণয় করিবার প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন হতদেহ স্পর্শ করিয়াও নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিবার উপায় ছিল—হত্যাকারী হতদেহ স্পর্শ করিলে তাহা হইতে রক্তস্রাব হইত। ফরাসী দেশে ক্রুশের সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দাঁড় করাইয়া রাখা হইত। যে আগে পড়িয়া যাইত, সেই দোষী বলিয়া স্থির হইত। এদেশে পাশা ফেলিয়াও দোষী নির্দ্দোষী ঠিক্ করা হইত।

সভ্যতাভিমানী গ্রীস দেশেও সভ্যাসভ্য সকল দেশের ন্যায় সময়-ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। বিদ্রোহাপবাদে লোকে তপ্ত লৌহ হাতে লইয়া বা আগুণের উপর দিয়া চলিয়া যাইয়া আপন আপন নির্দ্দোষীতা প্রতিপন্ন করিত। বিথিনিয়া, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় অনেক প্রদেশে জল পরীক্ষার নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্যাম দেশে অগ্নি পরীক্ষা, জল পরীক্ষা বা ব্যাঘ্রের সহিত দ্বন্দ যুদ্ধ করিয়া নির্দ্দোষীতা প্রতিপাদন করিতে হইত।

লিবিংষ্টোন্ সাহেব দেখিয়াছেন, আফরিকা মহাদেশে কোন পত্নী ঔষধ করিয়াছে বলিয়া কেহ সন্দেহ করিলে ওঝা ডাকাইয়া পত্নীগণকে মাঠে লইয়া যায় এবং উপবাস করাইয়া রাখে। অবশেষে ওঝা এক প্রকার গাছের রস সকলকে খাওয়াইয়া দেয়। রস খাইয়া সকলে ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে রস খাইয়া যাহারা বমন করে তাহারা নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু যাহাদের উদরাময় হয় তাহাদিগকে ডাকিনী বলিয়া জ্বলন্ত অনলে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। জাম্বেজী তটবাসী নিগ্রোদিগের মধ্যে সময়-ক্রিয়ার বহুল প্রাচুর্ভাব। অতি সামান্য কলহে রমণীরা সময়-ক্রিয়া দ্বারা নির্দ্দোষীতা প্রতিপন্ন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। বারুনী জাতি কুকুর বা কুক্কুটকে বৃক্ষ-নির্য্যাস খাওয়াইয়া দোষাদোষের বিচার করে। বমনে নির্দ্দোষ ও উদরাময়ে দোষের প্রমাণ হয়।

ভারতবর্ষে কতদিন সময়-ক্রিয়া প্রচলিত আছে, হিসাব করিয়া বলা যায় না। যে অলিখিত ইতিবৃত্ত দীর্ঘায়াতন লাভ করিয়া পুরাণ আখ্যায়িকা রূপে দর্শন দেয়, তাহার মধ্যে সময়-ক্রিয়ার বিবিধ উদাহরণ পাওয়া যায়। ব্যভিচার সন্দেহে সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা সকলেই অবগত আছেন। মনুসংহিতায় বৎসঋষি অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। ভারতবর্ষীয় অনার্য্য জাতির মধ্যে এই প্রথার অদ্যাপি অক্ষত প্রাচুর্ভাব।

গারো পর্ব্বতবাসীদিগের মধ্যে মোকদ্দমা আদৌ হয় না। তাহারা স্বীয় পদ্ধতি অনুসারে সকল গোলযোগ মিটাইয়া লয়।

কেহ কাহার নিকট টাকার দাবী করিলে তাহারা একটী নূতন হাঁড়ি ভরিয়া আগুণ করিয়া আগুণের উপর জল রাখে, সেই জল নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ফুটিলে টাকার দায়ী হইতে হয় না; তবে যে মিথ্যা দাবী করে, তাহার অর্থ দণ্ড হয়।

আর্য্যসমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতে নয় প্রকার দিব্য বা সময়-ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। বৃহস্পতি বলেন ;—

"ধটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষংকোষশ্চপঞ্চমং-
ষষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলা প্রোক্তাঃ সপ্তমংতপ্ত মাষকং।
অষ্টমংফাল মিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতিং।
দিব্যান্যেতানি সর্ব্বানি নির্দ্দিষ্টানি সয়ম্ভুবা।"

বিষ্ণু ধট অগ্নি উদক বিষ ও কোষ, এইপাঁচ প্রকার সময়-ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় অপর চারিটী এবং তিল দুর্ব্বাদি অন্যান্য আরো অনেকগুলি সামান্য বা সাধারণ বলিয়া তিনি তাহাদিগের উল্লেখ করেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ;—

"তুলাগ্ন্যাপোবিষং কোসাদিব্যানীহবিশুদ্ধয়ে
মহাভিযোগেস্বেতানি শীর্ষকস্থেঽভিযোক্তরি।"

কাত্যায়ন সপ্তবিধ দিব্যের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"বিষে তোয়েঽতাশেচ তুলা কোষে চ তণ্ডুলে
তপ্ত মাসক দিব্যে চ ক্রমাদ্দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ।"

ধট বা তুলা পরীক্ষার প্রক্রিয়া এইরূপ ;— চারি হস্ত উচ্চ দুটী খুঁটির উপর খদির বা তিন্দুক কাষ্ঠের পাঁচ হাত লম্বা পতাকাধ্বজ শোভিত তুলাদণ্ড বসাইয়া তাহার দুই পার্শ্বে লৌহ বলয়ে সমান লম্বা দুইটী শিকা ঝুলাইয়া একটীতে অপরাধীকে বসাইয়া ওজন করিয়া লইবে। তাহার পর তাহাকে নামাইয়া প্রাড়্বিবাক ধট ও পরীক্ষকদিগকে এইরূপ সম্বোধন করিবেন ;—

"ব্রহ্মঘ্নাং যে স্মৃতা লোকাঃ যে লোকাঃ কূট-
সাক্ষিণাং
তুলাধারস্য তে লোকা স্তুলাং ধারয়তো মৃষা।
ধর্ম্মপর্য্যায় বচনৈর্ধট ইত্যাভিধীয়সে
ত্বমেব ধট জানীষে ন বিদুর্য্যানি মানুষাঃ।
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষস্তুল্যতে ত্বয়ি
ত্বদেনং সংশয়াদস্মাদস্ম তস্মা ত্বমর্হসি।" বিষ্ণু

অপরাধী তখন এই বলিয়া ধটকে সম্বোধন করিবে ;—

ত্বং তুলে সত্যধামাসি পুরাদেবৈর্বিনির্ম্মিতা
তৎসত্যং বদ কল্যাণি সংশয়স্মাং বিমোচয়
যদ্যস্মি পাপ কৃম্মাতে স্ততোমাং ত্বং অধোনয়
শুদ্ধশ্চেদ্গময়োর্দ্ধাং মাং তুলানিত্যভিমন্ত্রয়েৎ

তদনন্তর পুনর্ব্বার অপরাধীকে তুলাদণ্ডে বসাইয়া ওজন করিবে। যদি অপরাধী পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর হয়, তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে, পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইলে দোষী জানিয়া দণ্ড দিবে। এখানে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। ভারতবর্ষে লঘুতর নির্দ্দোষীতার প্রমাণ। গ্রীসদেশেও লঘুতা নির্দ্দোষীতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ইংলাণ্ডে লঘুতা দোষের প্রমাণ। ইদনোদ্যানে আদি পুরুষকে পাপ পথে প্রবৃত্ত করিবার সময় শয়তান ধরা পড়িলে গাব্রেলের সহিত বিবাদ হইবার উপক্রম হয়। সহসা আকাশ পথে একটী তুলাদণ্ডের আবির্ভাব হইল। সে দণ্ডের এক পার্শ্বে গাব্রেলের প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত, তুলাদণ্ডে আপনাকে লঘুতর পরিমিত হইতে দেখিয়া শয়তান রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। যথা—

"Now dreadful deeds
Might have ensued...had not soon
The Eternal to prevent such horrid fray
Hurry forth in heaven his golden scales.

In these he put two weights,
The sequel each of parting and fight:
The latter quick up flew and kicked
the beam
The fiend looked up and knew
His mounted scale aloft: nor are but
fled" *Milton.*

অগ্নি পরীক্ষাঃ—

ষোড়সাঙ্গুলং তাবদন্তরং মণ্ডলংসপ্তকং কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রাঙ্মুখস্য প্রসারিত ভুজ-দ্বয়স্য সপ্তাশ্বথ পত্রাণি করয়োর্দদ্যাৎ। তানি চ করদ্বয় সহিতানি সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। ততস্তত্রাগ্নি বর্ণ লোহ পিণ্ডং পঞ্চাশ পলিকং সমং ন্যসেৎ। তমাদায় নাতিদ্রুতংনাতি বিলম্বিতং মণ্ডলেষু পদন্যাসং কুর্ব্বন ব্রজেৎ। ততঃ সপ্তমং মণ্ডল মতীত্য ভূমৌ লোহ পিণ্ডং জহ্যাৎ।

যো হস্তয়োঃ কচিদ্দগ্ধ স্তমশুদ্ধং বিনির্দিশেৎ
ন দগ্ধঃ সর্ব্বথা যস্তু স বিশুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥ বিষ্ণু

যোড়শাঙ্গুল ব্যাস পরিমিত সাতটী বৃত্ত সম-দূরে অঙ্কিত করিবে। ও অভিশস্তকে পূর্ব্ব মুখে বসাইয়া হাত বিস্তৃত করিয়া দুই হাতের ভিতর সাতটী অশ্বথ পত্র রাখিয়া সূতা দিয়া হাত জড়াইয়া পঞ্চাশ পলিক ভার অগ্নিপ্রায় লৌহ পিণ্ডে রাখিবে। সেই পিণ্ড লইয়া অভিশস্ত ধীরে ধীরে সেই সাতটী বৃত্তে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে, এবং সপ্তম বৃত্ত অতিক্রম করিয়া লোহপিণ্ড মাটীতে রাখিয়া দিবে। যাহার হাত কিছু মাত্র দগ্ধ হইবে, সে দোষী, অন্যথা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

লৌহপিণ্ড গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অভিশস্ত ব্যক্তি অগ্নিকে এই বলিয়া সম্বোধন করিবে;—

ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রুহি সত্যংকরেমম।
যাজ্ঞবল্ক্য।

উদক পরীক্ষা—পঙ্ক শৈবাল দুষ্টগ্রাহ মৎস্য জলৌকাদি বর্জিত জলাশয়কে এই বলিয়া সম্বোধন করিবে;—

ত্বমম্ভঃ সর্ব্বভূতানা মন্ত শ্চরসি সাক্ষিবৎ
ত্বমে বা স্তো বিজানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ।
ব্যবহারাভি শস্তোহয়ং মানুষস্তয়ি মজ্জতি
তদেনং সংশয়া দস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতু মর্হসি।

তদন্তর অভিশস্ত ব্যক্তি রাগদ্বেষ বর্জ্জিত কোন পুরুষের জানুদ্বয় ধারণ করিয়া "সত্যেন মাভিরক্ষস্ব বরুণ" বলিয়া জলে ডুবিয়া থাকিবে। সেই সময় একজন নাতি ক্রুর মৃদু ধনু দ্বারা (সাত শত অঙ্গুলি পরিমাণ ধনু ক্রুর পঞ্চাশৎ পরিমাণে মৃদু) একটী তীর নিক্ষেপ করিবে, অন্য একজন দ্রুত যাইয়া সেইটী কুড়াইয়া আনিবে।

তন্মধ্যে যো ন দৃশ্যতে স শুদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
অন্যথা ত্ব বিশুদ্ধঃ স্যাদে কাঙ্গস্যাপি দর্শনে।

বিষ পরীক্ষা;—

বিষত্বদ্বিষ মত্বাচ্চ ক্রুরং ত্বং সর্ব্বদেহিনাম
ত্বমেব বিষজানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ।
ব্যবহারাভি সস্তোহয়ং মানুষঃ শুদ্ধি মিচ্ছতি
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতু মর্হসি।

এই বলিয়া হিমাচলোদ্ভব শৃঙ্গি বৃক্ষজাত সাতযব বিষ ঘৃত প্লুত করিয়া অভিশস্ত ব্যক্তিকে খাইতে দিবে। অভিশস্ত এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে;—

ত্ব বিষ ব্রাহ্মণঃ পুত্রঃ সত্য ধর্ম্মে ব্যবস্থিত
ত্রায়স্বাস্মাদভিশাপাৎ সত্যেন ভবমেহমৃতঃ

বেগ বিনা যে সে বিষ জীর্ণ করিতে পারিবে, তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানিবে।

কোষ পরীক্ষা;—

দুর্গাদি উগ্রদেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগের স্নান পূত তিন প্রসৃতি জল পান করিবে। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে

যদি রোগ অগ্নি জ্ঞাতি মরণ রাজাতঙ্ক প্রভৃতি কোন ব্যসন না ঘটে তবে অভিশস্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষী বলিয়া জানিবে।

দুর্গয়াস্নাপয়ে চ্ছুলং মাদিত্যাস্ত চ মণ্ডলং
অন্যেষামপি দেবানাং স্নাপয়ে দায়ুধানি চ।
কাত্যায়ন।

তণ্ডুল পরীক্ষাঃ—আদিত্য স্নান পূত জল ও চাউল একটী মৃন্ময় পাত্রে এক রাত্রি রাখিয়া চৌর্য্যাভিশস্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া তাহার শিরোপরি একখানি পত্র রাখিবে। পত্রে এই কথাটী লেখা থাকিবে;—

আদিত্য চন্দ্রাবলিলোহনলশ্চ
দৌভূমি রাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিচ উভেচ সন্ধ্যে
ধর্ম্মোহি জানাতি নরস্য বৃত্তং।

তদনন্তর তাহাকে ঐ তণ্ডুল ভক্ষণ করাইয়া ভূর্জ্জ বা পিপ্পল পত্রে তিন বার নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করাইবে। শোণিত দৃষ্ট হইলে, হনুতালু বা গাত্র কম্পন হইলে তাহাকে অপরাধী বলিয়া জানিবে।

চাল পড়া খাওয়ান ভারতবর্ষেও অদ্যাপি বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। হণ্টার সাহেব বলেন, ভারতবর্ষীয় নানা অনার্য্য জাতির মধ্যেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের চুকমা জাতির কথা বলিতে বলিতে তিনি বলিয়াছেন "গুরুতর অপরাধে কেহ অভিশস্ত হইলে একটী মৃন্ময় পাত্রে একসের চাউল রাখিয়া পাত্রটী কোন মন্দিরে গৌতমের প্রতিমূর্ত্তি সমক্ষে রাত্রিকালে রাখিয়া দেওয়া হয়।" প্রভাতে মণ্ডলেরা অভিশস্ত ব্যক্তিকে তাহার কিছু চিবাইতে দেয়। অপরাধী হইলে চাল চিবান দুষ্কর হইয়া পড়ে এবং তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে।

"With slight modification, this form of ordeal prevails in every part of India.

Hunter's Statistical Reports.

তপ্তমাষকঃ—ষোড়শাঙ্গুল দীর্ঘ চতুরঙ্গুল খাত মৃন্ময় তাম্র বা আয়স পাত্র বিংশতি পল পরিমাণ উত্তপ্ত-ঘৃত বা তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে সুবর্ণ মাষক নিক্ষেপ করিবে। অভিশস্ত ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি যোগে তাহা উদ্ধার করিবে। করাগ্রে যদি ক্ষত বা বিস্ফোট না হয় তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। বিচারক ঘৃতকে এই বলিয়া আহ্বান করিবেনঃ—

পরং পবিত্রমমৃতং ঘৃত ত্বং যজ্ঞ কর্ম্মসু
দহ পাবক পাপং ত্বং হিম শীতঃ শুচৌভব।

অভিশস্ত এই মন্ত্রটী পাঠ করিবেন

ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্ত শ্চরসি পাবক
সাক্ষিবৎপুণ্য পাপেভ্যো ব্রুহি সত্ করে মম

ফাল পরীক্ষাঃ—

গো-চোরদিগের পক্ষে ফাল পরীক্ষা বিধেয়। দ্বাদশ পল আয়সে অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ ও চতুরঙ্গুল বিস্তার ফাল প্রস্তুত করিয়া তাহা উত্তাপে অগ্নিবর্ণ করিবে। তদনন্তর নিম্ন লিখিত মন্ত্রে অগ্নিকে আরাধনা করিয়া চোরকে সেই ফাল জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে বলিবে। জিহ্বা দগ্ধ না হইলে সে নির্দ্দোষী।

ত্বমগ্নে বেদাশ্চত্বারস্তঞ্চ যজ্ঞেষু হূয়সে
ত্বং মুখং সর্ব্বদেবানাংত্বং মুখং ব্রহ্মবাদিনাং
জটরস্থোহসি ভূতানাংততো বেৎসি শুভাশুভ
পাপংপুনাসি বৈ যস্মাত্তস্মাৎ পাবকউচ্যতে
পাপেষু দর্শয়াত্মানমর্চিষ্মান ভব পাবক
অথবা শুভ ভাবেন শীতোভব হুতাশন।
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষীবৎ
ত্বমেব দেব জানীষে ন বিদুর্য্যানি মানবাঃ

ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতু মহর্ষি।
নারদ।

সাক্ষীর অভাবে অনেক সময়ে ব্যভিচার চৌর্য্যে অগম্যাগম রাজদ্রোহ প্রভৃতি মহাপাতকের যথার্থ বিচার হয় না। সাক্ষী মিলিলেও তাহারা সকল সময়ে সত্য কথা বলে না, কিন্তু দৈব পরীক্ষার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। এই রূপ ভাবিয়া দৈবপরায়ণ লোকে অনেক সময় এই সকল মোকদ্দমায় সময়-ক্রিয়ার অনুসরণ করে।

স্নেহাৎক্রোধাল্লোভতো বা ভেদআরাত্তিসাক্ষিণঃ
বিধি দৃষ্টস্য দিব্যস্য নভেদো জায়তে কচিৎ

আবার শীত বাতে পাছে পরীক্ষার ব্যতিক্রম ঘটে, এ জন্য বিধান করা হইয়াছিল;—

চৈত্রো মার্গশিরশ্চৈব বৈশাখ তথৈবহি
এতে সাধারণা মাসাদিব্যানাম বিরোধিনঃ
ন শীতে তোয় শুদ্ধিঃ স্যান্নোষ্ণকালেঽগ্নি-
শোধনং।
ন প্রাবৃষি বিষংদদ্যাৎপ্রবাতে ন তুলাং নৃপ
পূর্ব্বাহ্নে সর্ব্বদিব্যানাংপ্রদানং পরিকীর্ত্তিতং
নাপরাহ্নে ন সন্ধ্যায়াং ন মধ্যাহ্নে কদাচন।

কোষ তণ্ডুলাদি পরীক্ষা সকল কালেই হইতে পারিত। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে ইংণ্ডের উচ্চ শ্রেণীর জন্য অগ্নি পরীক্ষা ও নিম্নশ্রেণীর জন্য তোয় পরীক্ষা বিহিত ছিল। ভারতবর্ষেও সেই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণস্য ধটোদেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য হুতাশনঃ
বৈশ্যস্য সলিলং দেয় শূদ্রস্য বিষমেবতু।

বৃদ্ধ আতুর ও রমণীগণের জন্য মহা· বিহিত নহে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় অসম্ভব সম্ভাবনা। অদৈবপরায়ণ উনবিংশ শতাব্দীর লোকে বিশ্বাস করিবে কি?

অগ্ন্যাদি পরীক্ষায় নির্দ্দোষী ব্যক্তিও কি কখন নিষ্কৃতি পাইত, স্বতই এ প্রশ্ন মনে উদিত হয়। ১৭৮৩খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর প্রধান মাজিষ্ট্রেট আলি ইব্রাহিম খাঁর সমক্ষে মিতাক্ষরা মতে কয়েক জন লোকের মহাপরীক্ষায় বিচার হইয়াছিল। মৌলবি সাহেব হিন্দু বিদ্বেষী, তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল বরণ হেষ্টিংসকে তিনি এতৎ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রথম খণ্ড এসিয়াটিক রিসার্চেস নামক গ্রন্থে তাহা প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে মৌলবি সাহেবের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

মৌলবি সাহেব বলেন, ধট পরীক্ষা কালে অভিশস্ত ব্যক্তির কি অপরাধ একটী পত্রে লিখিয়া দেওয়া হইত। অন্যান্য প্রক্রিয়া পূর্ব্বমত। তুলা দণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইলেও অপরাধী বলিয়া গণ্য হইত। অগ্নি পরীক্ষার প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র ছিল। নয় হাত দীর্ঘ, এক হাত প্রস্থ, আধ হাত গভীর খাদে পিপুল কাঠের আগুণ জ্বালাইয়া অভিশস্তকে তাহার উপর দিয়া হাঁটিতে হইত। তোয় পরীক্ষায় বাণক্ষেপ পরিপর্ত্তে যতক্ষণ এক জন ধীরে ধীরে পঞ্চাশ পদ না যাইত, ততক্ষণ জল মধ্যে মগ্ন থাকিতে হইত। বিষ পরীক্ষায় বিষাদ মূল বা শঙ্ক বিষ খাইতে দিত, অথবা একটী কলসী মধ্যে সর্প রাখিয়া একটী অঙ্গুরীয় বা মুদ্রা ফেলিয়া দিত। সেই অঙ্গুরীয় উদ্ধৃত করিতে সর্প যদি দংশন না করিত, তবে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। তণ্ডুল পরীক্ষায় শালগ্রাম শিলার সহিত তণ্ডুলও ওজন করিয়া বা তণ্ডুল মন্ত্র-

পূত করিয়া খাইতে দিত। ফাল পরীক্ষায় লৌহ পিণ্ড বা বর্শার ফলা উত্তপ্ত করিয়া হাতে ধরিতে দিত। ধর্ম্ম পরীক্ষায় রূপার ধর্ম্মের প্রতিমা ও লৌহ বা মৃত্তিকায় অধর্ম্মের প্রতিমা গড়িয়া অথবা মাটীর পুতুলে শাদা রঙ্গ দিয়া ধর্ম্মের ও কাল রঙ্গ দিয়া অধর্ম্মের মূর্ত্তি করিয়া গোবর মাখাইয়া বড় জালার মধ্যে রাখিয়া দিত। ধর্ম্মের প্রতিমা তুলিতে পারিলে অভিশস্ত নিষ্কৃতি পাইত! এই সময়ে বিষত্ত তোয় ভিন্ন অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীলোকদিগকেও পরীক্ষা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল।

মৌলবী সাহেব বলেন, শঙ্কর নামে এক ব্যক্তিকে চোর বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল। সাক্ষী ছিল না। অন্যপ্রকার বিচার করিতে চাহিলেও বাদী প্রতিবাদী আগ্রহের সহিত অগ্নি পরীক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। পরীক্ষার ফল দেখিবার জন্যে মৌলবি সাহেব অগত্যা সেই রূপেই বিচার করিতে স্বীকার করিলেন। পরীক্ষা স্থলে হিন্দু মুসলমান সাহেব অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি হইতে পরীক্ষার যে নিয়ম আমরা উল্লেখ করিয়াছি, শঙ্করের পরীক্ষা ঠিক্ সেই রূপেই হইয়াছিল। অগ্নিময় লৌহপিণ্ড হাতে লইয়া সে সাত হাত চলিয়াছিল, তাহার পর ঘাসের উপর পিণ্ড প্রক্ষেপ করিলে ঘাস জ্বলিয়া গিয়াছিল। অথচ তাহার একটী হাতেও ফোস্কা পড়ে নাই।

"He next to prove his veracity rubbed some rice in the husk between his hands; which were afterwards examined, and were so far from being burnt, that not even a blister was on either of them. Since it is the nature of fire to burn, the officers of the court, and people of Benares, nearly five hundred of whom attended the ceremoney, were astonished at the court; and this well wisher to man kind (মৌলবি সাহেব) was perfectly amazed."

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

বাঙ্গালীর ইতালী ভ্রমণ।

(রোম)

কুইরিনাল পর্ব্বত রোমের মধ্যে অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ আছে, তাহার মধ্যে কুইরিনাল অট্টালিকা অতি প্রসিদ্ধ। পোপ ত্রয়োদশ গেরেগরির অনুজ্ঞায় ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রাসাদ ফ্লাসিনো পলজিও নামক স্থপতি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। যখন কোন পোপের মৃত্যু হইত, তেই সময় কার্ডিনালগণ এই বাটীতে সভা করিয়া অন্য একজন পোপ মনোনীত করত, গবাক্ষ হইতে সেই অভিপ্রায় উচ্চৈস্বরে সাধারনের নিকট ব্যক্ত করিতেন। এক্ষণে কুইরিনাল প্রাসাদে রাজা ও রাণী আসিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। রোমে ইহা ভিন্ন আর স্বতন্ত্র রাজবাটী নাই, সুতরাং এইটাই রাজবাটীর নিমিত্ত রীতিমত সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। নৃপতি হম্বার্ট ও রাণী শীঘ্র রোমে আগমন করিবেন, এজন্য এই অট্টালিকা উত্তমরূপ সংস্কৃত হইতেছে। আমরা ঘরগুলি একে একে সমুদায় সন্দর্শন করিলাম। ঘরগুলি নানাবিধ উৎকৃষ্ট ছবি, সুন্দর সুন্দর

ঝাড়, ও গব্‌লিন কার্পেটের ছবি প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত আছে। সিংহাসন গৃহের ভিত্তি সকল লাল সাটীন দ্বারা আবৃত এবং উৎকৃষ্ট লাল মখমলের পর্দায় শোভিত। রাজদূতগণের উপবেশন গৃহ উৎকৃষ্ট নীল সাটীনদ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট বহুমূল্য সেভার পুষ্পাধার, প্রকাণ্ড চীন দেশীয় পুষ্পপাত্র, রাজা ভিক্তর ইমানুএল, নৃপতি ইম্বার্ট এবং রাজ্ঞী মারঘেরিটার সুন্দর চিত্রে সজ্জিত রহিয়াছে।

রাজবাটীর সম্মুখে একটী মনোহর ফুয়ারা বারিধারা উদ্গীরণ করিতেছে। এই ফুয়ারার ধারে কাষ্টর এবং পলক্‌শের সুন্দর মূর্ত্তি শোভিত আছে।

রাজবাটী দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। জুলাই মাস প্রায় অর্দ্ধগত হইল, এক্ষণে বড় গ্রীষ্ম। অঙ্গদিয়া দর দর করিয়া ঘর্ম্ম বহিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি শালের চাপকান, চোগা, এবং বৃহৎ পাগড়ী ব্যবহার করিতে ছাড়ি নাই। এদেশে মোটাকাপড় ব্যবহার ত্যাগ করাও যুক্তি সিদ্ধ নহে, ত্যাগ হইলে হঠাৎ পীড়া হইবার সম্ভব। রাজপ্রাসাদের সন্নিকট রসজিগ্লিওসি প্রাসাদে গমন করিলাম। ইহা ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ডিনাল সিপিও বরঘেশ অনুজ্ঞায় প্রস্তুত হয়। এস্থানে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে অনেক প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ দেখিলাম। মধ্যস্থলে একটী বাগান আছে। স্থানটী বড় মনোরম্য। দুই প্রহরের সময় ধীরে ধীরে বায়ু বহিতেছে এবং অদূরে বৃক্ষ শাখায় ইতালীয় গায়ক পক্ষী অতিতীব্র অথচ মধুরস্বরে গান করিতেছে। পক্ষীর স্বর শুনিয়া তাহা বুলবুল্‌ বস্তার (Nightingale) ডাক বোধ হইল। একটী উচ্চ সোপান মালা পার হইয়া রসজিগ-লিওসি প্রাসাদ মধ্যে ঢুকিলাম। প্রবেশ করিয়াই একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। গৃহের উপরিভাগে প্রস্তরের উপর গিডোর অরোরা অর্থাৎ রথারোহী সূর্য্যমূর্ত্তি, ঘোটক এবং কতিপয় দেবকন্যা সহ চিত্রিত রহিয়াছে। সূর্য্যদেবের অলৌকিক সুবর্ণকান্তি, চতুর্দ্দিকে রক্তাভ মেঘমালা, দেব ঘোটকের গমনোদ্যোগ অতি চমৎকার দৃশ্য! এই ছবি গ্রীবা উন্নত করিয়া দেখিবার কষ্ট হয়, এজন্য সম্মুখে টেবিলের উপর এক খান বৃহৎ আয়না রাখা হইয়াছে। তাহাতেই ছবির অবিকল প্রতিরূপ দেখা যাইতেছে। এখানে অনেক চিত্রকর বসিয়া এই অরোরা মূর্ত্তির নকল লইতেছে, কিন্তু আমার বোধ হয়, তাহার এক খানিও নকল গিডোর ছবির কাছে দাঁড়াইতে পারে না। তবে নকলগুলি মন্দ নহে, গৃহে রাখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এক এক খান ছোট ছোট নকল ছবি প্রায় ১৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। অরোরা ভিন্ন এস্থানের অন্য ঘরে টিসিএন, সালভেটাবোজা, ভানডাইক, রুবেনস্‌ প্রভৃতি চিত্রকরের কয়েকখানি অতি উত্তম চিত্র আছে।

আমরা সেণ্টপিটার্স গির্জ্জা দেখিতে গমন করিলাম। রোম কেন, পৃথিবীর মধ্যে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য স্থান আর নাই। আমাদিগের সম্মুখে এই অপূর্ব্ব বৃহৎ পদার্থ উপস্থিত হইবা মাত্র একবারে হতবুদ্ধি হইলাম। ইহা শিল্প চাতুরীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল। আমি সামান্য মনুষ্য, তাহাতে বর্ণনা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা নাই যে, তাহা বর্ণনা করিয়া পাঠকগণকে উপহার প্রদান করি। যদি আমি রস্কিনের ন্যায় লেখক

হইতাম, তাহা হইলে পাঠকগণ ইহার প্রকৃত বর্ণনা এবং আমার হৃদয় উচ্ছ্বাস উত্তমরূপে জানিতে পারিতেন।

ইতালীয় বিখ্যাত শিল্পীদ্বয় রাফেল এবং মাইকেল এনজিলো দ্বারা সেণ্টপিটার্স সংক্রান্ত প্রায় উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য সমূহ চিত্রিত এবং গঠিত হইয়াছিল। সম্মুখে ধর্ম্মালয়, তাহার দুইধারে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অতি বৃহৎ স্তম্ভমালা বিশিষ্ট গৃহ। দুইপার্শ্বের গৃহের উপরিভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ২৩৮টী ধার্ম্মিক যাজকগণের প্রতিমূর্ত্তি এবং গির্জ্জার উপরিভাগে মধ্যস্থলে যীশু এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে সেণ্টপল, পিটার্স, মেথু, লুক, জন প্রভৃতির বৃহৎ বৃহৎ এবং অতি সুন্দর মূর্ত্তি সমূহ আছে। মূর্ত্তিগুলি দেখিতে ছোট লাগিতেছে কিন্তু প্রত্যেকটী ১৩ হস্ত উচ্চ হইবে। সেণ্টপিটার্সের সম্মুখে দুটী ৪৬ ফিট উচ্চ ফুয়ারায় ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে মিশর দেশীয় একটী বৃহৎ স্তম্ভ শোভিত রহিয়াছে। উহা সম্রাট কালিগুলা ইজিপ্ত হইতে আনয়ন করেন। পোপ পঞ্চম সিক্সটস উহা সেণ্টপিটার্স সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

গির্জ্জায় প্রবেশ সময়ে আমাদিগকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার মত বোধ হইতে লাগিল। গির্জ্জার সম্মুখ স্তম্ভ শোভিত বারাণ্ডা, তদ্ অভ্যন্তরে দুই পার্শ্বে প্রস্তরের মনোহর কনস্তানটাইন এবং সারলেমানের প্রস্তর মূর্ত্তি। সর্ব্বসমেত এই গির্জ্জায় ৭৫৬টী বৃহৎ স্তম্ভ আছে।

সেণ্টপিটার্স ধর্ম্মালয়ের মধ্যে দুইদিকে প্রস্তরাধারে পবিত্র জল রাখা হইয়াছে এবং এক একটী আধার দুইটী করিয়া পক্ষযুক্ত বালকে ধরিয়া আছে। বালকগুলি দূর হইতে ছোট দেখাইতেছে বটে, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখি যে তাহা এক একটী প্রমাণাকার মনুষ্য। ইতালীয় নরনারী ভক্তি সহকারে কর যোড়ে সকলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং কেহ বা জানু পাতিয়া যীশুর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেছে। পার্শ্বে দক্ষিণদিকে শ্বেত প্রস্তরের বেদীর উপর সেণ্টপিটার্সের ব্রনজ্ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। গির্জ্জার মধ্য গুম্বেজে অর্থাৎ গোলাকার ছাদে খ্রীষ্টীয় ধার্ম্মিক যতিগণের 'মোজাইক' কাচে বসান সুন্দর মূর্ত্তি শোভিত। এই মূর্ত্তিগুলি অতি প্রকাণ্ড, এতবড় যে, সেণ্ট লুকের হস্তের লেখনীটী ৭ ফিট দীর্ঘ হইবে। ইহাতে প্রকৃত মূর্ত্তি গুলি যে কত বড় পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি শোভিত আছে, তাহার এক একটী ২৭ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইবে। এই স্থানের মধ্যস্থলে সেণ্টপিটার্সের সমাধি আছে, তাহা চারিদিকে আবদ্ধ এবং সম্মুখে অবতরণের সোপান শ্রেণী। এখানে সমাধির নিকট ৮৯ টী সুন্দর দীপ দিবারাত্র প্রজ্জলিত হইয়া থাকে। সমাধির সম্মুখে ভক্তি পূর্ণ পোপ চতুর্থ পিয়সের বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি। ইহা কানোভার নির্ম্মিত।

আমরা যে দিবস সেণ্টপিটার্সে গিয়াছিলাম, সেই দিন একটী ধর্ম্মোৎসব ছিল। রোমান কাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ প্রজ্বলিত মধুর বর্ত্তিকা হস্তে তার স্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দলে দলে কৌমার ব্রতাবলম্বী বালক যতিগণ আগমন করিল। এই সকল ধর্ম্মের আড়ম্বর আমাকে দেখিতে ভাল লাগিল—হৃদয়ের মধ্যে পৌত্ত-

লিকতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। রোমান কাথলিক পাদরিগণের উপাসনার ভাব বড় গম্ভীর। সকলে কর যোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং স্তোত্রাদি পাঠ এক এক বার সমাধা হইলেই ধর্ম্মসঙ্গীত মঞ্চ হইতে গায়কগণ মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, প্রধান গায়কের বয়স ৬০ বৎসর হইবে কিন্তু তিনি অতি সুকণ্ঠ গায়ক। তাঁহার সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ ক্ষমতা আছে। প্রকাণ্ড কলের অরগ্যান বাদ্য ধ্বনিতে শ্রোতৃবর্গের চিত্ত রঞ্জন করিতেছে।

আমরা সেণ্টপিটার্স হইতে পোপের প্রাসাদ সুবিখ্যাত ভাটিকানে গমন করিলাম। এখানকার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদেশ পত্র আনাইয়া এইস্থান দেখিবার অনুমতি পাইলাম। দ্বারে প্রবেশ মাত্র নানাবর্ণের বসন পরিধান করা সুইসগার্ডগণ বসিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া পরস্পর কি বলাবলি করিল, আমরা সে বিষয় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সোপান শ্রেণী উঠিয়া একবারে ভাটিকান প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। ইহা অতি বৃহৎ, সমুদায় দুই তিন দিবসে দেখিয়া উঠা অসাধ্য। তাহাতে ১৩০০০ সহস্র ঘর আছে। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ বাটী আর নাই। পুস্তকালয়ে অনেক পুস্তক স্তরে স্তরে কাষ্ঠাধারে সাজান রহিয়াছে। গৃহের মধ্যে পুষ্পাধার এবং চিত্রাদি যে কত আছে, তাহা সংখ্যা করা ভার। পোপের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। তিনি মুকুটধারী সম্রাট অপেক্ষাও এখানে সুখে বাস করেন। তাঁহার ভাটিকান একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড উদ্যান, সেই স্থানে তিনি শকোটারোহণে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সিসটাইন গির্জ্জা এই প্রাসাদ মধ্যে আছে। তাহা পোপ চতুর্থ সিকস্টস্ ১৪৭৩ সালে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ঘরে মাইকেল এনজিলোর শেষ বিচারের ছবি খানি দেওয়ালে চিত্রিত আছে। ইহা ভিন্ন এস্থানে ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন উৎকৃষ্ট চিত্র রহিয়াছে। ষ্টানজি নামক গৃহে রাফেলের কয়েক খানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। এই সকল চিত্র দেখিলে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। ভাটিকানে চিত্র, প্রস্তর মূর্ত্তি, কাচের জিনিস সকলই উৎকৃষ্ট। এরূপ বস্তু অনেক ইউরোপীয় রাজবাটীতে আছে কি না সন্দেহ। পোপ এখানকার যে সকল গৃহ সর্ব্বদা ব্যবহার করেন, তাহার মধ্যে যাইবার কাহার অধিকার নাই। পোপ অতিশয় জ্ঞানী এবং নানা ভাষায় সুপণ্ডিত; কিন্তু ইতালীয় সাধারণ লোকে তাঁহাকে কিছুমাত্র ভালবাসে না। সকলেই বীরবর দেশহিতৈষী গাড়িবল্ডির এবং নৃপতি ভিকতর ইমানুএলের গুণগান করে, কিন্তু পোপের নামে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। এটা কালের ধর্ম্ম। ইতালীয় নৃপতির সহিত পোপের বড় দেখা সাক্ষাৎ নাই এবং তিনিও গুরুদেবকে বড় একটা আন্তরিক ভক্তি করেন না। রোমে অদ্য পঞ্চম দিবস ১১টা হইতে ৫টা বেলা পর্য্যন্ত প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ গুলি একে একে সমুদায় দর্শন করিলাম। সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইল, পরে হোটেলে গিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করত পুনরায় এক খানি ভাল শকটারোহণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন জন্য বহির্গত হইলাম। রোমের বাহিরে ভিলা বরঘেশ নামক পল্লীর

নৈসর্গিক দৃশ্য অতি মনোরম্য। সহরের সৌধশ্রেণী, ধূলি, পথিকের দৌড়া দৌড়ি প্রভৃতি পশ্চাৎ রাখিয়া মুনিমনোলোভা এই উপবনে আমরা প্রবেশ করিয়া বিশেষ সুখ বোধ করিলাম। বেলা ৬টার সময় এখানে ভাল ভাল গাড়িতে উঠিয়া দেশের বড় লোকেরা এক ঘণ্টা কাল বেড়াইয়া থাকেন। পদব্রজে শকট সমূহ মধ্যে সাধারণ লোককে একবারেই দেখা যায় না, কেবল হুড় হুড় করিয়া অসংখ্য অসংখ্য সুন্দর শকটে বড় লোকেরা বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছে। নানা অলঙ্কারে ভূষিত রোমের সুন্দরীগণকে দেখিলে দেবকন্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইউরোপ মধ্যে ইহাদিগের ন্যায় সুন্দরী আর নাই। সুদীর্ঘ নাসিকা, সচঞ্চল মৃগ নয়ন, কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগে মুখ খানি যেন গোলাপফুল বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। বিংশবর্ষীয়া রোমক সুন্দরী পৃথিবীর মধ্যে প্রিয়দর্শনা। (অনেক আমাদিগের ভারতবর্ষীয়া পঙ্কজবদনী যোষিতার ন্যায় মুখের ভাব) কিন্তু কিছু অধিক বয়সে তাহাদের সৌন্দর্য্য ক্রমেই হ্রাস হইয়া আইসে—তাই বলিয়া তাহাদিগের রূপের গৌরবের যে হানি হয়, একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ভিলাবরঘেশ্ প্রবেশের দ্বারের দুইদিকে স্তম্ভ শোভিত দুটী ছোট গৃহ আছে এবং তাহার প্রত্যেকের সম্মুখে একটী করিয়া দুটী স্তম্ভ, এতদোপরি দুটী পিত্তলের চিল পক্ষা রহিয়াছে। গৃহদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলে দুই দিকে মিশরের স্তম্ভ ও গৃহের কৃত্রিম অনুকরণে দুটী হাইরোগিলিফিক্ অক্ষরযুক্ত স্তম্ভ এবং ২টী ছোটঘর দৃষ্ট হয়। ইহার পর হইতেই বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ শোভিত উদ্যান এবং তাহার মধ্যে দিয়া বরঘেশ্ প্রাসাদে যাওয়া যায়। এই অতিবিস্তৃত উদ্যান ভূমি এবং তৎসংক্রান্ত প্রাসাদ কৌণ্ট বরঘেশের সম্পত্তি। কৌণ্ট অতি বড় লোক, তাঁহার ভূমি সম্পত্তি দ্বারা প্রত্যহ ত্রিশ সহস্র টাকা আয় হইয়া থাকে। তাঁহাকে কেহ কেহ ভিলার মধ্যের জঙ্গলের সকল অকর্ম্মণ্য বৃক্ষ চ্ছেদন করিয়া কমলা লেবু, পীচ, এপ্রিকট প্রভৃতি ফলের গাছ রোপণ করিয়া, সেই বৃক্ষের ফল বিক্রয় দ্বারা দুই লক্ষ টাকার অধিক বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি এস্থানের নৈসর্গিক মনোহর শোভা বিনষ্ট করিয়া সামান্য ফল বিক্রয় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৌণ্ট স্থানান্তরে থাকেন। তিনি এস্থানে কখন আগমন করেন না, সুতরাং এই বিস্তৃত ভূমি এবং সুরম্য প্রাসাদ তাঁহার অনুজ্ঞা ক্রমে সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে। বরঘেশ প্রাসাদে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্র এবং প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। তাহা সপ্তাহে তিন দিবস সাধারণকে দেখাইবার নিমিত্ত খোলা হয়। বাটীর পুষ্প উদ্যান মধ্যে অনেক ফুয়ারা, কৃত্রিম পার্ব্বতীয় উৎস, গুহা এবং সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি শোভিত আছে। আমরা বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। এস্থানের অনেক ভাল ভাল ছবি বোনাপার্ট লুণ্ঠন করিয়া পারিশ পুরীতে লইয়া গিয়াছেন।

(নেপল্স)—আমরা রোম পরিত্যাগ করিয়া নেপলস্ যাত্রা করিলাম। রোম হইতে নেপলস্ ৮ ঘণ্টায় ট্রেণে যাওয়া যায়। নেপলস্ ৯টা রাত্রে পঁহুছিলাম।

ষ্টেসনের সন্নিকট রেলের গাড়ি হইতেই মুখ বাহির করিয়া দেখি যে একটা নিকটবর্ত্তী স্থানে যেন আগুন লাগিয়াছে। তাহার পর বুঝিলাম, ভিসুভিয়স পর্ব্বতের উপর হইতে রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। ষ্টেসন হইতে হোটেল-অম্নিবস গাড়িতে "হোটেল ভিশুভে" গমন করিলাম। "ভিশুভ হোটেল" অতি বৃহৎ। তাহা নেপলস্ উপসাগর কূলে স্থাপিত। গ্যাসের আলোকমালা সাগরের নীলজলে প্রতিফলিত হইয়া মনোহর শোভা প্রকাশ করিতেছে। হোটেল হইতে সাগর পর পারে ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি ক্রুদ্ধ হইয়া লক লক অগ্নিময় জিহ্বা বাহির করিতেছে। বাঙ্গালীর কাছে এ সম্পূর্ণ অভিনব দৃশ্য! বৃহৎ গভীর সাগর ও তাহার তীরে আবার আগ্নেয় পর্ব্বত! এতটাই দেখিবার এবং কবির বর্ণনীয় বিষয়। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত পেতরার্ক এবং দান্তের দোহাই দিয়া ইউরোপে বসিয়া অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমার হৃদয়ে কবিতার ভাবের ঢেউ কিয়ৎক্ষণ চেষ্টা করাতেও উঠিল না, সুতরাং সম্মুখের একটা অতি চমৎকার দৃশ্য কবিতায় উপহার দিতে পারিলাম না, সেজন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। হোটেলের দ্বারে একজন তথাকার প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে এক খানি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া হাইড্রোলিক কলের দ্বারা উর্দ্ধে উঠিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয়নগৃহে গমন করিলাম। হোটেলের ভোজনাগার এবং বিশ্রামাগার দেখিবার বিশেষ যোগ্য। পূর্ব্বকালে পম্পিয়াই নামক স্থানের ধনাঢ্য লোকের প্রাসাদ সমূহ যে প্রণালীতে নির্ম্মিত ও সাজান হইত, সেই রীতিতে এ ঘরগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। গৃহের ভিতে এবং ছাদে পম্পিয়াইতে যেমন চিত্র থাকিত, এঘর গুলিও সেইরূপ চিত্র করা আছে। ব্রন্জের রোমান দীপাধার এবং দুইটী বৃহৎ চিলপক্ষীর পক্ষ মধ্য হইতে গ্যাসের আলোক নির্গত হইয়া ভোজন গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছে। প্রাচীন সময়ে রোমকেরা যে প্রকার ধাতু নির্ম্মিত চেয়ার, কৌচ প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন, সেই রূপ-নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী সমূহ বিশ্রাম গৃহে আছে। প্রাচীনকালের কারুকার্য্য অনুকরণ করাতে এই স্থানের শোভা বড় ভাল দেখাইতেছে। ইহাতে গৃহ স্বামীর রুচির সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। মশারি না থাকাতে মশক দংশনে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। এসব স্থানে যে মশক আছে, তাহা জানিতাম না। প্রভাতে উঠিয়াই প্রধান কর্ম্মচারীকে এক একটী মশারি দিতে বলিলাম এবং তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখানে মশা, মাছি, ছুই আছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে। ইউরোপের অন্যান্য স্থানের ন্যায় নেপলস্ ততদূর পরিষ্কার নহে। নেপলস্ অতি প্রসিদ্ধ সহর এবং বসতি অসংখ্য, কিন্তু স্থানে স্থানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং অপরিষ্কার।

আমরা প্রাতের আহারাদি সমাপন করিয়া নগর দর্শনে বহির্গত হইলাম। এখানে অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, উত্তম উত্তম সুসজ্জিত দোকান, বড় বড় গির্জা এবং পথ লোকারণ্য দেখিলাম। পথের ধারে অনেক সামান্য দোকানদারগণ বড় বড়

কড়ি, নানাবিধ শাক, নানাপ্রকার কল, কাগজের পাখা, রুটী, পনির, গৃহ পরিষ্কারের বুরুস প্রভৃতি চীৎকার করিয়া পথিকের চিত্তাকর্ষণ করত বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। বড় বড় দোকানে অতি উত্তম উত্তম জিনিশ বিক্রয় হইতেছে। বাহির হইতে সে সকল জিনিশের শোভা অতি চমৎকার দেখাইতেছে। স্ত্রীলোকের সাটিনের সুন্দর সুন্দর পাখা, সাটিন মখমল কাপড়, কাচের ঝাড়, লণ্ঠন, পুষ্পাধার, তৈল-রঙ্গে চিত্রিত চমৎকার চিত্র সমূহ, প্রস্তরের মূর্ত্তি, টেরে কোটা মৃত্তিকার নানাপ্রকার পদার্থ, সাটিন ও মখমল মোড়া-গিল্টি করা রোমান চৌকি, টেবীল, প্রবালের অলঙ্কার, রত্নালঙ্কার, হস্তী দন্তের বিবিধ বস্তু প্রভৃতি দোকানে বিক্রয় হইতেছে। প্রবালের নানাবিধ অলঙ্কার এখানে বিক্রয় হয়, সে সকল অতি চমৎকার। নেপোলিটনগণের কারুকার্য্য বিশ্ব-বিখ্যাত।

আমরা ভিলা নেসলনী নামক স্থানে আকোএরিয়ম দেখিতে গমন করিলাম। ইহার দর্শনী এক ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে হইল। কাচের এক একটা বৃহৎ আধার মধ্যে ভূমধ্য সাগরের নানাবিধ সমুদ্রজীব সযতনে রক্ষিত হইয়াছে। এ প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত জল জন্তু মনুষ্য কর্ত্তৃক কোন স্থানেই প্রতিপালিত হয় নাই। চক্রাকার ষ্টার ফিস্, স্পঞ্জ, প্রবাল কীট, ক্ষুদ্র হিপোকাম্পস ঘোটকাকৃতি, দন্ত বিশিষ্ট মাংসাশী বৃহৎ বৃহৎ বাইন মৎস্য, গোলাকার বৃহৎ সোল মৎস্য, ভীষণ হিংস্র কটেল মৎস্য, বৃহৎ রক্ত বর্ণ কর্কটী প্রভৃতি জলের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। এখানকার রক্ষক একটী বৃহৎ মৎস্যের বক্ষস্থল স্পর্শ করিতে বলিল, আমি তাহা স্পর্শ মাত্র মৎস্যটা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল এবং তৎক্ষণাৎ আমার কি প্রকার বৈদ্যুতিক সংঘর্ষণে শরীর স্পন্দহীন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। এক জন জর্ম্মণ দেশীয় জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এ সকল সমুদ্র জন্তু সুপ্রণালী বদ্ধ করিয়া রাখাইয়া দিয়াছেন।

নেপলসের রাজবাটী অতি বৃহৎ। তাহা ৫৫০ ফিট প্রশস্ত স্থানে স্থাপিত আছে। ইহা ডোরিক, আইওনিক এবং করিনস্থিয়ান শিল্পকারু কর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত হইতেছে। ইতালির অন্যান্য স্থানের রাজবাটীর ন্যায় এটীও সুন্দররূপে সুসজ্জিত আছে। তাহা বিবিধ প্রস্তর মূর্ত্তি, অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র, বিবিধ কাচের বস্তু দ্বারা সাজান আছে। রাজ প্রাসাদের মধ্যে রাজকীয় অভিনয় গৃহ। সেটী বড়ই সুন্দর। এখানে রাজা, রাণী এবং পারিষদগণ অভিনয় সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

এখানকার "সান্‌কারলো" অভিনয় গৃহ ভুবন-বিখ্যাত। ইহার ন্যায় বৃহৎ থিয়েটার পৃথিবীতে আর নাই। গ্রীষ্মকালে এখানে অভিনয় হয় না। শীত ঋতুতে ইতালীয় বিখ্যাত কবিগণের নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে।

নেপলসের জাতীয় চিত্র-সালিকা দেখিবার জন্য গমন করিলাম। গৃহ প্রবেশমাত্র ১৬টী অতি উত্তম প্রাচীন সবুজ রঙ্গের প্রস্তরের স্তম্ভ দেখিলাম। সিংহাসনে উপবিষ্ট জুপিটর, প্রকাণ্ড হর্কুলিস, কামদেব, ভিনশ, একেলিস, উইলিশিশ, মিশর দেশীয় দেব দেবীর মূর্ত্তি, প্রভৃতি অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি, অনেক গুলি গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। একটী গৃহে কেবল পম্পিয়াই হইতে আনীত

ত্রনৃঙ্গ প্রস্তর প্রভৃতির অনেক বস্তু আছে। এক স্থানে কাচের বাক্স মধ্যে সুবর্ণ ও রত্নের অলঙ্কার দেখিলাম, তাহা পম্পিয়াই ধ্বংশ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এ সকল দৃষ্টে, পূর্ব্বকালের বিলুপ্ত একটী নগরের লোকে যে অত্যন্ত ধনশালী ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অলঙ্কার গঠন নৈপুণ্যও অতি চমৎকার, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

চিত্রালয়ে অনেক চিত্র আছে। রাফেল, টিনটারেটো, টিসিয়ান, ভানডাইক, গিডো প্রভৃতি প্রাচীন চিত্র-করগণের বিবিধ সুন্দর চিত্র সমূহ দর্শনে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। এখানে চিত্রকর অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে প্রসিদ্ধ চিত্রের নকল লইতেছে। আমরা একখানি চিত্রের নকল দৃষ্টে বড়ই মোহিত হইলাম এবং অনেক বাক্য ব্যয়ের পর মূল্য স্থির হইলে উহা ক্রয় করিয়া লইলাম। এক এক প্রণালীর চিত্র এক এক গৃহে রক্ষিত আছে,অর্থাৎ ভিনিসিয়ান, বলংনেশ, টাশ-কান, বাইজানটাইন, ডচ, জর্ম্মান, নেপো-লিটান, ফ্লেমিশ প্রভৃতি প্রদেশীয় চিত্র সমূহ প্রণালীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমা-দিগের দেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা যাঁহা-দিগের চিত্র বিদ্যায় অনুরাগ আছে, তাঁহারা যদি ইতালীতে আসিয়া চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহা হইলে বিশেষরূপে জানিতে পারেন। আমাদিগের দেশে যে সকল চিত্র প্রদর্শনী হয়, তাহা দেখিতে লজ্জা বোধ হইয়া থাকে। কলিকাতায় গত প্রদর্শনীতে যে সকল চিত্র রত্নের গৃহে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার একখানিও ভাল নহে। ইউরোপের কোন প্রদর্শনীতে এই সকল চিত্র পাঠাইলেই দর্শকগণ হাস্য করিয়া উঠিতেন। "আর্টষ্টুডিউ" চিত্রালয়ে বঙ্গ সন্তানগণ চিত্র বিদ্যার উন্নতি জন্য চেষ্টা করিতেছেন,ইহা সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইউরোপীয় উত্তম শিল্পীদ্বারা শিক্ষিত না হইলে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

চিত্রশালিকা হইতে গমন কালে পথের মধ্যে একস্থানে কবিকুলতিলক ডান্টের প্রকাণ্ড প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। এটী নূতন নির্ম্মিত হইয়া স্থাপিত হইয়াছে। এমূর্ত্তিটী অতি উত্তম। আমাদিগের কবির মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তির উদয় হইল।

আমরা নগরের বাহিরে কবি ভর্জিলের সমাধি দেখিতে গমন করিলাম। ইহা একটী পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়। আমরা একটী দ্বারে আঘাত করিতে দুই ব্যক্তি রক্ষক আসিল তাহাদিগকে আমরা প্রত্যেকে অর্দ্ধ ফ্রাঙ্ক দিলে সোপান শ্রেণী উঠিতে পারিলাম। তাহার পরে অনেকদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতে উঠিতে হয়। চারিদিকে পর্ব্বতোপরি আঙ্গুরের গাছে, থোকা থোকা আঙ্গুর ধরিয়াছে। পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে বড় পরিশ্রম হইয়াছিল, মনে হইয়াছিল, বুঝি এত পরিশ্রমের পর একটী প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিব,কিন্তু পরে দেখি যে সমাধি মন্দিরটী অতি জীর্ণ ও অপরিষ্কার। গৃহের মধ্যে এক-খানি প্রস্তরখণ্ডে কবি ভর্জ্জিলের নাম লেখা আছে। এস্থানে ভর্জ্জিলের মৃতদেহ নাই। কবির মৃত্যুর পরে, তাঁহাকে দাহন করা হই-য়াছিল এবং একটি পাত্রে তাঁহার চিতা ভষ্ম এই মন্দিরে প্রোথিত করা হয়, তাহাও আবার কালক্রমে এস্থল হইতে গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞায় কাষ্টেল নোবোতে রাখা হইয়াছিল,

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখান হইতে তাহা যে কোথায়, কে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার কোন প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না।

আমরা হোটেলে আসিয়া আহারের গৃহে গমন করিলাম। অনেক নেপোলিটন ভদ্রলোক এবং কামিনী আহার করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। সেই দৃষ্টিতে কেহই অসভ্যতা প্রকাশ করেন নাই, বরং আমরা উপবেশন করিবামাত্র অনেকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কেহই ইংরাজী বুঝেন না, সুতরাং কথোপকথন করা ঘটিল না। এখানে আহারের বন্দোবস্ত মন্দ নহে। ইতালীতে অন্ন ব্যবহার হয় এবং সেই সঙ্গে উত্তম মাংসের ঝোল করিয়া থাকে।

ভিসুভিয়স—তৃতীয় দিবস ভিসুভিয়স পর্ব্বত দর্শনার্থ যাত্রা করা গেল। প্রাতে ৯ টার মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া এক খানি গাড়িতে উঠিয়া নগর পার হইয়া ক্রমে ক্রমে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের উপর অনেক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে ও স্থানে স্থানে আঙ্গুর, পীচ, প্রভৃতি ফলের বাগান সুশোভিত এবং বন্য পুষ্প সমূহ ফুটিয়া রহিয়াছে। আমাদিগকে দুটী কৃষক আসিয়া পীচ, এপ্রিকট, ডুম্বর প্লম, তুতফল প্রভৃতি খাইতে উপহার দিল। তাহারা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। পর্ব্বতের উপর ঘোটকদ্বয় অতি পরিশ্রমের সহিত বৃহৎ শকট খানি টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এক এক বার বোধ হইতে লাগিল যে, ঘোটকদ্বয় বুঝি আর গাড়ি খানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে পারিল না। অবশেষে ভিসুভিয়স হইতে পূর্ব্বকালের গলিত প্রস্তর রাশি দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতের উপর একটী হোটেলে পঁহুছিলাম। এস্থান হইতে ভিসুভিয়স রেলের গাড়িতে উঠিতে হয়। আমরা ৪ চারি ঘণ্টা রৌদ্রে আসিয়া বড় ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। হোটেলে বিশেষ খাদ্য কিছুই ছিল না। আমাদিগের আজ্ঞাক্রমে কপোত মাংস এবং আলু ভাজা প্রস্তুত হইল, তাহাই মহাতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া পথের কষ্ট বিস্মৃত হইলাম। হোটেলের নিকটেই রেলওয়ে ষ্টেসন, তথা হইতে ভিসুভিয়স পর্ব্বতে উঠিতে হয়। পর্ব্বতটী সম্মুখে বিদ্যমান, তাহাতে বৃক্ষ লতা কিছুমাত্র জন্মে না। পর্ব্বতে উঠিবার রেল পূর্ব্বে ছিল না, ইহা সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। রেলের গাড়িতে ১২ জন মাত্র আরোহী উপবেশন করিতে পারে এবং গাড়ি গুলি তারের জড়ান রজ্জুর উপর দিয়া সরল ভাবে উর্দ্ধাধগমনাগমন করে। নিম্ন হইতে উপরের রেলের ষ্টেসেন উঠিতে ৮ মিনিট লাগিল। উপরের ষ্টেসনে আসিবা মাত্র ভীমকায় কয়েকজন পুরুষ আমাদিগকে পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। আমি এখান হইতে পর্ব্বতের উপরিভাগ কিয়দ্দূর এক খানি কাষ্টের দোলার উপর উঠিয়া দুইজন বাহক স্কন্ধে গমন করিলাম। উঠিবার সময় পশ্চাৎভাগে দেখিয়া পড়িয়া যাইবার বড় আশঙ্কা হইতে লাগিল। যদি দৈবাৎ এক জন বাহকের পদস্খলিত হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! উপরের ষ্টেসন হইতে পর্ব্বতের শৃঙ্গ অনেক উচ্চ। আমি

কিয়দ্দূর কাষ্টের দোলায় গমন করিয়া অবশেষে, আমার আত্মীয়গণের সঙ্গে পদব্রজে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দুইজন করিয়া বলবান লোক আমাদিগের প্রত্যেককে উঠাইতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে উঠিতে উঠিতে আগ্নেয় গিরির শৃঙ্গে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের চারিদিকে গলিত প্রস্তর চূর্ণ এবং হরিদ্রাবর্ণ গন্ধক রাশি পড়িয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশের দৃশ্য অতি ভয়ানক। একটা ২০০ ফিট গভীর এবং ৫০০ ফিট প্রশস্ত গহ্বর হইতে অনবরত শত শত তোপের ন্যায় ধ্বনি হইতেছে এবং প্রচণ্ড প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার সঙ্গে ঝর ঝর শব্দে প্রস্তর রাশি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। আমরা কিছু দূরে থাকিয়া এই ভয়ানক নৈসর্গিক ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলাম। এখানে চারিদিকে প্রস্তর রাশি গলিয়া নদীর ন্যায় বহিয়া অদ্রি অঙ্গে পড়িতেছে। এই পর্ব্বত কর্তৃক হারকুলিয়ম এবং পম্পিয়াই অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। অদ্রি শৃঙ্গ হইতে ঐ দুইস্থান, পোজলী, এবং কাপ্রি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপসাগর তটে নেপলস্ এখান হইতে এক খানি ছবির ন্যায় দেখাইতেছে।

নেপল্স—আমরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া মধ্যস্থলে ট্রেনে উঠিয়া গাড়ির নিকট আগমন করিলাম। গাড়িতে উঠিয়া হোটেলে পঁহুছিতে রাত্র হইয়া গেল। ভিস্থভিয়স্ দেখিতে আমাদিগের বিলক্ষণ ব্যয় হইল এবং প্রায় সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কেবল একটী মাত্র পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। এই বিদেশে পর্য্যটন করিতে আগমন করিয়া ভিস্থভিয়সের শৃঙ্গে উঠা বোধ হয় আর কোন ভারতবাসীর ঘটে নাই; এইটী মনে করিয়া অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক বোধ করিলাম। এখানে ইহাও বক্তব্য, নেপলস্ আসিয়া ভিস্থভিয়স সন্দর্শন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এটী স্বভাবের অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য! গ্রাম নগরের শোভা অনেক দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু আগ্নেয় গিরির এরূপ অভিনব দৃশ্য বিশেষ জনতা পূর্ণ নগরের নিকট এবং নীল সমুদ্র সন্নিধানে,—তথা অদূরে কয়েকটা প্রাচীন নগরের ধ্বংশ পরিপূর্ণ স্থান আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভিস্থভিয়স ভিন্ন অন্য কোন আগ্নেয় গিরি সংক্রান্ত বিশেষ স্মরণ রাখিবার যোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা নাই। ভিস্থভিয়সের অগ্ন্যুৎপাৎ পূর্ব্বকালে প্লিনি, ডিওডোরশ্ কেশস্ এবং আধুনিক সময়ে প্রসিদ্ধ তত্ত্ববিৎ হম্বোলট এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পালমাইরি স্বচক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পম্পিয়াই—অনেক ভ্রমণকারী ভিস্থভিয়স ও পম্পিয়াই এক দিবসেই দেখিয়া আইসেন। আমরা পর্ব্বত দেখিয়া তাহার পরদিবস ট্রেনে উঠিয়া পম্পিয়াই ষ্টেসনে গমন করিয়াছিলাম। রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটেই পম্পিয়াই নগরের ধ্বংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ষ্টেসন একটা ছোট গৃহ, তাহার নিকট কয়েকটা করবীর পুষ্পের বৃক্ষে অতি সুন্দর থোকা থোকা ফুল ফুটিয়া আছে। এস্থান অতি সামান্য পল্লীগ্রাম। চারিদিকে মাঠে আঙ্গুরের ও ভুট্টার ক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কৃষক ও দরিদ্র লোকের কুটীর মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে—অদূরে গিরিবর ভিস্থভিয়স ধূম ও প্রস্তররাশি বমন করিতেছেন। ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিস্থভিয়সের অগ্ন্যুৎপাৎ দ্বারা পম্পিয়াই এবং হার্কুলেনিয়ম ধ্বংশ হইয়া যায়।

হার্কুলেনিয়ম এরূপ ভাবে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা মৃত্তিকা মধ্য হইতে খোদিত করিয়া বাহির করাতে, নগরের অট্টালিকাদি কিছুই দেখা যায় নাই। এস্থানের অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি ও হস্ত লিখিত পুস্তক গলিত প্রস্তর দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নেপলস্ চিত্রশালিকায় রক্ষিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞায় পম্পিয়াই নগরটী মৃত্তিকামধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছে। নগরের ধ্বংশ দেখিবার পূর্ব্বে, এখানে যে একটী গৃহে পম্পিয়াই হইতে যে সকল বস্তু মৃত্তিকা মধ্য হইতে বাহির করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য গমন করিলাম। এখানে কয়েকটা মনুষ্য দেহ, কতকগুলি নর কঙ্কাল, অশ্ব, কুকুর, কুক্কুট প্রভৃতির কঙ্কাল দেখা গেল। রুটী, নানাবিধ শস্য, বোতল পূর্ণ তৈল, কাপড়, রজ্জু, ডিম্বের খোসা প্রভৃতি অনেক বস্তু আছে।

পম্পিয়াই নগরের ধ্বংশ দৃষ্টে, তাহা যে অতি সুন্দর স্থান ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহাতে দেবমন্দির, নানাবিধ দোকান, থিয়েটর, বড় লোকের বাটী প্রভৃতির ধ্বংশের শেষ আছে। পথ সকল প্রস্তর নির্ম্মিত, এখনও তাহাতে শকট চক্রের চিহ্ন বর্ত্তমান। পথের পরপারে যাইবার জন্য একটী করিয়া প্রস্তরের সোপান আছে। অনেক বাটীর সম্মুখে প্রস্তরের মধ্যে ফুটা করা আছে; তাহাতে অশ্বারোহীগণ অশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়া স্থানান্তরে স্বকার্য্য সাধনে গমন করিত। শকট সকল গলির মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে এক জন করিয়া সৈনিক পুরুষ থাকিয়া একটী পিত্তলের ঘড়ির ধ্বনি করিত, সেই ঘড়ি কয়েকটী এখনও গলির মুখে, গৃহের ভিত্তিতে টাঙ্গান আছে। একটী মদের দোকানে বড় বড় মৃত্তিকার আধার দেখিলাম; সে গুলি আমাদিগের ঢাকাই জালার মত। অনেক সুন্দর সুন্দর স্তম্ভ শোভিত, প্রাসাদে এবং ভিত্তিতে নানা বর্ণে চিত্র করা, কোন কোন গৃহের প্রাঙ্গন মোজাইক কাজ করা দেখা গেল। একটী গৃহের দ্বার দেশের সম্মুখে রং করা প্রস্তর দ্বারা Have শব্দ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই শব্দটী সে সময় কি তাৎপর্য্য ক্রমে যে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা জানি না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা সম্ভাষণ সূচক। পূর্ব্বে ইতালীয় লোকেরা অশ্লীল মূর্ত্তি ও ছবি ভাল বাসিত। ইহার প্রমাণ এখানকার গৃহের ভিতর ও বাহিরে অশ্লীল পুং চিহ্ন চিত্রিত আছে। ইহা ভিন্ন পম্পিয়াই গৃহের মধ্য হইতে যে কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা অত্যন্ত অশ্লীল। এ গুলি নেপলস্ চিত্র-শালিকায় একটী ঘরে বন্ধ আছে। দর্শকের ইচ্ছানুসারে তাহা দেখান হইয়া থাকে।

এখানে যে একটী ফুয়ারার ধ্বংশ আছে, তাহা বড় সুন্দর, তাহার চারি দিকে এবং গৃহের ভিত্তিতে অতি উত্তম মোজাইক কারুকার্য্য করা হইয়াছে। ষ্ট্রাডা ডেল লুপানার নামে যে স্থান আছে, তাহা বেশ্যা পল্লী ছিল। ইহাতে অনুমান হইতেছে, পম্পিয়াই নগরের লোকের ধর্ম্ম নীতির দিকে যে বড় একটা দৃষ্ট ছিল, তাহা বোধ হয় না। এই নগর ভাল করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, তাহা বিলাসীগণের প্রমোদ ভবন ছিল। বেশ্যালয়, মদের ভাটী, অভিনয় গৃহ, স্নানাগার, সাধারণ বক্তৃতা গৃহ, কিছুরই অভাব

ছিল না। আমরা বুলার লিটনের (Last days of Pompeii) পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। অদ্য সেই প্রাচীন নগর সত্য সত্যই দেখিলাম। একটী প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংশ রাশির উপর উঠিয়া পর্ব্বত-মালা, নেপলস্ উপসাগরের সচঞ্চল নীল জল, এবং অদূরে কাফ্রি, পজলী, প্রভৃতি স্থানের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিলাম। আমি বঙ্গবাসী, অনেক দূরে আসিয়া রোমক জাতীর কীর্ত্তি কলাপ এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছি, কিন্তু নিজের দেশ সোণার ভারতবর্ষের কথা আবার মনে পড়িয়া হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল! সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই—সামবেদ গানে ঋষিগণ আর্য্যভূমি আর পবিত্র করেন না; পাটলিপুত্র, হস্তিনাপুরের হিন্দু নৃপতিগণের শৌর্য্য বীর্য্য বিষয়ে বৈদেশিকগণকেও আশ্চর্য্য করিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভারতবর্ষ কোথায়? আর কি নীতি শাস্ত্র-বিশারদ চানক্য বা কামন্দকের ন্যায় পণ্ডিত ভারতবর্ষে আসিবেন? না আর ভারতবর্ষীয়গণ শাক্যসিংহের পবিত্র উপদেশ শ্রবণে মোহিত হইবে? আমি ভারতবর্ষের পূর্ব্ব শ্রী এবং এক্ষণকার শোচনীয় অবস্থা ভাবিলাম? হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হইল এবং অক্ষিযুগে দুই ফোটা জল আসিল!

পম্পিয়াই এখনও গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞায় খনন করা হইতেছে। অনেক গৃহ মৃত্তিকা মধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছে। এসকল দেখিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে গমন করিলাম। তথায় প্রবালের এবং গলিত (Lava) নির্ম্মিত নানা বস্তু সকল ফিরিওয়ালাগণ বিক্রয় করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আনয়ন করিল। আমরা কিছু ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলাম। এখানে ভিক্ষুকেরও অভাব নাই, কিন্তু তাহারা বেহালা বাজাইয়া গান করিয়া ভিক্ষা করে। অনর্থক বিরক্ত করিয়া পয়সা আদায় করে না। ট্রেণ আসিবামাত্র আমরা নেপলস্ অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। গাড়িতে একজন আইরিশ ছিলেন, তিনি অতি ভদ্র লোক। তাঁহার সঙ্গে রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইল। তিনি কহিলেন, ভারতবর্ষে অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী ভারতবর্ষীয়গণের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তিনি বলিলেন, ইংরাজগণ এখন হইতে ভারতবর্ষের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। আমি তাঁহার সকল কথা গম্ভীর ভাবে শুনিলাম। এই সকল কথাবার্ত্তা হইতে হইতেই গাড়ি আসিয়া নেপলস্ ষ্টেসনে উপস্থিত হইল; এবং আ[illegible] সন্ধ্যার পূর্ব্বে শকটারোহণে হোটেলে [illegible] ছিলাম। পরদিবস অতি প্রত্যুষে ৫ টার সময় রেলওয়ের গাড়িতে উঠিয়া আমরা ফজিয়া হইয়া ব্রিণ্ডিসিতে গমন করিলাম। আমাদিগের ইউরোপ গমনের ব্রিণ্ডিসি আরম্ভ এবং প্রত্যাগমন সময় আবার ব্রিণ্ডিসি ইউরোপের শেষ সীমা। গমন কালে ব্রিণ্ডিসিতে আসিয়া ইউরোপের দ্বার দেশে আসিয়াছি মনে করিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে পুনরায় এখান হইতে ভারতবর্ষ যাইতেছি। আর ইউরোপ দেখিতে আসিবার বড় একটা সম্ভাবনা নাই—চিরকালের জন্য ইউরোপের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি ভাবিয়া মনের মধ্যে কষ্ট হইল।

পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

ভারতের ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাস অতল-স্পর্শ, অগম্য, কালের সুপ্রাচীন গভীর অন্ধকারময় গর্ভে লুক্কায়িত। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের বহুল চেষ্টার গুণে এই মাত্র জানা গিয়াছে যে, প্রায় সমগ্র জগৎ যখন ঘোর অজ্ঞানতা অন্ধকারে ও কুসংস্কারপূর্ণ উপধর্ম্ম বা একেবারে ধর্ম্মবিহীন আরণ্যজীবনের অপরিজ্ঞাত অবস্থায় নিমগ্ন ছিল, ভারতে তখনও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একেশ্বরের পূজা অবিদিত ছিল না। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে যে, কোন প্রকাণ্ড জাতির সমস্ত লোকই ধর্ম্মমতে সমান পরিমাণে উন্নত হইতে পারে। কাজেই ভারতেও উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের অসদ্ভাব ছিল না। যে কারণেই হউক, মধ্যে ভারতীয় আর্য্যবংশীয়গণের অধোগতি হয় এবং তাঁহারা নানা উপায়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে হীন হইয়া পড়েন। এই হীনতাই তাঁহাদের দাসত্ব, তাহার কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ সকল হীনতা হইতে জাতীয় উদ্ধার সাধন জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণের আবির্ভাবও হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই নীচ অবস্থা হইতে ভারতীয় আর্য্যজাতির পবিত্র ধর্ম্ম সংরক্ষণের বহুল প্রয়াস পাইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের চেষ্টা বিফলও হয় নাই। যাহা হউক, আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পবিত্রতা যত দূর সংসাধিত ও পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার তুলনা অন্য কোন দেশেই পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ অজ্ঞানতা ও অন্যান্য নানা মৌলিক কারণে ভারতীয় ধর্ম্মে ক্রমে অনেক দোষ স্পর্শিয়াছিল। সেই সমস্ত দোষ প্রযুক্ত আর্য্যগণের সাধারণ ধর্ম্মভাব পৌরহিত্যাদি নানা অত্যাচার-মূলক ও বিপদসঙ্কুল মতের পোষকতা করিয়া নিজ স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতা হারাইলেন। মনুসংহিতা প্রভৃতিতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুষ্যের স্বাধীন চিন্তার স্রোত যেখানে রোধ হইবে, সেখানে অধঃপতন অপরিহার্য্য। আর্য্য সমাজও ক্রমে অন্তঃসারবিহীন হইয়া আসিলেন। তাহার ফল মুসলমানদিগের কর্তৃক দেশ বিজয়। কখন কোন দেশ অন্যজাতি দ্বারা বিজিত হইতে পারে না, যদি তাহার অন্তরের বল অক্ষুণ্ণ থাকে, যদি তাহার জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ থাকে।

মুসলমানদিগের অধিকার কালে ভারতীয় আবদ্ধ ধর্ম্মভাব কিছু আঘাত পাইয়াছিল। ঐসময়ে জাতিভেদ অনেক শিথিল হয় ও কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন চিন্তার অভ্যুদয় লক্ষিত হয়। সে উপকার কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু অপর দিকে বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় শিক্ষার অভাব, পরের দাসত্ব ও অন্য অনেক কারণে [illegible]দের জাতীয় আরও অধঃপতন হয়, সন্দেহ নাই। তাহাতে আমাদের আধ্যাত্মিকতারও বিশেষ হানি হইয়াছিল, এরূপ উপলব্ধি হয়। সেই উপলক্ষে ধর্ম্মপিপাসু অধিকাংশ সাধু মহাত্মাগণ জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে গিরি-

কন্দরে বা গহন কাননে প্রবেশ করেন; এবং বোধ হয় সেই অবধিই সাধারণ লোক সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি ঈদৃশ আস্থাশূন্য হইয়া সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধিতেই অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া পড়ে। আমাদের অনুমিত কারণে ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে, কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীতে বাস্তবিকই যে আমরা আধ্যাত্মিকতা হারাইয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় স্বকীয় প্রভূত জ্ঞান ও সুতীক্ষ্ণ বিচার শক্তির সাহায্যে আবার সেই প্রাচীনতম ভারতের প্রিয়তম একেশ্বরবাদ প্রচারিত করেন। নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রচারিত মুনি ঋষিদিগের আবিষ্কৃত সুমার্জ্জিত ধর্ম্মমত ধীরে ধীরে ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থান পাইতেছে। কিন্তু এক্ষণে আবার এক নূতনবিধ অন্তরায় উপস্থিত। শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এক দল লোক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা (কি উদ্দেশ্যে বলিতে চাহি না) জাতিকে পুনরায় মধ্যকালীন অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া জড় সাকার দেব দেবীর মূর্ত্তি পূজা করাইতে চাহেন। আমরা এক্ষণে বড় সঙ্কটাপন্ন স্থলে উপস্থিত। এক দিকে বর্ত্তমান শিক্ষা, কালের গতি ও মার্জ্জিত জ্ঞান নিরাকার একেশ্বরবাদের দিকে ক্রমশ আকর্ষণ করিতেছে। অপর দিকে হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতগণ তর্কজাল বিস্তার করিয়া ও হিন্দুশাস্ত্রের অনাদিকাল-সঞ্চিত সাগরোপম গর্ত্ত হইতে উপযোগী রচনাবলী উদ্ধার করিয়া জাতিকে পৌত্তলিকতা ও মূর্ত্তিপূজার দিকে অগ্রসর করিতে চাহিতেছেন। জন সমাজ কোন্ দিকে যায়? এখন শাস্ত ভাবে এ বিষয়ের বিস্তর আলোচনা হওয়া আবশ্যক। জন সাধারণের সমক্ষে, এই উভয় পক্ষের মত পরিষ্কার রূপে বিচারিত হইয়া গেলে, তাঁহারা যে পথ ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত মনে করিবেন, তাহাই অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন।

এক পক্ষের পণ্ডিতগণ আপনাদের মত বিবিধ বিধানে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। অপর পক্ষের মধ্যে বিগত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের নব্যভারতে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বাবু দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় "পৌত্তলিক কে?" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁহার অভিমত কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন। তথায় তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, "সে প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা কোন ধর্ম্মের কিছু আসে যায় না," অর্থাৎ তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য না করিয়া সাধারণ ভাবে পৌত্তলিকতা কি, তাহা বুঝাইতে যত্ন করিয়াছেন, তথাপি অনেকে তাঁহার অভিপ্রায় হয়ত বুঝিতে না পারিয়া নানাবিধ আশঙ্কা করিতেছেন। কেহ মনে করিয়াছেন, তিনি আমাদের দেশের পৌত্তলিকদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, কোন২ লোক মনে করিতেছেন, এইরূপে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মগণও ক্রমে পৌত্তলিক হইয়া পড়িবে!! সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আরও আন্দোলন হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হইতেছি। অল্প ক্ষমতা প্রযুক্ত বিশ্বাস করি না যে, কিছু বিশেষ কথা বলিতে পারিব। তথাপি কয়েকটী কথা, যাহা বলিবার আছে, তাহা লইয়া সমাজে আলোচনা হয়, এই অভিপ্রায়ে সেই কয়টী কথা প্রকাশ করি। কিন্তু এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যদিও দ্বিজদাস বাবুর প্রবন্ধ অবলম্বনে ইহা

লিখিত হইল তথাপি ইহা তাঁহার প্রবন্ধের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ নহে। প্রতিবাদ করিতে গেলে বিস্তর লিখিতে হয়। আমাদের বক্তব্য কয়েকটী কথামাত্র প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

প্রথম প্রশ্ন—পৌত্তলিকতা কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া দ্বিজদাস বাবু বড় গোলে পড়িয়াছেন। তিনি এক জাতীয় পৌত্তলিক দেখিলেন, যাহারা সৃষ্ট কোন বস্তু বা জীবে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া পূজা করে। তাহাদিগের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহাদের পৌত্তলিকতার মূলে ঈশ্বর জ্ঞানের পূর্ণ বা আংশিক অভাব আছে, তদ্ভিন্ন অন্য দোষ নাই। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন যে, তাহাদিগের উক্ত অভাবের জন্য তাহাদিগকে পৌত্তলিক বলিতে গেলে "অনাস্তিক মাত্রেই পৌত্তলিক" হইয়া পড়ে। তবে আর অপৌত্তলিক কে?—কেহই নয়, কেন না কাহারই ঈশ্বর জ্ঞান পূর্ণ নহে, অভাব আছেই আছে। কাজেই তাহাদিগকে আর পৌত্তলিক বলা হইল না। পরে আর এক শ্রেণীর পৌত্তলিক দেখিলেন, তাঁহারা উপাস্য দেব মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলেন না, কেবল ঈশ্বরের স্মরণ মনন ধ্যান ধারণার সৌকর্য্যার্থে চিহ্ন স্বরূপ মনে করেন। দ্বিজদাস বাবু ইহাদিগকেও পৌত্তলিক বলিতে পারিলেন না, কেন না তাহা হইলেও তাঁহার মতে ব্রাহ্ম ও অন্যান্য একেশ্বরবাদীরাও ঐ শ্রেণী ভুক্ত হইয়া পড়েন, কারণ তিনি বলেন, সকলেই কোন না কোন চিহ্ন অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা করিয়া থাকেন। শব্দ বা অন্য কোন চিহ্ন ধরিয়া যদি পৌত্তলিক নয়, তবে মূর্ত্তিচিহ্নধারীগণ পৌত্তলিক নামে কি হিসাবে অভিহিত হইতে পারেন? এ সম্বন্ধে আমাদের মত উপযুক্ত স্থলে ব্যক্ত হইবে। তৎপরে আর পৌত্তলিক পদবাচ্য কোন সম্প্রদায় দেখিতে না পাইয়া তিনি কপটাচারীদিগকেই ঐ নাম দিয়াছেন। তিনি বলেন "কপটতাই পৌত্তলিকতা।......ভণ্ডই পৌত্তলিক, যেহেতু ভণ্ড শব্দে অথবা মূর্ত্ত পুত্তলের লক্ষ্য দেবতাকে উদ্দেশ না করিয়া কার্য্য করে।...... তাহারই দেবতা প্রকৃতপক্ষে জড় পুত্তল, অতএব সেই প্রকৃত পৌত্তলিক।" সুযোগ্য লেখক এই স্থলে নিজেরই কথায় নিজে জড়িত হইয়াছেন। ভ্রাতৃবর এখানে বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ভণ্ড ও তাঁহার প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকদিগের মধ্যে পড়িয়াছে। কেন না তাহারও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান নাই, তাহা হইলে সে কখন এরূপ ভণ্ডামি করিতে পারিত না। সুতরাং তাহার যে কপটতা দোষ, উহারও মূলদেশে প্রকৃত জ্ঞানের অবিদ্যমানতাই লক্ষিত হয়। বোধ হয়, শ্রদ্ধেয় দ্বিজদাস বাবুও মনে করেন না যে, প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান যাহার আছে সে কখন প্রাণান্তেও এতাদৃশ কপটতাচরণ করিতে পারে! তবে আর ভণ্ড কপটও পৌত্তলিক কৈ? যদি বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে হইলেও ত তদুপাসনায় সরলতা না আসিতে পারে, সে কথা তাঁহার ১ম ও ৪র্থ শ্রেণীর লোকদিগের প্রতিও খাটিতে পারে। সুতরাং তাঁহার কথানুসারেই কপটাচারী পৌত্তলিক হইল না। তবে "পৌত্তলিক কে?" এ প্রশ্ন তাঁহার প্রবন্ধে মীমাংসা হইল কৈ? তাহার পরই বলিয়াছেন, "তোমার আমার পরস্পরকে পৌত্ত-

লিক বলিয়া নিন্দা করা বিড়ম্বনা মাত্র।" কেন না "প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন যাহার লাভ হয় নাই, সেই পৌত্তলিক। সে অর্থে হয়ত তুমিও পৌত্তলিক, আমিও পৌত্তলিক।" এবিষয়ে আমাদের আরও বলিবার কথা আছে।

তবে পৌত্তলিকতা কি? এপ্রশ্নের মীমাংসা করা একদিকে যেমন সহজ, আর এক দিকে আবার তেমনি কঠিন। প্রত্যেক নাগরিক, প্রতি বিদ্যালয়ের উন্নত শ্রেণীর ছাত্রই অতি সহজে এপ্রশ্নের এক প্রকার উত্তর দিতে সমর্থ। আবার সুযোগ্য লেখকগণও ইহার রীতিমত ব্যাখ্যা করিয়া নির্দ্দোষ লক্ষণ বলিতে পারেন না। সহজ জ্ঞানের ও সাধারণ দৃষ্টির অর্থ সহজ কিন্তু দার্শনিক ব্যাখ্যা দ্বারা লক্ষণ স্থির করিয়া কোন আখ্যা প্রদান করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। এই কঠিনতা প্রযুক্তই সম্মানিত দ্বিজদাস বাবু শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি অতি উন্নত লক্ষ্য ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া উদার উন্নত চক্ষে কথাটীর প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার লক্ষণ দিতে গিয়া দেখেন, সব গোলযোগ। বাস্তবিকও তাহা অপরিহার্য্য। এমন কি, তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়েরও ঐরূপ দার্শনিক আখ্যা দেওয়া অসম্ভব। মনে করুন, জড়, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী, এই তিন জাতীয় পদার্থ দ্বারা প্রকৃতি পূর্ণ এবং ইহাদের ন্যায় সর্ব্ববাদিসম্মত বিভিন্ন বস্তু আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহাদেরও মধ্যে এমন সকল স্থল আছে, যেখানে স্পষ্ট পদার্থটী জড়, কি উদ্ভিদ্, কি প্রাণী, কিছুই মীমাংসা করা অসম্ভব। এমন প্রাণী আছে, যাহাকে মহা মহা পণ্ডিতেরা আবার উদ্ভিজ্জ শ্রেণীবদ্ধ করেন, এমন উদ্ভিদ্ আছে যাহারা উদ্ভিদ্ কি জড়, তাহার স্থিরতা অদ্যাপি হয় নাই। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন Line of demarcation প্রভেদ সূচক চিহ্নিত রেখা দেখা যায় না। তবেই দেখুন, এমন সব সহজ বিষয়েই যদি প্রকৃত দর্শন সম্মত লক্ষণ ধার্য্য হইল না, তবে আর পৌত্তলিকতা প্রভৃতি কঠিন ভাবগতপ্রাণ বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা কি হইবে? এ সকল বিষয়ে সাধারণে ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

আর ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্ত যত টুকু বুঝা যায়, তাহাতেও ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এখানেও ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। মনে করুন এই যে একেশ্বরবাদ, ইহা কি একেবারে মানব সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল? কেহই তা মনে করেন না। সকল দেশের সকল জাতিরই প্রাচীন ধর্ম্ম বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, মানব প্রথমাবস্থায় প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার কোন দেব দেবী বা মূর্ত্তি বিশিষ্ট পুরুষ প্রকৃতি ছিল না, কোন কল্পিত দেবতার উপাসনা করিতে তখনও তিনি শিক্ষা করেন নাই। প্রাতঃকালে প্রতিদিন সূর্য্য দেব পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া জগৎকে হাসাইয়া দেখা দেন, রাত্রে কেমন হাস্যময়ী পূর্ণিমার পবিত্র বিমল জ্যোৎস্না, গ্রীষ্মাতিশয্যের প্রদোষ কালে সুস্নিগ্ধ মলয় পবন, আবার শীতের কঠোরতার মধ্যে কাষ্ঠনিঃসৃত লোলজিহ্বা উত্তপ্ত অগ্নি শিখা; গগনস্পর্শী ভীষণ দর্শন দিগন্তব্যাপী পর্ব্বতমালা, তদ্দেহ নিঃসৃত কলনাদী সুশীতল প্রস্রবণ; আকাশ-বিহারী শ্বেত কৃষ্ণ ধূসরাদি বিবিধ বর্ণে পরিবর্ত্তনশীল দুরন্ত মেঘমালা, তাহা-

দের ভীষণ নিনাদ ও বর্ষিত অজস্র বারিধারা; নানাবিধ শস্যের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ উর্ব্বরা পৃথিবী ও তদুপরিস্থিত ফুল ফল সুশোভিত সুরম্য বিটপী শ্রেণী—সমস্ত প্রকৃতিই তখন নবাগত মানবের কৌতুহল পূর্ণ মানসকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি কাহাকে ভয় করিতেন, কাহাকেও বা আত্ম সুখ লাভের আশায় প্রার্থনা করিতেন, কাহারও সহিত মনের কথা খুলিয়া বলিতেন, কাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার সাহায়তায় নিজের অশেষ কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতেন। এইরূপেই তখনকার মানব পশুপক্ষীদের ভাবা বুঝিতেন ও তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। তিনি নিজের মধ্যে যেমন প্রাণ দেখিলেন, বুদ্ধি দেখিলেন, অন্য সকল বস্তুতেই প্রথমে তাহাই অনুমান করিয়া লইলেন। সমস্ত প্রকৃতি তাঁহার চক্ষে তখন জীবন্ত জাগ্রত অগণ্য দেবতা পরিপূর্ণ। সকল জাতিরই প্রাচীনতম কথাবলি এই ভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে।

ক্রমে এ ভ্রম চলিয়া গেল। ক্রমে মানব পরীক্ষায় দেখিলেন যে, প্রকৃতির বস্তু সকলের মধ্যে তাঁহার নিজের মত জীবন বা আত্মা নাই। ক্রমে প্রকৃতি নির্জ্জীববৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। পর্ব্বতের স্তোত্র পাঠ করেন পর্ব্বত নিরুত্তর। নদীকে সম্বোধন করিয়া প্রাচীন কবি কত কি প্রাণের গভীর উচ্ছাস প্রকাশ করেন, নদী স্থির গম্ভীর ভাবে নিজ পথেই অবিরল ধায়মানা। উদ্ভিদ্‌গণকে কত সমাদর করেন, কত কথা সম্ভাষণ করেন, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর পান না। তখন ক্রমে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নির্জ্জীব হইলে কি হয়? চেতনা শূন্য হইলে কি হয়? যে শক্তির পরিচয় মানব নিজ প্রাণে পাইতেছেন, যে শক্তি ইচ্ছা রূপে নিজের অভ্যন্তরে নিয়ত বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার সমস্ত কার্য্যের প্রণোদন করিতেছে, যে শক্তির পরিচয় পাইয়া মানব নিজকে চেতন, জীবন্ত, আত্মা বা ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব মনে করিতে সমর্থ হইতেছেন, এবং যে অনুরূপী শক্তির পরিচয় পিতা, মাতা, ভগিনী ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের জড়ময় দেহ ও তাহার জড়ময় চিহ্নাবলির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকেও নিজের মত জীবন, ইচ্ছা বা আত্মা বিশিষ্ট বলিয়া স্বভাবত সহজজ্ঞানে নির্ণয় করিতেছেন ও তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্নেহ প্রেম সমর্পণ করিয়া স্বয়ং কৃতার্থ হইতেছেন,—সেই শক্তির যে অশংসয়িত প্রমাণ তিনি প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থে প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সে প্রমাণ অগ্রাহ্য করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কথার উত্তর দেয় না তাতে কি? আমাদের মত দেহ নয় তাতে কি? আমাদের ন্যায় ইচ্ছামত নড়ে চড়েনা, তাতেই বা কি? উভয় প্রকার শক্তিরই মূলে ঐক্য। যে ঐক্য আজ বার্কলী, হীগেল, মার্টিনো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কত কষ্টেও জ্ঞানী ও বিজ্ঞানাভিমানী মানবগনকে বুঝাইতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইতেছেন না, সেই ঐক্য তখন সরল অজ্ঞ মানব স্বতঃসিদ্ধ সহজ জ্ঞানের সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই তখনও এই সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল রহিল যে, এই জড়স্বরূপ বা আপাত-প্রতীয়মান জড় প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনার মূলে এক এক অদৃশ্য অজ্ঞাত শক্তিমান দেবতা বিদ্যমান

আছেন। এইরূপে প্রকৃতির অগণিত ঘটনা পরিবর্ত্তনের মূলে জলদেবতা, অগ্নিদেবতা, পবনদেবতা প্রভৃতি অগণ্য দেবতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। তখন মানব প্রকৃতির উপাসক নন, প্রকৃতির মূলে শক্তির অসংখ্য আবির্ভাব দেখিয়া তাহারই উপাসক। তখনও কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই যে, ঐ বিকাশ এক অখণ্ড শক্তি ভাণ্ডার হইতেই প্রকাশিত। এ সত্য বুঝিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে তাহাও বুঝিলেন। প্রকৃতির অসংখ্য ঘটনাবলির মধ্যে ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একতা দেখিলেন। অগণ্য বিকাশের মূলে একই অদ্বিতীয় অখণ্ড শক্তির বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

উপরে অতি সংক্ষেপে আমরা দেখিলাম যে, একেশ্বরবাদ একেবারে আবির্ভূত হয় নাই। অগ্রে প্রকৃতি পূজা, ক্রমে প্রকৃতির অন্তরস্থিত অদৃশ্য দেবতার পূজা ও অবশেষে তাহাদের একতা লক্ষিত হইলে একেশ্বরবাদ। কিন্তু একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইবামাত্রই কি উহা জনসাধারণের হৃদয়ে অটল স্থান লাভে সমর্থ হইয়াছে? সর্ব্বসাধারণ সমস্ত লোকই কি আজ এক অদ্বিতীয় বিশ্বময়ী শক্তির উপাসনা করিতেছে, না কখনও করিয়াছিল? স্বপ্নেও এ কল্পনা করা বাতুলের কার্য্য। বরং উপাসনা করা দূরে থাকুক, মতেই একেশ্বরবাদ এখনও অতি সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এ কথাতে আর মত দ্বৈধ হইতে পারে না। কয়জন ভারতবাসী আজ এক মাত্র চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসক? এত কোটী হিন্দুসন্তানের মধ্যে কতই লোক আজিও সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহগণ ও নানাবিধ বৃক্ষাদির উপাসনা করিয়া থাকে! কতই না লোক ইন্দ্রাদি দেবগণের অস্তিত্বে আজিও সরল বিশ্বাস দেখাইয়া থাকে! পৌত্তলিকতা লইয়া যে চারিদিকে এত গোলযোগ দেখা যাইতেছে, তাহার একটী কারণ আমাদের মনে হয় এই যে,—উক্ত শব্দটীর একটী সাধারণ অর্থ নাই। এক জন এক অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। আর এক জন কল্পিত অপর এক অর্থ গ্রহণ করিয়া তর্ক করিতেছেন। কাজেই এ বিষয়ে কোন স্থির মীমাংসা হইতেছে না। পৌত্তলিক শব্দে আমরা কি অর্থ করি, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আর একটী মাত্র মতের সমালোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, ঈশ্বরের স্মারক কোন চিহ্ন সম্মুখে বা সঙ্গে রাখিয়া ঈশ্বর চিন্তা করাও পৌত্তলিকতা। তাঁহাদের মতে নিরাকার, নিরবলম্ব, চিন্ময় পরমেশ্বরের উপাসকই অপৌত্তলিক। তিনি উপাসনার সুবিধার জন্য, মন স্থির করিতে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যদি কোন মূর্ত্তি বা জড় পদার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলেও ইঁহাদের মতে তিনি পৌত্তলিক। দ্বিজদাস বাবুও লিখিয়াছেন যে, "প্রকৃত ব্রহ্ম দর্শন যাহার লাভ হয় নাই, সেই পৌত্তলিক।" অর্থাৎ নিরবলম্ব ভাবে চিন্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপাসকই প্রকৃত অপৌত্তলিক।

ইহাই যদি পৌত্তলিকতা হয়, যদি নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক হইয়াও কোন বিশেষ জড় পদার্থ বা ছবি কিম্বা প্রতিকৃতি বিশেষের সাহায্যে পূজা করিলে পৌত্তলিক হইতে

হয়, তাহা হইলে কিন্তু "পৌত্তলিক" এই ভয়ানক কথাটার ভীষণত্ব থাকে না এবং প্রকৃতপক্ষে ইহার লোক-প্রচলিত অর্থই থাকে না। অজ্ঞ, মূর্খ লোকদিগের ত কথাই নাই, বিদ্বান,সুবিজ্ঞ,পণ্ডিত লোকেরাই কি সকলে নিরবলম্ব চিৎস্বরূপের উপাসনা করিতে পারেন ? যোগবলে, বহুকাল কঠোর সাধনের ফলে যাঁহাদের আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে মিলন হইয়াছে, যাঁহারা সত্যভাবে বলিতে পারেন "I and my father are one" যাঁহাদের গভীর ধ্যান সুস্পষ্ট সমুজ্জল ব্রহ্মানুভূতি, ব্রহ্ম স্পর্শ, ব্রহ্মদর্শন ; যাঁহারা এরূপ ব্রহ্মগত প্রাণ যে, সরলভাবে বলিতে পারেন "আমরা তোমাতে বিচরণ করি, রমণ করি, তুমি গৃহ ; তুমি প্রাণস্য প্রাণম্!" অথবা "In thee we live and move and have our being."——তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এই মতানুসারে তাঁহারাই প্রকৃত অপৌত্তলিক। নতুবা তুমি আমি খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদী,বৌদ্ধ,হিন্দু,ব্রাহ্ম—ভাই, সাধারণ আমরা সবাই পৌত্তলিক। এই নাম তাহা হইলে আর কঠোর ও লজ্জাকর থাকে না, বরং উহার অর্থ তখন সাধারণ সাধক হইয়া দাঁড়ায়। মহাপুরুষগণ চিন্ময় "নিরাবলম্বমীশং" কি বস্তু তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং প্রচারও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ কি গাছের ফল যে পড়িলেই অনায়াসে হাতে পাইব ? ঘর, বাড়ী, সংসার, টাকা টাকা করিয়া সমস্ত দিন ২৪ ঘণ্টা কাটাইব, আর ব্রহ্মজ্ঞান হাতে আপনি আসিবে? সাধন চাই, ঘোরতর সাধন চাই। সেই সাধনের যে অবস্থা, তাহাতে উক্ত পৌত্তলিকতা ভিন্ন অন্য উপায় কোথায় ? ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান যে যেখানে আছ, জিজ্ঞাসা করি, বুকে হাত দিয়া উপাসনার সময়ে দেখিয়া বল; তুমি চিন্ময় ব্রহ্মের দর্শন পাইলে কি না। যদি বল "না" তবে তুমি এইরূপ পৌত্তলিকা। ভাই ব্রাহ্ম! তুমি লেখকের হৃদয়ের বড় নিকটে, এক মায়ের পেটের ভাই, তোমাকেও বলি, এ হিসাবে ধরিলে আমরা অনেকেই পৌত্তলিক। সে জন্য কণামাত্র দুঃখিত নই, বরং মনে করি যে এরূপ পৌত্তলিকতা অপরিহার্য্য এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপান স্বরূপ। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সরল মনে সূর্য্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন না। কোন ব্রাহ্ম প্রকৃতি পূজক নহেন, স্বীকার করি। কোন একেশ্বরবাদী উপাসক, প্রকৃতির অসংখ্য ঘটনাবলির মূলে দেবতা লুক্কায়িত আছেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারেন, বলি না। এ সকল গ্রাম তিনি অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু এখনও লক্ষ্য স্থলে উপস্থিত হইবার তাঁহার বিলম্ব আছে। আজিও তিনি হয়ত নিরবলম্ব হইয়া ঈশ্বরের পূজা করিতে পারেন না, পারিবেন কিরূপে ? জড় পদার্থে তাঁহার দেহ নির্ম্মিত, তাঁহার বাহ্য ও এমন কি আন্তরিক বৃত্তি সমুদায়ও বাহ্য জড়ের প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিতেছে। এই জড়ের বন্ধন অতিক্রম করিয়া আত্মার গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিবার এখনও তাঁহার সাধ্য কৈ ? কঠোর সাধনের সাহায্যে আত্মজ্ঞান পরিষ্কার না হইলে পরমাত্মতত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে খুলিবে কি উপায়ে ? যতদিন না তাহা হইতেছে, তত দিন তিনি জড় উপায়ে জড়ের প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর

করিয়া চলিতে বাধ্য। তত দিন তিনি Objective অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করত তাহার দ্বারা Subjective অর্থাৎ আভ্যন্তরিক আলোচনা করিয়া তবে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইবেন। এ অতি সত্য কথা, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সাধন অবশ্য কঠোর। কিন্তু শিশুর অক্ষর পরিচয় কিরূপ দুরূহ শিক্ষা, তাহা পাঠক মাত্রেরই স্মরণ আছে। তাহার পর আবার সেই শিশুই কলম ধরিয়া কি ভয়ানক দ্রুততার সহিত সহস্র সহস্র অক্ষর একত্র সম্বন্ধ করিতেছে, সংযোগ করিতেছে, লিখিতেছে, আবার তার মধ্যে কেমন সুন্দর অর্থ গুপ্ত ভাবে খেলিতেছে, সেই লেখা আবার শত শত শিশুরা অবলীলাক্রমে পাঠ করিতেছে, তখন পূর্ব্বকালের কষ্টসাধ্য অক্ষর পরিচয়ের কথা হয় ত স্মরণই হয় না! এ সাধনেও ঠিক তদ্রূপ হয়। জড় দেহ জড় বস্তু বিশিষ্ট হওয়ায় আমাদের Subjective মানসিক বা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া সমূহও প্রথমাবস্থায় Objective বা বাহ্য জড় রাশির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতে বাধ্য। এজন্য নিরাকার নিত্য সত্য চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসক হইতে গেলে জড়ের সাহায্য লইয়া আরম্ভ না করিলে চলিবেনা, এ কথা এক পক্ষে অতি সত্য সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র রাশির অপরূপ শোভা জড় সম্ভূত, ও তাহাদের জ্ঞান জড়ময় ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ; সুতরাং জড় মূলীয়। কাজেই হে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীপূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তা! এই বলিয়া ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতে গেলে প্রথমে জড় জগৎ ও জড় ইন্দ্রিয়ের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। এই হিসাবে অগ্রে পৌত্তলিক না হইয়া জড় উপকরণের সাহায্য না লইয়া, জড় অবলম্বন ব্যতীত আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতেই সমর্থ হই না। ক্রমে সাধক বাহ্য অবলম্বন হইতে যাহা প্রাপ্য তাহা গ্রহণ করিয়া নিঃশেষ করিতে থাকিবেন, আর এ দিকেও সাধন বা অভ্যাস বলে তাঁহার আভ্যন্তরিক শক্তি সমূহের বিকাশ অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অবশেষে এমন এক স্থানে হয়ত আসিয়া উপস্থিত হইবেন, যথায় আসিলে ইহ জীবনেই বাহ্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রাণ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন। যখন নিরলম্ব হইযাই সনাতন, চিন্ময় পরমাত্মাকে নিজ বিশুদ্ধীকৃত আত্মাদর্পণে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়া সম্পূর্ণ জড়াতীত রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করিবেন। তাহার পরে আরও কতদূর যাইবেন, অনন্ত উন্নতিশীল মানবাত্মা কোথায় চলিবে তাহা কে জানে?

সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, এই শ্রেণীর লোকদিগের মতানুসারে পৌত্তলিকের লক্ষণ ঠিক হয় না, বরং শব্দটীরই অতি বিকৃত, অস্বাভাবিক এক অর্থ ধরিয়া লইতে হয়। তাহাতে পৌত্তলিক (Idolator) ও একেশ্বরবাদী (Theist) এই দুটী শব্দের চিরপ্রচলিত সহজ জ্ঞান-সিদ্ধ পার্থক্য নষ্ট হইয়া যায়। ইহা কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। এক একটী শব্দ এক একটী সুচিহ্নিত অর্থে ব্যবহৃত হইবার জন্যই সৃষ্ট। সেই অর্থের ব্যভিচার যেখানে হয়, সেখানের সেই শব্দেরও বিনাশ বলিতে হইবে। একারণ আমরা পৌত্তলিকতায় ঈদৃশ বিকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণে প্রস্তুত নহি। যতক্ষণ কোন লোক ঈশ্বর বলিলে বিশ্বপাতা, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বমূলাধার, চিন্ময় ব্রহ্ম

বলিবে ও নিরাকার মনে বিশ্বাস করিবে, ততক্ষণ সে যে চিহ্নকেই স্মারক বা হৃদয়ের ভাব উত্তেজনার সহায় মনে করুক না কেন, আমরা তাহাকে পৌত্তলিক শব্দবাচ্য কদাচ করিতে পারি না। তবে, যেই দেখিব যে সেই ব্যক্তি উক্ত চিহ্নসমূহের কোন্‌টার চিহ্নত্ব মাত্র বিস্মৃত হইয়া উহাকে ঈশ্বর বোধ করত নিজ হৃদয়ের প্রীতি, ভক্তি, উপাসনাদি উহাতেই অর্পণ করিতেছে,—অমনি বুঝিব যে সে পৌত্তলিক। সুতরাং পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিকের সীমা রেখা এই খানে পড়িল যে—আমি সহস্র চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারি কিন্তু যতক্ষণ আমার নিকট উহারা চিহ্নমাত্র, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার সহায় মাত্র,ততক্ষণ আমি পৌত্তলিক নহি। এমন কি ঐ সকল চিহ্ন আমার পক্ষে যদি অত্যাবশ্যকীয় হয়, অর্থাৎ যদি উহাদের সাহায্য ব্যতীত আমার উপাসনা না হয়, তথাপি আমি পৌত্তলিক নহি। তাহা হইলে অবশ্য আমি সঙ্কীর্ণচেতা একেশ্বর উপাসক,—নিম্ন শ্রেণীর সাধক; কিন্তু পৌত্তলিক কদাচ নহি। তবে পৌত্তলিক কে? না—যে ঐ সকল বাহ্য জড় সাহায্যেরই উপাসক, তাহাদিগকেই পূজা করে, তাহাদেরই নিকট প্রার্থনা করে এবং বিশ্বাস করে যে, তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে। মনে করুন, এক জন ব্রাহ্ম গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন, গঙ্গার হিল্লোল বড় সুন্দর দেখাইতেছে, ও তাঁহার মনে কি সব অপূর্ব্ব, স্বর্গীয় ভাবের উদ্রেক করিয়া দিতেছে। তিনি গঙ্গা সলিলের মধ্যে পরমেশ্বরের অপার মহিমা, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলময় ভাবের স্পষ্ট নিদর্শন পাইয়া বিমোহিত হইয়াছেন,চক্ষু দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু বহিতেছে। ইনি ত বাহ্য সাহায্যে ঈশ্বরের পূজা করিলেন, ইনি কি পৌত্তলিক?—কখনই না। আর মনে করুন, অপর এক জন সরল বিশ্বাসী হিন্দু সন্তান সেই খানে বসিয়া গঙ্গার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। পুরাণের ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন ও সেই সলিল স্পর্শে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের উদ্ধার বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় "পতিত পাবনী গঙ্গে! মা নিস্তারিণি! এ অধমকে উদ্ধার কর" বলিয়া তিনি ব্যাকুলতার সহিত কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক মস্তকে ছড়াইয়া দিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহারও ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এ স্থলে তাঁহাকে কি বলিব?—অবশ্য পৌত্তলিক বলিতে হইবে। কেন না তিনি, ভ্রম প্রযুক্তই হউক আর যাই হউক, গঙ্গাকেই তাঁহার উপাস্য দেবতা মনে ভাবিতেছেন। আমাদের হিন্দু পৌত্তলিকতার এরূপ লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত তুলিতে পারা যায়, কিন্তু আর বোধ হয় আবশ্যক হইবে না। এক্ষণে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী এক জন রোমান ক্যাথলিকের কথা মনে করুন। তাঁহার গৃহে এক খানি খ্রীষ্টের ক্রুশ বিদ্ধাবস্থায় ছবি রহিয়াছে; তিনি গভীর ভক্তির সহিত যখন ছবি খানির নিকট অগ্রসর হইবেন, তখন তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইবে কল্পনা করুন—খ্রীষ্ট ঈশ্বরের অবতার, স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং উক্ত ছবি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। ঈশ্বর মানবের পাপভার মোচনের জন্য কত ক্লেশ স্বয়ং বহন করিয়াছেন, মনে করিয়া বিশ্বাসী খ্রীষ্টান ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইবে ও তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুবারি বিনির্গত হইবে। ইনি পৌত্তলিক কি না?—কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, এ স্থলে খ্রীষ্টকে ঈশ্বর মনে করার

ইনি বস্তুতই পৌত্তলিক। কিন্তু আর এক জন লোক উক্ত ছবিটীর প্রতি চাহিয়া দেখিলে যদি তাঁহার মনে খ্রীষ্টের অমানুষিক স্বার্থ ত্যাগ, অটল বিশ্বাস, ও অতুলনীয় মনের প্রেম প্রভৃতির কথা যুগপৎ স্মরণ হইয়া তাহাকে (মানব) খ্রীষ্টের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত করে, ও যদি তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া সাধু চরিত্রের প্রণোদক ও প্রেমের মূল প্রস্রবণ করুণাময় পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস ও গভীরতর প্রীতি স্থাপন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন্ বুদ্ধিমান লোক পৌত্তলিক বলিবেন। আর দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

এক্ষণে আশা করি পাঠকবর্গ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলেন, আমরা পৌত্তলিক কাহাকে বলি। আর ইহা আমাদের স্বকপোল কল্পিত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক লক্ষণ নহে। কিন্তু কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ইহাই "পৌত্তলিক" শব্দটীর আপামর সাধারণ সমস্ত লোকের গৃহীত অর্থ। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদিগকে দ্বিজদাস বাবু পৌত্তলিক বলিতে চাহেন না। কেন না ইহাদের ভ্রান্ত কুসংস্কারের মূলে কেবল মাত্র জ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়। প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞানের অভাবই যে পৌত্তলিকতার মূল, তাহা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু তাই বলিয়া পৌত্তলিকতাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিনা। এই সকল লোকেরা যে ভ্রান্ত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইহারা যে পৌত্তলিক তাহাই বা কে অস্বীকার করিতে পারে? ভ্রান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক যদি সরল বিশ্বাসী হয়, তবে তাহাতে তাহার মুক্তির ব্যাঘাত হয় কি না, এ প্রশ্নই আমাদের আলোচ্য নহে। মুক্তি মানবমাত্রেই পাইবে; মহাপাতকীও সময়ে মুক্ত হইবে।' কিন্তু আমাদের আলোচ্য, এই শ্রেণীর লোক পৌত্তলিক কি না? তাহার উত্তর আমরা পাইয়াছি। কিন্তু পৌত্তলিক বলিয়া তাহারা ঘৃণার পাত্র কদাচ নয়। অজ্ঞানতা বশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত ও ভ্রান্ত বলিয়া বরং কৃপা-পাত্র ও আমাদের সম্পূর্ণ সাহানুভূতি ও সহৃদয়তার উপযুক্ত। ঘৃণার পাত্র যদি কেহ থাকে, তবে দ্বিজদাস বাবুর সহিত এক বাক্যে আমরাও বলি সে "ভণ্ড"।

শ্রদ্ধেয় দ্বিজদাস বাবু নিজে একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম হইয়াও বর্ত্তমান সময়ের নিরাকার চিন্ময় ঈশ্বরের উপাসক ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালীর প্রতি কিঞ্চিৎ অবৈধ আক্রমণ করিয়াছেন ও নিজের মত সমর্থন জন্য ব্রাহ্মদিগের উপাসনার বিকৃত ও অযথা বর্ণন করিয়াছেন দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন যে, আমরাও কোন আকার আরোপ না করিয়া ঈশ্বরের পূজা করিতে পারিনা— আশ্চর্য্য কথা! অবাক হইয়াছি! "ঈশ্বর আমার হৃদয়ে বা এই ব্রহ্ম মন্দিরে আছেন" একথা বলিলে হৃদয়ের বা উক্ত মন্দিরের বাহিরে নাই বুঝায়, দ্বিজদাস বাবুর একথা সত্য মূলক কি না, ব্রাহ্মগণ তাহার বিচার করিবেন। কিন্তু আমরা মনে করি যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, এই জন্যই তিনি আমার হৃদয় বা এই মন্দির পূর্ণ করিয়া আছেন, ইহাই মনে হয়। গভীর ধ্যানের সময় যখন তাঁহার সত্বা হৃদয় পূর্ণ করে, তখন অবশ্য বাহিরে তিনি আছেন কি না সে কথা মনেই উদয় হয় না; কিন্তু

তাই বলিয়া যে কেবল হৃদয়ে ও মন্দিরে আছেন, বাহিরে নাই, ইহাও ত মনে হয় না। সুতরাং তৎকালীন আমার হৃদয় বা মন্দির ঈশ্বরের আকার, এরূপ অনুভবও করা অসম্ভব। বরং সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই এই হৃদয়ে বা মন্দিরে আছেন, একথা অনুভব করা সঙ্গত, নতুবা ও কথা ভাবিতেই পারিতাম না। সুতরাং আমরা উপাসনা কালে ব্রহ্মমন্দিরের আকারকেই ঈশ্বরের আকার বলি, এ কথা ব্রাহ্ম সাধারণের পক্ষের কথা কি না, তাহা তাহারা বিচার করিবেন। কিন্তু বোধ হয়, প্রধান প্রসঙ্গের প্রতি চিত্ত অধিক আকৃষ্ট থাকা প্রযুক্ত প্রিয় ভ্রাতা এ কথাটীতে ব্রাহ্ম সাধারণের উপর লোকের যে একটু অন্যায় দৃষ্টি পড়িবে এবং সেটুকু যে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মেরা পাইবার যোগ্য দোষী নহেন,তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যথার্থই যখন আমরা বলি যে ঈশ্বর তুমি আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া আছ" তখন কি মনে করি?—এই নয় কি যে, "তুমি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, পূর্ণ পুরুষ, তাই আমার এক্ষুদ্র হৃদয়টীও পূর্ণ করিয়া আছ?" আমাদের বিবেচনায় ইহা ভিন্ন অন্য চিন্তা অসঙ্গত। বস্তুত কোন একেশ্বরবাদীই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, ঈশ্বরের আকার বিশেষ আছে।

তবে এই যে এত দেবদেবী মূর্ত্তি, ইহাদের উদ্ভব কোথা হইতে? সকলই কি অজ্ঞ লোকদের কল্পনা প্রসূত?—উত্তর—"জানি না।" হইতেও পারে ইহাদের কোন কোনটী কোন পণ্ডিত একেশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত লোকের আবিষ্কৃত। যেমন মনে করুন, একজন সাধক ধ্যান যোগে ব্রহ্মের উপাসনায় নিমগ্ন আছেন। অগণ্যভাবে অসংখ্য উপায়ে তাঁহার ব্রহ্ম উপলব্ধি হইতে পারে। একদা হয়ত ভীষণ ভাব মনে হইল। প্রকৃতির প্রশান্ত গম্ভীর ভাব তিরোহিত হইয়াছে, চারিদিকে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র ঘাত; ভীষণ অন্ধকারে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত; মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতালোক ঝলসিতেছে, তাহাতে আরও প্রগাঢ়তর অন্ধকারে গগন মেদিনী আচ্ছন্ন হইতেছে, ভয়ানক ঝড়ের শব্দ বজ্রধ্বনির সহিত মধ্যে মধ্যে মিশিয়া ভীম প্রলয় কালের ন্যায় তাঁহার মনে প্রতীয়মান হইতেছে, প্রকৃতির প্রশান্ত ভাব কোথায়? জননীর ন্যায় স্নেহের সহিত তিনি যে বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রটী পর্য্যন্ত সুশোভিত করিতেছিলেন, সেই আদরের বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া কোথায় ফেলিয়া দিতেছেন, তাহার সন্ধান নাই! ঘন ঘন ভূমিকম্প হইয়া গৃহ প্রাচীর মন্দিরাদি চূর্ণীকৃত হইয়া যাইতেছে, প্রশান্ত নির্ম্মল জলাশয় সমূহে তুমুল আন্দোলন হইয়া উত্তাল তরঙ্গ সকল উত্থিত হইতেছে! ভীষণব্যাপার! ঘোর প্রলয়কাল যেন উপস্থিত!—এই ভীষণভাব যদি সেদিন সাধকের মনে আবির্ভূত হয়, আর তিনি তাহার মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক ভাব পাইয়া যদি উভয়ের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন,—যদি দেখেন, মানবাত্মার মধ্যেও কখন কখন এইরূপ কোন অজ্ঞেয় শক্তির আবির্ভাবে ঘোর প্রলয় কালের ন্যায় ব্যাপার সমূহ সংঘটিত হইয়া থাকে, পাপাসুরের দল সমূলে পরাজিত হইয়া ছিন্নমস্তকে রক্তাক্ত কলেবরে শ্মশানভূমে নিপতিত থাকে। আর যে আভ্যন্তরীণ শক্তি এতদিন তাঁহাকে কত যত্নে লালন পালন করিতেছিলেন, কত ভালবাসিতেন, সেই শক্তিই এক্ষণে উন্মা-

দিনীর ন্যায় তাঁহার আত্মাকে ভূমে নিপাতিত করিয়া বক্ষে পদার্পণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন ও এক এক করি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পরম শত্রু দৈত্য দানব দলকে সংহার করিতেছেন—এই ভীষণ ভাবের মধ্যে মঙ্গল ইচ্ছার শুভ সমাবেশ যদি সুস্পষ্ট অনুভব করেন,—তবে ইহা বিবেচনা করা কি অসঙ্গত যে, পাছে অন্য সময়ে তাঁহার এই অদ্ভুত ও প্রার্থনীয় ভাবটী বিস্মৃত হন? এই আশঙ্কা দূরীকরণ অভিপ্রায়ে তিনি এক চিহ্ন কল্পনা করিয়া নির্ম্মাণ করিবেন, যাহাতে উক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ নিদর্শন থাকিবে এবং যাহা দেখিবামাত্র তাঁহার সেই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে পুনরায় আবির্ভূত হইবে? এই কল্পনাপ্রসূত ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি কি প্রচলিত কালী মূর্ত্তির সদৃশ নয়? মনে করুন, এই রূপেও নিরাকার ঈশ্বর উপাসকের দ্বারাও সময়ে সময়ে মূর্ত্তি কল্পিত হইতে পারে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকিবে যে, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা।" সাধনের সুবিধার জন্য এইরূপ মূর্ত্তি সম্মুখে থাকিলে উপরোক্ত সাধকের পক্ষে অবশ্য কোন দোষ আরোপিত হইতে পারে না। বরং সময় বিশেষে ইহা দ্বারা তাহার সমূহ উপকার ও মঙ্গল হইয়া থাকে। আমরাও এই রূপ সময়ে সময়ে কোন ভাব অযাচিত রূপে প্রাপ্ত হই, হইয়া তাহার এমন একটী নামকরণ করি যে, নামটী মনে উদিত বা মুখে উচ্চারিত হইবামাত্র সেই চমৎকার ভাবটী মনে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে অভ্যুদিত হয়। এই নাম কিছু কাল ধরিয়া সাধন করিতে করিতে উক্ত ভাব প্রাণের মূল পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় ও অধিকার করিয়া ফেলে। প্রত্যেক সাধকেরই নিশ্চয় এরূপ হইয়া থাকিবে। যদি ঐ নামকরণ, ঐ নাম সাধন না করি, তবে উক্ত অযাচিত ভাব প্রাণকে কখনই অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষণিক উত্তেজনা মাত্র করিয়া দিয়া চিরদিনের মত তিরোহিত হয়, এবং কখন যে তাহা আমি পাইয়াছিলাম, তাহা স্মরণও থাকে না। এই রূপে অবহেলায় কত সাধক যে কত অমূল্য ভাবকে জীবনে দাঁড় করাইতে পারিতেছেন না, কত সুন্দর ভাব ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, কে গণনা করিবে?

কিন্তু এখানে দুইটী কথা আছে। ঐ নাম বা ঐ মূর্ত্তি যখনই উক্ত সাধক নিজে লইবেন বা দেখিবেন, তখনই ভাব সঙ্গ বা Association of ideas এর গুণে তাঁহার মনে সেই ভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু তাহাতে অপরের কি? যে কখন সে ভাব পায় নাই, তাহার সে নামে বা সে মূর্ত্তিতে কি উপকার হইবে? এ গূঢ় সমস্যা কেহ তলাইয়া দেখিয়াছেন কি? একের পক্ষে যাহা অনন্ত ভাবের খনি, অসীম খেলার ক্ষেত্র, অপরের নিকট তাহা কেবল অর্থশূন্য শব্দ বা ছবি মাত্র প্রতীয়মান হইবে। কাজেই একের কল্পিত ও অবলম্বিত শব্দে বা মূর্ত্ত চিহ্নে অপর কাহারও বিন্দু মাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এই গূঢ় রহস্যই তেত্রিশ কোটী দেব মূর্ত্তির কল্পনা প্রসবের মূলে বর্ত্তমান বোধ হয়। যাঁহার যে ভাব উদয় হইয়াছে, তিনি সেই ভাবেই ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সাধন বলে হয়ত সিদ্ধও হইয়াছেন। লোকে না বুঝিয়া তাই অবলম্বন করিতে গিয়া ভ্রান্ত পৌত্তলিকতা জালে জড়িত হইয়া মূলের আধ্যাত্মি-

কতা হারাইয়াছেন। মূর্ত্তি আগে, তার প সাধন, এ মিথ্যা কথা। আগে সাধন, পরে ভাব প্রাপ্তি, ও ঐ ভাবের নামকরণ বা অনুরূপ রূপকের দ্বারা কল্পনা-প্রসূত বর্ণনা বা মূর্ত্তি নিম্মাণ (alligorical representation)। আগে নিরাকার চিন্ময় ব্রহ্মের জন্য লালায়িত হইয়া ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা, চিন্তন, মনন, ধ্যান, ধারণা, পরে ব্রহ্ম কৃপার ভাব প্রাপ্তি, ও তৎপরে আবশ্যক মত নাম বা রূপ। এই জন্যই বলা হইয়াছে, ভক্তের গৃহে ভগবানের জন্ম ও নামকরণ হয়। এই গেল প্রথম কথা। আরও একটী কথা এই যে, সাধকের যে কেবল একটী মাত্র ভাব লইয়াই পরিতুষ্ট থাকা উচিত, তাহা কদাচ নহে। তিনি ভাব প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকিবেন? তাহা ত তাঁহার চরম উদ্দেশ্য নয়, চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম দর্শন, নিত্য ব্রহ্মলাভ, তৎসঙ্গ, তন্ময়ত্ব। তবে তিনি কেন একটী মাত্র ভাব পাইয়া তাহার নাম বা রূপ দিয়া কৃতার্থ হইবেন? তিনি অনন্ত ভাব সাগরের তীরে বসিয়াছেন,— অগণিত ভাব তরঙ্গ তাঁহাকে আঘাত করিবে, ঠেলিবে, ফেলিবে, দুলাইবে, ডুবাইবে, ভাসাইবে, উল্টাইবে,—কত কি করিবে! তিনি অবোধ শিশুর মত একটী মাত্র ঢেউ খাইয়াই ভুলিয়া রহিবেন, ও কায়ক্লেশে সেইটীরই নামরূপ লইয়া ভুলিয়া থাকিবেন? দুর্লভ মানবজীবন একভাবে কাটিয়া যাইবে? অনন্তপ্রবাহ জীবনস্রোত তাঁহার একটী ক্ষুদ্র কূপে চির আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন? বাতুল! ছি!! এরূপ করিতে নাই। ভাব আসে আসুক, না আসে ক্ষতি নাই। আমি চাই সেই প্রেমসাগরে ডুবিতে, খেলিতে, আমি কেন সন্তুষ্ট হইব সিকি পয়সার একটা ভাবে? একের পর আর; আরের পর আবার; এইরূপ অগণ্য ভাবের তরঙ্গ আসিবে, ও আত্মার স্বরূপ মূর্ত্ত অবলম্বনকে কখনও বদ্ধাবস্থায় থাকিতে দিবে না। ক্রমে অবশেষে যখন ব্রহ্মসাগরে ডুবিব, তখন আত্মা সেই পরমাত্মানয় হইয়া যাইবে; আর চিহ্ন আবশ্যক কোথায়?

এই দুটী কথা স্মরণ থাকিলে পাঠকগণ বুঝিবেন যে, বাহ্য অবলম্বন সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনাও আমাদের দেশের প্রচলিত পৌত্তলিকতায় কত আকাশ পাতাল প্রভেদ। শেষোক্ত পৌত্তলিকতাও প্রকৃতি সম্বন্ধে সকলেই অভিজ্ঞ, সুতরাং সে কষ্টজনক দৃশ্যের বর্ণনা করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের মনঃক্ষুণ্ণ করা অনাবশ্যক। তবে এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বর্ত্তমান প্রচলিত পৌত্তলিকতার মধ্যে প্রকৃত প্রাণ অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা কিছুই নাই। দেশের বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ সংখ্যক লোকই জড় মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বোধে পূজা করে। অজ্ঞানতাবশত ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজা তাহারা জড়ে অর্পণ করে। এবং আর অধিক ক্লেশের কথা সব আছে, তন্মধ্যে ২।১ টা বলিলে পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। মনে করুন্ গ্রীষ্মাতিশয্যের সময় জলে মূর্ত্তিকে স্নিগ্ধ রাখা, রাত্রে মশারীর মধ্যে রাখা প্রভৃতিতে কি বোধ হয় না যে, তাঁহারা ঐ মূর্ত্তিটাকেই পূজা করেন, তাহাকে চিহ্ন মনে করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করেন না? তাঁহাদের দেব দেবীর ধ্যান করিবার সময়ে তাঁহারা যে সকল মন্ত্র জপ করেন, তাহার মধ্য হইতে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ

করা যায় যে, তাহাদের লক্ষ্য ঐ মূর্ত্তি মাত্র। অজ্ঞানতাই ইহাদের অপরাধ, অবশ্য স্বীকার করিলাম, কিন্তু সে অপরাধ জন্য যে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত নন, দ্বিজদাস বাবুর মতের সহিত এই খানে আমাদের ঐক্য হইল না। তিনি যে বলেন "অথবা তোমার কথাই যদি সত্যমানা যায়, যদি আকারেই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে,—তদ্দারা তাহাদের ঈশ্বর সাধনায় ব্যাঘাত হয়, এমন মনে করা যায় না।" ইত্যাদি। তিনি যে লাট সাহেবের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বালক ভুলান উপমামাত্র হইয়াছে। এইরূপ উপমা আমরা তাঁহার মত লোকের নিকট প্রত্যাশা করি নাই, এজন্য তাঁহার এই স্থলটুকুর জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। পরে লিখিয়াছেন "যে দেবতা বা জড় বস্তুকেই লক্ষ্য করিয়া তুমি পূজা কর, ঈশ্বর দয়া করিয়া অবশ্যই তোমার সে পূজা স্বয়ং গ্রহণ করিবেন, কালে তোমার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবেন।" এই স্থলটী লেখকের অত্যন্ত আত্মবিরুদ্ধ হইয়াছে। তিনিই এক স্থলে লিখিয়াছেন, উপাসনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা নয়। তাঁহাকে খুসী করা যদি উপাসনার লক্ষ্য হইত, আর না জানিয়া শুনিয়া তাঁহার বদলে যদি এক খণ্ড কাষ্ঠ বা প্রস্তরকে খুসী করা যাইত, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হাসিয়া বলিতেন,— "তোমরা আমাকে মনে করিয়াই যখন জড়ের উপাসনা করিতেছ, তখন উপাসনা আমি স্বয়ংই গ্রহণ করিলাম। এই আমি আসিয়াছি, বরং বৃণু, বর প্রার্থনা কর।"!! নতুবা তাঁহার বালক ভুলান কথা কিরূপে সঙ্গত, বুঝিতে পারি না। আরও এক অমুরূপ অদ্ভুত যুক্তিবিরুদ্ধ কথা উক্ত প্রবন্ধে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কোন চিত্রকর যখন কোন চিত্র অঙ্কিত করেন, তখন তাঁহার আত্মা সেই চিত্র রূপই ধারণ করে। এইত এক অদ্ভুত মত, যাহার কোন প্রমাণ লেখক দেন নাই। তার পর আবার এই মত উপমা স্বরূপ লইয়া আর একটী মত সম্ভবপর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, "সেইরূপ চিত্রকর… দুর্গা কালী মূর্ত্তিমাত্র কল্পনাতে ধারণ করিয়া যদি ভক্তের নিকট আবির্ভূত হন, ভক্ত তখন তাঁহাকে দুর্গা কালী রূপেই আবির্ভূত দেখিতে পাইবেন।"—ভয়ানক মত! শ্রদ্ধেয় দ্বিজদাস বাবু নিজেই ইহার তীব্র প্রতিবাদ না করিলে বিস্মিত হইব। সত্য বটে তিনি "যদি তবে" দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তথাপি এরূপ সম্ভব মনে করাও আশ্চর্য্য। সে টুকু নির্দ্দোষ;—যে ভক্ত বাল্যকালাবধি দুর্গা বা কালী মূর্ত্তি বিশেষ অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ ঐ মূর্ত্তিতেই ঈশ্বর আবির্ভূত হইবেন এই আশা হৃদয়ে পরম আদরে পোষণ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক যে, তিনি ঐ রূপ মূর্ত্তি সাধন পথে অগ্রসর হইলে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতে পারেন। এ টুকুতে লেখকের কোন দোষ দেখিনা, কেননা বাস্তবিকই রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তগণ কালীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেন, এরূপ প্রবাদ আছে। অন্য সাধকের পক্ষে তাঁহার কল্পনার উৎকৃতা প্রসূত বা অন্য কোন কারণে সম্ভূত হওয়ায় সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে পারি যে, তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, ঐরূপ একমূর্ত্তি। তাহাতে কি? তাহাই কি বিশ্বস্রষ্টা, পাতা, বিধাতা সেই পরব্রহ্মের আকার? সাধক

এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? এবং শ্রদ্ধেয় দ্বিজদাস বাবুইবা তাহার কি প্রমাণ দিতে পারেন? "যদি ভক্তের নিকটে আবির্ভূত হন" এই টুকুর কি প্রমাণ দিতে তিনি প্রস্তুত?—সেই মূর্ত্তিত স্বয়ং পরমেশ্বরের মূর্ত্তি নয়, তাঁহার নির্দ্ধারিত আকার নয়, তাঁহার নিজ চেহারা ত সেটা নয়ই নয়। তবে সে কি ব্রহ্ম দর্শন হইল? কেবল পূর্ব্বোক্ত মত একটা ভাববিশেষের পরিগৃহীত মূর্ত্তিমাত্র, তাহার মূল্য কত, তাহা পূর্ব্বে বিশদ রূপে লিখিত হইয়াছে। সাধক বলিবেন "কেন? প্রমাণ আছে, আমার সেই মূর্ত্তি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ভক্ত তোমার ব্রতার্থে আমি তোমার সম্মুখে এই বেশে আসিলাম। এই যে মূর্ত্তি দেখিতেছ, ইহার মধ্যে আমি আছি। ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ চাও?" হাসির কথা! অবিশ্বাস করি না। ভক্ত ওরূপ কথা হয়ত শুনিতে পাইলেন; তাহাতেই কি সেই মূর্ত্তি দর্শন হইল, আর শোনা হইল। একটা কথা যে সেই মূর্ত্তিতে ভগবান আবির্ভূত। সে মূর্ত্তি দর্শন আর ব্রহ্ম দর্শন কখনই এক নয়, কেননা তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তু দর্শনই ব্রহ্ম দর্শন, কারণ কিসে তিনি আবির্ভূত নন? গাছ, পাথর, নদী, আকাশ, আমার দেহ, কলস, সর্ব্বত্রই ত তিনি বিদ্যমান; তবে আর মূর্ত্ত সাধক আমা অপেক্ষা ও তোমা অপেক্ষা কিসে অধিক ব্রহ্ম দর্শন করিলেন? ব্রহ্ম নিরাকার চৈতন্যময় সর্ব্বশক্তিমত্বা প্রযুক্ত মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াই ত জগৎময় রহিয়াছেন, এক প্রকার বলিতে হইবে। তবে আর বিশেষ ব্রহ্ম দর্শন তাঁহার কৈ হইল?

এত কথা বলিতে হইত না, এত বাক্য ব্যয় করিতাম না, যদি লেখক নিজে মূর্ত্তিতে বিশ্বাসী হইতেন। তাঁহার মুখে এরূপ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছি। বোধ হয় তর্কের খাতিরে এরূপ মত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা লেখকের মনোগত কথা নহে; কেননা তাহার পরক্ষণেই বলিয়াছেন, "যদি পূর্ণ খণ্ড স্বরূপের পক্ষে দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন আকার ধারণ অসম্ভবই হয়" ইত্যাদি। সে যাহা হউক, একটা রূপ দর্শনই যদি উপাসনার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলেও এক দিন উক্ত সাকারদ্দিগের মত সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও নয়। উপাসনার উদ্দেশ্য কি, তাহা উপাসক মাত্রেই জানেন—আত্মার সম্মুখে পরমাত্মাকে সর্ব্বদা রাখিয়া ক্রমে তন্ময়ত্ব লাভ করা। ইহা যদি উদ্দেশ্য, তবে কালী বা দুর্গার মূর্ত্তির সান্নিধ্যে আত্মাকে রাখিয়া তন্মূর্ত্তিময় হইয়া যাওয়াই কি সাকার পৌত্তলিকদিগের লক্ষ্য? অবশ্য নয়! তবে মুক্তি লাভ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাহ্য বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দিবানিশি মুক্ত ভাবে পরমাত্মার সহবাস ও নিত্য যোগ সংস্থাপনই মুক্তি। ইহাই উপাসনা বা সাধনের লক্ষ্য। তবেই বুঝিয়া দেখুন, সাধন জড়ে বা সাকারের উপাসনায় হয় কি না।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে; আশা করি, দ্বিজদাস বাবু বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, পৌত্তলিতাতে সাধকের আত্মার উপকার না হইয়া বরং অধোগতিই হইয়া থাকে, এবং জাতিভেদজনিত বৈষম্য ব্যতীত, আমাদের দেশে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত আছে, তাহাতে পৌত্তলিকতায় চিরনিবদ্ধ অনেক দোষ

আছে। এখন আর তিনি বা পাঠক বর্গের কেহই বলিতে পারিবেন না যে, পৌত্তলিকতাতে স্বত কোন দোষ নাই। পৌত্তলিকতাতেই দেশ অধঃপতিত হইয়াছে। মানবের আত্মার মহত্ব বিনষ্ট করিয়া জড় সহবাসে তাহাও প্রভূত পরিমাণে জড়ত্ব আনিয়া দিয়া আমাদের সোণার দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। প্রাণস্য প্রাণম্ চিন্ময় পরমাত্মার উপাসকগণ বিস্মৃত হইয়া কেবল অন্ধ বিশ্বাসের আবর্ত্তে পড়িয়া ভ্রম ও কুসংস্কারের দৃঢ় শৃঙ্খলে গ্রীবাদেশ সম্বদ্ধ করিয়া কোটী কোটী নরনারী শতাব্দীর পর শতাব্দী দুর্লভ মানবজীবন বৃথায় হারাইয়া দেশের দুর্গতি শতধা বর্দ্ধিত করিতেছে। এ পৌত্তলিকতার বীজ পর্য্যন্ত ভারতক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিয়া সত্যের জ্বলন্ত বহ্নিতে দগ্ধ করা প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকের অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম। যিনি তৃণ কণা স্থলান্তরিত করিয়াও এই মহাব্রতের সহায়তা করিতে সমর্থ হন তিনি ধন্য!

তবে যাহারা খ্রীষ্টানদিগের বৃথা অনুকরণে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে চিন্তাশূন্য চীৎকার ধ্বনি উত্তোলন করিয়া অনর্থক স্বদেশীয় সরল বিশ্বাসী ভ্রাতৃগণের নিন্দাবাদ করে ও তাঁহাদের বিশ্বাসের ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া হৃদয়ের নীচতার পরিচয় দেয়, তাহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ গর্হিত কার্য্যের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, বরং অবিমিশ্র ঘৃণার চক্ষে আমরা তাহাদের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করি। ধার্ম্মিক সাধকেরা পাপী নারকীকেও ঘৃণা করিতে পারেন না; পৌত্তলিক ত উপাসক, তাঁহার ত কথাই নাই। ভ্রান্ত অজ্ঞান বলিয়া কৃপাকাতর সজল নয়নে তাঁহার হাতে ধরিয়া বুঝাইতে হইবে। উপদেশ ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার প্রমাণ করিয়া নিজ গৃহীত সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সময়ে সত্য জ্ঞানের আবির্ভাবে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার আপনি পলায়ন করিবে। অন্ধকারকে দূর করিতে হইলে অন্ধকারের নিন্দাবাদ বা তাহার সহিত বৃথা যুদ্ধে ফল কি? জ্ঞানী ব্যক্তি সেখানে আলো জ্বালিয়াই অন্ধকার দূর করেন। সে আলো থাকে, অগ্রসর হও।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

আসাম ও বাঙ্গালী।

(প্রতিবাদ।) (১)

কোন জাতির চরিত্র সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে সেই জাতীয় লোকদিগের সহিত বিশেষ ভাবে আলাপ পরিচয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদিগের সহিত কিছু কাল বাস করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদিগের জাতীয় চরিত্রের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ না

(১) এই প্রতিবাদটী আমরা সাদরে পত্রিকাস্থ করিলাম। কোন জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিচার হয়, ইহা আমাদের অসহ্য। এ বিষয় লইয়া আর বাদ প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই বলিয়া প্রবন্ধ-লেখকের মর্ম্ম অর্থ বুঝাইবার জন্য ও তাঁহার প্রতি অবিচার না হয়, এই জন্য আমরা স্থানে স্থানে ফুটনোট করিয়া দিলাম। এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, প্রবন্ধ-লেখক যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা অতি দুঃখের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন, নিন্দা প্রচারের জন্য নহে। ন, স।

করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একস্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছি, ইতি মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির দুর্ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের সমস্ত দোষ সেই জাতির উপর ঢালিয়া দেওয়া [যেমন মেরুলে করিয়াছেন] কত দূর ন্যায়সঙ্গত, বুঝিতে পারি না। তারপর আবার লোক মুখে কাহারও দোষের কথা শুনিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করা যে কত দূর ভ্রমসঙ্কুল, কে না বুঝিতে পারে? দোষ থাকিলেও তাহা ঘোষণা না করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে পারিলে কিঞ্চিৎ সুফল ফলিতে পারে। দোষ ঘোষণাতে বরং আসামে বাঙ্গালী-বিদ্বেষাগ্নিতে "ইন্ধন" দেওয়া হয়।

এক আসামে যত প্রকার পার্ব্বত্য জাতি বাস করে, ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে এরূপ আছে কি না সন্দেহ, এবং তাহাদিগের মিশ্রনে যত প্রকার সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহাদিগের রীতি নীতি ও চরিত্র বর্ণনা করা অতি কঠিন ও গুরুতর দায়িত্বের কার্য্য। ডাক্তার বুকেনন, পেমবারটন, রবিনসন প্রভৃতি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ আসামের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও এমন ভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসী নিম্ন শ্রেণীর সমস্ত লোকদিগকে "নীতিহীন, চরিত্র-হীন, ধর্ম্মহীন, মনুষ্যত্বহীন" বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহসী হন নাই। উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের সাহস ও আসাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাকে ধন্যবাদ!

১। "ব্যভিচার নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে দোষ বলিয়াই গণ্য নহে—পিতা কন্যাকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মপ্রাপ্ত বড় লোকের সহবাসে রাখিতে পারিলে সম্মান বোধ করে।"

২। "পাঠকগণ শুনিয়া চমকিত হইবেন, আসামের অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ্য বেশ্যা নাই—তাহার কারণ ভদ্র পরিবার ভিন্ন বাড়ীতে বাড়ীতে সকলেই * ঐ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে।"

৩। "স্ত্রীলোকে উপার্জ্জন করে পুরুষেরা ঘরে বসিয়া খায়।"

৪। "আতিথ্য প্রথা কোথাও নাই, তবে গুপ্ত প্রণয় খুলিতে পারিলে দ্বার অবারিত।"

দেখা যাউক এই কথা গুলি কতদূর সত্য। এক একটী করিয়া এই সকল মন্তব্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

মোটামুটী ধরিতে গেলে আসামে মেচ্, লালুং, হাজং, কাছাড়ী, রাভা, ছুটীয়া কোচ্, আহম্, খাম্তি, অব, ডবা, মিরি, মিস্মি, মিকির, থালিয়া, গারো, নাগা প্রভৃতি অসভ্য জাতি বাস করে। এই সকলের আবার শাখা, উপশাখা আছে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির ভাষা, আচার প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কতকগুলি একে অন্যের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদের মিশ্রণে কত শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, কে গণনা করিবে? ইহাদিগের বিবাহ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। কোন্ জাতি কোন্ জাতির সহিত, কোন্ শাখা কোন্ শাখার সহিত বিবাহ

* "ই" শব্দটী প্রবন্ধ-লেখকের নহে। "সকলেই" ও "সকলে"—উভয়ের এক অর্থ নহে। যাহা হউক, "সকলে" শব্দটী প্রয়োগ করায় প্রবন্ধ-লেখকের নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। এই অন্যায় শব্দ প্রয়োগে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত। পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন। স, স।

বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসী মিরি (পার্ব্বত্য মিরি নহে) জাতির উল্লেখ করিতেছি। মিরি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বারগাঁ ও দোগাঁ। বারগাঁ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, পিণ্ড এবং ভোরী। পিণ্ডপুরুষের ভোরী রমণী কিম্বা ভোরী পুরুষের পিণ্ড রমণীকে বিবাহ করিতেই হইবে। নতুবা ইহারা কুলভ্রষ্ট হয়। মিরি দিগের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই। কোন কোন স্থলে অল্প বয়সে বিবাহ সুস্থির হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত যুবক পৃথক ঘর বাড়ীর সংস্থান করিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত বিবাহ করে না। কোন কোন স্থলে যুবক বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ীতে দুই বৎসর কি ততোধিক কাল চাকরী করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ শ্বশুরকে পণ স্বরূপ প্রদান করে। তৎপর পৃথক বাড়ীতে চলিয়া যায়। বন জঙ্গল পরিষ্কার, ক্ষেত্র চাস প্রভৃতি সমস্ত কঠিন কাজ পুরুষগণ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোক ধান্য রোপণ করে, কাটে, কাপড় বুনে ও অন্যান্য গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন করে। কোন ডফ্লা রমণী পতি বর্ত্তমানে পত্যন্তর গ্রহণ করিলে কিম্বা পর পুরুষে আসক্ত হইলে ডফ্লা রীতি অনুসারে তাহার প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। তৎপর কাছাড়ী (কছারী)* জাতির বিষয় দেখা যাউক। ইহাদিগের বাসস্থান গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দড়ঙ্গ, প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাভূমি। ইহাদিগের মধ্যে আমাদের দেশের ন্যায় খোকা খোকির বিয়ে হয় না। কোন ব্যক্তির বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে তাহার পিতামাতা পাত্রী অন্বেষণ করিতে থাকে। যদি কোন কন্যা পছন্দ হয়, তবে বরের পিতা মাতা কন্যার পিতা মাতার নিকট তাম্বুল (পান সুপারী) শুকর মদ্য প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হয়। যদি পাত্রী পক্ষের কেহ তৎক্ষণাৎ সুপারী কাটিয়া পান খায়, তবেই তাহাদিগের বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইল। ইহার পর কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে সকল বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি সমবেত হইলে সভাস্থলে বর ও কন্যাকে উপস্থিত করিয়া উক্ত বিবাহে তাহাদিগের সম্মতি আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহারা সম্মতি সূচক বাক্য প্রকাশ করিলেই বিবাহ হইল। তৎপর উক্ত নব দম্পতীর মঙ্গল উদ্দেশে ভূতপ্রেত দিগের নিকট মুরগ প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়; এবং নৃত্যগীতাদি ও ভোজ হইয়া বিবাহ ক্রিয়া শেষ হয়। এখানে বলা উচিত যে, যুবকের পিতা কন্যার পিতাকে কিঞ্চিৎ অর্থ পণ স্বরূপ দিয়া থাকেন। পাত্র পক্ষ সেই পণ দিতে অক্ষম হইলে, জামতা শ্বশুর বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য চাকরী করিতে বাধ্য হয়। স্বামী স্ত্রীর পরস্পর অভিমত হইলে বিবাহ ভঙ্গ (Divorce)

* They have a bold, independent, manly bearing, though in Conversation theia manner is apt to be unpleasantly abrup and brusque; and when bent on attaining unlawful ends they do so more commonly by violence and force than by deceit and fraud. One leading feature in their natural type of character is very strongly marked claunish feling which cause them sometimes to stand by and support each other for good or for evil to the last extremity.

Assam Census Report p. 70

হইতে পারে। বিবাহ ভঙ্গ করিতে হইলে এবিষয়ে আত্মীয় স্বজনকে খবর দেওয়া হয়। তৎপর স্বামী একটা পানের এক দিকে ও স্ত্রী অপর দিকে ধরিয়া সভা স্থলে সকলের সমক্ষে টানিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেই বিবাহ ভঙ্গ হইল। ইহারা পুনরায় ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে। ইহাদিগের স্বভাব উত্তম; বিবাহ বন্ধন দৃঢ় ও পবিত্র *। মিকির জাতির বিবাহ-প্রণালীও প্রায় কাছাড়ীদিগের ন্যায়। খামতি জাতির মধ্যে মদ্য পান নিষিদ্ধ। এইরূপ আরো কত জাতির উল্লেখ করিতে পারি। তবে কেমন করিয়া বলিব, "উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা নাই বলিলেই ঠিক হয়?" (১) কেমন করিয়া বলিতে পারি, "ব্যভিচার নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে দোষ বলিয়াই গণ্য নহে" * ইত্যাদি।

আমিও এক সময় ব্রহ্মপুত্র বক্ষে ভাসমান উমানন্দের শোভা দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে নীলাচল শিখর-স্থিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পশ্চাৎদিকে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। কত কি ভাব হইয়াছিল; বলিতে পারি না। একটী কথা মনে আছে,—আসামে ভেড়া বানান। একজন আসামী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয় ভেড়া বানান বিষয়টা কি?" তিনি উত্তর করিলেন—"ভেড়া আবার বানাবে কি? ভেড়ার ছেলেরাই এখানে আসিয়া ভেড়া হয়; এখানে কি মানুষ আসে?" তৎপর আমি নিম্ন শ্রেণীর লোক বেষ্টিত—শম্মার বাড়ীতে ৭। ৮ দিন অবস্থিতি করিয়াছি। আমার নিকট হোমিওপ্যাথী ঔষধ ছিল। ইহাদের অনেকেই এই সংবাদ পাইয়া প্রতিদিন স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া আমার নিকট আসিত। আমিও ইহাদিগের বাড়ীতে যাইতাম। ইহাদিগের শিশু কন্যাগণ আমাকে অনেক সময় পয়সার জন্য বিরক্ত করিত। বলিত "একটা পয়সা ডে বাবু, মুগ ডে বাবু ডে, হন্দেখ্ খাইব, আশীষ করিব, ডে বাবু মুগ একটা পয়সা ডে" ইত্যাদি। এই পল্লীস্থিত বিবাহিত ও অবিবাহিত স্ত্রী লোকদের সহিত আলাপ করিয়া ইহাদিগের চরিত্র, রীতি নীতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। একদিনও ইহারা "বাড়ীতে বাড়ীতে বেশ্যা বৃত্তি করে বলিয়া অনুভব করিতে পারি নাই। পরন্তু যখন ইহাদিগকে সৎ পরামর্শ দিয়াছি, সৎ কথা বলিয়াছি, তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছে "টোর ঘর বঙ্গাল দেশত ন হোবার লগে, টুই বঙ্গাল ন হয়, টুই ভাল" ইত্যাদি (তোমার বাড়ী বঙ্গদেশে নয়, তুমি বাঙ্গালী নও, তুমি ভাল, তুমি ভাল ইত্যাদি) বলা বাহুল্য যে বাঙ্গালী মাত্রকেই "বঙ্গাল" অথবা "কলা (কাল)

* "The family relations among Cacharis are on the whole sound and pure and much more as perhaps than in more civilized communities
Census Report 1881 *p.* 71.

(১) সমালোচক অনেক জাতির নাম করিয়া অতি কষ্টে দুটী জাতির বিবাহ প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাও সে কিরূপ বিবাহ প্রথা পাঠকগণ বিচার করিবেন। বিহু প্রথাকেও ত এক প্রকার বিবাহ প্রথা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিতেন।

* "Among the Cacharis adultery is looked upon as a very serious offence and the adulterer becomes an outcast unless he can pay a heavy fine No blame is attached to the adultress.
Robinson's Assam, p. 295.

রঙ্গাল” এবং সাহেব মাত্রকেই “বগা (শাদা) বঙ্গাল” বলিয়া থাকে। ইহাদের সকলই যে “বাড়ীতে বাড়ীতে ঐ জঘন্য বৃত্তি করে না, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। * এক দিন ঘরে বসিয়া আছি, পার্শ্বের ঘরে একজন যুবক চুপি চুপি কি বলিল; দুই চারিটা টাকার শব্দও শুনিয়াছিলাম। বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল “এমন কথা বলোনা বাবা, ইজ্জত যাবে।” তার পর বৃদ্ধা রাগান্বিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই আমাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া সমস্ত কথা বলিল। বাঙ্গালী যুবক বৃদ্ধার নাতিনীর রূপে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র জাতীয়া। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া কিরূপে বলিব “বাড়ীতে বাড়ীতে সকলেই ঐ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে”। আর উক্ত প্রবন্ধ লেখক পরেরমুখে দুচারিটী কথা শুনিয়াই সমস্ত আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের দোষ দেশ বিদেশে কীর্ত্তন করিলেন। সমস্ত নিম্ন জাতির উপর কলঙ্ক আরোপ করিলেন। কি ভয়ানক ভ্রম!!

পাশব প্রকৃতি কোন কোন ইংরাজ ও বাঙ্গালী অর্থ দ্বারা আত্মীয় স্বজনকে বশ করিয়া তাহাদের অধীনস্থ কন্যা কি অন্যান্য বয়স্থা স্ত্রীলোককে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, একথা সত্য। এইরূপ লোক “সম্মানিত„ হওয়া দূরে থাকুক, সচরাচর ঘৃণিত অনাদৃত হইয়া থাকে। টেম্পল্ টন সাহেবের কথা বোধ করি অবগত আছেন। কোন কোন ইহুদী এরূপ করে বলিয়া জনরব আছে। কোন বাঙ্গালী ও তাহার বিধবা কন্যাকে দুষ্কর্ম্মে রত করিয়াছিলেন। এই জন্য কি এই গুলি জাতীয় কলঙ্ক বলিয়া ধরা যাইতে পারে? একজন বা দুইজন অন্যায় কাজ করে বলিয়া কি বলিব, জাত শুদ্ধ সব লোক এরূপ করিতে পারিলে “সম্মান বোধ করে।” লেখকের এইরূপ উক্তি অতি সঙ্কীর্ণতা পরিচায়ক।

২। “আসামের অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ্য বেশ্যা নাই, তাহার কারণ ভদ্র পরিবার ভিন্ন বাড়ীতে বাড়ীতে সকলেই ঐ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে।” * এরূপ লিখাকেই বলে Libellous!!! এজন্য লেখকের উচিত প্রত্যেক কৃষক ও কৃষক-রমণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সকলেই এই রূপ করে?—দেশ শুদ্ধ লোকের কথা দুই দিনে কি রূপে জানিলেন? না জানিয়া সব ছোট লোকদের উপর এমন অপবাদ! কেহ কেহ এরূপ করে বলিলেও কতকটা যুক্তি যুক্ত হইত। ইহাকেই বলে মিথ্যা অপবাদ করা। † বঙ্গদেশের সব পল্লীতেই বেশ্যা আছে না কি? লেখকের যুক্তি বলে দেখিতেছি কয়েকটী সহর ভিন্ন সমস্ত বঙ্গদেশ রসাতলে যায়। তবে কি আসামে ব্যভিচার নাই? এখানে বলিয়া রাখি, আসামে স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল এখনও আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিরজুমলা প্রমুখ মুসলমান সৈন্যগণ আসামে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকগণ আর খোঁজা

* কিন্তু অনেকে যে করেনা ইহা কি তারিণী বাবু বলিতে পারেন? সকলে করে ইহা লেখা অন্যায় হইয়াছে স্বীকার করি, লেখকের এই অনবধানতার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

*আবার কেন? ন, স।

† তারিণী বাবু এস্থলে যাহা কলমে আসিয়াছে তাহাই লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ন, স।

বেষ্টিত অন্তঃপুরে বাস করে না ; যথা ইচ্ছা তথা বিচরণ করে। তখন হইতে মুসলমানগণ তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া চরিত্রের হীনতা সম্পাদন করিতেছিল। তার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মদেশ হইতে মানগণ আসিয়া আসামী দিগের কি না দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিল? এদিকে তখন আবার ইংরেজ সৈন্যগণ আসামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই আসামে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। আসামে সমাজ ভিত্তি স্খলিত হইল— নৈতিক উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত হইল।* তখন হইতেই আসামবাসী হীনতেজ, হীনবীর্য্য হইয়া দিনপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। "দেশার্থং দেহমুৎসৃজেৎ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুরুষগণ পতঙ্গের ন্যায় বিপ্লবাগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন। এদিকে পতি পুত্রহীন মাতা, স্বামীহীন স্ত্রী, ভ্রাতাহীন ভগিনীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে মানদিগের অত্যাচারে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা আসামে অসম্ভাবিত রূপে বৃদ্ধি হইয়া গেল। তখন হইতেই আসামে বিবাহ-বন্ধন শ্লথ, বিবাহ-পদ্ধতি হীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং এখন ও তদানুষঙ্গিক কতকগুলি কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সেই বিপ্লবের ভস্মরাশি এখনও স্তুপাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই রূপে যে সকল জাতি যত অধিক পরিমাণে দেশী ও বিদেশী সৈন্য ও মান প্রভৃতি অত্যাচারীদিগের সংঘর্ষণে আসিয়াছিল, তাহাদের নৈতিক অবনতি তত অধিক পরিমাণে হইয়াছে। দুশ্চরিত্র ইংরাজ ও বাঙ্গালী, পশু প্রকৃতি দেশী ও বিদেশী সিপাহীদিগের ঔরষ জাত সন্তান সন্ততি যে ব্যভিচারী হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বঙ্গদেশে যেমন ব্যভিচারী মাতা সন্তানকে পরিত্যাগ করে, অথবা মারিয়া ফেলে, আসামে তেমন নিয়ম নাই। ইহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সুতরাং কোন শ্রেণী বিশেষের দোষ দেখিয়া আমরা তাহা সমস্ত জাতিতে আরোপ করিতে পারি না। অপিচ কোন শ্রেণীর কি কোন জাতির ব্যবসা ইহাদিগকে ক্রমে ক্রমে কুপথে প্রচারিত করিতেছে। যেমন ব্যবসায়ী গায়ক গায়িকা, নর্ত্তক নর্ত্তকী, এবং অভিনায়ক অভিনায়িকা প্রভৃতি। এখানকার মেথরগণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী; খাসিয়ানগণ সে জন্য কি বলিবে উক্ত দেশবাসী সকল লোকই মেথর জাতীয়? ইহা যেমন ভুল, উক্ত প্রবন্ধ লেখকের "নট নটী" প্রভৃতি অতি অল্প সংখ্যক লোকের দোষ কিম্বা ব্যবসায় সকল জাতিতে আরোপ করাও তেমন ভুল হইয়াছে। পরন্তু এদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা আছে বলিয়া ইহাদিগের দোষ গুলি অতি সহজেই সাধারণের নিকট ধরা পড়ে। বঙ্গদেশে অন্তঃপুরে কত কিছু হয়; অন্য দেশীয় লোকের সহজে তাহা জানিবার সাধ্য কি? তার উপর আবার সহরের স্ত্রী লোক দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সেই মত পোষণ করা অতি প্রমাদজনক। যদি চিৎপুর রোডের কিম্বা সোণাগাছীর অবস্থা দেখিয়া বঙ্গীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কেহ সেই মত পোষণ করে, তবে কেমন হয়? ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাস্থিত হাজু নামক স্থানকে বর্ত্তমান বেবিলন বলিলেও অত্যুক্তি হয়

* "Such intercourse has nearly every where currupted the manners of the natives"
Oscerpeschel's races of man p. 229.

না। বেবিলনে যে সকল পাশবক্রিয়া মোক্ষপ্রদ বলিয়া সম্পাদিত হইত, হাজুতে সেই গুলি মোক্ষপ্রদ না হইলেও বড় একটা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। হয়গ্রীব মহাদেবের কুমারী স্ত্রীগণ ও নর্ত্তকীগণ কি না করিতে পারেন! এজন্য কখনই বলিতে পারি না আসামের সর্ব্বত্রই এই প্রকার—আসামে নিম্ন শ্রেণীর সকল লোকেই নিতান্ত জঘন্য নীতিহীন বর্ব্বর। সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কথা দূরে থাকুক, কেবল মাত্র হাজুর নিম্ন শ্রেণীস্থ সকলেই "বাড়ীতে বাড়ীতে এই যঘন্য বৃত্তি করিয়া থাকে" বলা ও নিতান্ত অন্যায়। * আসামে ভালও আছে মন্দ ও আছে। তবে দুই এক স্থানে মন্দের ভাগ অধিক।

৩। "স্ত্রীলোকে উপার্জ্জন করে পুরুষেরা ঘরে বসিয়া খায়।" পার্ব্বত্য অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য জাতিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সমান পরিশ্রম করে। য়ুরোপীয় সভ্যতর জাতির ন্যায় স্ত্রীকে মঞ্চে বসাইয়া পাদ্য অর্ঘ প্রদান করে না—যেমন আমাদের দেশেও কতক পরিমাণে হইতেছে—আবার নিতান্ত বর্ব্বরের ন্যায় স্ত্রীর দ্বারা সমস্ত কাজ করায় না। আসামের ১৮৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এরূপ লিখিত আছে †। শতকরা ৬১.৫ জন পুরুষ নিজ নিজ পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পুরুষ সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৪১.৯ জন ১৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক, সুতরাং দেখা যায় যে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেই নিজ নিজ পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন পুরুষের ন্যায় কর্ম্ম করে। ইহা দ্বারাই উপরোক্ত কথাটী কত দূর সত্য তাহা প্রমাণিত হইতে। *

৪। আসামে আমাদের দেশের ন্যায় আতিথ্য প্রথা না থাকার কয়েকটী কারণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ মিকির প্রভৃতি জাতির গ্রামে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে এক এক পরিবারের সমস্ত লোকের জন্য এক খানি মাত্র ঘর। বাড়ীর সকলেই সেই ঘরে রাত্রি যাপন করে ও আহারাদি করিয়া থাকে। তাহাতে আবার ইহারা নিতান্ত দরিদ্র অবস্থাপন্ন। বঙ্গ দেশের কৃষকদিগের ন্যায় সুখ সচ্ছন্দে বাস করে না। দ্বিতীয়তঃ অনেক দুষ্ট লোক ইহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছে বলিয়া ইহারা এখন আর কাহাকেও স্থান দিতে চায় না। তৃতীয়তঃ হিন্দু সন্তান যেমন মুসলমানকে অন্তঃপুরস্থিত ঘরে স্থান দিতে চায় না, তেমনি হিন্দু আসামীগণ ধর্ম্মের অনুরোধে বাঙ্গালী প্রভৃতিকে আশ্রয় দেয় না। হিন্দু আসামিগণ এত দূর গোড়া যে, বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতিকে জল পান করিবার জন্য বাটী, গ্লাস প্রভৃতি দেওয়া দূরে থাকুক, বসিবার কাষ্ঠাসন পর্য্যন্ত দেয় না। বসিবার জন্য খড় দিয়া থাকে। "গুপ্ত প্রেমের দ্বার খুলিলে" ও হিন্দু আসামী তাহার বাসঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না—তাহারা বাসনে আহার করিতে দিবে না।' † তবে আর কি প্রকারে "দ্বার অবারিত?" চতুর্থতঃ ইহাদের অনেকেই জঙ্গলে বাস করে।

* এখানে ও ঐ এক কথা? ন, স

† See p. 115 Assam Census Report.

* এই তুলনায় গণনা সমস্ত আসামবাসীর সংখ্যানুসারে হইয়াছে। কেবল নিম্ন শ্রেণী সম্বন্ধেই ঐরূপ কথা বলা হইয়াছে। ন, স।

† They are also hospitable to people of their own caste but to no others." *Robinson's Assam p.* 267.

এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রাম অনেক দূর। কোন এক গ্রামের হাট হইতে সপ্তাহের খাদ্য ক্রয় করিয়া রাখে, ইহাতেই তাহাদের সেই কয়েক দিন চালাইতে হইবে। তাহাতে ইহারা নিতান্ত গরিব। * অতিথিকেই বা দিবে কি, নিজেই বা খাইবে কি? তবে কোন ব্যক্তি নিতান্ত নিরাশ্রয় হইলে গ্রামস্থিত "নাম ঘরে" (উপাসনালয়ে) তাহাকে স্থান দেওয়া হয়।

আমরা আর্য্য জাতির বংশধর হইয়া যদি কুরীতি কুনীতি পূর্ণ দেবদেবীর অর্চনা করিতে পারি, তবে আসামী "ধর্ম্মহীন" এ কথা আর কলঙ্কের বিষয় কি? ইহারা পর্ব্বতবাসী অসভ্য। ইহাদের কোন কোন জাতি এখনও মনুষ্যের আদিম পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় অতিহীন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কয় জন ধর্ম্ম প্রচারক ইহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য বর্ষে বর্ষে আসিয়া থাকেন? নিম্ন শ্রেণীর সকলই ধর্ম্মহীন, এ কথাই বা কেমন করিয়া বলি। বঙ্গদেশে যেমন চৈতন্য, আসামে তেমন শঙ্করদেব। শঙ্করের পবিত্র ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে সত্য, কিন্তু আসামবাসী সকলেই ধর্ম্মহীন এ কথা বলিতে পারি না। অনেক স্থানে গ্রামস্থিত "নাম ঘরে" নাম কীর্ত্তন হইয়া থাকে, কোন কোন স্থলে জঘন্যতাও দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কি অতি অশ্লীলতা পূর্ণ কিশোরী ভজন নাই? এজন্য কি বলিতে পারি বঙ্গদেশ শুদ্ধ সব বৈষ্ণবই ধর্ম্মহীন?

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ নিবাসী খামতিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু ইহারা গোমাংস ভিন্ন অন্যান্য মাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ। ইহাদের পুরোহিত মদ্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারে না। মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিক পরিধান করত গ্রামের বহিস্থ "বাপুচঙ্গে" (ধর্ম্ম মন্দিরে) বাস করে। গ্রামস্থিত স্ত্রী পুরুষ তাহার আহারার্থ নানা প্রকার দ্রব্য ও পূজার জন্য ফুলের মালা প্রভৃতি উপহার দিয়া থাকে। 'বাপুচঙ্গে' বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কেবল মাত্র পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করে। প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্ত্তির নিকট কোন প্রকার বলি প্রদান করে না।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ভাই. আসামবাসীর দোষ ঘোষণা করিয়া কি আরো বিদ্বেষানল বৃদ্ধি করিতে চাও! সকলেরই দোষ আছে; কাহারও অধিক কাহারও অল্প। দোষ জানিয়া কাহারও কিছু লাভ নাই; গুণ জানিলে বরং তাহা অনেকে অনুকরণ করিতে পারেন। যাহাতে আসাম উন্নত হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। * বৎসর বৎসর এখানে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করুন; দেখিবেন বঙ্গদেশ অপেক্ষা এখানে ধর্ম্ম প্রচার কত সহজ; দেখিবেন, অসভ্যেরা একবার ধর্ম্মের কথা শুনিলে কেমন সুসভ্য হইয়া পড়ে। বুঝিতে পারিবেন আসামে ধর্ম্মের আদর হয় কি না।

শ্রীতারিণীচরণ নন্দী। শিলং।

* আতিথ্য প্রথা না থাকার অনেক কারণ আছে, সে সকল উক্ত প্রবন্ধের আলোচ্য ছিল না। ম, স।

* তারিণী বাবু ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু অভাব না জানিলে অভাব দূর করিতে কে অগ্রসর হয়? আসামের অভাব জ্ঞাত করিয়া প্রবন্ধ-লেখক কি সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হন নাই? বাঙ্গলার বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতির দোষ উল্লেখ করিয়া এপর্য্যন্ত যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি নিন্দার কার্য্য করিয়াছেন? ম, স।

চৈতন্য চরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম।

উপক্রমণিকা।

আজকাল এদেশে ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা চলিতেছে। সহরে, পল্লিগ্রামে, নগরে, উপনগরে, যেখানে যাই সেইখানেই দেখি সাকার, নিরাকার, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় সকল উৎসাহের সহিত আলোচিত হইতেছে। স্কুলের ছাত্রদিগের মুখেও এখন ঈশা, মুসা, নানক, কবির, শাক্য, চৈতন্যাদি ধর্ম্মবীরগণের ধর্ম্মজীবনের গূঢ়তত্ত্বের অতি উচ্চ উচ্চ কথা সকল শুনা যাইতেছে। শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ভারত সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূরস্থিত সভ্যতম ইউরোপেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী মহা আন্দোলন চলিতেছে। ইউরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা মানব জীবনের প্রহেলিকা ও ঈশ্বর তত্ত্বের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া গভীর চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ নিচয় জগৎকে উপহার দিতেছেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রত্যেক ঈশ্বর বিশ্বাসীর মনে বড় আশার সঞ্চার হয় যে, বুঝিবা এই দুঃখময় অবিশ্বাসী জগতে বিশ্বাস রাজ্য স্থাপিত হইবার দিন আগতপ্রায়। যে সকল নাস্তিক ও সন্দেহবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এমনদিন আসিবে যখন ভগবানের নাম পর্য্যন্ত মানবীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে চির দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিবে, বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মান্দোলন বাস্তবিকই তাঁহাদের কথার অলীকতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। সুবিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হারবার্ট স্পেনসার তাঁহার Ecclesiastical institution নামক গ্রন্থে এক্ষণে একথা স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতেছেন যে, ভগবানের অস্তিত্ব ও উপাসনা যে কেবল চিরকাল মানব মনে অঙ্কিত থাকিবে তাহা নহে, আমরা যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই উপাসনার ভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে। উপাসনাকে তিনি ঐশীভাবের সঙ্গীতময় উচ্ছ্বাস (musical expression of sentiments) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "That a sphere will exist for those who are able to impress their hearers with a due sense of the mystery which enshrouds the universe, and that *musical expression to the sentiment accompanying this sense will not only survive but will undergo further development.* ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ যুগান্তর উপস্থিত না হইলে, আমরা অদ্য যে প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইতাম না।

এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত শ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি সভ্য জগতে এক প্রকার রাজত্ব করিতেছেন বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। এখন আর সেকালের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও ভক্তি শাস্ত্রের কথা শুনিলে কাহাকেও উপহাস করিতে শুনা যায় না। কিন্তু ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বের শিক্ষিত সম্প্রদায়

ইহা কখন বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে, শিখাকর্ণধারী স্থূলকায় বাবাজীদের শাস্ত্রে আবার শিখিবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে, অথবা এমন কিছু আছে যাহাতে মানুষের পরিত্রাণের পথে সহায়তা করিতে পারে? কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সে দিন চলিয়া গিয়াছে; আজ্‌কাল ধর্ম্মযাজকগণ বৈষ্ণব শাস্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতেছেন, ধর্ম্ম মন্দিরের বেদী হইতে প্রেম, ভক্তি, ভাব, মহাভাব সম্বন্ধে উপদেশ সকল প্রদত্ত হইতেছে, বৈষ্ণব সাধুগণের জীবনের জলন্ত বৈরাগ্য ও প্রেমের কথা সংবাদ পত্রে নিনাদিত হইতেছে, এবং বৈষ্ণব গ্রন্থের মর্ম্ম সকল গৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, এ সময়ে চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিলে কেহ উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

যদিও ভক্ত চূড়ামণি শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অনেক বিষয় সভ্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি এমন অনেক কথা আছে, যাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, অথবা যাহা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ রূপে হয় নাই। বিশেষত তাঁহার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদিগের মতে তদ্দ্বারা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। কেন না, এক্ষণকার পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বসিয়া সুমার্জ্জিত রুচির সহায়তায় তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিতে গেলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভবনা অতি অল্প। সে জন্য আমরা এই প্রবন্ধে এই বঙ্গীয় ধর্ম্ম সংস্কারক ও ধর্ম্মবীরের চরিত্র নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিব, মনে করিতেছি। ইহাতে আমাদের নিজের সিদ্ধান্ত অতি অল্পই থাকিবে। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উক্তি অনুযায়ী নিঃসন্দিগ্ধরূপে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, তাহারই উপর আমরা বিশেষ নির্ভর করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মজীবনের বিকাশ, পরিপুষ্টি ও পরিণতিও যাহা, ভক্তিশাস্ত্রের বিকাশোন্নতিও তাহাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং পাঠক মহাশয় মনে করিয়া লইতে পারেন যে, বৈষ্ণবীয় ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনাও এ প্রস্তাবের এক প্রধান উদ্দেশ্য। "বৈষ্ণবীয় ভক্তি শাস্ত্র" অর্থে আমরা চৈতন্য-প্রণোদিত ভক্তিকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে ভক্তি বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নাই। বাস্তবিক ঘটনা এরূপ নহে। কারণ চৈতন্য জন্মিবার বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে এবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল। পৌরাণিক সময়ের অভ্যুদয় কালে ভক্তিপ্রবণ ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবৎ ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থে, তাহার পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব সময়ে বা কিছু পরে বৌদ্ধধর্ম্মের তীব্রগতি প্রতিরোধের জন্য রামানুজস্বামী, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক, তৎপরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ও জয়দেব গোস্বামী দ্বারা, এবং অবশেষে মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতাচার্য্য ও যবন-কুল তিলক হরিভক্ত হরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক এ শাস্ত্র আলোচিত ও শুধু তাহা নহে, স্বস্ব জীবনে সংসাধিত হইয়াছিল। তবে চৈতন্যের প্রব-

র্ত্তিত ভক্তি ও প্রেম ইঁহাদের প্রেমভক্তি হইতে যে অনেকটা ভিন্ন ছিল, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

নানাবিধ অত্যুক্তি ও রূপকালঙ্কারের মধ্য হইতে চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত সকল নির্ব্বাচন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। একে তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থ বা পদাবলী অতি বিরল, তাহাতে আবার তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহাকে যে ভাবে দেখিতেন, তাহাতে তাঁহার সামান্য সামান্য কার্য্য পরম্পরাকেও তাঁহারা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য বলিয়া অদ্ভুত ও অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং চৈতন্য জীবনের প্রকৃত ঘটনা নির্ব্বাচন করা যে বড় সহজ হইবে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় ইতিহাসের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ইহার ঘটনাপুঞ্জ দুষ্প্রাপ্য নহে। বৈষ্ণবেরা তাঁহার জীবনের ও ধর্ম্ম মতের প্রায় সমস্ত ঘটনাই বজায় রাখিয়াছেন, কেবল তাহার অনেক স্থলে অলৌকিক অত্যুক্তিতে আচ্ছন্ন করিয়াছেন মাত্র।

দ্বিতীয়ত চৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিতেন ও উপদেশ শুনিতেন, তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ অতি অল্পই দেখা যায়। যাঁহারা তাঁহার জীবনবৃত্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুশিষ্য ছিলেন না। তাঁহার তিরোভাবের অনেক পরে অর্থাৎ যখন চৈতন্যের অবতারত্ব এক রূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনই এই সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। সুতরাং এবিষয়ে আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ অতি অল্পই দেখিতে পাইব; দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে।

চৈতন্যদেবের নিজের বাক্যকেই আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ বলিতেছি। তাঁহার কার্য্য কলাপ পরিদর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে সকল লিপি গ্রথিত হইয়াছে, তাহাকে আমরা দ্বিতীয়শ্রেণীর প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিব। ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিধান মতে ইহা যদিও প্রথম শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু দর্শক ও শ্রোতাদিগের নিজ নিজ মনের ভাব, ও ভাবব্যঞ্জক বর্ণনা, বক্তা ও অনুষ্ঠাতার ভাবের সহিত এরূপ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, কোন্‌টী কাহার, তাহা বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। সে জন্য আমরা এখানে প্রমাণ শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, ব্যবস্থা শাস্ত্র-বিশারদ পাঠক ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেও চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রশিষ্যের বাচনিক শ্রুত হইয়া যে সকল গ্রন্থ রাশি রচিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের মতে তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ।

"আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত,
সূত্ররূপে মুরারী গুপ্ত করিলা গ্রথিত।
প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।"

চৈতন্য চরিতামৃত।

"বেদগুহ্য চৈতন্য চরিত কেবা জানে?
তাহা লিখি যেই শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে।"

চৈতন্যভাগবত।

এক্ষণে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের

অনুসরণ করিতেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চৈতন্য চরিত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন্ কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তদ্বিষয় সমালোচনা হইবে।

চৈতন্যচরিত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি কি প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যদেবের স্বপ্রণীত গ্রন্থ বা আনুপূর্ব্বিক পদাবলী পাওয়া যায় না। কেবল এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত গুটী কয়েক সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলা পদাবলী যাহা তাঁহার মুখ-বিনির্গত বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্র সম্পর্কীয় সর্ব্বাঙ্গীণ ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করা যাইতে পারে না। কারণ তত্তৎ শ্লোক বা পদ বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভাবিত হইয়া বিশেষ বিশেষ সময়ে উচ্চারিত হইত, সুতরাং সমস্ত জীবনের ঘটনাবলীর পরিচায়ক বলিয়া তাহাকে সমর্থন করা উচিত নহে। তবে তদ্দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মভাবের অনেক তত্ত্ব পরিস্কার রূপে বুঝা যায়। এইরূপ কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

নাম সঙ্কীর্ত্তনকে তিনি ঈশ্বর সাধনের পরম উপায় মনে করিতেন। তদ্বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহা জনিনানুরাগঃ।"

হে ভগবন্ আমাদের উপর তোমার এমনি কৃপা যে, তোমার নামেতে তুমি তোমার সর্ব্ব শক্তি বহুপ্রকারে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ এবং ঐ নাম স্মরণের জন্য সময়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছ; কিন্তু আমার এরূপ দুর্দ্দৈব যে এমন নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

যেরূপে ভগবানের নাম লইলে প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয় তৎসম্বন্ধে উক্তি।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিবসহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণের ন্যায় নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্ব প্রকার অভিমান ত্যাগ করত হরি নাম কীর্ত্তন করিবে।

প্রার্থনা বিষয়ে তাঁহার উপদেশ, যথা

"ন ধনং, ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ি।"

হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী বা পাণ্ডিত্য এ সব কিছুই যাচ্ঞা করিতেছি না, আমার জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

কিরূপ বাহ্য লক্ষণ হইলে প্রকৃতরূপে ভগবন্নাম গ্রহণ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, স্থানান্তরে তিনি তাহা প্রার্থনা বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—

"নয়নংগলদশ্রু ধারয়াবদনংগদ্গদারুদ্ধয়াগিরা
পুলকৈর্নিচিতংবপুঃকদাতব নাম গ্রহণে
ভবিষ্যতি।"

হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকিবে; গদ গদ বাক্যে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিবে; এবং পুলকে সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইবে।

ঈশ্বর বিরহে তাঁহার কীদৃশ অবস্থা ঘটিত, তাহা পশ্চাল্লিখিত শ্লোক পাঠে জানা যায়।

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে"

গোবিন্দ বিরহে আমার নিমেষ কাল যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হয় এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হয়।

সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হইয়া এই পদটী এক সময় গাইয়াছিলেন।

"সেই ত পরাণ নাথ পাইনু,
যাঁহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।"

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে কড়চা গ্রন্থ গুলিই প্রধান। এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সভ্য সমাজে দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ ঘটনার ডাইরি ও স্মৃতি লিপি (Memorandum) রাখার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে কন্থাকরঙ্গধারী অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য বৈষ্ণব সমাজে যে ঐ প্রথা প্রচলিত থাকিবে, ইহা সামান্য বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। অনেক পাঠক হয় তো মনে করিতে পারেন যে, এরূপ বলা কেবল বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার আবিষ্কার মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই যে, শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ও অনুচরগণের মধ্যে স্মৃতিলিপি রাখার প্রথা বহুল রূপে বিদ্যমান ছিল। এই রূপ স্মৃতিলিপিকে তাঁহারা কড়চা গ্রন্থ বলিতেন ও রচয়িতার নামানুসারে তাহার নামকরণ হইত। যথা;—রূপ গোস্বামীর কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা ইত্যাদি। অনুমান হয়, কড়চা নামটী পারস্য ভাষার জমিদারী কাগজ বিশেষের নাম হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। এক্ষণেও জমিদারী সেরেস্তায় একটী কাগজ প্রচলিত আছে, তাহার নাম কড়চা কাগজ; ঐ কাগজে প্রতি প্রজার জমি ও তাহাদের জমাব পরিমাণ ও যত টাকা যে যে সময়ে উসুল দিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে; তাহা দৃষ্টি মাত্রেই বলা যাইতে পারে যে, ঐ প্রজার জমি জমা কত ও তাহার নিকট কত টাকা বাকী আছে। যাঁহার জলন্ত ধর্ম্মভাব হইতে ধর্ম্ম জগতে কত নূতন নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে; ও তৎকালের সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারের জন্য যিনি কতই অভিনব উৎকৃষ্ট রীতি চালাইয়া ছিলেন, সেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য চৈতন্যদেব যে পারস্য ভাষা হইতে এই কড়চা নামটী গ্রহণ করিয়া তাহা অন্য ভাবে প্রবর্ত্তিত করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

উপরি উক্ত কড়চা গ্রন্থে চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলী আপন আপন রুচি, বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে তাঁহার কার্য্য বিবরণ, উপদেশ ও আচার আচরণ, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিয়া রাখিতেন এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা তন্মধ্যে বহু পরিমাণে সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়া রাখিতেন। রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর কড়চায় সংস্কৃতের ভাগ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ, সনাতন ও জীব সর্ব্বদা পুরুষোত্তমে চৈতন্যের নিকট বাস করিতেন না সত্য; কিন্তু তথাপি তাঁহারা কড়চা লিখিতে অমনোযোগী ছিলেন না। চৈতন্যের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই তাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রণীত কড়চা সকলও সেই ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে।

এসম্বন্ধে মহর্ষি ঈশা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈত-

ষ্টের জীবনেতিহাস অতি আশ্চর্য্য রূপে ঐক্য। জন, মথি, লুক প্রভৃতি খ্রীষ্টীয়ানাচার্য্যগণ ঈশার সমসাময়িক থাকিয়া যেরূপে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই যোগীশ্রেষ্ঠ ঈশাকে স্বয়ং ব্রহ্ম, দেবনন্দন রূপে পৃথিবীর পাপীগণের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, বলিয়া যেরূপে বিশ্বাস করিতেন, ভগবদ্ভক্ত চৈতন্য সম্বন্ধে পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবাচার্য্যগণও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। উভয় স্থলেই গ্রন্থকারগণ প্রকৃত ঘটনার সহিত এত অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনাবলী চিত্রিত করিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে তাহা হইতে সত্য নির্ব্বাচন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অথচ এই সকল ব্যক্তি অতি জ্ঞানী ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অপ্রত্যয় করাও কঠিন। সাধারণত আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, কি খ্রীষ্টীয়ানাচার্য্যগণ কি বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ কেহই ইচ্ছা পূর্ব্বক অসত্যকে আশ্রয় দেন নাই। মহীয়সী-ক্ষমতা-সম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের প্রতি সাধারণের অবিচলিত ও দৃঢ় বিশ্বাস নিবন্ধন দুর্ভাগ্য ক্রমে ধর্ম্ম জগতে এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

মুরারিগুপ্ত নামক নবদ্বীপবাসী জনৈক পণ্ডিত চৈতন্যের বাল্যসখা ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর চৈতন্যদেব সর্ব্ব প্রথমে যে সকল বন্ধুর নিকট আপন ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনিও একজন। চৈতন্যের আদিলীলা বিষয়ে তিনি এক কড়চা লিখিয়াছিলেন। এই কড়চাতে গৌরাঙ্গের জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সূত্র অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী সময়ে চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস প্রধানত ইহাই অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত
সূত্ররূপে মুরারীগুপ্ত করিলা গ্রন্থিত।"
চৈতন্য চরিতামৃত।

শেষাবস্থায় চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করিতেন। স্বরূপদামোদর নামক শিষ্য তখন সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। তাঁহার কড়চাই শেষ জীবনের প্রামাণিক গ্রন্থ। চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহা হইতেই অধিকাংশ ঘটনা আপন পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

"প্রভুর মধ্য, শেষ লীলা স্বরূপদামোদর
সূত্ররূপে গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।"
চৈতন্য চরিতামৃত।

এই শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর-প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্যচরিত প্রধান। কিন্তু কবিকর্ণপুরের প্রাপ্ত যৌবন হইতে না হইতে চৈতন্যের তিরোভাব হয়। সুতরাং তৎপ্রণীত গ্রন্থ তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেই পরিগণিত।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতিমূলক যত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত চৈতন্য চরিতামৃত ও লোচন দাস কৃত চৈতন্য মঙ্গলই প্রধান। তদ্ভিন্ন রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বহুবিধ গ্রন্থ

ও পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সমুদয় চৈতন্যের অবতার সংস্থাপন ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যত, তত তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে নহে। অতএব সে সমুদয় গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

চৈতন্যের স্বর্গারোহণের পর সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বৃন্দাবন দাস চৈতন্য মঙ্গল নামে এক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশ করিলেন। বৃন্দাবন দাসকে বৈষ্ণবেরা ব্যাসের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস;
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল;
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।"
চৈঃ চঃ।

ইনি শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময়ে শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা করিয়াছিলেন, সে সময়ে নারায়ণীর বয়স ৪ বৎসর। চৈতন্য এই বালিকাটীকে বড় ভাল বাসিতেন। ব্যাসের উদ্দেশে নিবেদিত প্রসাদ আপনি খাইয়া ভুক্তাবশেষ নারায়ণীকে দিয়াছিলেন। অতএব বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন যে, চৈতন্যদেবের শক্তি সঞ্চার হেতু বৃন্দাবন দাস ব্যাসের অবতার হইয়া উত্তরকালে নারায়ণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

"নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন।"
চৈঃ চঃ।

বৃন্দাবন দাস প্রণীত বলিয়া চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে এক্ষণে যে গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম চৈতন্যভাগবত। অথচ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উহার নাম চৈতন্য মঙ্গল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ নাম পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী আছে যে, পরবর্ত্তী সময়ে লোচন দাস নামক জনৈক বৈদ্যবংশীয় বৈষ্ণব চৈতন্য জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া চৈতন্য মঙ্গল নামে তাহার নামকরণ করেন। তৎকালের প্রথানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রন্থকারকে আপন গুরুর অনুমতি লইতে হইত। লোচনের ইষ্ট দেবের নিকট মঞ্জুরার্থে ঐ পুস্তক আনীত হইলে তিনি দেখিলেন যে, বৃন্দাবনের গ্রন্থের নামে এই গ্রন্থ অভিহিত হইয়াছে। তজ্জন্য শিষ্যের উপর বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন যে "বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা যতক্ষণ নিরাকৃত না হয়, ততক্ষণ এ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়া দূরে থাকুক, তোমার মুখ দর্শন করিব না।" বৃন্দাবন দাস তখনও জীবিত ছিলেন। লোচন দাস অগত্যা বৃন্দাবনের নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করাতে বৃন্দাবন দাস প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন ও আপন গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "চৈতন্য ভাগবত" রাখিলেন।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃত। যদিও ইহা চৈতন্যভাগবতের পরে বিরচিত হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক রূপে চৈতন্যের ধর্ম্ম মত সমর্থন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও ঘটনাবলীর বৈচিত্রতা প্রদর্শন ও রচনার ওজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধরিলে ইহা সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাস্তবিকও বৈষ্ণব সমাজে ইহা তদ্রূপেই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ইহা বাঙ্গলাসাহিত্যসংসারের একটী অক্ষয়

জ্ঞান ভাণ্ডার ও প্রেম ভক্তির অমৃত প্রস্রবণ। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল গ্রন্থকার পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, চৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এমনি দুর্দ্দশা যে, তাহারা আপনাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে কি আছে তদনুসন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্পাতী কাটোয়া উপবিভাগের অধীন ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পারে ঝামটপুর নামে এক খানি পল্লী গ্রাম অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই গ্রামই চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম স্থান।

"নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।" চৈঃ চঃ।

কথিত আছে যে, তিনি অল্প বয়সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও স্বপ্নে নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করত বৃন্দাবনে যাইয়া সমস্ত জীবন যাপন করেন। সে সময়ে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ অপরাহ্নে বৃন্দাবনবিরচিত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থে চৈতন্যের শেষ জীবনের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত না থাকায় তাঁহাদের আশা পরিতৃপ্ত হইত না। তজ্জন্য মদন মোহন মন্দিরের অধ্যক্ষ হরিদাস পণ্ডিত প্রভৃতি কৃষ্ণদাসকে ঐ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণদাস যদিও তখন বৃদ্ধ, কিন্তু নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ঐ গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন; এবং উদ্যমের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ ব্রজবাসীদিগকে উপহার দিলেন।

"বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল;
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল।
সূত্রকরি সব লীলা করিল গ্রন্থন;
পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈলবিবরণ।
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার;
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার।
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন;
চৈতন্যের শেষ লীলা না কৈল বর্ণন।"
চৈঃ চঃ ১০০৮—১০১২।

"আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ;
শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন।
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া;
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।"
চৈঃ চঃ ১০৩৫—১০৩৬।

১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবার কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে বৃন্দাবন নগরীতে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। তৎ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন।

"শাকে সিন্ধগ্নিবানেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে
সূর্য্যাহোঽশিতপঞ্চম্যাংগ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।"

১৪৫৫ শকে চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। সুতরাং তাঁহার স্বর্গারোহণের প্রায় ৮২ বৎসর পরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এইগ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত হইলে জীব গোস্বামীর অনুমতি লইয়া প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণদাস তাঁহাকে ইহা পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও চৈতন্য উপদেশ সকল বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে; তাহা অবলীলা ক্রমে সাধারণের আয়ত্তাধীন হইল, অথচ আপনাদের রচিত-সংস্কৃত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত

হইবে না, এই আশঙ্কায়, কৃষ্ণদাসের উপর রাগান্বিত হইয়া ক্ষুদ্র চেতা জীবগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ লুকাইয়া এক কুঠরীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন ও কবিরাজকে কটূক্তি করিলেন। বৃদ্ধ কবিরাজ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া মথুরায় গমন করিয়া সর্ব্বদা এই দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, সাধারণে পড়িবে বলিয়া তিনি পুস্তক রচনা করিলেন, তাহা প্রকাশিত হইল না ও গৌরাঙ্গের শেষ লীলাও অপ্রচারিত রহিয়া গেল।

"আমি যে করিনু গ্রন্থ সবার কারণে,
বিদ্যা না হইলে ধর্ম্ম বুঝিবে দর্শনে।
প্রভুর যে শেষ লীলা কেহ না জানিবে,
প্রেমভক্তি আচরণ কেহ না শিখিবে,
হেন গ্রন্থ দৈবে গেল কেহ না পাইবে;
দয়াল চৈতন্য লীলা কেহ না জানিবে।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

এই সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামে কবিরাজের জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জানাইলেন যে, চৈতন্য চরিতামৃত যখন রচিত হইয়াছিল, তাহার এক এক সর্গ সমাপ্ত হইলে তিনি (মুকুন্দ) এক একপ্রস্ত নকল করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত গ্রন্থের নকল তাঁহার নিকট রহিয়াছে।

"মুকুন্দ কহিল প্রভু করি নিবেদন,
যে কালে আপনি করেন গ্রন্থের লিখন।
পরিচ্ছেদ সাঙ্গ হৈলে লৈয়াছি মাগিয়া—
পড়িয়া লিখিয়া প্রভু দিতাম আনিয়া।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

ইহা শ্রবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ঐ নকলটী আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও সংশোধন করিয়া মুকুন্দকে গোপনে রাখিতে বলিলেন, যেন জীব তাহা জানিতে না পারেন।

"মুকুন্দে আনন্দ হইয়া কহিল বচনে,
প্রকাশ না করিও এবে রাখ সাবধানে।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

পরে মুকুন্দ দ্বারা কবিরাজ ঐ নকল গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। তদবধি তাহা ক্রমে ক্রমে এদেশে প্রচার হইয়া পড়ে।

"গ্রন্থ লৈয়া যাও বাপ শ্রীগৌর মণ্ডল,
লিখিয়া লয়েন যেন বৈষ্ণব সকল।
যারে তারে দিধা বাপ কহেন বচন।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

কৃষ্ণদাসের স্বহস্ত লিখিত আসল গ্রন্থ অদ্যাবধি বৃন্দাবনে রাধা-দামোদরের মন্দিরে আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহা এদেশে কখন আইসে নাই।

ধর্ম্ম সমাজে চিরকালেই ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য কত না বিবাদ কলহ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাটী এরূপ ঘটনাপুঞ্জের একটী অংশ মাত্র। একদিকে জীবগোস্বামীর ক্ষুদ্রাশয়তা ও ঈর্ষা, অপর দিকে কৃষ্ণদাসের উদার ভাব তুলনা করিতে গেলে মনে হয় যে, এইরূপে ধর্ম্ম জগতে কতই না অনিষ্টপাত হইয়া গিয়াছে। যদি ভাগ্য ক্রমে মুকুন্দ দত্তের নিকট একটী নকল না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্ম জগতের একটী প্রধান রত্ন কীটদষ্ট পুঁথির আকারে বিগ্রহ মন্দিরে লুক্কায়িত থাকিত ও অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চৈতন্য চরিতামৃতের পর লোচন দাস চৈতন্য মঙ্গল নামে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে বিশেষ নূতনত্ব কিছুই নাই। তাহা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের ছায়ামাত্র। তবে তাঁহার প্রণীত পয়ার ও

ধুয়া গীতি কাব্য আকারে লিখিত হইয়াছে যেরূপ কীর্ত্তিবাস ওঝার রামায়ণ, ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলের গান বৈষ্ণবপ্রধান রাঢ় দেশের অনেক স্থানেই গীত হইতে দেখা যায়। বোধ হয় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এইরূপে চৈতন্যের জীবন লীলা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম বিষয় আলোচনার জন্য যে প্রমাণ প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ নিচয়ে পাওয়া যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন ভক্তমালে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ আছে, যাহাতে এসম্বন্ধে অনেক আলোক পাইতে পারা যায়। কিন্তু তত্তাবতই পরবর্ত্তী কালের ও ক্রমেই জনশ্রুতি মূলে লিখিত হওয়ায় অধিক নির্ভরণীয় হইতে পারে না।

পরবর্ত্তী অধ্যায় চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ ছিল ও তাহা কোন্ কোন্ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল, তাহা আমরা বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে যত্ন করিব। শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

প্রবাসে।

(পদ্য)

"This glassy stream, that spreading pine,
Those alders quivering to the breeze,
Might sothe a soul less hurt than mine,
And please, if anything could please."
Cowper.

(১)

শান্তিহীন, সুখহীন,—পোহাল রজনী।
প্রবাস-যাতনা বুকে,
অনিদ্রার ক্লান্তি চোখে,
তবুও শৈলের শিরে (১) ছুটিনু অমনি।
জানিনা কি হবে তায়,
সুখ কি অসুখ হায়;
আগ্রহে তবুও শয্যা ত্যজিনু তখনি।

(২)

উষা, নব প্রেম ভরে,
প্রেমময় স্নিগ্ধাধরে
চুমিয়া শৈলের শিরে, দোলে তার কোলে
সে চুম্বনে আলিঙ্গনে,
বুক চিরে প্রেমধনে
প্রপাত ধারায়(২) শৈল দিতেছেরে ঢেলে!
কে নিন্দে পাষাণ, যার, প্রেমে হিয়াগলে?
সে প্রেম-প্রবাহে তার,
তরল—তরলাকার
উষার উজল প্রেম, 'ফলিত চকিত;
আহা কি মাধুরী মরি মিলনে উদিত!

(৩)

হেরি এ মোহন ছবি,
কি গীত গাইবে কবি?
আছে কি উচ্ছ্বাস, প্রাণে সরস এমন?
উচ্ছ্বাসে গায়িছে পাখী,
উচ্ছ্বাসে কাঁপিছে শাখী,
উচ্ছ্বাসে স্ফুরিত নেত্র তরুণ তপন!

(১) উড়িষ্যার প্রধান পাটগিরি।

(২) প্রধান পাটের জলপ্রপাত।

(৪)

বিচ্ছেদের বিষময়
আশা শূন্য এ হৃদয়,
হায়রে মিলন-পুরে কেমনে রাখিব ?
ঢালি বিষাদের শ্বাস,
আনন্দের এ উচ্ছ্বাস
—হৃদয়হীনের মত—কেন নিবাইব ?
এ মোর হৃদয় সম
ঐ হোথা অন্ধতম
রবিকর স্পর্শশূন্য গভীর গহ্বর ;
উহারি নিভৃত কোলে
যাতনার সুর তুলে,
গায়িব উন্মাদ গীত, অজ্ঞাতে সবার !
তুমি না বুঝিবে সুখি, সঙ্গীত আমার !
পার কি বুঝিতে হায়,
অনন্ত আকাশ গায়
কি দুঃখে জলদ নাদে,—একাকী, গম্ভীর ?
বজ্রনাম ধরে যার
বুকের বিষাদ ভার,
নিশ্বাসে বিজলী কত হানে শত তীর ?
তুমি কি বুঝিবে তবে দুঃখ প্রবাসীর ?

(৫)

হেমন্তে পদ্মিনী মত,
নিত্য মধু পরিপ্লুত
প্রেমভরা প্রাণ, গৃহে পড়িছে ঝরিয়া,
দারুণ বিষাদ-হিম বুকেতে লাগিয়া।
জ্যোৎস্নাময় কত হাসি
—কৃষ্ণায় যেন রে শশী—
আঁধারের কালামুখে যেতেছে ডুবিয়া
মরিতেছে কত আশা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কি তাপ পরাণে তার
কার সাধ্য বুঝিবার ?
কি প্রলেপ, ওহে বৈদ্য করিছ বিধান ?
যাধার ব্যাধির রাখে কানাই সন্ধান !

হেসোনা হেসোনা সুখি,
আমার মতন দুখী
না হলে বুঝিবে নাকো, যাতনা আমার ;
হাস তুমি, আমি ঢালি ধারা বরষার !
স্নেহ ভরা আলিঙ্গন,
প্রাণভরা সম্বোধন,
জননি গো, কত দিনে মিলিবে আবার,
ভাবিয়া কাঁদিছে আজি তনয় তোমার !
চৌদিকে ভীষণারণ্য,
—প্রাণহীন্—স্নেহশূন্য—
কোথা হেথা ভ্রাতৃস্নেহ বন্ধুর মমতা ?
কে কহে আমার দুখে শান্তনার কথা ?

(৬)

পরিজন পার্শ্বে যার
কি ক্লেশ গায়িতে তার (৩)
"বড়ই সুন্দর আহা শোভা প্রকৃতির।"
একবার শূন্য প্রাণে
চাহ রে প্রকৃতি পানে,
বুঝিবে মাহাত্ম্য কত ওই মুরতির !
তাই বলি বুঝিবে না,
যে যাতনা যে বেদনা
দহিছে সতত হায় প্রাণ প্রবাসীর !
সুখী না বুঝিবে কভু বেদনা দুখীর !

(৭)

মানব বদন সম
অতুলন—অনুপম,
সুন্দর—সুস্নিগ্ধ আর কি আছে ধরায় ?
প্রকৃতি সুন্দর হয়, তাহারি ছায়ায় !
ছাড়ি প্রেম কিশোরীর,
(প্রিয় গীতি বাঁশরীর)
যশোদার ননি ছানা, ছিদাম বলাই,
বৃন্দাবন কুঞ্জতলে
যমুনার নীল জলে,

(৩) কবি Wordsworth

কি আছে, আদর যার করিবে কানাই ?
প্রিয় স্মৃতি বিজড়িত
কাঁটা বনে, মধু কত !
তাই ভালবাসি, ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গন ;
শোভাহীন হেরি এই বন উপবন !

(৮)

চাহি না দেখিতে আর,
স্বচ্ছ নির্ঝরের ধার
শিলা হতে শিলান্তরে পড়িতে ছুটিয়া ;
চাহিনা গগন-ভালে
হেরিতে সাঁঝের কালে
তারকা শশীর শোভা উঠিতে ফুটিয়া ;
দে মোর প্রেমের শশী,
দে মোর প্রেমের হাসি,
দেরে মোর লীলাময় প্রবাহ প্রেমের,
চাহি না ও শোভা রাশি শূন্য জগতের !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ঈশ্বরজ্ঞান প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ ? *

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥"

আমাদের প্রকাশিত 'পৌত্তলিক কে' প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম, "সাধারণ ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান মানুষ মাত্রেরই আছে।" তত্ত্বকৌমুদী সেই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন "দ্বিজদাস বাবু নিজেই বলিয়াছেন এবং ইহাই সত্য যে 'বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের' সাধারণতঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে 'পরোক্ষ' জ্ঞান কিছু কিছু আছেই।" তত্ত্বকৌমুদী আমাদের 'জ্ঞান' শব্দের স্থলে 'পরোক্ষ জ্ঞান' ও 'মানুষ মাত্রেরই' স্থলে "বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম সম্প্রদায়" বসাইয়া প্রকৃত পক্ষে আমাদের কথার সমালোচনা না করিয়া নিজের কথারই সমালোচনা করিয়াছেন। বোধ হয় লেখক আমাদের কথা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ধার্ম্মিকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেন ;—(১) যাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছে (২) যাহাদের ঈশ্বর জ্ঞান পরোক্ষ। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তিনি আবার অন্য কল্পিত উপায় গ্রহণ করিবেন কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজই বোধ হয়। (১) সাধু অন্যের দৃষ্টান্তের জন্য, অথবা "চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং" অনেক কার্য্য করিতে পারেন। তিনি নিজে যদি মূর্ত্ত চিহ্ন ব্যবহারে সাধনা সহজ বোধ করিয়া থাকেন, তবে অন্যের জন্যও সে পথ সহজ হইতে পারে, এই আশায় দৃষ্টান্তের জন্য তিনি মূর্ত্ত চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন। একজন উন্নত ব্রাহ্ম হয়ত মন্দিরে বসিয়া উপাসনাতে এবং নির্জন উপাসনাতে সমান সরস ভাব লাভ করেন, তথাপি অন্যের দৃষ্টান্তের জন্য হইলেও তিনি নিয়মিত ভাবে মন্দিরে যাইতে পারেন। (২) অথবা বাহ্য জগতে

* এই প্রবন্ধটী তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ না হওয়ায় নব্যভারতে দেওয়া গেল।

কিম্বা পুত্তলে ঈশ্বর পূজাকে উপায় বলিবার প্রয়োজন কি? ব্রহ্মদর্শন যাহার লাভ হইয়াছে, তাহার পক্ষে চক্ষু মুদিয়া আত্মাতে সে দর্শন লাভ করা যাহা, চক্ষু খুলিয়া বহির্জগতে সে দর্শন লাভ করাও তাহাই; এবং আকাশ নক্ষত্রাদিতে ব্রহ্মদর্শন যদি তাঁহার পরিহারের বিষয় না হয়, পুত্তলা দিতে ও সে দর্শন পরিহার করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলা যাইবে। (৩) ব্রহ্মদর্শনে অন্তর বাহির ভেদ থাকে না। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কম্পশ্যেৎ"। দুই জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অনন্তের উপলব্ধি কোথায়? ব্রহ্ম দর্শনে নিরাকার সাকার, আমি তুমি, ঈশ্বর জীব ভেদ থাকিতে পারে না। তাহা হইলে নিরাকার সাকারের সীমা, তুমি আমার সীমা, জীব ঈশ্বরের সীমা হইয়া দাড়ায়। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই ব্রহ্ম দর্শনের কথা।

কিন্তু তত্ত্বকৌমুদী মূলেই ভুল করিয়াছেন, তিনি ধার্ম্মিক দিগকে যে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেন সেই বিভাগই অসিদ্ধ। তাঁহার পরোক্ষ ঈশ্বর জ্ঞান একটী আকাশ কুসুম। ঈশ্বর জ্ঞান মানব আত্মার নিত্য প্রত্যক্ষ—অথবা সম্বিৎ-সিদ্ধ—,তবে লোকভেদে প্রত্যক্ষের পরিমাণে তারতম্য আছে। কাহারও ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল, কাহারও বা অন্ধকার গৃহের রজ্জুর ন্যায় অস্ফুট। মানব আত্মা সংসারের কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করে না, কিছুতেই তাহার অভাব যায় না। যাহার সংসারের সকলই আছে,তাহারও হৃদয়-গহ্বর হইতে নিরন্তর ধ্বনি উঠিতেছে "ইহার কিছুই আমার নয়," তাঁহার প্রাণ ধনজনের মধ্যে বসিয়া ভয়ে নিরন্তর কাঁপিতেছে। তাহার প্রাণ যে অভয় নিয়ত প্রার্থনা করিতেছে, সংসারের বিদ্যা ঐশ্বর্য্য বা পরিজন কিছুই তাহা দিতে পারিতেছে না। প্রাণের প্রাণে থাকিয়া কে যেন অস্ফুট স্বরে নিরন্তর ডাকিতেছে, কোথায় গেলে যেন সকল অভাব পূর্ণ হইবে। ভিতরে বসিয়া কে যেন অনবরত বলিতেছে, "যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি," কিন্তু জীব বহির্মুখ, নিজকে দেখিয়াও সে দেখে না, সেই অস্ফুট নীরব ধ্বনি সে শুনিয়াও শুনে না; নিজের ভিতরে প্রবেশ করিয়াও করে না। 'আমার' 'আমার' করিয়া জীব ব্যস্ত, কিন্তু আমি কি, মোহে পড়িয়া সে একবার ভাবে না। যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা অসৎ, তাহারই লীলাতে সে নিয়ত মুগ্ধ; যাহা স্থির, যাহা নিশ্চল, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পরিবর্ত্তনশীলের ক্রীড়া চলিতেছে, যাহার সত্ত্বা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া অসৎ ও সৎ রূপে অবস্থান করিতেছে, মূঢ় জীব সেইরূপ-রসের ধাঁধায় পড়িয়া পরম প্রত্যক্ষকেও প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ করিতেছে না, কাহার রূপ, কাহার রস, একবারও ভাবে না। মোহের আবরণে সেই হৃদয়ের গভীর বাণী অস্ফুটই থাকিতেছে, সেই প্রাণের ছবি অন্ধকারাচ্ছন্নই থাকিতেছে। কিন্তু বিপদের সময়ে যখন এই দৃশ্য অসৎ, আর মানব মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না,যখন জীব বহিঃপ্রবৃত্তির অসারতা দেখিয়া অন্তর্মুখ হয়, যখন চক্ষু কর্ণ আপনার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখনই সেই 'still small voice', সেই অন্ধকার গৃহের রজ্জু, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই নিকটে প্রকাশিত হয়।

আশ্রয় করা যায়, সংসারে এমন কিছুই নাই, অথচ জীব আশ্রয় আশ্রয় করিয়া দাবদগ্ধের ন্যায় ইতস্তত ফিরিতেছে। মানব মাত্রেরই এই কথা। সেই পরম আশ্রয় হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়াই, যে ভাব ত্রিসংসারে কোথাও নাই, তাহা জীব ধারণা করিতে পারিতেছে, তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। শান্তি সংসারের কিছুতেই নাই, তথাপি জীব শান্তি শান্তি করিয়া পাগল হইতেছে। পরম শান্তি-স্বরূপ হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়াই যাহা কোথাও নাই তাহাও জীব ধারণা করিতে পারে, তাহার জন্য ব্যাকুল হইতে পারে। অনন্ত হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়াই সংসারের অনন্তবৎ কিছুতেই জীব মজিয়াও চিরদিনের জন্য মজিতেছে না।

ঈশ্বর আছেন, মানুষ মাত্রেরই নিত্য-প্রত্যক্ষ। অতি অশিক্ষিত অজ্ঞানী লোকও বিপদকালে আত্ম দৃষ্টি করিলে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ বলিয়া বোধ করে, সাক্ষাৎ বোধ করে বলিয়াই উদ্ধার প্রার্থনা করে। নতুবা অনুমান বা উপদেশের অবাস্তবিক ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কদাপি মন তৃপ্তি মানিত না। বিপদ যেমন প্রত্যক্ষ, প্রতিকারের উপায়ও যদি তেমনই প্রত্যক্ষ না হয়, কে কায়মনপ্রাণে তাহাতে আস্থা প্রদান করিতে পারে? এই আমি প্রাণে মরিতেছি, কাহার নিকটে উদ্ধার প্রার্থনা করিব? যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান জনিত হয় (আপ্ত বচন অথবা 'উপদেষ্টার উপদেশ' ও অনুমানেরই অন্তর্গত) সেই "বোধ হয়ের" ঈশ্বরকে কে তখন ডাকিতে পারে? "হে ঈশ্বর, বোধ হয় তুমি আছ, যদি থাক আমার আত্মাকে উদ্ধার কর, যদি আমার আত্মা থাকে" এ কথা বলিয়া কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে? মোট কথা এই, যে ই যখন হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করে, সে ই তখন সেই প্রার্থনার ফল-দাতাকেও হৃদয়ে সাক্ষাৎ অনুভব করে। এক সময়ে না এক সময়ে জীবনে জ্ঞানী অজ্ঞানী সাধু অসাধু সকলকেই প্রার্থনা করিতে হয় এবং সে সঙ্গে ঈশ্বরকেও প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভব করিতে হয়।

কিন্তু কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিলেও তাহার গুণ সম্বন্ধে কিছু কিছু অজ্ঞানতা থাকিতে পারে। যে তোমাকে দেখিয়াছে, সেই যে তোমার সব গুণ জানিয়াছে, এমন নাও হইতে পারে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, অথচ তাঁহার গুণের জ্ঞান অপূর্ণ থাকিতে পারে। যদি কাহারও ঈশ্বরের গুণ বিষয়ে অজ্ঞানতা থাকে, তাহা বলিয়া মনে করা যায় না যে, সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে না। ঈশ্বর গুণ নহেন, তিনি গুণী, তিনি ব্যক্তি, তিনি পুরুষ। যদি ঈশ্বরের গুণ সম্বন্ধে কোন পৌত্তলিকের কিছু অজ্ঞানতা থাকে, অথচ সে সরল ভাবে ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, গুণ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই বলিয়া মনে করা যায় না যে, সে প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট করা হয় নাই, সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে নাই।

ফলত অনুমান বা আপ্ত বচন যদি মানুষের ঈশ্বর জ্ঞানের ভিত্তি হইত, তবে ধর্ম্ম এ সংসারে থাকিত না। কি করিয়া অনুমান করিব? যদি ঈশ্বরের মত আরও দুচারি জন থাকিত, যদি সৃষ্টিরমত উপাদানের আরম্ভ হয় এরূপ কার্য্য আরও দুচারিটী আমাদের সর্ব্বদা নয়ন গোচর হইত, অনন্ত যদি পাঁচ সাতটী

হইত, তবে না হয় এক জন ঈশ্বর দেখিয়া, একটা সৃষ্টি ক্রিয়া দেখিয়া, একটা অনন্ত দেখিয়া, অপর জন ঈশ্বরের, অপর সৃষ্টি ক্রিয়ার, অপর অনন্তের বিষয় অনুমান করা যাইত। অনুমানের ঈশ্বর, ঈশ্বর নহেন, তাহার জ্ঞানও ঈশ্বর জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান পরিত্যাগ করিলে অনুমানের দ্বারা এই মাত্রই হইতে পারে যে, একটা মানুষের মত লোক কল্পনা করিয়া তাহার মধ্যে কিছু অধিক পরিমাণে মানুষের গুণের মত কতকগুলি গুণ আরোপ করিয়া তাহাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা যায়। এই ঈশ্বর এক বিরাট্ 'পুত্তল' এবং তত্ত্বকৌমুদী যেরূপ বলিতেছেন, যদি বর্ত্তমান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ঈশ্বর জ্ঞান "পরোক্ষ জ্ঞান" হয়, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর জ্ঞান না হয়, তবে সে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় পৌত্তলিক, তত্ত্বকৌমুদী যদি তাহারই একজন হন, যাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, তবে তিনিও পৌত্তলিক; তাঁহার ঈশ্বর পূজাও মানস পৌত্তলিকতা, অথবা Anthropomorphism। এরূপ লোকও অনাস্তিকদিগেরই একজন। "সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইবার জন্য ব্যাকুল" বলিলেও কিছু আসে যায় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কাহার সম্বন্ধে? যদি প্রকৃত ঈশ্বর তাহার অধ্যাত্ম প্রত্যক্ষ একেবারেই না হয়, তবে সে যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবিতেছে, যাহার সম্বন্ধে সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইবার জন্য ব্যাকুল, সেও সেই বিরাট্ মানস পুত্তল। তাহারই সম্বন্ধে কি সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইবার জন্য ব্যাকুল? যদি বলা যায়, উপদেষ্টা যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, সে তাহাকেই প্রত্যক্ষ জানিবার জন্য ব্যাকুল, তাহাতেও কিছুই হয় না। 'ঈশ্বর কে' যে না জানিল, উপদেষ্টা কাহাকে ঈশ্বর বলিতেছে, তাহাও সে জানিল না; উপদেষ্টার 'ঈশ্বর' তাহার কাছে বাক্য মাত্র, অর্থশূন্য শাব্দ পুত্তল। গবয় যে দেখিয়াছে, সে যদি বলে গবয় গরুরই মতন, তুমি গরু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিলে তাহারই সদৃশ একটী জন্তু কল্পনা করিয়া তাহাকেই গবয় মনে করিতে পার। ঈশ্বর সম্বন্ধেও যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, উপদেষ্টার উপদেশে ঈশ্বরের সদৃশ কোন বস্তু থাকিলে তাহা দেখিয়া ঈশ্বরকল্পনা করিতে পারে। তাহা হইলেও সেই কল্পিত গবয় গবয় নয়, গবয়ের মানস প্রতিমা, সেই কল্পিত ঈশ্বরও প্রকৃত ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের মানস প্রতিমা।

শুধু উপদেষ্টার উপদেশে যে কিরূপ ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভব, গ্রাম্য গল্পে তাহার একটী দৃষ্টান্ত আছে। একজন দুধ্ দেখে নাই, সে জিজ্ঞাসা করিল, দুধ্ কেমন? আর একজন যে দুধ্ দেখিয়াছে, সে বলিল, দুধ্ বকের মত। সে বকও দেখে নাই, বক দেখিয়াছে এমন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই বক কেমন? কাস্তের মতন। সে কাস্তে দেখিয়াছে; সে ভাবিল দুধ কাস্তের মতন। মীমাংসা করিল, দুধ বড়ই শক্ত, দাঁতে ভাঙ্গা যায় না। ত্রিসংসারে অন্য কাহারও সহিত যাহার তুলনা হয় না, উপদেষ্টাকে উপমা দ্বারা তাহাই বুঝাইতে হইল। উপদিষ্টের ঈশ্বর জ্ঞান ও দুধেতে কাস্তের জ্ঞান ভিন্ন আর কি হইবে?

যদি সাদৃশ্যে ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভবও হইত, যদি আমার চৈতন্যের দ্বারা ঈশ্বরের চৈতন্যের উপমা হইত, যদি জড়ের সত্তা দ্বারা ঈশ্বরের সত্তার তুলনা হইত, তবে না হয় উপদেষ্টার উপদেশ ধরিয়া ঈশ্বরের এক

মানস প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করা যাইত। কিন্তু তাহাও প্রতিমূর্ত্তি, প্রকৃত ঈশ্বর নয়। সেই মানস প্রতিমূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিলেও ঈশ্বর যাহা নহেন, তাঁহাকে তাহাই ভাবিতে হইল। তোমার সংজ্ঞা মতই পৌত্তলিকতা হইল।

আবার অনুমান উপমা দ্বারা কোন ব্যক্তির অথবা আত্মার জ্ঞান, কেবল তাঁহার গুণক্রিয়া সম্বন্ধে। যে তোমাকে দেখিয়াছে, সেই মাত্র তোমাকে জানিয়াছে, যে তোমাকে দেখে নাই, সে তোমাকে জানেও নাই। সে তোমার গুণের ব্যাখ্যা, কার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া থাকিতে পারে, তাহা বলিয়া সে তোমাকে জানে নাই। শ্রোতার আত্মার উপমা দ্বারা তোমার গুণ, তোমার কার্য্যেরও একজন আধার বা পাত্র সে কল্পনা করিতে পারে, কিন্তু সেই কল্পিত পাত্র তুমি নও। পরোক্ষবাদীর ঈশ্বর সম্বন্ধেও এই কথা। মানিলাম, পরোক্ষবাদী আপনার আত্মার তুলনায় ঈশ্বরের আত্মা কল্পনা করিল। তথাপি যেমন তোমার গুণ কর্ম্মের কল্পিত পাত্র তুমি নও, পরোক্ষবাদীর কল্পিত ঈশ্বরও ঈশ্বর নয়। সেই কল্পিত তুমি যেমন শ্রোতার মনের কার্য্য অথবা অবস্থামাত্র, পরোক্ষবাদীর কল্পিত ঈশ্বরও তাহার মনের কার্য্য অথবা অবস্থা মাত্র। পরোক্ষবাদী নিজেই এক ঈশ্বর সৃষ্টি করে, সে তাহার ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। শাক্ত যদি তাহার নিজের ঈশ্বর সৃষ্টি করে বলে, হে পরোক্ষবাদী তুমিও তাহাই করিতেছ, শ্রোতা যদি সেই কল্পিত "তুমির" সম্মান করে, তাহাতে তিনি সেই "তুমির ও তুমি" আপনারই সম্মান করিলেন, প্রকৃত তুমি তাহা পাইলে না। পরোক্ষবাদীর কল্পিত ঈশ্বরের আরাধনা সম্বন্ধেও সেই কথা। সে তাহার ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, আপনারই আরাধনা করে। সে পৌত্তলিক হইতেও ভয়ানক। মোট কথা এই হয়, ঈশ্বর জ্ঞান নিত্য প্রত্যক্ষ, না হয় নিত্য প্রত্যক্ষ নয়। যদি নিত্য প্রত্যক্ষ হয়, তবে কে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে পারে? কে পৌত্তলিক হইতে পারে? যদি কাহারও নিত্য প্রত্যক্ষ না হইয়া পরোক্ষ হয়, তবে যাহাদের ঈশ্বর জ্ঞান পরোক্ষ, তাহারা সকলেই পৌত্তলিক। যে ধর্ম্ম তাহারা প্রচার করে, সে ধর্ম্মও পৌত্তলিকতা, "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

আত্মা যদি প্রত্যক্ষ হয়, যিনি আত্মার আত্মা তিনি প্রত্যক্ষ হইতেও প্রত্যক্ষ। যাহার মন বহির্বিষয়ে ঘুরিতেছে, যে ঘরের দিকে চক্ষু দেয় না, সেই আত্মার আত্মাকে দেখিয়াও দেখে না, অনুভব করিয়াও করে না। সেই "দশমের গল্প," অনাস্তিক অজ্ঞেয়বাদী লোকদিগের পক্ষেই সত্য। দশ জন লোক একত্র সাঁতার দিয়া নদী পার হইল, নির্ব্বিঘ্নে সকলে আসিয়াছে কিনা জানিবার জন্য প্রত্যেকে আপনাদের সংখ্যা গণিতে লাগিল। প্রত্যেকেই নিজকে পরিত্যাগ করিয়া বর্ণনা করিতেছে, গণনাতে নয় জন মাত্র পাওয়া যায়। "হায় কি বিপদ, আমাদের এক জন মারা গিয়াছে" এই বলিয়া সকলে কাঁদিতে লাগিল। ক্রন্দনের শব্দে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া জুটিল, একজন পথিক তাহাদের ক্রন্দনে দয়ার্দ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তোমরা কেন রোদন করিতেছ?" তাহারা বলিল, "আমরা দশ জন একত্রে আসিতেছিলাম,

আমাদের এক জন নদীতে মারা গিয়াছে।" পথিক গণিয়া দেখিলেন, তাহার দশ জনই জীবিত আছে। "কৈ তোমারা ত দশ জনই আছ" এই বলিয়া তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন, কেহ মারা যায় নাই। বুঝিতে পারিয়া তাহারা লজ্জায় অবাক্ হইল যে, কি করিয়া প্রত্যেকেই নিজকে ভুলিতে পারিল। নাস্তিকের নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়তাবাদীর অজ্ঞেয়তাবাদ, ইহাদেরই দশমের জন্য রোদনের ন্যায় অলীক। 'আমি' প্রত্যক্ষ, সকল প্রত্যক্ষের ভিত্তি, কি করিয়া সেই 'আমি' কেই ভুলা যায়? ঈশ্বর সেই 'আমি' রও 'আমি,' আমি প্রত্যক্ষেরও ভিত্তি; তাঁহাকে যে প্রত্যক্ষ না করে, সে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, সে অন্য কোন বস্তুই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। বাহ্য প্রত্যক্ষ আমি প্রত্যক্ষের অন্তর্গত, আমি প্রত্যক্ষ ঈশ্বর প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। যে বাহ্য জগত প্রত্যক্ষ করে, সে তৎসঙ্গেই আপনাকেও প্রত্যক্ষ করে, যে আপনাকে প্রত্যক্ষ করে, সে সেই সঙ্গেই ঈশ্বরকেও প্রত্যক্ষ করে।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরাবুদ্ধি বুর্দ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সাপরা গতি॥"

কিন্তু আমি যখন বাহ্য বিষয়ে আবদ্ধ থাকি, তখন আপনার সত্তার কথা ভাবি না, যতক্ষণ আপনাতে আবদ্ধ থাকি ততক্ষণ ঈশ্বরের সত্তার কথাও ভাবি না। ততক্ষণই "এষঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।" কিন্তু বাহ্য বিষয়ের বন্ধন মোচন হইলে আমি আছি ভাব উজ্জ্বল রূপে প্রত্যক্ষ হয়। আমি আছি ভাবের বন্ধন মোচন হইলে, ঈশ্বর আছেন উজ্জ্বল রূপে অনুভব হয়।

"তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেণ্ মুঞ্জাদি, বেষীকাং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥" নাস্তিকই বল আর অজ্ঞেয়তাবাদীই বল যদি তাহাদের উপরে সেই পথিকের ন্যায় সদ্গুরুর কৃপা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহার উপদেশ মত যদি তাহারা কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তবে এমন লোক নাই যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বলিয়া না বুঝিবে।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

লণ্ডন সহর—ইংরাজজাতি—হাইড্ পার্ক—বকিংহাম পালেশ ও রাজ পরিবার।

"England is a garden. Under an ash coloured sky, the fields have been combed and rolled till they appear to have been finished with a pencil instead of a plough. The solidity of the structures that compose the towns speaks the industry of ages. Nothing is left as it was made. Rivers, hills, valleys, the sea itself feel the hand of a master." R. W. Emerson.

আমরা অমরাবতী সদৃশ পারিশ নগর প্রাতে ৮ টার সময় পরিত্যাগ করিয়া ক্যালে ডোবার হইয়া বৈকালে বেলা ৭ টার সময়ে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে পঁহু-

ছিলাম। ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া দেখি, আমাদিগের জন্য পূর্ব্বের সংবাদ অনুসারে কুক্ কোং আফিসের একটী লোক প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা তাহাকে পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। সে ব্যক্তি আমার আত্মীয়ের সঙ্গে রেলওয়ে আফিসের সংলগ্ন Custom House হাউসে আমাদিগের সকল বাক্স পরীক্ষার জন্য লইয়া গেল। ইতালী, ফ্রান্স অপেক্ষা এখানে জিনিস পত্র পরীক্ষা করিবার বড় ধরাধরি। সকল বাক্স খুলিয়া জিনিসগুলি লণ্ড ভণ্ড করিয়া দেখিয়া, তবে কর্ম্মচারিগণ বাক্সগুলি ছাড়িয়া দিল। আমাদিগের সঙ্গী লোক এক খানি ক্যাব গাড়ি করিয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল। রেলওের নবেলে বাল্যকালে লণ্ডনের বর্ণনা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অদ্য সেই মহানগর লণ্ডনে আসিয়া পঁহুছিলাম। লণ্ডনের সঙ্গে আমাদিগের বিশেষ ঘনিষ্টতা আছে; কাজেই ইউরোপের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা লণ্ডনে আসিয়া আমাদিগের খালি সহর দেখা নহে। এখানকার লোকের আন্তরিক ভাব, সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক আন্দোলন, বিদ্যা, বুদ্ধি বিষয় বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা আছে।

লণ্ডনের ক্যাবগাড়ি মন্দ নহে। ইহা আমাদিগের দেশের সাধারণ পাল্কি গাড়ি অপেক্ষা ভাল। এখানে, ঠিকা গাড়ির মধ্যে ক্যাব গাড়ির সংখ্যা অধিক, ইহা ভিন্ন দুই চাকার 'হানসম' গাড়ি আছে, তাহাতে দুই ব্যক্তি সচ্ছন্দে যাইতে পারে। গাড়িতে উঠিয়া রাস্তার দুই ধারে লোক দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই St. George's Road Pimlico নামক স্থানের দুই ধারের প্রাসাদ শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এটী লণ্ডনের মধ্য স্থলে স্থিত এবং এই খানে সম্ভ্রান্ত লোকেরা বাস করিয়া থাকেন। এখানে সাধারণ লোকের গতিবিধি বড় অল্প এবং জন কোলাহল শূন্য বলিলেই হয়। রাস্তা অতি প্রশস্ত এবং দুই ধারে একই রকম অতি উচ্চ সৌধ শ্রেণী। প্রত্যেক নম্বর দেওয়া গৃহে একটী করিয়া পাম লাগান প্রবেশ দ্বার আছে। আমরা একটী গৃহের দ্বারে পঁহুছিলেই, গাড়ির শব্দ শ্রুত মাত্র, বাটীর গৃহিণী আসিয়া আমাদিগকে একটী শয়নের ঘর দেখাইয়া দিলেন। আমরা যেমন ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সেই মতই একটী ভদ্র পরিবারের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে পাইলাম। বাটীর কর্ত্রী, তাঁহার স্বামী, এবং কয়েকটী সুশীল পুত্র কয়েকটী ঘরে বাস করেন। ইহা ভিন্ন আর একটী উকীল ও বম্বে প্রদেশ হইতে আমাদিগের মত দুটী ভ্রমণকারী ভদ্র লোক সম্প্রতি এই খানে বাস করিতেছেন। আমরা বম্বের মেং কে মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আলাপে বড় সুখী হইলাম। ইনি বড় স্বদেশহিতৈষী উৎসাহী লোক। তিনি প্রকাশ্যভাবে আত্মীয় স্বজনকে জ্ঞাত করিয়া ইউরোপে আসিয়াছেন, বাটী প্রত্যাগত হইলে পর কেহ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবে না। বম্বের লোক আমাদিগের বাঙ্গালার লোক অপেক্ষা অনেক কুসংস্কার-বিহীন হইয়াছে। বাঙ্গালীরা কেবল জাতি মারিতে ও দলাদলী করিতে বিশেষ দক্ষ। তাহারা দেশের কিসে হিত হয়, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিবে না। বাটীতে থাকিয়া মদ্ মাংস খাইয়া কুক্রিয়ার শেষ করিবে, কিন্তু তাহাতে

বাঙ্গালী সমাজ একটী কথাও বলিবে না; কিন্তু যদি একজন বাঙ্গালী বিদ্যাশিক্ষার জন্য, বা মানসিক উন্নতি সাধন জন্য ইউরোপে আইসেন, তবে আর আমাদিগের দেশের লোক তাহাকে কোন প্রকার সমাজ মধ্যে গ্রহণ করিবে না। ইহাতে দেশের যে কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। আমরা যে সুপণ্ডিত বিহারী লাল বাবু, রমেশ বাবু, আনন্দমোহন বাবু, মেং বড়ুয়া, সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতিকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিতেছি, ইহাতে কি আমাদিগেরও একটা বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না? আক্ষেপ করিয়া আর কি করিব, বঙ্গদেশের উন্নতির পথে কণ্টক প্রদান করা হইতেছে। এবং তাহাই কৃতবিদ্যগণ স্বচক্ষে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

আমরা সহর দেখিতে কয়েক দিবস বহির্গত হইয়াছিলাম। পারিশ অপেক্ষা লণ্ডন অনেকাংশে বৃহৎ, কিন্তু নগর শোভায় পারিশ এত উৎকৃষ্ট যে, তাহার সঙ্গে লণ্ডনের তুলনাই হল না। এখানে বৃহৎ বৃহৎ সৌধ শ্রেণী আছে, কিন্তু সেগুলি সমুদয় কয়লার ধূমে একবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পার্লিমেণ্ট গৃহ, ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত কিন্তু কয়লার ধূমে তাহার বাহ্য শোভা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বড়২ হোটেলের এখানে অভাব নাই; গ্রাণ্ড হোটেল, আলেকজান্দ্রা, চারিংক্রশ প্রভৃতি হোটেলের বাটী অতি বৃহৎ এবং দেখিতে সুন্দর, বিশেষত Hotel Metropole নামক যে একটী নূতন হোটেল খুলিয়াছে, সেটী পারিশের গ্রাণ্ড হোটেলের মত উৎকৃষ্ট। এক এক পল্লীতে সেই স্থানের লোকের বেড়াইবার জন্য একটী করিয়া পার্ক উদ্যান আছে, সে গুলি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ পরিশোভিত এবং তাহার মধ্যে উপবেশনের আসন আছে। নগরের জনতা ও অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল বাগানে আসিয়া বসিতে বা বেড়াইতে মন বড় প্রফুল্ল হয়। দুই প্রহরের বেলায় লিডিন হলষ্ট্রীট, পিকাডিলি, ফ্লিট ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড প্রভৃতি পথে জনতা ও গাড়ি ঘোড়ার গতায়াত দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। পথের দুই ধারে ফুট পাথে যে কত অসংখ্য লোক সজোরে পদক্ষেপ করিয়া আপন আপন কর্ম্মে গমন করিতেছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কেহ কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে না, সকলেই হুশ্ হুশ্ করিয়া যাইতেছে। একটী লোকের মুখে আলস্য ভাব প্রকাশ নাই, সকলেই কাজে চলিয়াছে। পথে গাড়ি যে কত যাইতেছে তাহার আর সংখ্যা হয় না। ইহা ভিন্ন লোকে অমনিবস্, ট্রাম, সুড়ঙ্গরেলে ও অন্য রেলওয়ে গাড়ীতে গমনাগমন করিতেছে। এই সহরে যে কত লোক মধুমক্ষিকার মত আছে, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। অট্টালিকা অসংখ্য, লাগালাগি জমাট হইয়া আছে। কে কোথায় যে থাকে, তাহার কেহ সন্ধান রাখে না। এক ঘরের লোক অপর ঘরের লোককে চিনে না।

খোশ গল্প বাজে কথায় লণ্ডনের লোক সময় কাটায় না। কেবল তাহাদের কাজের কথা, কাজের উদ্যোগে সময়ক্ষেপ হয়। ইংরাজগণ কিসে টাকা হইবে, কিসে ব্যবসা চলিবে, সেই চিন্তায় অহরহ ব্যস্ত। বোনাপার্ট ইহাদিগকে "দোকানদারের জাতি" এই আখ্যা ঠিক্ দিয়াছেন। ইহারা

ব্যবসা বড় ভাল জানে। পথের দুই ধারে কত যে ভাল ভাল দোকান আছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। কাহার দোকানে রাশি রাশি কাপড়, কাহার দোকানে ছাতা, কাপড়ের পরিচ্ছদে লাগাইবার কৃত্রিম ফুল, জুতা, ঝাড়, লণ্ঠন প্রভৃতি কত যে রহিয়াছে, তাহা দেখিলে জ্ঞান-হারা হইতে হয়। কভেণ্ট গার্ডেনে এই গ্রীষ্মকালে ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, নানাবিধ শাক, বিট, গাজর, সালগম, কাল আঙ্গুর, ষ্ট্রবেরি প্রভৃতি ফল ও উদ্ভিজ্জ রাশি রাশি সাজান রহিয়াছে। কত রকম পুষ্পগুচ্ছ ও মালা এবং নানাবিধ ফুল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, তাহার সন্দর্শনে নয়ন তৃপ্ত হয় এবং সুগন্ধে মন মোহিত হয়। এই সকল ফুল দেশ দেশান্তর হইতে বিক্রয় জন্য আসিয়া থাকে। বিলিংশ্-গেটে নানাবিধ মৎস্য, কর্কটী, প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ চিঙ্গড়ী মৎস্য বরফের উপর সাজান রহিয়াছে। আমরা মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালী, নানাবিধ মাছ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কসাইয়ের দোকান মাংস পূর্ণ। যাহার যত আবশ্যক সে ততই পাইতে পারে। লণ্ডনে কোন জিনিস ক্রয় করিতে হইলে দামের জন্য বকাবকি করিতে হয় না। সকল বস্তুর নির্দ্দিষ্ট মূল্য জিনিসের গায়ের টিকিটে লেখা আছে, তাহাই দেখিয়া মূল্য দিয়া বস্তু ক্রয় করে। ইহার কম বা বেশী কাহাকে দিতে হয় না। ইহাতে ক্রেতা বিক্রেতার সকলের সুবিধা আছে। আমাদিগের চীনেবাজারের মত একটা জিনিসের দাম ঠিক করিতে আধ ঘণ্টা লাগে না। কোন দোকানে গিয়া যদি কোন জিনিস পছন্দ হয়, তবে খরিদ কর, নতুবা কোন বস্তু ক্রয় না করিয়া ফিরিয়া আসিলে দোকান্দার কোন কথা বলিবে না। দোকান্দারগণ সকলেই গ্রাহকগণের বিশেষ খাতির করিয়া থাকে।

বড় লোকেও ব্যবসা করিতে লজ্জা বোধ করেন না। আমাদিগের দেশের কোন কালের কোন লোকের পূর্ব্ব পুরুষ রাজা ছিলেন, সেই সূত্রে তিনি আর অহঙ্কারে মাটীতে পা দেন না। ঘরে খাবার নাই, তথাপি সগর্ব্বে পেঁচকের ন্যায় গম্ভীর ভাবে বাটীতে বসিয়া থাকিবেন, নিজের ভরণ পোষণ যাহাতে ভালরূপ চলে, তাহার দিকে একবারও দৃষ্টি করিবেন না। এ সকল মহামূর্খতার জন্য আমাদিগের দেশের ভদ্র লোকে অনর্থক কষ্ট ভোগ করে। এপ্রদেশে সেরূপ প্রকার লোকের মনের ভাব নহে। ডিইক অব আর্গাইলের এক পুত্র চার ব্যবসা করিয়া থাকেন। তাঁহার এক ভ্রাতা কুইনের জামাতা এবং পিতা একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ বড় লোক। লর্ডহার্ট ফোর্ডের ভাগ্নপতি Count Gleichen স্বহস্তে প্রস্তর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। অনেক Baronet বড় লোক চিত্র বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তাঁহারা স্বহস্ত অঙ্কিত চিত্র বিক্রয় করিয়া থাকেন।

ইংরাজ জাতির মধ্যবিৎ লোক সকলেই কিছু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। সাধারণ চলিত গোছের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অধিকাংশ লোক রেলওয়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং, পোষ্ট আফিস, সওদাগরের ক্লার্ক প্রভৃতি কর্ম্মে নিয়োজিত হয়। এই সকল লোক বড় একটা সেক্ষপীয়র, মিল্টন, কার্লাইল, ডারউইনের গ্রন্থ পাঠ করে না। তাহাদিগের ব্রাডিন, আউডিয়া, জেমস্, প্রভৃতির নবেল এবং সংবাদ পত্র

পড়িবার ঝোঁক্ বেশী। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা পাইয়া থাকেন, তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং সেই সকল লোক কি সাহিত্য কি বিজ্ঞান উত্তম রূপে পাঠ করেন। ইহা ভিন্ন গ্রীক্ লাটিন এবং আধুনিক অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজী উৎকৃষ্ট মাসিক ও ত্রৈমাসিক কাগজে ভাল ভাল সংপ্রবন্ধ লিখিয়া বিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন। শ্বেতদ্বীপের উৎকৃষ্ট জীবিত গ্রন্থকারের অভাব নাই। কবির মধ্যে টেনিসন, সুইনবরণ, ইতিবৃত্ত রচকের মধ্যে ফ্রাউড, ফ্রিমেন, উপন্যাস কর্ত্তার মধ্যে উইলকি কলিন্স্, বিজ্ঞান শাস্ত্র-বেত্তার মধ্যে হক্সিলি, টিণ্ডেল, স্পেনসার, রোমানিস প্রভৃতি দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। ইংলণ্ডে মাসিক ও ত্রৈমাসিক কতক গুলি যে উৎকৃষ্ট পত্র প্রকাশ হয়, এত দৃশ সংপ্রবন্ধ পূর্ণ পত্র ইউরোপের অন্য কোন স্থানে প্রকাশিত হয় না। বিজ্ঞান, ভাষা, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি জন্য অনেক সভা আছে। তাহার সদস্যগণ সকলেই বিচক্ষণ।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও বিশেষরূপে শিক্ষিত হইয়া থাকে। ভদ্র মহিলাগণ ইংরাজী, ফরাশীশ, ইতালীয় ভাষা, শিল্প, বিজ্ঞান অনেকে উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। অনেক স্ত্রীলোক উত্তম উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

ইতর শ্রেণীর লোকের অক্ষর পরিচয় আছে। সাধারণ সংবাদ পত্রও পড়ে কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় নীচ ও ভয়ানক প্রকৃতির লোক মনুষ্য শ্রেণীর মধ্যে নাই। ইহাদিগকে দ্বিপদ পশু বলিলেও হয়। ধর্ম্ম যে কাহাকে বলে, ইহারা তাহা জানে না। সেণ্টজাইল্সে ইহাদিগের স্ত্রী পুরুষগণকে সন্ধ্যাকালে দেখিয়া আসিয়াছি। তাহারা মদ্যপান করিয়া কলহ চীৎকার করত পথিকগণের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। এখানে পথিকগণের নির্ব্বিঘ্নে ভ্রমণের সাধ্য নাই। হঠাৎ এই শ্রেণীর দুষ্ট বালক, বালিকা, স্ত্রী বা পুরুষ আসিয়া তাহাদিগের মূল্যবান বস্তু অপহরণ করিয়া লয়। তাহাদিগকে পুলিশের শাসনের ক্ষমতা নাই। এই সকল মনুষ্যের আকার অতি ভয়ানক। মনুষ্যের যে এতাদৃশ কুৎসিত ভয়ঙ্কর চেহারা হয়, তাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না। সেণ্ট জাইলস্ ভিন্ন ও লণ্ডনের যেখানে অধিক লোকের সমাগম, সেই খানেই চোরের উৎপাৎ। ঘড়ি চেইন, টাকা কড়ি লইয়া পথে পদব্রজে ভ্রমণ করে, কাহার সাধ্য? গাইটকাটাগণ চোখের নিমিষে বহু মূল্য বস্তু ভদ্র লোকের নিকট হইতে অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এতাদৃশ ইতর শ্রেণীর লোকের উৎপাৎ নাই। এই সকল লোকে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি অসভ্যতা প্রকাশ করে। কখন 'ব্লাকি' বলে, কখন বা তাহাদের সেই বানর অপেক্ষায় কুৎসিৎ মুখ বিকৃত করিয়া দেখায়। এরূপ মনুষ্য নামধারী পশু আর কুত্রাপি দেখা যায় না। পাদ্রিগণ নানা ভাষায় ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল ও যীশুর প্রেম ভক্তির কথার পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া দেশ বিদেশে স্বয়ং অর্থ ব্যয় করিয়া গমন পূর্ব্বক বিতরণ করিয়া থাকেন এবং মৌখিকও অনেক উপদেশ দিয়া বেড়াইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের ঘরের দ্বারে অসংখ্য ইতর শ্রেণীর স্বদেশীয়

লোক ধর্ম্ম জ্ঞান বিহীন হইয়া মনুষ্য নামের কলঙ্ক রটনা করিতেছে। ইহা কি একবার দেখিয়া দেখিতেছেন না? ভারতবর্ষীয়গণকে আর বিদেশীয় ধর্ম্ম যাজকগণ কি ধর্ম্ম আর কি নীতি শিখাইবেন? আমাদিগের আর্য্য ধর্ম্ম গ্রন্থে, নীতি শাস্ত্রে, ঈশ্বরোপাসনা, পরোপকার, গুরুজনে ভক্তি, দাম্পত্য স্নেহ, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক সৎ বিষয়ের উপদেশ আছে; সেরূপ উপদেশ পৃথিবীর কোন ধর্ম্ম গ্রন্থে বা নীতি শাস্ত্রে নাই। এ কথা কেবল আমরা কেন, পক্ষপাত শূন্য আর্য্যশাস্ত্রে পণ্ডিতগণও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশের ইতর লোকেরা শিষ্ট ও ধর্ম্ম-ভীরু, কিন্তু ইংলণ্ডের ছোট লোক মানুষ কি পশু, তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণকে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া কি জানাইব?

ভারতবর্ষের অনেক সাহেব এদেশীয়দিগকে পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচনা করেন। দেশীয় লোকের প্রতি অনেক নীলকর, চাকর, সাধারণ রাজকর্ম্মচারীগণ অত্যাচার করিয়া থাকে। বিনা অপরাধে অনেক দেশীয় লোক সাহেবের জুতা লাথি খাইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়গণের বিশেষ সদ্ভাব ছিল; কিন্তু এক্ষণে সাধারণ লোক যাহারা ব্যবসা বা সাধারণ রাজ কর্ম্মে আইসেন, তাঁহারা কিসে টাকা জমা করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবে, তাহাতেই ব্যস্ত থাকে। দেশের লোকের উপর বড় একটা স্নেহ মমতা হয় না। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর ভাল ইংরাজ এখানে আইসেন, তাঁহারা অবশ্যই সদ্‌গুণশালী এবং তাঁহারা দেশীয় লোকের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা প্রাণপণ করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক ইতর শ্রেণীর সাহেবের উৎপাৎ বৃদ্ধি হওয়াতে ভারতবর্ষীয়গণ মন কষ্টে কাতর ভাবে বাস করিতেছে। ইংলণ্ডের ইংরাজ ভদ্র লোক অত্যন্ত উদার স্বভাব। আমি অনেক ভদ্র লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট অনেক প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রীত ও বাধিত হইয়াছি। ভদ্র ইংরাজ মহিলার শত মুখে প্রশংসা করিতে হয়। আমরা এখানে কতক গুলি ভদ্র পরিবারের কামিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছি। ইহাঁদিগের মধ্যে রূপবতী গুণবতী ও বিদ্যাবতী অনেক আছেন। ইংরাজ জাতি স্বভাবতঃ কিছু গম্ভীর প্রকৃতি, এবং নিজের প্রশংসা গানে নিজেই অনুরক্ত। যে বোনাপার্টের বীরত্বে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল কম্পান্বিত হইয়াছিল, ইংরাজ সেনাপতিগণ তাঁহার সামান্য রূপ প্রশংসা করেন; তাঁহারা মারলবরো, নেলসন্, ডিউক অব ওয়েলিংটনের বীরত্ব কাহিনী দশমুখে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ইংরাজগণের প্রকাশিত গ্রন্থে জাতিগৌরব নির্ব্বাচন আবশ্যক হইলে, সর্ব্ব প্রথমেই সকল বিষয়েই ইংরাজ জাতিকে উচ্চ আসন প্রদান করা হয়। এটী জনবুলের একটী দোষ বলিতে হইবে।

লণ্ডনে হাইড পার্ক, বাট্ রেসিয়া পার্ক, রিজেণ্ট পার্ক, প্রভৃতি সাধারণের বেড়াইবার উদ্যান আছে। ইহার মধ্যে হাইডপার্ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাটরেসিয়া পার্কে অনেক ভদ্রলোক ও মহিলাগণ বেড়াইতে গিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর পুষ্পোদ্যান, নানাবিধ বৃক্ষ শ্রেণী এবং জলাশয় কুমদকহ্লারশোভিত, তাহাতে আবার

হংসমালা ক্রীড়া করিতেছে, দেখিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়। এখানে বৈকালে ৮টা বাজিলেই একজন প্রহরী আসিয়া চীৎকার করিয়া সকল ব্যক্তিকে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলে, এবং সেই সময় সকল ব্যক্তি উদ্যান পরিত্যাগ করেন এবং সেই পার্কের দ্বার বন্দ হয়। রিজেণ্ট পার্কে সাধারণ লোক এবং পাদ্রিগণ বেড়াইতে গিয়া থাকেন। হাইড পার্ক বড় লোকের বেড়াইবার স্থান। এখানে ক্যাব গাড়ির প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। কেবল ভাল ভাল গাড়িতে বড়লোকে বায়ু সেবন জন্য বেড়াইয়া থাকেন। পদব্রজে বেড়াইবার ফুটপাথ এবং ঘোটকারোহণে বেড়াইবার পরিষ্কার পথ রহিয়াছে। বৈকালে এস্থানের শোভার সীমা থাকে না। দলে দলে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যুবক যুবতীগণ পদব্রজে ও গাড়িতে আরোহণ করিয়া ইতস্তত: বেড়াইয়া থাকেন। কত শত শত সুবেশধারিণী, হংসগ্রীবা কামিনী আপনার রূপমাধুরী দেখাইবার জন্য সগর্ব্বে একাকিনী, যুবক মধুকরের মন হরণ নিমিত্ত, গোলাপ প্রসূন সদৃশ প্রফুল্ল আনন, বৃহৎ বৃহৎ দ্রুমরাজির অন্তরাল হইতে এক এক বার দেখাইয়া আবার গভীর নিকুঞ্জ মধ্যে গোপন করেন। যুবকগণ কামিনীর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপে চঞ্চল চিত্তে হরিণীর অনুসরণে নিবিড় পাদপ শ্রেণীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। অনেকে লৌহ আসনে উপবেশন করিয়া নানাবিধ পুষ্প শোভা সন্দর্শন করেন। এখানে পুষ্প শোভা বড় মনোহর। এই জুনমাসে থোকা থোকা রডোডেনড্রম নামক ফুল ফুটিয়া যে উদ্যানের কি পর্য্যন্ত শোভা বিস্তার করিয়াছে, তাহা এক মুখে বলা যায় না। রবিবারে দুই প্রহর বেলার সময় এখানে বড়লোকেরা স্ত্রী পুত্র, কন্যা সঙ্গে নানাবিধ সুন্দর পোষাক করিয়া বেড়াইয়া থাকেন। সে দৃশ্যটী দেখিতে বড় আমোদ বোধ হয়।

সেণ্টজেমস্ পার্কের নিকট বকিংহাম রাজপ্রসাদ। ইহা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও বৃহৎ। মহারাণী ভিকটোরিয়া লণ্ডনে এই স্থানে বাস করেন। তিনি প্রকাশ্য রূপে কদাচিৎ শকটারোহণে গমন করিয়া থাকেন। আমাদিগের ভাবি নৃপতি প্রিনস্ অব ওয়েলস্ এবং প্রিনসেস্ সর্ব্বদা নগর মধ্যে শকটারোহণে গমন করেন। রাজকুমার অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি। তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণেই প্রাণের সহিত ভাল বাসে। প্রিন্সেস্ রূপে ও গুণে বিখ্যাতা। মহারাজ্ঞীকে প্রজাবর্গ যার পর নাই ভক্তি করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমোদ—জুলজিকেল গার্ডেন

Invention প্রদর্শনী—মাদামটুসোঁ।

লণ্ডনের বাহিরের দৃশ্য যদিও পারিশের মত মনোহর নহে, তথাপি এখানে পারিশের মত আমোদের স্থানের অভাব নাই। দিনে সূর্য্যোদয় এবং রাত্রের চাঁদের আলো গ্রীষ্মকালেও যে সর্ব্বদা হয়, তাহা নহে। প্রায় মেঘাচ্ছন্ন এবং টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িয়া থাকে। প্রকৃতির ম্লান মুখ দেখিলে বড়ই বিরক্তি বোধ হয়, কিন্তু লণ্ডনবাসীরা সেই অসুখ নিবারণ কারণ দিবসে ও রাত্রের জন্য নানা প্রকার আমোদের স্থানে নাট্য, গীত, চিত্রালয়, শিল্প প্রদর্শনী প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল আমো-

দের স্থানের মধ্যে প্রথমত আমরা যে যে থিয়েটরে গমন করিয়াছি, তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। লণ্ডনে সর্ব্ব সমেত ৩৫টী থিয়েটর আছে। ইহার ২। ৩ টী বাদে সকল গুলির প্রত্যহ অভিনয় হইয়া থাকে। এক খানি নাটকের ২।৩ মাস ধরিয়া প্রত্যহ (কেবল রবিবার বাদে) অভিনয় হয়, কোন কোন নাটশালায় আবার সপ্তাহে ২। ৩ দিবস, একবার দিবসে ও একবার রাত্রে দুইবার করিয়া অভিনয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক থিয়টরে সন্ধ্যার সময় লোকাকীর্ণ। সকল আসন প্রায় দর্শক বৃন্দে পরিপূর্ণ হয়। নাট্যশালার দ্বারে জনতায় টিকিট ক্রয় করা অসুবিধা হয় বলিয়া Kieth, Prowse & Co.——প্রভৃতি টিকিট বিক্রয়ের আফিস খুলিয়াছেন। এই সকল স্থানে টিকিট পূর্ব্বে ক্রয় করিলে প্রসিদ্ধ থয়েটরের আসন পাইবার অসুবিধা ঘটে না, কিন্তু থিয়েটরের গৃহে টিকিট ক্রয় অপেক্ষা এই আফিস সমূহে অধিক মূল্য কমিসন স্বরূপ লাগে। এই আফিস গুলিতে প্রত্যেক থিয়েটরের সঙ্গে সংলগ্ন টেলিফোন যন্ত্র আছে।

Prince's Theatre গমন করিলাম। এই স্থানে মিসেস্ ল্যাংটীর অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। "Peril" নামক নাটকের অভিনয় হইল। Mrs Langtry এই নাট্যে Lady Ormond প্রধান নায়িকার অভিনয় ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি ইংলণ্ডের বিখ্যাত সুন্দরী। বড় লোকেরা তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে উমেদারী করিয়া থাকেন। কেবল অভিনয়ের জন্য নহে, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য লোকে টাকা খরচ করিয়া এই থিয়েটরে আসিয়া থাকে।

এখানকার থিয়েটরে অনেক লোক হয়। লণ্ডনের ইতর লোকের ত কথাই নাই, তাহারা নাট্য বা সঙ্গীতে আমোদ করে না—জিন মদ্যপানে অবকাশ কাল পশুবৎ চীৎকার ও কলহে অতিবাহিত করে। সাধারণ বা মধ্য শ্রেণীর লোকেও টাকা খরচ করিয়া নাটক অভিনয় দেখিতে যায় না, কেবল লণ্ডনের বড় লোকেরা, পল্লীগ্রামবাসীগণ এবং বিদেশী ভদ্রলোকেরা থিয়েটরে গমন করে। বিলাতের থিয়েটর গৃহ সমূহ প্রায় এক ধরণের। ইহার মধ্যে সোণার গিল্টিকরা এবং প্রথম শ্রেণীর আসন গুলি মখমল মোড়া। দুই তিনটী থিয়েটর ছাড়া, সকল স্থানেই প্রোগ্রাম স্ত্রীলোকেরা প্রতিদর্শকের সমীপে আসিয়া বিক্রয় করে। এটী বড় মন্দ নিয়ম। থিয়েটর সকল গ্যাসের আলোকে সুশোভিত, কিন্তু যেই অভিনয় আরম্ভ হয়, অমনি রঙ্গশালা ভিন্ন, গৃহের অপর বিভাগের আলোক নিচয় নির্ব্বাণ করিয়া দেওয়া হয়। পুনর্ব্বার এক একটী অঙ্কের শেষে বিশ্রাম সময় আবার দশ মিনিটকাল আলো জ্বলে, পরে নাট্যারম্ভে দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেওয়া হয়। এনিয়মটী ভাল লাগিল না। অন্ধকারে দর্শক শ্রেণীর মধ্যে বসিয়া থাকা বিরক্ত জনক।

Royal Lyceum Theatre—এইস্থানে নটকুল শিরোমণি হেনরি আরভিং অভিনয় করিয়া থাকেন। ইনি আধুনিক কালের গারিক। বড় বড় লর্ডগণ ও রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন ইহাঁকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে ভোজন করেন। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, ইহাঁকে সেক্সপীয়রের কোন নাটকের অভিনয় করিতে দেখিব, কিন্তু এসময় তিনি

গোল্ডস্মিথের Vicar of Wakefield উপন্যাসের অন্তর্গত Olivia নামক করুণ রসপূর্ণ নাটকের অভিনয়ে Dr. Primrose চরিত্র অভিনয় করিতেছেন। আমরা তাঁহার অভিনয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ দেখিলাম। এতাদৃশ সুন্দর অভিনয় ইংলণ্ডে অন্য কোন থিয়েটরে হয় না। নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই আপন আপন অভিনয় ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পাদন করিলেন। আমরা এলন টেরির Olivia নায়িকার অভিনয় দর্শনে মোহিত হইলাম এবং তাঁহার নিঃসহায় দুঃখের অবস্থায় অশ্রুপাৎ করিলাম। এখানকার ঐকতানিক বাদ্য বড় উৎকৃষ্ট।

Drury Lane—এটী অতি পূর্ব্বের থিয়েটর। এখানকার সাজঘরের দ্বারে মিসেস্ সিডন্স কেম্বল ———এবং কিন্স———সুন্দর অর্দ্ধাকৃতি প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এই স্থানে সমাজের হিতসাধন জন্য "True Story" নামক একখানি সত্য ঘটনার নাট্যাভিনয় হইতে দেখিলাম। বড় লোকেরা সাধারণ লোককে ঘৃণার সহিত দৃষ্টি করেন—স্বপ্নেও তাহাদের হিতকামনা করা দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন; এই সকল বিষয় সংক্রান্ত একটী অতীব দুঃখ সূচক ঘটনা নাটকাকারে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা অভিনয় ব্যাপার দর্শনে যারপর নাই প্রীত হইলাম। নটেরা আপন আপন অভিনয় কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করিল। চিত্রপট গুলি বড় চমৎকার। অভিনয়ের মধ্যে এক অঙ্কে জর্ম্মনগণ কর্ত্তৃক পারিশের মধ্যে গোলা বর্ষণ দেখিয়া সত্যই যেন গত ফরাশীশ এবং জর্ম্মনগণের যুদ্ধ ব্যাপার দৃষ্টি করিতেছি, আমাদিগের বোধ হইল। দুম দুম করিয়া তোপের শব্দ হইতে লাগিল এবং অগ্নি ও ধূমে রঙ্গস্থল পূর্ণ হইল।

Opera Comique—এখানে Bad Boys নামক নাটকের অভিনয় দেখিলাম। অভিনয় কার্য্য হাস্যরস প্রধান হইয়াছিল। এখানকার অভিনেতৃগণ সকলেই সুন্দরী।

St. James Theatre—আমরা এস্থানে Mr. & Mrs. কেণ্ডলের অভিনয় দেখিলাম। Mrs Kendal বেশ সুন্দরী এবং অতি উত্তম অভিনয় করিয়া থাকেন।

Royal Italian Opera, Covent garden—২০ শে জুনে আমরা Verdi's Opera La Traviata গীতি নাট্য সন্দর্শন ও সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে গমন করিলাম। মাদাম এডেলেনা পাটীর নাম ইউরোপে বিখ্যাত। ইনি সঙ্গীত ব্যবসা দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য করিয়াছেন। নাট্যালয়ে পাটীকে বিংশতি বর্ষের কামিনীর ন্যায় দেখাইতেছে। এক্ষণে ইহার বয়স ৪২ বৎসর। পাটীর রূপ লাবণ্যের কথা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। কণ্ঠস্বর কোকিলের ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর। আমরা গান শুনিয়া একেবারে মোহিত হইলাম। টিকিটের মূল্য ১০৲ দশ টাকা যাহা দিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বোধ হইল। দর্শকগণ নাটক শেষ হইলে পাটীকে প্রায় ২০০ শত টাকা মূল্যের পুষ্প গুচ্ছ উপহার দিলেন।

এগ্রিকলচর হল নামক স্থানে ভাল ভাল ঘোটকের মেলা হইয়াছে। আমার আত্মীয় ঘোটক ভাল বাসেন, এজন্য তাহার অনুরোধ ক্রমে তথায় যাইতে হইয়াছিল। এস্থলে প্রবেশ করিয়া দেখি, চারি দিকে ঘোড়া। কোন্ দিক দিয়া যাইব, তাহার

আশু কিছু ঠিক করিতে পারি নাই, পরে মহাকষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া ঘোড়ার পদের নিকট দিয়া উপরের কাষ্ঠ মঞ্চে উঠিলাম। প্রায় সকল স্থানের টিকিট বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। কয়েকখানি 2s. 6d. আসনের টিকিট ছিল, তাহা ক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলাম, কিন্তু এখান হইতে চারিদিক্ দেখিবার বিশেষ সুবিধা বোধ হইল না। উপবেশনের কিয়ৎক্ষণ পরে, একটী লোক আসিয়া আমাদিগের পরিচয় লিখিয়া লইয়া গেল। আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না, পরে সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া সাদরে আমাদিগকে এইস্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়া, ভাল যেখানে উচ্চ মূল্যের প্রথম শ্রেণীর আসন আছে, সেই খানে বসিতে বলিল। সে ব্যক্তি কহিল যে, এই স্থানের অধ্যক্ষগণ আমাদিগকে ভারতবর্ষীয় সম্রান্ত লোক জানিয়া বিনামূল্যে প্রথম শ্রেণীর আসনে বসিতে দিলেন। আমরা সেই জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ দেখুন! ভারতবর্ষে কোন সাহেব লোকের আমোদের স্থানে টাকা খরচ করিয়া গেলেও শ্বেত পুরুষগণের পশ্চাৎ ভাগে নীরবে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, বিনাব্যয়ে সসম্মানে উচ্চ শ্রেণীর আসনে উপবেশন করিতে পাইলাম। আমরা লণ্ডনে সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণের সদ্ব্যবহারে যার পর নাই প্রীত হইয়াছি।

এখানে প্রিনস্ ও প্রিন্সেস ওয়েলস্ পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন, সে জন্য কিছু অতিরিক্ত ধুমধাম হইয়াছে। তাঁহারা আগমন করিলে সকল লোকে টুপি খুলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রিনস্ ও প্রিন্সেস্ সাধারণ পোষাক পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা এতাদৃশ সাধারণ পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন যে, আমরা লোকের ভিড়ের মধ্য হইতে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে প্রথমে চিনিয়া লইতে পারি নাই। আমাদিগের দেশের কোন রাজপুত্র হইলে, তাঁহার অঙ্গে মণিমাণিক্য খচিত থাকিত এবং তাঁহার আগমন সময়ে তুরী, ভেরী বাজিয়া উঠিত। এই সুসভ্য দেশে মিথ্যা বাহ্য আড়ম্বর ও গোলযোগ নাই। প্রিনস্ ও প্রিন্সেস এবং তাঁহাদিগের পুত্র কন্যাগণ কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখানকার আমোদের মধ্যে ঘোড়ার দৌড়াদৌড়ী এবং বিক্রয় জন্য কতকগুলি গাড়ি প্রদর্শন করা হইল মাত্র। ইহা ভিন্ন বিশেষ বর্ণনার যোগ্য কোন আমোদ হয় নাই।

এই স্থানে আর একদিন আমরা কৃত্রিম যুদ্ধ সজ্জা দেখিতে আসিয়াছিলাম। এখানে আসিলে আমাদিগকে দেখিবা মাত্র অধ্যক্ষ মহাশয় বিনাব্যয়ে প্রথম শ্রেণীর আসন প্রদান করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত সৈনিকগণ অশ্বারোহণে যে প্রকারে যুদ্ধ করিতে হয়, দুর্গ অধিকারের কৌশল, বিপক্ষ সৈন্যের গতি অবরোধ প্রভৃতি অনেক সমর-কৌশল দেখাইল।

Royal Aquanum—ইহা একটী আমোদের স্থান। এস্থান দুই প্রহর বেলায় খোলা হয় এবং রাত্র ১১॥ সময় বন্ধ হয়। গৃহটী অতি প্রকাণ্ড কিন্তু সুদৃশ্য নহে। আমরা কয়েক দিন এখানে দিবসে ও রাত্রে

আসিয়াছিলাম। ঘরের মধ্যে কাচের আধারস্থিত জলে নানাবিধ সাধারণ মৎস্য রক্ষিত আছে। পার্শ্বের একটী ঘরে সন্তরণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র জলাশয় রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে অনেক দোকানে জিনিষ বিক্রয় হইয়া থাকে। একটা সুসজ্জিত রঙ্গ-শালা আছে। সেই স্থানে সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি আমোদ হইয়া থাকে। এস্থানে ইতর লোক ও চোর অনেক আসিয়া থাকে, এজন্য পকেটে টাকা কড়ি সাবধানে রাখিতে হয়।

রিজেণ্ট পার্কের পশু শালা—দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথমে নানাবিধ পক্ষীর ঘর। ইংলণ্ডে গায়ক পক্ষী অনেক প্রকার আছে। এক প্রকার ঝুঁটওয়ালা নূতন-গিনীর কপোত বড় সুন্দর। সিংহের গৃহে অনেক গুলি সবল সিংহ রহিয়াছে। নূপশু প্রায় দেখা যায় না। এখানে তাহা দেখিলাম। ইহা এক প্রকার হরিণ শ্রেণীর পশু। জলাশয়ে কৃষ্ণবর্ণ লম্বা গলাযুক্ত বৃহৎ বৃহৎ সোয়ান হংস জলমধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। সুন্দর পক্ষযুক্ত স্বর্গীয় পক্ষী (Bird of Paradise) অতি মনোহর। ইহাদের মুখ হইতে গলা পর্য্যন্ত ঠিক্ কাকের মত। এই স্থানে অনেক প্রকার পশু পক্ষী অতি যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে। বালকদিগের এই পশু শালা দেখিতে বিশেষ কৌতুক হইয়া থাকে।

International Invention Exhibition ;—মৎস্যের প্রদর্শনীর পরে রাজকুমার প্রিনস্ অব ওয়েলস্ দেশীয় শিল্প ও সঙ্গীত সম্বন্ধীয় নানাবিধ যন্ত্রের প্রদর্শনী করিবার উল্লেখ করেন এবং সেই অভিপ্রায় অনুসারে গবর্ণমেণ্ট এই নূতন প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। ইহা আমাদিগের ১৮৮৩ সালের কলিকাতার প্রদর্শনীর অপেক্ষা অনেক ভাল। এখানে দুই ঘণ্টা কাল ভাল নির্দোষ আমোদে কাটান যাইতে পারে। আমরা এখানে কয়েক দিবস গমন করিয়া বিশেষ রূপে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। এক দিবস এই প্রদর্শনীতে গমন করিবার পূর্ব্বেই পথে শুনিলাম যে ঐ ঘরে আগুন লাগিয়াছে। আমরা ক্যাব হইতে অবতরণ করিয়া সসব্যস্ত হইয়া প্রদর্শনীতে গিয়া দেখি যে, সত্যই অগ্নি লাগিয়াছে। প্রিন্স অব ওয়েলস্ স্বয়ং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। শত শত পুলিসের প্রহরী অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতেছে এবং 'দোম্‌কল' জল-যন্ত্র দ্বারা অনবরত বেগে বারি সিঞ্চনে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। ইহাতে প্রদর্শনীর অতি সামান্য রূপ ক্ষতি হইয়াছিল মাত্র। প্রদর্শনীর একটী ঘরের কৃত্রিম জল প্রপাতটী অতি সুন্দর। ইহার উপর নানাবিধ কুসুম শোভিত এবং নানা বর্ণের কাচের আভায় জলের বর্ণ চমৎকার দেখাইতেছে। ইহার নানা প্রকোষ্ঠে নানা প্রকার জিনিস আছে। তোপ, বন্দুক, জাহাজ-বিনষ্টকারী টর্‌পিডো, নানাবিধ কাপড়, ফটোগ্রাফ, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি ইংলণ্ডের কারিকরগণের প্রস্তুত করা বস্তু নিচয় রহিয়াছে। লণ্ডনের বস্তু ছাড়া বিদেশীয় অনেক জিনিস আসিয়াছে। লণ্ডনের অনেক বড় বড় দোকানের কোন জিনিসের নমুনা লইয়া পরম সুন্দরী কামিনীগণ বসিয়া রহিয়াছেন। সুমিষ্ট বচনে দর্শকগণকে আহ্বান করিয়া ভাল ভাল জিনিস গুলি সহাস্য বদনে দেখাইতেছেন। সেই সহাস্য বদনের প্রিয় সম্ভাষণে অনেক ভদ্র লোকের জিনিস ক্রয় করিবার ইচ্ছা হই-

তেছে। ইংরাজ দোকানদারগণ কি প্রকারে জিনিস বিক্রয় করিতে হয়, তাহা ভাল রূপে জানে।

এখানে আমেরিকানগণ কলের দ্বারা ওয়াচ ঘড়ি, কাপড় তৈয়ারির সূত্র, কাচের সূত্র, ও চুরুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে, রত্ন বিক্রেতার দোকানে যে সকল রত্নালঙ্কার বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, তাহা যার পর নাই সুন্দর। রত্নের দ্বারা নির্ম্মিত ভ্রমর, প্রজাপতি, পুষ্প প্রভৃতি সীমন্তিনীর বক্ষালঙ্কার গুলি ঠিক যেন স্বাভাবিক। স্বর্ণকারের সুবর্ণ ও রৌপ্যাভরণ বিশেষ কারুকার্য্য বিশিষ্ট। একটী ঘরে অষ্ট্রীয়া হইতে আনীত পরসিলেনের উপর হস্ত দ্বারা চিত্রকরা পুষ্পাধার ও টেবিলের শোভা বর্দ্ধক বড় মনোহর বস্তু নিচয় রহিয়াছে। কারুকার্য্য বিষয়েই ইউরোপ পৃথিবীর শীর্ষ স্থানীয়। আমাদিগের ইউরোপের সঙ্গে টক্কর দিয়া কোন জিনিস প্রস্তুত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। এখানে আসিয়া ভারতবর্ষীয়গণ অনেক রকম শিল্পকার্য্য শিখিয়া যাইয়া স্বদেশের উপকার করিতে পারেন। এক ঘরে রুসিয়ার দ্রব্য রহিয়াছে। আমরা যাইয়া দেখি, দুই জন রুষ কয়েক রকম জরির কাপড় ও পোষাক লইয়া বসিয়া আছে। একজন রুষ ইংরাজী বলিতে পারেন। ইহারা উভয়েই ভদ্রলোক এবং অতি বিনীত স্বভাব। আমাদিগকে ইহারা জরির কাপড় গুলি দেখাইলেন। তাহাতে শিল্প কার্য্যের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই ঘরের অন্য এক স্থানে রুসিয়ার ভল্লুকের চর্ম্ম, আর মাইনের লোমের পরিচ্ছদ প্রভৃতি দেখিলাম।

সন্ধ্যার সময় আলোক জ্বলিলে এই প্রদর্শনীর বড় শোভা হয়। চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোকে দিবা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এসময় স্ত্রীপুরুষের বড় জনতা হয়। সকল থিয়েটর এবং অন্যান্য আমোদের স্থান খোলা আছে, তাহাতে আবার এই প্রদর্শনীতে এত লোকের সমাগম যে, কিপ্রকারে প্রত্যহ এত লোক হইয়া থাকে, তাহা ভাবিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। প্রদর্শনীর উদ্যানটী আমোদের একটী বিশেষ স্থল। আমরা একদিন দেখিলাম, এই উদ্যানে প্রায় ৮।১০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছে। জর্ম্মন সম্রাটের খোসের ব্যাণ্ড বাজিতেছে। ফুয়ারা গুলি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক কৌশলে, উচ্চ প্রাসাদের উপর হইতে রঙ্গিন কাচ আলোকের নিকট রাখায়, ফুয়ারার উত্থিত জলে ইন্দ্রধনুর বিবিধ বর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। জলাধারে ধাতুময় কুমুদ সত্য বলিয়া ভ্রম হইতেছে এবং তাহার ফুলে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছে! বাগানের চারিদিকের বৃক্ষ শাখায় বৈদ্যুতিক আলোক, সবুজ তৃণের মধ্যে নানাবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোক দেখিয়া চক্ষে ধাঁধা লাগিয়া উঠিল। এই বিচিত্র শোভা দেখিয়া বোধ হইল যেন আরব্য উপন্যাসের আলাদিনের উদ্যানে আসিয়াছি। উদ্যানের এক ভাগে জলের নূতন নূতন গোলাপের বড় সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে। গোলাপ গাছ গুলি একটী কাচের ঘরে বন্ধ আছে। উদ্যান মধ্যে থোকা থোকা অতি মনোহর রডোডেন্ ড্রমের ফুলের শোভা দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম।

বাগানের বাদ্যাগার পার হইয়া একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। ইহার নীচের ঘরে হোটেলের কর্ম্মচারীগণ নানা

প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দর্শকগণকে আহ্বান করিতেছে। যাহার ইচ্ছা হইতেছে, তিনি উচিত মূল্য দিয়া আহার করিতেছেন। উপরের একটী ক্ষুদ্র স্থানে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় যন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। অনেক দর্শক ঢাক, ঢোল, খোল বাদ্যযন্ত্র দেখিয়া ভারতবর্ষীয়গণ সুসভ্য সঙ্গীত বিদ্যা জানে না মনে করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী বীণাবাদন শুনিলে হিন্দুগণ সঙ্গীত শাস্ত্রে যে কি পর্য্যন্ত ব্যুৎপন্ন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই সকল ঘরের সংলগ্ন একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদে আসিলাম। তাহার নাম "আলবার্টহল" ইহার মধ্যস্থল অতি প্রকাণ্ড, ছোট খাট রোমের কলোসিয়ম বলিলে হয়। ইহার উপরে চিত্রশালা, তথায় অনেক ভাল ভাল ছবি আছে, সে খানে দুই সহস্র লোকের বসিবার আসন রহিয়াছে। এখানে সঙ্গীত হইয়া থাকে। কলের বাদ্যযন্ত্র অতি প্রকাণ্ড। এ স্থানের সঙ্গীত শালায় এক সহস্র গায়ক ও বাদ্যকর উপবেশন করিতে পারে।

মাদাম টুসোঁর মোমের প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন গৃহ লণ্ডনের একটা বিখ্যাত দৃশ্য। মাদাম টুসোঁ ফরাশীশ স্ত্রীলোক। তিনি তাঁহার খুল্লতাতের নিকট মোমের মূর্ত্তি প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়া ষোড়শ লুই নৃপতির ভগ্নী মাদাম এলিজেবেথকে মূর্ত্তি গঠন বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করাইতেন। প্রথম ফরাশীশ বিপ্লবের সময় মাদাম টুসোঁ ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনে আসিয়া মোমের প্রতিমূর্ত্তির প্রদর্শন গৃহ খুলিয়াছিলেন। ইহাতে কয়েক বৎসর মধ্যে তাঁহার অনেক টাকা উপার্জ্জন হয়। এক্ষণে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি এই ব্যবসা দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য করিয়াছেন।

প্রথম ঘরে নৃপতি জন, পঞ্চম হেনরি, এডবার্ড, রাজ্ঞী এলিজেবেথ, কার্ডিনেল উলজি প্রভৃতি সজীবের ন্যায় রহিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইলাম। ইংরাজী আদি কবি জিওফ্রিচ সরের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে ভক্তির উদয় হয়। দ্বিতীয় ঘরে ভিকতর ইমানুএল, বাল্ডী গাম্বেটা, লর্ড ব্রোহাম, সেক্সপীয়র, আরবি পাশা, ব্রাইট, আব্রাহেম্ লিনকন্ প্রভৃতির মূর্ত্তি শোভিত আছে। ইহার মধ্যে ভলটেয়ারের মূর্ত্তি মাদাম টুসোঁ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এ মূর্ত্তি গুলি সমুদায় অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। দেখিলে জীবিত মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হয়। এক স্থানে মাদাম সেণ্ট আমারেস্থ নামক একটী পরম রূপবতী কামিনী শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার বক্ষ সজীবের ন্যায় ধুক্ ধুক্ করিয়া নড়িতেছে। ইনি প্রথম ফরাশী বিপ্লবের সময় দুর্বৃত্ত রোবস পিয়রের কোপে পতিত হইয়া গিলোটাইন যন্ত্রের ছুরিকায় প্রাণত্যাগ করেন। এই সকল প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে ভারতবর্ষীয় বিখ্যাত কয়েক ব্যক্তির মূর্ত্তি রহিয়াছে। মহারাজ গোয়ালিয়র, কাশ্মীরের (মৃত) নৃপতি, ভূপালের বেগম এক স্থানে রহিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভারতহিতৈষী লর্ডরিপণ উপবেশন করিয়া আছেন। আংলো ইণ্ডিয়ানগণ দেখ, ইংলণ্ডেও লর্ড রিপনের কেমন সম্মান। একটী ঘরে বোনাপার্ট সেণ্ট হেলেনার বন্দী হইয়া যে শয্যায় শয়ন করিতেন, তথায় যে বালিস মাথায় দিয়া মৃত্যু হয়, যে যে রাজবেশ পরিধান করিয়া তিনি সম্রাট রূপে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্ঞী জোসেফাইনের পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমু-

দায় বস্তু অনেক মূল্যে সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচের একটী ঘরে যাইতে হয়. তথায় দিনের বেলায় আলোক জ্বলিতেছে। এই স্থান অতি ভয়ানক, ভাবিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে। এখানে বিখ্যাত নরহন্তাগণ জীবিতের ন্যায় রহিয়াছে। ফরাশীশ বিপ্লব সময়ের বিখ্যাত নর-শোণিত-লোলুপ মারা. জলের টবে, সারলেট করদের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিতেছে। ভীষণ শার্দ্দূলের ন্যায় তাহার মুখাকৃতি. দেখিলে ভয় হয়। নির্দ্দয় রোবস্ পিয়রের যেরূপ মনের ভাব, মূর্ত্তিও ঠিক সেই রূপ। এই ঘরে সেই ভয়ানক ফরাশীশ প্রথম বিপ্লব সময়ের গিলোটাইন্ জল্লাদ ষোড়শ লুই, রাজ্ঞী মেরি এন্টনেট, মাদাম এলিজেবথ, ডিউক অব্ অরলিনস্, রোবস্ পিয়র প্রভৃতি ২২০০০ সহস্র লোকের মস্তক চ্ছেদন করে, সেই ছুরি খানি রহিয়াছে দেখিলাম। এই জিনিসটা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল—সেই ভয়ানক সময়ের নানা কথা স্মৃতি পথে উদিত হইল—শেষে বিরক্ত হইয়া ঘর পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবারে বাহিরে আসিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম। ক্রমশঃ

সারদা-সুন্দরী।

(দাহ—নিশীথ সময়, ১২ই অগ্রহায়ণ—১২৯২।)

আজ—
কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর?
তোমার অধিক শোভা,
ততোধিক মনোলোভা,
শোয়া'য়ে দিয়েছি চাঁদ চিতার উপর!
লাবণ্য তোমার চেয়ে,
সুধা পড়ে ঠোঁট বেয়ে,
অনলে উছলে যেন রূপের সাগর!
সুনীল নয়ন দুটী
রহিয়াছে আধ ফুটি,
শরত-প্রভাত-পদ্ম ডাগর ডাগর!
উষার উজলে কিবা,
ললাটে স্বর্গীয় দিবা,
তরুণ অরুণ বিন্দু সিন্দূর সুন্দর!
শোয়া'য়ে দিয়েছি চাঁদ চিতার উপর!

১

কি দেখিতে আসিয়াছ স্বর্গের দেবতা?
হৃদয়ের প্রিয়ধন
কিসে করে বিসর্জ্জন
দেখ কিহে নরের এ ঘোর নিষ্ঠুরতা?
দয়া মায়া স্নেহ ভুলি,
দিয়াছি চিতায় তুলি,
এমনই মানবের আদর মমতা!
প্রাণ ব'লে বুকে লয়,
যেন দুই এক হয়,
পাপিষ্ঠ অসুর জানে এত আত্মীয়তা?
লুঠিয়া হৃদয় তার
শেষে এই ব্যবহার,—
কি দেখিতে আসিয়াছ স্বর্গের দেবতা?
এমনই মানবের আদর মমতা!

২

শশধর!
দেখ মানবের এই পশু ব্যবহার,
কৃতঘ্ন ইহার কাছে
আর কি জগতে আছে,
হেন ঘোর অবিশ্বাসী পাপী দুরাচার?
আমি গেলে দেশান্তরে,
সারদা আমারি তরে,
দিন দণ্ড পলে পলে বর্ষি অশ্রুধার,

করুণ সজল আঁখি
উর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকি
কাতরে মঙ্গল ভিক্ষা মাগিত আমার!
যেন তপস্বিনী বেশে
নরের নরক দেশে
ছিল পুণ্য প্রস্রবণ মূর্ত্তি মমতার!
জননী, ভগিনী, জায়া,
সকলের দয়া মায়া,—
প্রেম তিলোত্তমা ছিল সারদা আমার!
আর কি কহিব হায়,
আজি রাক্ষসের প্রায়,
অনল দিয়েছি সেই আননে তাহার,
কৃতঘ্ন আমার চেয়ে আছে কি হে আর?

৩

তুমি ত অনন্ত উচ্চে ওহে শশধর,
আর কি নিখিল ভূমে,
এমন চিতার ধূমে,
দেখেছ করিতে কারে আচ্ছন্ন অম্বর?
শীতল পুণ্যের ছায়া
প্রাণময়ী প্রিয় জায়া
প্রীতির অপরাজিতা পারিজাত থর,
অনন্ত অমৃত সিন্ধু
প্রেম পূর্ণিমার ইন্দু
দেখেছ ছিঁড়িয়া দিতে চিতার উপর?
আপনার বুক চিরা
না দিয়া ধমনী শিরা
না দিয়া কলিজা খুলে—কোন্ মূর্খ নর,
আহাহা আমার মত
পিশাচ রাক্ষস এত,
কণ্ঠের কলপ লতা—কুসুমের থর,
দেখেছ ছিঁড়িয়া দিতে চিতার উপর?

৪

"বল হরি হরি!"
কি ঘোর গম্ভীর রব, ভাঙ্গিয়া দিগন্ত সব,
উঠিয়াছে নৈশাকাশ তোলপাড় করি;
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—"বল হরি হরি!"
রোগ শোক দুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এবসুন্ধরা
যায় আজ দিবা ধামে সারদা সুন্দরী,
বুঝিয়াছি শশধর
বরষি অমৃত কর
এসেছ লইতে তারে অভিষেক করি!
কোমল কৌমুদী রথে
হীরা বাঁধা ছায়া পথে
তুলিয়াছ কি সুন্দর লাবণ্য লহরী!
অই ভাসে অই যায়,
অই অনন্তের গায়,
মিশিল জন্মের মত আহা মরি মরি!
আনন্দে অমর কুল
বর্ষিছে তারার ফুল;
বহিছে স্বর্গীয় বায়ু সুগন্ধ বিতরি,
জননী আনন্দময়ী
বরণ করিয়া অই
লইতেছে পুত্রবধূ সুখে কোলে করি!
কি আনন্দ দেবভূমে
আজি আনন্দের ধূমে
উঠিছে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব তোলপাড় করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—"বল হরি হরি!"
রোগ শোক দুঃখ ভরা
ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা
যায় আজ দিব্যধামে সারদা সুন্দরী।
বল চন্দ্র বল তারা—"বল হরি হরি!"

৫

পশু, পক্ষী, তরু, লতা
যে তোমরা আছ যথা,
প্রকৃতি অনন্ত কণ্ঠে—"বল হরি হরি!"
অপ্সর, কিন্নর, নর,
যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর,
ভূলোক দ্যুলোকবাসী অমর, অমরী,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব—"বল হরি হরি!"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

একটী কথা।

তোমরা অদৃষ্ট মান না। আমি মানি, এ অন্ধকার পৃথিবীতে কি সকল বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করা যায়? এক দিন এ হৃদয়ের আশার মলিন কাননে নিশি দিন যে রাগিণী প্রেম হইয়া ফুটিত; আজ সে ফুলের একটী ও ত আর ফুটিয়া নাই!—চারি দিকই ধূমে আচ্ছন্ন। এখানকার ত সবই এই রূপ। হয় ত সে রাগিণীর হৃদয়ের চাবি যাহার হাতে ছিল,সে বুঝি নাই! অথবা তাহার কোথায়-সে-কি হইয়াছে, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব। কি বলিব? কি একটা গোলমাল—কিসের একটা ঘন বিষাদ মেঘ—যেন হৃদয়ের অন্ধকারময়ী নদী সৈকতে বসিয়া কে কাঁদিতেছে। সেই জন্যই বলি যে, কেনর অদৃশ্য মূল সকল সময় পাওয়া যায় না।

জীবনের প্রতি ঘটনার কারণ কে কবে মিলাইয়া পাইয়াছে? সেই অদৃশ্য মহাশক্তির অদৃশ্য তরঙ্গের ঘোর বিপ্লবের মুখে পড়িয়া কি হইতেছে এবং কে কোথায় যাইতেছি, বলিতে পার কি? বন্ধন মুক্ত হইয়া যাইতেছে, আবার মুক্ত পদার্থ যুক্ত হইতেছে। ইহাই ত এখানকার এই প্রকৃতির নিয়ম। সে নিয়ম অ-দৃষ্ট। সেই অদৃষ্ট বিরাট প্রকৃতি তোমার মুখ চাহিবে না। প্রকৃতির বিশাল কারখানায় অবিশ্রাম কার্য্য চলিতেছে। সে-কার্য্য কেমন নীরব। প্রকৃতির কার্য্য কি? নির্ম্মাণ ও ধ্বংশীকরণ—জীবন ও মৃত্যু। তাহার মধ্যে তোমার নিউটন পড়িয়াছে—তুমিও পড়িবে—আমিও পড়িব। তোমার সঙ্গে আবার কত সাধ—কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশা ও কত প্রেম যে চূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে,এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে প্রকৃতি কত গৃহে বিজয়ার চির বিষাদ লহরী তুলিয়া দিয়া, আবার কত গৃহে বিবাহের আনন্দ স্রোত ভাসাইয়া সুখের চির পূর্ণিমার রজনী গড়িতেছেন। হায়! তোমার বিজ্ঞান কেবল বাহ্য জগতেরই কথা জানে। কিন্তু আমার মনের কোন্ কথা বা ঘটনার কারণ দিতে পারে? তবে ভাই অদৃষ্টের এত নিন্দা কর কেন? হিন্দুর অদৃষ্ট তত্ত্ব তোমরা ত ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর না। তাই বলি, দিন কতক "উনবিংশ শতাব্দী" ও "বিজ্ঞানের প্রখর আলো" প্রভৃতি কতক গুলি বড় বড় বাষ্পময় কথা ভুলিলে কি ভাল হয় না?

সবই অদৃষ্ট। সেই জন্যই মাধুরী আজ অস্ফুট বিধবা। বালিকা মাধুরী আজ বিধবা। মাধুরীর আশার আকাশের সুখের পূর্ণ চাঁদ আজ কোথায়? আজ এ বাঙ্গালার কয়জন বিধবার দুঃখে অশ্রুপাত করে? আজ আমার বাঙ্গালার প্রতি ঘরে ঘরে এই রূপ এক একটী বিষাদময়ী মাধুরী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। আজ তাহাদের সেই সুখ শূন্য নবীন জীবন কাননের প্রতি ফুলে জীবনগ্রাসী মৃত্যু-কীট বাস করিতেছে। বালিকা বিধবার স্নেহ ভিক্ষা পূর্ণ নীরব পবিত্র কটাক্ষের অর্থ আমাদের দেশের বহুদর্শী সমাজ সংস্কারকেরা ইচ্ছা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না। বালিকা বিধবার অর্থ পূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ও জগতে অতুলনীয়-

সেই পবিত্র নীরব রোদনের কি কোন মূল্য নাই? সত্য কথা বলিতে গেলে বাঙ্গালি-বিধবার অবস্থা ভিত্তি-শূন্য।

মাধুরী বাঙ্গালী ঘরের বিধবা; সমাজের দাসী। তাহার ইহকালের সকল সুখ-আশাও অস্তমিত। কেন তবে মাধুরীর চাঁদ মাধুরীর হৃদয় শূন্য করিয়া অতীতে লুকাইল? কই, মাধুরী ত ধরিয়া রাখিতে পারিল না!—প্রকৃতির এ চাতুরী—এ রহস্য কে বুঝিবে! ঠিক কথা। আমরা ত এ জগতের বিদেশী, দুদিনের জন্য আসিয়াছি। আমাদের প্রকৃত গৃহ সেই প্রেমময়ের অনন্ত প্রকৃতি রাজ্যে।

অদৃষ্ট ক্রমে মাধুরীর হৃদয়-প্রান্তরে কোথা থেকে এক ক্ষুদ্র. এক স্নেহের ক্ষুদ্র নদী দেখা দিল। সেই ক্ষুদ্র নদী কি এক মধুর রব আনিয়াছে, যাহা শুনিয়া মাধুরীর হৃদয়ের মৃত কুঁড়ি গুলি আজ কত দিনের পর আবার ফুটিয়া উঠিল। মাধুরীর মনও সেই নদীর মধুর রবের সহিত মিশিল। একি হইল? মাধুরীর হৃদয়ের তীর হইতে এক কি-যে মত্ততা সুর উঠিয়াছে, বালিকা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। অথবা বুঝিতে পারে নাই বা কেন বলি। মাধুরী নির্জ্জনে আপনার মনে ভাবিতেছে—"এ সংসারে আমি কে? আমি যে পরিত্যক্ত ফুল! আমার প্রতি তাঁর এত উদারতা কিসের? আমার ত কোন গুণ নাই। তবুও তিনি আমার দুঃখে এত অশ্রুপাত করেন কেন? আর কেহ ত একবারও আমার দিকে করুণার নয়নে চায় না? তাঁর গুণের সীমা নাই। তিনি কি? হায়! আমি যে আর আপনার নাই।" এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে মাধুরীর উপর ঘুম-ঘোর-ময় চক্ষু দুটী অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত।

বালিকা হৃদয় প্রেমময়। বালিকার নির্ম্মল প্রেমময় হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে একবার যে ছবি অঙ্কিত হইবে, তাহার ছায়া বালিকার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শিরায় শিরায় জাগিতে থাকিবে। সে পবিত্র প্রেমের মূলে কুঠারাঘাত করিবার ক্ষমতা নিষ্ঠুর স্বার্থপর সমাজের কিছুই নাই। এ সংসারে নারীইত জীবন্ত স্নেহমূর্ত্তি ও পবিত্র প্রেম-গঙ্গা-জননী। নারীই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সজীব মূর্ত্তি।

ঘটনার স্রোত কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। কাল সুপ্রসন্ন—অনুকূল বাতাস বহিতেছে। কি করিয়া ঠিক জানি না, এমন একদিন আসিল, যখন মাধুরীর সহিত তাহার ইহলোকের দেবতা—হৃদয়ের হৃদয়, আর আমার বাঙ্গালী সমাজে অতুলনীয় এক জ্যোতির্ম্ময় যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রেমিক প্রেমিকের মিলন। সে মিলনের তুলনা এ জগতে নাই। তখন দুইটী আত্মায় এক হইয়া সেই জগৎ অতীত আত্মায় লীন। কি চমৎকার জাগ্রত ঘুম। এই রূপ কতক্ষণ ছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। যখন উভয়ের আত্ম বিসর্জ্জন-পৃষ্ঠ-বিহারিণী অনন্ত সুখ ও মিলনের ঘুম ভাঙ্গিল, তখন যুবকের মুখ ফুটিল—"সব প্রস্তুত; সরল প্রাণে দুঃখ দেওয়া কি উচিত? আচ্ছা, তুমি আমাকে কি—" এই কথার মধ্যে বাধা দিয়া মাধুরী সে স্থান হইতে চকিতের মধ্যে উঠিয়া গেল। আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে তথায় আসিল। এবার তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, স্বর অতি মৃদু, অতি স্নেহময়—অতি অস্পষ্ট। সেই অস্পষ্ট স্বরে

ইহ জগৎ বিস্মৃত হইয়া বলিতে লাগিল—"কেন জন্মেছিলাম! জন্মিলাম যদি ত তোমাকে দেখিলাম কেন! কই, দেখিয়াও ত আশা মেটে না। আরও যেন—আমি কি দুর্ব্বল!" এই বলিয়া সেই অতুলনীয়া সুন্দরী মাধুরী মাথা নত করিল।

তখন যুবক কি করিলেন? আর স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া মাধুরীর সুন্দর অতি মধুর হাত দুই থানি আপনার হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন—"কি বুঝাব তোমায় মাধুরি! বুঝাবার ভাষা নাই—শক্তি নাই! এক বৎসর তোমার স্বপ্নময়ী স্মৃতি আমার চির সহচরী ছিল। এক বৎসর আমার চির চঞ্চলময়ী স্মৃতি তোমাময় হইয়াছিল এ দুই চোকে ভাল করে এ পৃথিবী দেখি নাই। কেবল কল্পনাময় মাধুরী-জগৎ ভ্রমণ করেছি।"

ইহার উত্তরে, মাধুরী অতি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"ভাই, এ জীবনের পর পারে তুমি রয়েছ; তোমার সঙ্গে মিশিবার শক্তি, আমার কৈ! আমি যে সমাজের স্বার্থের অধীন। সমাজ যে ব্যক্তির দিকে চায় না! এ মিলনে যে তুমি সমাজচ্যুত হইবে! আমার ছাই সুখের জন্য তোমার সুখের দ্বার বন্ধ করিব কেন? আমি ত ডুব্‌চি; আমাকে তুল্‌তে গিয়ে তুমি ডোব কেন?—এ হৃদয় শূন্য! যত দিন বাঁচিব, এই শূন্য হৃদয়ের মন্দিরে তোমার অশরীরী প্রতিমার নিশি দিন পূজা করিব। দূর মিলন, বড় মধুর—বড় পবিত্র।"

যুবক একবার সমাজ ও জগতের দিকে চাহিয়া যে গম্ভীর কথাগুলি বলিলেন, তাহা কি আমার বাঙ্গালার পাঠকদের চক্ষু খুলিয়া দিবে না? যুবক উত্তর দিলেন, "মাধুরি, সমাজ কে? এ যথেচ্ছার স্বার্থপর সমাজের শাসন আমি মানি না। আমাদের এ মিলন সেই মহাশক্তির নিয়মের ফল। এ মিলনে আমার আমিত্ব কোথায়? আমাদের মিলনের পুরোহিত সত্য স্বয়ং। এমিলনের উপর সমাজের কোন হাত নাই। এস, মাধুরি এস, আজ এই ভস্মাবশেষ সমাজের উপর দাঁড়াইয়া তোমার পাণি গ্রহণ করি। এস মাধুরি, এই প্রলয়ের রাজ্যে আমাদের এক মাত্র ধ্রুব সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি। আজ আমি ভাবী পরিবর্ত্তিত সমাজের গোড়ায় দাঁড়াইয়া বলিতেছি যে, সত্যই আমাদের এক মাত্র আদর্শ। সমাজ কে? আমি কে? তিনিই সব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

পাতা মুড়িবেন না

ভবভূতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রামচন্দ্রের বনগমনের পর বহুদিন অতীত হইল। পুত্রবৎসল রাজা, দশরথ উপযুক্ত পুত্রের নির্ব্বাসন-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া বিষাদে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে এবং রামচন্দ্রের বনগমনে অযোধ্যাপুরী নীরব হইল। আলোক সমুজ্জ্বল রাজভবন, অন্ধকারময় পরিত্যক্ত আগারে পরিণত হইল। যে বিষাদময়ী রজনীতে দশরথ কৌশল্যার নিকট মুনিশাপের কথা বিবৃত করিয়া, চিরদিনের জন্য তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, যেন সেই করাল নিশার ছায়া অযোধ্যার নরনারীর

গণের মুখে নিপতিত হইল। নাটকাংশে এই সকল বিষয় অতুল্য; অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম এবং ইহপরলোকপ্রিয় হৃদয়ের নির্ব্বেদ বর্ণন করিতে যাইয়া, বাল্মীকি এই সকল স্থলে যে কয়টী বিষয়ের প্রস্তাবনা করিয়াছেন, সাহিত্য সংসারে তাহাদিগের সমগুণ বস্তু অতি বিরল। কিন্তু ভবভূতি এই সকল বিষয় আপনার গ্রন্থ মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সংক্ষেপের মধ্যে রামচরিতের সর্ব্বাংশ বর্ণন করিতে যাইয়া এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আপনার কল্পনা বিকাশ ও নূতনত্বরক্ষার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই অনেক অনেক সুন্দর স্থল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দশরথের মৃত্যুকালীন অবস্থা, এই সকল স্থলের একটী অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এইসঙ্গে তিনি অনেক অপেক্ষাকৃত নীরস অংশও পরিত্যাগ করিবার অবসর পাইয়াছেন। রামচন্দ্রের সহিত নিলজ্জা শূর্পণখার লালসাপূর্ণ কথোপকথন পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে আপনার সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনার উৎকৃষ্ট উদ্ভাবন কৌশল প্রদর্শন করিতেও ক্রটী করেন নাই। রামায়ণজ্ঞ পাঠকের নিকট দশরথের মৃত্যু, শূর্পণখার শাস্তি, বিরাধবধ ইত্যাদি বিষয়, অবিদিত না থাকিলেও ভবভূতির পক্ষে তাহাদিগের উল্লেখের প্রয়োজন; অন্যথা তাঁহার নাটক দর্শক ব্যক্তিগণের পক্ষে বিদিত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু নাটকাকারে বর্ণিত করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক দীর্ঘ ও নীরস হইবার সম্ভাবনা। অথচ তাহা একেবারে পরিত্যাগ করাও কোন মতেই সম্ভবপর নহে। তিনি সেই নিমিত্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা এইবার নিম্নে তাহার উল্লেখ করিব।

বীরচরিতের পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই যে, পক্ষীন্দ্র জটায়ু, ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজ সম্পাতির চরণ বন্দনের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। একবার বালস্বভাব-সুলভ চপলতা বশত জটায়ু এবং সম্পাতি উভয়েই আকাশ মণ্ডলে উত্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সূর্য্যের প্রখর কিরণে জটায়ুর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। ভ্রাতৃবৎসল সম্পাতি কনিষ্ঠের প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, আপনার পক্ষ পুটের অন্তরালে তাঁহার শরীর আচ্ছাদিত করিলেন। এইরূপে স্নেহময় ভ্রাতার নিস্বার্থতায় সে যাত্রা জটায়ুর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু সূর্য্যকিরণে সম্পাতির পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া গেল। জটায়ু ভ্রাতার নিঃস্বার্থ স্নেহের কথা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তিনি প্রতিদিনই তাঁহার চরণ বন্দনের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। ভবভূতি, সম্পাতি এবং জটায়ুকে রঙ্গভূমিতে অবতারণা করাইয়া, তাঁহাদিগের মুখ হইতেই আপনার অভীপ্সিত বিষয়গুলি বিবৃত করাইয়াছেন। যে সকল বিষয় অতি স্বল্পের মধ্যে উল্লিখিত করা তাঁহার অভিপ্রেত, তিনি তাহা তাঁহাদিগের দ্বারাই পাঠকগণের গোচর করাইয়াছেন। এইরূপ কৌশল দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায়ও সুসিদ্ধ হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে নূতন চরিত্রের সমাবেশ দ্বারা তাঁহার গ্রন্থেরও নূতনত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অভিনয় দর্শক ব্যক্তিগণের পক্ষেও এরূপ নূতন চরিত্রের সমাবেশ যে অধিকতর মনোরঞ্জক, তাহা বোধ

হয় সকলেই অবগত আছেন। ভবভূতি সেই জন্য অনেক স্থলেই এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া আমরা এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

পরস্পর অভিবাদন এবং কুশল প্রশ্নের পর সম্পাতি জটায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস জটায়ু, কালক্রমে রামচন্দ্রের পিতৃমরণ শোক একটু মন্দীভূত হইয়াছে ত?" "আমি বিরাধ মাংসে পরিতৃপ্ত গৃধ্রগণের মুখে অবগত হইলাম যে, রামচন্দ্র চিত্রকূট হইতে শরভঙ্গের আশ্রমে গমন করিয়াছেন, এবং শরভঙ্গের অগ্নি প্রবেশের পর, সেখান হইতে সুতীক্ষ্ণ প্রভৃতি মুনিগণের নিকট গমন করিয়াছেন। জটায়ু রামচন্দ্রের কুশল সংবাদ নিবেদন করিয়া বলিলেন, "রাম এক্ষণে অগস্ত্য ঋষির আদেশে পঞ্চবটীতে বাস করিতেছেন।" সম্পাতি শুনিয়া বলিলেন "হাঁ, জন স্থানে গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী নামক স্থান আছে বটে, কিন্তু ভাই, অনেক কালের কথা বলে আমার আর এখন সে সকল কথা স্মরণ হয় না।" জটায়ু অগ্রজের কথা শেষ হইলে বলিলেন "দাদা, শুনেছেন, কামুকী শূর্পণখা একদিন পাপাভিলাষে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়েছিল"। সম্পাতি জটায়ুর কথায় বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "সে কি? সে হতভাগিনীর যে বয়সের শেষ নাই? দুগ্ধপোষ্য বালক রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হ'তে কি তার একটুকু লজ্জা বোধ হল না? এইরূপ কথোপকথন ক্রমে জটায়ু অগ্রজের নিকট শূর্পণখার শাস্তি, এবং খরদূষণ বধ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। সম্পাতি শুনিয়া বলিলেন, "ভাই জটায়ু, রাবণ মদান্ধ, মায়াবী এবং অমিতপরাক্রম; সে যে অনায়াসে ভগিনীর এইরূপ অপমান এবং জ্ঞাতি বিনাশ উপেক্ষা করিবে, তাহাতে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। রাম এবং লক্ষ্মণ উভয়েই বালক, তুমি সর্ব্বদা অতি সাবধানে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না। আমিও তাঁহাদিগের মঙ্গলের জন্য সমুদ্রে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিব" সম্পাতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলে জটায়ু আকাশ মার্গে উড্ডীন হইলেন। এই সকল স্থলে ভবভূতি অত্যুক্তি বর্ণনায় বাল্মীকিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। জটায়ু দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, রামচন্দ্র একটী চিত্র মৃগের অনুসরণ করিতেছেন, লক্ষ্মণ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছেন, আর রাবণ পরিব্রাজক বেশে রামচন্দ্রের উটজে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি রাবণকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পৌলস্ত্য, পৌলস্ত্য, তুমি প্রলয় কালের বেদ রক্ষক মহাত্মাগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, বৈদিক ক্রিয়া কলাপ তোমার অবিদিত নাই, তুমি যমেরও জেতা, কিন্তু তোমার এই ব্যবহার?" রাবণ জটায়ুর আহ্বানে উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন জটায়ু ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

ভবভূতি কোন স্থলেই রঙ্গভূমিতে যুদ্ধের দৃশ্য অবতারিত করেন নাই। জটায়ু এবং রাবণের যুদ্ধও তিনি দর্শকগণকে দেখিতে দেন নাই, কিন্তু সে যুদ্ধের পরিণাম কি হইল, তিনি স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা দর্শক ও পাঠকগণের গোচর করিয়াছেন।

জটায়ু রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরই আমরা দেখিতে পাই, লক্ষণ এবং রামচন্দ্র সেখানে প্রবেশ করিলেন। লক্ষণ সীতার অদর্শনে শোকাকুল; সীতার রূপ ও গুণ স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা চিন্তা করিয়া তিনি ব্যথিত। কিন্তু রামচন্দ্রের হৃদয়ে বিষাদ নাই। তাঁহাকে দেখিয়া লক্ষণের বোধ হইল, যেন মূর্ত্তিমান ক্রোধ অথবা জঙ্গম শোকাগ্নি কানন মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। রামচন্দ্রের তাৎকালিক হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার নয়। তাঁহার হৃদয়ে শোক অথবা অবসাদ নাই, কিন্তু তাহা লজ্জা, নির্ব্বেদ এবং পরিদেবনায় পরিপূর্ণ। তিনি শতবার আপনাকে ধিক্কার দিতে ছিলেন। লোকে আত্মীয়, স্বজন, অনুগত, সকলকে রক্ষা করিতে পারে, আর তিনি একমাত্র পত্নীকেও রক্ষা করিতে পারিলেন না, এ চিন্তা বজ্রনির্ম্মিত কীলকের ন্যায় তাঁহার হৃদয় ভেদ করিতেছিল; তাঁহার বোধ হইতেছিল যেন তিনি ঘোরতর অন্ধতমসে নিমগ্ন হইতেছেন। একে পিতৃশোক তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, তাহার উপর দীনা সীতার অবস্থা আজি কি হইল? এ চিন্তায় তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন;—

"ন্যক্কারো হৃদিবজ্রকীলইবমেতীব্রং পরিস্পন্দতে,
ঘোরেহন্ধে তমসীব মজ্জতিমনঃ সংমীলিতং লজ্জয়া।
শোকস্তাত বিপত্তিজো দহতি মাং নাস্ত্যেব যস্মিন্ ক্রিয়া
মর্ম্মাণীব পুন র্ভিনত্তি করুণা সীতাং বরাকীং প্রতি॥

লক্ষণ অগ্রজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আর্য্য, আপনার ন্যায় মহাত্মাগণ ত কখন বিপদে অভিভূত হন না"। রামচন্দ্র সে কথায় উত্তর না দিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি একি করিলাম? যাঁহারা সমগ্র ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সূর্য্যবংশ প্রদীপ মহাপরাক্রম সেই মহাত্মাগণের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি একি করিলাম? আমার ব্যবহারে সেই মহাপুরুষগণ অপমানিত হইলেন, কল্পান্তজীবী সাধু জটায়ু প্রাণত্যাগ করিলেন। সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া জগতে কখনও যাহা কেহ করে নাই, আমি সেই সকল গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম।" (১) আমরা বলিয়াছি যে রামচন্দ্রের হৃদয় নির্ব্বেদ এবং পরিদেবনায় পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহাতে অনুতাপেরও অসদ্ভাব নাই। সীতাহরণ যে তাঁহারই অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং ধার্ম্মিক জটায়ু যে তাঁহারই অনবধানতা রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইয়া, জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, সে কথাও তাঁহার বোধগম্য হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয় জটায়ুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইল। উভয় ভ্রাতায় কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, লক্ষণ অগ্রজকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিলেন, "আর্য্য, এক্ষণে সেই দুরাত্মার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া আণৃন্য লাভ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।" রামচন্দ্র বলিলেন, ভাই, "সে বিষয়ে কি আর বক্তব্য আছে?

(১) যৈগু প্তাস্তকুতোভয়ানি ভুবনাস্তাসন মহাভীষব স্তে সূর্য্যান্বয়কেতবো নৃপতয়ঃ পূর্ব্বে তিরস্কারিতাঃ।
কল্পান্তেষপি যঃ স্থিতঃ স গমিতঃসাধু র্জটায়ুর্দিবং
পত্নীং হারয়তা বনে যদকৃতং লোকৈঃ কৃতং তন্ময়া॥

পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে রাক্ষস বধের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম, তাহার উপর ত আজি আবার এই অত্যাচার; কেবল রাবণকে নিধন করিলেই হইবে না, তাহার সবংশে শাস্তির প্রয়োজন।" উভয় ভ্রাতার এইরূপ কথোপকথনের পর, সীতার অন্বেষণে উন্মত্ত শ্বাপদ সঙ্কুল দক্ষিণাপথ ভূভাগে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অকস্মাৎ দূরে শ্রুত হইল, "কঃ কোঽত্রভোঃ! পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তা মামনেন দুরাত্মনা রাক্ষসকবন্ধেনা কৃষ্য মানা মরণো স্থিরম্।

অহং হি শ্রমণানাম সিদ্ধাশর তাপসী।

মতঙ্গাশ্রম বাস্তব্যা রামান্বেষিণ্যুপাগতা॥"

রামচন্দ্র শুনিবামাত্র লক্ষ্মণকে তাঁহার রক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণ অল্প ক্ষণের মধ্যেই কবন্ধকে বিনষ্ট করিয়া শ্রমণাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রমণা রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "দেব, বোধ হয় রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ বিভীষণের নাম আপনি অবগত আছেন, তিনি আপনার নিকট এই লিপি প্রেরণ করিয়াছেন।" রামচন্দ্র শুনিয়া লক্ষ্মণকে পাঠ করিতে আদেশ করিলেন; লক্ষ্মণ তাহা পাঠ করিলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিতছিল;—

"বিশ্লিষ্ট ভাগ ধেয়ানাং; দ্বয়ীনঃ পরমাগতিঃ। ধর্ম্ম প্রবৃদ্ধ্যমানো বা গোপ্তা ধর্ম্মস্য বা ভবান্।" বিভীষণ লিখিয়াছিলেন, 'যাহারা আমাদিগের ন্যায় হতভাগা, সংসারে তাহাদিগের দুইটীমাত্র অবলম্বন। প্রথম সম্যক সম্বর্দ্ধিত ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মরক্ষক আপনার ন্যায় মহাত্মা। রামচন্দ্র শুনিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "বৎস, প্রিয় সুহৃদ লঙ্কেশ্বর মহারাজ বিভীষণের পত্রের কি উত্তর প্রদান করিব?"

লক্ষ্মণ বলিলেন, "যখন প্রিয় সুহৃদ এবং লঙ্কেশ্বর মহারাজ বিভীষণ একথা বলিয়াছেন, তখন আর উত্তর প্রদানের অবশিষ্ট কি?" শ্রমণা লক্ষ্মণের উত্তরে অনুগৃহীতা হইলেন। ইহার পর রামচন্দ্র শ্রমণার মুখে অবগত হইলেন যে, ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সুগ্রীব, বিভীষণ হনুমান প্রভৃতি মহাত্মাগণ সীতার অনসূয়া নামাঙ্কিত উত্তরীয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রণয়ীর নিকট প্রিয়জনের মস্তকের একটী কেশ পর্য্যন্তও প্রীতিকর। রামচন্দ্র যখন শুনিলেন যে, সুগ্রীব প্রভৃতি সীতার ব্যবহার্য্য উত্তরীয় প্রাপ্ত হইয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয় সেই সকল অকারণ সুহৃদ মহাত্মাগণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি তাহাদিগকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উৎসুক হইলেন। এই সময় কাননের দক্ষিণ ভাগে অতি প্রবল অগ্নিশিখা দৃষ্ট হইল, রামচন্দ্র দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া শ্রমণাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রমণা বলিলেন, "কুমার লক্ষ্মণ যোজনবাহু কবন্ধ রাক্ষসের দেহ দগ্ধ করিবার জন্য চিতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহারই শিখা আপনার দৃষ্টিগোচর হইতেছে।" রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

এইস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা দুই একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভবভূতির সময়ে যে রঙ্গভূমির অনেক উন্নতি হইয়াছিল এবং তিনিও যে কেমন করিয়া রঙ্গস্থিত দর্শকগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই কথার উল্লেখ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

যাহাতে হৃদয়ে অকস্মাৎ বিস্ময় অথবা ভীতির সঞ্চার হয়, সেইরূপ দৃশ্যের অবতারণা করিতে পারিলেই নাটককার প্রায় রঙ্গভূমিতে কৃতকার্য্য হন্। কি আধুনিক, কি প্রাচীন, প্রত্যেক নাটককারই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য সাধ্য মত প্রয়াস পাইয়াছেন। ভবভূতিও তাহা বুঝিয়া স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে তাহার অবতারণা করিয়াছেন। হঠাৎ নিবিড় অন্ধকারময় কাননের মধ্যে আলোক রাশি সমুত্থিত হইল, সেই অন্ধকার মিশ্রিত আলোকে ভীষণাকার রাক্ষসের অৰ্দ্ধদগ্ধ কলেবর দর্শকগণের চক্ষুতে পতিত হইল, আবার তৎক্ষণাৎ ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড সঞ্চালনের বলেই যেন সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল, এবং সেই শ্মশানালয় হইতে তেজঃপ্রদীপ্ত দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হইলেন, এ সকল দৃশ্য যে অভিনয় দর্শক ব্যক্তিগণের নিকট কিরূপ বিস্ময়কর, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। আমরা এস্থলে ইহার প্রসঙ্গমাত্র করিলাম। উত্তরচরিত সমালোচনের সময় ইহার সবিস্তর সমালোচনা করিব।

দিব্যপুরুষ চিতানল হইতে সমুত্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন এবং আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমি মাল্যবানের আদেশে আপনার বিনাশের জন্য এই কানন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলাম, কিন্তু আপনার অনুগ্রহে আজ শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। আপনার প্রসাদে আজ অন্যের পরোক্ষ বস্তুও আমার অবিদিত নহে। মাল্যবান আপনার বিনাশের জন্য বালীকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, তিনিও রাবণের প্রতি মৈত্রীতা নিবন্ধন আপনাকে বধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আপনার গোচরার্থ একথা আপনার নিকট নিবেদন করিলাম।" রামচন্দ্র দিব্য পুরুষের কথায় বিন্দুমাত্রও বিস্ময় প্রকাশ করিতেন না, বালীর ন্যায় মহাবীর তাঁহার বধের জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, একথায় তাঁহার উদ্বেগ মাত্র জন্মিল না। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, ... গণ কখনও সুহৃৎ কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন না। ভদ্র, আমি তোমার সংবাদ প্রদানরূপ সৌজন্যে প্রীত হইলাম, প্রার্থনা করি, তুমি তোমার উপযুক্ত লোকে আনন্দ অনুভব কর। রামচন্দ্রের উত্তরে সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং দিব্য পুরুষও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ক্রমশঃ

পাপের অনন্তত্বে আমি।

পৃথিবীর উষ্ণত্ব এড়াইবার জন্য আমি ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। নিভৃত শয়নকক্ষেই মস্তক রাখি, আর সুশীতল বটছায়াতেই বিশ্রাম মাগি, কিছুতেই পৃথিবীর কোলাহল—পৃথিবীর উষ্ণ নিঃশ্বাস—ঘৃণা-বিদ্বেষের দারুণ উত্তাপ আমাকে পরিত্যাগ করিল না। এখন আমি কোথায় যাই—এখন আমি কি করি? পৃথিবীতে এমন সুহৃদ কে আছে, যে কষ্ট

স্বীকার করিয়া বলিয়া দিবে, আমি কি করি?

আমার অবস্থা, ভাই পাঠক, তোমাকে কিছু খুলিয়া বলিতেছি। আমি বড় পাপী। আমার প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি প্রশ্বাসে, প্রতি শোণিত-বিন্দুতে পাপ,—কেবল পাপ—অনন্ত পাপ বিমিশ্রিত—বিজড়িত। যেটীকে যখনই পাপ বলিয়া বুঝিতেছি, তখনই সেটীকে পরিত্যাগ করিতেছি—কিন্তু একটী পরিত্যক্ত হইতে না হইতে দশ দিক হইতে দশটী আসিয়া ঘেরিতেছে। যত দূর করি,—ততোধিক আক্রমণ। একটী ছাড়ে, দশটী আসে। দশটী যায় ত শতটী আশ্রয় লয়। এমনই করিয়া আমি যতই পাপাসুরদিগকে দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, রক্তবীজের গোষ্টি ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অনন্ত পাপ কুণ্ডে—অনন্ত অভাব সাগরে আমি পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। এই বিশাল অনন্তের হস্ত হইতে যে আমি রক্ষা পাইব, আমার সে আশা কখনও ছিলনা, আজও নাই। এই ত আমার অবস্থা। কিন্তু কাহার অবস্থা আমার ন্যায় নহে। যতই পাপ বোধ জন্মিবে, ততই নূতন পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আজ একটীকে পাপ বলিয়া বুঝিতেছি, কল্য দশটী বুঝিব—দশটী বুঝা শেষ হইতে না হইতে শতটী। পাপ-বোধ একবার জন্মিলে আর তাহার শেষ নাই। কিন্তু এই ত জঘন্য চরিত্র—পাপ-কীট আমরা রহিয়াছি, আমরা আবার কত অহঙ্কারে মত্ত! ছোট পাপী আবার অহঙ্কারস্ফীত বক্ষে কত বড় পাপীর প্রতি ঘৃণা কটাক্ষপাত করিতেছে। পাপীদলের আবার বড় ছোট কি? বরং ইহাই ঠিক, যে বড় ধার্ম্মিক, সেই বড় পাপী, কারণ তাঁহার পাপবোধ সকলের অপেক্ষা অধিক। কিন্তু পৃথিবীর ব্যাখ্যা সেরূপ নহে। পাপীই, পাপীকে ঘৃণা করিতেছে! অমুকে ব্যভিচারী,—অমুক পরনিন্দুক—অমুক কপটাচারী, এই প্রকার কত ভেদাভেদের সৃষ্টি করিয়া কত ঘৃণা,—কত ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি করিতেছি। কিন্তু একবারও ভাবিতেছি না যে, আমার পাপ-বোধই অন্যের পাপ বোধের কারণ নহে। আমি আজ যেটীকে পাপ বলিয়া বুঝিয়াছি, অন্য সকলেও যেঠিক সেইটীকেই পাপ বলিয়া বুঝিতেছে, ইহা ঠিক নাও হইতে পারে। উন্নতির তারতম্যানুসারে পাপ-বোধের তারতম্য জন্মিবেই জন্মিবে। যিশুখ্রীষ্ট যাহাকে পাপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আমি হয়ত সে সকলকে বর্ত্তমান অবস্থায় পাপ বলিয়া মোটেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। এই প্রকারে এমন অনেক পাপ আছে, যাহা তুমি ও আমি দুই ভিন্ন চক্ষে দেখিতেছি। এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা তোমার ও আমার নিকট দুইবিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মানুষের রুচি, প্রবৃত্তি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, বুদ্ধি ও ধারণা শক্তিও তেমনি পৃথক পৃথক। মানুষের উদ্দেশ্য পৃথক, কর্ত্তব্য পৃথক, মত পৃথক। পৃথকত্ব ঘুচিয়া যাইবে যে দিন, সেই দিন তোমার পাপ আমার নিকট হয়ত পাপ বলিয়া বোধ হইতে পারে; নচেৎ নহে। তুমি বলিবে, কেন, এমন ত অনেক পাপ দেখিতেছি, যাহাকে তুমি ও আমি এক বাক্যে পাপ বলিতেছি। আমি বলি, তাহা অসম্ভব। পৃথিবীর তীক্ষ্ণ শাসন—মুখ-চাওয়া-চাওয়ি-ভাব, সকল ভুলিয়া যাও, তবে বুঝিবে, বাস্তবিক

পৃথিবী যাহাকে পাপ বলিতেছে, তাহা তোমার আমার নিকট সকল সময়ে পাপ নাও হইতে পারে। পৃথিবীর প্রচারিত পাপ কেই যে সকলে পাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করে, সে কেবল ভয়ে; পাপবোধে নহে। যে পাপে বোধ জন্মে, সে পাপ আর মানুষ করিতে পারে না। পাপ বোধ জন্মে না, অথচ মুখে পাপ স্বীকার করে বলিয়াই মানুষ পাপে লিপ্ত হয়। পাপ-বোধ না হইলে, পাপ, মানুষের নিকট পাপ নহে। এমন কোন ঘটনা নাই, যাহা সকল সময়েই পাপ। যাহাতে মানবের আত্মার অপকার হয়, তাহাই পাপ। কোন্‌টী কখন কাহার নিকট পাপ, তাহা বিবেক স্পষ্ট বলিয়া দেয়। আমার বিবেক যাহাকে পাপ বলে না, সময় বিশেষে তোমার বিবেক তাহাকে পাপ বলে বলিয়াই তাহা পাপ নহে। হিন্দু এবং খ্রীষ্টানের বিবেক কত বিভিন্নপথগামী! সুধা, একসময়ে সুধা, এক সময়ে গরল। গরল, আবার ঘটনা পরম্পরায় এক জনের নিকট সুধার ন্যায় হইতেছে। মুখে পাপ পাপ বলা, ও হৃদয়ে পাপ-বোধ এক কথা নহে। আবার বলি, পাপ বোধ জন্মিলে, মানুষ আর সে পাপে কখনই লিপ্ত হইতে পারে না। যতদিন যেটায় পাপ বোধ না জন্মে, ততদিনই সেটাকে মানুষ আদর করে; যখন পাপ বোধ জন্মে, তখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে। অন্যের মুখে শুনিলেই পাপ বোধ হয় না। পৃথিবীর সাধু লোকেরা মিথ্যা কথা বলাকে পাপ বলিয়া গিয়াছেন। আমিও বলিতেছি, মিথ্যা বলা পাপ। বলিতেছি বটে, কিন্তু হাজার বার হাজার মিথ্যা কথা বলিতেছি। এই যে আমি মিথ্যা কথাকে পাপ বলিতেছি, ইহাই পাপ-বোধ নহে। পাপবোধ ভিতর হইতে যখন জন্মে, তখন মানুষ আর তাহাতে লিপ্ত থাকিতে পারে না। এই জন্যই বলিতেছি, পৃথিবীর লোকেরা যে কার্য্য করিতেছে, আমার নিকট তাহা পাপ হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর লোকদিগের নিকট তাহা পাপ নাও হইতে পারে। চৈতন্য আমাপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন, তিনি যদি জীবিত থাকিতেন, তবে হয়ত বুঝিতেন যে, আমি যাহা করিতেছি, সে সকলই পাপ কার্য্য। কিন্তু না বুঝিয়া আমি যাহা করিতেছি, তাহা আমার পাপ কার্য্য নহে আমি যাহাকে পাপ বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা না করাই আমার ধর্ম্ম। না করাই কি? যেখানে যে বিষয়ে পাপ বোধ হয়, সেখানে সে বিষয়ে লিপ্ত থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যেখানে বোধ নাই, সেখানে পাপও নাই। অজ্ঞাত অবস্থায়, অবোধ অবস্থায় মানুষ যাহা করে, তাহা কখনই পাপ হইতে পারে না। পাপ ঘটনা নহে, পাপ মনের একটী অবস্থা মাত্র। উন্নতির তারতম্যানুসারে মনের অবস্থা ভিন্ন রূপ হয়। বিবেক তখন উজ্জ্বল হয়। এই মনের অবস্থা যাহার যেরূপ, সে পাপকেও সেইরূপ দেখে। যে পাপ, একজনের নিকট মহা পাপ, তাহাই একজনের নিকট পুণ্য হইতে পারে।" হইতে পারে নহে; তাহা পৃথিবীতে অনেক স্থলে পুণ্য হইতেছে। সরল বিশ্বাসের জন্য মানুষ কখনও দায়ী হইতে পারে না। বিবেকের স্পষ্ট আদেশে যে যাহা সরল ভাবে বুঝিতে পারে, তাহা পালন করিলেই তাহার পুণ্য হয়। যে পাপে বোধ জন্মে, সেরূপ পাপ মানুষ আর করে না বটে, কিন্তু আরো দশটীকে তখন পাপ বলিয়া বুঝিতে

পারে। তুমি অধিক পাপী, কি আমি অধিক, তাহা তোমার আমার ভাবিবার অধিকার নাই—ভাবিবার শক্তি নাই। কারণ তোমার পাপ আমার নিকট পাপ বলিয়া বোধ নাও হইতে পারে, এবং আমার পাপ তোমার নিকট পাপ বলিয়া বোধ নাও হইতে পারে। স্থির ভাবে যখন ভাবিয়া ও চিন্তা করিয়া দেখি, তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি না। সামান্য দৃষ্টান্তেই আমরা পরাস্ত হইয়া যাই। আমরা সকলেই অন্নাহার করিতেছি, কিন্তু এই অন্নাহারে তোমার শরীরে যে উপকার হইতেছে, আমার শরীরেও যে ঠিক তেমনিই হইবে, কোন বিজ্ঞান তাহা নিশ্চয় বলিতে পারে না। যে ঔষধ খাইয়া তোমার প্রভূত উপকার হইতেছে, সেই ঔষধ সেবনেই আমার অনিষ্ঠ হইতে পারে-- ইহা প্রতি দিনের ঘটনা। এই জন্যই বিজ্ঞান আজও এ সকল বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিল না,—এই জন্যই চিকিৎসাশাস্ত্র আজও অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে। আমরা এই হিসাবে জগৎকে দেখিলে, পাপী আর পুণ্যাত্মা, এই ভেদাভেদ আর থাকিতে পারে না। কে সাধু, কে অসাধু, কে পাপী, কে পুণ্যাত্মা, মানুষ আপন বুদ্ধিতে তাহা ঠিক রূপে কখনই বুঝিতে পারে না। পাপীই সময়ে মানুষের নিকট পুণ্যাত্মা হইতেছে, পুণ্যাত্মাও পাপী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এই রূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া, মানুষ, কেবল অন্যায়েরই পূজা করিতেছেন, কেবল অবিচারেরই প্রশ্রয় দিতেছেন। দুঃখের বিষয়, পৃথিবী কখনও এই অন্যায়ের পূজা পরিত্যাগ করিতে পারিল না। এই অন্যায়ের প্রশ্রয় পাওয়াতেই কোন মানুষ ঈশ্বরের অবতার হইয়া পূজা পাইল, কোন মানুষের শোণিত-পাত করিয়া মানুষ রক্তপিপাসা নিবৃত্তি করিল। গুরু পূজার দিন, মানুষ পূজার দিন চলিয়া যাইতেছে, লোকেরা বলে, কিন্তু কোথায় যাইতেছে? প্রকারান্তরে, গুরুপূজা, মানুষ পূজা অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। মানুষ, যতদিন আপন বুদ্ধির বিচারে পাপী ও পুণ্যাত্মা, সাধু ও অসাধুর বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবে, ততদিন এভাব থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে, এমন একদিন আসিবে, যখন এই অন্যায়, এই অবিচার, এই অসত্যের পূজা পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইবে। যখন বড় ছোট, পাপী পুণ্যাত্মা, এসকল ভেদাভেদ আর মানুষ গণিবে না;— যখন সকল বস্তুতেই ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে;—যখন একজন আপন বুদ্ধিতে অন্য জনের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বয়ং ভাল হইবার জন্যই ব্যস্ত থাকিবে;—যখন মানুষ অন্যের চক্ষের তৃণ না দেখিয়া নিজের তৃণ দেখিতেই ব্যস্ত থাকিয়া জীবনকে শেষ করিতে পারিবে। যখন লোক বিশাল বিস্তৃত অভাব সাগরের মধ্যে পড়িয়া যায়, তখন আর কি কিছু বিচার করিবার অবসর থাকে?—পাপ বোধ জন্মিতে জন্মিতে যখন মানুষ পাপের অনন্তত্বে নিমগ্ন হইয়াছে, বুঝিতে পারে, তখন অসম্পূর্ণ মানুষের অন্য আর কিছুই গণনার বাসনা থাকে না। তখন কেবল মনে হয়—কেমনে উদ্ধার পাইব, কেমনে রক্ষা পাইব। অকূল সাগরে পড়িয়া কে কবে অন্যের কথা ভাবিতে পারিয়াছে? পাপ বোধ জন্মিলে, নিশ্চয়ই পাপকে অনন্ত বলিয়া মনে হয়। একটুই জ্ঞান

হইতে হইতেই তবে জ্ঞানকে অনন্ত মনে হয়। সাগরকে অতলস্পর্শ বলিয়া যে না জানিয়াছে,তাহার পক্ষে অন্যের উদ্ধারের চিন্তা সম্ভবপর হইতে পারে, স্বীকার করি। কিন্তু যে জানে, ডুবিলে আর উঠিবার শক্তি নাই, সে নিজে ডুবিয়া কখনই অন্যের চিন্তা করিতে পারে না। পাপে ডুবিয়া পাপী অন্য পাপীর পাপ কি গণিবে? পাপ-বোধ জন্মিলে সে পাপ করা যেমন অসম্ভব, অন্য পাপীর কথা ভাবাও তেমনি অসম্ভব। এই পৃথিবীকে অভাবের গভীর সাগর বলিয়া যেনা বুঝিয়াছে, সে অন্যের অভাব দেখিতে পারে, কিন্তু যে বুঝিয়াছে, সে আপনাকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিবে। কে তুলিবে, কে উদ্ধার করিবে,—প্রতিক্ষণ কেবল এই চিন্তা। অকূল পাপ-সাগর—কূল নাই,কিনারা নাই! কেমনে উঠিব, কেমনে বাঁচিব, কেমনে জীবন পাইব—পাপীর পাপ-বোধ জন্মিলে কেবল এই চিন্তা জাগিবে। আমার বড় দুঃখ, আমি ঠেকিয়া,ভুগিয়াও শিখিতে পারিতেছি না। পাপ-সাগরে পড়িয়াও অন্যের পাপ দেখাইয়াই ফিরিতেছি। ধরি ধরি, ধরিতে পারি না। পাই, পাই,শিখিতে পারি না। পৃথিবীর সকলকে আদর করিব—সকলকেই বিশ্বেশ্বরের ছবি বলিয়া ভাবিব;—সকলকেই মঙ্গলময়ের সৃষ্টি বলিয়া মনে করিব, ভাবি, কিন্তু আবার সংসারের উষ্ণতায় পড়িয়া সব গোলমাল হইয়া যায়। ঘৃণা বিদ্বেষের ভীষণ উষ্ণতায় আমার প্রাণ যায়—জীবন যায়—সব যায়। অহঙ্কার, আত্মাভিমানে—আমার জীবনরত্ন বিসর্জ্জিত হইল। অনন্ত পাপে ডুবিয়া আমি মারা যাই। কি করিলে আমি এই সংসার-উত্তাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব, বুঝি না। পাপ-অনন্তত্বে পড়িয়া আমি নিজে নিরুপায়; কিন্তু তবুও অন্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি!! এ রোগের ঔষধ কি? উপায় এক ছিল, এক ঔষধ ছিল,তাহা আমি ধরিয়াও ধরিতে পারিলাম না। বৃথা আড়ম্বরে, বাহ্য আন্দোলনে মাতিয়া আমার সোণার-চাঁদকে হৃদয়ে পাইয়াও ধরিতে পারিলাম না। আমার পরশমণিকে প্রাণে পাইয়াও পুরিয়া রাখিতে পারিলাম না। যাঁহাকে পাইলে সব অভাবের অভাবত্ব দূর হয়, আমি তাঁহাকে ভুলিয়া কেমন মলিন হইয়া বিষাদের সঙ্গীত গাইয়া ফিরিতেছি, ভাই পাঠক, তুমি একবার দেখ। এই পতিত, গলিত, ঘৃণিত সন্তানের উদ্ধারের জন্য সকলে একবার প্রার্থনা কর।

সামাজিক ব্যাধি। (২য়)

চিকিৎসার ব্যবস্থা—শৈশবের শিক্ষা।

পূর্ব্ব লিখিত প্রবন্ধে যুবক যুবতীদিগের নীতির বিকারকে সামাজিক ব্যাধি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, এবং সেই ব্যাধির কারণ-নির্ণয় করিতে গিয়া প্রধানত তিনটী কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। সে তিনটী কারণ বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড ও এদেশ, উভয় পক্ষে খাটিতেছে। (১ম) কারণ সহরে অরক্ষিত অবস্থাতে বাস, (২য়) কারণ, গৃহে ও পরিবার মধ্যে তৃপ্তির অভাব। (৩য়) কারণ বাল্যকালে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার অভাব। এই ত্রিবিধ কারণ ব্যতীত এদেশীয় যুবকদিগের নীতি

দূষিত হইবার আর একটী কারণ আছে, তাহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সেটী—দূষিত সাহিত্য। দূষিত সাহিত্যের দ্বারা সামাজিক নীতিকে যতদূর বিকৃত করে, এমন অতি অল্প কারণে করিয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমান রঙ্গভূমিগুলিকে আমাদের যুবকদিগের নীতি-বিকারের একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, কিন্তু অনিষ্ট-কারিতা সম্বন্ধে দূষিত সাহিত্যের সহিত রঙ্গভূমির তুলনাই হয় না। এক জন যুবককে রঙ্গভূমিতে যাইতে হইলে প্রকাশ্যভাবে আর দশজনের সঙ্গে যাইতে হয়; অভিভাবকগণ যদি বিরোধী হন, তবে তাহার পক্ষে গোপনে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু একজন যুবক এক খানি কুৎসিত, বিকৃত-রুচিসম্পন্ন পত্রিকা বা গ্রন্থ দ্বার বদ্ধ করিয়া পড়িতেছে, সেখানে কে তাহাকে বারণ করিবে? আমাদের বালক বালিকাগণ কোথায় কোন গ্রন্থ দেখিতেছে ও কোথায় কোন গ্রন্থ পড়িতেছে, তাহার উপর চক্ষু রাখা অভিভাবকদিগের পক্ষে সহজ নহে। এই কারণে কুৎসিত সাহিত্যের দ্বারা যে অনিষ্ট হয়, তাহা নিবারণ করা দুষ্কর। বর্ত্তমান সময়ে বড় বড় সহরে বহুজন সমাগম হওয়াতে ও গোকুলের হত্যা ও দুর্দ্দশা ঘটাতে, দুগ্ধ নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে অনেক ব্যবসায়ী লোক দুগ্ধের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া শিশুদিগের আহারোপযোগী পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছে ও তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু রাসায়নতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল পদার্থে এমন দ্রব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা আহার করাইলে শিশুদিগের দেহে উৎকট পীড়ার বীজ সকল নিহিত হইতে পারে। এইরূপে চতুর ও ধর্ম্মভয়-বিহীন ব্যবসায়িগণ তৈল ঘৃত প্রভৃতি প্রতিদিনের ব্যবহৃত সমুদায় দ্রব্যেরই নকল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। তদ্দ্বারাও লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এই সকল প্রবঞ্চক লোককে ধরিয়া বিচারালয়ে আনয়ন করা হয়; এবং দেশের প্রচলিত রাজবিধি অনুসারে তাহাদিগের সমুচিত দণ্ডও হইয়া থাকে। আমরা যখন সংবাদ পত্রে এই সকল প্রবঞ্চনার কথা পাঠ করি, তখন আমাদের কতই ঘৃণার উদয় হয় এবং ঐ সকল লোকের দণ্ড হইলে আমরা কত পরিতোষ লাভ করি। কিন্তু যে প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী সামান্য অর্থ লোভে মানবের খাদ্যের সঙ্গে বিষাক্ত বস্তু মিশ্রিত করে, শিশুদিগের পানীয় দুগ্ধের মধ্যে পীড়াজনক পদার্থ সন্নিবিষ্ট করে, তাহার অপেক্ষা কুৎসিত সাহিত্যের লেখক ও প্রকাশক কি কম নিন্দনীয়? একখানি কুৎসিত গ্রন্থ পাঠ করিলে বা একখানি কুৎসিত ছবি দেখিলে একজন যুবক বা যুবতীর মনে যে কি অসাধুতার বীজ নিহিত হইতে পারে, তাহা কি কেহ অনুভব বা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? এক জন বিখ্যাত লোক বলিয়াছেন যে, তাঁহার পঠদ্দশায় তাঁহার এক জন সমাধ্যায়ী তাঁহাকে গোপনে একখানি অতিশয় অশ্লীল গ্রন্থ পড়াইয়াছিল, সেই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় গুলি তাঁহার কল্পনাকে এতদূর দূষিত করিয়াছিল যে, তৎপরে তিনি যখন দেশ মধ্যে সম্ভ্রান্ত হইয়াছেন ও যখন নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে লিপ্ত আছেন, যখন ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধনে তাঁহার

মন সুদৃঢ়-রূপে আবদ্ধ হইয়াছে, তখনও মধ্যে মধ্যে সেই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সকল তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিয়াছে। একজন সমাধ্যায়ী বালক অপর একটী বালককে গোপনে ডাকিয়া একখানি অতি কুৎসিত ছবি দেখাইল। সেখানি তাহার কল্পনাকে এতদূর উত্তেজিত করিল যে, জন্মের মত তাহার স্মৃতিতে ঐ ছবি খানি মুদ্রিত হইয়া রহিল। তৎপরে যখনই সেই ব্যক্তি প্রলোভনে পড়িবে, ও তাহার চিত্ত বিকার উপস্থিত হইবে, তখনই সেই ছবি স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিবে ও সেই কল্পনাকে জাগাইয়া তুলিবে। মানবের ইন্দ্রিয় বিকারের গূঢ়-তত্ব যাঁহারা নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, মানবের পতনের পূর্ব্বে কল্পনাই তাহার পথ প্রস্তুত করে। স্মৃতি ও কল্পনাতে সুখের ছবি অগ্রে উদিত হয়, তদনন্তর মন সেই প্রলোভনে পতিত হয়। অতএব সামাজিক নীতির রক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে যাঁহারা উৎসুক, তাঁহাদিগকে দেশের সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে।

যুবকদিগের দুর্নীতির চতুর্ব্বিধ কারণ উল্লেখ করিয়া এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, এই চতুর্ব্বিধ কারণের প্রতিবিধান কিরূপে করা যায়? কিন্তু এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে আর দুইটী বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম, যে মানব আপনাকে আপনি রক্ষা করে, সেই সুরক্ষিত হয়। যদি আমাদের যুবক যুবতীদিগের মনে সেই সৎপ্রতিজ্ঞা প্রবল না থাকে, যদ্দ্বারা মানব এই প্রলোভন পূর্ণ-সংসারে আপনাকে সুপথে রাখিয়া চলে, তবে কি সামাজিক শাসন, কি গুরুজনের ভয়, কিছুতেই তাহাদিগকে সুপথে রাখিবে না। দ্বিতীয়ত, জনসমাজের যেরূপ অবস্থা ও ইহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে ইহাতে বাস করিয়া আমাদের বালক বালিকাগণ সৎ ও অসৎ দুই দেখিবে। তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে গৃহ মধ্যে বদ্ধ রাখা সম্ভব নয়, এবং সম্ভব হইলেও প্রার্থনীয় নয়। তদ্দ্বারা কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই ঘটে। সদসত্তের সংগ্রাম ক্ষেত্রে পড়িয়া জয় লাভ না করিলে, কি পুরুষ কি রমণী, কাহারও চরিত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ন্যস্ত হয় না। সুতরাং এইরূপ আশা করিতে হইবে যে, বালক বালিকাগণ যখন সমাজে মিশিবে, তখন ভাল মন্দ দুই শুনিবে, দুই দেখিবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু এমন কিছু ভাব তাহাদের অন্তরে প্রবল করিয়া দেওয়া আবশ্যক, যদ্দ্বারা তাহারা সৎকেই আলিঙ্গন করিবে ও অসৎকে বর্জ্জন করিবে। ইহাও সেই আপনার দ্বারা আপনাকে রক্ষা করা। আমরা সময়ে সময়ে দেখিয়াছি, একটী বালক বা বালিকা, যাহার প্রকৃতিতে অসাধুতার বীজ নিহিত আছে, দশদিন অপর দশটী সৎপ্রকৃতির বালক বালিকার সহিত বাস করিতেছে, তাহাদের সদ্দৃষ্টান্ত হইতে কোন উপকার লাভ করিতে পারিতেছে না; কিন্তু এক দিন দুই ঘণ্টার জন্য অপর একটী বালক বা বালিকার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহারও প্রকৃতি অসৎ, অমনি, চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে, সেই রূপ দেখি, দুইটীতে মিশিয়া গিয়াছে।

এই জন্যই আমাদের দেশের একটী চলিত কথাতে বলিয়া থাকে—"আকরে টানে" অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি যেমন পদার্থে, সে সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে শৈশবের শিক্ষার দিকে প্রবলরূপে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যই এই যে, আমরা শিশুদিগের অন্তরে এমন কিছু বীজ নিহিত করিয়া দিব, যাহার গুণে উত্তর কালে তাহারা সৎ ও অসৎ, উভয়ের মধ্যে সংকেই বরণ করিবে এবং অসৎ যাহা তাহাকে ঘৃণা পূর্ব্বক দূরে পরিত্যাগ করিবে। এখন প্রশ্ন এই, শৈশবকালে কিরূপে এই প্রকার শিক্ষা দেওয়া যায়? এবিষয়ে দুইটী কথা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম, শিশুদিগের মনে ধর্ম্ম ও নীতির স্থূল ২ নিয়ম সকল সুদৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। (২য়) দ্বিতীয়ত তাহাদের অন্তরে সাধুতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল করিয়া দিতে হইবে। যদি এই দুই পদার্থ তাহাদের অন্তরে দিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি, তবে উত্তরকালে তাহারা সংসার প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু এ দুইটী তাহাদের অন্তরে কিরূপে নিহিত করা যায়? এবং কেহ কেহ এরূপও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কোন গৃহস্থের গৃহ এমন আছে যেখানে শিশুদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির স্থূল স্থূল নিয়ম সকল শিক্ষা দেওয়া হয় না? অথবা যে খানে তাহাদের সাধুতার পথে আশ্রয় করিতে উৎসাহিত করা হয় না? "তুমি মিথ্যা কথা বলিও না, তুমি পরের দ্রব্য চুরি করিওনা, তুমি পরশ্রী দেখিয়া কাতর হইওনা, ইত্যাদি উপদেশ কোন গৃহস্থের গৃহে সন্তানদিগকে শুনান হয় না? যে ব্যক্তি নিজে পাপাচারী, ইন্দ্রিয়াসক্ত বা দুষ্ক্রিয়ান্বিত, সেও ইচ্ছা করে যে, তাহার সন্তানগণ সে পথ আশ্রয় না করে, সুতরাং সে ব্যক্তিও নিজ গৃহের শিশুদিগকে নীতিমার্গ অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকে। তবে কেন আশানুরূপ ফল দর্শিতেছে না? আমরা বহুদিন শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইয়া নিজেরা একটী শিক্ষালাভ করিয়াছি। সে শিক্ষাটী এই;—বাচনিক শিক্ষা অপেক্ষা পারিবারিক পবিত্র বায়ুতে থাকার ফল অধিক, অর্থাৎ মনে কর, আমি বাড়ীর দশটী বালক বালিকা একত্র করিয়া বসাইলাম, বলিলাম, তোমরা স্থির হইয়া শুন, তোমাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে কিছু উপদেশ দিব। তাহারা গম্ভীর হইয়া বসিল; আমিও গম্ভীর ভাবে মিথ্যা কথার দোষ উল্লেখ করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলাম। বক্তৃতা শেষ হইলে তাহারা খেলিবার জন্য গেল, আমিও বিষয়ান্তরে গমন করিলাম। এরূপ ভাবে ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ দেওয়াতে যে একেবারে কোন ফল হয় না, তাহা বলি না, কিন্তু ইহাতে তাহাদের অন্তরে নীতি ও ধর্ম্মের নিয়ম সকল যেরূপ দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত না হয়, তাহারা পার্শ্বে থাকিয়া পিতা মাতার যে চরিত্র প্রতিদিন লক্ষ্য করে, তন্মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মের জীবন্ত ভাব যদি বিদ্যমান থাকে, তদ্দ্বারা তদধিক হইয়া থাকে। শিশুরা যদি দেখিতে পায়, তাহাদের পিতা মাতার সাধুতার প্রতি আন্তরিক আদর ও অসাধুতার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা; কেবল যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহারা

সাধুতার কথা বলেন, তাহা নয়, কিন্তু কোন প্রকার অসাধুতা দেখিলে তাহারা আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং দেশের সমুদায় সাধুলোককে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের মনে সাধুতার ভাব এমন দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয় যে, তাহা তাহাদের মানসিক গঠনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

সংক্ষেপত এই জানিতে হইবে যে, পিতা মাতা সৎ সত্য-প্রিয় ও ঈশ্বর-পরায়ণ হইলে, পরিবার মধ্যে স্বভাবত যে পবিত্র বায়ু বহিয়া থাকে, তাহাতে থাকিয়াই শিশুরা নীতি ও ধর্ম্মে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মৌখিক উপদেশ যে প্রয়োজনীয় নহে, কেহ এরূপ মনে করিবেন না। উপদেশের অভাবে নীতি ও ধর্ম্মের নিয়মগুলি দৃঢ়রূপে তাহাদের হৃদয়ে প্রোথিত হইবে না; জনক জননীর চরিত্রে প্রকৃত সাধুতা থাকিলে ও সাধুতার প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, সন্তানেরা স্বভাবত সাধু হইবে। কিন্তু আমরা এই প্রলোভনপূর্ণ জগতে এমন সাধুতা চাই, যাহা জন-সমাজের পাপ রাশির সহিত সংঘর্ষণে টেঁকিতে পারে। সেইরূপ সাধুতা পাইতে হইলে, শৈশব কালেই নীতি ও ধর্ম্মের নিয়মগুলিকে বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেজন্য উপদেশের প্রয়োজন। এই উপদেশ চারি প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম, পরিবার মধ্যে। আর তোমাদিগকে নীতির উপদেশ দিব বলিয়া খেলা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া এক স্বতন্ত্র ঘরে লইয়া গেলাম, তাহারা গম্ভীর ভাবে বসিল, আমিও গম্ভীর ভাবে বসিলাম; তৎপরে এক ঘণ্টাব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করা গেল। বক্তৃতান্তে পিতা ও সন্তান উভয়েই নিষ্কৃতি পাইল। উপদেশ দিবার এ প্রণালী নহে। পরিবার মধ্যে শিশুদিগকে দুই প্রকারে উপদেশ দিতে হইবে। (১) জননী গল্পের দ্বারা উপদেশ দিবেন। উপকথা, পৌরাণিক আখ্যায়িকা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সাধু ও বীরদিগের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি সকল বর্ণনাদি করিয়া তিনি শিশুদিগের চিত্ত বিনোদন করিবেন; অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব সকল তাহাদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবেন। দুর্ভাগ্যবশত যে যে পরিবারে জননীগণ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সেখানে শিশুদিগকে গল্প বলার প্রথা একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। শিশুরা সন্ধ্যাকালে গল্প শুনিবার জন্য ধরিলে শিক্ষিতা জননীরা বিষম লেঠা বলিয়া বোধ করেন ও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ইহার কারণ বেঙ্গমা বেঙ্গমী পাখীর গল্প, পক্ষীরাজ ঘোড়া ও তালপত্রের খাঁড়ার গল্প, এক-নড়ের গল্প, প্রভৃতি যে সকল উপকথা দেশ মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা বলিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না; নূতন গল্পও কিছু জানেন না, এই জন্য কাজেই শিশুদিগকে তাড়াইতে হয়। (২) গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যেমন উপদেশ দিতে হইবে, সেইরূপ তাহাদের প্রতি দিনের কাজ ও খেলার সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিতে হইবে। যখন কোন শিশু কোন অপরাধে ধৃত হয় ও জনক জননীর নিকট শাস্তি লাভ করে, বা অপর কোন শিশুর দুষ্টতার জন্য নিজে ক্লেশ পায়, সেই সকল সময়ে তাহাদিগকে যে সকল কথা বলা যায়, তাহা তাহাদিগের বিশেষ

মনে থাকে। এই সকল সময়ে নীতি ও ধর্ম্মের মূল নিয়ম সকল তাহাদের মনে মুদ্রিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, পরিবার মধ্যে জনক জননী যে উপদেশ দিবেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশে তাহা আরও দৃঢ়ীভূত হইবে। শিক্ষক মহাশয় বা মহাশয়রাও যেন নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে অগ্রসর না হন। তাহাদিগকে প্রতি দিনের পাঠ দিতে দিতে এমন সকল কথা আপনি উঠিবে, যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে অনেক উপদেশ দিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। সেই সকল সুযোগ ছাড়িবেন না। তৎপরে বিদ্যালয়ে যখন তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিবে ও খেলা করিবে, সে সময় তাহাদের প্রতিদৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহারা এমন কাজ অনেক করিবে, যাহাতে উপদেশ আবশ্যক হইবে। সেই সকল সময়ে উপদেশ দিলে তাহা চির দিন স্মরণ থাকিবে।

তৃতীয়—শিশুগণ পরিবার মধ্যে ও বিদ্যালয়ে যে উপদেশ পাইবে, তদ্ভিন্ন প্রত্যেক রবিবারে এক এক স্থানে শিশুদিগকে একত্র করিয়া নীতি বিদ্যালয় খোলা যাইতে পারে। শিশুদিগকে একত্র করিলে তাহাদের কত আনন্দ হয়! তাহারা পরস্পরের সহিত বন্ধুতা করিয়া কত সুখী হয়। এই সকল সময়েও গল্পাদির দ্বারা নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে। তদ্দ্বারা নিয়ম সকল তাহাদের অন্তরে সুদৃঢ় রূপে প্রোথিত হইতে পারে।

চতুর্থ—সর্ব্বোপরি শিশুদিগের জন্য সহজ সুবোধ ভাষার পুস্তক, পুস্তিকা প্রচার আবশ্যক। এই সকল পুস্তক ও পুস্তিকার লক্ষ্য এই থাকিবে যে, শিশুরা সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবে।

এই সকল উপায়ে শৈশব কাল হইতেই বালক বালিকাদিগের অন্তরে নীতি ও ধর্ম্মের নিয়ম সকল সুদৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; তাহা হইলেই তাহারা উত্তর কালে আপনাদিগকে আপনারা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

টমকাকার কুটীর।—দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধীয় উপন্যাস; ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ; মূল্য ২৷৷০, ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। আঙ্কেল টমস্ কেবিন নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক যিনিই হউন, তিনি আমাদিগের এবং বাঙ্গলার সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই অপূর্ব্ব পুস্তক খানি নানা দেশের নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এতদিন পরে বাঙ্গলাভাষায় পুস্তকখানিকে রূপান্তরিত দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এইরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা না করিতে পারিলে মনের ক্ষোভ মিটে না, কিন্তু নব্যভারতে নিতান্ত স্থানাভাব। আমরা আশা করি, সর্ব্ব সাধারণে এই পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া অনুবাদকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন। পুস্তকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। পুস্তকের মূল্য কিছু অল্প হইলে ভাল হইত। কারণ ইংরাজি পুস্তকখানি ৷৷০ হইলেই লওয়া যায়।

স্থানাভাবপ্রযুক্ত এবারেও সমস্ত সমালোচনা গেল না; গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (২য়)

চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা

চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ ছিল, তখন কোন্ কোন্ আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ইহা পরিচালিত হইতেছিল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুধর্ম্মের উত্থান, বিস্তার ও অধঃপতন বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সে জন্য আমরা সে বিষয়ের স্থূল স্থূল বিবরণ বিবৃত করিয়া পরে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিব।

শক্তি উপাসনাই মানব হৃদয়ের প্রথম ধর্ম্মভাব, একথা স্থির সিদ্ধান্ত। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় জড় জগতের যে কোন পদার্থের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়, তাহাই তখন অলৌকিক ঐশীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়; সুতরাং তত্তৎ বস্তুকে মানুষ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করিয়া থাকে। সমস্ত মানবজাতির আদিম ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের আর্য্য-পূর্ব্ব-পুরুষগণ এদেশের আদি নিবাসী ছিলেন না। যখন তাঁহারা মধ্য-আসিয়া হইতে ভারতসীমায় পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহারা এই ধর্ম্মভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তজ্জন্যই আমরা ঋগ্বেদের প্রথমে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" প্রভৃতি সূক্ত সকল দেখিতে পাই। তাঁহারা শীত প্রধান দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নির প্রভাব ও উপকারিতা বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন। সেজন্য তৎকালে অগ্নিই তাঁহাদের প্রধান দেবতা ছিল। পরে ভারতে আসিয়া যতই তাঁহারা প্রকৃতির বৈচিত্র্য দেখিতে লাগিলেন, শ্যামল শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সকল, সুবিশাল তরঙ্গময়ী স্রোতঃস্বতী নিচয়, নানাবর্ণে সুরঞ্জিত মেঘমালা ও নানাজাতীয় সুগন্ধ ও সুন্দর কুসুমাবলী প্রভৃতি এখানকার বিচিত্র পদার্থপুঞ্জ যতই তাঁহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, তাঁহাদের দেবতার সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালক্রমে আর্য্যঋষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি জড় পদার্থসকলে দেবত্ব নাই; কিন্তু ঐ সকল পদার্থের অন্তরালে এমন এক একটী শক্তি অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করিতেছে যে, তাহারই প্রভাবে ঐ সকল ভৌতিক পদার্থ এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী হইয়াছে। এই রূপে জড় পদার্থ হইতে জড়ের আধারভূত পৃথক পৃথক শক্তিতে দেবত্ব আরোপিত হইল। তখন ইন্দ্র, বরুণ, পবন, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি অসংখ্য বৈদিক দেবগণ এক একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদসংহিতার আদিদেবগণ জড় জগতের প্রাকৃতিক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু পরোবর্ত্তী মন্ত্র সকলে আবার ঐ সকল দেবতার দেবত্ব। সেই সেই পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির প্রতি আরোপিত হইয়াছে। জড়ময় অগ্নিই ঋগ্বেদের প্রথম দেবতা, কিন্তু উত্তরকালে জড়কে পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্তরালবর্ত্তিনী শক্তিতে অগ্নির দেবত্ব নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কালসহকারে আর্য্যগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই সকল দেবতা কখন অনুকূল, কখন প্রতিকূল। কখন কালে বৃষ্টি হইয়া শস্যাদি জন্মায়, আবার কখন অতি-বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইয়া শস্যসকল বিনষ্ট হয়। তখন ঐসকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করা, তাহাদের অত্যাচার ও প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল সেজন্য নানাপ্রকার যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম. বলিদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পদ্ধতি সকল রচিত হইতে লাগিল। পরিশেষে বেদ-সকলের মন্ত্র, সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়া একটী সুবিস্তীর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পরিণত হইল।

এইরূপে যুগ যুগান্ত চলিয়া গেল, আর্য্যগণ ক্রমেই অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং গভীর চিন্তা ও গবেষণায় নিমগ্ন হইয়া জীবতত্ব ও ঈশ্বর-তত্বান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে ভারতে উপনিষদের যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর্য্য মহর্ষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, যে অসংখ্য শক্তির দ্বারা এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, তাহা পৃথক পৃথক দেবতার পৃথক পৃথক শক্তি নহে, তাহা একই কেন্দ্র স্থান হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সমস্ত বিশ্ব মণ্ডলে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে শক্তি হইতে অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে ও যাহা হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আধার একই। এই ভাবটী যেই হৃদয়ঙ্গম হইল, অমনি তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন যে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাস স্বতদ্‌ব্রহ্ম।" ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, এই আদ্যাশক্তি বা ব্রহ্ম-শক্তি কেবল জড়শক্তিনিচয়ের নিদানভূতা নহেন, তাঁহাতেই সমস্ত জ্ঞান, চৈতন্য, আনন্দ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ও প্রাণীবৃন্দের প্রাণও তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত আছে। তিনি অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয় ও এক। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হওয়া মাত্র আর্য্যগণ বলিয়া উঠিলেন যে———

"বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।

এক্ষণে বহু সহস্র শতাব্দী পরে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে তত্ব লাভ করিতে কতই যত্ন করিতেছেন, এবং যাহার অল্প-ভাস পাইয়া যাহাকে জড়শক্তি, কেহ বা অজ্ঞেয় শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কত যুগ পূর্ব্বে সেই মহান্ তত্ব লাভ করিয়া অতি দার্ঢ্য সহকারে বলিয়া গিয়াছেন যে "বেদাহ মেতং" আমি নিশ্চয় রূপে জানিয়াছি। হায়! আমাদের কি দুরদৃষ্ট যে, আমরা তাঁহাদেরই বংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দি; অথচ তাঁহাদের সঞ্চিত রত্নকে পদ দ্বারা দলিত করিতে লজ্জিত হই না;

এই রূপে আর্য্যসমাজে ঈশ্বরতত্ব নির্ণীত হইল বটে; কিন্তু তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইল না। কতিপয় চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যতীত জন সাধারণে এই মত গ্রহণ করিল না। এক্ষণকার ন্যায় প্রচার করিবার জন্য যে কোন চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় না। বর্ত্তমান্ সময়ে

যেরূপ দেশ সাধারণে শিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সময়ে সেরূপ সাধারণ শিক্ষার নিয়মও কিছু ছিল না। সুতরাং শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে এই ধর্ম্ম মত যে অপ্রচারিত থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আপামর সাধারণ লোক পূর্ব্বের ন্যায় জড় পূজক ও কুসংস্কারাবিষ্ট থাকিয়া গেল। এই ভাবে বহু কাল কাটিয়া গেল, ভারত ধর্ম্ম শূন্য হইয়া পড়িল এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অভাবে কতিপয় যাগ, হোম, বলিদান প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানই তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের যুগের অন্তর্ধান এবং পৌরাণিক যুগের অভ্যুদয় হইল।

খ্রীষ্ট জন্মিবার ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি দেখিলেন যে, এত যাগ যজ্ঞ করিয়াও মানুষ শান্তি পাইতেছে না। ইহার কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া রাজপুত্র গৃহসংসার সকলই পরিত্যাগ করিলেন এবং সাংসারিক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর তপস্যা-ব্রত গ্রহণ করিলেন। ভগবৎস্বেচ্ছায় কালক্রমে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি বাসনানিবৃত্তিকেই পরমধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। ক্রমে তাঁহার ধর্ম্ম দিগদিগন্ত ব্যাপী হইয়া উঠিল এবং তাহার প্রবল তরঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম যায় যায় হইয়া পড়িল। তখন ব্রাহ্মণাচার্য্যগণ অনন্যোপায় হইয়া জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য অভিনব তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অমনি অসংখ্য পুরাণ ও উপপুরাণ সকল রচিত হইয়া দেশময় ব্যাপিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা এই সকল পুরাণের দ্বারা এখন এইমত প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বর বাক্যমনের অগোচর, নিরাকার ও নির্ব্বিকার হইলেও সাধকের সাধনাসিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে মূর্ত্তি বিশেষ পরিগ্রহ করত জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সুতরাং এই সকল মূর্ত্তি পূজা করিলেই ঈশ্বরের পূজা করা হইল; এবং তাহাতেই মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়াস্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।"

যমদগ্নি।

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, অংশরহিত এবং অশরীরী হইলেও সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। নিরাকার-বাদীগণ এই শ্লোকের 'কল্পনা' শব্দের অবস্তুতে বস্তুত্ব আরোপ করা অর্থ করিয়া সাধক কর্ত্তৃক ঈশ্বরের রূপ স্বকপোলকল্পিত হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সাকার-বাদিগণ 'কল্পনা' অর্থে 'পরিগ্রহ' ধরিয়া সাধকের সাধন সৌকর্য্যার্থে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সাকাররূপ গৃহীত হইয়া থাকে, এই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এবং এই মূল সূত্র ধরিয়া অবতারবাদ ও ঈশ্বরবিগ্রহের নিত্যসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। যাহা হউক, এইমত সংস্থাপিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে যৌদ্ধদিগকে এদেশ হইতে উন্মূলিত করিতে সক্ষম হইলেন। সেই সময় হইতে নানাপ্রকার উপাসনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের এক একটী শক্তিকে এক একটী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, অথবা ক্ষমতাশালী ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষে ঐশীশক্তি ও ঐশী গুণ

আরোপ করিয়া নানাপ্রকার রূপকালঙ্কার ও অত্যুক্তিতে পূর্ণ করত দেবোপাখ্যান সকল রচিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব, এই পাঁচটী প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া আর্য্যগণ বহুবিধ উপধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে ষষ্টীমাখাল প্রভৃতিও দেবাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া তেত্রিশ কোটী দেবতার দুর্ভেদ্য দুর্গ সংগঠিত হইয়া উঠিল। বড় আশ্চর্য্যে বিষয় এই যে, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন সাংসারিক অভাব মোচন ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধন জন্য প্রথমে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় ও পরে যেমন সে, সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, অর্থকেই সার বস্তু জ্ঞানে রাশি রাশি সঞ্চয় করিয়া সুখানুভব করিতে থাকে; তদ্রূপ আর্য্যব্রাহ্মণগণ মূর্ত্তিপূজাকে পরমার্থসাধনের সহজ উপায় বলিয়া জনসাধারণে প্রবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে তাহাকেই সারবস্তু করিয়া প্রকৃত পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন!

এই পাঁচটী উপাসক সম্প্রদায়মধ্যে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতই প্রধানতঃ গৃহীত হইয়াছিল। এই যুগের শাক্তগণ আর উপনিষদের সময়ের শক্তিপূজকদিগের ন্যায় জড়প্রকৃতির অন্তরালে সেই আদ্যাশক্তিকে দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদের উপাস্য আর অসীম আকাশে ও মানবের অন্তরাত্মায় তেজোময় অমৃতময় রূপে প্রকাশিত হয়েন না, তাঁহাদের ভগবতী এখন মৃণ্ময়ী বা পাষাণময়ী জড়মূর্ত্তিতে পরিণতা। তাঁহারা এক্ষণে শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, দেবাসুরের যুদ্ধ ও মধুকৈটভরক্তবীজবধোপাখ্যান সকল প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কাহার সাধ্য যে সে সকলের অবান্তর ব্যাখ্যা করে? সেই হইতে অবতারবাদের ও মূর্ত্তি পূজার ভাব দৃঢ়তর কুসংস্কাররূপে ভারতবাসীর হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

শক্তিমন্ত্র সাধন ও তাহাতে সিদ্ধি লাভের জন্য এই সময়ে আবার নানাপ্রকার তন্ত্র শাস্ত্র সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সকল তন্ত্র কাহা কর্তৃক কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া জানিবার উপায় নাই। কারণ অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় এই সকল শাস্ত্রে গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল তন্ত্রই শিববাক্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, এই সকল তন্ত্র অতি আধুনিক। শিববাক্য বলিলে সকলের আশু বিশ্বাস ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবেন বলিয়া, গ্রন্থকারগণ স্বস্ব নাম অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এই সকল তন্ত্র যে কেবল একজনের লেখনীসম্ভূত, ইহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। নানা সময়ে নানা ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হইয়াছে, ইহাই ঠিক যুক্তি।

তন্ত্র সকলের অভ্যুদয় কাল হইতেই শাক্তসম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। এক দল পূজা, হোম, বলিদান করিয়াই কান্ত;. অপর দল সুরা ও গণিকা পর্য্যন্ত লইয়া সাধন আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম ব্যভিচারের চরমদৃষ্টান্ত দেখাইলেন। প্রথমোক্তগণ পশ্বাচারী, অর্থাৎ তাঁহারা মদ্য ও গণিকা ব্যবহার করেন না বলিয়া পশু-প্রকৃতি, আর শেষোক্তগণ বীরাচারী বা বামাচারী বলিয়া আখ্যাত হইলেন। অধিকাংশ তন্ত্রই বীরাচার মত সমর্থন করি-

য়াছে। কেহ কেহ বলেন যে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার অর্থাৎ মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনের পাঁচটী উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। যাহাই থাকুক না কেন, তান্ত্রিক সাধকদিগকে দেখিলে, সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মই যে প্রবল ছিল এবং শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগের উপর যে বিবিধ অত্যাচার করিত, বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া,
কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল,
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্ত চন্দন, তণ্ডুল।
মদ্য ভাণ্ড পাশে রাখি নিজ ঘরে গেল।"

চৈঃ চঃ

শাক্তগণ যেমন ঈশ্বরের রুদ্রভাব ও ধ্বংশকারিণী শক্তিকে অবলম্বন করত আপনাদের উপাস্যদেবতার গঠনকল্পনা করিলেন, স্বত্ব গুণাবলম্বী বৈষ্ণবগণ সেই রূপ তাঁহার পালনী ও স্থিতিকারিণী শক্তি লইয়া বিষ্ণু পূজার মত প্রচার করিলেন। কাল সহকারে এই মত সর্ব্বত্র আদৃত হইতে লাগিল, এবং সাত্বিক ভাবের লোক সকল ইহাতে যোগদান করিলেন। তখন ভক্তি-প্রবণশাস্ত্র সকল বিরচিত হইয়া জন সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল। বিষ্ণু পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, হরিবংশ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র এই যুগের ধর্ম্মান্দোলনের ফল। ক্রমে বিষ্ণুর দশাবতার ও মর্ত্ত্যলীলা সকল ব্যাখ্যাত হইল এবং বিষ্ণু ও তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি, মনোমোহনকারী পরম সুন্দর দেবাকারে পরিণত হইলেন। বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবগণও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যদেশে বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য, সম্প্রদায় সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নিয়মবদ্ধ আকারে পরিণত করিলেন। বোধ হয় ব্যভিচারী শাক্তদিগের অত্যাচার হইতে জনগণকে রক্ষার জন্য সম্প্রদায়প্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

"পর মত বিরুদ্ধাংশে ছেদন করিয়া
স্বমত যাথার্থ্যস্থাপে বিচার করিয়া।"

ভক্তমাল।

চারিটী সম্প্রদায়ের নাম শ্রী, চতুর্ম্মুখ, রুদ্র ও চতুঃসন। শ্রীসম্প্রদায়ের আদিগুরু রামানুজস্বামী, চতুর্ম্মুখ সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্যের স্থাপিত, বিষ্ণু স্বামী রুদ্রসম্প্রদায়, এবং নিম্বাদিত্য চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণূপাসক ছিলেন; কিন্তু পরস্পরে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। রামানুজ সম্প্রদায় রামের এবং মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী কৃষ্ণের প্রাধান্য মানিয়া থাকেন। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই শুদ্ধাচার, অহিংসা, ভক্তি প্রভৃতি সাত্বিক ধর্ম্ম সকল শিক্ষা দেন। সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব সকলেই গৃহত্যাগী উদাসীন। তাঁহারা একটী একটী দল বাঁধিয়া গুরুর অধীনে বাস করিতেন, এবং দেশপর্য্যটনে অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন। ইহারা যে যে স্থানে থাকিতেন, তাহাকে মঠ বলে। এক্ষণেও রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব আছেন, কিন্তু প্রথমকালের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্মের আর আধ্যাত্মিক ভাব নাই। নানাপ্রকার কদাচার ও কদনুষ্ঠান ইহা-

দের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সম্প্রদায় ধর্ম্ম এক সময়ে এরূপ প্রবল হয় যে, সম্প্রদায়বিহীন হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মই গ্রহণ করা হয় না. এই বিশ্বাস বৈষ্ণব জগতে বদ্ধ মূল হইয়াছিল। বোধ হয় এই বিশ্বাস হেতু চৈতন্য দেবকেও সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে মধ্বাচার্য্য মটের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

"বিনা সম্প্রদায় গুরু উপদেশ বার্থ ;
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু না যায় অনর্থ।"
ভক্তমাল।

সম্প্রদায় ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই প্রথমত ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম্মের উদয় হয়। মাধবেন্দ্র পুরী, যামুনাচার্য্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ পরম ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনে যে নদীর প্রথম প্রস্রবণ উন্মুক্ত হয় এবং যাহা পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া মৃদু মন্দগতিতে বহিতে বহিতে শ্রীবাস, অদ্বৈত ও হরিদাস প্রভৃতির হৃদয় ক্ষেত্র অভিষিক্ত করে, সাগর সদৃশ চৈতন্য হৃদয়ের বিপুল ফোয়ারা খুলিয়া গিয়া তাহারই কলেবর বৃদ্ধি করত এক মহাপ্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল। সম্প্রদায়ীগণের ঈশ্বর বিশ্বাস কি রূপ উজ্জ্বল ছিল, তাহা যামুনাচার্য্য কৃত নিম্নোদ্ধৃত স্তোত্রটী পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে।

"উল্লংঘিত ত্রিবিধ সীম সমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরি ব্রঢ়িম স্বভাবং
মায়া বলেন ভবতাপি নিগুহ্য মানং
পশ্যন্তি কেচিদমিশংত্বদনন্য ভাবাঃ।"
অলকমন্দার স্তোত্র।

হে ভগবান্! আপনার গোপনীয় চরিত্র স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সীমার পরাকাষ্ঠা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে এবং আপনি ও মায়াবলে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ; কেবল আপনাতে অনন্য ভাব ভক্তেরাই তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত পাঠে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রথম স্থাপিত হয়। বিষ্ণু পূজার পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্প্রদায়ীগণ কেবল তাহারই মত সকল লইয়া এক একটী পৃথক দল গঠন করেন ; এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাব কালক্রমে বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়ে। সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব গোস্বামী কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। তবে সম্প্রদায়ীগণের ভাবের সহিত ঐ ভাব মিশিয়া গিয়া একটী অভিনব আকার ধারণ করে। চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এই অভিনব ভাব লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাজন করিতেছিলেন। মধ্বাচার্য্য মঠের অধস্তন সপ্তম আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরী দেশ পর্য্যটন উপলক্ষে এদেশে আগমন করত অদ্বৈতকে ভক্তির ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যান ; তদবধি প্রেমভক্তির অনন্ত ভাব সকল অদ্বৈতান্তঃকরণে উদ্দীপিত হইতেছিল।

"তাঁর ঠাঁই উপদেশ করিলা গ্রহণ,
হেনমতে মাধবেন্দ্র অদ্বৈত মিলন।"
চৈঃ ভাঃ।

তৎকালে অদ্বৈতভবনেই বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইতেন। অদ্বৈতাচার্য্যের টোল ছিল ; সেখানে অধ্যাপনা উপলক্ষে তিনি ভক্তি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। যবন কুলোদ্ভব ভক্ত হরিদাস যবন কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহারই বাটীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গসমাজ যে বৈষ্ণব

ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকে ভক্তি ও বিশ্বাসশূন্য লোক গুলা ধর্ম্মের নামে কেবল কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বরে মত্ত হইয়া পরিত্রাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিয়া অদ্বৈত বড়ই ব্যাকুল হইতেন এবং কবে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ডীউদ্ধার করিবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন।

"বিষ্ণু ভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার,
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার।"

চৈঃ ভাঃ।

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ,
ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে যায় ভব রোগ।
লোক গতি দেখি আচার্য্য করুণ হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে গতি হয়?"

চৈঃ চঃ।

কথিত আছে যে, প্রেম ভক্তির বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অবতীর্ণ করাইবার জন্য তিনি সেই হইতে বিশেষ সাধনা আরম্ভ করিলেন ও আপনিও প্রাণপণ যত্নে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যাপনা ও নাম সংকীর্ত্তন প্রচার প্রভৃতি উপায় সকল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন যে, তাঁহারই সাধনার বলে পরোবর্ত্তী সময়ে স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"এই মতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার।"

চৈঃ চঃ।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতি তখন সর্ব্বদাই উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইত; এবং ইতর ভদ্র সকলেই বৈষ্ণবদিগকে উপহাস করিত। চৈতন্যভাগবতকার তখনকার ভাব অতি সুন্দর রূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

"হাততালি দিয়া যে সকল ভক্তগণ
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন;
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে,
'ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে?
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নারায়ণ;
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ?
সংসারী লোকেরে বলে মাগিয়া খাইতে;
ডাকিয়া বলয়ে হরি লোকে জানাইতে।
এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।'
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মেলিয়া।"

চৈঃ ভাঃ।

বৌদ্ধধর্ম্মের গতিরোধ জন্য যতগুলি অধ্যাত্মিক বল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদই প্রধান। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই শঙ্কর অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন এবং অল্প বয়সে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার মত এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; জীবের অস্তিত্ব কেবল মায়ামাত্র; মায়াত্যাগ হইলেই জীব ও ব্রহ্মে কিছুই প্রভেদ থাকেনা। এইভাবে তিনি সমস্ত বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিলেন। এক্ষণেও ঐ সকল শাঙ্করভাষ্য বেদবাক্যের ন্যায় মান্য হইয়া আসিতেছে। বোধ হয়, শিক্ষিত ও জ্ঞানীব্যক্তিদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করার জন্য এই মত উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিয়াছিল। তৎকালের পণ্ডিত সমাজে এইমত সম্মানিত হওয়ার পর, বৌদ্ধগণ পরাজিত হইয়া সমুদ্র পারে ও হিমালয়পারে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্যের পূর্ব্বে এইমত বহুল প্রচার হইয়াছিল। এইমতের বিরুদ্ধে তাঁহাকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে মত অব-

লম্বন করিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিধর্ম্ম বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আবার তাহারই মূলোৎপাটনে কৃতসংকল্প হইলেন। বৈষ্ণব সমাজে এই মত এতই দূষণীয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে যে, আজপর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণ শঙ্করের নাম শুনিবা মাত্র খড়্গহস্ত হয়েন। চৈতন্য "সোঽহং" 'তত্ত্বমসি' মত সকলের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও তর্ক দেখাইয়া কাশীবাসী পরমহংস ও সন্ন্যাসীগণকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন। তিনি উপনিষদ ও বেদসূত্রকে তত্ত্বজ্ঞানের আকর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; কেবল শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখাই দূষণীয় মনে করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি শঙ্করকে তিরস্কার করেন নাই, বরং বলিতেন যে, তিনি ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য এই অর্থ করিয়াছিলেন।

"উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব;
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরমমহত্ত্ব।
গৌণবৃত্ত্যে যেই ভাষ্য করিল আচার্য্য
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কার্য্য।
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা,
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া।"
চৈঃ চঃ।

কালে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ মধ্যে আবার নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করিতে লাগিল; তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম শৈবধর্ম্মরূপে পরিণত হইল।

বৈষ্ণবগণ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন ও তাহা তখনকার শিক্ষিত দলে কিরূপ সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা পশ্চাল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা যাইতে পারে।

"সন্ন্যাসীর সনে না করেন আলাপন;
সেই আপনাকে মাত্র বলে নারায়ণ।
* * *
জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, বিরক্ত খ্যাতি যার;
কারও মুখে নাহি দাস্যমহিমা প্রচার।"
চৈঃ ভাঃ।

"ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস;
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস?
মায়াধীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ;
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ?"

এইতো গেল সম্ভ্রান্ত লোক ও শিক্ষিত পণ্ডিতদিগের কথা। ইতর সাধারণ লোকে না শাক্ত, না বৈষ্ণব, না অদ্বৈতবাদী; ইহারা কিছুই ছিলনা। তাহারা সকল মতেরই সকল কথা মানিত কিম্বা না মানিত। যখন যে সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা পরিচালিত হইত, তখনই সেইরূপ চলিত। ইহারা বৈষ্ণবধর্ম্মও মানিত, মাংসমুদ্রা প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যোগ দিত, আবার মায়াময় জগৎ, ঈশ্বর ভিন্ন জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা দায়িত্ব নাই, ইহাও বলিত। তদ্ভিন্ন জনসাধারণে কতকগুলি স্বকপোলকল্পিতদেবত্যপূজার পদ্ধতি প্রাবষ্ট হইয়াছিল, ইহাতেই তাহাদের অধিক আমোদ ও কৌতুক দেখা যাইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, ষষ্ঠ প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার পর্ব্বেই তাহাদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। এক্ষণকার ন্যায় দুর্গোৎসবের প্রথা তখনও প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

নিষ্কাম ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা চৈতন্যের পূর্ব্বে কি ইতর, কি ভদ্র কেহই জানিতেন না। পশ্চাদুদ্ধৃত কবিতাটী তখনকার সামাজিক ধর্ম্ম ভাবের একটী সুন্দর ছবি।

"ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠি বিষহরি;
তাহা যে পূজেন সেহ মহাদম্ভ করি।
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্যমনে;
মদ্য মাংসদানে পূজে কোন কোন জনে।
যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে লোক সব মহা আনন্দিত।"

চৈতন্য ভাগবত।

বিষহরির গান, রামায়ণের গানের ন্যায় গীত হয়। তাহা এক্ষণেও কোন কোন ইতর শ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যোগীপাল গীতাদি কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার যো নাই।

যে সকল ধর্ম্মের কথা বলা হইল, তদ্ভিন্ন মুসলমান ধর্ম্মও তখন বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অর্থ লোভেই হউক আর বল প্রয়োগ দ্বারাই হউক, অনেক এ দেশবাসী তখন মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; মুসলমানদিগের ভাষা ও ভাব বহুল পরিমাণে সমাজ মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল; এবং মহমম্মদীয় ব্যবহারাদিও গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে সকল আধ্যাত্মিক শক্তি তখন সমাজ মধ্যে কার্য্য করিতেছিল, তন্মধ্যে মুসলমানের ধর্ম্মভাবও একটী। তবেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শাক্ত ধর্ম্ম, অদ্বৈত বাদ, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শাস্ত্র বহির্ভূত নানা প্রকার সামাজিক উপধর্ম্ম এবং কতক পরিমাণে মুসলমান ধর্ম্মের ভাব দ্বারা তদানীন্তন বঙ্গসমাজ পরিচালিত হইতেছিল। চৈতন্য ও তাঁহার সাহায্যকারী ধর্ম্মাচার্য্যগণকে এই সমস্ত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেম ও ভক্তির ধর্ম্ম স্থাপিত করিতে হইয়াছিল। ইহাতে কি প্রকার আধ্যাত্মিক বলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা চৈতন্য জীবনের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দিতেছে। ফলত তাঁহার আধ্যাত্মিক বলের সহিত এই সকল আধ্যাত্মিক শক্তির যে সংগ্রাম, তাহাই তাঁহার জীবনের গূঢ় রহস্য।

এত গুলি শক্তির ক্রীড়া-ভূমি হইয়া বঙ্গ সমাজ সময়ের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া চলিল, বঙ্গবাসীগণ স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া; ক্রমে নিস্তেজ, অবসন্ন ও অসার হইয়া পড়িল, প্রাচীন আর্য্য সমাজের দৃঢ় বন্ধন ও ধর্ম্মভাব সকল শিথিল হইয়া পড়িয়া সমাজকে আধ্যাত্মিক অবনতির চরমাবস্থায় উপনীত করিল, এবং অচিরকাল মধ্যে সোণার বঙ্গদেশ প্রেতভূমিতে পরিণত হইল! কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? বাঙ্গালী, বল বীর্য্য, সৎসাহস প্রভৃতি মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণ সমূহ ও পার্থিব উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইল বটে, কিন্তু ভগবান্ বাঙ্গালীর হৃদয় দিয়া যে ভাগবতী লীলা প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা তখন কে জানিত? সেই অন্ধকারময় পিশাচ ভূমিতেই যে উত্তরকালে সত্য ধর্ম্মের সূর্য্য উদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলোক দান করিবে, তাহা কোন্ মানব বুদ্ধির আয়ত্তাধীন ছিল? সেই জন্যই বুঝিবা বিধাতার মঙ্গলময় হস্ত বাঙ্গালী জাতির সমস্ত ঐহিক সুখ কাড়িয়া লইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের জন্য তাহাকে অল্পে অল্পে প্রস্তুত করিতেছিল।

ফলত যেমন মহর্ষি ঈশার আগমনের পূর্ব্বে সংসারবিরাগী যোহন আসিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন যে, "আমার পরে যিনি আসিতেছেন তাঁহার দ্বারায় স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে" তদ্রূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের প্রেম ভক্তির ধর্ম্ম আসিয়া যেন এই বলিয়া গেল যে "বঙ্গদেশ প্রস্তুত হও! ভক্তি বন্যার জলে অজ্ঞান অন্ধকারের আবর্জ্জনা সকল ধৌত কর, আমার পর যে আলোক এখানে আসিতেছে তাহা হইতেই স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; অতএব সেই আলোক গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।" ফলে যিনি যাহাই বলুন, আমরা চৈতন্যচন্দ্রের উদয়কে পরবর্ত্তী সত্যধর্ম্মবিকাশের প্রথম উষা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গের আকাশ প্রান্তে তেজঃপুঞ্জ ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইয়া ৪৮ বৎসর কালযাবৎ প্রেমভক্তির আলোকে বঙ্গবাসীর হৃদয় আলোকিত করত পুনরায় অনন্তের বক্ষে অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছেন। এই ৪৮ বৎসর মধ্যে এ দেশের ধর্ম্ম জগতে যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বাভাস আমরা এই অধ্যায়ে বর্ণন করিলাম।

চৈতন্যের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা।

১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৮৫ অব্দে চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্ধান হয়।

"চৌদ্দশতসাত শকে জন্মের প্রমাণ;
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান।"

চৈঃ চঃ।

এই অর্দ্ধশতাব্দীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক বৃত্তান্ত আমরা এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থাবলম্বনে প্রদর্শন করিতেছি।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে হিন্দুরাজত্ব লোপ হইল; পৃথ্বীরাজের অধিকৃত সিংহাসন যবনকরতলন্যস্ত হইল। সুলতান সাহাবুদ্দীন দিল্লীর সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া আপন সৈন্যাধ্যক্ষ কুতবুদ্দীনকে তাহার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে সাহাবুদ্দীনের মৃত্যু হইলে গজনীর সাম্রাজ্য উৎসন্ন হইল। তখন কুতবুদ্দীন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করত দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রধান সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজী সেনবংশীয় বৃদ্ধ নরপতি লাক্ষণেয়কে কৌশল ক্রমে রাজ্য চ্যুত করিয়া বঙ্গদেশে যবন পতাকা উড্ডীন করিলেন, এবং দিল্লীশ্বরের নামে স্বয়ং ইহা শাসন করিতে লাগিলেন। গৌড়নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। সেই হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ক্রমান্বয়ে মুসলমান সুবাদারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক এই দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। পূর্ব্বভাগে বাহাদুর খাঁ সুবাদার নিযুক্ত হইয়া সোণার গ্রাম নগরে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। নাজীরুদ্দীন ইহার পূর্ব্ব হইতে সমস্ত বঙ্গের সুবাদার ছিলেন। বিভাগের পরও তিনি গৌড় নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাল সহকারে দিল্লীর সম্রাটগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় তাঁহাদের অধীনস্থ সুবাদারগণ দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীনতা পরিত্যাগ করত স্বাধীন হইতে লাগিলেন। ১৩৪০

খ্রীষ্টাব্দে লোদীবংশীয় সম্রাট মহম্মদ সাহার অধিকার সময়ে সোণার গ্রাম বিভাগের সুবাদারের জনৈক সামান্য ভৃত্য কৌশলক্রমে সমস্ত বঙ্গদেশ হস্তগত করত সুলতান সেকেন্দার নামে বঙ্গের একেশ্বর হইলেন; এবং দিল্লীশ্বরের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত করিলেন। দিল্লীশ্বর তখন ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সেকেন্দরের কিছুই করিতে পারিলেন না। সেই হইতে সম্রাট্ আকবর সাহার অধিকার অর্থাৎ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশ দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন ভাবে মুসলমানরাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, পাঠান রাজগণের এইরূপ স্বাধীনতার কালেই নবদ্বীপে শচীনন্দন জন্মগ্রহণ করেন।

চৈতন্যচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে বারিক নামে বঙ্গেশ্বরের জনৈক খোজা স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া সুলতান সাজাদানাম গ্রহণ করত গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ৮ মাস গত হইতে না হইতেই মুলুক আণ্ডিল নামক তাঁহার একজন সেনাপতি তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেরোজ সাহা উপাধি গ্রহণ করত বঙ্গ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ফেরোজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সাহা একবৎসর রাজত্ব করিলে ১৪৯৫ সালে একজন আবিসিনীয় রাজপুরুষ তাঁহার জীবন নাশ করিয়া মজঃফর সাহা উপাধিগ্রহণ করত বঙ্গরাজ্য অধিকার করিলেন। এই ব্যক্তি অতিশয় নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত স্বভাবের লোক ছিল। তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অচিরকাল মধ্যে ওমরাগণ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং মহম্মদীয় বংশজাত মন্ত্রী সৈয়দ হোসেনকে সেনাপতি করিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড় নগরের প্রান্তরে এক মহাসমর হইল; তাহাতে মজঃফর সসৈন্যে নিহত হইলে, দ্বিতীয় আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করত সৈয়দ হোসেন বাঙ্গালার মজনদে উপবেশন করিলেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এবং ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সৈয়দ হুসেন রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং চৈতন্য জীবনের দ্বাদশ হইতে পঞ্চত্রিংশৎবর্ষ পর্য্যন্তের ঘটনা তাঁহারই রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই রাজার রাজত্ব সময়ে রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; প্রজাগণ নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে লাগিল এবং অনেক সুনিয়মও সংস্থাপিত হইল। ইনি এক ডালার দুর্গ সংস্কার করিয়া সেখানে আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং রাজ্যের অহিতকারী আবিসিনীয় ও অন্যান্য দুষ্ট লোকদিগকে দমন করিলেন। ইহার পুত্র নশরৎ সাহা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকার সময়ে গৌড় নগরে অনেক সুন্দর সুন্দর শৌধ মালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে বৎসরে চৈতন্যের তিরোধান হয়, ইনিও সেই বৎসরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

গৌড়েশ্বর সৈয়েদহুসেনের নাম চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে। দ্বিতীয় আলাউদ্দীনের পূর্ব্বনাম সৈয়দহুসেন ছিল ও সে সময়ে তিনিই বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন।

সুতরাং চৈতন্যভাগবতের সৈয়দহুসেনই যে দ্বিতীয় আলাউদ্দীন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। যখন রাজধানীর সমীপবর্ত্তী রামকেলী গ্রামে চৈতন্য হরিনামের মহিমা প্রচার করিতেছিলেন, কোটি কোটি নরনারী তাঁহাকে দেখিতে ও নামসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেছিল, মৃদঙ্গ করতালের নিনাদে দিগন্ত কম্পিত হইতেছিল এবং প্রেমভক্তির বন্যাতে সমস্ত বঙ্গভূমি ভাসিতেছিল, গৌড়ের সহর কোতোয়াল রাজাকে সেই বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন।

"কোতয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে
একাসন্যাসী আসিয়াছে রামকেলী গ্রামে।
নিরবধি করয়ে ভূতের সঙ্কীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন।"

চৈঃ চঃ।

এই সম্বাদ পাইয়া সৈয়দহুসেন হিন্দু সভাসদ্গণকে বিশেষবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎকালে কেশবছত্রী ও রূপ এবং সাকর মল্লিক এই তিন জন সর্ব্বপ্রধান হিন্দু সভাসদ্ ছিলেন। রূপ ও সাকর মল্লিককে বীরখাস ও দবীর খাস বলিত। চৈতন্যের প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও মহোচ্চপদমর্য্যাদাকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করত পরবর্ত্তী বৈরাগ্যাশ্রমে ইঁহারাই রূপ সনাতন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা এই বলিয়া চৈতন্যের বিষয় উড়াইয়া দিলেন যে "কোথা হইতে একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আসিয়াছে তাহার এত মহত্ব কি যে আপনি তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন।" তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, যবন জাতি ঘোর অবিশ্বাসী, এক্ষণে যদিও সাধুভাব প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু পরে অন্যের মন্ত্রণা শুনিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। এই বিবেচনায় চৈতন্যকে রাজধানীর নিকট হইতে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ভগবানের নামের কি মহিমা ও সাধুগণের প্রকৃতি কি মনোহর! হোসেন সাহা চৈতন্যের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা দূরে থাকুক,তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা জন্য ও গোঁড়া কাজীগণ তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে না পারে, তজ্জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন।

"রাজা বলে এই মুই বলি যে সবারে;
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।
যেখানে তাঁহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে;
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন
বিরলে থাকুন কিম্বা যেবা লয় মন।
কাজী বা কোটাল কিম্বা অন্য কোন জন,
যে কিছু বলিবে তার লইব জীবন।"

চৈঃ ভাঃ।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, হোসেন সাহা একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন; সুতরাং হিন্দুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থেও ইহার যথেষ্ট পোষকতা পাওয়া যায়।

"যে হোসেন সাহা পূর্ব্বে উড়ীয়ার দেশে
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।"

চৈঃ ভাঃ।

"যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।"

চৈঃ ভাঃ।

তবে যে চৈতন্যের প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের ইচ্ছায় বলিতে হইবে।

এই সময়ে রূপ ও সাকর মল্লিক, দুই ভ্রাতা চৈতন্যচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করি-

লেন। চৈতন্যের প্রজ্বলিত বৈরাগ্যভাব তাঁহাদের অন্তরে অন্তরে বিঁধিল। চৈতন্য দেব রামকেলি গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে উভয় ভ্রাতারই বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। রূপ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বাগ্রে চৈতন্যসন্নিধানে চলিয়া গেলেন। তখন সাকর সংসার ত্যাগের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন; ও সমস্ত রাজকার্য্যের ভারার্পণই তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি অমনোযোগী হইয়া পীড়ার ভান করত বাটীতে বসিয়া থাকাতে রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। এক দিন হটাৎ গৌড়েশ্বর তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

"রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল।
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা,
কার্য্য ছাড়ি রৈলা তুমি ঘরেতে বসিয়া।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ।"
চৈঃ চঃ।

ইহা শুনিয়া সনাতন বলিলেন যে, তাঁহার দ্বারায় আর রাজ কার্য্য চলিবে না। তাঁহার স্থানে দ্বিতীয় লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে গৌড়েশ্বর সৈয়দ হুসেন রাগান্বিত হইয়া সনাতনকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কতক দিন পরে রাজ মন্ত্রী উৎকোচের দ্বারায় কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করত প্রয়াগনগরে যাইয়া চৈতন্যের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তদবধি উজীরীর পরিবর্ত্তে তাঁহার ফকীরী অবলম্বন হইল।

এই বৃত্তান্ত পাঠে সুরুচিসম্পন্ন পাঠক মনে করিতে পারেন যে, সনাতনের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকের পক্ষে পীড়ার ভাণ করিয়া বাটীতে বসিয়া থাকা ও উৎকোচ দিয়া কারামুক্ত হওয়া অতি অন্যায় হইয়াছিল। তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, সনাতনের সেই ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ। সত্যাসত্য, পাপ পুণ্যের প্রভেদ তখনও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তীব্র বৈরাগ্যের উত্তেজনায় সংসার পরিত্যাগ করা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ও তাহা সাধন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। আমরা এরূপ বলি না যে, সনাতন তখন সমস্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। যদি তাহা হইত, তবে তাহার পর দুইমাস পর্য্যন্ত প্রয়াগে চৈতন্যের নিকট তাঁহাকে উপদেশ লইতে হইত না।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি—টাউয়ার—চিত্রশালিকা—ব্রিটিশ মিউসিয়ম—হর্স গার্ড—সেণ্টপল গির্জা—ইজিপ্সিয়ান হল—South Kensington Museum.

ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি অতি পবিত্র স্থান। আমরা তীর্থ যাত্রীর ন্যায় এখানে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকালের মহাত্মাগণের সমাধি ও প্রস্তর মূর্ত্তি সমূহ সন্দর্শনে অতীব প্রীত হই-

লাম। মিণ্টন্, সেক্ষপীয়র্, গ্রে, স্পেনসার্, চশার, গোল্ডইস্মিথ্ প্রভৃতি কবিগণের প্রস্তর মূর্ত্তি সমূহ অতি মনোহর। সম্প্রতি এস্থানে মহাত্মা ডারবিনের সমাধি দেওয়া হইয়াছে।

টাউয়ার—লণ্ডনের এটী প্রাচীন দুর্গ, পরিখা দ্বারা বেষ্ঠিত। ডিনেমাইট্ দ্বারা কোন দুর্ব্বৃত্ত ইহা ধ্বংশ করিবার চেষ্টা করাতে সম্প্রতি এস্থানে দর্শকগণ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি বিনা প্রবেশ করিতে পারেন না। আমরা লিখিত অনুমতি পাইয়া এস্থলে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম। একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী পোনের শত শতাব্দির সেকেলে লালবর্ণের ঢিলে পোষাক পরিধান করিয়া আসিয়া আমাদিগকে দুর্গ মধ্যে লইয়া গেল। এই স্থান প্রকাণ্ড, কালিমাখা, পুরাতন, ও প্রস্তর নির্ম্মিত। দেখিতে কিছুমাত্র শোভা বিশিষ্ট নহে। এই স্থানে পূর্ব্বকালের নানাবিধ বন্দুক, তোপ, লৌহধর্ম্ম, তরবার আছে। টাউয়ারে যে সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প হয়। রাজ্ঞী এন্ বলিন্, রাজ্ঞীকাথারিন্ হাউয়ার্ড, লেডী রচ্ফোর্ড, স্যর্ টমাস্ মূর্, বিশপ্ক্রান্মার্,লেডি জেন্ গ্রে, আরেল্ অব্ এসেক্স্ প্রভৃতি এই স্থানে বন্দী ছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহাদিগের মস্তকোচ্ছেদ করা হয়। কারাগার প্রস্তর নির্ম্মিত, অতি ভয়ানক, অন্ধকার গৃহ। তাহা দেখিয়া আমাদিগের রক্ত শীতল হইয়া গেল। ওয়াল্টর্ রেলি যে ঘরে বন্দী ছিলেন, তাহা দেখিলাম্। সেই ভয়ানক বন্দীশালায় থাকিয়া তিনি পৃথিবীর ইতিবৃত্ত রচনা করেন।

আমরা যাইয়া দেখিলাম, এখানকার রত্ন গৃহ বন্ধ। একজন ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত সম্ভ্রান্ত মিলিটেরী কর্ম্মচারী পেন্‌সন্ পাইয়া রত্ন গৃহের তত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া স্বহস্তে রত্নগৃহের দ্বার খুলিয়া দিলেন। অনেক বহুমূল্য রত্ন, ভূষিত রাজমুকুট ও সুবর্ণের রাজদণ্ড প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় চার্লস্ নৃপতি যে মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা দেখিলাম। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যে মুকুট মস্তকে দিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা লাল মখমল দ্বারা প্রস্তুত করা এবং বহুমূল্য রত্নদ্বারা ভূষিত। ইহার মূল্য প্রায় চতুর্দ্দশ লক্ষটাকা। এই স্থানে পূর্ব্বে কোহিনুর হীরক রক্ষিত ছিল। এক্ষণে তাহা মহারাজ্ঞীর নিকট আছে।

ন্যাসানেল্ গালারি ও রয়েল্ একাডামি—এই দুই স্থানে অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি ন্যাসানেল্ গালারিতে ডিউক্ অব্ মারল্বরোর নিকট হইতে লণ্ডনবাসীগণ একখানি মেরি ও খ্রীষ্টের রাফেলের চিত্রিত মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া উপহার দিয়াছেন। এই ছবিখানির মূল্য আটলক্ষ টাকা। সাধারণে চাঁদা করিয়া দিয়াছে। উপরের উল্লিখিত দুই স্থান ভিন্ন বণ্ড্ষ্ট্রীটে গষ্টেভ্ ডোরের কয়েকখানি ছবির প্রদর্শন গৃহ আছে। আমরা এই ছবি কয়েকখানি দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইয়াছি। মৃত ফরাশীশ চিত্রকর ডোরের চিত্রবিদ্যার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ডোর গালেরির নিকট লংনামক একজন ইংরাজ চিত্রকরের কয়েকখানি চিত্র আছে। এগুলি অতি পরিষ্কার এবং সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গঙ্গা নাম্নী একটী স্ত্রীমূর্ত্তি বক্ষ

চমৎকার। ইংরাজ চিত্রকর যদিও আধুনিক ইতালীয় বা ফরাসীসগণের চিত্র বিদ্যায় সমকক্ষ নহেন, তথাপি তাঁহারা উৎকৃষ্ট চিত্র চিত্রিত করিতে সক্ষম। লাণ্ড্সিয়রের পশু পক্ষীর চিত্র যার পর নাই উৎকৃষ্ট। ইহার কতকগুলি ন্যাসেনেল গালিরিতে রক্ষিত আছে। আমরা সেগুলি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি।

ব্রিটিস্ মিউসিয়ম্—এই গৃহটী থাকাতে ইংরাজ জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, জাতীয় গৌরব প্রকাশ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে এতাদৃশ উত্তম স্থান আর নাই। বিদ্যান ব্যক্তি এই স্থানে প্রত্যহ আসিয়া বিবিধগ্রন্থ অধ্যয়ন ও প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা চিরজীবন মহাসুখে অতিবাহিত করিতে পারেন। আমরা এই স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র একজন কর্ম্মচারী বিনীত ভাবে বলিলেন যে, "ডিনামাইট্" অগ্ন্যুৎপাদক পদার্থ দ্বারা কতকগুলি দুষ্ট বিদেশীয় ব্যক্তি এই গৃহ ধ্বংস করিবার কল্পনা করিয়াছিল, এজন্য সাধারণকে আপাতত সকল ঘরে যাইতে দেওয়া হয় না এবং অধিকাংশ ঘর বন্ধ রাখা হইয়াছে; কিন্তু আপনাদিগকে এস্থানের অধ্যক্ষ মহাশয় সকল প্রকোষ্ঠে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। এই বলিয়া তিনি আমাদিগের পরিচয় সমেত কার্ড অধ্যক্ষ মহাশয়কে দেখাইয়া একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে আমাদিগের সঙ্গে দিলেন। পুস্তকালয়টী অতি প্রকাণ্ড। একস্থানে এত পুস্তক পৃথিবীর কোন পুস্তকালয়ে নাই। মধ্যের গৃহ গোলাকৃতি এবং তাহার উপরিভা গ কাচ দ্বারা আবৃত। পুস্তক রাখিবার আলমারি সমূহ ধাতু নির্ম্মিত এবং তাহা অতি উচ্চ। তাহাতে থাকে থাকে অসংখ্য পুস্তক সাজান রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠে অনেক কর্ম্মচারী কাজ করিতেছেন কিন্তু গোলমাল এক বারে নাই। একটী কাচাধারে লুথার, জন্নক্স, নিউটন, মাইকেল্ এন্জিলো, রুবেন্শ্, রেম্ব্রেন্ট, এরিওষ্টো, রাসিন্, ভল্টেয়ার্, নেল্সন্, প্রভৃতি বিখ্যাত ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাত্মাগণের হস্ত লিখিত পত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত হস্ত লিখিতগ্রন্থ, এস্থানে বিস্তর সংগৃহীত আছে। রাজা রামমোহন রায় এইখানে ডাক্তর রসেন্‌কে ঋগ্বেদ নকল লইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। যখন রসেন্ ঋগ্বেদ নকল লইয়াছিলেন, সে সময় বঙ্গদেশে বেদের সংহিতাভাগ কেহই আলোচনা করিতেন না। এখন ইউরোপীয় সংস্কৃত শাস্ত্র বিষারদ পণ্ডিতগণ বেদ ও তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ সভাষ্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করাতেই তাহা বঙ্গ দেশে সকলে দেখিতে পাইতেছেন। আমাদিগের পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এমনি উদার স্বভাবের লোক, যে জর্ম্মন পণ্ডিতগণ বেদ আলোচনা করিতেছেন, বেদ অনুবাদ করিতেছেন এবং তাহা জন সমাজে প্রচার করিতেছেন, সেই সকল মহাত্মাগণের প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করিতে লজ্জা বোধ করেন না। এখানে গ্রীক রোমক, আসেবীর ও ইজিপ্তের নানাপ্রাচীন প্রস্তর নির্ম্মিত বস্তু রহিয়াছে। অমরাবতীর বৌদ্ধ-স্তূপের ধ্বংসাবশিষ্ট দর্শন করিলাম। একটী ঘরে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য পদার্থের এক জিনিস, হালিকার নেশসের রাজ্ঞী আর্টমিশিয়ার অনুজ্ঞায় তাঁহার স্বামী মোসলমের সমাধি যে প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই মসোলিয়ম্ গৃহটী সম্পূর্ণ উঠাইয়া লইয়া এই স্থানে রাখা হইয়াছে। রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার মৃত্যু হইলে যে আধারে তাঁহাকে রাখা হয়,

সেই আধারটি দেখিলাম। কত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র মুদ্রা, প্রাচীন কালের মূর্ত্তি, বিবিধ উৎকৃষ্ট পুরাকালের চিত্র, ধাতু নির্ম্মিত বহুমূল্য অলঙ্কার, মনুষ্যের প্রাথমিক অবস্থার ব্যবহারের বস্তু, প্রভৃতি দর্শন করিলাম। আমাদিগকে এখানকার কর্ম্মচারী যিনি সঙ্গে সঙ্গে সকল ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যেক উৎকৃষ্ট প্রাচীন বস্তুর বিবরণ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এখানকার কর্ম্মচারীগণ অতি ভদ্রলোক। আমরা বিদেশীয় বলিয়া সকল বস্তু অতি যত্নের সহিত তাঁহারা প্রত্যেক ঘরে লইয়া গিয়া দেখাইয়াছিলেন। ব্রিটীস্ মিউসিয়ম অতি বৃহৎ এবং এখানে দেখিবার যোগ্য অনেক বস্তু আছে।

হর্স্‌গার্ড্—এখানকার কর্ম্মচারী একজন কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তিনি অতি ভদ্রলোক। তাঁহার অনুরোধে আমরা একদিন হর্স্‌গার্ড্ গিয়াছিলাম। এই বাটীর দ্বারের দুইদিকে অশ্বারোহী দুটী সৈন্য অশ্বের উপর উঠিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। হর্স্‌গার্ডের সৈন্য ও অফিসরগণ সকলেই বলিষ্ঠ এবং সুপুরুষ। আমাদিগের পরিচিত কর্ণেলের সঙ্গে হর্স্‌গার্ডের সন্নিকট অস্ত্র শস্ত্রের একটী গৃহ দেখিতে গেলাম। এই গৃহে অনেক প্রকার তোপ, বন্দুক, বর্ম্ম, অসি, গোলা, গুলি আছে। এখানে হিন্দুকুল সূর্য্যকুমার সিংহের বর্ম্ম দেখিলাম। তিনি বৃদ্ধ বয়সে এই লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীরবর নেল্‌সনের টুপী, পোষাক, কেশ এইখানে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

সেন্ট্‌পল্ গির্জ্জা—লণ্ডনে যতগুলি গির্জ্জা আছে, তাহার মধ্যে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে মনোহর। ইহার মধ্যের ঘরে ৫০০০ সহস্র লোক সচ্ছন্দে উপাসনা করিতে পারে। এমন সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট উচ্চ গৃহ ও কয়লার ধূমে একবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এখানে চিত্রকর জস্যুয়া রেনল্ডস্, বীরবর চার্ল্‌স্ নেপিয়র, পণ্ডিতবর জন্‌সন বিসপ্ হিবার্, লর্ড কর্ণওলিস্, সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্‌স্, লর্ড-নেল্‌সন্, স্যর্ জন্ ম্যুর্ প্রভৃতির প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিলাম। এই গির্জ্জায় মহা সমারোহে ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটনকে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। আমরা গির্জ্জার উপরে যা লণ্ডন সহর দেখিলাম। এখান হইতে সহরের গৃহগুলি একটী জমাট বাঁধা স্থান বলিয়া বোধ হয়। একটী গৃহের ছাদের উপর দিয়া সহরের অনেক বাটীতে যাওয়া যায়। গির্জ্জার গোলাকার গুম্বজের ভিত্তির এক স্থানে কথা কহিলে সেই ভিত্তের অন্য স্থানের লোক ভিত্তির উপর কর্ণ সংলগ্ন করিলে তাহা স্পষ্ট শুনিতে পায়।

ইজিপ্‌সিয়ানহল।

মাস্কেইলন্ এণ্ড্ কুকের ঐন্দ্রজালিক তামাসা।—একদিবস আহারান্তে এখানে সেখানে সহরে বেড়াইয়া ও কয়েকজন ভদ্র লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথাপি ভাবিলাম বাসায় বিশ্রাম করা হইবে না, একটা আমোদের স্থানে বসিয়া সময় কাটাইতে হইবে। আমাদের দেশে শরীর ক্লান্ত হইলে একটা বড় চেয়ারে বসিয়া বা তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া হাত পা ছাড়িয়া আধ ঘুমন্ত অবস্থায় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করি-

তাম, কিন্তু এ সহরে আসিয়া যত পরিশ্রম করিয়া বেড়াই, ততই যেন শরীরে স্ফূর্ত্তি বোধ হয়—একটুও অনর্থক আলস্য ভাবে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। এ সাহেবের দেশে আসিয়া আমাদের সাহেবী মেজাজ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা একটু বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিব অথচ আমোদে সময় কাটাইব, এজন্য মাস্কাইলন কুকের তামাসা দেখিতে বেলা ৩টার সময় অম্নিবসে উঠিয়া "ইজিপ্সিয়ান্ হল" অভিমুখে গমন করিলাম। অম্নি বস্ খানি রাস্তার এক কোনে থামিল, শকট চালক আমাদিগকে সাবধানে অবতরণ করাইয়া দিল। পথের অপর ধারে "ইজিপসিয়ান্ হল্।" এ পিকাডিলির রাস্তা, এখানে গাড়ি ঘোড়ার বড় ভিড়, সুতরাং রাস্তা পার হওয়া অসম্ভব। আমরা ইঙ্গিত করিবা মাত্র একজন পুলিস অফিসার আসিয়া আমাদিগের হাত ধরিয়া পথ পার করিয়া দিল। এ বন্দোবস্ত লণ্ডনে বড় ভাল। একজন পুলিস অফিসার ভদ্রলোককে রাস্তা পার করিয়া দিবার সময় সকল গাড়ি অমনি থামিয়া যায়। "ইজিপ্সিয়ান্ হল্" মিসরদেশের নক্সায় নির্ম্মিত। এ হর্ম্ম্য অতি সুদৃশ্য, কিন্তু বৃহৎ নহে। ইহার মধ্যে একটী চিত্র স্থাপিত আছে, তাহা দর্শন-যোগ্য। একটা ছোট ঘরে মাস্কইলিন্. কুকের তামাসা হইয়া থাকে। ঐ তামাসা দেখিলাম, তাহা আমোদ-জনক বটে। বৈদ্যুতিক তার দ্বারা শূন্যে বাজনা বাজিতে লাগিল, ঘর অন্ধকার হইল, রঙ্গশালায় কঙ্কালবিশিষ্ট একটী শব তালে তালে নাচিতে লাগিল—আমাদিগের দেখিয়া চক্ষুস্থির;—ছোট ছোট বালক বালিকা এটী দেখিয়া একবারে ভয়ে জড়সড় হইল। দুইজন ভারতবর্ষীয় পুরুষ ও একজন ভারতবর্ষীয়া কামিনী সাজিয়া নানারকম ভোজ বাজী দেখাইল। এইরূপ এখানে কিয়ৎক্ষণ বাজী দেখিয়া আমোদ করিলাম।

Kensington Museum.—এটী দেখিবার উপযুক্ত স্থান। এখানে নানাস্থানের পূর্ব্বকালের ও আধুনিক সময়ের শিল্প বস্তু সকল সুন্দর প্রণালী বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। লুভার ও রোমের যে সকল সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি আছে, তাহার আদর্শে খড়ির কতকগুলি মূর্ত্তি একটী ঘরে সজ্জিত আছে। ট্রাজান স্তম্ভের প্রকাণ্ড খড়ির নকল স্তম্ভ রাখা হইয়াছে। মাইকেল এন্‌জিলোর খ্রীষ্ট ও মেরির চিত্র এবং তাঁহার নির্ম্মিত যে প্রস্তরের ডেভিডের মূর্ত্তি আছে, তাহার আদর্শে খড়ির মূর্ত্তি দেখিলাম। এক ঘরে জাপান দেশীয়, এক ঘরে চীন দেশীয় নানাপ্রকার বস্তু ও বুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটা লম্বা ঘরে ভারতবর্ষের শাল, মক্‌মলের কাপড়, কিন্‌খাপের কাপড় প্রভৃতি সাজান আছে। এইস্থানে দেখিবার যোগ্য অনেক বহুমূল্য বস্তু অতি যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

কিউ উদ্যান—ক্রিষ্টাল পালেশ—আলেক্জান্দ্রাপালেশ্—রিচ্মণ্ড্ পার্ক্—হাম্টন্ কোর্ট—জল বিহার।

কিউউদ্যান—লণ্ডনের বাহিরে স্থাপিত। মাটীর তলের রেলের গাড়িতে উঠিয়া গমন করিলাম। বাগান, তাহাতে নানারকম গাছ, এবং বিবিধ প্রকার ফুল ফুটিয়া আছে, এরূপ দৃশ্য আমার নয়ন ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। ইংলণ্ড ও

ফ্রান্সে নানা রকমের গাছ এবং ফুল দেখিলাম। এমন শোভা বিশিষ্ট গাছ এবং ফুল ভারতবর্ষের কোন স্থানে নাই। এ গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রামে মাঠের শোভা বড় চমৎকার। সবুজ দুর্ব্বাদল মখমলের শয্যার ন্যায় দেখাইতেছে। তৃণের মধ্যে নানাবিধ শাদা, লাল, হরিদ্রা রঙ্গের ডেজি, পপি, কাউস্লিপের ফুল ফুটিয়াছে, তাহা দেখিলে চক্ষু বড়ই পরিতৃপ্ত হয়।

কিউ উদ্যান অতি প্রকাণ্ড, অনেক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। একটী কাচের ঘরে প্রবেশ করিলাম, তাহার মধ্যে বড় গরম। এইস্থানে আফ্রিকার খর্জুর, তাল, কলা প্রভৃতি আছে। অন্য একঘরে জলাশয়ে পদ্ম, ভিক্‌টোরিয়া পদ্ম, কুমুদ এবং অন্য কয়েক রকম বিদেশীয় জলজ ফুল-গাছ আছে। অন্য ভাগে যে কত রকম নূতন নূতন গোলাপ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার শোভার কথা আর কি বর্ণন করিব। ইহার মধ্যে জেভিয়ার ওলিবো নামক গোলাপের ফুল প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। অনেক প্রকার ফারেন্ ও কাঁটারগাছ দেখিলাম। বড় বড় টবের উপর ফুসিয়ার গাছে বড় সুন্দর ফুল ধরিয়াছে; হাইড্রাঞ্জিয়ার থোকা থোকা ফুলের কি মনোহর দৃশ্য! এইরূপ অনেক পুষ্প, বৃক্ষ, তৃণ, লতা, গুল্ম দেখিয়া নয়ন বড় পরিতৃপ্ত হইল। উদ্যান মধ্যে একটী জলাশয়ে কতকগুলি প্রস্তরের মধ্যে একটী ফুয়ারা উঠিতেছে,তাহা দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদিগের বাগানটী সমুদায় পর্য্যটন করিয়া দেখিতে অনেক সময় লাগিল।

ক্রিষ্টাল্ পালেস্—ইহা লণ্ডনের বাহিরে সিডিন্‌হামে আছে। আমরা কয়েকদিবস এখানে গিয়াছিলাম। ঘরটা অতি প্রকাণ্ড কাচ দিয়া ঢাকা। ইহার মধ্যে দেখিবার অনেক জিনিস আছে। কোন স্থানে ফুয়ারার জল উত্থিত হইতেছে, নানাবিধ ফুলের গাছ টবে সাজান আছে। চারিদিকে মাটীর ও খড়ির বড় বড় মূর্ত্তি, অনেক জিনিসের দোকান, নানাবিধ পশু পক্ষীর মৃত শরীর জীবিতের ন্যায় রক্ষিত, দেখিতে পাইলাম। একটা ঘর ইজিপ্ত দেশের প্রণালীতে নির্ম্মিত আছে। ভারতবর্ষের প্রণালীতে যে ঘর গুলি সাজান আছে, তাহা আমাদিগের দেখিতে বড় ভাল লাগিল। এই প্রাসাদে অনেক লোকের সমাগম হয় এবং দোকানের জিনিস বিক্রয়ে ব্যবসায়ীগণের বিশেষ লাভ হইয়া থাকে। কয়েক খানি দোকানে হস্তি দন্তের কারু কার্য্য বিশিষ্ট বিবিধ প্রকার বস্তু দেখিলাম। সে গুলি অতি সুন্দর রূপে ইংরাজ শিল্পীগণ প্রস্তুত করিয়াছে। এখানে অনেক ভাল ভাল ছবি সাজান আছে, যদিও তাহা কোন বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্রিত নহে, তথাপি তাহা দেখিবার যোগ্য। একটা ঘরে পম্পিয়াইর ধ্বংস ও ভিসুভিয়শ্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতের পানরমা দৃশ্য আছে, তাহা বড় সুন্দর।

আমরা এই খানে Hansel Festival উপলক্ষে ৪০০০ চারি সহস্র গায়কগণের সঙ্গীত শুনিলাম। এত লোকের ঐকতানিক স্বরে সঙ্গীত বিশেষ প্রশংসনীয়। অন্য একদিবস রাত্রে এই খানে বাজি পোড়ান দেখিতে আসিয়াছিলাম।

আলেকজান্ড্রা পালেস্—এও একটী লণ্ডনের বাহিরে আমোদের স্থান। এখানেও ক্রিষ্টাল্ প্যালেসের মত অনেক

দোকান আছে। চিত্রশালায় সুন্দর সুন্দর চিত্র ভিত্তি শোভিত করিয়া রহিয়াছে। ঘরের বাহিরে একস্থানে লাপ ল্যাণ্ড বাসী স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকা বসিয়া আছে, দেখিলাম। ইহাদের নিকট তদ্দেশীয় কাঠের গাড়ি ও একটী বৃহৎ রেইন্‌ডিয়ার হরিণ রহিয়াছে।

আমরা ওয়াটারলু ষ্টেসন হইতে রিচ্‌মণ্ড্‌ ষ্টেসনে গিয়া হাম্‌টন্‌ কোর্টে গমন করা স্থির করিলাম। রিচ্‌মণ্ড্‌ একটী পল্লীগ্রাম কিন্তু তথায় বড় বড় বাটী এবং সারি সারি নানাবিধ দোকানের অভাব নাই। ইহার পর টুইকিন্‌হাম্‌ নামক আর একটী গ্রাম। এই খানে কবিবর পোপ্‌ বাস করিতেন এবং লুইফিলিপ্‌ নৃপতি এই স্থানে অনেক দিবস বাস করিয়াছিলেন। এই সকল পল্লীগ্রাম দেখিতে বড় মনোহর। গৃহের নিকট ফুলের বাগান এবং তাহা বিবিধ প্রকার বৃক্ষে শোভিত। আমাদিগের রিচ্‌মণ্ড্‌ পার্কে আসিয়া মন বড় প্রফুল্ল হইয়াছিল। এমন নৈসর্গিক শোভা বিশিষ্ট স্থান আর কখন দেখি নাই। চারিদিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, পর্ব্বত, কন্দর, জলাশয় রহিয়াছে। আমাদিগের শকটের নিকট শত শত মৃগ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগকে দেখিয়া শকুন্তলা-নাটকের ঋষির আশ্রমের কথা মনে পড়িল। এই সকল জন্তু কেহই মৃগয়া করিতে আসিয়া বধ করে না। তাহারা বনের শোভা বৃদ্ধি করিবার জন্য রহিয়াছে।

হাম্‌টন্‌ কোর্টের উদ্যান ও প্রাসাদ অতি মনোরম্য। এই বাটীতে কার্ডেনেল উল্‌জি বাস করিতেন। আমরা লৌহ নির্ম্মিত সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। এই স্থান হইতে বুসি পার্কের দুইধারে চেস্‌নট্‌ বৃক্ষের শোভা বড়ই মনোহর। এক স্থানে জলাশয়ের মধ্যে একটী বৃহৎ ফুয়ারা, তাহাতে দিয়ানার প্রস্তর মূর্ত্তি শোভিত। এখানেও অনেক মৃগ বেড়াইতেছে, তাহারা পদ শব্দে কিছু মাত্র ভীত হয় না। হাম্‌টন্‌ কোর্টের উদ্যান, আমাদিগের চিত্ত বিশেষরূপে আকর্ষণ করিল। পুষ্পোদ্যানে ভিতের গায়ে গোলাপের লতা সংলগ্ন আছে। তাহাতে কত রকম সুগন্ধযুক্ত মনোহর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা বর্ণন করা যায় না। সারি সারি কমলা লেবুরবৃক্ষ আছে, ইহার মধ্যে অনেক গাছ তৃতীয় উইলিয়ম নৃপত্তির সম সাময়িক।

হাম্‌টন্‌ কোর্টের দ্রাক্ষালতার গৃহ বিখ্যাত। একটী কাচের ঘরে একটী দ্রাক্ষালতা কৃষ্ণবর্ণ ফলে সুশোভিত রহিয়াছে। ইহা ১১০ ফিট লম্বা এবং আমরা দেখিলাম, তাহাতে এক সহস্রের অধিক থোকা থোকা আঙ্গুর ধরিয়াছে। এই ফল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে। দ্রাক্ষালতাটীর বয়ক্রম ১১৮ বৎসর হইবে। হাম্‌টন্‌ কোর্ট্‌ প্রাসাদ অতি প্রকাণ্ড এবং সেকালীয় ধরণের। এই প্রাসাদ অভ্যন্তরে অনেক ভাল ভাল চিত্র আছে। এই খানে বড় একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কতকগুলি পতি-পুত্র বিহীনা নিঃসহায়া ভদ্র বিধবা মহিলাকে বিনা ব্যয়ে অবস্থিতি করিতে দেওয়া হয়।

আমাদিগের প্রতিবেশিনী দুইটী ইংরাজ মহিলার সঙ্গে বেশ আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা ভদ্রবংশোদ্ভবা এবং সুশিক্ষিতা। এই দুই ভগিনী আমোদ অনুরক্তা এবং শিল্প ও সঙ্গীত শাস্ত্রে সুনিপুণা। তাঁহারা একদিন বলিলেন, পরশ্ব শনিবারে টেম্‌সে

জলকেলির বড় ধুম হইবে, এই উপলক্ষে তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিলাম। সেই শনিবারে দুই প্রহর বেলার পর কিংস্‌টন্‌ ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। তথায় তাঁহারা দুই সহোদরা এবং আর একটী ভদ্র যুবক আসিয়াছিলেন। আমাদিগের সঙ্গেও একটী ইংরাজ বন্ধু ছিলেন। আমরা সকলে একত্রে টেমস্‌ নদের তটে যাইয়া একখানি সুন্দর পরিষ্কার নৌকা ভাড়া করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলাম। আমরা নৌকা বাহিয়া চলিলাম। আজি জলকেলীর বড় আমোদ। শত শত নৌকায় নর-নারী আনন্দে মগ্ন হইয়া হাসিতে হাসিতে, গান করিতে করিতে চলিয়াছেন। যেন আজি ব্রজ নারীগণ জল বিহার করিতেছেন। নব নাগর গোপ তনয়ের অভাব নাই। সীমন্তিনীর পদযুগে করযোড়ে নাগররাজ গরুড় পক্ষীর ন্যায় বসিয়া আছেন। কেহ বা মানিনী নায়িকার মান ভঞ্জন জন্য তরি হইতে অবতরণ পূর্ব্বক টেমস্‌ তটের মনোহর ওইষ্টিরিয়া বা হনি সকল লতা কুঞ্জের আসনে উপবেশন করিয়া সীমন্তিনীর কমল সদৃশ আননের চিবুক ধরিয়া কত মধুর বাক্যে কর্ণ তৃপ্ত করিতেছেন। নদীর জলে যেন যুবক যুবতীর হাট বসিয়াছে। যেদিকে দেখি সেই দিকে শোভার সীমা নাই। যেন বোধ হইতেছে, সরোবরে শত শত কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। কামিনীর হাস্য-ময় আস্য বড় শোভার স্থল হইয়াছে।

আমরা তটের নিকট তরি লাগাইয়া কিছু জলযোগ করিলাম। ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ কোন কালে কোন স্থানে আহার না করিয়া উপবাস করিয়া থাকে না। তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত আগে করা হইয়া থাকে। আমাদিগের কোন স্থানে যাইতে হইলে উপবাসী থাকিয়া মৃত প্রায় বাটী ফিরিয়া আসিতে হয়।

টেমস্‌-তটে গ্রামের শোভা বড় সুন্দর। চেশ্‌নট্‌, হথরণ এলম্‌ প্রভৃতি বৃক্ষের কি মনোহর শোভা! তাহাতে আবার থ্‌শ,লার্ক, রবিন,বুলবুল পক্ষীর মধুর সঙ্গীতে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইতেছে। নগরের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া এই সকল পল্লীগ্রামে ২। ১ দিবস থাকিতে মনে বড় সুখ বোধ হয়। কয়েক স্থানে প্রস্তর দিয়া বাঁধিয়া দেওয়াতে প্রস্তর গ্রথিত স্থানের উপর দিয়া টেমস্‌ নদের জল মহাবেগে ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া স্রোত মধ্যে পতিত হইতেছে। এই জল প্রপাত শব্দ কর্ণে মধুর লাগিল। গ্রাম, তৃণ গুল্ম লতা, জল সকলই যেন আনন্দে হাসিতেছে। আজি যেন প্রকৃতি-দেবী কোন উৎসবের নিমিত্ত সাজ সজ্জা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা অতি প্রফুল্ল চিত্তে তরি বাহিয়া নানা প্রকার হাস্য কৌতুক করিতে করিতে হাম্পট্‌ন্‌ কোর্ট পার হইয়া অনেক দূর গিয়াছিলাম। এইরূপে জলকেলী সমাপন করিয়া রাত্রে কিংশ্‌টন্‌ রেলওয়ে হইয়া লণ্ডনে পঁহুছিলাম। তথায় ৫ পাঁচ দিবস থাকিয়া ইতালীর প্রধান প্রধান সহর দেখিতে যাত্রা করিলাম।

কিছুকাল লণ্ডনে বাস করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বড় কষ্ট হইল। আমাদিগের লণ্ডনে অনেকের সহিত পরিচয় এবং কয়েক জনের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আমরা সজল নেত্রে

তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইয়া লণ্ডন পরিত্যাগ করিলাম। বিপুল তরঙ্গ পূর্ণ "চানেল" পার হইয়া ফরাসীস্ রাজ্য পঁহুছিলাম। আমরা অমরাবতী সদৃশ পারিশ ভুলিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম। ব্রছেলস্ হইয়া পারিশ যাইব কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। একেবারে বরাবর পারিশ পঁহুছিলাম। তথায় ৫ দিবস থাকিয়া ইতালীর প্রধান প্রধান সহর দেখিতে যাত্রা করিলাম।

তুকারাম ও রামপ্রসাদ।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আপামর সাধারণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ও তাহাদিগকে উন্নতির মঞ্চে উঠাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবীরগণ আবির্ভূত হয়েন। আবার ইহাও দেখা যায় যে, এই উন্নত-মনা ব্যক্তিগণ, আবশ্যক মত, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা প্রদেশে দেখা দিয়া থাকেন। অন্য দেশ হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই, ভারতবর্ষই আমাদের কথাগুলি সপ্রমাণ করিবে। বাঙ্গালায়, চৈতন্য ও রামপ্রসাদ; উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তুলসীদাস ও কবীরদাস; রাজপুতানায়, রামচরণ ও রয়দাস; পঞ্জাবে, গুরু নানক ও গুরুগোবিন্দ; গুজরাটে, দাদু; দাক্ষিণাত্যে, তুকারাম ও তুকারাম এবং মান্দ্রাজে রামানুজ আবির্ভূত হইয়া সাধারণকে ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ভারতবাসীগণ জাতিত্ব নিগড়ে আবদ্ধ, তাহারাই মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় এই ধর্ম্মবীরগণের দৃষ্টান্ত দর্শনে ও উপদেশ শ্রবণে জাত্যাভিমানকে একেবারে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এবং ইহা আরো আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে যিনি এক সময়ে দাম্ভিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি যবন ও চণ্ডালের সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করিয়াছেন, আবার যিনি অতি নীচ কুলোদ্ভব, তিনি উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণকে দীক্ষা দিয়াছেন ও তাহাদের সহিত একত্রে আহার করিয়াছেন। মহাপণ্ডিত চৈতন্য মুসলমানদিগকে স্বদলভুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছেন, অথচ এই চৈতন্য সহস্র সহস্র লোকের নিকট হইতে ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। রয়দাস, জাতিতে চর্ম্মকার ছিলেন। চিতোরের রাজমহিষী ইহাঁর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ ইহাঁর সহিত একত্রে ভোজন করিতেন। এরূপ নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও রয়দাস একজন সাধু বলিয়া পরিগণিত এবং একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের * প্রবর্ত্তক বলিয়া পূজিত। ফল কথা এই যে, যে বংশেই কেন জন্মগ্রহণ করুন না, প্রকৃত সাধু ব্যক্তিকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। সাধু তুকারাম ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু বলা এই প্রস্তাবটীর উদ্দেশ্য। কিন্তু বঙ্গদেশে তুকারাম বিশেষরূপে পরিচিত নহেন। এই জন্য, প্রথমে, তাঁহার জীবনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব এবং তাঁহার পর, এই দুই সাধু ব্যক্তির মধ্যে কি

* এই সম্প্রদায়টী রয়দাসী বলিয়া পরিচিত এবং রয়দাসকে আপামর সাধারণে রুইদাস বলিয়া জানে।

কি সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা পাইব।

পুনা হইতে প্রায় আট ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে, দেহুনামকগ্রামে, অনুমান ১৫৩০ শকাব্দে, তুকারাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন। তাঁহার পিতা বণিকের ব্যবসা করিতেন। বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইলে, তুকারামের পিতা সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সংসারের ভার তুকারামের উপর ন্যস্ত হইল। তুকারাম তাঁহার পিতার ব্যবসা কিছুকাল চালাইয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী স্ত্রী ছিল। কিছুদিন পরে, তিনি একটী স্ত্রীকে হারাইলেন এবং তাঁহার একটী পুত্রও ইহলোক হইতে অবসৃত হইল। এই সময়ে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তুকারাম তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ইহাতে তিনি বিশেষরূপে মুহ্যমান হইলেন। ইহার উপর আবার তাঁহার স্ত্রীর বাক্য যন্ত্রণা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তুকারামের মন ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তিনি কয়েকজন ভক্ত প্রতিবাসীকে লইয়া ভজন ও কীর্ত্তন করিতেন। সংসারের প্রতি আর বড় মন দিতেন না। নিজ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, দীন ব্যক্তিকে দেখিলে মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তুকারামের স্ত্রী জিজা বাইয়ের এ সকল সহ্য হইত না। স্বার্থপরতা তাঁহাকে এতদূর পর্য্যন্ত অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে, স্ত্রী-সুলভ লজ্জাকে তিনি জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তুকারামের বন্ধুগণকে তিনি ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। "তাহাদের কি অন্য কোন কর্ম্ম নাই যে এখানে আসিয়া সময় অতিবাহিত করে? অথবা তাহারা অকর্ম্মণ্য হইবে, নতুবা কে এত মূর্খ যে এ প্রকারে সময় অপব্যয় করে" ইত্যাকার বাক্য তাঁহাদের উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তুকারাম কোন দীন ব্যক্তিকে কিছু দিতে গেলে, জিজা বাই তাঁহাকে বাধা দিতেন—এমন কি তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষার তণ্ডুল পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতেন। তুকারাম বিরত হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বাটী হইতে কিছু দূরে, তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত বিঠোবা * দেবের একটী মন্দির ছিল। তুকারাম এই মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, ভাণ্ডারা নামক একটী পর্ব্বত আছে। তুকারাম মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে বিঠোবার মন্দিরে প্রত্যাগমন করত দেব সমক্ষে নৃত্য গীত করিয়া রজনী অতিবাহিত করিতেন।

তুকারাম যদিও সংসার ত্যাগ করিলেন, আত্মীয় স্বজনের স্নেহ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তিনি বাটী গমন করিতেন, আবার পরিজনগণের বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া চলিয়া আসিতেন। তুকারাম যখন বাটীতে থাকিতেন, অধমর্ণগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া দেনা পরিশোধ সম্বন্ধে তাহাদের সুবিধা করিয়া লইত। খাতকগণের নিকট হইতে সুদ লইতেন না, আবার তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সুবিধা মত দেনা পরিশোধ করিতে অনুমতি দিতেন। তুকারামের কনিষ্ঠের ইহা প্রীতিকর হইল না। তিনি তুকারামের সহিত পৃথক্ হইবার প্রস্তাব করিলেন। বিষয়াদি বিভক্ত হইল। তুকারাম কতক গুলি দলিল দস্তাবেজ পাইলেন। তাঁহার আর ইচ্ছা হইল

* এ প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ বিঠোবা নামে খ্যাত।

না যে, টাকা আদায়ের জন্য অধমর্ণগণের সহিত বিবাদ করেন। কাগজ পত্রাদি রাখিবার আবশ্যকতা বিবেচনা না করিয়া সমুদায় জলে নিক্ষেপ করিলেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া জিজাবাই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তুকারামকে যৎপরোনাস্তি ভৎ‌র্সনা করিতে লাগিলেন। তুকারাম কিছু না বলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। দেহু হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে আলন্দি নামক একটী স্থান আছে। এখানে জ্ঞানোবা নামক এক জন সাধুর একটী সমাধি আছে। এই স্থানের নিম্ন দিয়া ইন্দ্রিয়ানী নাম্নী একটী নদী প্রবাহিত। তুকারাম হৃদয়ে শান্তি লাভ করিবার জন্য এই মনোরম্য স্থানটীতে গমন করিলেন। তথায় ২।৪ দিন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথাকার এক জন কৃষকের এক জন ক্ষেত্র রক্ষকের আবশ্যক হইয়াছিল। সে দেখিল, তুকারামের কোন কাজ নাই, বৃথায় কালক্ষেপ করিতেছে। তুকারামকে ক্ষেত্র রক্ষকের কার্য্যটী দিবার জন্য প্রস্তাব করিল। তুকারাম তাহাতে সম্মত হইলেন। অর্দ্ধ মণ শস্য এই কার্য্যের বেতন স্বরূপ স্থির হইল। তুকারাম ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বিঠোবা দেবের নাম গান করেন। বিহঙ্গ কুল দলে দলে আসিয়া শস্য খাইতে লাগিল। তুকারাম তাহাদের নিবারণ করেন না। একদা ক্ষেত্রের স্বামী এই ব্যাপারটী নয়ন গোচর করিল। সে তুকারামের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভৎ‌র্সনা করিতে লাগিল। তুকারাম বলিলেন, একি আশ্চর্য্য কথা; পক্ষীগণ কৃষ্ণের জীব; তাহারা কি আহারাভাবে মারা যাইবে? এই শস্যে তাহাদেরও মনুষ্যের ন্যায় অধিকার আছে। উভয়ে ক্ষণকাল বচসা হইল। অবশেষে স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপর বিচারের ভার ন্যস্ত হইল। পঞ্চায়েত এই স্থির করিলেন যে, ক্ষেত্রে যত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তুকারামকে সমুদায় দিতে হইবে। তুকারাম অগত্যা এই মীমাংসায় সম্মতি প্রদান করিলেন। অন্যান্য বৎসরে, চল্লিস মণের অধিক শস্য এই ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু, ভক্তের প্রতি ভগবানের কি অপার করুণা। এবার তাহাতে তাহার অষ্ট গুণ অধিক ফসল হইল। ক্ষেত্রস্বামী ইহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। কিন্তু, এ সম্বন্ধে কাঁহাকে কোন কথা বলিল না। ক্ষেত্রস্বামীর প্রতিবাসীগণ তুকারামকে এক জন ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত। পঞ্চায়েত তাঁহার সম্বন্ধে যে মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহাও তাহারা অবগত ছিল। ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, এই সংবাদ তাহারা পঞ্চায়েতকে জানাইল। পঞ্চায়েত পুনরায় বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, ক্ষেত্রের সমুদায় শস্য সংগৃহীত হইলে, তাহা হইতে ক্ষেত্রস্বামীকে চল্লিশ মণ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট তুকারামকে দেওয়া হইবে। আলন্দির কয়েক জন ভদ্র লোকের উপর শস্য বিভাগের ভার অর্পিত হইল। তাহারা ক্ষেত্রপালকে চল্লিশ মণ শস্য দিয়া অবশিষ্ট তুকারামের গৃহে পাঠাইয়া দিল।

তুকারাম বিঠোবার নাম লইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কখন নিজ গ্রামস্থিত বিঠোবা দেবের সমক্ষে নূতন গীত করেন, কখন ভাণ্ডারা পর্ব্বতে অবস্থিত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, কখন বা নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে হরিগুণ গান করিয়া

বেড়ান। এই সময়ে বাবা চৈতন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বাবা চৈতন্য, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের এক জন শিষ্য ছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনি তুকারামকে নানা প্রকার উপদেশ দিলেন, ভগবানকে পাইবার প্রকৃষ্ট পথ অর্থাৎ ভক্তিমার্গ তাঁহাকে দেখাইলেন এবং নানা প্রকার মধুর বাক্যে তুকারামের মনে শান্তি প্রদান করিলেন।

তুকারাম এত দিন কেবল নিজ উন্নতির জন্য ব্যগ্র ছিলেন। এখন একটী গুরু ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। সাধারণের নিকট হরিনাম গান করা তাঁহার একটী বিশেষ কার্য্য হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের প্রভাব তাঁহাতে সংক্রামিত হইল। তিনি দ্বারে দ্বারে হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। নামদেব নামে একজন সাধু এতদঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটী অভঙ্গ অভ্যাস করিয়া তুকারাম তাহা গাইয়া সাধারণকে শুনাইতে লাগিলেন। কথায় * এবং সঙ্কীর্ত্তনে এই সকল † অভঙ্গ, গীত হইতে লাগিল। নামদেবের অভঙ্গ গাইতে গাইতে তাঁহার নিজে রচনা শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইল। ক্রমে তিনি উত্তম উত্তম অভঙ্গ রচনা করিতে লাগিলেন। এই সকল অভঙ্গতে তুকারাম বেদ ও পুরাণের উৎকৃষ্ট ভাব সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অভ্যাস সহকারে উত্তম উত্তম অভঙ্গ সকল তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল বাহির হইতে লাগিল। তুকারামের ধর্ম্মভাব ব্যাখ্যা ও সংগীত শ্রবণে সাধারণে মোহিত হইয়া উঠিল। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি বৃদ্ধ কি যুবা, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়। তুকারাম যে এক জন শূদ্র,তাহা তাহারা ভুলিয়া গেল। তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রদান করিতে লাগিল।

তুকারামের প্রতি এপ্রকার অযথা ভক্তি দেখান হইতেছে, ইহা কয়েক জন দাম্ভিক ব্রাহ্মণের সহ্য হইল না। তাহাদের অন্তঃকরণ ঈর্ষানলে জ্বলিতে লাগিল। আপামর সাধারণকে নিবারণ করা তাহারা অসাধ্য বিবেচনা করিল। এরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাসকে বাধা দেওয়া কাহার সাধ্য? সুতরাং ব্রাহ্মণগণ, তুকারামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। দেহুগ্রামে মামবোজি নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি তুকারামের কথা ও ভজন সর্ব্বদাই শুনিতেন। তাঁহার সহিত তুকারামের সদ্ভাব ছিল। এমন কি, তিনি একজন ভক্ত বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মনের মধ্যে তিনি বিরূপ ভাব পোষণ করিতেন। মামবোজি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গোস্বামী ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান প্রদান করিত। কিন্তু তুকারামের যশ প্রভাবে তাঁহার প্রভা লুক্কায়িত হইল। বিঠোবাদেবের মন্দিরের নিকট, গোস্বামী মহাশয়ের একটী উদ্যান ছিল। এই উদ্যানটীর চারিদিকে কাঁটার বেড়া দেওয়া

* কথার প্রণালী এই যে, কথক মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে একটী বচন আবৃত্তি করেন, পরে তাহা নানা প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রোতাগণকে বুঝাইয়া দেন। মধ্যে মধ্যে সংগীত হইয়া থাকে এবং ইহাতে কয়েকজন ব্যক্তি কথক মহাশয়ের সহিত যোগ দান করেন।

† অভঙ্গ—ধর্ম্মসংগীত। অভঙ্গের অর্থ যাহা ভঙ্গ নহে। অভঙ্গ গুলি অধিক বিস্তীর্ণ বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম অভঙ্গ হইয়াছে। কোন কোন অভঙ্গ একশত চরণে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ছিল। কাঁটা-গাছ বাড়িয়া মন্দিরে যাইবার পথ রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। এতদঞ্চলে, একাদশী তিথিতে, দেবমন্দিরে একটী প্রকৃত উৎসব হয়। তথায় কথা ও ভজন হইয়া থাকে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়া দেব দর্শনাদি করেন। একাদশী আগত-প্রায় দেখিয়া, তুকারাম যাত্রীগণের ক্লেশ নিবারণ জন্য, স্বহস্তে কাঁটা গাছের বর্দ্ধিত অংশ গুলি কাটিতে লাগিলেন। তুকারাম মামরোজিকে একজন ভক্ত বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এ কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর হইবে। গোঁসাই ঠাকুরের পূর্ব্ব হইতেই তুকারামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ছিল। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া, তিনি দ্রুতবেগে আগমন করিলেন, এবং একটী কাঁটা ডাল উঠাইয়া লইয়া তাহার দ্বারা তুকারামকে প্রহার করিলেন। তুকারামের অঙ্গ কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হইল। তিনি জ্বালায় অস্থির হইলেন। কিন্তু, মামরোজিকে কোন কথাই বলিলেন না। অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত সমুদায় সহ্য করিলেন। ভক্তগণ তুকারামের শুশ্রূষা করিল। তিনি কিছু দিন পরে আরাম হইলেন। তুকারাম পূর্ব্বকার ন্যায় ভজন কীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন। গোঁসাইজির প্রতি তাঁহার কোন বিরক্তির চিহ্ন কখন প্রকাশ পায় নাই।

ইহার পর, তুকারামের উপর আর একটী অত্যাচার আরম্ভ হইল। রামেশ্বর ভট্টনামে একজন ব্রাহ্মণ তুকারামের অনিষ্ট করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে জেলার বিচার-কর্ত্তার নিকট একটী অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি বিচারকর্ত্তাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তুকারাম শূদ্র হইয়া বেদ ব্যাখ্যা করিতেছে। ইহা হিন্দু ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। অতএব তাহাকে বিশেষ রূপে দণ্ড দেওয়া উচিত। বিচারকর্ত্তা আশঙ্কা করিলেন যে, প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং তুকারামকে দেহুগ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তুকারাম ইহা অবগত হইয়া অতীব মুহ্যমান হইলেন। অনুজ্ঞা পত্র বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি রামেশ্বর ভট্টের নিকট গমন করত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রামেশ্বর ভট্ট বলিলেন যে, যদ্যপি তিনি আর অভঙ্গ রচনা না করেন এবং যে সকল অভঙ্গের পুঁথি তাঁহার নিকটে আছে, তাহা জলে নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে বিচারালয়ের অনুজ্ঞা স্থগিত রাখা হইবে। তুকারাম এ সময়ে তাঁহার মানসিক বল হইতে বিচ্যুত হইলেন। রামেশ্বর ভট্টের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। তাঁহার অভঙ্গের পুঁথি গুলি জলে ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু জলে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে পুঁথি গুলিকে উত্তম রূপে বাঁধিয়া দিয়া ছিলেন। তুকারামের এই কার্যটী দেখিয়া, সামান্য ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিল, দেখ এ লোকটী কি নির্ব্বোধ, কিছু দিন পূর্ব্বে সে তাহার দলিল আদি নষ্ট করিয়া, তাহার পার্থিব সুখের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, এখন আবার অভঙ্গের পুঁথি গুলি জলে নিক্ষেপ করত, তাহার স্বর্গ গমনের দ্বার বন্ধ করিল। এই কথা গুলি তুকারামের অন্তঃকরণে শেল সম বিদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার মূর্খতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি বিঠোবা দেবের মন্দিরের সমক্ষে ধর্ণা

দিয়া রহিলেন। তাঁহার অন্যায় কার্য্যের জন্য দেবতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অভঙ্গগুলি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কথিত আছে যে, ত্রয়োদশ দিবসের রজনীতে, বিঠোবা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, অভঙ্গ গুলি নষ্ট হয় নাই, নদীর তীরে গমন করিলেই তিনি তাহা পাইবেন। তুকারাম বিঠোবা দেবের আজ্ঞা মত অভঙ্গের পুঁথি গুলি লইয়া আসিলেন। তুকারামের অন্তঃকরণে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি বিঠোবা দেবকে ধন্যবাদ দিয়া এবং তাঁহার করুণার কার্য্য উল্লেখ করিয়া কয়েকটী অভঙ্গ রচনা করিলেন। এদিকে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার দ্বারা রামেশ্বর ভট্টের মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, রামেশ্বর ভট্ট পুনা নগরের একটী কূপে স্নান করিলেন। কিন্তু স্নিগ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। পরে এই কথা উঠিল যে, তুকারামের প্রতি অত্যাচার করাতে তাঁহার এই দশা ঘটিয়াছে। পরে তুকারামের শরণাপন্ন হইলে পর, তিনি শান্তি লাভ করিলেন। এ ঘটনাটী কেহ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করুন বা না করুন, রামেশ্বর ভট্ট যে তুকারামের এক জন প্রকৃত বন্ধু হইলেন এবং শেষে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এই ঘটনাটীর পর, তুকারাম উৎসাহের সহিত কথা ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোহাগাডা তাঁহার প্রিয় স্থান ছিল। তথায় তিনি সর্ব্বদা গমন করিতেন। এই সময়ে তুকারামের যশ পরিব্যাপ্ত হইল। চারিদিক হইতে লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। ক্রমে রাজা শিবজীর সমুদায় কর্ণগোচর হইল। রাজার মন ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তিনি তুকারামকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। শিবজী তুকারামের নিকট একখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন, এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য আয়োজন করিয়া দিলেন। তুকারাম নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন। সংসারের চাক্‌চিক্যে তাঁহার মন আর মোহিত হয় না। অশ্ব, গজ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি নিমন্ত্রণ পত্রের প্রত্যুত্তরে সাতটী অভঙ্গ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে, নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন এবং তাহার সহিত, রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক গুলি সদুপদেশ দিলেন। অভঙ্গ গুলি পাঠ করিয়া, শিবজী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তুকারামের প্রতি তাঁহার ভক্তির ভাব এত প্রবল হইল যে, শিবজী স্বয়ং মহার্হ উপঢৌকন সহ, তুকারামকে আনিবার জন্য গমন করিলেন। তুকারাম তখন লোহাগাডা নামক স্থানে ছিলেন। শিবজী তথায় উপস্থিত হইয়া, তুকারামের চরণে প্রণিপাত করত উপঢৌকন প্রদান করিলেন। তুকারাম তাহা অস্বীকার করিলেন। কিন্তু নানা প্রকার সদুপদেশ দ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করত বিদায় করিয়া দিলেন।

ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের চরিত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যত দিন না তাঁহারা অন্তরের রিপু সকল দমন করিতে পারেন, তত দিন তাঁহারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে সক্ষম হয়েন না। আর ইহাও বিশেষরূপে প্রতীয়মান

হয় যে, কাম রিপু অনেকের পক্ষে ধর্ম্ম সাধনের বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া উঠে। হাব ভাব সম্পন্না লাবণ্যবতী রমণীর কুহকে পড়িয়া কত ফল মূল আহারী তপস্বী পর্য্যন্ত স্খলিত-পদ হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মবীরগণ এই প্রলোভনকে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধ-কাম হইয়াছেন। কাম রিপুকে ভস্মসাৎ করিয়া,মহাদেব মহাযোগী বলিয়া বিখ্যাত; এবং ধর্ম্ম বীর শাক্য সিংহ মহাবিক্রমশালী মারকে পরাজয় করিয়া নির্ব্বাণ-পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তুকারামও এই প্রবল রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়া ছিলেন। একটী লাবণ্যবতী রমণী সর্ব্বদাই তুকারামের কথা ও কীর্ত্তনাদি শুনিতেন। কিন্তু কামের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, এই রমণীটীর মন ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত না হইয়া, ইনি তুকারামকে মন্দ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এতদূর পর্য্যন্ত কাম রিপুর বশীভূত হইলেন যে, এক সময়ে তুকারামকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহার মনের ভাব তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিলেন। তুকারাম রমণীর কথা শুনিয়া সিহরিয়া উঠিলেন। তুকারাম তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত তিনি সকল রমণীকে রুক্মিনীর ন্যায় জ্ঞান করেন। সুতরাং তিনি তাঁহার মাতার ন্যায় পূজনীয়া। অতএব এ প্রকার মন্দ কথা তাঁহার মুখ হইতে কখন যেন বহির্গত না হয়।

ইহার পর তুকারামের উপর আর একটী নিগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইল। তুকারাম যখন লোহাগাড়া গ্রামে কীর্ত্তন করিতে যাইতেন, সেখানকার এক জন কাঁশারী তাঁহার সহিত যোগ দান করিত। কাঁশারীর পত্নী অতিশয় সংকীর্ণমনা ছিল। সে দেখিল যে, তাঁহার স্বামী নিজ ব্যবসার প্রতি অবহেলা করত তুকারামের সহিত নৃত্যগীত করিয়া বেড়ায়। তুকারামের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ভাব জন্মিল। এবং যাহাতে সংকীর্ত্তনাদি বন্ধ হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া কাঁশারীর পত্নী তুকারামকে এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে আনিল। সাধুর প্রতি তাহার পত্নীর এ প্রকার ভক্তি ভাব দেখিয়া, কাঁশারী মনে মনে বড় আহ্লাদিত হইল। স্নানের সময় উপস্থিত হইলে সাধুকে গরম জলে স্নান করাইবার প্রস্তাব করিল। তুকারাম তেল মাখিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কাঁশারীর স্ত্রী অত্যন্ত উষ্ণ জল আনিয়া তুকারামের অঙ্গে ঢালিয়া দিল। সাধুর শরীর ঝলসিয়া গেল। তিনি জ্বালায় ছটফট করিতে লাগিলেন। কাঁশারীর স্ত্রীকে কোন কথা বলিলেন না। কেবল ভগবানের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, এই দুষ্টা স্ত্রী সলজ্জিতা হইয়া সাধুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল এবং অবশেষে তাঁহার এক জন প্রকৃত ভক্ত হইয়াছিল।

হিন্দু সমাজে, সন্ন্যাসীদিগের বড় সম্ভ্রম। তাঁহারা লোক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের স্থানীয় হইয়াছেন, লোকের এই প্রকার বিশ্বাস। যে গৃহে তাঁহারা পদার্পণ করেন, সে গৃহ পবিত্র হয়। গৃহস্থ তাঁহাদিগকে পুষ্পাদি দিয়া পূজা করে এবং তাঁহারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলে, গৃহস্বামীর অন্তঃকরণে আর আনন্দ ধরে না। যাঁহারা যথার্থ সন্ন্যাসী, যাঁহারা

ঈশ্বরে সমুদায় সমর্পণ করিয়া তদ্ভাবাপন্ন হইয়াছেন, কে না তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকে? কিন্তু এ অবনী মণ্ডলে প্রকৃত বিরক্ত সন্ন্যাসী কোথায়? অনেকে প্রকাশ্যে লোক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণ অভিমানে পরিপূর্ণ। তাঁহারা পরমেশ্বরকে উপাস্য বলিয়া স্বীকার করেন না, যেহেতু তাঁহারা নিজে ভগবান। "আমি ব্রহ্ম" ইহাই তাঁহাদের বীজ মন্ত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষেরা ঈশ্বরকে পূজা করেন না বটে কিন্তু তাঁহার স্থানে যশ-লিপ্সাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ষোড়ষ উপচারে তাহার পূজা করিয়া থাকেন। এই রূপ প্রকৃতির দুই জন সন্ন্যাসী, তুকারামের সুখ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল দেখিয়া, ঈর্ষা নলে জ্বলিতে লাগিল। কোথায় লোকে তাহাদিগকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে, না এক জন মূর্খ শূদ্র অসগা রূপে সম্মানিত হইতে লাগিল। তুকারামকে দমন করা তাহারা আবশ্যক বিবেচনা করিল। এবং এই নিমিত্ত তাহারা রাজা শিবজীর এক জন কর্ম্মচারী দাদাজি কান্ডাদেবের নিকট, তুকারামের বিরুদ্ধে এক আবেদন প্রেরণ করিল। আবেদনে লিখিত ছিল যে, তুকারাম শূদ্র হইয়া বেদ ব্যাখ্যা করিতেছে এবং লোকে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছে। ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এবং হিন্দু চূড়ামণি রাজা শিবজীর রাজ্যে এরূপ অত্যাচার যে প্রশ্রয় পাইতেছে, ইহা অতীব আশ্চর্য্য। এই অত্যাচারী শূদ্রকে সমুচিত দণ্ড না দিলে, রাজ্যে ধর্ম্ম বিপ্লব হইয়া উঠিবে। সন্ন্যাসীদ্বয়ের এই আবেদন উপেক্ষনীয় নহে। দাদাজি, রাজা শিবজীর নিকট এ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শিবজী তুকারামকে বিশেষ রূপে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু, এ আবেদনটীকে অগ্রাহ্য করাও উচিত বিবেচনা করিলেন না। মন্ত্রীদলের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল যে, তুকারামের সহিত সন্ন্যাসীদ্বয়ের শাস্ত্র বিচারের আজ্ঞা প্রদান করা হউক। এবং ইহাতে তুকারাম পরাজিত হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইবে। সন্ন্যাসীদ্বয়কে এই কথা বলা হইল, এবং ইহাতে তাহারা সম্মতি প্রদান করিল। তুকারামকে পুনা নগরে আনিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রচার হইল। তুকারাম তাঁহার কয়েক জন সঙ্গিকে লইয়া সঙ্গমের নিকট উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দাদাজি তাঁহার আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে নগর মধ্যে লইয়া আসিলেন। কোন বিশেষ স্থানে একটী বিরাট সভা আহুত হইল। নানা স্থানের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। বিচারের মীমাংসা করিবার ভার পণ্ডিতগণের উপর অর্পিত হইল। বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দাদাজি তুকারামকে কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন, তুকারাম এরূপ ভক্তির সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যে, শ্রোতাগণ একেবারে মোহিত হইলেন। এমন কি তুকারামের বিরোধী ব্যক্তিগণের কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়া গেল। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উল্লিখিত দুই জন সন্ন্যাসী কীর্ত্তন শুনিয়া এ প্রকার অভিভূত হইলেন যে, তাঁহারা তুকারামের সমক্ষে নত-শির না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। দাদাজি এই

দৃশ্যটী নয়ন গোচর করিয়া, সন্ন্যাসীদ্বয়কে ভৎর্সনা করিলেন এবং সভা সমক্ষে তাঁহাদের পরাজয় ঘোষণা করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসীদ্বয়ও লজ্জিত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন।

তুকারামের প্রকৃত দিগ্বিজয় হইল। সমুদায় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি এখন নির্ভয় চিত্তে কথা ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহার শত্রুগণ যে কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা নিজেই আবদ্ধ হইল। তুকারাম এখন মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় স্বর্গীয় প্রভা বিকীর্ণ করিয়া আপামর সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্য ভক্তিভাবে অনুরঞ্জিত হইল।

তুকারামের জীবন কি প্রকারে শেষ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। সাধারণ বিশ্বাস এই যে তিনি দেব বিমানে আরোহণ করত বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। তুকারামের জীবন চরিত্রে লিখিত আছে যে, তিনি তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারে তীর্থ দর্শনে গমন করিবেন কি না। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিনি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন এবং হয়ত, কোন নিভৃত স্থানে তপস্যায় নিরত ছিলেন।　　ক্রমশঃ

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নদী উপকূলে।

১

প্রকৃতির অন্তরে ডুবিয়া,
সব দুঃখ গেলাম ভুলিয়া!
ক্ষণেক এ ভাবে রই,
ক্ষণেক আলোক পাই,
ক্ষণ থাকি মরমে মজিয়া,
শোক তাপ গেলাম ভুলিয়া!

২

শোক তাপ কিছু নাই,
সুখ ভরে কান্দি যাই,
আমিও কি সুখী, ভাই, এভবসংসারে?
আহা! নেত্র ভাসিল শিশিরে!
আমি কি গো সুখী,
আমি কি গো সুখী?
চিরদুঃখী আছি পড়ি,আমিও কি সুখী!

৩

প্রকৃতির বুকেতে মরিয়া,
সব দুঃখ গেলাম ভুলিয়া,
বাসনা মনের নাই,
কেবল প্রকৃতি চাই,
এই ভাবে থাকি নিরন্তর,
অন্তিমে মরণ ধরি লভি গো আঁধার!

৪

কিছু মনে রাখিব না,
কত কত কি প্রাণে বেদনা!
যাহা কিছু আছে মনে গেলাম পাসরি,
আজিশূন্য প্রাণে আমি, আমরি! আমরি!

৫

সংসারের যাতনা বহিতে,আজি ফিরিব না,
ক্ষণেক বিরামে রই,
ক্ষণেক জীবন পাই,

ক্ষণ থাকি লইয়া আপনা!
পৃথিবী যে পদ চায়,
মনে আজি নাহি লয়,
ধন মান জ্ঞান মদ, থাকুক পড়িয়া দূরে,
ক্ষণেক ডুবিয়া থাকি প্রকৃতি-ভাব আঁধারে!

৬

নীরব লইয়া বুকে,
প্রকৃতি লইয়া মুখে,
থাকি পড়ি গাঙ্গিনীর কূলে!
চেতনে মরিয়া থাকি,
জনম ভুলিয়া থাকি,
পড়ি থাকি প্রকৃতির কোলে!
দিন বয়ে যায় যায়,
নয়ন না দিব তায়;
মুদিত নয়ন, চির-আঁধারে ডুবিতে চায়,
ক্ষণপরে মৃত্যু আসি লইয়া যাবে কোথায়!

৭

প্রকৃতি মা! যে সুখ লভিনু আজি ও দুটী চরণে মিলি,
জনমে জনমে চিতে থাকে যেন এই স্মৃতি!
কখন কোথায় থাকি,
কালস্রোতে কোথা ভাসি,
জীবনের শোক তাপ সহিতে কতই বাকী?
একা একী পথে যাই,
কিম্বা জনস্রোতে ধাই,
দুর্ব্বার অদৃষ্টচক্রে যেথা রহি যাই,—
নগরে, প্রান্তরে, বনে, দেশ দেশান্তরে,
বিজন প্রবাসে, কিম্বা দরিদ্র কুটীরে,
যেথা যাই, যেথা রই,
যতভোগী, যত সই,
জুড়াই এহিয়া যেন স্মৃতির মৃদুলকরে!
এই গো মিনতি, মাত! রাখি যাই আশাভরে!
ও মুখ কিরণ পানে, যতনে ক্ষণ নেহারি,
আমার সে পথ যেন খুজিয়া লইতে পারি!
মনে কত কথা আসে,
পূর্ব্বস্মৃতি ক্ষণ হাসে,
জন্ম জন্মান্তর কথা কে যেন আনিয়া দেয়,
আপনার বাড়ী লাগি ধীরি ধীরি মায়া হয়!
আবার আপন বশে, চলিব আপন পথে,
আর যে আমায় ছাড়ি দিবনাগো কারুহাতে!
প্রকৃতি মা! প্রকৃতি মা!
আমি যে দুয়ারে আজি, কি আর বলিব, ওমা!
(ডাকিতে জানিনা, ওমা!)

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

ফুল ও ফল। (১)

(সমালোচন)

বাবু চন্দ্রনাথ বসু বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব স্থল। তিনি যে সকল প্রবন্ধে সময়ে সময়ে বঙ্গদর্শনকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহারই কতকগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। আজি কালি বাঙ্গালা সাহিত্যের ফোড়ে-পটিতে পুস্তকের নাম সুললিত করিবার জন্ত যেমন বিনোদিনী, কুরঙ্গিনী, স্বন্ স্বন্ সমীরণ, কুহু কুহু, প্রভৃতি শ্রবণ-মধুর (?) নামে নামকরণ কার্য্য হয়, এনামকরণ সে প্রণালীর নহে। ফুল ও ফল নামের স্বার্থকতা আছে। প্রথম প্রবন্ধ, ফুলের বৃন্ত (ধ্যান)। অগভীর, বিষবাদী,

(১) শ্রীচন্দ্রনাথ বসু এম্ এ প্রণীত। ৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেনে প্রকাশিত; মূল্য বার আনা।

সংসারদ্বেষী সন্ন্যাসী টাইমনই হউন; আর অতুল প্রতিভাশালী শান্তির প্রচারক, পরহিত-জীবন, মহাপুরুষ বুদ্ধদেবই হউন, সকলেরই চক্ষে সর্ব্বপ্রথমে এজগতের শোক, তাপ, বিষাদ ও যাতনা প্রতিভাত হয়। হয় বটে; কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ, যিনি বুদ্ধদেব, যিনি জরামৃত্যুর পরপারে নির্ব্বাণমুক্তি দেখিয়া, শান্তিময় সুধাময় "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম"—সাম্যনীতি—প্রেমনীতি, প্রচার করেন; কিন্তু টাইমনের মত সংসার ছাড়িয়া পশুত্বলাভ করেন না। এই প্রভেদ। চন্দ্রনাথ বাবু ধ্যানে সর্ব্বপ্রথমে জগতের বিষাদের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। অতলস্পর্শ শূন্য কূপ, সে শূন্যে অতলস্পর্শ অন্ধকার, সে অন্ধকারে বিষাদের—প্রলয়ের—মৃত্যুর—অনন্ত-পোরা, অনন্তভরা, অনন্তদীর্ঘ অনন্তপ্রস্থ, ক-অ-অ-ধ্বনি। কি ভয়ানক! পাঠকেরা সে অপূর্ব্ববর্ণনা চন্দ্রনাথ বাবুর মোহকরী ভাষায় নিজেই পড়িবেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু এই ভীষণ, অসার সৌন্দর্য্যকেই ধেয় করেন নাই। তিনি পৌষমাসময় পৃথিবীর পরপারে বসন্ত দেখিয়াছেন—কোকিলের শব্দ শুনিয়াছেন, ফুলের শোভা দেখিয়াছেন। অন্ধকারের মধ্যে, জ্যোতির্ম্ময়, শান্ত, গম্ভীর, সংযত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়াছেন;—যাহার অনন্তদীর্ঘদেহের ভিতরে, অনন্ত যোজন দূরে প্রলয় কোথায় লুকাইয়াছে। অনন্ত বিশ্ব আহ্লাদে ভাসিল, চন্দ্রনাথ বাবু তখন সেই মহাপুরুষকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু বুদ্ধদেবের পদধূলি পাইবার যোগ্য বটে। আর যদি তিনি সত্য সত্যই অনন্তব্যাপী মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া থাকেন, তবে এ সমালোচক তাঁহার পদধূলির প্রার্থী।

এজগৎ সৌন্দর্য্যময়, কিন্তু কয়জন তাহা বুঝিতে পারে? সৌন্দর্য্য বোধ প্রস্ফুটিত করান চাই--ইহার জন্য শিক্ষাচাই। কবিগণ ইহার শিক্ষক। চন্দ্রনাথ বাবু, কোকিল, ও ফুলের ভাষায় জগৎ যে সুন্দর, তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভাষা যেরূপ কবিত্বময়, তাহাতে পদ্য না হইলেও এই গদ্যেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু জগৎকে সুন্দর দেখিয়াছেন, কাজেই কঠোর, ভীষণ মৃত্যুতে তাঁহার বিশ্বাস আর নাই। এই জন্যই তাঁহার ফুলের ফল—'ভালবাসা' ও 'পরলোক'। এই বিশ্বব্যাপী নাস্তিকতার দিনে চন্দ্রনাথ বাবুর মত শিক্ষিত লোককে আনন্দময় জগদীশ্বরে এবং পরলোকে আস্থাবান দেখিলে বড়ই সুখ হয়।

কিন্তু একটী কথা; চন্দ্রনাথ বাবু কবি, দার্শনিক নহেন। ফুলগুলি যেমন সুগন্ধযুক্ত ও সুন্দর করিয়া গড়িয়াছেন, ফল গুলির বেলায় তেমনটী হয় নাই। ফলে, যতটুকু ফুলের গন্ধ আছে সেই টুকুই ভাল, বাদবাকী নহে। ফল গড়িতে যে, ব্যবসায়িত্ব (Practicality) চাই, কবির ভাব প্রধানতায় (Ideality) তাহা মিলিতে পারে নাই। অখণ্ডজগতের সুন্দর ছবি যেমন অঙ্কিত হইয়াছে, জগৎ বিশ্লেষণ তেমন হয় নাই। দার্শনিকের বিশ্লেষণ অস্ত্রে অদৃষ্টের তত্ত্ব, পরলোকের তত্ত্ব তেমন যোগ্যতার সহিত উদ্ভিন্ন হয় নাই। এ অযোগ্যতার কথা কবি নিজেই একরকম স্বীকার করিয়াছেন; অদৃষ্ট আলোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, "আমি অদৃষ্টবাদে যত দর্শন দেখি, তদপেক্ষা কবিত্ব দেখি, যত জ্ঞান দেখি তদপেক্ষা ভাব দেখি" ইত্যাদি। অদৃষ্ট মানিলে দয়া বাড়ে, ক্ষমা বৃদ্ধি হয়, একথাটা চন্দ্রনাথ বাবু খুব

দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ঐ একটা দিক্ মাত্র। অন্য দিক্ স্পর্শও করেন নাই। কবির চক্ষে এক দিক্ বই প্রায় কোন কিছুর ছবি পড়ে না, কিন্তু প্রতিফলিত দিক্টা যে খুব সুন্দর হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু দার্শনিক সমালোচকেরা ভাল মন্দ সব দিক্ দেখেন। সকল কথারই খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচার করেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকাতেই, চন্দ্রনাথ বাবুর অদৃষ্ট প্রকাশের পূর্ব্বে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ" নামক প্রবন্ধে (২) এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু, অদৃষ্টবাদের যে গুণকে কাব্যময় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, নগেন্দ্র বাবু, স্বচ্ছ ভাষায় তাহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। অধিকন্তু, অদৃষ্টবাদের দোষেরও দক্ষসমালোচনা করিয়াছেন। ওকালতী করেন নাই, সমালোচনা করিয়াছেন। কবির সকল দিক্ দেখিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই বুঝি, চন্দ্রনাথবাবু Survival of the fittest মতকে নৃশংস বলিয়াছেন; ভালবাসা নামক প্রবন্ধটী পরিপক্ক করিতে পারেন নাই, পরলোক প্রমাণে বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণতার অভাব দর্শাইয়াছেন। 'ফুল ও ফল', আগাগোড়া কবির কল্পনা ভাবিয়া পড়িলে, ভাবের তৃপ্তিসাধন হয়, সুখ হয়। কিন্তু জ্ঞানের দৃষ্টিতে পড়িলে, ফলগুলি মনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। যে দোষে তাঁহার 'গুরু রস্কিন' দোষী, সে দোষ চন্দ্রনাথ বাবুতে খুব বর্ত্তিয়াছে। Ruskin যে স্থলে ভাব প্রধান, সেই স্থলেই মধুর। কিন্তু যেখানে সোজা-রকম জ্ঞানের কথা পাড়িয়াছেন, সেইখানেই সেখানই একটু হারিয়া গিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, দর্শন রাজ্যে তাহার অনেক কথারই মূল্য অতি অল্প। এই জন্যেই বিলাতের Metaphysical society তে তিনি তেমন দক্ষ বিবেচিত হন নাই। গুরু শিষ্য এক দোষে দোষী। যাঁহারা স্পেন্সার বা বেনের ভালবাসার দেহচ্ছেদ্ দেখিয়াছেন, তাঁহারা চন্দ্রনাথ বাবুর ভালবাসা প্রবন্ধ পাঠে সুখী হইতে পারিবেন না। আমি এ কথা বলি না যে, তাঁহার ঐ প্রবন্ধের সব কথাগুলিই ভ্রম পূর্ণ। "যে ভালবাসা গুণ দর্শনে উৎপন্ন হয়, তাহাই ভালবাসা," "গুণ দর্শন মূলক ভালবাসা কতক পরিমাণে নিজের গুণ দর্শন সাপেক্ষ" প্রভৃতি অনেক কথা আছে, যাহা সার ও সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু তিনি আকৃতিগত সৌন্দর্য্যের উপর যতটা খড়্গহস্ত, দার্শনিকেরা ততটা হইবেন না। অকবি ও অদার্শনিক আমরা তো মোটেই নয়। আর একটা কথা এই যে, চন্দ্রনাথ বাবু ভালবাসা কথাটার অর্থ বিষয়ে কিঞ্চিৎ গোল রাখিয়াছেন। সেই কারণে একটু না বুঝিয়াই (চন্দ্রনাথ বাবু আমাকে ক্ষমা করিবেন) নব্য সমাজ সংস্কারকদিগের বিবাহ প্রথার উপর বিষবৃষ্টি করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু ভালবাসাকে একস্থলে দয়া, অন্যত্র দাম্পত্যপ্রেম, ইত্যাদি নানারকম অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই জন্যই লিখিয়াছেন যে, "নব্য সমাজ সংস্কারকেরাও মনের মানুষ খুঁজিয়া বিবাহ না করিলে, বিবাহে ভালবাসা হয় না। এই মতের পক্ষপাতী হইয়া, আমাদের প্রাচীন বিবাহ প্রণালীর উপর খড়্গহস্ত

(২) ঐ প্রবন্ধ নগেন্দ্র বাবুর বিবিধ সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

হইয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়ান, ভালবাসার পাত্র বাছিয়া বেড়ান, অধার্ম্মিক ও অশিক্ষিতের কার্য্য, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের কার্য্য নয়। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের কাছে সকলই ভালবাসিবার জিনিস।" কি আশ্চর্য্য মীমাংসা!! দয়া করিয়া যত্ন করা, সমবেদনায় কাতর হওয়া, আর বিবাহ করা, এ সকলে কি এক ধাতুর ভালবাসা, কোন কালে ছিল, না আছে, না হইবে? ধার্ম্মিক হউন, শিক্ষিত হউন, আর ভগবদ্ভক্তই হউন, তিনি যাহাকে দয়া করেন, তাহাকেই বিবাহ করিতে পারেন না। এজগতে সকলই ভগবানের শিশু, তাই বলিয়া তবে একটা পশুকেও বিবাহ করা যায় কি? কথাটা বোধ হয় বড় তীব্র হইল। আচ্ছা, সহজদৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করি। রাস্তার পার্শ্বস্থিত গলিত কুষ্ঠরোগী ঐ যে ভিক্ষুক, উহাকে প্রাণভরিয়া দয়া করা যাইতে পারে, কোলে বসাইয়া সুশ্রুষা করা যাইতে পারে; কিন্তু চরিত্র না জানিয়া বন্ধুত্বে বরণ করা যায় কি? যাঁহার কোঁদলে পাড়া কম্পবান, বিষ-বচনে প্রাণ ম্রিয়মান, ধর্ম্মের নামে যাঁর গুরুতর অরুচি, ব্যবহারে নিদারুণ অশুচি, ভগবদ্ভক্ত তাহাকে ঘৃণা করিবেন না, বরং ভাবপক্ষে খুব দয়া করিবেন, সংশোধনের চেষ্টা করিবেন, কিন্তু কদাপি দাম্পত্যপ্রেমে ভালবাসিবার জিনিস করিতে পারিবেন না। "প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত সকলকেই মনের মানুষ করিতে পারেন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিয়া ভাল বাসিতে পারেন"—ইহা অগভীর কথা। কি জানি, ভগবদ্ভক্তি কেমন তাহা বড় বুঝি না; এরূপ বুঝি হইতেও পারে। কিন্তু সাধারণ লোকে (যাহাদের সংখ্যা জগতে ৮০/১৭॥০), তাহারা কোন প্রকার শিক্ষার প্রভাবেই এ ভগবদ্ভক্তি পাইবে না, কোন দিনই এমন রকম বিবাহ করিয়া গৃহধর্ম্ম করিতে পারিবে না।

এখন পরলোক বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ দার্শনিকতার নমুনা তুলিয়া দেখাইব। অনেক আছে, তবে একটী মাত্র দেখাইব। "শাস্ত্রতে হিন্দুর মতে মানুষ মরিয়া, আপন কর্ম্মফলানুসারে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাই সঙ্গত, ইহাই যুক্তি যুক্ত কথা"। (৭৯ পৃঃ) ভাল, পাঠকগণ একবার এই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কথার যুক্তিসঙ্গতি ও প্রমাণ দেখুন,—"মানুষ মরিলে কি অপর কোন গ্রহ নক্ষত্রে বাস করিতে পারে না?" চন্দ্রনাথ বাবু বলেন "পারে।" কেন পারে, না, এই পৃথিবীতেই এক এক ব্যক্তি এক এক ধাতুর, কেহ মঙ্গলের ধাতুর, কেহ শনির ধাতুর। অতএব এখানেই তাহারা সেই সেই গ্রহ দ্বারা শাসিত হয়। একথার প্রমাণ এই যে, ফলিত জ্যোতিষ্কর্ত্তা একথা বলেন। প্রমাণটা খুব ভাল বটে!! কাজেই তাহারা পরে সেই সেই গ্রহে যাইতে পারে। এ প্রমাণের পরেও যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তবে আরও শুনুন; চন্দ্রনাথ বাবু তর্ক করিয়া বুঝাইতেছেন;—"তুমি বলিবে, আমি ফলিত জ্যোতিষ মানি না। আচ্ছা, নাই মান। আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র আছে, তাত মান। তবে ঠিক করিয়া বল দেখি, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র দেখিয়া মানুষ মানুষ হইয়াছে কি না? অন্ধকার রাত্রে নক্ষত্র খচিত আকাশ দেখিয়া মানুষ দেবতাবে ভোর হয় কি না? তবে কেমন করিয়া বল যে, চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র দ্বারা

তুমি শাসিত নও? যদি তাহাই হয়, তবে তো স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মরিলে পর, চন্দ্র বল, নক্ষত্র বল, যেখানে বল সেই থানেই যাওয়া সম্ভব।" হরিবোল হরি। এই প্রমাণের বলে একথাটা এত সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত? "ফলিত জ্যোতিষ মান না,আচ্ছা চন্দ্র সূর্য্য ত মান?" এইত হইল সব কথার মীমাংসা!! এ সকল কথা কবির কল্পনা বলিয়া পড়িয়াছি, মিষ্টও লাগিয়াছে, আরও পড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দার্শনিকের যুক্তি নয়, জ্ঞানের বাণী নয়। পাঠকেরা এইটী স্মরণ রাখিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর গ্রন্থ পড়িলে সুখী হইতে পারিবেন।

এই সকল কারণে গদ্য হইলেও 'ফুল ও ফল' কবিতা পুস্তক। সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যদি পাঠকগণ একবার কপট রাজনৈতিক আন্দোলন, বৃথা পরগ্লানিময় সংবাদ পত্র পাঠ পরিত্যাগ করিয়া একবার চন্দ্রনাথ বাবুর "ফুল ও ফল" পড়েন, তবে প্রকৃত পক্ষেই লাভবান হইতে পারিবেন; সৌন্দর্য্যে দৃষ্টি পড়িবে; ভালবাসিবার জন্য হৃদয় উন্নত হইবে, এই কোলাহলময় পৃথিবী ভুলিয়া একবার সৌন্দর্য্যময় পৃথিবীর সহিত অনুস্যূত অপার্থিব অনেক কথা মনে আনিতে পারিবেন। কিন্তু সাবধান, যেন মনে থাকে, এগ্রন্থ কবির লেখা, দার্শনিকের বা তার্কিকের নহে। এই কোলাহলের দিনে চন্দ্রনাথ বাবু এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া আমাদিগকে যথার্থই ঋণী করিয়াছেন।

সমালোচনার উপসংহার কালে, পাঠকদিগকে একটী নমুনা তুলিয়া দেখাইব যে, চন্দ্রনাথ বাবুর সৌন্দর্য্যে দৃষ্টি কত প্রখর; ভাবের গাম্ভীর্য্য কত গভীর, শিক্ষা দিবার ক্ষমতা কত অধিক। যে কোকিলের কুহু রবকে, অসার ভোগবিলাসিতাময় সৌন্দর্য্যের সহিত লোকে সম্বন্ধ করিয়া থাকে, একবার চন্দ্রনাথ বাবুর নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ছত্র ভাব যোগে পাঠ করিলে, আর তাহা করিবেনা,—কোকিলের রবে স্বর্গের সংবাদ শুনিবে। চন্দ্রনাথ বাবু লিখিতেছেন;——

"কোকিলের স্বর শুনিলে কেবল বিরহকাতরতা বৃদ্ধি হয়, একথা সত্য কিনা, আমি জানি না। কিন্তু কোলিকের স্বরে বিষ বৈ আর কি কিছুই নাই? সেই সুললিত,সুঠাম, সুমধুর, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নিরাশির ন্যায়, পূর্ণাবয়ব, স্বতঃ উৎপন্ন স্ফূর্ত্তিবৎ কু-উ ধ্বনিতে কি বিষ থাকিতে পারে?" "বসন্তে কাননের কি অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছে। শীতের কুজ্‌ঝটিকা ঘুচিয়া গিয়াছে; সূর্য্যের নবীনালোকে চারিদিক ফুট ফুট করিতেছে। বিমল আকাশে কাননটী বেড়িয়া বেড়িয়া ছোট পাখী গুলি উড়িয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবী সজীব দুর্ব্বাদলে আবৃত। তদুপরি নানা বর্ণ শোভিত পতঙ্গ আনন্দে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। এই সমস্ত হর্ষ—এই সমস্ত উল্লাস—এই সমস্ত স্ফোট—আকাশ এবং পৃথিবীর এই সমস্ত সঙ্গীতময় স্ফূর্ত্তি কিজানি কোথাকার কোকিলের প্রাণে প্রবেশ করিয়া কু উ স্বরে অপূর্ব্বতানে নির্গত হইতেছে। * * * বসন্তের কোকিলের কু-উ ধ্বনি স্ফোটের সঙ্গীতাত্মক প্রতিকৃতি। অপূর্ব্ব বিকাশের অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপনী। * * প্রস্ফুটিত ফুল,প্রস্ফুটিত শিশু, প্রস্ফুটিত যুবা,হোমরের ইলিয়দ,কালিদাসের কুমার, সেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথ, শেলীর স্কাইলার্ক, ফিদিয়সের যুপিতর, বীরশ্রেষ্ঠ গর্ডন, দয়াবতার হাউয়ার্ড, প্রেমোন্মত্ত

চৈতন্য, জ্ঞানোন্মত্ত, ব্রহ্মাণ্ডরূপী ব্যাস, সকলই এক অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনি। বসন্তের কোকিল, তুমি বিকাশের গীত গাও, উন্নতির সঙ্গীত শুনাও, তথাপি তোমাকে এপর্য্যন্ত কেহ চিনিলনা!" এইরূপ অনেক আছে; সে সকল পাঠকেরা নিজে নিজে দেখিয়া লইবেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্নায়বীয় প্রণালী।

(ভেক।)

শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ, ইহা সকলেই জানেন। শরীরের একটী বিশেষ বিভাগ আছে, তাহার সহিত মনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকট সম্বন্ধ—এই বিভাগের নাম স্নায়বীয় প্রণালী। শরীরের মধ্যে সর্ব্বত্র এক রকম সূক্ষ্ম শাদা সূত্র আছে, তাহাকে স্নায়ু বলে। শরীরস্থ সমুদয় স্নায়ু গুলি, অব্যবহিত ভাবেই হউক, আর ব্যবহিত ভাবেই হউক, পরস্পরের সহিত সংযুক্ত—তাহারা এইরূপ সংযুক্ত বলিয়া তাহাদিগের সমষ্টিকে স্নায়বীয় প্রণালী বলে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের নিমিত্ত স্নায়ুর ক্রিয়া আবশ্যক, ইহা অনেকেই জানেন—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পক্ষে যাহা সত্য, জীবনবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা এক্ষণে সমুদয় প্রকার মানসিক ক্রিয়ার পক্ষে সত্য বলেন—অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে মানসিক যে কোন ক্রিয়াই হউক না কেন, তাহার নিমিত্ত একটী স্নায়বীয় ক্রিয়ার প্রয়োজন। মনের পক্ষে যাহা সত্য, শরীরের পক্ষেও তাহা সত্য—শরীরের সমুদয় ক্রিয়ার নিমিত্তই স্নায়বীয় প্রণালীর সাহায্য আবশ্যক। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, স্নায়বীয় প্রণালী আমাদিগের শরীরের একটী কত আবশ্যকীয় বস্তু—সুতরাং শরীরের এই বিভাগ সম্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু জানিয়া রাখা ভাল। স্নায়বীয় প্রণালী সম্বন্ধে আমরা আর একটী সত্য বলিতেছি, যে যেরূপ জন্তু তাহার স্নায়বীয় প্রণালী সেইরূপ—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্তুদিগের স্নায়বীয় প্রণালীতে সাদৃশ্য থাকিলেও সবিশেষ বিভেদ আছে। আশুলার স্নায়বীয় প্রণালী এক প্রকার, মৎস্যের আর এক প্রকার;—মৎস্যের এক প্রকার শূকরের আর এক প্রকার;—শূকরের এক প্রকার, বানরের আর এক প্রকার;—বানরের এক প্রকার, মানুষের আর এক-প্রকার। আমরা এস্থলে ভেকের স্নায়বীয় প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। পরে সুবিধা হইলে অন্যান্য কতকগুলি জন্তুর স্নায়বীয় প্রণালী বর্ণনা করিতে পারি—ভেকের স্নায়বীয় প্রণালীর ধরণ জানা থাকিলে অনেকগুলি জন্তুর স্নায়বীয় প্রণালীর একটী সাধারণ আভাস পাওয়া যায়; ভেকও এই সকল জন্তুদিগকে পৃষ্ঠবংশী জন্তু বলে; কারণ তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ দেশে বংশবৎ একটী হাড়ের মালা আছে। মানুষ, বানর, শূকর, মৎস্য, সর্প, ভেক প্রভৃতি অনেকগুলি জন্তু পৃষ্ঠবংশী শ্রেণীর অন্তর্গত।
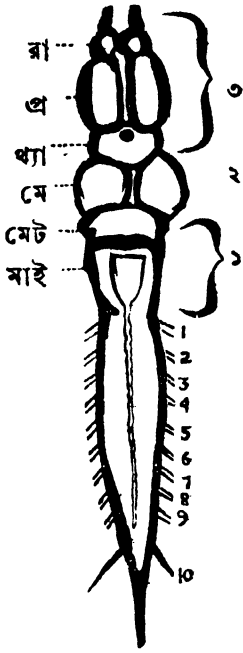
১=অগ্রবর্ত্তী মস্তিষ্ক।
২=মধ্যবর্ত্তী মস্তিষ্ক।
৩=পরবর্ত্তী মস্তিষ্ক।
রা=রাইনেন্ সেফালন।
প্র=প্রসেন্ সেফ্যালন বা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারস্।
থ্যা=থ্যালেমেন্ সেফ্যালন।
মেট=মেটেন্ সেফ্যালন বা সেরিবেলম্।
মাই=মাইয়েলেন্ সেফ্যালন বা মিডলা অবলঙ্গেটা।
মে=মেসেন্ সেফালন বা অপটিক লোবস্।

একটী ভেক ক্লোরোফর্ম দ্বারা মারিয়া সুরা-সারের মধ্যে একটী খোলা পাত্রে রাখিয়া আস্তে আস্তে উহার মাথা ও পৃষ্ঠদেশের হাড়গুলির উপরিভাগ একখানি ছোট কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিলে যাহা দেখা যায়, তাহা ছবিতে দেখান হইয়াছে। আমি এমন বলিতে চাহি না যে, ছবিটী নির্দ্দোষ হইয়াছে, তবে এইমাত্র বলি যে, উহা দেখিয়া পাঠক এখানকার বর্ণনা কতক মনে ধারণা করিতে পারিবেন। ছবিটীর এক অংশ ১, ২, ৩ এই চিহ্ন তিনটী দ্বারা দেখান হইয়াছে—এই অংশটী ভেকের মস্তিষ্ক, উহা মাথায় থাকে—অবশিষ্ট অংশটী পৃষ্ঠবংশে থাকে, ইহাকে আমরা পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু বলিব, কারণ উহা দেখিতে রজ্জুর মত। পাঠক যদি ইচ্ছা করেন, তবে নোটে লিখিত বৈজ্ঞানিক নাম গুলি শিখিতে পারেন—আর যদি ইচ্ছা না হয়, তাহাতেও আপাতত কিছু ক্ষতি নাই। মস্তিষ্কের তিনটী ভাগ—এই তিনটী ভাগকে অগ্রবর্ত্তী, মধ্যবর্ত্তী, ও পরবর্ত্তী মস্তিষ্ক বলা যাইতে পারে। অগ্রবর্ত্তী মস্তিষ্কের সর্ব্বপ্রথমে দুটী ছোট ছোট অংশ আছে—এই দুইটী অংশ নাসিকার দুই পার্শ্বে চলিয়া গিয়াছে—ইহাদিগকেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু বলে—অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্যের নিমিত্ত ইহাদিগের সাহায্য আবশ্যক; এই দুইটী অংশ মূলদেশে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। এই দুই অংশের পর দুইটী বৃহত্তর অংশ আছে—তাহাদিগের নাম পাঠকের জানিয়া রাখা আবশ্যক—তাহাদিগকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারস্ বলে। ভেকের মস্তিষ্কে এই দুইটী অংশ অন্যান্য অংশের তুলনায় যত বড়, মনুষ্যের মস্তিষ্কে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক বড়। বস্তুত এই দুই অংশ উচ্চ শ্রেণীর জন্তুর মানসিক ক্রিয়ার প্রধান স্থান, অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার নিমিত্ত যে সকল প্রধান প্রধান স্নায়বীয় ক্রিয়া আবশ্যক, তাহা এই স্থলে ঘটে। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দুইটীর পর যে অংশ, তাহা হইতে দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু দ্বয়ের উৎপত্তি—দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু দুইটী এই অংশের নিম-

ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া পরস্পরের উপর দিয়া এইরূপ (×) ভাবে চলিয়া যায় এবং মধ্যবর্ত্তী মস্তিষ্কের গোলকবৎ অংশ দুইটীর নিম্নদেশে যুক্ত হয় এবং অবশেষে দুই অক্ষি-গোলকের পশ্চাদ্‌ভাগে প্রবেশ করিয়া তথায় রেটিনা নামক জালে পরিণত হয়। মধ্যবর্ত্তী মস্তিষ্কের পর পরবর্ত্তী মস্তিষ্কের প্রথম অংশ—ইহাকে সেরিবেলম্ অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক' বলে। ভেকের মস্তিষ্কে অন্যান্য অংশের তুলনায় ইহা যত বড়, উচ্চ-শ্রেণীর জন্তুর মস্তিষ্কে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ বড়। ফলত মনুষ্যের মস্তিষ্কের উপরি-ভাগ সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দ্বয় ও সেরি-বেলম দ্বারা আবৃত অন্যান্য অংশ গুলি উপরিভাগে উহাদিগের ন্যায় স্পষ্ট দেখা যায় না। সেরিবেলমের পর মিডলা অব-লঙ্গেটা—ইহার এক অংশ দেখিতে একরূপ ত্রিভুজাকার—এই অংশের মধ্যে ঐ আকা-রের একটী গহ্বর আছে—এই গহ্বর অগ্র-বর্ত্তী মস্তিষ্কের 'থ্যা' চিহ্নিত অংশের ও 'প্র' চিহ্নিত অংশদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ গহ্বরগুলির সহিত সংযুক্ত। আবার এদিকে উহা 'পৃষ্ঠ বংশস্থ রজ্জুর' মধ্যে ক্ষুদ্র একটী থালের মত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ভেকের মস্তিষ্কের দুই পার্শ্ব হইতে সমুদয়ে দশ যোড়া—এক এক পার্শ্বে দশটী স্নায়ু উৎপন্ন হইয়াছে—তাহাদিগের মধ্যে দুই যোড়ার (দর্শন ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের স্নায়ু) পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু দ্বয় পরবর্ত্তী মস্তিষ্কের নিম্নদেশ হইতে উৎপন্ন হয়—বাকী সাত যোড়া স্নায়ুর এস্থলে বিশেষ উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। 'পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু' পৃষ্ঠবংশের পশ্চাৎ দেশে একটী থালের মধ্যে অবস্থিত—উহার অগ্রভাগে একটী এবং পশ্চাৎভাগে একটী খাত আছে। পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু হইতে দশ যোড়া—অর্থাৎ এক এক পার্শ্বে দশটী স্নায়ু উৎপন্ন হই-য়াছে—এই কয়টী স্নায়ুর প্রত্যেকের দুইটী মূল। মূল দুইটী উল্লিখিত খাত দ্বয়ের নিকট হইতে উত্থিত, অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী মূল অগ্রবর্ত্তী খাতের, আর পরবর্ত্তী মূল পরবর্ত্তী খাতের নিকট হইতে। পরবর্ত্তী মূলের উপর একটী ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তু আছে—ইহাকে গ্যাঙ্‌গ্লিয়ন (ganglion) বলে। পৃষ্ঠাবংশস্থ রজ্জুর স্নায়ুগুলি দেহের ধড়ে ও চারিখানি পায়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, আর মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি মস্তকে চারি-দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু ব্যতীত স্নায়বীয় প্রণালীর আর একটী বিভাগ আছে—ভেকের পৃষ্ঠবং-শের সম্মুখ ভাগে দুই পার্শ্বে দুইটী গ্যাঙ্-গ্লিয়নের মালা আছে—এক একটী মালায় দশটী করিয়া গ্যাঙ্‌গ্লিয়ন। এই গ্যাঙ্-গ্লিয়ন মালা দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ুশাখা দ্বারা পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু হইতে উত্থিত স্নায়ুগুলির সহিত সংযুক্ত—মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত পশ্চাদ্-বর্ত্তী দুইযোড়া স্নায়ুর সহিতও মালা দুইটীর যোগ আছে। মালা দুইটীর গ্যাঙ্‌গ্লিয়ন গুলি হইতে স্নায়ু উত্থিত হইয়া রক্তপেশী সমূহ ও উদরস্থ পাকযন্ত্রাদির সঙ্গ গ্রহণ করি-য়াছে।

আমরা একক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে, ভেকের স্নায়বীয় প্রণালীর দুইটী প্রধান বিভাগ (১) মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু এবং (২) পৃষ্ঠবংশের অগ্রভাগ গ্যাঙ্‌গ্লিয়ন-মালা দ্বয়। এই সকল অংশের ক্রিয়া সংক্ষেপে বলা যাইতেছে কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক। স্নায়বীয়

প্রণালী দুই প্রকার প্রধান বস্তু হইতে গঠিত—প্রকোষ্ঠ ও সূত্র। সূত্রগুলির কার্য্য ইঙ্গিত বহন করা, আর প্রকোষ্ঠের কার্য্য ইঙ্গিত গ্রহণ করা কিম্বা উৎপাদন করা। ইঙ্গিত শব্দের অর্থ বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভেকের গাত্র স্পর্শ কর, কিম্বা তাহাকে চিম্‌টি কাট, কিম্বা তাহার গাত্রে তড়িৎ প্রয়োগ কর, অথবা তাহার চক্ষুতে আলোক পতিত হউক, অথবা তাহার জিহ্বায় স্বাদ বিশিষ্ট বস্তু পড়ুক—এই সমুদয় ও অন্যান্য অবস্থায় ভেকের শরীরের বহির্ভাগ হইতে মস্তিষ্কে ইঙ্গিত চলিয়া যাইবে—যাহাদ্বারা সে ঐ সকল ব্যাপার অবগত হইবে—আবার কোন অবস্থায় বিপদ দেখিয়া কিম্বা কোন স্থলে আহার্য্য বস্তু দেখিয়া ভেকের শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা হইল; এরূপ অবস্থায় ভেকের মস্তিষ্ক হইতে শরীরের বহির্ভাগে ইঙ্গিত চলিয়া আসিবে, আর তদ্দ্বারা তাহার গতি সাধিত হইবে। পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, এস্থলে ইঙ্গিত শব্দের অর্থ কি। গ্যাঙ্‌গ্লিয়নগুলিতে এবং মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জুর ধূসর অংশগুলিতে স্নায়ু-প্রকোষ্ঠের সংখ্যা অধিক, আর স্নায়ু গুলিতে এবং মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠাবংশস্থ রজ্জুর শ্বেত অংশ গুলিতে স্নায়ু সূত্রের সংখ্যা অধিক। কতক গুলি স্নায়ুসূত্র মস্তিষ্ক কিম্বা পৃষ্ঠবংশস্থরজ্জু কিম্বা গ্যাঙ্গ্লিয়ন মালার অভিমুখে ইঙ্গিত বহন করে—এই সকল সূত্রকে অভিবাহী সূত্র বলে—আর কতকগুলি স্নায়ু সূত্র বিপরীত দিকে ইঙ্গিত বহন করে—ইহাদিগকে বহির্বাহী সূত্র বলে। অভিবাহী সূত্রের কার্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মে—এই নিমিত্ত উহার আর এক নাম ঐন্দ্রিয়িক সূত্র; বহির্বাহী সূত্রের কার্য্য দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গতিসাধন হয়—এই নিমিত্ত উহার আর এক নাম গতিসাধক সূত্র। মস্তিষ্ক দ্বারা সমুদায় মানসিক ক্রিয়া সাধিত হয়—অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার নিমিত্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া আবশ্যক—মানসিক ক্রিয়ার নিমিত্ত মস্তিষ্কের সমুদয় অংশগুলির মধ্যে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়;—যে ভেকের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়,—যে ভেকের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারদ্বয় নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়—সে আর ইচ্ছা বৃত্তি দ্বারা কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, ফলত তাহার ইচ্ছা বৃত্তি লোপ পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু হইতে উত্থিত স্নায়ু গুলি দ্বারা মস্তক ভিন্ন অন্যান্য অংশের স্পর্শ ক্রিয়া ও গতি ক্রিয়া সাধিত হয়—অর্থাৎ কতকগুলি সূত্র স্পর্শ জ্ঞান সাধক ইঙ্গিত মস্তিষ্ক বহন করে, আর কতকগুলি সূত্র গতিসাধক ইঙ্গিত মস্তিষ্ক হইতে শরীরের ধার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে বহন করে। পৃষ্ঠবংশস্থরজ্জু হইতে উৎপন্ন স্নায়ুদিগের অভিবাহী সূত্র গুলি উহাদিগকে পরবর্ত্তী মূল, আর বহির্বাহী সূত্র গুলি অগ্রবর্ত্তী মূল দ্বারা উত্থিত হয় অর্থাৎ ঐ ঐ মূল দ্বারা পৃষ্ঠবংশ হইতে স্নায়ুতে প্রবিষ্ট হয়। মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্পর্শ ও গতি মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত স্নায়ু দ্বারা সাধিত হয়; দর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদন এই কয়টী ক্রিয়াও মস্তিষ্কের স্নায়ু দ্বারা সাধিত হয়। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কোন ক্রিয়া সাধিত হইবার নিমিত্ত অভিবাহী সূত্র দ্বারা মস্তিষ্কের স্নায়ু প্রকোষ্ঠ গুলিতে ইঙ্গিত যাওয়ার প্রয়োজন হয়, আর ইচ্ছা দ্বারা শরীরের কোন স্থলে গতি সাধিত হইবার নিমিত্ত অভিবাহী সূত্র দ্বারা

সেই স্থলে মস্তিষ্কের স্নায়ু প্রকোষ্ঠ গুলি হইতে ইঙ্গিত আসা আবশ্যক। উপরে লিখিত গ্যাঙ্গ্লিয়ন-মালাদ্বয় তাহাদিগের হইতে উৎপন্ন স্নায়ু দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে পচন রক্ত সঞ্চরণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে; এই সকল ক্রিয়া মনের অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশস্থ রজ্জু ও মনের অজ্ঞাতসারে অনেক কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপ ক্রিয়ার নাম Reflex action বা প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়া, কারণ ইহাতে অভিবাহী ইঙ্গিত মস্তিষ্কে যাইয়া মনের উপর কার্য্য না করিয়া, মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবংশস্থরজ্জু কিম্বা গ্যাঙ্গ্লিয়ন মালা, এই তিনের কোন স্থল হইতে প্রতিবাহী ইঙ্গিত আকারে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। স্নায়ু সূত্রগুলি স্নায়ু প্রকোষ্ঠ গুলির সহিত সংযুক্ত—স্নায়ু প্রকোষ্ঠ গুলির তিন প্রকার কার্য্য, ইঙ্গিত গ্রহণ করা, গৃহীত ইঙ্গিত অন্য কোন স্থলে প্রেরণ করা, আর ইঙ্গিত উৎপাদন করা। স্নায়ু প্রকোষ্ঠ দুই প্রকার ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে পারে—অভিবাহী সূত্রের ইঙ্গিত, আর প্রতিবাহী সূত্রের ইঙ্গিত। ভেকের প্রতিবাহী স্নায়ু সূত্রে ইঙ্গিত এক সেকেণ্ড সময়ে ৫৬ হাতের কিছু অধিক (২৮ মিটার) দূর চলিতে পারে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

আমি-রহস্য।

Our God is an indwelling encompassing reality, present in every force and illumining all space. Not only in contemplation and prayer, but in all the secular details of our daily life, in all our social and domestic duties, yea in our eating and drinking, there is God always speaking to us and showing Himself to us. But unbelievers have ever ascribed to human agency things which belong to God."

"Held fast in His encircling arms I cannot move, but am moved; I cannot speak, but I am made to speak."—*Keshub Chunder Sen.*

আমি কি, আমি কেন?—এ এক গভীর রহস্য। অতি অল্প লোকে এ গভীর রহস্য ভেদ করিতে পারে। অথচ মানুষ যতই সূক্ষ্মদর্শী হইতে বাসনা করে, ততই হৃদয়ের নিভৃত স্থানে,—যেখানে পৃথিবীর কোলাহল বা আন্দোলন পৌঁছে না—পৃথিবীর ফুল ফুটে না, আকাশের চাঁদ হাসে না, সেই অতি নিস্তব্ধ,—অতি নিভৃত স্থানে জাগিয়া উঠে—আমি কি, আমি কেন, আমি কোথায়? এই চিন্তাই ধর্ম্ম সাধনার প্রথম সোপান, এই চিন্তা যখন মানবের হৃদয়কে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকে, তখনই মানুষ স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হয়।

কিন্তু সে দূরের কথা। আমি কি, একথা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে। এই গভীর চিন্তাতে বুদ্ধদেব বনবাসী হইয়াছিলেন, খ্রীষ্ট আত্মহারা হইয়াছিলেন, মহম্মদ উন্মাদের ন্যায় হইয়াছিলেন। এবং সেদিন আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেশবচন্দ্র সেন কত তৃষ্ণা-কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন? এ গভীর রহস্য কেন? আত্মবোধের শেষ নাই কেন?—কূল অকূলে পরিণত কেন? সীমা অসীমে লীন হয় কেন, প্রকৃত রূপে এ গভীর তত্ত্ব ভেদ করা বড়ই কঠিন। ধরি-ধরি-ধরিতে পারি না; পাই-পাই-পাই-না করিতে করিতেই অবা-

মেষী মানুষের জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। এ গভীর রহস্যের উত্তর কোথায় ?

উত্তর পাওয়া যা'ক বা না যা'ক, সৃষ্ট মানুষকে বাধ্য হইয়া কিছু দিন পৃথিবীতে থাকিতেই হইবে। আদি-বোধ নাই ;—পরিণাম ধারণা নাই ;—অথচ মানুষ রহিয়াছে। কি জন্য যেন, মানুষ ভূতের ব্যাগার খাটিয়া মরিতেছে। আমিত্ব হইতেই সমাজত্বের উৎপত্তি ;--আমিত্ব না থাকিলে বহুত্ব বা সমাজত্ব, কিছুই থাকিত না। আমিত্ব না থাকিলে পৃথিবীর কোলাহল বা জালা যন্ত্রণা কিছুই থাকিত না। যদি তাই হয়, তবে আমিত্বের বিনাশ সাধন না করিয়া মানুষ কেন কষ্ট দুঃখের দাসত্ব স্বীকার করিয়া মরিতেছে? কেন দুঃখ, কেন জ্বালা ভুগিতেছে ?—এ কোন কথারই উত্তর নাই ;—অথচ মানুষ আসিয়াছে, থাকিতেছে !—থাকিবে, রহিবে ! কি এক অবিনাশী শক্তি পশ্চাত হইতে মানুষকে ঠেলিতেছে যে,মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া, যে পথ সে জানে না, সেই পথের দিকেই ছুটিতেছে ! সে পথ অতি ভীষণ পথ,—সে পথ মৃত্যু !

কিন্তু মানুষ কি ? মৃত মানুষের শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেল,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত পৃথক করিয়া ফেল—শিরার পরে শিরা, মাংসের পরে মাংস, অস্থির পরে অস্থি, স্নায়ুর উপরে স্নায়ু—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, তাহা হইতে আরো সূক্ষ্ম বাছিয়া বাহির কর ;—কিন্তু এমন কিছুই দেখিতে পাইবে না, যাহাতে আমিত্বের সূক্ষ্ম বীজ—নিহিত। শোণিতই বল, আর মজ্জাই বল, তেজই বল , আর বীর্য্যই বল, সময় তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিতেছে, একবার ভাবিয়া দেখ। মৃত্যুর পরে মানুষকে পৃথিবীর বাজারে অন্বেষণ করিতে যাও-- দেখিবে আর সে মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রূপ মিলাইয়া গিয়াছে,—শরীর পঞ্চ ভূতে মিলিয়া কি হইয়া গিয়াছে ! হায়, হায়, শ্মশানে ভস্মীভূত মৃত শরীরের পরিণাম কে না দেখিয়াছে ? এই ছিল, এই নাই, দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে কি হইয়া গেল ! ইহা দেখিয়া দেখিয়াও মানুষ আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত ! আপনাকে লইয়া থাকাতেই যেন মহত্ব ! আমার শরীর আমার চক্ষের সম্মুখে যে পচিয়া গলিয়া ম্লান হইবে, ইহা আমার প্রাণের অসহ্য ;—পৃথিবীর রোগগ্রস্ত, জলার্দ্র, রৌদ্র-দগ্ধ শরীরকে রক্ষা করিতে মানুষের কত চেষ্টা ! কেবল তাহাই পরিসমাপ্তি নহে। আমি ভাল হইব—দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে ভূষিত হইব—নীতি পরায়ণ হইব—উদার হইব, ক্রমাগত মানবের এই চেষ্টা। এমন লোক পৃথিবীতে নাই—যে উন্নতির জন্য পিপাসিত নয়। এমন লোক জগতে দেখা যায় না, যে অনন্ত উন্নতিকে লক্ষ্য করে নাই। পাপী আর পুণ্যাত্মা, ধনী আর দরিদ্র, মূর্খ আর জ্ঞানী—সকলেরই লক্ষ্য উন্নতি। সে উন্নতি—অনন্ত। অনন্তের পথই মানবের একমাত্র বাসনার পথ। পাইলে আরো পাইতে ইচ্ছা হয়, ধরিলে আরো ধরিতে ইচ্ছা হয়। মানুষ ক্রমাগত অবিশ্রাম উন্নতি হইতে উন্নতিতে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই যে চেষ্টা—ইহার শেষ নাই। নিশ্চেষ্ট মানুষ এই পৃথিবীতে নাই। খাটিয়া খাটিয়া মানুষ মরিতেছে। মরিবার জন্যই মানুষ ছুটিতেছে।

শত শত ব্যক্তি মরিয়াছেন—চক্ষে দেখিয়াও মানুষ আসক্তি-দড়ি ছিঁড়িতে পারে না। মানুষ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে মানুষকে চিতায় ভস্মীভূত করে, কিন্তু তবুও আপন পরিণাম ভাবে না। যে জন্মিয়াছে, সেইত মরিবে; কিন্তু তাহা ভাবিয়া, ভাই, তুমি কি জীবন মমতা ছিন্ন করিতে পার?—আপনার উন্নতির চেষ্টা ভুলিতে পার?—তাহা অসম্ভব। তুমিও পার না, আমিও পারি না। নিরাশার স্বপ্ন মানুষকে চিরকাল ভুলাইতে পারে না। মানুষের ক্ষত অঙ্গ পরিপূর্ণ হয়—মানুষ সকল নিরাশা হইতে উদ্ধার পায়। মরিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণের সম্বল—উন্নতির আশা। মৃত্যুর পরের কথা জানি না, বলিতে চাই না. কিন্তু ইহা ঠিক যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষের প্রাণের সম্বল—উন্নতির পিপাসা-আশা। পিপাসা-আশা এক সঞ্জীবনী শক্তি। চক্ষের জল পড়িতে পড়িতে শুকাইয়া যায়—ভগ্ন হৃদয় দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে। শোক তাপ ও বিপদ আপদের ভ্রুকুটী দেখিতে দেখিতে মানুষ ভুলিয়া যায়। অবশেষে হাসিতে হাসিতে মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। মানুষ নিশ্চয় মরিবে, কিন্তু তাহাও তাহার বিশ্বাস-যোগ্য নয়—তাহারও ধারণা নাই। অন্ধকার যে মানুষের পরিণাম, তাহা কে ভাবিতে পারে? ভাবিতে পারিলে কি জীবন-ভার বহন করা যাইত?—কষ্টের পথে হাটা যাইত?—কখনই নহে। এই জন্যই মানুষ তাহা ভাবিতে পারে না। মৃত্যুর ক্রোড়ে এক পা দিয়াও মানুষ পৃথিবীর দিকে আশার চক্ষে তাকায়। এই যে আশা—এই যে দারুণ আশা, ইহা কি মৃত্যুতেই শেষ হইয়া যায়? তাহাও অসম্ভব। এই আশা ছিল, চক্ষের নিমেষের মধ্যে রক্ত যাই নিশ্চল হইল, যাই মৃত্যু ধরিল, অমনি আশা নির্ব্বাণ হইল, ইহা আমি মানি না। আমি মানি না, তুমি কি মানিতে পার? ইহা মানা তোমার পক্ষেও অসম্ভব। পৃথিবীর কেহই ভাবিতে পারে না যে, মৃত্যুই সকল উন্নতি-আশার পরিসমাপ্তি। পুনর্জন্মেই বিশ্বাস কর, বা আত্মার অমরত্বই স্বীকার কর, তোমাকে মানিতেই হইবে যে, উন্নতি-আশার পরিসমাপ্তি নাই। না মানিলে ধর্ম্ম টিকে না।

এই আশাই—বিশ্বাস। কে যেন বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে। কে যেন মানুষকে অবিরত টানিতেছে। জরা-মৃত্যু-চিন্তা আসিয়া যখন রাজপুত্র সোণার চাঁদ সিদ্ধার্থের হৃদয়কে মলিন করিয়া ফেলিল, তখন কে যেন নীরব ভাষায় ডাকিয়া বলিল—"সন্তান চাহিয়া দেখ, আমি আছি।"—সিদ্ধার্থ অনশনে অনাহারেও জীবিত রহিলেন। আশার জীবন্ত শক্তিতে মানুষ মরিয়াও জীবিত। মৃত্যু কোথায়?—মৃত্যু একটা অবস্থা মাত্র। মৃত্যুর অস্তিত্ব নাই,—মৃত্যুর ভয় নাই—এই আশার নিকটে! বিশ্বাসীর নিকটে আবার মৃত্যুর ভ্রুকুটী? অনাহারই বল, আর অনিদ্রাই বল,—রোগই বল আর শোকই বল—বিশ্বাসীর নিকটে এ সকলের পরাক্রম নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, তাহাকে মানুষ কেন ভয় করিবে? বিশ্বাসীর মরণের ভয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, উন্নতির আশা নাই, এমন মানুষ নাই; সুতরাং অবিশ্বাসী মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নাই। সুতরাং মৃত্যুর ভয় করিয়া মানুষ কোন দিন উন্নতিতে

বিস্মৃত হইতে পারিল না। ঈশা অনশনেও মরেন নাই। ঈশা মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন, তোমরা কি জান না? ইহা কল্পনার কথা নহে; ইহা জীবন্ত সত্য। সকলেই ঈশার ন্যায় মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে অবিরত উত্থিত হইতেছে। এই মরিতেছি, এই উঠিতেছি—আমি। উঠি আবার মরি, মরি আবার উঠি। উঠিতে উঠিতে শেষে মৃত্যুঞ্জয় নাম ধারণ করিয়া মানুষ অমরত্ব লাভ করিতেছে। অমরের সন্তান মরিবে, তুমি, আমাকে এবং তাঁহাকে পড়িতে দেখিয়া ইহা ভাবিতেছ? পড়িয়াছি বলিয়া তুমি উপহাস করিতেছ? ভাই, দেখিতে দেখিতে আবার উঠিব। শিশু একবার পড়ে, আবার উঠে। অনন্তের শিশু মানুষের যদি শতবার পতন হয়, তবে সহস্রবার উত্থান হয়,—তবে সহস্রবার জীবন লাভ হয়। বিশ্বাস-আশা, সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা, মরিতে না মরিতে মানুষকে তুলিতেছে। একবার মরিলে আবার জীবন লাভ। মৃত্যুর হস্ত হইতে কে যেন অবিরত নির্ম্মুক্ত করিয়া দিতেছে। এই জন্যই মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে না। কেন করিবে? এমন অমোঘ ঔষধ মানুষের হাতে থাকিতে কেন ভয় করিবে? করিবার সাধ্য কি? আশা—কেবল আশা, কেবল বিশ্বাস। এই যে বিশ্বাস, ইহার অধিকারী সকলেই। ধর্ম্ম কাহারও একচাটিয়া সম্বল নহে। ধর্ম্ম গুরুতে আবদ্ধ নহে, পুস্তকে নিবদ্ধ নহে, সময় ও কালের অধীন নহে। যিনি আমাকে আশার পথ দেখাইতেছেন, তিনিই তোমাকেও আশার পথ দেখাইতেছেন। যিনি আমাকে রাখিয়াছেন, তিনিই তোমাকে রাখিতেছেন। আমি যাহা বুঝি, তুমি তাহা বুঝ না, ইহা আমি স্বীকার করি না। সকলেরই প্রাণের বিশ্বা[illegible]ক অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিতে;—তা সাকারই হউক বা নিরাকারই হউক। সাকারও নিরাকার, নিরাকারও সাকার। সাকারও গুণের সমষ্টি, নিরাকারও গুণ-সমষ্টি। যাহাই যে মানুক না কেন, অবিশ্বাসী থাকিবার যো নাই। অবিশ্বাস লইয়া কেহই জন্মে নাই। আপনার অস্তিত্ব যে মানে, তাহাকেই মায়ের অস্তিত্ব-জঠর স্বীকার করিতে হইবে। মা ভিন্ন সন্তানের আবির্ভাব জগতে অসম্ভব। সকলেই মায়ের সন্তান; সকলেই বিশ্বাসী। মায়ের নিকট সকল সন্তান সমান। আমি বড়, তুমি ছোট, কিম্বা আমি ছোট, তুমি বড়, ইহা তুমিও আমি ভাবি বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট তুমি ও আমি সমান। মায়ের সকল সন্তানই সমান। অন্য দিকে বড় আর ছোট কি? তুমি ধনী হইয়াও উন্নত হইতে পার, আমি কাঙ্গাল দরিদ্র হইয়াও হইতে পারি। তোমারও লক্ষ্য—উন্নতি, আমারও লক্ষ্য—এই উন্নতি। তোমাকেও যে পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, আমাকেও সেই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, যে বায়ু তোমার জীবন ধারণের কারণ,—তাহাই আমার জীবন ধারণের কারণ হইতেছে। তোমারও পরিণামে মৃত্যু, আমারও তাহাই। ভেদাভেদ, কেবল কূট বুদ্ধি-প্রসূত জঞ্জাল বই আর কিছুই নহে,—কেবল অহঙ্কার হইতে প্রসূত পাপ গরল মাত্র। এ সকল ভেদাভেদে কিছু আসে যায় না। ধনের ভিতরে থাকিয়াও এক জনের উন্নতি হইতে পারে, দরিদ্রতার ভিতরে লালিত পালিত হইয়াও পারে। উন্নতি সকলেরই লক্ষ্য। মৃত্যুর পরে নবজীবন লাভ—

সকলেরই পরিণাম। অবস্থার ভেদাভেদ গণিয়া যে কূটতর্ক [illegible] বড়ই মূর্খ। সূত্রধরের গৃহে ঈশা [illegible] গ্রহণ করিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; আর রাজার গৃহে সিদ্ধার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াও অমর হইয়া গিয়াছেন। সময় ও দেশের মোহ আবরণ ছিন্ন কর, বুঝিতে পারিবে—ঈশা ও বুদ্ধসকল ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছেন। কে সুখী, কে দুঃখী, কে বড়, কে ছোট? এ সকল গণনা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। যে, যে অবস্থায় পতিত, তাহাই তাহার ভাল। দুঃখে পড়িয়াও লোক উন্নতির দিকে চলে, সুখে ভাসিয়াও লোক ঐ পথে হাটে। লোক হাটে, লোক চলে? ভুল কথা। কে যেন হাটায়, কে যেন চালায়। রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র—সকলেরই পরিণাম মৃত্যু ও উন্নতি। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমাকে মরিতেই হইবে। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমাকে মরণের ভিতর দিয়া নবজীবন লাভ করিতেই হইবে। ইচ্ছা কোথায়? আমিত্ব কোথায়? সকলই তিনিত্ব—সকলই তিনিময়। তুমি ইচ্ছা করিয়াই শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিতে পার না—অনাহারে থাকিতে পার না। তোমাকে কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে। তোমার শরীর ধারণ করিবার জন্য অন্নের গ্রাস মুখে দিতেই হইবে। লোভ নামে যে একটা কথা আছে, সেটা তুমি আমি সৃষ্টি করি নাই। আহারে স্পৃহা প্রত্যেকেরই আছে—কেবল বাঁচিবার জন্য। শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেই হইবে; পরিবার প্রতিপালন করিতেই হইবে; অসহায় দারিদ্রের জন্য অশ্রু ফেলিতেই হইবে—পৃথিবীর মঙ্গল চিন্তা করিতেই হইবে। সে কি জন্য? কেবল আপনার উন্নতির জন্য। পৃথিবীর সকল কর্ত্তব্য বোধ আপনার উন্নতির জন্য। কর্ত্তব্য নামক যে একটা কথা আছে, সেটা কেবল আপনার উন্নতির জন্য। তুমি যে চেষ্টা কর, ইহা তুমি ঠিক বলিতে পার না। কি এক অবিনাশী শক্তি পশ্চাত হইতে ঠেলিতেছে, মানুষ অবাক হইয়া আত্মহারা হইয়া কেবল চলিতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—মানুষ ক্রমাগতই চলিতেছে। হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব, খ্রীষ্টানত্ব—বৌদ্ধত্ব—সকলত্বই উন্নতির নিম্নতর সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতেছে। খুব গভীর ভাবে মানুষ যখন চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তখনই মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়, তখনই পিতা পুত্রে সম্মিলন হয়। তখনই পুত্র বলে "Not I, but my father in me." আমি নহি, পিতাই আমাতে বিদ্যমান! কি উচ্চ কথা। পুত্রত্ব ঘুচিয়া কেবল—পিতৃত্ব! কি আত্মত্যাগ—কি স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! পিতৃত্বে ডুবিলে পুত্রত্ব ঘুচিয়া যায়। এ শরীর তাঁহারই শরীর—এ শোণিত তাঁহারই শোণিত। তাঁহারই সব—আমি কিছুই নই। আমিত্বের অস্তিত্ব অহঙ্কার মূলক কথা—প্রকৃত পক্ষে উহা কিছুই নহে। তাঁহারই ইচ্ছাতে আছি, তাঁহারই ইচ্ছাতে যাইব। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছারই জয়। মানুষ তাহারই হাতের পুত্তলিকা মাত্র। তিনিই যন্ত্র চালাইতেছেন—আমরা কেবল যন্ত্র মাত্র। আমি যে কলম ধরিয়া লিখি, সেই কলম যেমন আমি নহি, তিনি আমা[illegible] দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন [illegible]—আমরাই তিনি নহেন। মানুষ, তোমরা ভুল বুঝিও না। মানুষে ঈশ্বর নহে;

কিন্তু মানুষে ঈশ্বর। বস্তুই ঈশ্বর নহে, কিন্তু বস্তুতে—ঈশ্বর। দ্বৈতবাদের ভিতরে, অতি সূক্ষ্ম স্থানেই অদ্বৈতবাদ লুক্কায়িত! তন্ময়ত্ব লাভ করিলে, আমি-ময়ত্ব ঘুচিয়া যায়। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। ছায়া নিবিয়া যায়। মোহ আবরণ ছিন্ন হইয়া যায়। তখনই মানুষ বলে, "হে আশা, হে বিশ্বাস, হে শক্তি, তুমিই সর্ব্বস্ব, আমি কিছুই নই। বলে, আমিই তুমি নও, কিন্তু তুমিই সকল, আমি কিছুই নই। সকল তুমি, সর্ব্বস্ব তুমি, শক্তি তুমি, মুক্তি তুমি, জীবন তুমি, উন্নতি তুমি।" অনন্ত অপার চক্রে পড়িয়া মানুষের অস্তি তখন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। তখনই ঈশা সন্তান বেশে পুনরুত্থিত হইয়া পুত্রত্ব প্রচারের জন্য বিনরাবতার ধারণ করে—বুদ্ধ তখন নির্ব্বাণ-পদ লাভ করে। তখন প্রকারগত বা মতগত বা সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ আর থাকে না। পৃথিবী তখন স্বর্গ হইয়া যায়। অনন্তের সন্তানগণ অনন্ত কণ্ঠে তখন কেবল মায়ের নামই গান করে। তখন পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বই সর্ব্বস্ব বলিয়া সন্তানের নিকট বোধ হয়। অবোধ অনন্তের শিশু সন্তান তখন পিতা মাতা বই আর কিছুই জানে না। তখন মানুষ দেখে, তিনি যেন সকল গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন। অস্থিতে তিনি, মাংসে তিনি, মজ্জায় তিনি, প্রতি লোম-কূপে তিনি, শোনিত বিন্দুতে বিন্দুতে তিনি [illegible] যেন তিনিময়, আকাশ—চন্দ্র সূ[illegible]ময়, বন উপবন তিনিময়—ফুল ফল [illegible]। সাগর—পাহাড় পর্ব্বত—সব তিনিময়। একই শক্তি সকলে, একই প্রাণ সকল বস্তুতে। প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীব[illegible] আপন সত্বা তখন বিশ্ব-সত্বায় [illegible] ক্ষুদ্র বারিবিন্দু অগাধ অতলস্পর্শ সাগরে তখন মিশিয়া গিয়াছে। পৃথকত্ব, বৈচিত্র্য, বৈষম্য, সকল ঘুচিয়া, একত্ব, এবং সাম্য সকল ঘটে বিদ্যমান। একরূপ ভাঙ্গিয়াই বিভিন্ন, এক হইতেই বহুত্বের উৎপত্তি। বিভিন্ন মিলিয়া একত্বে পরিণত। এই প্রকার যখন মানুষ তিনিময় হইয়া যায়, তখন শান্তিপুরের শান্তি-ঘাটে বসিয়া একতারা লইয়া গগন কাঁপাইয়া মায়ের সন্তান কেবল মায়ের নাম গান করিতে থাকে। সকল সুখ—সকল সম্পদ তখন তাহার জীবনে অবতীর্ণ হয়। অভেদাত্মক হইয়া সে তখন সোণাতনী তনু লাভ করে। মানুষ তখন দেবত্ব লাভ করে। পশুত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব হয়। মৃতব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়। সংসার-গোর হইতে ক্রুশ-বিদ্ধ মানব-তনয় তখন পুনরুত্থিত হয়। বিশ্বাস যখন যাঁহার প্রাণের সম্বল হয়, তখন তাঁহাকে এই প্রকারে আমি-রহস্যের মীমাংসা করিতেই হইবে। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

বিলাপ।

প্রাণের ভিতরে হেন,
তুমুল ঝটিকা কেন,
আলোড়িত এ হৃদয় চল্লোর্ম্মি আঘাতে

শূন্য মরুভূমি মত,
হুহু করে অবিরত,
ভাসিতেছে হৃদি সদা নিরাশার স্রোতে।

জানিতাম এ সংসার সুখের স্বপন,
স্বপন বালিকা সনে করিতাম খেলা,
হৃদি মাঝে পরিতাম স্বপনেরমালা ;
কোথায় সে নন্দন কানন ?
মিশাইল কাল বক্ষে জলবিম্ব হেন।

৩

জানিতাম এ সংসার সুখের আগার ;
তরল জোছনা মেখে
জোছনায় বুক ঢেকে
শ্যামল তৃণের পরে রাখিতাম এ ভাঙ্গা সেতার,
জোছনা মদিরা ধারা ঝরিত গো নয়নে
আমার।
অকস্মাৎ কেন হায় এ বাত্যা প্রবল
আলোড়িত করিতেছে হৃদি মরুস্থল।
কোথায় সে কৌমুদী তরল !
দিশাহারা অন্ধকার উগারিছে দারুণ গরল !!

৪

অন্তরের নিভৃত বেলায়,
নিরাশা পিশাচী
ফেলিতেছে অবিরল দারুণ নিশ্বাস ;
এ ভাঙ্গা হৃদয়ে মোর হইতেছে প্রতিধ্বনি তার।

৫

ওই যে ওখানে,
বকুলের শাখে,
মাতায়ে ভুবন,
কুহরিল পিকবর সুমোহন স্বরে,
আমার হৃদয়ে হেন,
নিরাশা বসিয়া কেন
অবিরত হায় হায় করে !
বনের বিহঙ্গ কেন কাঁদায় আমারে !

৬

এই যে এ স্রোতস্বিনী
করি কুলু কুলু ধ্বনি,
অবিরল কাঁদিতেছে পরের বেদনে,
আমি যদি যাই ওই তটিনীর পাশে
জানাতে গো প্রাণের বেদনা ;
আঘাতি উভয় তটে
অমনি চলিয়া যায় উচ্চহাসি হেসে !

৭

যদি কভু যাই,
বারিধির ঠাঁই,
নিবাতে এ হৃদয়ের প্রচণ্ড দাহন
আমারে হেরিয়া
অনন্ত সে সিন্ধুনীর যায় শুকাইয়া !

৮

তুমিও কি মহীধর তাহার মতন
বুঝ নাই পরের বেদন ?
পাষাণ অন্তর তব দ্রবেনি কখন ?
অথবা তা' কভু নয়,
তা' হ'লে যে ভেদি ওই পাষাণ হৃদয়
ঝর ঝর ঝরে,
নির্ঝরের ধারে
অবিরল নেত্রাসার হ'তোনা পতন !

৯

তুমি হে পবন
জগৎ জীবন,
কি কহিছ মৃদুস্বনে কুসুমের কাণে ?
নিরাশার স্রোত কি হে তোমারও জীবনে ?
তুমিও কি আমার মতন,
প্রাণের যাতনা তব
জানাতেছ তটিনীরে মৃদুল নিস্বনে !

১০

ওহে স্রোতস্বিনি,
হেসোনা হেসোনা ওই মর্ম্মভেদী হাসি।
আজি যেন যৌবনের গরবে মাতিয়া
তরঙ্গে তরঙ্গে সখি নাচিয়া নাচিয়া

চলেছিস্ সাগর উদ্দেশে
বুকভরা ভালবাসা দিতে লো প্রাণেশে।
দেখেছি তোমায়, যবে
দুরন্ত ঝটিকা সনে
প্রেমোন্মত্ত পারাবার নিজে মেতে বয়,
পাষাণে চাপিয়া বক্ষ অবিরল করেছ রোদন,
শুনেছি তোমার সেই মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন।

১১
যাও সিন্ধু বহি যাও অনন্ত প্রবাহে;
কলুষিত করিব না নয়নের জলে
পবিত্র বালুকাময় তোমারও কূলে।
কিন্তু দেব,
অনন্ত ও মরুময় তোমার বেলায়
দিও স্থান দিও দেব কাতর জনায়!

শ্রীঅটলবিহারী সিংহ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **সারধর্ম্ম বা তত্ত্বসার**।—বগুড়া আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় হইতে প্রচারিত—বিনামূল্যে বিতরিত। আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক বিবৃত প্রবন্ধ সকল ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের চাঁদাতে ইহা প্রচারিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু প্রবন্ধগুলি কিছু বাছিয়া বাছিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হইত।

২। **হিন্দুশাস্ত্র**—জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ড, শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষাল কর্তৃক সঙ্কলিত; মূল্য ১৷৷০। এই বিপিন বাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এবার তিনি নানা শাস্ত্র হইতে অসংখ্য শ্লোক সংগ্রহ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড কিরূপ ছিল, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন এবং পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। বিপিন বাবুর অধ্যবসায়কে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার সঙ্কলিত এই উপাদেয় গ্রন্থখানি এই বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ ধর্ম্মান্দোলনের সময়ে যিনি পড়িবেন, তিনিই হিন্দুধর্ম্মের গভীর মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন।

৩। **কবিতা-হার**।—শ্রীগঙ্গানারায়ণ সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল্য৷৵০। গঙ্গানারায়ণ বাবুর কবিতায় অনেক নূতন ভাব, অনেক নূতন কথা দেখিলাম। অনুকরণপ্রিয় বঙ্গে তিনি যে আপন পথে আপন মনে চলিতে পারিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে প্রশংসা করি। চেষ্টা, যত্ন, এবং অধ্যবসায় থাকিলে ভবিষ্যতে গ্রন্থকারকে আরো উন্নতদরের কবিতা লিখিতে দেখিব, আশা আছে।

৪। **বনফুল**—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ, প্রণীত, মূল্য ৷৷০ মাত্র। এই পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করা ভাল দেখায় না। অবশিষ্ট প্রবন্ধ গুলি সুপাঠ্য, চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ। ক্ষীরোদ বাবু এক জন কৃতবিদ্য লোক—তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো হইবে। এই পুস্তক খানি যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই সুখী হইবেন।

৫। **ফরিদপুর সুহৃদ সভার পঞ্চম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ**। এই সভার কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। সভা নীতিশিক্ষা এবং ব্যায়াম শিক্ষার ভার গ্রহণ

করিয়াছেন। অধিকন্তু এবৎসর হইতে সভা রজনী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। সভার মঙ্গল উদ্দেশ্য সকল পূর্ণ হউক, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৬। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর অষ্টম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। সভার কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। কলিকাতাতে পূর্ব্ব বঙ্গের যত গুলি সভা আছে, তন্মধ্যে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গত বৎসর ১৩৫৯৸/১৫ আয় হইয়াছে এবং ৬২০৸৶০ ব্যয় হইয়া ৭৩৮৸৵১৫ স্থিত আছে। সভ্যগণের উৎসাহের বিশেষ পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যায়। উৎসাহ সম্বন্ধে শ্রীহট্ট সম্মিলনী সকল সম্মিলনীর আদর্শ স্থল। সভ্যগণের এই উৎসাহ স্থায়ী হইলে শ্রীহট্টের অনেক অভাব দূর হইবে।

৭। বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত— শ্রীমহেন্দ্র নাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত; মূল্য ৸০। শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবু জীবিত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশিত হইল, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশের প্রধান অভাব এই—আমরা মহৎ লোকের সম্মান করিতে আজও শিখি নাই। লোকের মহত্ত্ব দেখিতে যে না জানে, তাহার উন্নতিলাভ অসম্ভব। কিন্তু আমাদের এমনি প্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা লোকের দোষ ভিন্ন গুণ দেখিতে পারি না। অন্য লোকের মহত্ত্ব আছে, ইহা স্বীকার করিতে আমাদের প্রাণ অহঙ্কারে স্ফীত হয়। এই কারণে আমাদের দেশে প্রকৃত মহৎলোক অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও আদর নাই। আদান প্রদানের স্রোত স্থগিত হইয়াছে। এই জন্য আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা দারুণ দুঃখ জাগিতেছে। এই সময়ে মহেন্দ্র বাবু আমাদের দেশের একজন প্রকৃত মহৎ লোকের জীবনী প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের যে বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। এই কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় মহেন্দ্র বাবুর জীবন সার্থক হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রকাশিত ঘটনা সকল লইয়া কোন কোন সহযোগী কিছু আন্দোলন করিয়াছেন। সে সকল ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা নিতান্ত অল্প। এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি, সাম্প্রদায়িক তর্ক বিতর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবুর মতামত না দিলেই ভাল হইত। স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। সে যাহাই হউক, মহেন্দ্র বাবুর ভাষা পরিপাটী এবং জীবন চরিত লিখিবার তাঁহার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে।

৮। সাধক সঙ্গীত—শ্যামা বিষয়ক পদাবলী, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত; মূল্য ।০। এই ধর্ম্মান্দোলনের যুগে এরূপ ভক্তিভাব পূর্ণ সঙ্গীত পুস্তক সকলেরই আদরের জিনিস। এই পুস্তক খানি সকল শ্রেণীর ভক্তি শিক্ষার্থীর পক্ষেই উপকারী হইবে। কৈলাস বাবু যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা যৎসামান্য নহে। এজন্য তাঁহাকে যে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

৯। ভারতরহস্য—প্রথমভাগ, শ্রীরাম

দাস সেন প্রণীত; মূল্য এক টাকা। মানুষ যতই বিজ্ঞ এবং প্রবীণ হউক না কেন, অতীত মানব সমাজের ইতিবৃত্ত পাঠে তাঁহাকে পরিতুষ্ট হইতে হইবেই হইবে। নব্যভারত পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের ধান্দায় পড়িয়া প্রাচীন ভারতের কীর্ত্তিকলাপের প্রতি কিছুকাল বড়ই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, কিন্তু পরম সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতের সে দিন ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া যাইতেছে। নবীনত্ব ও প্রাচীনত্বের সংযোগে ভারতের ক্রমেই এক অপরূপ বেশ হইতেছে। যাঁহারা নবীন বিজ্ঞান-প্রধান-যুগে প্রাচীন জ্ঞান সংযোগ করিতেছেন, তাহারা যে ভারতের কি মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন, ভাবী বংশধরেরা সে বিচার করিবে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, তাঁহারা স্বদেশের প্রিয় সন্তান—মাতৃ ভূমির সংপুত্র, তাঁহাদের নিকট আমরা বড়ই ঋণী। রামদাস বাবু প্রাচীন ভারতের নানা প্রকার তত্ত্ব সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া বড়ই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতেছেন। তাঁহার যত্ন, অধ্যবসায় ও চেষ্টা দেখিলে অবাক হইতে হয়। এই গ্রন্থে সমযোগ, আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, অসি, দেবযান, রাজসূয়যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, পুরুষমেধ যজ্ঞ, রাজাভিষেক, যুদ্ধরহস্য ও যুদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় কয়েকটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি গবেষণা পূর্ণ। এই গ্রন্থ প্রাচীন তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিগণের নিকট যে বিশেষ রূপে আবৃত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

১০। **মানব প্রকৃতি—দ্বিতীয়খণ্ড—** শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ প্রণীত; মূল্য দুই টাকা মাত্র। অষ্ট পল্লবে এই গ্রন্থ খানি শেষ হইয়াছে। বিবর্ত্তবাদ অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ আদৃত হইতেছে, তাহাতে এ সন্দেহ আর কাহারও মনে নাই যে, বিবর্ত্তবাদ অসম্ভব। জগতের সকলেরই লক্ষ্য—উন্নতি। উন্নতি লাভ করিতে করিতে মানব পূর্ব্ব প্রকৃতি ও স্বভাব হইতে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবের ন্যায় হইয়াছেন, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মতই—ক্রম উন্নতি। ক্ষীরোদ বাবু বিবিধ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বিবর্ত্তবাদের সমস্ত মত গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জাতীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মৌলিকতার ভাণ করেন নাই। বড় বড় বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মত সকলকে একত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা জানি, তাঁহার প্রতি এক শ্রেণীর লোকের বিজাতীয় ঘৃণা আছে। সে শ্রেণীকে কখনই উদার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ পৃথিবীতে মত আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলই বিচার করিয়া দেখা উচিত;—অন্যের কথা শুনিব না, অন্যের মত পড়িব না, এ মত নিতান্ত অনুদার। এই মত কখনই জগতে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে না। ক্ষীরোদ বাবু সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকিলেও কখনই সর্ব্বসাধারণের নিকট অশ্রদ্ধা পাইবেন না। আজ হউক, কাল হউক, ক্ষীরোদ বাবুর এই উদ্যমের, এই অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে এদেশে সহস্র তত্ত্বান্বেষী যুবক জন্ম গ্রহণ করিবে। আমরা এরূপ চিন্তা পূর্ণ গ্রন্থের বড়ই পক্ষপাতী। এগ্রন্থ কল্পনার বৃথা ক্রীড়া নহে;—ইহাতে অনেক গভীর তত্ত্ব কথা আছে; তাহা পড়িলে জীবন সম্বন্ধে এক গভীর রহস্য বাহির হইয়া পড়ে। সে সকল কথার উল্লেখ করিবার স্থান নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। এ গ্রন্থ ক্রমেই ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ স্বদেশীয় পাঠকগণের নিকট আদৃত হইবে; এবং ক্ষীরোদবাবুর পরিশ্রম সফল হইবে।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম (৩য়)।

চৈতন্যের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা

চৈতন্য জীবনের শেষ অষ্টাদশবর্ষের ঘটনাবলী উড়িষ্যার নীলাদ্রিতে সংঘটিত হইয়াছিল; এবং উৎকল রাজ ও তাঁহার প্রধান সভাসদগণ চৈতন্যের প্রিয়ভক্ত ছিলেন, সুতরাং সে দেশের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এ প্রস্তাবের নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নহে। চৈতন্য জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশ যেরূপ স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়া যবন করতলন্যস্ত হইয়াছিল সৌভাগ্য ক্রমে উড়িষ্যার অবস্থা তখন সেরূপ ছিল না। তখনও নীলাচলের রাজপ্রসাদে হিন্দুস্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়িতেছিল এবং সমস্ত উৎকল দেশবাসী স্বাধীনভাবে কালযাপন করিতেছিল। অধিক সৌভাগ্যের বিষয় এই যে চৈতন্যদেবের সময়ে বাঙ্গালীবংশীয় রাজাগণ উড়িষ্যার নৃপাসনে আসীন ছিলেন।

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে ৪৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের সিংহাসনে কেশরীবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে কেশরীবংশ ধ্বংশ করতঃ গঙ্গাবংশের জনৈক রাজকুমার উৎকল সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। সেই হইতে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ একাদিক্রমে উড়িষ্যায় রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজাগণের সময়ে কেবল কয়েক বৎসর সিংহাসন লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছিল। সে যাহা হউক চৈতন্যের সময়ে গঙ্গাবংশীয় প্রতাপ রুদ্র নামে নরপতি উড়িষ্যার রাজাসনে আসীন ছিলেন। অধ্যাপক উইলসন সাহেব সাব্যস্ত করিয়াছেন যে মেদিনীপুর ও তমলুকের মধ্যবর্ত্তী স্থান বিশেষ হইতে গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ প্রথমে উৎকলে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই রাজাগণ যে জাতীতে বাঙ্গালীছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব দিগের গ্রন্থে রাজা প্রতাপরুদ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও উইলসন সাহেবের কথাই দৃঢ়ীভূত হয়। কারণ এই রাজা অতিশয় বাঙ্গালীর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রধান সভা পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। প্রধান সভা পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল।

রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার মনোগত ইচ্ছা পত্রের দ্বারায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে জানাইলে ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গতঃ ঐ কথা চৈতন্যকে জানাইলেন। স্ত্রী ও রাজদর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ; সুতরাং সন্ন্যাসী চূড়ামণি চৈতন্য এই কথা শ্রবণমাত্রে (বিষ্ণু) (বিষ্ণু) বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন ও সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, যে যদি তিনি পুনরায় ঐরূপ কথার প্রসঙ্গ করেন তবে আর তাঁহাকে নীলাদ্রিতে দেখিতে পাইবেন না। সার্ব্বভৌম পরাস্ত মানিয়া অগত্যা ঐ কথা রাজাকে জানাইতে বাধ্য হইলেন। প্রতাপ রুদ্র

গৌরাঙ্গের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ঐ কথা শ্রবণে মর্ম্মাহত হইলেন এবং চৈতন্যের সাক্ষাৎকার না পাইলে রাজ্যাদি সমস্ত বিষয়বৈভব পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভগবৎপ্রেমিক রামানন্দ রায় নর্ম্মদা প্রদেশে প্রতাপ রুদ্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ কালে গোদাবরী তীরে চৈতন্যের সহিত তাঁহার মিলন হওয়ার পর রামানন্দ রায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল চৈতন্যের সহবাসে কাটাইবেন। এই মনোগত ইচ্ছা তিনি রাজাকে নিবেদন করিলে রাজা প্রতাপরুদ্র আহ্লাদ সহকারে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ও তাঁহার নির্দ্ধারিত বেতন তাঁহাকে পেন্‌শন্ স্বরূপ মাসে মাসে দেওয়া হইবে তাহার ও আদেশ করিয়া দিলেন; এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার দ্বারায় চৈতন্যের সাক্ষাৎ দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন।

"তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন;
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ।
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই ভজে তাঁর সফল জীবনে।" চৈঃ চঃ

রামানন্দ রায় চৈতন্য সমীপে রাজার এই কাতরোক্তি বিজ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফলোদয় হইল না। তখন গজপতি প্রতাপরুদ্র আপন রাজধানী কটকনগর হইতে সার্ব্বভৌমকে এই দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন যে যদি তিনি গৌরাঙ্গের দর্শন না পান তবে নিশ্চয়ই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া চলিয়া যাইবেন। এই পত্রে তিনি মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদগণকেও অতি দীন ভাবে আত্ম নিবেদন জানাইয়া ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত চৈতন্যের নিকট অনুরোধ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। এই পত্র পাঠ করিয়া নিত্যানন্দপ্রমুখ সমস্ত ভক্তগণ চৈতন্যকে চটেপটে ধরিলেন; কিন্তু ধর্ম্মবীর চৈতন্য কিছুতেই আপন বিশ্বাস হইতে টলিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া এক রফা বন্দোবস্ত করিলেন যে চৈতন্যের একখানি বহির্বাস রাজসমীপে পাঠান হইবে। চৈতন্যের পরিবর্ত্তে রাজা ঐ বহির্বাসকে আলিঙ্গন করিতে পাইবেন। তাহাই করা হইল। তাহাতে রাজা কতক শান্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিল না। তখন চৈতন্যদেব রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলে রাজা আপন তনয়কে গৌরাঙ্গ সন্নিধানে পাঠাইলেন। গৌরাঙ্গ মহানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজাও পরে সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৫১০ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু বঙ্গদেশ দিয়া বৃন্দাবন যাইবার মনস্থ করিয়া কটক নগরে চলিয়া আসিলেন এবং নগরের বহিরুদ্যানে আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি প্রভুর আগমন বার্ত্তা রাজস্থানে জানাইলে রাজা প্রতাপ রুদ্র যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন এবং বহুকাল সঞ্চিত মনের গাঢ় অনুরাগ এখন অনায়াসে চরিতার্থ হইতে পারিবে ভাবিয়া অতি ব্যস্ততার সহিত যাইয়া চৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন ও প্রণয়বিহ্বলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট

হইয়া তখন তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

"শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা;
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয় বিহ্বল;
স্তুতি করে পুলকাঙ্গে পড়ে অশ্রুজল।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন;
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।'

চৈঃ চঃ

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন উড়িষ্যারাজ ও বঙ্গেশ্বরে যুদ্ধ হইতেছিল। উৎকল সীমার পর পারে যবন রাজ্য। পথে দস্যুভয় ও যবনসৈনিকগণের প্রচুর অত্যাচার ছিল। বঙ্গদেশে যাইতে পথি মধ্যে চৈতন্যের কোন অসুবিধা না হয় ও যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বঙ্গদেশে পৌঁছিতে পারেন এই উদ্দেশে রাজা প্রতাপরুদ্র প্রদেশস্থ ও বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারীগণকে পত্র লিখিয়া দিলেন, এবং পথের দুই পার্শ্বে সামগ্রীসম্ভার প্রস্তুত থাকে ও জলপথে নৌকার সুব্যবস্থা হয় এরূপ উপায় করিয়া দিয়া রামানন্দরায় ও আপনার প্রধান অমাত্য শ্রীহরিচন্দন ও মঙ্গরাজকে তাঁহার সমভিব্যাহারে দিয়া পাঠাইলেন। সচিবদ্বয় যাজপুর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দ রায় রেমুণা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যের সঙ্গে বহু ভক্ত মণ্ডলী যাইতে লাগিলেন। যেখানে যান রাজকর্ম্মচারীদের সুব্যবস্থায় সেইখানে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এই প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ বহু ভক্ত সমাকীর্ণ হইয়া উৎকলের সীমান্তঃপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উৎকলরাজের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে ৩।৪ দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহার নিরাপদে বাঙ্গলায় যাইবার জন্য যবন রাজকর্ম্মচারীর সহিত সন্ধিস্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।

"দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে;
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে।" চৈঃ চঃ

এই সময়ে যবনরাজের এক অনুচর উড়িয়াদিগের কটকে আসিয়া মহাপ্রভুর ভক্তিভাব ও নামসংকীর্ত্তন দেখিয়া গিয়া আপন প্রভুকে জানাইল। যবনাধ্যক্ষ তাহা শুনিয়া চৈতন্যকে দেখিতে ইচ্ছুক হওত আপন বিশ্বাসী অনুচর দ্বারায় আপন অভিলাষ বলিয়া পাঠাইলেন। উৎকল রাজাধ্যক্ষমহাপাত্র প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি নিরস্ত্র হইয়া কেবল দুই চারি জন ভৃত্য সঙ্গে আসিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পারেন; নচেৎ নহে। যবনরাজ সেই প্রকারেই আসিয়া চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম ভক্তির ভাবাবলোকনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই দাম্ভিক যবন আপন পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন, এবং বালকের ন্যায় পরিত্রাণের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন যবনাধ্যক্ষ চৈতন্যের বঙ্গ গমনের সকল সুবিধা করিয়া দিলেন এবং জলপন্থায় উত্তম উত্তম নৌকা সজ্জিত করিয়া দিয়া জলদস্যুগণ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে, সেই জন্য পিছলদা পর্য্যন্ত স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। সেখান হইতে তিনি বিদায় হইয়া

গেলে চৈতন্য দেব তাঁহার দত্ত নৌকারোহণে নির্ব্বিঘ্নে পানীহাটী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন।

"জল দস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল,
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল।
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদী পার করাইল;
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।
সেকালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে;
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।"
চৈঃ চঃ

এক্ষণে যে জমিদারী প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহার মূলান্বেষণ করিতে গেলে মুসলমান্ রাজাদিগের অধিকার সময় নির্ব্বাচন করিতে হয়। ইতিহাস পাঠে জানাযায় যে মুসলমান্ রাজগণ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড সকল উৎপন্ন শস্যের অংশের গড় পড়তা ধরিয়া করাবধারণ করত ভূম্যধিকারীগণকে বিলী করিয়া দিতেন; ও তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ কর আদায় করিয়া লইতেন। ভূম্যধিকারীগণ করাদায়ে অশক্ত হইলে বা দুষ্টামি করিলে সরকার হইতে ক্রোক সাঁজোয়াল নিযুক্ত করিয়া আদায়ের চেষ্টা হইত। ইংরেজাধিকারের প্রথমাবস্থাতেও এই প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের শাসন কালে ঐ নির্দ্দিষ্ট করে জমিদারী সকল চিরকালের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; এবং অদ্যাবধি তদনুসারে করাদায় হইয়া আসিতেছে। জমিদার, তালুকদার, মকররীদার প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদ হইতে কর্ষণকারী কৃষক পর্য্যন্ত এক্ষণে বহুবিধ স্বত্বের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারও অঙ্কুর মুসলমানদিগের আমলে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থের অনেক স্থানে এইরূপ ভূম্যধিকারীর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে এস্থানে যে ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করাযাইতেছে, তাহা হইতেই পাঠক মহাশয় তৎকালের রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার আভাস পাইতে পারিবেন।

চৈতন্যের সময়ে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুই সহোদর সপ্তগ্রাম জমিদারীর ভূম্যধিকারী ছিলেন। এই জমিদারীর বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকা ছিল। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন অতিশয় বদান্য, সদাচার নিষ্ঠ ধার্ম্মিক এবং ব্রাহ্মণ ভক্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন। কথিত আছে যে নবদ্বীপে এমন ব্রাহ্মণ ছিল না, যাঁহারা তাঁহাদের ব্রহ্মোত্তর পাইতেন না বা অর্থে প্রতিপালিত হইতেন না। চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র ইহাদিগকে উত্তম রূপে জানিতেন; উভয় ভ্রাতা তাঁহাদের সেবায় বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন। কালক্রমে গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য অনেক টাকার জন্য বাকিদার হইলে একজন মুসলমান্ চৌধুরী হিরণ্য দাসের জমিদারী ডাকিয়া লইল। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় দখল ছাড়িয়া না দেওয়ায় সে ব্যক্তিও রাজ সরকারে বার লক্ষ টাকার দায়ীক হইল। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া রাজসরকারে দরখাস্ত করিয়া উজীরকে সরেজমিনে আনাইল। ভ্রাতাদ্বয় এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে পলায়ন করিলেন। উজীর আর কাহাকেও না পাইয়া গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাসকে কারাবদ্ধ করিলেন। এই রঘুনাথ দাস পরবর্ত্তী সময়ে সমস্ত বিষয় সংসার পরিত্যাগ করত বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এবং চৈতন্যদেব মর্ত্ত্যলোক

পরিত্যাগ করার পর বৃন্দাবনে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন ভগবানের আরাধনায় যাপন করিয়াছিলেন। যাহাহউক রঘুনাথ কারাবদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছচৌধুরীকে পিতৃসম্বোধন করতঃ এরূপ ভাবে বিনয় করিলেন যে যবন ভূম্যধিকারী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথের কারামোচন করাইয়া দিলেন। এবং তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের সহিত আপোষে মীমাংসা করত সমস্ত দেনাপাওয়ানার হিসাব পরিষ্কার করিতে পারিলেন।

"রঘুনাথ আসি তবে জেঠা মিলাইল;
ম্লেচ্ছ সহিত বশকৈল, সবশান্ত হৈল।"

চৈঃ চঃ।

যবন কুল তিলক ভক্ত হরিদাসের জন্মস্থান বূঢ়ন গ্রাম। অল্প বয়সে হরিদাস গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন বেণা-ঝোপের মধ্যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করত হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন। দেশের ভূম্যধিকারী রামচন্দ্রখান একজন দুর্দ্ধর্ষ ও বৈষ্ণবদ্বেষী লোক ছিল। লোকে হরিদাসকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত তাহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। সেজন্য সে হরিদাসের তপস্যা ভঙ্গ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া রাত্রি যোগে একজন বারাঙ্গনা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিল। ইহাতে ভক্তের তপস্যা ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক সেই বেশ্যা সাধু ভক্তের ভক্তিভাব ও নিষ্ঠা দেখিয়া কুমতি পরিত্যাগ করতঃ নবজীবন লাভ করিল। স্থানান্তরে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃত রূপে ব্যাখ্যাত হইবে; এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই অধার্ম্মিক ও উপদ্রবকারী দেশাধ্যক্ষ শীঘ্রই স্বীয় অনুষ্ঠিত পাপের ফল ভোগ করিল। আর এক সময়ে বহুসংখ্যক লোক সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দপ্রভু হরিনাম কীর্ত্তনের জন্য ইহার বাটীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক এই পাষণ্ড তাঁহাদিগকে কুবাক্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিল এবং বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাহার যে আন্তরিক ঘৃণাছিল তাহা দেখাইবার জন্য নিত্যানন্দ তাহার চণ্ডীমণ্ডপের যেস্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের ও সমস্ত আঙ্গনার মৃত্তিকা খনন করিয়া ফেলাইয়া দিল ও ঐ স্থান গোময় দ্বারা লেপাইল।

"তবে রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞাদিল;
গোসাই যাঁহা বসিলা তার মাটী খোদাইল।
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গণ।"

চৈঃ চঃ।

এই রামচন্দ্র খান সুবিধা পাইলেই দস্যুবৃত্তি করিতে ছাড়িত না এবং জমিদারীর দেয় রাজস্ব আদায়ে পরাঙ্মুখ ছিল। ইহাতে রাজাজ্ঞায় উজীর আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাহার বহির্বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বাসা করিয়া থাকিল; এবং ভক্তসমাবেশ হইয়াছে বলিয়া যেস্থানের মাটী ইতাগ্রে সে খনন করিয়া ফেলাইয়াছিল, সেই স্থানে অবধ্যবধ ও গোমাংসাদি রন্ধন করিতে লাগিল। পরে সপরিবারে রামচন্দ্রকে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গেল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত সেই গ্রাম উজাড় করিয়াদিল। এইরূপে সাধুর অপমানের জন্য সমস্ত গ্রাম দণ্ডনীয় হইল। রামচন্দ্র খানের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রোধ হয়ে ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর;
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল;
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাঁধিল।

স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বাঁধিয়া
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া।

*　　*　　*　　*

মহন্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনের দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥”

চৈঃ চঃ।

এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুসভ্য ইংরাজাধিকারে বাস করিয়াও যখন ভূম্যধিকারীগণের নানা প্রকার অত্যাচার উপদ্রবের কথা নিতান্ত অবিরল দেখা যায় না, তখন যে রামচন্দ্র খানের ন্যায় অত্যাচারী ও পাষণ্ড জমিদার পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ প্রকারে সমাজকে দূষিত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে তখন মুসলমানের আমলদারী; সে সময়ে তাহার প্রতি যেরূপ দণ্ড হইয়াছিল, একালে সেরূপ দণ্ড দিবার নিয়ম নাই। স্ত্রী পুত্র সহিত বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া ও ঘরবাড়ী লুটপাট করিয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে এক্ষণে রাজকীয় দণ্ডবিধি ও শাসনবিধি অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে।

তখনকার সময়ে নামে মাত্র মুসলমান দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থাশাস্ত্র দেশের রাজকীয় আইন রূপে নির্দ্দিষ্টছিল; কিন্তু কার্য্যেতে তাহার কিছুই হইত না। এক্ষণে যেমন দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টরী প্রভৃতি বিভাগ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক রূপে কার্য্য শৃঙ্খলা সংগঠিত হইয়াছে তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। রাজধানীতে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কিন্তু রাজার সানুকূল আদেশ লাভ তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে উৎকোচের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। প্রিয়মন্ত্রী বা অনুচর যেরূপ বুঝাইয়া দিতেন রাজা তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। রাজা ব্যতীত রাজধানীতে এক জন কাজী ও একজন সহর কোতয়াল থাকিতেন। তাঁহারা সামান্য সামান্য অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। রাজধানী ব্যতীত প্রধান প্রধান নগরেও এক এক জন কাজী থাকিত। এই সব কাজীগণের ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল। তাঁহারা দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি সকল বিষয়েরই শাসন কর্ত্তা ছিলেন; এবং আপনাদের ইচ্ছানুসারে দণ্ড পু ষ্কার দিতে পারিতেন। চৈতন্যের সময়ে এইরূপ একজন কাজী নবদ্বীপে নিযুক্ত ছিলেন।

চৈতন্যচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে ভক্তিপথাবলম্বী যে সকল বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গাদাসপণ্ডিত নামে একজন ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ তিনি এক সময়ে যবনের কোপে পড়িয়াছিলেন। যবন প্রতিনিধি কাজী এই আদেশ দিয়াছিলেন যে রাত্রি প্রভাতে সপরিবারে তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে ও তাঁহার বাটীঘর কাটিয়া গঙ্গাজলে ফেলাইয়া দিতে হইবে। গঙ্গাদাস কোন বিশ্বস্ত সূত্রে এই বিপদ পূর্ণ সংবাদ জানিতে পারিয়া সেই গভীর রজনীযোগে সপরিবারে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং কোন মতে গঙ্গাতীরে আসিয়া পারে যাইবার সুবিধা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে ততরাত্রে খেয়াঘাটে নৌকা পাওয়া গেল না; এবং চারিদিক অন্বেষণ করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এদিকে রাত্রিপ্রভাত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া গঙ্গাদাস অতিশয় কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সাক্ষাতে যবনে তাঁহার পরিবারবর্গকে স্পর্শ

করিবে এই ভাবনায় আকুল হইয়া অবশেষে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিবেন স্থির করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নয়ন গোচর হইল যে একজন নাবিক একখানি ক্ষুদ্র তরণী লইয়া মধ্য গঙ্গা দিয়া বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি তাহাকে আহ্বান করত একটী টাকা ও একজোড়া বস্ত্র দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নৌকারোহণে গঙ্গা পার হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন যে স্বয়ং ভগবান্ খেয়ারীর রূপধারণ করিয়া গঙ্গাদাসের পরিত্রাতা হইয়াছিলেন। কাজীদিগের এরূপ দৌরাত্ম্যের কথা তৎকালে বিরল ছিল না। যখন চৈতন্যের আদেশে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গকরতালের ধ্বনির সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া গেল, তখন যবন ও অন্যান্য নাগরিক লোক কাজীর নিকট ঐ কথা জানাইলে, কাজী স্বয়ং গৃহে গৃহে যাইয়া খোলকরতাল ভাঙ্গিয়া দিলেন ও নাম সংকীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

"শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন;
কাজী পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন।
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী একঘরে আইল;
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল।
এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি;
এবে উদ্যম চালাও সবে কাঁর বল জানি?
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে;
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।"
চৈঃ চঃ

এই সম্বাদ চৈতন্যের কর্ণ গোচর হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত নগর প্রতিধ্বনিত করিয়া এক মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র লোকে মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, কাঁশর ইত্যাদি লইয়া তাঁহার দলে যোগ দিল; এবং সহস্র সহস্র মশালের আলোকে নগর দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। চৈতন্যের প্রকাশ্য সংকীর্ত্তনের এই আরম্ভ। সে রাত্রের সংকীর্ত্তনের প্রতাপে কাজী লুক্কায়িত হইতে বাধ্য হইয়া পলায়ন পর হইলেন। তৎপরে যখন তিনি চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও ঈশ্বর প্রেমের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি রূপে তাঁহাকে অনুভব করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার বিদ্বেষ ভাব কোথায় চলিয়া গেল। তদবধি তিনি একজন বিশ্বাসী ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন; এবং নানা প্রকারে চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনবিলাসের সুবিধা করিয়া দিলেন।

বঙ্গে মুসলমানাধিকারের কিছু কম তিনশত বৎসর পরে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েন। এই দীর্ঘকাল জেতা ও জিতগণ এক দেশে বাস ও এক ভাষায় কথোপকথন করা ও পরস্পর সংযুক্ত থাকা হেতু পরস্পরের মধ্যে একপ্রকার সৌহৃদ্য ভাব জন্মিয়াছিল। উভয় জাতীয় লোকের মধ্যে সম্পর্ক পাতাইয়া পরস্পরকে সম্বোধন করা হইত, ইহাতেই সে ভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। নবদ্বীপের কাজী চৈতন্যকে ভাগিনেয় বলিয়া সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই।

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা;
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা;
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়;
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা নালয়।" চৈঃ চঃ

নদীয়া জেলার জজ কি মেজেষ্টর সাহেবের পক্ষে নবদ্বীপ নগরবাসী সামান্য এক জন ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত এইরূপে কথোপকথন করা সামান্য মহত্বের পরিচায়ক নহে। এক্ষণে কি আমাদের রাজ পুরুষগণ আমাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন? অসভ্য মুসলমানগণের অধিকার সময়ে নানা প্রকারে প্রজাগণের উপর অত্যাচার হইত সত্য। কিন্তু তথাচ বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট যে সকল অধিকার পাইয়াছিল, সুসভ্য ইংরাজগণের নিকট তাহা পাওয়া যাইবে কি না জানিনা।

সামাজিক অবস্থা।

চৈতন্যের সময়ের সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার বর্ত্তমান সময়ের আচার আচরণ হইতে যে অনেক পরিমাণে ভিন্ন ছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রথমতঃ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর জাতীয়ভাব ও রুচি যে এক্ষণে ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি সে সময়ের যদি কোন অত্যাতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ পুনর্জীবিত হইয়া মর্ত্ত্য লোকে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, তবে তাঁহার অধস্তনবংশীয়কে দেখিলে তাঁহার বংশ সম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। কোথায় এক্ষণকার সার্টকোট, মোজা, পেণ্টুলেন, বিলাতী জুতা চশমাধারী ছোট বড় কর্ত্তিতকেশ ইয়ং বেঙ্গল, আর কোথায় তখনকার খরকাটা শূন্যপদ, শূন্যগাত্র, জানুর্দ্ধ পরিধেয়ী বঙ্গীয় যুবা! কিন্তু স্ত্রী লোকদিগের পরিচ্ছদাদি যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সহর বাজারে এক্ষণে মেয়েদের জুতা, মোজা ও বডী পরিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে এক্ষণেও সেকালকার ভাব অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে গহনা সম্বন্ধে এক্ষণে সেকালের ন্যায় রুচি নাই। যাহা হউক এক বিষয়ে কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মহিলার পরিচ্ছদ এক্ষণ হইতে অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না যে তখনকার সম্ভ্রান্তভদ্রমহিলাগণ কেবল সাড়ীকে ভদ্রোচিত পোষাক মনে করিতেন না; সাড়ীর উপরে তাঁহারা ওড়নার ন্যায় বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ঐ বস্ত্রকে তখন ভুনি দোগজা বলিত। চৈতন্যের জন্ম হইলে অদ্বৈতের স্ত্রী সীতাদেবী কি রূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শিশুকে দেখিতে যাইতেছেন দেখুন।

"অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগত বন্দিতা আর্য্যা
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে, চলে উপহার লয়ে,
দেখিতে বালক শিরোমণি।
সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজতের পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কন।
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হার গণ।
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি পট্টে সূত্র ডোরি,
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্র বর্ণের পট্টশাড়ী, ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন।
দূর্ব্বা ধান্য গোরচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র গুপ্ত দোলাচরি, সঙ্গে লয়ে দাসী চেড়ি,
বস্ত্রালঙ্কারে পেটরা ভরিয়া।

ভক্ষ্য যোগ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার
শচী গৃহে হইল উপনীত।' চৈঃ চঃ।

আহারাদি ও খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে যে, সেকালে ও একালে বিশেষ কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তখনও ডাল, ভাত, তরকারী, শাক সবজী ঘৃত, দধি, দুগ্ধ মৎস্য প্রধান খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল; এক্ষণেও তাহাই আছে। তবে এখন যে কালিয়া পোলাও ও হোটেলে খাওয়ার রীতি কোন কোন শিক্ষিত দলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। এতদ্ভিন্ন শাক্ত ও বামাচারীগণ ছাগমাংস আহার করিতেন। দধি ও ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধের সহিত চিপীটক ও রম্ভা চিনি সংযোগে ফলাহারের ঘটাটাও বিলক্ষণ ছিল। পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ যে চিড়া মহোৎসব দেন, তাহাতে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এখনকার মত নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও পিষ্টকাদিও তখন প্রস্তুত হইত; কিন্তু সর্ব্বত্রেই রন্ধনের ভার স্ত্রীলোকগণের উপর অর্পিত থাকিত। আচার্য্য-পত্নী সীতাদেবী চৈতন্যের নিকট কিরূপ দক্ষতার সহিত পাক বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন, একবার দেখা যাউক।

"মধ্যে পীত ঘৃত সিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ;
চারি দিকে ব্যঞ্জন দোনা আর মুগ্দ সূপ।
বাস্তুক শাক পাক করি বিবিধ প্রকার;
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর।
চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া আর মূল ফলে
অমৃত নিন্দুক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।
কোমল নিম্ব পত্র সহ ভাজা বার্ত্তকী;
পটোল ফুলবড়ী ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।
নারিকেল শস্য ছানা সর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।
মধুরাম্ল, বড় অম্ল, অম্ল পাঁচ ছয়;
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।
মুদ্গ বড়া, মাস বড়া কলাবড়া মিষ্ট;
ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি, যত পিটা ইষ্ট।
সঘৃত পায়স মৃৎ কুণ্ডিকা ভরিয়া।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধরাখেত ধরিয়া।
দুগ্ধ চিতাউ, দুগ্ধ লকলকী কুণ্ডিভরি;
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।"
চৈঃ চঃ।

লুচি কচুরির প্রথা বোধ হয় বড় একটা চলিত ছিল না। কারণ ঐ রূপ খাদ্যের বর্ণনা কি চৈতন্য চরিতামৃত, কি চৈতন্য ভাগবত, কি কোন কড়চা গ্রন্থে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রচলিত ধর্ম্মের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ ভদ্র সকল লোকই ভূত, প্রেত উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত; এবং সাপের মন্ত্র, ডাইনের মন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রের বলবীর্য্য দৃঢ় রূপে মানিত।

"কেহ রক্ষা বাঁধে, কেহ পড়ে স্তুতিবাণী।
কেহ বিষ্ণু পাদোদক অঙ্গে দেয় আনি।"
চৈঃ ভাঃ।

"ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিলচিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই।" চৈঃ চঃ।

আমোদ প্রমোদের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী, হরির গীতাদি শ্রবণ, ঢোল ঢক্কাদির বাদ্য শ্রবণ, কুস্তি মালামো করা প্রধান ছিল। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের প্রথা এক্ষণেও যেরূপ তখনও সেই রূপ ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্নপ্রাশন, উপবীত ধারণ ও বিবাহের যে বর্ণনা আছে, তাহা এক্ষণকার ব্রাহ্মণ বালকের তত্তদনুষ্ঠানের সহিত কোন অংশে বিভিন্ন বোধ হয়

না। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের কোন প্রমাণ উদ্ধার করা গেল না।

শিক্ষা সম্বন্ধে তখনকার তুলনায় এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তখন সাধারণ লোকের কোন শিক্ষা হইত না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসা করিতেন, তাঁহারা ভিন্ন অপরে ভালরূপ সংস্কৃত শিখিতেন না। সাধারণ ভদ্রলোকে আপন আপন বালকদিগকে প্রথমে পাঠ শালায় ও পরে মৌলবীর নিকট উর্দ্ধপার্শী শিক্ষা দিতেন। তখন বাঙ্গলা ভাষায় কোন পুস্তকাদি ছিল না। ঐ রূপ পুস্তকাদি রচনা করা চৈতন্যের সময়েই প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। সুতরাং তখনকার লোক কেহই মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত হইতে পারিতেন না। চলিত কথাবার্ত্তা ও পত্রাদি লেখা বাঙ্গালাতে হইত বটে, কিন্তু তাহাকে শিক্ষা বলা যায় না। এক্ষণকার মত তখনও বিদ্যারম্ভের দিন হাতে খড়ি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল; এবং ফলা বানানাদি বঙ্গ ভাষার মূল শিক্ষাও দেওয়া হইত।

"শুভ দিনে শুভক্ষণে মিশ্র সুন্দর
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥
দিন দুই তিনে শিখিলেন বার ফলা।
নিরন্তর লেখেন কৃষ্ণের নাম মালা॥

চৈঃ চঃ।

যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসায়ী হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম্ম শাস্ত্র, কেহ দর্শন শাস্ত্র, কেহ বেদ বেদান্তাদি আপন আপন রুচি ও সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষা করিতেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রথা তখন আদৌ চলিত ছিল না। চৈতন্যের সময়েই যে স্ত্রী শিক্ষার দ্বার প্রথম উদ্ঘাটিত হয়, তাহা একরূপে বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্র ও স্ত্রীদিগকে ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; যখন চৈতন্যদেব ঐ প্রথার বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিয়া আচণ্ডাল সকলেই হরিনামের অধিকারী, এই উদার মত প্রচার করিলেন, সেই দিন হইতেই বঙ্গীয় মহিলা ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠে অধিকার লাভ করিলেন। এবং শিখি মাইতির ভগিনী ও করমাবাই প্রভৃতি অনেক অনেক ভদ্র মহিলা উত্তর কালে বিদ্যাবতী রমণী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের আমল দারীর কাল হইতে এদেশে অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। চৈতন্য দেবের সময়েও বঙ্গীয় মহিলাগণ অবরোধে অবরুদ্ধা ছিল। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে অদ্বৈত পত্নী "বস্ত্র-গুপ্ত-দোলা" আরোহণে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে আসিয়া ছিলেন। তখনকার কুলকামিনীগণ কিরূপে কাল যাপন করিতেন ও তাঁহাদের পতিভক্তি ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি কি রূপ ছিল তাহা পশ্চাদুদ্ধৃত আদর্শ চিত্র পাঠে বুঝা যাইতে পারিবে;

"একেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন;
তথাপিও পরম আনন্দ যুক্তমন।
উষাকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম
আপনে করেন সব এই তার ধর্ম্ম॥
দেব গৃহে করেন যত স্বস্তিকমণ্ডলী;
শঙ্খচক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবনে তাঁর মন॥
কোন দিন লই লক্ষ্মী পতির চরণ
বসিয়া থাকেন পদমূলে অনুক্ষণ॥ চৈঃ ভাঃ

স্বভাব চরিত্রের বিষয় দেখিতে গেলে

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ হইতে আমরা এই নির্ব্বাচন করিতে পারি যে, তখনকার লোক অধিক সরল প্রকৃতি, সত্যপ্রিয় ও ধর্ম্মভীরু ছিল। এক্ষণে যেমন কপটতা, কলহপ্রিয়তা ও বঞ্চনার ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন ততদূর ছিল না। প্রায় সকল লোকেই আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত এবং শান্তভাবাবলম্বনে, কাল যাপন করিতে ভালবাসিত। বিলাস পরায়ণতা তখন বঙ্গসমাজকে এখনকার ন্যায় কলুষিত করে নাই। যাঁহারা ধনী ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা যে একবারেই বিলাসী ছিলেন না এরূপ নহে, তবে তখনকার বিলাসে আর এক্ষণকার বিলাসে প্রকৃতিগত অনেক বিভিন্নতা আছে। আর এক্ষণে যেমন সমাজ শুদ্ধ সকলেই বিলাসী, তখন সেরূপ ছিল না। তখনকার বিলাসিতার চিত্র দেখিলেই, পাঠক ইহার মীমাংসা আপনা আপনি করিতে পারিবেন।

"দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিতলে শোভা করে;
দিব্য তিন চন্দ্রাতপ তাহার উপরে।
তঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মাকাশে;
পট্টনেতে বালিস শোভয়ে চারিপাশে।
বড় ঝাড়ি ছোটঝাড়ি গুটি পাঁচ সাতে।
দিব্য পিতলের বাটা; পাকা পান তাতে।
দিব্য আলবাটী দুই শোভে দুই পাশে।

* * *

দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে;
বাতাস করিতে আছে দেখে সর্ব্বক্ষণে।
কি কহিব সেবা কেশভারের সংস্কার।
দিব্যগন্ধ আমলকিবহি নাহি আর।
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবানা;
বিষয়ীর প্রায় যেন সকল শোভনা" চৈঃ ভাঃ

ইহা অতি উচ্চবংশীয় ধনীর আসবাব। সুতরাং সাধারণ লোকের লওয়াজিমা কিরূপ ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

হিন্দু জাতি স্বভাবতই অতিথি প্রিয়। এখন হইতে সেকালের লোক অধিক পরিমাণে আতিথ্য করিত। চৈতন্যের সময়ে অতিথি সৎকার গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য করণীয় ছিল; না করিলে মহা প্রত্যবায় হইত। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও এই ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়; তখনকার অতিথি সেবার এই মূল মন্ত্র ছিল।

"অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি;
তাহা করিলেই বলি অতিথিরে ভক্তি।"
চৈঃ ভাঃ

পক্ষান্তরে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল জুয়াচুরি, ব্যভিচার সমাজ মধ্যে বহু পরিমাণে সংঘটিত হইত, সন্দেহ নাই। তাহা না থাকিলে আর জগাই মাধাই, চাঁপাল গোপালের উপাখ্যান বিবৃত হইবে কেন? তবে তখন এই সকল পাপাচারীর প্রতি সামাজিক দণ্ড প্রয়োগ করা হইত এবং শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্তাদি করিলেই, সে সকল পাপ হইতে মুক্তি দেওয়া হইত। এক্ষণে সমাজ বন্ধন ও ধর্ম্মবন্ধন কিছু শিথিল হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ; তাহা ছাড়া সেকাল ও একালে এরূপ পাপ সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় না।

যে সকল ভীষণ পাপের স্রোত বঙ্গ সমাজের অভ্যন্তরে স্তরে এক্ষণেও প্রবাহিত হইতেছে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও সেইরূপ হইতেছিল। কেবল চৈতন্য হৃদয়ের প্রবলতর প্রেমভক্তির তরঙ্গে কিছুকালের জন্য ঐ সকল দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা কতক পরিমাণে বিধৌত হইয়াছিল মাত্র।

কিন্তু অচির কাল মধ্যেই তাঁহার ধর্ম্ম লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া মলিন ও কলঙ্কিত হইল। তখন ঐ সকল পাপরাশি পুনঃ. রায় এই দুর্ভাগ্য সমাজকে পঙ্গপালের ন্যায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পুনরায় যুগ ধর্ম্মের প্রচণ্ড অগ্নিশিখা ব্যতিত তাহা নির্ম্মূলিত হইবার নহে। ভাই বঙ্গবাসী! আবার কি সেই যুগ ধর্ম্ম আসিয়াছে? বিশ্বাস চক্ষু উন্মীলন কর দেখিতে পাইবে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

একতা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে, হিন্দুত্বের যাহা কিছু সার আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া হিন্দু সমাজ দৃঢ়ীভূত করাকেই জাতীয় একতা সাধনের একটী উপায় স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি। ধর্ম্ম দ্বারা যে অখণ্ড একতা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা প্রশস্ত নীতি হইলেও আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া জাতীয় একতা রূপ সঙ্কীর্ণ নীতির অবতারণা করিতে কেন প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা অনেকের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। তদুত্তরে যাহা বলা আবশ্যক আমরা ক্রমে বলিয়া যাইতেছি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সার্ব্বভৌম একতা হইতে সমাজের কেন্দ্র স্বরূপ গৃহস্থাশ্রমে পৌছিতে ক্রমান্বয়ে জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক একতার প্রয়োজন। বুদ্ধদেব গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া একবারে সার্ব্বভৌম একতায় যোগ দিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও তাহাই। কিন্তু আমরা সন্ন্যাসী নহি। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই একতা সিদ্ধ করিতে চাই। একতার উদ্দেশ্য আছে, তাহা কেবল নিবৃত্তির জন্য নহে, প্রবৃত্তিরও উদ্দীপক হইবে, এরূপ আশা করিয়া থাকি। এ বড় উৎকট সমস্যা। আপনার অস্তিত্ব ও স্বার্থ ভুলিতে পারিলেই অন্যের সহিত একীভূত হওয়া যায়। প্রবৃত্তির লোপ অথবা নিবৃত্তির দ্বারা আপনার স্বার্থ ভুলিতে পারা যায়। কিন্তু আপনার স্বার্থ ভুলিলেই যে অন্যের স্বার্থে স্বার্থ বোধ হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? যোগী ব্যক্তি সংসার সংস্রব শূন্য হইয়া যোগে বসিলে তাঁহার দ্বারা সংসারী ব্যক্তির কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ, সংসারের উপকার ও অন্যের হিত সাধন করিতে হইলে, আমাদের প্রবৃত্তির প্রয়োজন; প্রবৃত্তি ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কার্য্য নহিলেই বা উপকার কোথায়? সেই জন্যই বলি যে স্বার্থ ধ্বংস করাই যে একতা সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়, সে একতা আমরা চাইনা; দশ জনে মিলিতে চাই, ঐক্য সাধন করিতে চাই, কেবল আমাদের স্বার্থের নির্ব্বিরোধ সম্পাদন জন্য। কেন না, স্বার্থের নির্ব্বিরোধেই আমাদের দুঃখ হ্রাস, অভাব পূরণ ও সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা এ তথ্য এখন বুঝিয়াছি, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছিনা। তজ্জন্য যাহার প্রয়োজন, তাহার নামই প্রেম। প্রেমে প্রবৃত্তি ধ্বংস হয় না, বৃদ্ধি করে। ইহা যুক্তি নহে, বন্ধন।

এখন বিবেচনা করা যাউক, এই বন্ধন দ্বারা কি প্রকারে একতা সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা জ্ঞানের লক্ষ্যকে সত্য বলিয়া থাকি। সত্য আবিষ্কার এবং সত্য নির্ণয় করাই জ্ঞান লাভের প্রথম উদ্দেশ্য। সত্য স্থিরীকৃত হইলে তদ্দ্বারা জ্ঞানের অন্যান্য উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকে। প্রেমের ঐ প্রকার একটী স্থির লক্ষ্য আছে। মিলনই সেই লক্ষ্য। যেখানে প্রেম আছে, সেখানেই মিলনের আকাঙ্ক্ষা। মিলন সুসাধ্য হইলেই একতা সাধনের উপায় বিহিত হয়।

আদৌ আমাদিগের মধ্যে পারিবারিক একতা এই প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল। স্ত্রীহৃদয়ই মনুষ্য প্রেমের প্রধান আধার, এই নিমিত্তই মনুষ্যে মনুষ্যে প্রথম মিলন স্ত্রী-পুরুষে। এই মিলনই গৃহস্থাশ্রমের এবং পারিবারিক ধর্ম্মের উৎপাদক, এবং সেই জন্যই খ্রীষ্টানেরা বলিয়া থাকেন, Charity begins at home, অর্থাৎ সমুদায় দয়া ধর্ম্মের মূলই গৃহাশ্রম। ত্যাগ স্বীকার এখান হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে। কি শরীর ও কি মন, আর কি সম্পত্তি ও কি ধন, সকল বিষয়েই পরিবারের জন্য আমরা ক্ষতি স্বীকার করিতে সহজে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। এই প্রবৃত্তির মূলই নারীপ্রেম, নারীপ্রেম হইতেই বাৎসল্য ও দয়া মায়ার উৎপত্তি। সমুদায় হিংসা প্রবৃত্তি ও কঠোর স্বার্থপরতা নাশের প্রথম ও আদিম উপায়ই এই। ইহা যিনি অস্বীকার করিবেন, তিনি মনুষ্যত্বও অস্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু কোন বিষয়েরই আতিশয্য শুভদায়ক নহে। নারীপ্রেম ভববন্ধনের ও পারিবারিক একতা সাধনের মূল হইলেও কেবল তাহাতেই মানবহৃদয়ের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। নারীপ্রেমই মনুষ্যের হৃদয়দ্বার উন্মোচনের প্রথম উপায় বটে, কিন্তু তাহাতেই হৃদয় আবদ্ধ হইয়া থাকিলে, সে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা অবশ্য অনুভূত হয়। হৃদয়মণ্ডপের প্রধান দুর্গোৎসবই রমণীপ্রেম লইয়া; কিন্তু হৃদয়পুত্তলি বিসর্জ্জন দিবারও সময় আছে। প্রকৃতি সে সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তখন একটী পুত্তলিকার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে অনেক পুত্তলিকা প্রবেশ করে, যথা পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি। এইরূপে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া ক্রমে বিস্তৃতি উৎপন্ন হয়। সেই বিস্তৃতির প্রথম ফল সামাজিক একতা। তদ্দ্বারা কেবল স্বীয় পরিবারের সুখ সাচ্ছন্দ্য নহে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও স্বদেশবাসীর সুখ সাচ্ছন্দ্যও আমাদের মনোযোগের বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মানবজাতির সুখসাচ্ছন্দ্যই আমাদিগের ভাবনার বিষয় হয়। সেইরূপ ভাবনার আধুনিক সাক্ষী জনষ্টুয়ার্ট মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার, ম্যালথস প্রভৃতি। কেবল স্বজাতির জন্যই ইঁহাদিগের মস্তিষ্ক পীড়িত হয় নাই, সমগ্র মানবজাতির নিমিত্তই ইঁহারা ভাবিয়াছেন। তাহার ফলেই সমাজতত্ত্ব, হিতবাদ মত যৌন নির্ব্বাচন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ইত্যাদি মতের সৃষ্টি।

প্রেম হইতে মতের সৃষ্টি, একথা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। বরং জ্ঞান হইতে মতের সৃষ্টি এ কথা অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন। নিউটন যে জ্ঞানের বলে মাধ্যাকর্ষণ স্থির করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান সহসা অন্য নিরপেক্ষ জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। সেই জ্ঞানের ফলে মানবজাতির প্রভূত উপকার সিদ্ধ হইয়া থাকিলেও

তাহার মূলে যে মনুষ্য-প্রেম ছিল, ইহা বুঝিয়া উঠা যায় না। নিউটন স্ত্রী পুত্র লইয়া তখনও বিব্রত ছিলেন না। স্ত্রীদ্বারা তাঁহার হৃদয় কখনও আকৃষ্ট হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। তথাপি তাঁহার কার্য্য দ্বারা যে ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে কত গভীর মানব প্রেমের পরিচয় দেয়। তাঁহার প্রেম মনুষ্যে আবদ্ধ ছিল না, মনুষ জাতির সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়াও অগ্রসর হইয়াছিল, এবং প্রকৃতি রাজ্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছিল। কিসের জন্য তিনি কোন্ স্বার্থ সাধন জন্য লালায়িত হইয়া ছিলেন? যে জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন তাহাতে কি তাঁহার আসক্তি ছিল না? যদি আসক্তি ছিল, তবে তদ্দারা কি প্রেমের অস্তিত্বও অনুভূত হয় না? বস্তুতঃ এখানে জ্ঞান মাহাত্ম্য ও প্রেম মাহাত্ম্য উভয়ই একীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহাই জ্ঞান ও প্রেমের পরিণয়। ফলও আশ্চর্য্য জনক। হৃদয় শূন্য জ্ঞান দ্বারা কখনই এরূপ কৃতার্থতা সিদ্ধ হইতে পারে না। হৃদয়শূন্য জ্ঞানের ফল সমগ্র মানবজাতি ভোগ করিতে পায় না। জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য ও হৃদয়ের লক্ষ্য মিলন। কিন্তু সত্য ও মিলন কিসের জন্য? যাহাতে সমগ্র মানবজাতির উপকার এবং যদ্দারা প্রাণী মাত্রই প্রীত হয়, তাহাই কি সত্য ও মিলনের উদ্দেশ্য নয়? ঐই উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্যই ঈশ্বরের মহিমা আমাদের দেশে বুদ্ধদেবে এবং পশ্চিম দেশে যিশু খ্রীষ্টে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মের পরিণয় সাধন করিতে পারেন, তাঁহারা মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের অবতার। তাঁহাদিগের দ্বারা সকল সমাজ ও সকল জাতিই সমান উপকৃত হয়। কিন্তু অখণ্ড একতা ঐ পর্য্যন্ত। খ্রীষ্টের প্রচারিত ধর্ম্মনীতি এবং বুদ্ধদেবের প্রচারিত সত্য, কোন হৃদয়বান্ লোকই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু কোন গৃহাশ্রমী ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ভুলিয়া তাঁহাদের ন্যায় একত্ব সাধনে সক্ষম নহেন। সে শক্তি সকলের সম্ভবে না। সকলের সহিত পার্থক্য দেখাইয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিস্ফুট করিবার জন্যই তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা মন প্রাণে সকলের সহিত এক হইলেও শক্তিতে সকল হইতে পৃথক ছিলেন। এই নিমিত্তই খ্রীষ্টানেরা যিশুখ্রীষ্টের অলৌকিকত্ব প্রমাণ জন্য এত চেষ্টা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃও বুদ্ধ ও যিশুখ্রীষ্ট নরাকারে মনুষ্য সমাজে অবতীর্ণ হইয়া থাকিলেও তাঁহারা ঈশ্বরের অবতারের ন্যায় পূজিত। আমরা তাঁহাদিগের আদর্শ দেখিয়া দূর হইতে নমস্কার করিতে পারি, কিন্তু নিকটবর্ত্তী হওয়া আমাদিগের সাধ্যাতীত।

যাহা হউক, উক্ত উভয় আদর্শকে আমাদের অখণ্ড একতা শিক্ষা স্থলে রাখিয়া আমাদের সাংসারিক প্রয়োজনার্থ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় একতা সাধনের উপায় বিচার করা আবশ্যক। সে সাধনের মূল মন্ত্রই মানবপ্রেম। মানবপ্রেম আছে বলিয়াই পারিবারিক একতা এখনও বর্ত্তমান আছে। এখনও বর্ত্তমান আছে, একথা এরূপ ভাবে বলিবার কারণ এই যে ক্রমে ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ হৃদয়শূন্য জ্ঞানের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যে এক সময়ে পারিবারিক একতা ভঙ্গ হইয়া মনুষ্যজাতি পুনর্ব্বার আদিম

অবস্থায় নিপতিত হইবে না, এরূপ ভরসা করা যায় না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। জ্ঞানবৃদ্ধির প্রভাবে মনুষ্য জড় প্রকৃতির উপর যতই শাসন বিস্তার করিতেছে, তাহার অন্তঃপ্রকৃতি শাসনের ক্ষমতা ততই কমিয়া আসিতেছে। ভোগ বিলাসই বাহ্য সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র সহচর, হৃদয়ের মাহাত্ম্য তাহার নিকটে অতি তুচ্ছ বিষয়। এই জন্য কল্পনা ও প্রেমের ক্ষমতা ক্রমেই সকল সমাজে হ্রাস হইয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষমতাই বাড়িতেছে। এ উভয়ের মিলন না হইলে পৃথিবী ত্বরায় মরুভূমিতে পরিণত হইবে। বোধ হয় সেই বিপদ নিবারণ জন্যই ত্বরায় আবার কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হওয়া সম্ভবপর। যে সময় নিউটন ইয়ুরোপ-খণ্ডে আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন সে সময় ইয়ুরোপের যে অবস্থাছিল এখন সে অবস্থা নাই। সকলেই বলে সভ্যতা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু নিউটনের ন্যায় মহা পুরুষ আর দেখা গেল না। পাঠক ইহা দ্বারাই স্থির করুন, জ্ঞানজ্যোতিঃ নিউটনের সময়ে অধিক কি এখন অধিক। ইংলণ্ডের সে নিউটন নাই, সে সেক্সপিয়ার নাই, ভারতের সে গোতম নাই, কালীদাস নাই; তথাপি ইংলণ্ড বর্ত্তমান জ্ঞান গরিমায় মৃত্তিকায় পদক্ষেপ করিতেছেন না, আবার আমরাও দেখা দেখি বর্ত্তমান যুগকেই শ্রেষ্ঠ যুগ ভাবিতে শিখিয়াছি। বর্ত্তমান যুগাপেক্ষা পূর্ব্বযুগ জ্ঞান ও সভ্যতায় অধিক উন্নত ছিল, একথা বলিলে কোন উন্নতিশীল লোকেরই তাহা সহ্য হয় না। অহঙ্কারের ও সাধারণতঃ স্বত রিপুরই এইরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা যাউক, আমরা যে আজ ইংরাজের পদদলিত দাসের জাতি, আমাদের কাছেও যদি বর্ত্তমান যুগাপেক্ষা অন্য কোন যুগের প্রশংসার কথা হয়, তবে তখনই বক্তাকে বাতুল মনে করি। অধঃপতন এতই বেগবান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ইংরাজ আমাদিগের দেশে পশ্চাত্য সভ্যতা আনিয়াছেন। আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। পূর্ব্ব পুরুষেরা অসভ্য ছিলেন, বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন না, খাদ্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন না, বায়ু সেবনের প্রয়োজন বুঝিতেন না, বস্ত্রাদি ব্যবহারের নিয়ম জানিতেন না, ইত্যাদি গার্হস্থ সকল বিষয়েই তাঁহারা ইয়ুরোপীয় জাতি অপেক্ষা অজ্ঞ ছিলেন। ইয়ুরোপীয় জ্ঞানালোকে এখন আমরা পদে পদে তাঁহাদিগের দোষ ধরিতে শিখিয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এত দোষ ধরিয়া ও গুণের অনুকরণ করিয়া আমরা কি আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষাপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও অধিক সুখী হইতে পারিয়াছি? যিনি যত দূর পারেন, এক একবার বাল্যকালের কথা স্মরণ করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, আমাদের পল্লীসমাজ কি ছিল, আর এখন কি হইয়া উঠিয়াছে। একতা সাধন জন্য আমরা চাই মনুষ্যপ্রেম; কিন্তু দেখিতেছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ও পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে আমাদিগের সেই মনুষ্যপ্রেম ক্রমেই তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ হইয়া আসিতেছে। কত লেখকই কত প্রকারে তাহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন।

লোকের প্রবৃত্তি ও সময়ানুসারে ভিন্ন রূপ হইয়া উঠিয়াছে। সময়েই সকল পরিবর্ত্তন সংঘটন করায় সত্য, কিন্তু পরিবর্ত্তনে যে কেবলই নিরবচ্ছিন্ন হিত সিদ্ধ হইতেছে, ইহা বুঝিবার তাৎপর্য্য কি? ভাই ভগ্নিতে, পিতা পুত্রে, মাতা কন্যায় এখন প্রায়ই অসদ্ভাব দেখা যায়। স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের নীতি অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা সুন্দর পারিবারিক একতা হারাইতেছি এখন সকলেরই স্বস্ব প্রধান হইবার বাসনা কিন্তু তাহাতে একান্নবর্ত্তী পরিবারের যে দোষ দর্শান হইয়াছিল, তাহার কিছুই প্রতীকার দেখা যাইতেছে না। দশজনে একত্র হইয়া থাকিলে যে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন হয় না, তাহার অর্থ নাই। যাহারা সমাজের গলগ্রহ স্বরূপ তাহারা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রণালী ধ্বংস হইলেও থাকিবে। কেবল লাভ এই যে এক দোষের প্রতিবিধান করিতে যাইয়া, অপর দোষের পথ প্রসারিত করা হইতেছে। ভদ্র পরিবারে স্ত্রীলোকেরা সকল সমাজেই গলগ্রহ স্বরূপ। এ অবস্থায় যদি কেহ আপন বৃদ্ধা মাতা, পীড়িত বা অন্য কারণে অকর্ম্মণ্য ভ্রাতা বা ভগ্নিকে পরিত্যাগ করে, তাহার নৃশংসতা কি সমাজে উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে?

আমরা পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে একতার সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য দেখিতে পাইতেছি। ইউরোপীয় ধর্ম্ম জ্ঞান হইতে মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা করিতেছি এবং কাগজে লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া একতার মাহাত্ম্য সকলকে বুঝাইতে যত্নবান হইতেছি। কিন্তু আমাদের এ সকল উদ্যমের ফল কি হইতেছে? ক্রমেই দেখিতে পাইতেছি যে, বিচ্ছেদ বাড়িতেছে। ঘরে ঘরে গৃহ বিচ্ছেদ ও আত্ম বিচ্ছেদ, পাড়ায় পাড়ায় সামাজিক বিচ্ছেদ, নগরে নগরে অসংখ্য বিচ্ছেদ। এত বিচ্ছেদে কি একতা থাকিতে পারে? আবার তাহাতে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের ছল পাইয়াছি, সুতরাং সেই ব্যপদেশে সমস্ত নিয়মের মস্তকে পদার্পণ করিয়া প্রত্যেকেই এক এক জন নিয়ন্তা হইয়া বসিয়াছি। কিন্তু এ দিকে দিন দিন স্বাস্থ্য হারাইতেছি, সচ্ছন্দতা হারাইতেছি। বিলাসের দ্রব্য অনেক পাইয়াছি বটে, কিন্তু বিলাসে ত স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না সচ্ছন্দতাও বাড়ে না। ইহা প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষীভূত বিষয়। তথাপি বলিতে পারিবে না, যে, তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা তোমা অপেক্ষা অধিক সুখ ও সচ্ছন্দতা ভোগ করিতে পাইতেন; কেন না তাহা হইলে ব্রিটিস সভ্যতার ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের অবমাননা করা হইবে। তাহা কোমল হৃদয় হিন্দুর প্রাণে কি প্রকারে সহ্য হইতে পারে? নৃশংস ও দুরাচার মুসলমানের স্বেচ্ছাচার শাসন প্রণালীর ফলেও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অধোগতি আমাদের ন্যায় হইয়াছিল না। প্রত্যেক বঙ্গবাসীই তাঁহার আপন আপন পিতামহকে স্মরণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে আমাদের অপেক্ষা কত সবলকায় ও সুস্থ শরীরে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। আর আমরা যে, শরীর সবল করিবার এবং স্বাস্থ্য রক্ষার এত প্রকৃষ্ট উপায় সমন্বিত হইয়াছি, তথাপি আমাদিগের স্বাস্থ্য নাই কেন? শরীর দুর্ব্বল হইতেছে কেন? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাওয়া কি বাতুলতার কার্য্য?

আমাদের দেশের কথা, ঘরের কথা হইলেই আমাদের পদে পদে অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, কিন্তু আমেরিকার বৃক্ষে গোদুগ্ধ নিঃসৃত হয়, আফ্রিকার কোন্ জাতীয় লোক খেজুর খাইয়া জীবন ধারণ করে, ইহা আমাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। সাংখ্য পাতঞ্জল বুঝি না, মিল ও কোম্‌ৎ বুঝাই আবশ্যক। কালীদাসের কবিত্ব খুঁজি না, কিন্তু ড্রাইডেন ও বাইরণের কাব্য মুখাগ্রে রাখিতেই হইবে। বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করিব না, কিন্তু বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা হইলেই আগে ইংরেজী বলিতে চেষ্টা করিব। এ সকল শিক্ষার জন্ম নহে, বস্তুতঃ আজি কালি আমাদের স্বভাবই হইয়া পড়িয়াছে, দেশীয় কিছুই ভাল নহে, বিদেশীয় সব ভাল। কিন্তু যখন দেশ হিতৈষিতা বা স্বজাতি প্রেমের কথা উঠিবে, তখন আবার সকলই বিপরীত দেখি। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান যুগ পরিবর্ত্তনের ফল। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, সন্দেহ নাই।

যাহা হউক দেশের এবম্প্রকার দুর্দ্দশা ভাবিয়া বা বর্ণনা করিয়া, যদি তন্নিবারণের কোন প্রকৃত পন্থা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে না পারা যায়, তবে তজ্জন্য মস্তিষ্ক পীড়ন অনর্থক। আজি কালি এই রূপ অনর্থক কার্য্যে অনেকেই প্রবৃত্ত আছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ভাবিতেছেন, কেহ লিখিতেছেন, আর কেহ বা এপিকিউ রসের নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক সকলই হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই বর্ত্তমান যুগের দুঃখ প্রভাব বিনষ্ট হইতেছে না। হাসিবার সময় গত হইয়াছে, কাঁদিতেও বোধ হয় বিধি আর অধিক সময় দিবেন না। দারিদ্র্য পীড়নে ও রোগের দুঃসহ শাসনে দেশের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত। এ সময় কে—এ যুগকে যিনি যতই কেন সভ্যতার আলোকে আলোকিত দেখুন না, প্রকৃতি তাঁহার মরীচিকা ভ্রম শীঘ্রই প্রতিপন্ন করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই।

সার্ব্বভৌম একতা ধর্ম্ম সাধনের চরম উদ্দেশ্য ও মুক্তি সাধনের প্রধান সম্বল। এ বিবেচনায় উহার আবশ্যকতা সকলের পক্ষেই সমান। কিন্তু যিনি বিবেচনা করেন, সার্ব্বভৌম একতাই উচ্চ নীতি, আর তন্নিম্নে জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক একতা, সঙ্কীর্ণ নীতি, তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করা আবশ্যক। বস্তুতঃ কোন প্রকার একতাই সঙ্কীর্ণ নীতি নহে, ইহা আমরা পরিষ্কার রূপে দেখাইতে প্রস্তুত আছি। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপার মধ্যে দুই প্রকার শক্তির আবির্ভাব সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দুই শক্তি পরস্পর বিরোধী, এই নিমিত্তই সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি। এই উভয়ের মধ্যে মিলন সংঘটন হইলেই ক্রিয়ার লোপ হয়। তাহাকেই নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে। সুখ দুঃখ মঙ্গল অমঙ্গল, উন্নতি ও অবনতি ইত্যাদি সমস্ত বিরুদ্ধ ভাবই এই বিরোধের ফল। আমরা একটীর পক্ষপাতী ও আর একটীর বিরোধী, ইহাও সেই মূল শক্তিদ্বয়ের বিরোধের ফল। নতুবা ভগবান্ মঙ্গলময় হইয়া কেন অমঙ্গলের ভাব বর্ত্তমান রাখিয়াছেন, ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। ইহা আমাদের পক্ষে যাহাই হউক, কিন্তু ভগবানের ক্রীড়া সন্দেহ নাই। নতুবা তাঁহার সর্ব্ব শক্তিমত্তার প্রতি বিশ্বাস থাকে না। তাঁহার শিবত্ব ও শক্তিত্ব অস্বীকার করিলে সমস্ত ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত হয়।

এখন, আমরা দেখিতে পাই, আমরাও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন জীব। আমরাও সৃষ্টির দুই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বারা চালিত। আমরা ধর্ম্মভাবের অনুগামীও বটে, বিরোধীও বটে। বুদ্ধদেব দেখিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইতে না পারিলে ধর্ম্মভাব স্থির রাখা যায় না। তাঁহার নির্ব্বাণ মুক্তির তাৎপর্য্যই এই। দেহে ও মনে সকলের সহিত এক হওয়া নির্ব্বাণ মুক্তি ব্যতীত আর কিছুতেই ঘটিতে পারে না। এই একতাকেই সর্ব্বভৌম একতা বলা যায়। ইহাতে প্রাণীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, অস্তিত্বের লোপও হয় না। ইহাতে অন্যের অস্তিত্বের সহিত আপন অস্তিত্ব এক ভাবাপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অন্যের জন্য জীবন বিসর্জ্জন কিছুমাত্র কষ্টদায়ক বোধ হয় না। মানবজাতির ধর্ম্ম শিক্ষা ও ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার জন্য এইরূপে যুগযুগান্তে এক এক জন মহাপুরুষ এক এক দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া এক এক প্রকার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান গরিমায় সত্য ভক্তি বিচলিত হওয়ায় এই সকল পদচিহ্ন ক্রমে দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই মনে হয়, যদি ত্বরায় মহাপ্রলয় না হয়, তাহা হইলে মানবের শিক্ষার জন্য পুনর্ব্বার কোন মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হওয়া সম্ভব। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সকল সময়ে সমান বর্ত্তমান হইলেও আমরা তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহাকে সকল সময়ে দেখিতে পাই না, দেখিলেও বুঝিতে পারি না, বুঝিলেও ধারণা ঠিক রাখিতে পারি না। সেই জন্যই মহাদেব আপন ইচ্ছা ক্রমে মহাপুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইয়া কিছু সময়ের জন্য আমাদিগকে চকিত, স্তম্ভিত, ও ধর্ম্মনিয়মাধীন করিয়া রাখিয়া আবার অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। তাঁহার ক্রিয়াই এইরূপ। তিনি উন্নতি হইতে অবনতি, এবং অবনতি হইতে উন্নতি উভয়ই সিদ্ধ করিয়া থাকেন। যাহারা বলেন জগতে কেবলই উন্নতি হইতেছে, তাঁহাদের মত অভ্রান্ত নহে। বস্তুতঃ আলোক হইতেই আঁধার এবং আঁধার হইতেই আবার আলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রকারে অস্তিত্ব হইতে নাস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের সঞ্চয় হয়।

বস্তুতঃ যেমন একত্ব হইতে দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি অসংখ্যত্বের উৎপত্তি, সেইরূপ অসংখ্যত্ব হইতে আবার একত্বের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। মানব সমাজে এই প্রকার একতা ও ভিন্নতা চিরদিনই বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা নিবারণের কোন উপায়ই সাধারণ মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে। মনুষ্য মাত্রেই মনুষ্যের ভ্রাতৃবৎ হইলেও মনুষ্য মাত্রেই মনুষ্যের শত্রু; তাহা না হইলে মানব বুদ্ধির এত কুটিলতা ও কপটতা কেন? সভ্যতা কি প্রকারান্তরে এই কুটিলতা ও কপটতার বৃদ্ধি করিতেছে না? অথচ আমরা সকলেই মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া স্বার্থসাধনে সদা বিব্রত। মুখে উত্তম বাগ্বিন্যাস ও লেখনীতে উত্তম লিপি কৌশলের পরিচয় প্রদান যত সহজ, বস্তুতঃ সত্যানুসরণ তত সহজ নহে। আবার একতার মাহাত্ম্য বুদ্ধিতে গ্রহণ করা যত সহজ, কার্য্যত প্রকাশ করা তত সহজ নহে। আপনার স্থির সময়ে অন্যকে সহোদর বৎ জ্ঞান করিতে পারি, কিন্তু যে সময়ে প্রকৃতি প্রতিবাদী হন, অর্থাৎ রিপুর প্রাবল্য উপস্থিত হয়, তখন আর আমাদিগের সে জ্ঞান থাকে না। তখন অন্যের কথা দূরে থাকুক,

আপনার সহোদরকেও শত্রুবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা কি আমাদিগের জীবনের প্রতিদিনের ঘটনা নহে? অথচ আমরা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, কেন না আমরা সভ্য হইয়াছি। সভ্যতার গুণে সৌভ্রাত্রে জলাঞ্জলি দিয়া থাকিলেও, আমরা সকলের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ বুঝিয়াছি ও তাহা প্রতিপালন করিতেছি এ অভিমান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি।

সেই জন্যই বলি এ কপটতা কেন? যদি একতার প্রয়োজন থাকে, তবে সর্ব্বত্রে কপটতার বিনাশ ও সরলতার আবির্ভাব সাধন আবশ্যক। সরলতা ব্যতীত সত্যানুরাগ থাকিতে পারে না, সত্যানুরাগ ব্যতীত প্রেম ও জ্ঞানের মিলন অসম্ভব। সরল হওয়া আবশ্যক. এজন্য আমাদের প্রথমেই দেখা উচিত, আমাদের পারিবারিক একতা প্রাচীন সমাজে কতদূর সিদ্ধ হইয়াছিল, এবং আমরাই বা এখন তাহার কত দূর উন্নতি করিয়া তুলিয়াছি। প্রায় সকলেই জানেন, ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ একান্নবর্ত্তী পরিবারের জন্য বিখ্যাত। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের উৎপত্তির মূলই সৌহৃদ্য ও স্নেহ মমতা। এই জন্যই গৃহ বাঙ্গালীর পক্ষে অতি প্রিয় পদার্থ। সহস্র কষ্ট উপস্থিত হইলেও বাঙ্গালীর গৃহত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মে না। গৃহই বাঙ্গালীর ইহজীবনের স্বর্গ স্বরূপ। যত দিন পরিবারের মধ্যে সরলতা ও কর্ত্তার দৃষ্টি সকলের প্রতি সমান ছিল, তত দিন এই পারিবারিক একতা যথার্থই স্বর্গ স্বরূপ ছিল। কর্ত্তার পদস্খলনের সঙ্গে সঙ্গেই এরূপ একতা নানা অসুখের মূলীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আর একতা নাই। কর্ত্তার এরূপ পদস্খলনের প্রধান কারণ দেশে শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও বিজাতীয় ভাব সংযোগে আত্মসংযম ও সরলতার অভাব। শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তনের ফলে, দেশের সচ্ছলতা দূর হওয়ায়, লোকের নানাপ্রকার অভাব-পীড়ায় উৎপত্তি এবং বিলাসের আবির্ভাব হওয়ায় নানাপ্রকার কাল্পনিক অভাবের সৃষ্টি ও তদ্ধেতু স্বার্থপরতার বৃদ্ধি হইয়াছে। এই কারণেই আমাদিগের পারিবারিক কর্ত্তারা আর এখন ঠিক থাকিতে পারেন না। ইহার উপর আবার ধর্ম্মভাবের পরিবর্ত্তন দ্বারা সামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় পারিবারিক একতায় ও বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রণালী যাহা বহু কাল হইতে নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা আর এখন চলিতে পারে না, স্থিরীকৃত হইয়াছে। পারিবারিক একতা ভঙ্গ হইয়াছে, ক্রমে দম্পতি মিলনও ভঙ্গ হইতে পারে। কেন না, স্ত্রী পুরুষ এতদুভয়ের মধ্যে কে কাহার অধীন থাকিবে, যখন এ প্রশ্নের উদয় হইবে, তখন উভয়ে পৃথক হওয়া সম্ভব। স্বাধীন মত দ্বারা ও এ প্রকার বিচ্ছেদ ঘটনা হইতে পারে। জ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতিতে মত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং যতই মতভেদ, ততই গৃহ বিচ্ছেদ। ক্রমে মনুষ্যজাতি আবার আদিম অসভ্যাবস্থার ন্যায় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই যাহার যে দিকে ইচ্ছা সে সেই দিকে বিচরণ করিতে থাকিবে। ইচ্ছা হয় স্ত্রী স্বামীর সহিত একত্র বাস করিবে, না হয় অন্যের সহিত মিলিত হইবে, অথবা একাকিনী কালযাপন করিবে। কোন বন্ধনই আর মনুষ্যকে পরস্পর স্থায়ীরূপে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে

না। এইরূপে পারিবারিক একতার চরমোৎকর্ষ কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে আমেরিকা ও ইয়ুরোপের সমাজপতি পরীক্ষা করিলে তাহা কতক কতক বুঝা যায়। বস্তুতঃ প্রেমশূন্য জ্ঞান প্রভাবে আমাদিগকে ক্রমেই এই বিচ্ছেদের পথে লইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা যে, দিন দিনই বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাবে আত্মশাসনের ক্ষমতা হারাইতেছি, ভ্রমক্রমেও কাহারও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হইতেছে না।

পারিবারিক একতা এইরূপেই শেষ হইয়া আসিতেছে। ক্রমে আমরা প্রত্যেকেই, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই সংসার-সমাজের এক একটী পৃথক্ একক স্বরূপ হইয়া মানব-মহত্ব প্রকাশ করিতে থাকিব, তাহার সূচনা হইয়া উঠিতেছে। পারিবারিক একতা ভাঙ্গিয়া এই সকল একক লইয়া আমাদের সামাজিক একতার বিচার করিতে হইবে। সমাজ কি জন্য? পরস্পরের ব্যক্তিগত বিরোধ মিটাইবার জন্য না বাড়াইবার জন্য? এত কাল আমাদের পারিবারিক একতা ছিল, সামাজিক একতাও ছিল, কেন না পরিবার শাসনের জন্য আত্মসংযমী কর্ত্তা ছিল ও সমাজ শাসনের জন্য শাস্ত্র ছিল। শাস্ত্রে যুক্তি ও বিবেচনার অনেক ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহার মান্য ছিল; নিয়ম যতই ভ্রান্ত হউক না কেন, মান্য হইলেই তদ্দ্বারা একতা সিদ্ধ হয়। সুতরাং সামাজিক একতা সিদ্ধ হইয়াছিল। একতার উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় সমাজের ও যে উদ্দেশ্য, একতার ও তাহাই। পরস্পরের ব্যক্তিগত বিরোধ দূর করিয়া সাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত এক নিয়মাধীন হওয়াই বোধ হয়, সমাজের উদ্দেশ্য। সামাজিক একতা হইতেই [illegible] উৎপত্তি। এক দেশে এক [illegible] হইলেই তাহা এক জাতি রূপে প্রতীয়মান হয়। এইরূপ এক জাতি অন্য জাতি হইতে পৃথক থাকে। কেননা দেশের জল বায়ু ও বাহ্য প্রকৃতি দ্বারা মানব প্রকৃতি গঠিত হয়, বিজ্ঞানের এই উক্তি যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল বায়ুর পার্থক্য বিবেচনায়, জাতীয় পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী স্বীকার করিতে হইবে।

এখন আমাদিগকে আর একটী তর্কে উপস্থিত হইতে হইতেছে। জাতীয় পার্থক্য প্রকৃতির নিয়মাধীন। যে নিয়মে ইংরেজেরা এতকাল ভারতে আসা যাওয়া করিয়াও অদ্যাপি আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের ন্যায় তথাকার স্থায়ী অধিবাসী রূপে পরিণত হইতে পারিতেছেন না, সে নিয়ম প্রকৃতির নিয়ম। জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিলে ইংরাজেরা কখনও এখানকার অধিবাসী হইতে পারিবেন না। যদি হন, তবে আর ইংরেজ থাকিবেন না, আর এক প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে, ইহা প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম। ইংরেজ এখনও ভারতীয় প্রকৃতিকে সে প্রকার কর দিতে সম্মত হন নাই, সুতরাং মুসলমানের ন্যায় ইংরেজ অদ্যাপি আমাদিগের দেশের সাধারণ অধিবাসীতে পরিণত হইতে পারেন নাই। সে ঘটনা আমাদের পক্ষে ভাল কি মন্দ, তাহার বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা রাজকীয় একতার বিষয় উত্থাপন করিতেছি।

এক সময়ে ভারতে সকল প্রকার এক

তাই ছিল। যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ন্যায় সকল প্রকার একতার মধ্যেই সামঞ্জস্য ছিল। পারিবারিক, জাতীয় পর্য্যন্ত সকল প্রকার একতাই ভারতে বিদ্যমান ছিল। এই একতা বন্ধনের প্রধান রজ্জুই ধর্ম্মশাস্ত্র। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ হিন্দুজাতি দ্বারা অধিবাসিত ও হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা শাসিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজকীয় শাসন একজনের অথবা এক সমিতির হস্তে ছিল না। ইহাতে অনেকেরই মনে হয় যে, ভারতে রাজকীয় একতা ছিল না। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ভারতে রাজকীয় একতা থাকাও প্রতিপন্ন হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন রাজা ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেন, রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন সম্বন্ধে সকলেই আপন আপন মন্ত্রীর উপদেশানুসারে কার্য্য করিতেন, কিন্তু শাস্ত্র কাহারই উপেক্ষণীয় ছিল না। সুতরাং সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রণালীর প্রভেদ থাকিলেও স্থূল বিষয়ে একই নিয়ম ছিল। শাস্ত্রই হিন্দুজাতির সামাজিক আইন, শাস্ত্রই হিন্দু জাতির রাজকীয় আইন। রাজ্যে রাজার আইন যেমন খাটে, হিন্দু সমাজে ও রাজ্যে শাস্ত্রও তেমনি খাটিত। আইন মনুষ্য কৃত, সুতরাং সর্ব্বদাই ভ্রম ও দোষ যুক্ত; এই নিমিত্ত আইনের পরিবর্ত্তন সময়ে সময়ে আবশ্যক বোধ হইয়া থাকে। শাস্ত্র সম্বন্ধেও একই কথা। কিন্তু একেবারে আইন শূন্য শাসন অপেক্ষা, ভ্রম পূর্ণ আইন দ্বারাও শাসন কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহনীয় ভাবে চলিয়া থাকে, আমাদের দেশে শাস্ত্র সকল ভ্রম পূর্ণ হইলেও তদ্দ্বারা প্রাচীন কালে সামাজিক শৃঙ্খলা সেই রূপ রক্ষিত হইত। দেশ শাসন জন্য সকল দেশেই আইন আছে, কিন্তু সমাজ শাসন জন্য হিন্দুর দেশ ছাড়া আর কোথাও যে কোন শাস্ত্রের আধিপত্য আছে, এমত কথা আমরা এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই। দেশ শাসনের জন্য যেরূপ আইনের প্রয়োজন, সমাজ শাসনের জন্য সেই রূপ শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে কি না, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বিবেচ্য বিষয়। আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রাচীন ভারতে বহু সংখ্যক হিন্দু রাজা বর্ত্তমান থাকিলেও কেবল শাস্ত্রের প্রসাদাৎ দেশে রাজকীয় একতা যথেষ্ট রূপে বর্ত্তমান ছিল। যথেষ্ট রূপ কেন না সাধারণের সাচ্ছন্দ্য জন্য যত দূর একতার প্রয়োজন তাহা এক প্রকার ছিল। আবার সামাজিক ও পারিবারিক একতাও উহার বিরোধী ছিল না। বস্তুতঃ সর্ব্ব প্রকার একতার মধ্যেই একটা সামঞ্জস্য ছিল, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কল্যাণের নিমিত্ত বলিতে হইবে।

এখন কথা এই যে, আমাদের দেশের পূর্ব্ব কাহিনী লইয়া আমরা যতই স্পর্দ্ধা করি না কেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন লাভ নাই। স্বদেশের প্রতি মমতা সকল লোকেরই স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। যাহার হয় না, সে ব্যতিক্রম স্থল। আমরা এক্ষণে যত কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা কেবল দেশ-ভক্তির পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে নহে। বস্তুতঃ যে দেশে পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় একতা পরস্পর সামঞ্জস্য লাভ করিয়া সাধারণ একতার প্রয়োজন সাধন করিতে উপযুক্ত না হইয়াছে, সে দেশ অদ্যাপি সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহন করিতে পারে নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। যে সভ্যতা

মনুষ্যকে বিলাসী করে, কিন্তু সাচ্ছন্দ্য দেয় না, গর্ব্বিত করে, কিন্তু বিনয় শিখায় না, স্বাধীন করে, কিন্তু নিয়ম রাখে না. অভাব জন্মায়, কিন্তু পূরণ করে না; যাহাতে পূর্ত্তি আছে, তৃপ্তি নাই, সুখ আছে স্বস্তি নাই, বিশ্বাস আছে, ভক্তি নাই, সে সভ্যতা যতই বিজ্ঞান গর্ব্বিত হউক না না কেন, তাহাতে মনুষ্যজাতির স্থায়ী উপকার সিদ্ধ হয় না। আমাদের দেশে এক্ষণে ইয়ুরোপীয় সভ্যতা এই প্রকার অপ্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানে যাহাদিগের সমধিক আদর ও ভক্তি আছে, তাঁহারা ও অদ্যাপি ইহার সম্যক আলোচনা করিতেছেন না। বস্তুতঃ আমরা সুবিজ্ঞ বাকল সাহেবের প্রণীত সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিয়াও কি বলিব না যে, আমাদের দেশে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ চেষ্টা সম্পূর্ণ অন্যায়। দেশের প্রকৃতি, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ইয়ুরোপীয় প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রূপে গঠিত হইয়াছে। এখানকার জল বায়ু ইয়ুরোপের জল বায়ু নহে। ইয়ুরোপের সভ্যতা এখানে চলিবে কেন? সেই জন্যই বলি যে, এক্ষণে আমাদিগের কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইয়ুরোপীয় সমাজের আদর্শ দেখিয়া আমাদের নব্যভারত বাসী যেরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, সে চাঞ্চল্য দূর করা একান্ত আবশ্যক। ইয়ুরোপীয় সমাজের রীতিনীতি আমাদিগের সমাজে কখনই খাটিতে পারে না। যিনি সে চেষ্টায় বদ্ধ পরিকর হন, তিনি নিতান্ত মূর্খ। আমরা বিজ্ঞানে পণ্ডিত না হইলেও সচ্ছন্দে তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া স্বাভিমান প্রবল করিতে পারি।

আমরা জানি আমরা হিন্দু সন্তান। হিন্দুর বিলাস-প্রিয়তা অতি প্রধান দোষ। হিন্দু রাজত্বের প্রাদুর্ভাব কালে, হিন্দুশাস্ত্রের শাসনে এই বিলাস প্রিয়তা বিশেষ সংযমিত হইয়াছিল। প্রকৃতির রত্ন ভাণ্ডারে থাকিয়াও ভারতবাসী আত্মশাসন করিতে শিখিয়াছিল। বিষয় থাকিতেও নির্ব্বিষয়ী, সুখের সামগ্রী অসংখ্য বর্ত্তমান থাকিতেও তৎপ্রতি স্পৃহাশূন্য উদাসীন, এমন জাতি পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। এমন বিলাস বিরোধী জাতি, যে জাতির লোকে কিছু কাল পূর্ব্বে এক পরিধেয় ও উত্তরীয় লইয়াই সকল সভায় গমনাগমন করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না, সেই সরল আত্মশাসনরত হিন্দুজাতির সন্তান আজ কি না পোষাক পরিচ্ছদে ইয়ুরোপীয় বেশ ধরিয়াছে! ইহা কি বস্তুতই দোষ নহে, বিলাস নহে? কেন এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এত পরিচ্ছদ বাহুল্যের প্রয়োজন? শরীর উলঙ্গ থাকিলে লজ্জা বোধ হয়? এ শিক্ষা কে দিয়াছে? অবশ্য [illegible] হইবে, শীত প্রধান দেশীয় ইংরাজজাতি। কিন্তু ইংরাজ জাতি যে জল বায়ুতে গঠন হইয়াছে, ভারতবাসী সে বায়ুর শাসনাধীন নহে। সুতরাং ভারতবাসীর সাচ্ছন্দ্যের জন্য পরিচ্ছদের বাহুল্য কোন অংশেই প্রয়োজনীয় নহে। তবে কেন এ রীতির অনুকরণ? যদি ধুতি চাদরে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিয়া কোট পেণ্টালুন, ইজার চাপকান, পিরান চোগার প্রয়োজন কি? তন্নিমিত্ত অর্থ ব্যয়ই বা কেন? ইহা কি বস্তুতঃ সাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় নহে?

আবার খাদ্য বিষয়েও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে

যাহার কল্পনাও কোন লোকের মনে কোন কালে উদিত হয় নাই, তাহা ভারতবাসীর জাতীয় গৌরবের বিষয়। ইহাতে আমরা দুঃখিত হইব কি না, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। ফলতঃ তাহার প্রয়োজন ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। আমরা যাহার কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি সে খাদ্য বিচার। অনেক খাদ্য সামগ্রী যাহা ভিন্ন২ জাতির সুখাদ্য, ভারতবাসীর তাহা অখাদ্য। খাদ্য বিষয়ে অন্য কোন দেশের কোন জাতিই এরূপ কঠোর নিয়মাধীন নহে। ইহাকে কি আমরা সভ্যতার [illegible]? কখনই না। কোন্ খাদ্যে মনুষ্যকে পশুভাব হইতে বিমুক্ত করিয়া দেবভাবের সমীপবর্ত্তী করে, তাহা হিন্দুরা যেরূপ নিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই সেরূপ পারে নাই। সে কথা প্রতিপন্ন করিতে হইলে এক খানি পৃথক্ গ্রন্থ লিখিতে হয়। ভরসা করি, আমাদের মধ্যে যিনি ক্ষমতাবান্ হন, তিনি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া জাতীয় গৌরব সম্বর্দ্ধন করিবেন।

বস্তুতঃ বিদেশীয় জাতি সংস্রবে আসিয়া আমাদিগেরউন্নতি হইতেছে, ইহা যিনি মনে করেন, তাহার প্রকৃতি বুঝিতে আমরা অক্ষম। যে সময়ে আমরা রোগে শোকে অভাবে ও পীড়নে সদা জর্জ্জরিত, কেবল চুরি ডাকাইতি, নরবলি, সতীদাহ, গঙ্গায় পুত্র বিসর্জ্জন ইত্যাদি দুর্নীতির লোপ হইয়াছে বলিয়া যদি সে সময়কে উন্নতির সময় বলিতে হয়, তবে অবনতির সময় কাহাকে বলিতে হইবে জানিনা। নরবলি, সতীদাহ, ইত্যাদি দ্বারা কত লোক ইহ জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ছিল, জানি না, কিন্তু বোধ হয়, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, ডেঙ্গু ব্ল্যাক্ ফিভার ইত্যাদিতে যত লোক ইহ জীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কোন মতেই ন্যূন নহে। আর যাহারা পরিবর্ত্তনের কালে মৃতবৎ ভাবে দুর্ব্বহ জীবন ভার কষ্টে সৃষ্টে বহন করিতেছে, তাহাদের সময় সংখ্যা কে গণনা করে।

যাহা হউক, আমরা পরিবর্ত্তনমাত্রকেই দূষণীয় বলিতেছি না। পরিবর্ত্তন ব্যতীত জীবন নির্ব্বাহ হয় না। যে জাতির পরিবর্ত্তন নাই, সে জাতি সম্পূর্ণ নির্জীব সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন দেশীয় রীত্যনুসারে হইলেই প্রকৃতি বিরোধের ফল প্রাপ্ত হয় না। বিদেশীয় সভ্যতার অনুকরণে আমরা পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে যাইয়া এই প্রকারে প্রকৃতি বিরোধের ফল প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের শরীরে বল নাই, মনে তেজ নাই, স্বাতন্ত্র্য বোধ নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই, প্রীতিতে সরলতা নাই, কেবল বিদেশীয় অনুকরণের দোষে। এই অযথা অনুকরণ ত্যাগ করিয়া যে অনুকরণে আমাদের প্রকৃতি বিরোধ উৎপন্ন ও স্বাভাবিক সরলতার লোপ না হয়, তাহার অনুসরণ করিলেই আমাদের উন্নতির সম্ভাবনা। সেই নিমিত্তই বলিয়াছি। হিন্দুত্বের যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া অগ্রে সমাজ দৃঢ়ীভূত করা হউক। সারগ্রাহীতা অভ্যাস সিদ্ধ হইয়া উঠিলে অসার বস্তু ত্যাগ সহজ ও সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। তখন আমরা আমাদিগের আত্ম-মর্য্যাদা বুঝিতে পারিব। ইহা বলা বাহুল্য যে, আত্ম-মর্য্যাদা বোধ ব্যতীত কোন সুনীতি দৃঢ় রূপে জাতীয় চরিত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে

পারে না। একতা একটী প্রধান সুনীতি। এই সুনীতি জাতীয় ভাবে পরিচালিত হয়, ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর ইহাও বুঝিতে হইবে, জাতীয় বল, সার্ব্বভৌম একতা যাহা কেবল ধর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় না হইলেও, সামজ ও স্বাতন্ত্র্য এবং তন্নিবন্ধন সাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনন্ত তুষানল।

পীড়িতের আর্ত্তনাদ।

সংসার দুঃখময়। হাহাকার ঘরেঘরে, জলধারা চোখে চোখে, বৈরাগ্যের নিশ্বাস, বিরহের বেদনা, শোকের ক্রন্দন, রোগের যাতনা, শত্রুর অত্যাচার, দ্রোহীর অবিশ্বাস, প্রণয়ীর বিড়ম্বনা, হতাশের বিষাদ-আক্ষেপে সংসার জর জর। মাথার ঘাম ফুটিয়া পায়ে ঝরে, তবু উদর পুরে না। উষ্ণ শোণিত শীতল হয়, তবু অভাব মিলে না। কাল কেশ সাদা হয়, তবু পিয়াস মিটেনা। হা হতাশ, দীর্ঘশ্বাস, হৃদয় বেদনা নিত্য নিরন্তর, তবু লোকে বলে সংসার সুখের, আমার সোণার ঘর কন্না। এ রহস্যের অর্থ কি? সহস্র সহস্র বৎসর হইতে সহস্র সহস্র পণ্ডিত ও সাধুগণ, বিরাগী ও সন্ন্যাসীগণ, শাস্ত্রকার ও সমাজ-বেত্তা বলিয়া আসিলেন, সংসার অনিত্য, সংসার মায়া এখনি আছে, এখনি যাইবে, মায়ার মুগ্ধ হইয়া, অনিত্য অসার পদার্থকে আমরা নিত্য সারাৎসার বলিয়া গণনা করিতেছি। কত লোক কত ভাবে কত কথায় আমাদিগকে বুঝাইল। আনন্দ কোলাহলের বাসরে সহসা "হরিবোল হরি" বলিয়া চিৎকার, আমার চমক ভাঙ্গিয়া ক্ষণকালের জন্য চৈতন্য জন্মাইল, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি গায়ের বস্ত্র টানিয়া দিয়া নিদ্রার আবেশে ঢলিয়া পড়িলাম। স্বপ্নই আমার ভাল লাগে, নিদ্রার অজ্ঞানতা, আমার বড় প্রিয়, চৈতন্য, আলোক, জ্ঞান, সূক্ষ্মতা আমাকে আকর্ষণ করে না। লোকে এত বুঝায়, তবু যাহা জড়, যাহা অনিত্য, যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, যাহা অন্ধকার, যাহা স্থূল আমি তাহাই ভালবাসি।

সংসার যে জন্য শোভনীয় বলিয়া লোকে আমাকে বুঝাইত, দেখিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছি, সে সকলই ভুল। যাহা পর্ব্বত বলিয়া ভিত্তি গাঁথিয়া সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, চোরা বালির মত আমার বিশ্বাসের সেই ভিত্তি দিন দিন পলে পলে সরিয়া যাইতেছে, ঘর ফাটিয়া চুঁরিয়া গেল, তথাপি মেরামত করিয়া চক্ষু বুঝাইয়া বিপদের কোলে মাথা দিয়া পতনোন্মুখ সেই গৃহে শুইয়া আছি। জীবনের শিক্ষা, সাধুর দৃষ্টান্ত, পণ্ডিতের বেদ সকলই আমাকে শিখাইয়া দেয়, সংসার অসার কণ্টক পূর্ণ, বেত্রাঘাতে পৃষ্ঠ ফাটিয়া গিয়াছে, আঘাত কত পীড়াদায়ক বুঝিয়াছি, তবু যেখানে আঘাত পাইব, সেই খানেই ছুটি, যেখানে যন্ত্রণা সেখানে মস্তক পাতিয়া দেই, গরল দেখিলেই অমৃত বলিয়া পান করি, এ রহস্যের মর্ম্ম কি?

যাহা পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় বায়ুতে মিশাইয়া

যাইতে, যাহা আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিতেছিলাম, তাহা অন্ধ হইতে অন্ধতর অন্ধকারে পরিণত হইতেছে, যাহা বরমালা বলিয়া সোহাগ করিয়া গলায় পরিয়াছিলাম, তাহাই সর্প হইয়া বক্ষে দংশন করিতেছে, তথাপি সেই মালা আবার খুঁজিতেছি, সেই আলোক আবার চাহিতেছি, সেই স্বপ্নকে সত্য বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রান্ত হইতেছি, এ স্বেচ্ছাকৃত ভ্রমের কারণ কি? অনিত্যকে নিত্য বলি কেন, অসুখকে সুখ বলি কেন, সাধ করিয়া কণ্টকে দেহ ছিন্ন করি কেন? মরিচিকাকে মরিচিকা বলিয়া বুঝিয়াও তাহার পিছনে দৌড়াই কেন? কে আমাকে বুঝাইবে?

মায়া মোহে কুৎসিত কুরূপকে, সুন্দর স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিতেছি। শূন্য হইতে উৎপত্তি, শূন্যের উপাদানে গঠন, বায়ুভরে সেই আদিম শূন্যে পরিণত। আদরের পুত্র কন্যা শূন্যের সমষ্টি, প্রেমময়ী দয়িতা শূন্যের ছায়া; স্নেহময়ী ভূদেবী জননী জীবন শূন্য স্বপ্নের আবেশ, সাধ করিয়া যাহাকে কোলে লইয়া বসাইতেছি; সে পূতি-গন্ধময় শব মাত্র, যাহাকে বুকে পুরিয়া বুক জুড়াইতেছি, সে ও নাই, আমিও নাই, বুকও নাই, জুড়ায়ও না কেহ, চিন্তা করিতে চক্ষু অবসন্ন হইয়া পড়ে, মস্তিষ্ক মুহ্যমান হয়। এই সুবাসিত সাধের বেল ফুল, এ নাকি ঘেঁটুফুল? এই বায়ু সেবিত, সজ্জিত, শীতল গৃহ, এ নাকি মরুস্থলী, আমার আশার পুত্র, ভরসার পুত্র, ভরসার ভাই, প্রাণময়ী প্রণয়িনী সকলকে দেখিতে দেখিতে ছাড়িতে হইবে, টানিয়া লইয়া যাইবে, হাত বাড়াইলে ধরিতে পারিব না, কল্পনা কল্পনায় মিশাইবে, শূন্য শূন্যে কাটিয়া যাইবে, বুঝিতেছি, দেখিতেছি, তবু কেমন বুঝিতে পারি না, মস্তিষ্কে ধরিতে পারি না, হৃদয় মস্তিষ্কের মাথায় একটা ঘোমটা ফেলিয়া মস্তিষ্ককে চাপিয়া ফেলে, মায়ার একটানা স্রোতে আমার হাত পা অবশ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, এ মায়ার ব্যাপারটা কি? কিসে আমাকে এত ভ্রান্ত করে, চিতাবাঘিনীকে কেন কুরঙ্গিনী ভাবিয়া পুষিতেছি? এ জটিল রহস্যের মিমাংসা কে করিবে? কে আমাকে বুঝাইবে?

জগৎ অনন্ত মরুস্থলী, সাইমুনের ঝটিকা দিবানিশি অনন্ত বালু রাশির উপর প্রবাহিত। কি খরস্রোতা নির্ঝরিণী, কি মন্থর গতি প্রভূত পয়ঃ তুষার বাহিনী, সকলেই সেই স্থলে পতিত হইয়া অন্তর্দ্ধান করে। বিশাল জীবন-নদের অবশ্যম্ভাবী এক মাত্র পরিণাম মরুস্থল। প্রারম্ভে খরস্রোত চপলতা, মধ্যে অতলস্পর্শ প্রবীণতা, অন্তে আত্মঘাতিনী স্বরস্বতী মূর্ত্তি, এ জীবনে লাভ কি? আমি জীবন চাহি না, যে জীবনের ইতিবৃত্ত চিন্তা করিলে আত্মহত্যা পুণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, নরক ভোগের তুলনায় স্বর্গ সুখ তুচ্ছ বলিয়া পরিচালিত হয়, আমার অনিচ্ছায় কে আমাকে সে জীবন দান করিয়া উপকৃত করিল?

স্বর্গ, স্বর্গ, স্বর্গ বালকের পুত্তলিকা, বর্ব্বরের প্রলোভন, ইহ জীবনের অসমতা সামঞ্জস্য করিতে প্রতারকের উদ্ভাবনা। ইহজীবনে যাহা হইল না, পৃথিবীর অনুরূপ উপাদানে সৃষ্ট, অনুবীক্ষণের কাচ লইয়া ক্ষুদ্র পৃথিবী মহত্তীকৃত স্বর্গে, পার্থিব নিয়মের ব্যত্যয় হইয়া, পার্থিব লাভ লোকসানের হিসাব হইয়া ক্ষতিপূরণ করা হইবে। হৃদয় আশ্বস্ত হও। এখানে তোমার পুণ্যের

পুরস্কার দারিদ্র্য, পাপের দণ্ড ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম। তুমি পাপ হইতে নিবৃত্ত হও। ইহকালে তোমার পুণ্যের পুরস্কার কুঠার লৌহশলাকা, জলন্ত চিতা পাপের দণ্ড রাজপ্রাসাদে। তুমি পাপ হইতে নিবৃত্ত হও, ইহকালে পুণ্যে কিছু লোভনীয় না থাকিলেও পুণ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, পরকালে স্বর্গে ক্ষতি পূর্ণ হইবে হৃদয়ত আশ্বস্ত হয় না। আমি পাপ করিলাম তোমার বিরুদ্ধে, ক্ষতি করিলাম তোমার, ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তোমার, দণ্ড দিতে হয়, তুমি দিবে, তোমার অবিশ্বাসী সমাজ দিবে, সমাজের প্রতিনিধি রাজা দিবে। তৃতীয় ব্যক্তি দণ্ড দিবার কে? ক্ষমা করিবার কে? আমি উপকার করিলাম তোমার, কৃতজ্ঞ হইতে হয়, তুমি হইবে, পুরস্কার দিতে হয় তুমি দিবে। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পুরস্কার লইব কেন? লইলে তাহাতে তৃপ্তি হইবে কেন? আর যদি পুরস্কার দেন, আর তাহাতে তৃপ্তি হয়, সে পুরস্কার অন্যকে সাধু কর্ম্মে প্রণোদিত করিতে, তিনিও তোমার সমাজের একজন সাধারণ তন্ত্রের প্রজা, তোমার সুখ দুঃখে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি হয়। স্থানান্তরে, সময়ান্তরে, সমাজের অসাক্ষাতে, গোপনে দণ্ড পুরস্কার, অন্ধকার রাত্রে দস্যুর লগুড় প্রহারের ন্যায় নিরর্থক বা অপরিচিত, অজ্ঞাত নামার উপহারবৎ পরিত্যাজ্য। আমার সুখ দুঃখ তোমাদিগকে লইয়া। জ্ঞাতি মণ্ডলে অপমান, দেশে সুনাম, যাহাদিগকে লইয়া একত্র আছি, যাহাদিগের শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য সকলি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাহাদিগের একটী টিটকারী, কুঠার অপেক্ষা যন্ত্রণা দায়ক, দণ্ড দিতে হয়, তাহাদিগের সম্মুখে দিবে, পুরস্কার দিতে হয়, তাহাদিগের সমক্ষে দিবে, তবে দণ্ড পুরস্কার সার্থক হইবে।

দণ্ড পুরস্কারের সার্থকতা অস্বীকার করি না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, অস্বীকার করি। যাহা করিয়াছি, তাহার দণ্ড আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। কাহারও সাধ্য নাই, আমার কৃত পাপের ফল ভোগ হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবেন। কারণ ঘটিলেই কার্য্য হইবে, সে নিয়মের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না, তবে যে সকল কারণে কার্য্য প্রভাবিত হয়, দণ্ড ভয় বা পুরস্কারলাভ তাহার অন্যতম হইয়া কার্য্যকে প্রভাবিত করিতে পারে। তুমি আমাকে দণ্ড দাও, ভবিষ্যৎ অসৎ কার্য্য হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিতে, অতীত কার্য্য প্রত্যাহৃত করিতে নহে। অতীত প্রত্যাহরণ করিবার ক্ষমতা আমারও নাই, তোমারও নাই, কাহারও নাই। তুমি আমাকে পুরস্কার দাও, ভবিষ্যতে সুকার্য্য করিবার লোভ দেখাইতে। দণ্ড পুরস্কারের অন্য কোন অর্থ নাই। ইহকালের কার্য্যের দণ্ড ইহকালেই হইতে পারে। সমাজের উপকারের জন্য ব্যক্তি গত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে আমরা বাধ্য হই। দণ্ড সমাজের উপকারার্থে, দণ্ডদাতা সমাজ, পুরস্কর্ত্তা সমাজ, গ্রামের মোড়ল দিয়াই হউক, সংবাদ পত্রেই হউক, আর দেশের রাজা দিয়াই হউক। শিক্ষা ও সংসর্গের ন্যায়, অনুবৃত্তি ও অভ্যাসের ন্যায়, যে সহস্র কারণে আমার এক একটী কার্য্য প্রভাবিত করে, দণ্ড পুরস্কার তাহার একটী। শিক্ষা দোষে আচরণ যেমন অন্যায় হইতে পারে, দণ্ড দোষে তেমনি হইতে পারে। সুতরাং দণ্ড পুরস্কারের সার্থকতা অস্বীকার করা যাইতে

পারে না। কিন্তু সে দণ্ড পুরস্কার পরকালে হয়, দণ্ড পুরস্কার তৃতীয় ব্যক্তির হস্তগত। তবে সের সিংহের অপরাধে ডালহৌসী দলিপ সিংহের দণ্ড করিয়াছিলেন, তাহাও যুক্তি সঙ্গত বলিতে হইবে। আবার তোষা-মোদ করিয়া বিল্বপত্র দিয়া ভোলা-নাথকে ভুলাইয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহা অবুদ্ধি কবিকল্পনায় সম্ভব, কিন্তু সত্য নহে। জীবনে সুখ দুঃখের অনিয়মিত অন্যায় বিভাগ দেখিয়া কোন কবি কোন দিন স্বর্গের কল্পনা করিয়া ছিলেন। সে কুজ্-ঝটিকা যুক্তির আলোকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে দুঃখ যন্ত্রণার এত প্রাদুর্ভাব কেন? জীবন এত অসার কেন? চিরদিন এই প্রশ্ন চিন্তাশীলের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছে। স্বর্গের ন্যায় আর একটী কবিকল্পনা মানবেচ্ছার স্বাধী-নতা। জগতে দুই জন ঈশ্বর, দুই জন কর্ত্তা, এক জন দিয়া প্রহেলিকার সমস্যা হয় না। ভাই, ঈশ্বর ও সয়তান, দেব ও দৈত্য, সুর ও অসুর, আহরিমান ও অহুর মজ্দার-কল্পনা বর্ব্বর-যুগে প্রচলিত ছিল। মনুষ্য এখন সভ্য হইয়াছে, মস্তিষ্কে ব্যাবৃতি জন্মিয়াছে, তাই সাকার, দৈত্য, দানব, সয়তান ও অসু-রের পরিবর্ত্তে নিরাকার স্বাধীন ইচ্ছাকে তাহাদিগের সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছে। সুখের কর্ত্তা ঈশ্বর, দুঃখের কর্ত্তা মনুষ্যের স্বাধীনতা। দুর্ব্বল ঈশ্বরের অভিপ্রায় ভাল ছিল, তিনি সুখী করিতেই মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কেবল না বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতার দোষে মনুষ্য আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছে। স্বাধীন না হইলে মনুষ্য সুখী হইত, কিন্তু ঈশ্বরের বুদ্ধির দোষেই হউক অথবা হাইকোর্টের জজিয়তি পাইবার লোভেই হউক, ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। মার্জ্জার হস্তগত মূষিককে স্বাধীনতা দিলে, মূষিক যখন পলায়নপ্রবৃত্ত হয়, আর মার্জ্জার তাহাকে চপেটাঘাত করে, তখন মার্জ্জারের কত আনন্দ হয়, ঈশ্বর কি সে আনন্দ উপেক্ষা করিতে পারেন? অথবা তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি অমৃত ভ্রমে সন্তানকে বিষপান করাইতেছেন, এখন সন্তানের মৃত্যু হইলে তিনি কি করিবেন? অথবা মনুষ্যকে একটু স্বাধীনতা না দিলে, মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্মের বিচারপতি হইবার তাঁহার সুবিধা কই ঘটে। সেই জন্যই বা তিনি মনুষ্যকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়া-ছিলেন। দয়া-প্রবণ ঈশ্বর স্ত্রীবৎ কোমল হৃদয়। সামরিক যুগে হৃদয়ের কোমলতা তাদৃশ লোভনীয় নহে, কঠোরতাই সে সময়ে গৌরবের প্রস্রবণ। তাই কোমল হৃদয় ঈশ্বরের বিচারে কঠোরতা আরোপ করিবার জন্য লোকে ঈশ্বরকে বিচারকরূপে কল্পনা করিতে চাহিয়াছিল, ঈশ্বরে বিচার-পতিত্ব আরোপ করিবার জন্য এবং জীবনের যন্ত্রণা ব্যাখ্যা করিবার জন্য মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা কল্পিত হইয়াছিল।

আমার জন্মান্ধতা, আমার মূকতা, আমার অঙ্গ-বৈকল্য যেমন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, আমার কৃত কোন কর্ম্মই তেমনি আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহারা আমার প্রকৃতি গঠিত করিয়াছে, তাহারা আমার সহিত পরামর্শ করে নাই। আমি যন্ত্র, যন্ত্র যেরূপ গঠিত হয়, সে সেইরূপে কার্য্য করে, কার্য্য ভাল হয়, সুখ্যাতি কারুকরের, কার্য্য মন্দ

হয় অখ্যাতি কারকরের। মন্দ কার্য্যের জন্য, আহাম্মুখ না হইলে, কি কেহ যন্ত্রটীকে পদাঘাত করে? যন্ত্রে তৈল দাও, দম দাও, সে অন্য রকমে চলিবে। আমাকেও দণ্ড দাও, পুরস্কার দাও, আমি অন্য রকমে চলিব, কিন্তু দায়িত্ব আমার কিছু নাই। আমার জন্ম, আমার শিক্ষা, আমার সংসর্গ, আমার অভ্যাস, দণ্ড, পুরস্কার, প্রতিবেশী, অবস্থান কিছুই আমার করায়ত্ত নহে। সুতরাং কি করিব, কি না করিব, তাহাতে আমার কোন স্বাধীনতা নাই। যে রকমের কারণ প্রবলতর হইবে, সেই রকমের কার্য্য করিতে আমি বাধ্য।" তবে আমার দায়িত্ব কোথায়? তুমি যে দণ্ড দাও তাহা আমার দায়িত্ব হেতু নহে, শত কারণের সঙ্গে আর একটী নূতন কারণ যোগ করিয়া দিবার জন্য। বাতুলকে কোন কার্য্যের দায়ী বলিয়া পদাঘাত করিলে, লোকে তোমাকে যেমন উপহাস করিবে, আমাকে দায়ী বলিয়া পদাঘাত করিলেও তেমনি উপহাস করিবে। যাহা কিছু আমি করি তাহা আমার প্রাক্তনগত, ললাট লিপি বা কর্ম্মফল। আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র নাই। থাকিলে আমার সুখ দুঃখের কারণ যথস্থব রূপে বুঝিতে পারিতাম বটে, কিন্তু ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়া ফেলিতাম। আমাকে অমৃত বলিয়া গরল খাইতে দিবার জন্য তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করিতাম। তোমার ইচ্ছা তোমার অধীন নহে, তোমার আজ্ঞাবহ গোলাম নহে, এই অর্থে মায়া ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করা যায়।

জীবনের দুঃখ প্রাবল্য এড়াইবার জন্য দুর্ব্বল-প্রকৃতি লোকে আত্মহত্যা করে, ইহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য তেমনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নানা দেশীয় দার্শনিকগণ মানসিক আত্মহত্যা ঘটাইয়া ছিলেন। পুত্র শোক নিবারণ করিতে কেহ কেহ সুরাপান করিয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটায়, এই দার্শনিকেরা মায়া পান করিয়া ভববিস্মৃতি ঘটাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দ্বৈতবাদীদিগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা সুখের কর্ত্তা এক ঈশ্বর ও দুঃখের কর্ত্তা আর এক ঈশ্বর কল্পনা করিয়াছিলেন। এই মাতালেরা অদ্বৈতবাদী। ইয়ুরোপে ফিকটে ও ভারতবর্ষে শঙ্কর মিশ্র ইঁহাদের আচার্য্য। ইহাদের ভিন্নপ্রকৃতি সন্তান সন্ততি অনেক আছে। কেহ বলেন, জগতে সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই। সকল সুখের, চাঁদের জোছনা, ফুলের সুবাস, মেঘের শোভা, শিশুর হাসি, প্রণয়ের সুখ, নানা কথার অনুপ্রাস ঘটাইয়া ক্ষত মুখে ভস্মের প্রলেপ দিতে চাহেন। কেহ বা বলেন, দুঃখ বলিয়া যাহা বুঝিতেছ, তাহা দুঃখ নহে, তাহাও সুখ। তুমি মায়ায় পড়িয়া ভ্রান্ত হইয়াছ, তাই ফুলের আঘাতে বজ্রপাত কল্পনা কর, সোণার হারকে লৌহ শৃঙ্খল অনুমান কর, সুখের বাসর দুঃখের কারাগার বলিয়া প্রতীত হয়। এই দলের অগ্রনীগণ "সোহং" ঘোষণা করেন। "আমিই ঈশ্বর"। কেবল আমার সত্ত্বা ঈশ্বর নহেন, আমি ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত নহি, ঈশ্বর "তত্ত্বমসি" You are his manifestation। আর স্রষ্টা নাই, সৃষ্ট নাই, ইহকাল পরকাল নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, স্বর্গ নাই, পৃথিবী নাই, এক ভিন্ন, দুই নাই। মনুষ্যই ঈশ্বর, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বরই সব, মনুষ্যই সব। অদ্বৈতবাদীগণ মনুষ্যকে ঈশ্বরত্ব দান করিয়া ঈশ্বরকে অবনত করেন অথচ দুঃখের কারণ ব্যাখ্যাত হয় না। মনুষ্য

ঈশ্বর হইলে পাপ করে কে? দণ্ড পায় কে? ঈশ্বর? মনুষ্য ঈশ্বর হইলেও মনুষ্য ঈশ্বর দুঃখ ভোগ কেন করে, অব্যাখ্যাত রহিয়া যায়। কেহ বা দুঃখের অস্তিত্ব উড়াইবার জন্য জগতের অস্তিত্ব উড়াইয়া দেন, কেহ বা দুঃখভোগীর অস্তিত্ব উড়াইয়া দুঃখের উন্মুলন করিতে চেষ্টা করেন। নির্ব্বোধ শশক পত্র পুঞ্জে মস্তক লুকাইলে কি ব্যাধের বজ্রাঘাত নিবৃত্ত হয়।

নিরীশ্বরবাদী শাক্যসিংহ অন্যান্য প্রাচীন পণ্ডিতের ন্যায় অবিদ্যা হইতে বাসনা ও বাসনা হইতে দুঃখের উৎপত্তি অনুসরণ করিয়া জন্ম মাত্র দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। দুঃখময় জীবনের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, ইহা শাক্য সিংহ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। জীবের দুঃখ ও ঈশ্বরের দয়ার বিসম্বাদীতা তিনি ঘুচাইতে পারেন নাই, কেহ দুঃখের অস্তিত্ব, কেহ বা জীবের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন। কেহ বা উভয়ই স্বীকার করিয়া দ্বৈত ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিলেন। এই দুইটীর কোনটী শাক্যের মনঃপূত হয় নাই; তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া কর্ম্মফল দ্বারা জীবের দুঃখ, ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন এবং জগতকে স্বতঃসৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিতেন। কর্ম্ম ফল বর্ত্তমান দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে। কিন্তু আদিম দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কর্ম্মফল এমন কেন হইল? যাহার পরিণামে আমাদের এত দুঃখ, পূর্ব্ব পুরুষগণ এমন কর্ম্ম কেন করিয়াছিলেন, শাক্য সিংহ তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই। হিন্দু ব্যবস্থাপকগণ দুঃখময় জীবন বিধবার দুঃখ মোচনের জন্য বাসনার সংযমন, নিবৃত্তিমার্গ বা ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ দুঃখময় জীবন জীবমাত্রেরই জন্য সেই ব্রহ্মচর্য্য বা অনন্ত তুষানলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সরলভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন, জন্ম বা জীবন মাত্র দুঃখময়. —আত্মহত্যা সে দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। বিষপানে বা উদ্বন্ধনে একদিন আত্মহত্যা করিবার পরামর্শ দিলে লোকে তাঁহাকে বাতুল বলিত। তাহা না করিয়া তিনি এক একটু করিয়া জীবনের শ্বাস রোধ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, রিপু, কামনা, বাসনা, হৃদয়, তিন এক একটু করিয়া তুষানলে দগ্ধ করিতে, এক একটু করিয়া সমস্ত হৃদয়টা উৎপাটিত করিতে বলিয়াছিলেন হৃদয় দুঃখের কারণ। মাতাল সুরা মধ্যে হৃদয়কে ডুবাইয়া শোক হইতে ক্ষণকালের জন্য নিস্কৃতি পায়—সন্ন্যাসী মাদক সেবন করিয়া জীবনের যন্ত্রণার লাঘব করে। সে কিন্তু ক্ষণিক চিকিৎসা। কর্ম্মফল জীবনে দুঃখের কারণ বলিয়া এবং হৃদয় সেই দুঃখের আধার বলিয়া, বুদ্ধদেব জ্ঞান যোগে হৃদয়কে চিরদিনের মত ধ্বংস করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। হৃদয়হীন জীবন, মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। শাক্য বলিয়াছিলেন, জীবনে লাভ নাই। যদি ভবিষ্যতে ক্ষতি পূরণের আশা না রহিল, যদি আমার অনায়ত্ত কারণ হেতু সমস্ত জীবন যন্ত্রণাই পাইতে হইল, যদি অমৃতের কটোরা মুখের নিকট পৌছিতে পৌছিতে হলাহলেই পরিণত হয়, যদি সংসার কেবল মরুময়, প্রণয় কেবল বিরহময়, মিত্রতা শত্রুতাময়, বিশ্বাস অবিশ্বাসময়, উপকার কৃতঘ্নতাময়, শান্তি অশান্তিময়, ধর্ম্ম প্রতারণাময়, পবিত্রতা

কুটিলতাময় হয়, যদি জীবন কেবল বিষময় হয়, তবে জীবনে লাভ কি? এত দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়া এখনও জীব যখন জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন বুঝিলাম বিষপাত্র এখনও পূর্ণ হয় নাই। যে স্তম্ভে তাঁহারা সুখের লতা জড়াইতেছেন, যে দিন বালকের হস্তে উর্ণনাভের তন্তুর ন্যায় বজ্রাঘাতে তাঁহাদের সে স্তম্ভ চূর্ণিত হইবে, তখন তাঁহারা দেখিবেন পৃথিবীতে সার কেবল বিষাদ, সুখ স্বপ্ন মাত্র।

"It is not Nature" says Fichte "it is Freedom itself, by which the greatest and most tenible disorders, incedent to our race is produced. Man is the cruellest enemy of man."

স্বাধীনতা পাপের কারণ নহে যেহেতু স্বাধীনতা নাই পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। কর্ম্ম ফলই পাপের কারণ অর্থাৎ আমার পাপের জন্য দায়ী আমি নহি, অন্যেরা। অন্যের পাপ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয় "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরানাং পুণ্যলক্ষণং।" দণ্ড পাই আমি। কেন? বলিবে আমার এই দণ্ড অনুমান করিয়া পূর্ব্ব পুরুষেরা পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেন বলিয়া। কৈ তাঁহারাও নিবৃত্ত হন নাই; হইলে আমি পাপ করিতাম না, তোমরাও দণ্ড দিতে না। পক্ষান্তরে দেখ, প্রত্যেক নগরে গুলা ঠা ও ... তে শ্রম ... বের ন্যায় পাপীর নিরন্তর জন্ম হইতেছে। পয়োনালী জাত কীটের ন্যায় নগরের পঙ্কিল ক্ষেত্রে রাশী রাশী পাপীর জন্ম হইতেছে; কোন দণ্ড পুরস্কারে ইহাদের পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। ইহাদের জন্মদাতা কে? সুতরাং জীবনের দুঃখ মাত্র পাপহেতুও নহে, হইলেও অন্যায়। আর যে পাপের জন্য দায়ী আমি নহি, তাহার জন্য দুঃখ আমাকে ভোগ করিতে হইলে তোমরা সুবিচারক বটে! ভাই, যখন কঠোর কুঠারাঘাতে পাপীকে চূর্ণ করিতে উদ্যত হইবে, তাহার যন্ত্রণা চিন্তা করিয়া তাহার দুর্দ্দশায় এক ফোঁটা চোখের জল অর্পণ করিও।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

বিজ্ঞান সৌন্দর্য্য চায় না। জ্যোতির্ব্বিদ শরতের নির্ম্মল নৈশ আকাশে ফুটন্ত তারার হাসি বা হীরাখচিত ছায়া পথের মাধুর্য্য দেখিতে রাত্রি জাগরণ করেন না। তিনি দৃষ্টি সহায় যন্ত্রযোগে শূন্য পথে কতক গুলি বন্ধুর কদাকার ... সঞ্চারক অনন্ত জড় পিণ্ডের ছুটাছুটি দেখিয়াই স্তম্ভিত হন। বড় বেশী ... সকল মরুতুল্য জড় রাশির ... ও পরস্পরের সম্বন্ধাদির নিয়ম শৃঙ্খলে তিনি কখনও কখনও এক আধ টুকু সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন মাত্র দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও তাঁহার লক্ষ্যের অতীত। শিশিরে নাইয়া, ফুলে সাজিয়া, প্রভাত জ্যোতির শাড়ী পরিয়া প্রকৃতি হাসিতেছে। সুন্দর যুবতীর নিশ্বাস প্রবাহে ম... মৃদু সুগন্ধমলয় ধীরে ধীরে বহিতেছে। নিভৃত কুসুমকুঞ্জে কোকিল কুহরিতেছে। পীলিমার শুভ্র কোলে পাপিয়া গাইতেছে। ... বলিবে "সৌন্দর্য্য জাগিয়াছে।" এক জন ক... ডারউইন্শিষ্যের ... ঘণ্টা খানিক বসিলেই বুঝিয়া আসিতে হইবে, এসকলের কিছুই কিছু নয়। তিনি বলিবেন "কতকগুলি ধূলা মাটি কীট পোকার বিকাশ বা বিবর্ত্তন ব্যতীত

ইহসংসারে সর্ব্বৈব মিথ্যা।” কেহ বলিবেন “নাসাতে, চক্ষু যন্ত্রে সৌরকর সাহায্যে ফুলের জড়ীয় অণুর কম্পন জনিত অনবরত উত্থিত ইথার তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত ভিন্ন ফুলের সুরভি বা সুষমা কুসংস্কার মাত্র। কণ্ঠাহত বায়ুর তরঙ্গ বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন শব্দ বিশেষকেই তোমরা সুস্বর বল। কোকিলের কূজন, পাপিয়ার গান ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়।” এই সকল অবোধ্য ভাষার কট মট ছটায় মুগ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সর্ব্বদাই মনুষ্যের প্রাণে সৌন্দর্য্যের একটা সপিণ্ড করণ করিতে যেন ব্যস্ত সমস্ত রহিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য তত্ত্ব বিজ্ঞানের অতীত। অথবা সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান আর জড় বিজ্ঞান এদুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। জড়-বিজ্ঞান জড়ীয় নিয়মের অতীত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নয়। নূতন আবিষ্কার ব্যতীত, নূতন সৃষ্টি, নূতনত্বের রচনা তাহার বিষয় নয়। নিয়ম কথাটাই সম্পূর্ণ পুরাতন রাজ্যের। কতকগুলি কিছু আগে স্বীকার না করিলে তৎপশ্চাৎস্থিত নিয়মের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যায় না। নিয়ম কতকগুলি দ্রব্য বা বিষয়ের পশ্চাৎস্থিত কিছু। দুই বা বহুর পরস্পরের মধ্যগত সম্বন্ধ এবং ক্রিয়ার প্রকাশ ও অন্তর্দ্ধানের প্রণালীই নিয়ম নামে অভিহিত। সুতরাং নিয়ম-শাস্ত্রের বিষয়গুলি সম্পূর্ণ পুরাতন। নিয়ম পুরাতন জগতের কথা। নিয়ম, শাস্ত্র, জড়বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যাকরণ, সমাজতত্ত্ব, আইন, বিধি, ব্যবস্থা সকলই পুরাতন। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ভিত্তি সম্পূর্ণ নূতনত্বের উপরে স্থাপিত। ইহার দ্বিতীয় নাম কবিতা। সৌন্দর্য্যের শাস্ত্রকার কবি।

কবিতাকে সৌন্দর্য্যের শাস্ত্র না বলিয়া সৌন্দর্য্য প্রকাশক ভাষা বা অপর কিছু বলা উচিত। কেবল ভাষাই কবিতা নয়। সৌন্দর্য্য প্রকাশক মনের ভাব এবং রুচিও কবিতা। নীরবে নীল গগণের দিকে চাহিয়া [illegible] অবশ প্রাণ উদাসী হইয়া ছুটিয়া সেই নীলিমার কোলে কোলে নীল আকাশের গা ঘেঁষিয়া ঘেঁষিয়া আনাগোনা করিতেছিল। আর কি যেন গাইতেছিল। গান গুলি স্বপ্নময়। বুঝিতে বুঝিতে আর বুঝা গেল না। শুনিতে শুনিতে আর শুনা গেল না। তবু ও গানের নীরব তরঙ্গগুলি সেই প্রাণেই ঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলাম। এককোঁটা চোকের জল ঝরিয়া পড়িল। কবি বলিলেন “অপূর্ব্ব কবিতা ফুটিয়াছে। একেই বলে কবিতা।” এই কবিতার স্বপ্ন কোথায় ঘুমাইতে ছিল? সৌন্দর্য্যের কোলে। সৌন্দর্য্য কি?

“সৌন্দর্য্য কি?” আজ এই তত্ত্বই আলোচ্য। সৌন্দর্য্য কি? একটী জীবনময়ী সঙ্গীত ধারা। স্বপ্নময়ী নীতি। প্রাণময়ী গাথা। শান্তিময়ী প্রহেলিকা। আনন্দময়ী শুভবার্ত্তা। আর কি? অমৃত প্রস্রবণ। সুখের সিন্ধু। প্রাণের শীতলতা। হৃদয়ের হর্ষোচ্ছ্বাস। জীবনের জীবন্তত্ব। ভাবের উৎস। চিন্তা স্রোতের উচ্ছ্বসিত নদীবক্ষ। আরও কিছু। ভগবদ্‌ভক্তি। নির্ম্মল প্রেম। প্রীতির অনন্ত পারাবার। সৌন্দর্য্য স্বয়ং বিশ্বজন হৃদয়-রঞ্জিনী প্রাণে রমা জগজ্জননী। সৌন্দর্য্যের শেষ কাহিনী “মা, মা, মা,।” “মা” কথার গর্ভে সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে।

সৌন্দর্য্য বন্ধুরতা, অপ্রেম, অশান্তি চায় না। সৌন্দর্য্য ফোটে প্রেমে। সৌন্দর্য্য ফোটে সুখে, শান্তিতে। সৌন্দর্য্য বলে "এস, এস। কাছে এস। বুকে এস। কোলে এস। প্রাণে এস। হৃদয়ে এস। মর্ম্মের ভিতরে এস। মর্ম্মের মর্ম্মে এস। এস মিলে যাই। মিশিয়া থাকি। এস এক বই দুই নাই। তুমি আমি এক। এক হইয়া দ্বিতীয়ের সমীপে দাঁড়াই। দ্বিতীয় মহৎ, মহিমান, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মল, সুন্দর। দ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ "মা"। মায়ের কোলে সন্তান পূর্ণ বিকাশের উপরেও আর কিছু। নির্ব্বাক, গভীর, গম্ভীর, স্তম্ভিত সৌন্দর্য্য। এমন আর নাই।"

বাহিরে যে সৌন্দর্য্য দেখি তাহা ভিতরের শোভা সৌন্দর্য্যের ছায়া মাত্র। কথাটা অবৈজ্ঞানিক নয়। বিজ্ঞান খুঁজিতে খুঁজিতে খেই হারাইয়া শেষটা বলিতে বাধ্য হইয়াছে "বাহিরের যে সৌন্দর্য্য দেখ, তাহা ভিতরের শোভা সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র।" কথাটা ভাবান্তরেও বলিতে পারা যায়। স্থূল ভাবে দেখা যায়, সূর্য্য কিরণ, অণুর সঞ্চালন, ইথার তরঙ্গ, চক্ষু এই কয়টীর যোগে বর্ণ বৈচিত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু চক্ষুর ক্রিয়া সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। অন্য-মনস্কাবস্থায় কত বর্ণের পাখী, ফুল চোকের কাছ দিয়া চলিয়া যায় বা চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা ঠিক করা গিয়াছে, তখন চোক বুজিয়া থাকিলে যাহা ঘটিত, তাহার অতিরিক্ত কিছু ঘটে নাই। মোহের অবস্থায় বা পীড়াজনিত গাঢ় বিকারের সময়েও প্রায় এই রূপ ব্যাপার ঘটে। এই প্রকারে নানা উপায়েই প্রমাণ হয় চক্ষুর ক্রিয়া মানসিক ব্যাপার মাত্র। বর্ণ-বৈচিত্র সম্বন্ধে আর যে তিনটী কারণ স্বীকার করা হয় তাহা বাহিরের। এ ঘটনাতে চক্ষুই আমাদের প্রধান সহায়। অপর গুলির বিদ্যমানতাতেও চক্ষুর অভাবে সংসার অন্ধকার বোধ হয়। মনের যে বর্ণগ্রাহিকা শক্তি তাহাই আমাদের নিকট বর্ণ বৈচিত্রের সাক্ষাৎ কারণ। মানুষের বয়স্ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তি যত বিকাশিত হয় বর্ণগত বৈচিত্রও সেই পরিমাণে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সদ্যজাত শিশুর সহিত পরিণত বয়স্ক মানুষের এবিষয়ে যে প্রভেদ তাহা ভাবিয়া অবাক্ হইতে হয়। আবার সাধারণ লোকের অপেক্ষা যে ব্যক্তি বর্ণ বিষয়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়াছে এবং বহুদর্শী হইয়াছে, তাহার চক্ষুতে এই বিচিত্রতা আরও পরিস্ফুতরূপে পরিস্ফুট। পশুদিগের বর্ণজ্ঞান এত অস্ফুট যে, তাহা আছে কি না তদ্বিষয়ে সময়ে সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহাদের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা আদবেই আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেবল কখন কখন আলো দেখিয়া কোন কোন পশু বা পতঙ্গকে আমোদোন্মত্ত প্রায় হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের ভিতরে তখন কোন্ জাতীয় শক্তির প্রভাবে কি প্রকারের ব্যাপার ঘটে তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। ইয়ুরোপের কোন কোন পণ্ডিতসমিতি হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, বানরবং অতি অসভ্য বর্ব্বর প্রকৃতির মানুষও সূর্য্যোদয় এবং নির্ম্মল সলিল বক্ষে চন্দ্রালোক ও চন্দ্র বিম্বের ক্রীড়া দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল এবং গম্ভীর হয়। তখন তাহার মুখচ্ছবি দেখিয়া স্পষ্টই তাহাকে ভাবান্তরিত ও চিন্তান্বিত

বোধ হয়। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া আর এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ, তাঁহার প্রণীত মানবপ্রকৃতি নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষাংশে এই প্রকারের একটী উদাহরণ দিয়াছেন। বস্তুত, এই সকল বিচার করিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, মানুষের মধ্যে কি যেন একটা শক্তি আছে বা বিকশিত হইয়াছে যে, তাহার প্রভাবে মানবের চক্ষুতে এই জগৎ সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ দেখে, এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি অণুতে অণুতে যেন রাশি রাশি শোভা সৌন্দর্য্য ঢালা রহিয়াছে। কৈ একটী পশুকেও ত দেখা যায় না, যে বর্ষার আকাশে রামধনু আঁকা দেখিয়া, বিজলী চকিত নবীন মেঘের নীচে সবুজ বৃক্ষ শাখায় পেকমধারী ময়ূরের প্রসারিত পুচ্ছ দেখিয়া, বর্ষার উচ্ছ্বসিত নদীরবক্ষে নির্ম্মল চন্দ্র কিরণের ক্রীড়া দেখিয়া, প্রভাতের অরুণ দীপ্তি মাখা শিশির স্নাত ফুল্ল কুসুমোদ্যান দেখিয়া, মলয় অনিলে ফুল বাগানে ফুলের ঢেউ দেখিয়া, এক দৃষ্টে ধ্যান ধরিয়া স্তম্ভিত হইয়া সংসার ভুলিয়া, আপনা পাশরিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও চাহিয়া আছে? কৈ কখনও ত দেখি না, কোকিলের মধুর কূজন, পাপিয়ার উদাস গান, ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জরণ বা বাঁশীর সঙ্গীত, বীণার ঝঙ্কার শুনিয়া একটা ভল্লুক বা ব্যাঘ্র মানুষের মত মোহিত হইয়াছে? সর্পদিগের বংশিরব গ্রহণের শক্তি আছে। হরিণ সম্বন্ধেও এই রূপ প্রবাদ শুনা যায়। কিন্তু সাধারণত পশুপ্রকৃতি এ সম্বন্ধে ঘন নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেবল মানুষেরই মধ্যে কি যেন এক জ্যোৎস্নাময়, স্বপ্নময়, মধুময় ভাবের সমুদ্র উচ্ছ্বসিত রহিয়াছে। তাহার প্রতি তরঙ্গেই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া আছে।

শুধু বর্ণ বা রঙ্ সৌন্দর্য্য নয়। বর্ণবৈচিত্র্যে মনোহর সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়, ইহা সত্য কথা। সাতটী রঙ্ পৃথক্ পৃথক্ দেখিলেও মনে অসৌন্দর্য্যের বিরক্তি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু রামধনু-দেহে ক্রমান্বয়ে সাজান দেখিলে যেমন ভাব হয়; তেমন কিছুতেই হয় না। কোন সুসজ্জিত গৃহে বা মনোহারীর দোকানে জিনিষ গুলি যতক্ষণ এলোমেলো হইয়া পড়িয়া থাকে, ততক্ষণ ভাল দেখা যায় না। যাই জিনিষ গুলি সুরুচি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজান হইল, অমনি কোথা হইতে যেন একটা সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। কতকগুলি ফুল ছিঁড়িয়া এক থানে ফেলিয়া রাখার অপেক্ষা দশটী সবুজ বা কচি পাতার সঙ্গে একত্র করিয়া গুছিয়া একটী তোড়া বান্ধিলে বা মালা গাঁথিলে সৌন্দর্য্য আরও বাড়ে। নানা হিজি বিজি বন জঙ্গলের মধ্যে দুইটা জবার গাছ, একটা টগরের গাছ, একটা চাঁপার গাছ ফুল ভরে অবনত হইয়া থাকিলেও তেমন ভাল দেখায় না। কিন্তু গাছ গুলি এক থানে করিয়া একটী বাগান করিলে কেমন ভাল দেখা যায়! পরচুলা প্রস্তুতকারীদের দোকানে কত সুদীর্ঘ কৃত্রিম কেশভার দেখিয়াছি। কিন্তু একটী ক্ষুদ্র মস্তক ঢাকা আজ ঘনলম্বিত বিপুল কেশ রাশির সম্মুখে এক খানি কৌমুদী-বিধৌত, কলঙ্কের রেখা শূন্য চাঁদমুখ ফুটিয়া আছে, ইহাও দেখিয়াছি। এই দুইএ কত প্রভেদ তাহা সুরসিক কবি তুমিই বিচার করিয়া বল। কলাপীর বিস্তৃত কলাপ রাশি এত মনোহর কি কেবল বর্ণ বৈচিত্র্যে? না। তাহার

সঙ্গে গঠন-বৈচিত্র্য, বিন্যাস-বৈচিত্র্য, সর্ব্বোপরি সুন্দর লাবণ্য মিশিয়া আছে বলিয়াই এত সুন্দর। এক খানি সোলা দেখিতে কদাকার। মালী তাহা কুড়াইয়া নিয়া কতকগুলি শাদা শাদা ফুল তৈয়ার করিল। এখন দেখত কদাকার সোলা খণ্ড কেমন সুন্দর হইয়াছে! কত শরীরে চাঁপাফুলের মত রঙ দেখিয়াছি। কত গৌর কান্তিতে গোলাপের আভা ছড়াইয়া হাসিতেছে দেখিয়াছি। অথচ বলিয়াছি "ইঃ! কি কুৎসিত!" সেখানে সৌন্দর্য্য যেন কেন ফোটে নাই। কেমন টিকাল টিকাল নাক! কেমন পটল চেরা চোক দুইটী! কেমন হাতে গড়া মুখখানি! কেমন গোল গাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি! কেমন পটের মত দেহ খানি। পশ্চাতে কেমন এক বোঝা কাল মেঘের মত লম্বা চুল! সমস্ত দেহের উপর দিয়া কেমন একটা তেজাল, জমকাল, গৌরবর্ণের স্রোত বহিয়া যাইতেছে! অথচ এই সৌন্দর্য্যের প্রতিমা দেখিয়া একটুকুও মন উঠিল না। ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিলাম। দূর হইতে একখানি লাবণ্যের প্রতিমা মুখভরা, প্রাণজোড়া, বুক পোরা হাসি হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যেন সংস্কারমরুর বুকে হঠাৎ একটী সহস্র দল পদ্ম ফুল ফুটিল! যেন আঁধার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিল! যেন রোগীর তন্দ্রা-নিমীলিত চক্ষুর সম্মুখে স্বপ্নে নন্দনকাননের শোভা জাগিয়া উঠিল! রাশি রাশি পুঞ্জ পুঞ্জ পারিজাত ফুটিল! ফুটন্ত মন্দার বুকে চির বসন্তের কোকিল ডাকিল! মন্দাকিনী কুসুমের ছাঁয়া বুকে ধরিয়া মলয় প্রবাহ শীতল করিয়া বহিতে লাগিল! চক্ষু জুড়াইল, কর্ণ শীতল হইল, প্রাণ সুধার সাগরে সাঁতরাইতে লাগিল। এবার কি বলিব "আহা! সুন্দর! সুন্দর! সুন্দর!" কেনা বলিবে "বল।" কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে পূর্ব্বের মত আস্‌বাবের বেশী আড়ম্বর নাই। তেমন গঠন চাতুর্য্য বা বর্ণের ঢলাঢলি নাই। আছে কি? আছে, আমার বুকের ভালবাসা আর তাঁহার বুকের ভালবাসা মিশিয়া একটী তরঙ্গ। আছে, কতক গুলি বিনম্রতা, কতক গুলি দয়া ও পরের জন্য অশ্রুর ধারা। আছে, এক প্রাণ ভগবদ্‌ভক্তি। আছে, এক বুক পবিত্রতা ও নিষ্ঠা। আছে, স্বর্গের পুঞ্জ পুঞ্জ রাশি রাশি লাবণ্য। আর কিছু নাই; যাহা আছে তাহার ভরেই ধরা টলমল, জগৎ চকিত। আর কি চাও? বল। বলিতে পার বল। যে উত্তর দিতে পার দেও। বল এ স্বপ্ন এ প্রহেলিকা কি? বল "এ সৌন্দর্য্যের কাহিনী কি? যাহা আকাশে নাই, পাতালে নাই, স্বর্গে নাই, মর্ত্তে নাই, জড়ে নাই, অজড়ে নাই, যেখানে খুঁজি সেখানেই যাহা দেখিতে পাইনা, অথচ সর্ব্বস্থানেই ফুটিতে পারে, তাহা কি? একি আশ্চর্য্য ভোজের বাজি নয়?"

অভক্ত, তুমি যেখানে উত্তপ্ত মরু দেখিয়া নিরাশায় কান্দিতে ছিলে, দেখ ভগবানের ভক্ত সন্তান সেখানেই স্বর্গরাজ্যের সুবর্ণ পারিজাত রাশি ফুটন্ত দেখিয়া প্রেমাশ্রু ঢালিতেছেন। দেখ ইহা সত্য, ধ্রুব, নিশ্চিত কথা। পাপীর নরকের আঁধারে ঢাকা বিশ্বেই সাধু ভগবদ্ ভক্তের কৈবল্য ধাম, বৈকুণ্ঠ ভবন, স্বর্গের নন্দনকানন। এখন শুনিবে, সৌন্দর্য্য কি? সৌন্দর্য্য ভগবানের খাস দরবারের কিছু। ভগবানের নিজের একটী স্বরূপ। ইহা পশুর দেখি-

বার অধিকার নাই। অজ্ঞানীর দেখিবার অধিকার নাই। অভক্তের দেখিবার অধিকার নাই। বাহিরের কবিরা ইহার একটা ছায়া মাত্র দেখিয়াই উন্মত্ত হন। শুধু ভগবদ্‌ভক্ত কবি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পান। সেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিবার একমাত্র অধিকার তাঁহারই। যাঁহার ভিতর সুন্দর, তিনিই দেখেন বাহির সুন্দর। সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, ভিতর সুন্দর করিতে হইবে। সৌন্দর্য্য না দেখিলে জন্ম বৃথা, জীবন বৃথা। যে ইহা দেখে নাই, সে স্বর্গ দেখে নাই। সে ভগবানের সৃষ্টিতে নরক দেখে, আপনি নরকে থাকে। সৌন্দর্য্য মানব প্রাণের বড় আকাঙ্ক্ষার জিনিষ। ইহা যখন চক্ষুর অঞ্জন হয়, তখন শত্রুকে মিত্র বোধ হয়, দস্যুকে বন্ধু বোধ হয়, ঘাতককে সোদর জ্ঞান হয়। সৌন্দর্য্য অনন্ত জীবন পথের পথিকদিগের মহা পুণ্যতীর্থ। সুন্দর স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

তুকারাম ও রামপ্রসাদ। (২য়)

আমরা তুকারামের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। এখন তুকারামের ও রামপ্রসাদ সেনের জীবনে কি কি সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়, তাহার আলোচনা করিব।

উভয়েই নিজ নিজ মনের ভাব সংগীতের দ্বারায় ব্যক্ত করিতেন। সামান্য সাংসারিক ঘটনা হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উচ্চ ভাব পর্য্যন্ত, সংগীতের দ্বারায় প্রকাশ হইত। তুকারামের "অভঙ্গ" যেমন দাক্ষিণাত্যে আদরিত, রামপ্রসাদের "পদাবলী"ও সেই প্রকার বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। উভয়েই এক ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তুকারাম ভগবানকে পিতৃভাবে দেখিতেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মাতৃভাব উপলব্ধি করিতেন। উভয়েই ঈশ্বরের নিরাকার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তবে, সাধনার জন্য একটী মূর্ত্তি অবলম্বন করা যে আবশ্যক, তাহা উভয়েই দেখাইয়াছেন। তুকারাম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বিঠোবার প্রতিমার সমক্ষে ভজন কীর্ত্তনাদি করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। রামপ্রসাদ শাক্ত ছিলেন। কালী পূজা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আকারের মধ্যে, উভয়েই ঈশ্বরের নিরাকার ভাব দেখিতেন। এই সাধুদ্বয়ের পবিত্র জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উভয়েই অতি অল্প বয়স হইতে সংসারের প্রতি বীতরাগ ছিলেন। উভয়েরই মন ভগবানের দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে এই যে, সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা ও নানা প্রকার দৈববিড়ম্বনা তুকারামের বৈরাগ্য অবলম্বন পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল। ইহার উপর, তাঁহার মুখরা স্ত্রীর অত্যাচার তাহাকে সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার সহধর্ম্মিনী কর্ত্তৃক তিনি লাঞ্ছিত হয়েন নাই। কিন্তু তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই সংসারকে অতি অসার বিবেচনা করিয়া জগৎ জননীর প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তুকারাম, ভিক্ষাবৃত্তি কিম্বা কোন প্রকার চাকরী অবলম্বন

করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা তাঁহার বাটীতে আনিয়া দিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি মন সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকাতে, তুকারাম কোন স্থায়ী বৃত্তি অবলম্বন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি একবার ক্ষেত্ররক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, ক্ষেত্র স্বামীর বিরক্তি ভাজন হইয়াছিলেন। পক্ষী সকল শস্য খাইয়া যাইতেছে, তৎ প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। ক্ষেত্রস্বামী তাঁহাকে তজ্জন্য ভর্ৎসনা করিল। তিনি অমনি তেজের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "কেন, পক্ষীগণও কৃষ্ণের জীব, তাহারা কেন তাহাদের খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইবে।" পিতৃ বিয়োগ হইলে যখন সংসারের ভার রামপ্রসাদের উপর ন্যস্ত হইল, তাঁহাকে বিষয় কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তিনি মুহুরীর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মানুষ কি রামপ্রসাদকে সামান্য চাকরীতে আবদ্ধ রাখিতে পারে? তিনি কি সাংসারিক ব্যাপারে জড়িত থাকিতে পারেন? তিনি খাতা লিখিতে যান, জগৎ মাতা তাঁহার সমক্ষে দেখা দেন। একবার অঙ্কপাৎ করেন, আবার মায়ের নাম খাতায় লেখেন। অবশেষে, মানুষের চাকরী করা বিড়ম্বনা বিবেচনা করিয়া, ব্রহ্মময়ীর ভাবে বিভোর হইয়া তিনি তাঁহার হিসাবের খাতার এক পৃষ্ঠায় লিখিলেন।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্ হারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি * * * *
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী॥

তুকারাম শস্য রক্ষা করিবার ভার লইলেন। কিন্তু ব্রহ্মের ভাবে বিভোর হইয়া তিনি সকল জীবে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিলেন। তাঁহার প্রতি যে একটী ভার অর্পিত হইয়াছে, তখন আর তাঁহার মনে উদয় হইল না। তিনি পক্ষীগণকে তাড়াইয়া দিলেন না—আহার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিৎ করা তিনি অন্যায় বিবেচনা করিলেন। রামপ্রসাদের উপর একটী গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছিল। আয় ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার করিয়া লেখা তাঁহার কার্য্য। তিনি ব্রহ্মময়ীর ভাবে বিভোর হইয়া আর তৎ প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিলেন না। পুস্তকের পাতে পাতে দুর্গা নাম ও সংগীত লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উপরে উপরের কর্ম্মচারী বিরক্ত হইল, সে দিকে তাঁহার দৃক্পাৎ নাই, পদচ্যুত হইবার আশঙ্কা নাই।

তুকারাম সংসার হইতে অবসৃত হইয়া, তাঁহার ইষ্ট দেবতা বিঠোবার সেবায় নিযুক্ত হইলে তাঁহার মনের ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন;—

"ভাল হইয়াছে ওহে দেবনারায়ণ,
ব্যবসায়ে নষ্ট হলো সমুদায় ধন।
সাংসারিক দুঃখ আর দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
হয়েছে আমার পক্ষে সুখের কারণ।
এই সব যাতনায় হইয়া ব্যথিত।
করিয়াছি মন প্রাণ তোমাতে অর্পিত।"

রামপ্রসাদ সাংসারিক ক্লেশকে তুচ্ছ করিয়া বলিতেছেন;—

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
আমার দুঃখে দুঃখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও দেখি চাই।
* * *
দেখ সুখ, পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই॥"

তুকারাম, মহারাজা শিবজীকে যে পত্র লেখেন তন্মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি দুঃখী নহেন। তিনি বলিতেছেন ;—

"কৃপা পাত্র নই মোরা শুন হে রাজন,
আমাদের দুঃখী বলে করোনা গণন।
নারায়ণে সমুদায় করিয়া অর্পণ,
তাঁহার আশ্রয়ে করি জীবন যাপন।
বাসনা বিহীন গ্রামে বসতি আমার
ধরণীর সুখ আশা নাহি কিছু আর।"

রামপ্রসাদ তাঁহার মনকে বুঝাইতেছেন যে তিনি দুঃখি নহেন। যথা ;—

ও মন তুই কাঙ্গালি কিসে।
ও তুই জানিসনেরে সর্ব্বনেশে।

* * *

ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি,
দেখিস্ নারে বসে বসে॥"

তুকারাম এক স্থলে বলিয়াছেন !—

"বাসনায় নষ্ট করে পবিত্র জীবন।

* * *

সুসজ্জিত নর নারী করিলে দর্শন,
মৃত প্রায় হই আমি শুনহে রাজন।

* * *

তুকা বলে, ধনীগণ সম্ভ্রমের দাস,
ভক্তগণ হরি গেয়ে সুখে করে বাস।"

যে জন ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চায়, তাহার পার্থিব সুখের আশা করা উচিত নহে। রামপ্রসাদ বলিতেছেনঃ—

"মন করোনা সুখের আশা,
যদি অভয় পদে লবে বাসা

* *

হরিবে বিষাদ আছে মন,
করোনা এ কথায় গোষা।
ওরে সুখেই দুঃখ, দুঃখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা॥"

তুকারাম হরির ভাবে বিভোর থাকিয়া আপনাকে সুখী বিবেচনা করিতেন। পার্থিব সুখকে তিনি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেন। এই জন্য তিনি মহারাজা শিবজীর পত্রের প্রত্যুত্তরে এই প্রকার লিখিতে সক্ষম হইয়া ছিলেনঃ—

"তোমার নিকটে গিয়া কিবা প্রয়োজন,
হইবে ইহাতে বৃথা পথ পর্য্যটন।
খাদ্য যদি হয় মম কভু প্রয়োজন,
ভিক্ষা বৃত্তি করে আমি কাটাবো জীবন।
বসনের আবশ্যক হইলে কখন,
ছিন্ন বস্ত্রে হবে মম অভাব পূরণ।
প্রস্তর আমার পক্ষে চারু আস্তরণ।
আকাশ হয়েছে মম গাত্র আচ্ছাদন॥"

* *

প্রকৃত ভক্তের পক্ষে বিষয় সুখ ভোগ যে অসম্ভব তাহা, রামপ্রসাদ এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

"তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা,
সেটাও নিত্য নয়॥"

* *

যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরু তলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় ট্যাকা, এ বড় সংশয়।
প্রসাদে পেয়েছে তারা প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা রামপ্রসাদের আশায়॥"

আর এক স্থলে রামপ্রসাদ বলিয়াছেনঃ—

"আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী
আমায় সন্ন্যাসী করেছে॥

তুকারাম যেমন মহারাজা শিবজীর অনুগ্রহ লাভ বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেন নাই, প্রত্যুত রাজার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করত তাঁহার

প্রাসাদে গমন করেন নাই। রামপ্রসাদও একজন রাজ সভাসদ হইয়া রাজ বাটীতে থাকা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পথে একটী প্রতিবন্ধক স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তবে এই দুই ভক্তের মধ্যে প্রভেদ এই যে, তুকারাম ধন পাইলে তাহা লইতেন না। তাঁহার পরিজনগণের জন্য যে ধন আবশ্যক, সে বোধ তাঁহার ছিল না। রামপ্রসাদ ধনের জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতেন না, তবে, আচম্বিত ভাবে, তাঁহার হাতে টাকা আসিলে, তাহা উপেক্ষা করিতেন না। রামপ্রসাদ রাজার সভাসদ হইয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিতেন। তবে, তাঁহার উপর সংসারের ভার ন্যস্ত ছিল, সুতরাং পরিজন প্রতিপালন জন্য যে মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহা উপেক্ষা করেন নাই। রামপ্রসাদের সংসারে থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার জগৎজননীর কাছে অনেকবার মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। যথাঃ—

"আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছো গো মা সংসারী।"

আর এক স্থানে বলিয়াছেনঃ—

* *

"মনে করি গৃহ ছাড়ি,
নাম সাধনা করি বসে।"
কিন্তু এমন কল করেছো কালী,
বেঁধে রাখে মায়া পাশে॥

উভয়েই মুক্ত হস্ত ছিলেন। তুকারাম গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, অকাতরে দান করিতেন। এমন কি, তাঁহার সন্তানগণ যে কষ্ট পাইবে, সে চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইত না। দয়ার পাত্র দেখিলেই তিনি দান করিতেন। তুকারামের স্ত্রী তাঁহার স্বামীর প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"গৃহে শস্য আসিল, কিন্তু আমার সন্তানেরা তাহা খাইতে পাইবে না। আমার এই গৃহ চোর (তুকারাম) সমুদায় অপর লোককে বিতরণ করিবে। তাঁহার জন্য বাটীতে কিছু থাকিতে পারিবে না। আমি এখন কি করি, কোথায় যাই, কি প্রকারে সন্তানগণকে প্রতিপালন করি।" কথিত আছে যে, একদা তুকারাম কয়েক গাছি আক লইয়া বাটী আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে দয়ার পাত্র দেখিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। শেষে, এক গাছি মাত্র রহিল। তাহাই লইয়া বাটীতে আসিলেন। তুকারামের স্ত্রী এ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে আক গাছি দিবা মাত্র তিনি ক্রোধে অধীরা হইয়া সেই ইক্ষু দণ্ড তুকারামের পৃষ্ঠে ভাঙ্গিলেন। তুকারাম হাসিয়া বলিলেন—"সহধর্ম্মিনীর ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বটে। তোমাকে আক গাছি খাইতে দিলাম, তুমি তাহা কি প্রকারে একা খাইতে পার—সুতরাং তোমার স্বামীকে দিবার জন্য আকগাছি ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড করিলে।"

রামপ্রসাদও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকের ক্লেশ দেখিলে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত। কালী ঠাকুরাণীর ও কবির প্রণামী স্বরূপ ভক্তগণ যাহা প্রদান করিত, সমুদায়ই দাতব্যে ব্যয়িত হইত। কথিত আছে যে, ইহাতে কুলান না হইলে, কোন কোন সময়ে তাঁহার মাসিক বৃত্তি হইতেও অর্থ দান করিতেন। রামপ্রসা-

দের ঘরণী বোধ হয় ধর্ম্মভীরু ছিলেন। ইহা সম্ভব যে, সাধক তাঁহার সাধু কার্য্যে কোন প্রকার বাধা পাইতেন না। উভয়েই ধর্ম্ম বলে বলীয়ান ছিলেন। ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উভয়েই ভগবানের নিকট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। প্রকৃত ভক্তের যে ভগবানের উপর জোর আছে, তাহা উভয়েই দেখাইয়াছেন। তুকারাম বলিতেছেন—

"আমার পাওনা আমি চাহিব যখন,
বল হরি কোথা তুমি লুকাবে তখন?
করিয়াছ তুমি দেব যে যে অঙ্গীকার,
সাধুজনগণ দেখ সাক্ষী আছে তার।
বসিব তোমার দ্বারে হয়ে মহাজন। *
আদায় না করে, যেতে দিব না যখন॥"

তুকারাম আর একস্থলে বলিয়াছেনঃ—
"ধোরেছি কোমর তব, সর্ব্বশক্তিমান!
করিতে অনিষ্ট মম সাধ্য আছে কার?
করিতেছি হে বিঠোক! তোমারে আহ্বান,
ত্বরা করে এস তুমি নিকটে আমার।
অন্যদিকে চাহিবার নাহি প্রয়োজন।
ডাকিলেই আসিবে হে আমার সদন॥"

রামপ্রসাদের জোর এক রকমের জোর—ইহা আদুরে ছেলের জোর। এছেলেকে জগৎ মাতার ফাকি দেওয়া কঠিন। ব্রহ্মময়ীর ছেলে বলে, কখন আপনা আপনি গুমোর কচ্চেন, মায়ের বলে বল পেয়ে কখন যমকে শাসাচ্চেন, আবার প্রার্থিত বস্তু পেতে বিলম্ব দেখে কখন জননীকে সর্ব্বনাশী বলে গালি দিচ্চেন—কখন বা, বাবার কাছে নালিস কর্‌বেন বলে ভয় দেখাচ্চেন।

মনকে মৃত্যুভয়ে ভীত দেখিয়া রামপ্রসাদ বলিতেছেনঃ—
"মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এযে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হয়ে
ব্রহ্মময়ী সুত?

এক সময়ে রামপ্রসাদ যমের দূতকে বেস দুকথা শুনিয়ে দিলেনঃ—
দূর হয়ে যা যমের ভাটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বলগে যা তোর যম রাজারে, আমার মতন
নিছে কটা।
আমি যমের যম হতে পারি, ভাবলে ব্রহ্ম-
ময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভাটা, মুখ সাম্‌লায়ে
বলিস্ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা
দিলে রাখবে কেটা।"

ভব-যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ীর প্রতি কঠিন কথা প্রয়োগ করিতেছেনঃ—
"জন্ম জন্ম জন্মান্তরে মা কত দুঃখ আমায়
দিলে।
রামপ্রসাদ বলে এবার মলে ডাক্‌বো
সর্ব্বনাশী বলে॥"

নাছোড় বান্দার ন্যায় রামপ্রসাদ আরো কিছু চড়িয়ে বল্‌ছেনঃ—
"দেখি মা কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে
যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা ফাকি দিয়ে
কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো, খুঁজে
খোঁজ নাহি পাবা।

* উত্তমর্ণ।

বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে
পাছে ধাবা ॥
প্রসাদ বলে ফাকি জুকি, মাগো দিতে
পারো পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে
তোমার বাবা ॥"

মায়ের আদর পাইতে বিলম্ব হওয়াতে রামপ্রসাদ বলিতেছেনঃ—

"মা হওয়া কি মুখের কথা।
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥

* *

সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা।
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার
হয় না ব্যথা ?
দীন রামপ্রসাদ বলে, এচরিত্র শিখিলে কোথা
যদি বল আপন পিতৃধারা, নাম ধরোনা
জগন্মাতা ॥"

নিজে শাসিয়ে যখন রামপ্রসাদ কিছু করিতে পারিলেন না, তখন মায়ের নামে নালিস করিতে উদ্যত হইলেন।

"তারা আমি নই আটাসে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোক্ রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা
হৃদকমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা
কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সই-মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে
তুলে।
এবার কর্‌বো নালিশ নাথের আগে,
ডিক্রি লব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে;
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ গুজরাইব মিছিল
কালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকর্দ্দমা, খুব হবে রাম-
প্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে
লবে কোলে ॥

ক্রমশঃ

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

আমরা যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম করি। একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত সমস্ত আর্য্যভূমি যাঁহার ব্যবস্থা শাস্ত্র দ্বারা শাসিত হইতেছে, তাঁহার পবিত্র চরণ উদ্দেশে মস্তক নত করিতেছি।

যে সময় প্রাচীন আর্য্যগণ পশ্বাদির মাংস ও সোম রস দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের অর্চ্চনা করিতেন এবং তদন্তর সেই দেবপ্রসাদ পান ভক্ষণে উন্মত্ত হইয়া সামগান দ্বারা পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশ বিমোহিত করিতেন, আর্য্য সমাজের তখন এক চিত্র, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ভারত ক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া সেই চিত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বিপ্লবতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে লাগিলেন। বৈদিক সূত্র সমূহের পরিবর্ত্তে নূতন স্মৃতি প্রণীত হইল। ক্রমে ইঁহারা সকলেই

মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরা।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খ লিখিতাদক্ষগোতমৌ।
শাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ।

ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। আমরা ব্যবস্থা

প্রণেতাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই মনুর নাম দেখিতে পাই। প্রকৃত পক্ষেও তিনি সকলের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যদি কোন ঋষি কোন মত প্রচার করিয়া থাকেন, তবে কখনই গ্রহণ যোগ্য নহে, ইহা সর্ব্বসাধারণ প্রচলিত কথা। কিন্তু সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, কোন একটী বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ভগবান মনু হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। মনুপ্রোক্ত দায়ভাগ দ্বারা একমাত্র বঙ্গদেশ শাসিত হইতেছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের দায়ভাগদ্বারা বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমাস্থিত বিহার প্রদেশ হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ শাসিত হইতেছে। যে মিতাক্ষরা গ্রন্থ জগদ্বিখ্যাত এবং যাহার দ্বারা বঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য স্থানবাসী আর্য্যগণ শাসিত হইতেছেন, সেই মিতাক্ষরা গ্রন্থ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার এক খানা টীকামাত্র।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে উপোদ্‌ঘাত, ব্রহ্মচারি, বেদাভ্যাস, বিবাহ, গর্ভাধান, বর্ণ জাতি বিবেক, গৃহস্থ, আতিথ্য, স্নাতব্রতক, অনধ্যায়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, দ্রব্যশুদ্ধি, দান, শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ, প্রতিপদাদিশ্রাদ্ধফল, গণপতি কল্প, গ্রহশান্তি, রাজধর্ম্ম, ত্রসাবয়াদিমান, প্রভৃতি ২০টী প্রকরণে আচার নামক প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ৩৬৮টী শ্লোক আছে। ব্যবহার নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩১০টী শ্লোক আছে, ইহাতে ব্যবহারমাতৃকা, ভুক্তি লক্ষণ, ঋণদান, নিক্ষেপ, সাক্ষি, লেখ্য, দিব, দায়ভাগ, সীমা বিবাদ, স্বামিপালবিবাদ, অস্বামি বিক্রয়, দত্তাপ্রদানিক, ক্রীতানুশয়, সম্বিদ্ব্যতিক্রম বেতনদান, দ্যুতসমাহ্বয়াখ্য, বাকপারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, সাহস, বিক্রীয়া সম্প্রদান, সম্ভূয়-সমুত্থান, স্তেয়প্রকরণ, স্ত্রী সংগ্রহণ প্রভৃতি ২৩টী প্রকরণ আছে। প্রায়শ্চিত্ত নামক তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৩৪টী শ্লোক আছে। ইহাতে প্রেত নির্হণ, শোকাপনোদন, নির্হর্তৃ কর্ত্তব্য আপধর্ম্ম, বানপ্রস্থ, যতি, জীবোৎপত্তি, দেহ বর্ত্তিস্বনাদিসংখ্যা, দেহবর্ত্তিরসাদিমান, আত্মতত্ত্ব আত্মনোজগদুৎপত্তি, আত্মনোস্ত্যাদিযোনিপ্রাপ্তি, যোগপ্রবৃত্ত্যুপায়, অকালমৃত্যু, অর্চ্চিরাদ্যয়নকথন, যোগাভ্যাস বিধি, যোগ সিদ্ধি লক্ষণ, ভুক্তাবশিষ্টপাতকৈর্জন্ম বিশেষ, নরকনামানি, মহাপাতক নিরূপণ, উপপাতক, ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত, গোবধাদি প্রায়শ্চিত্ত, প্রকীর্ণক প্রায়শ্চিত্ত, পতিতত্যাগ বিধি, স্ত্রীনাং বিশেষ পতনীয়ানি, গোগ্রাস, রহঃস্কৃত পাপ প্রায়শ্চিত্ত, যমনিয়মা, সন্তাপনাদিকৃচ্ছ্রলক্ষণানি, এতচ্ছাস্ত্রাভ্যাস ফল প্রভৃতি ৩৩টী প্রকরণ আছে। পরমহংস পরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর এই ধর্ম্মশাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহাই মিতাক্ষরা নামে প্রসিদ্ধ। অস্মদ্দেশীয় উকীলগণ এই মিতাক্ষরাগ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আদালতে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহারা মূল গ্রন্থের অনুসন্ধান ও করেন না। একি আমাদের দেশের উন্নতি, না অবনতি।

আমরা গৌরবের সহিত উল্লেখ করিতে পারি যে, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী মিথিলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংহিতার আরম্ভেই লিখিত হইয়াছে।

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনয়োব্রুবন্।

বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রুহি ধর্ম্মানশেষতঃ ॥
মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্র ক্ষণং ধ্যাত্বা ব্রবীন্মুনীন্।
যস্মিন্ দেশে মৃগঃকৃষ্ণ স্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত॥

অর্থাৎ, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকে বন্দনা করিয়া মুনিগণ বলিলেন, বর্ণাশ্রম ভেদে ইতর বর্ণের ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন। মিথিলা নিবাসী সেই যোগীন্দ্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মুনিগণকে বলিলেন, যেদেশে কৃষ্ণসার (মৃগ) বিচরণ করে, সেই দেশের ধর্ম্ম শ্রবণ কর।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা বলিয়া পরিচিত, তাহা নহে, তিনি প্রকৃত পক্ষেই যোগীশ্বর ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার জন্য এক্ষণ আমরা সংহিতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

বৈশম্পায়ন ঋষির নিকট যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি তাঁহার দ্বাদশজন শিষ্য যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার মহীধর বলেন, কোন কারণ বশত বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য গুরু বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া, যোগ বলে তাহা উদ্গীরণ করিলেন। তখন বৈশম্পায়ন অন্যান্য শিষ্যগণকে বলিলেন "তোমরা তৈত্তিরীয় পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সেই পরিত্যক্ত বেদ গ্রহণ কর।" শিষ্যগণ তাহা করিল। যাজ্ঞবল্ক্যের পরিত্যক্ত বেদ মলিন হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহা "কৃষ্ণ যজু"নামে খ্যাত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় দ্বারা গৃহীত বলিয়া বেদের সেই অংশ তৈত্তিরীয় সংহিতা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

তদনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য ভগবান ভাস্করের আরাধনা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন "তুমি বেদ রচনা কর, তাহা শুক্ল যজু নামে খ্যাত হইয়া জনসমাজে সমধিক আদৃত হইবে।" সূর্য্য হইতে বর লাভ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যে বেদ রচনা করেন, তাহাই শুক্লযজু নামে অভিহিত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বরচিত বেদ, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি তাঁহার পঞ্চদশজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই শিষ্যবর্গ হইতে শুক্ল যজু সহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুর্ব্বেদ রচনা করেন।

একদা বিদেহপতি জনক এক বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বেদবিদ ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, সমাগত বিপ্রমণ্ডলীকে দর্শন করিয়া জনক চিন্তা করিলেন, ইহাদের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কে? কিরূপে ইহার মীমাংসা করি। অনেক চিন্তার পর বিদেহরাজ একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। যজ্ঞস্থানের চতুর্দ্দিকস্থ তোরণস্তম্ভে এক সহস্র গো বন্ধন করিয়া সেই সকলের শৃঙ্গ আড়াই পোয়া স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণগণ! যিনি আপনাদিগের মধ্যে ব্রহ্মপরায়ণ, এই গো সকল তিনি দক্ষিণা স্বরূপগ্রহণ করুন," রাজার বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণগণ সকলেই নীরব হইয়া রহিলেন, তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী শিষ্য সোমশ্রবাকে বলিলেন, "হে সোমশ্রবা! এই সকল গো মুক্ত করিয়া লইয়া যাও।" সোমশ্রবা গুরুর আদেশানুসারে গো সকল লইয়া গমন করিল।

তদ্দর্শনে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে অধীর হইলেন। জনকের হোতা অশ্বল ঋষি ক্রোধকম্পিতস্বরে তখন বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমিই কি আমাদিগের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মপরায়ণ।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, আমি ব্রহ্মিষ্ঠ নহি। ব্রহ্মিষ্ঠগণকে আমি নমস্কার করি। দক্ষিণার জন্যই যজ্ঞে আসিয়াছি, দক্ষিণা স্বরূপ গোগুলি গ্রহণ করিয়াছি।" তখন অশ্বল ঋষি বলিলেন, "চতুরতার প্রয়োজন নাই, আমাদের সহিত এক্ষণ বিচারে প্রবৃত্ত হও।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন কর।'

অশ্বল বলিলেন, "মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইলে কোন যজমান রক্ষা পাইবে?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "যিনি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা ফল সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই সৎকর্ম্ম-ফলভোগী যজমানই তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন।"

আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য! বল দেখি, এই শরীরাকাশে কতটীগ্রহ ও অতিগ্রহ আছে।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "মানব শরীরে অষ্টগ্রহ ও অতিগ্রহ বর্ত্তমান আছে।"

আর্ত্তভাগ বলিলেন, সেই সকলের গুণ ও নাম উল্লেখ কর, এবং তাহারা কিরূপ নিয়তির অধীন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, তাহা বল।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, প্রাণগ্রহ, অপান (বায়ু) অতিগ্রহ, প্রাণ বায়ু অপানের সাহায্যে গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। বাক্যগ্রহ, নাম অতিগ্রহ, নামের সাহায্যে বাক্য, বাক্য উচ্চারণ করে। জিহ্বা গ্রহ, রসন, অতিগ্রহ, জিহ্বা রসের সাহায্যে আস্বাদন করে। চক্ষুগ্রহ, রূপ অতিগ্রহ, চক্ষু রূপের সাহায্যে দর্শন করিয়া থাকে। কর্ণগ্রহ, শব্দ অতিগ্রহ, কর্ণ শব্দের সাহায্যে শ্রবণ করিয়া থাকে। মনগ্রহ, কামনা অতিগ্রহ, মন কামনার সাহায্যে মনন করিয়া থাকে। হস্তগ্রহ, কর্ম্ম অতিগ্রহ, হস্ত কর্ম্মের সাহায্যে কার্য্য করে। ত্বকগ্রহ, স্পর্শ অতিগ্রহ স্পর্শের সাহায্যে ত্বক স্পর্শ অনুভব করে। ইত্যাদি।

কুশিত নন্দন কোহলক ঋষি বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ আত্মা অন্তর্য্যামী? সাক্ষাৎ আত্মা কি পরোক্ষ আত্মা? অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনটী অন্তর্য্যামী আত্মা। এবং তাহাকে কি প্রকারেই বা জানা যায়।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণার বশীভূত নহেন, শোক, মোহ, জরামৃত্যু যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই অন্তর্য্যামী, যিনি বায়ুতে বায়ুর প্রাণ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, বায়ু যাহার শরীর, অথচ সেই বায়ুও যাঁহাকে জানিতে পারে না, তিনিই অন্তর্য্যামী। যিনি সূর্য্যের প্রাণরূপে সূর্য্যেতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অথচ সূর্য্য যাহাকে জানে না, সূর্য্যই যাঁহার শরীর তিনিই অন্তর্য্যামী। আকাশে বর্ত্তমান থাকিয়া যিনি আকাশের প্রাণ রূপ হইয়াছেন, আকাশই যাঁহার শরীর, অথচ আকাশ যাঁহাকে জানে না, তিনিই অন্তর্য্যামী। ইত্যাদি।

অতঃপর ঋষি তনয়া গার্গী সমবেত সভ্যগণকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণগণ! আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, যদি তিনি তাহার উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে কোন ব্রহ্মবাদীই তাঁহাকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইবেন না।"

ধন্য প্রাচীন আর্য্য সমাজ, যে সমাজে

পুত্র কন্যাকে সমভাবে বিদ্যাশিক্ষা দানে কোন রূপ প্রতিবন্ধক ছিল না। কোন মূঢ় সেই সমাজের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারে? আমরা কি সেই আর্য্য সন্তান, এ সমাজ কি সেই সমাজ? এ যে তাহার বিকৃত ও ঘৃণিত ছায়া মাত্র। যাহারা বর্ত্তমান সময়ের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি কটাক্ষ করিয়া গ্রন্থ রচনা ও অভিনয় দ্বারা বাহবা লইবার জন্য লালায়িত, তাহারা কি সেই আর্য্যকুলের কুলাঙ্গার নহে? হায়! এ হতভাগা জাতি কবে প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান বিকৃত সমাজ সংশোধন করিতে সক্ষম হইবে। কবে আমরা বঙ্গের সর্ব্বনাশকারী অপদেবতাদিগের পরিবর্ত্তে মন্বত্রি, বিষ্ণুহারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণকে বঙ্গের সিংহাসনে দেখিতে পাইব। কবে শনির পরিবর্ত্তে বৃহস্পতি বঙ্গের সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন। কবে রামদাস, শ্যামদাস, ব্রজবিলাস ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে, বঙ্গবাসী ভগবান পরাশরকে পূজা করিবে!

ব্রাহ্মণগণ গার্গীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহর্ষে বলিলেন "গার্গি! তোমার প্রশ্ন উপস্থিত কর।" তখন গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যেমন বিদেহ ও কাশীদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ধনুতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া যুগপৎ দুইটী শর যোজনা করিয়া শত্রুর প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমিও জিহ্বাগে দুইটী প্রশ্ন করিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি, তুমি আমার বাণরূপ প্রশ্নদ্বয় ধারণ ও তাহার উত্তর প্রদান করিতে অগ্রসর হও। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। গার্গী বলিলেন এই যে ঊর্দ্ধে দৃশ্যমান্ আকাশ ও এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর অন্তরা প্রভৃতি স্থান সকল কোন্ পদার্থ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। পৃথিবী ও আকাশের সংযোগ, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও অতীত কালই বা কোন্ পদার্থ দ্বারা ওতঃপ্রোতভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "এই সকল স্থান ও কাল একমাত্র মহাকাশ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।"

গার্গী বলিলেন হে যোগীশ্বর! আমি আপনার যুক্তিগর্ভ উত্তরে অনুগৃহীতা হইলাম। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, জিজ্ঞাসা কর।

গার্গী বলিলেন, আপনি বলিয়াছেন, পৃথিবীর অধ, উর্দ্ধ ও উভয়ের সংযোগ স্থান এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান মহাকাশ দ্বারা পরিপূর্ণ। ভাল, এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই মহাকাশ কাহার দ্বারা পূর্ণ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "এসমস্তই অক্ষয় পুরুষ দ্বারা পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, সেই অক্ষয় পুরুষ স্থূল বা অনু নহেন, তিনি জড় পদার্থের ন্যায় সঙ্কীর্ণ কিম্বা বিস্তৃত নহেন, তিনি বর্ণ ও ইন্দ্রিয়াদি বর্জ্জিত, তাঁহার প্রাণ নাই, তাঁহার মুখ নাই, তিনি কিছু আহার করেন না। তাঁহাকেও কেহ কিছু করিতে পারে না। হে গার্গি, সেই অক্ষয় পুরুষের শাসনে চন্দ্রসূর্য্য নিয়মিত হইতেছে, তাঁহারই শাসনে পৃথিবী স্থির ভাবে থাকিয়া লোক সকলকে ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছে, পশ্চিম বাহিনী নদী সকল প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিয়াছে। যিনি সেই অক্ষয় পুরুষকে না জানিয়া হোম, যজ্ঞ অথবা বহুবর্ষব্যাপী তপস্যা করেন, তাঁহার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায়

নিষ্ফল হইয়া যায়। যে ব্যক্তি সেই অক্ষয় পুরুষকে অবগত হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করেন সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাঁহাকে জানিতে অভিলাষ করেন, তিনি স্বতই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হন। হে গার্গি! তাঁহার দ্বারাই এই মহাকাশ ওতঃ-প্রোত ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।”

তখন গার্গী ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আর বিচারের প্রয়োজন নাই, কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত কর। শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনী ও তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহা হইতে বিরত থাকিয়া কেবল আর একটী বিষয় অর্থাৎ মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

তথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী কাত্যায়নী চ তয়োর্হি মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রী প্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ও কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা অর্থাৎ স্ত্রীজনোচিত গৃহকার্য্যে নিপুণা। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া জ্যেষ্ঠাপত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে মৈত্রেয়ি! আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিব। যদি তোমার বাসনা হয়, তবে কাত্যায়নীর সহিত ধনের বিভাগ করিয়া তোমাকে পৃথক করিয়া দি।”

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! যদি ধনপূর্ণ সমুদয় পৃথিবী আমার হয়, তবে ধনসাধ্য ক্রিয়া দ্বারা আমি নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে পারিব কি না?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “না, ধনের দ্বারা তাহা হয় না, অন্যান্য বিষয়ভোগী ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে, তোমার জীবনও সেইরূপই হইবেক, ধনদ্বারা মোক্ষের আশা মাত্র নাই।”

তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, “ভগবন্! যে ধনের দ্বারা আমার মুক্তির আশা নাই, সেই ধনে আমার প্রয়োজন কি? মহাশয়, যাহাকে মুক্তির সাধন বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।”

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! তুমি স্বভাবতই আমার প্রিয়, এইক্ষণে এই প্রিয় বাক্য বলিয়া আরও অধিক প্রিয়তমা হইলে। তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রত্যক্ষ দেখ, পত্নী হইতে শুশ্রূষা, গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অধিকার ইত্যাদি জন্য পতি পত্নীর প্রিয় হন না। উত্তম বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিব, আপন অভিলাষানুসারে সুখে থাকিব, এই অভিলাষেই পতি পত্নীর প্রিয় হন, ইহার অন্যথা হইলে আর সে ভাব থাকে না। সেইরূপ আপন উপকার ও সুখাভিলাষেই পত্নী ও পতির প্রিয় হইয়া থাকে, পত্নী পতির সুখাভিলাষের বিপরীত হইলে, আর প্রিয় থাকে না, বরং ত্যাজ্যা অথবা বধ্যা হইয়া থাকে।

তৎপর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক সকল, দেবতা, বেদ, যজ্ঞ, বস্তু প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিতেছেন।

ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ম্ভবতি।

ন বা অরে ব্রাহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি।

ন বা ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি।

ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে যজ্ঞানাং কামায় যজ্ঞাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় যজ্ঞাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য ইহাই প্রতীত হয় যে, আত্মাই যথার্থ প্রিয়, আত্মা অপেক্ষা কেহ প্রিয় নাই, অন্য সকলই আত্মার অভিলাষ অনুসারে প্রিয় হইয়া থাকে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ব্বার বলিতেছেন, হে মৈত্রেয়ি! পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করা কর্ত্তব্য, তাহার উপায় প্রথমত বেদ শ্রবণ, তৎপর যুক্তির দ্বারা বেদার্থের মনন, তাহার পর নিদিধ্যাসন, এই সকল উপায়ে যিনি পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ করেন, তিনিই সর্ব্ববিদ হইয়া থাকেন।

শুক্লযজুর্ব্বেদ ও সংহিতা প্রণেতা যাজ্ঞবল্ক্য প্রকৃত যোগীশ্বর। আমরা সংহিতা সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না। সকলেই এই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করেন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র গুলি আমাদের অমূল্য পৈত্রিক সম্পত্তি। সুসভ্য ইয়োরোপবাসিগণ গ্রীশ, রোমের যতই গৌরব করুন না কেন, কোন দেশেই এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত হয় নাই। অনেক দেশেই আইন (Law) ছিল, কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণ ব্যতীত অন্য কেহই বিধিকে ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিতে সক্ষম হয় নাই।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

স্বার্থ, স্বত্ব ও প্রেম।

যে ব্যক্তি পরের শুভাশুভ, সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া, কেবল নিজেরই সুখ ও নিজেরই কল্যাণ কামনায় জীবন ধারণ করে ও তদ্বিষয়েই লক্ষ্য রাখিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাকেই "স্বার্থপর" এই নিন্দার্হ উপাধি দান করা হয়। অদ্য উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে স্বার্থপর মানবের যেরূপ নিন্দা, সেরূপ আর অধিক দেখা যায় না। দশ জন একত্র সমবেত হইলে, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্রে আপনার সুখ ও সুবিধা অন্বেষণ করে, সে ঘৃণিত। অধীনস্থ পরিজন বর্গের মঙ্গলের দিকে কল্পনা রাখিয়া, যে গৃহস্বামী অহোরাত্র কেবল নিজের ইন্দ্রিয় সুখের জন্যই ব্যাকুল, সভ্য জগৎ তাহাকে বড় নিন্দা করে। তদ্রূপ যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন, সেখানে কেহ অপরের প্রতি উপেক্ষা করিয়া নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় চিন্তনে ব্যস্ত, সেখানেই তিনি ভদ্র লোকদিগের ঘৃণা ও নিন্দার ভাজন হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি?

স্বার্থপরতা যে এত ঘৃণিত, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উহা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। মানব যে সকল গুণে ইতর প্রাণী-

গণের অপেক্ষা উন্নত জীব বলিয়া গণ্য, সামাজিকতা উহাদের মধ্যে একটী প্রধান। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে, মানুষ একা একা অরণ্যে অরণ্যে প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না। একত্র থাকিতে হইলে কাজে কাজেই কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য হইয়া বাস করা আবশ্যক হয়। সকল বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিবার বাসনা না থাকিলে, কখনও মানবমণ্ডলী গঠিত হইতে পারে না। যাহার যাহা ভাল লাগিবে, সে তাহাই করিবে—এই স্বেচ্ছাচারগত নিয়ম, পাশবাচার বৈ আর কি? সভ্য অবস্থায়, অর্থাৎ সমাজ বদ্ধ অবস্থায় মানব কখনও তাহা সহ্য করিতে পারে না। অসভ্য, বন্য, পাশব অবস্থা হইতে মনুষ্য যতই ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে থাকে, ততই এই সত্যটী সুস্পষ্টরূপে তাহার চক্ষে পতিত হয় যে, নিজের ইচ্ছাকে অনেক স্থলে অপরের শুভাশুভের দ্বারা নিয়মিত করা আবশ্যক। কারণ, সে তখন দেখে যে, সকলেই স্ব স্ব সুখান্বেষণ করিলে সমাজ চলে না। তদ্দ্বারা প্রত্যেকেরই সুখ-হানি হইয়া উঠে। সুতরাং এই সময় হইতেই সে প্রথমে নিজে নিজের ইচ্ছাকে দমন করিতে শিক্ষা করে। অপরের মঙ্গলের জন্য নিজের সুখ-বাসনা দলিত করাই সভ্য ও সমাজবদ্ধ মানবের স্বাভাবিক ও অত্যাবশ্যকীয় গুণ। এই স্বভাব ধর্ম্মের বিরুদ্ধভাবাক্রান্ত বলিয়াই, স্বার্থ সভ্য মানবের কাছে এত ঘৃণিত কথা। "স্বার্থপর" গালাগালি তাই আজ কাল আমাদের মধ্যে এত বর্জ্জনীয়।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, সভ্য সমাজ কি তবে স্বার্থহীন হইয়া চলিতেছে? বর্ত্তমান সময়ে সভ্য মানবগণ কি আপনাদের সুখ ও মঙ্গল চাহেন না? এখন কি মানুষেরা পরস্পরকে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া সমাজ-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতেছে? কে বলিবে "করিতেছে?" কে সত্যের অবমাননা না করিয়া, আজ বলিতে পারে যে, স্বার্থপরতা, নিন্দা ও ঘৃণার কথা হইলেও, মানুষ এই ঘৃণার্হ দোষটী একেবারে বর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে? কখনই বলা যায় না। জনসমাজে যদি স্বার্থ নাই, তবে কেন আজ ভারতবাসী স্বীয় মাতৃ ভূমিতে ক্রীতদাস হইয়া দারুণ ক্লেশে দিন যাপন করিতেছে? কেন আজি তবে স্বাধীন ব্রহ্মদেশ ইংলণ্ডের করাল কবলগ্রস্ত হইল? মানবের হৃদয়ে স্বার্থের শাসন যদি বিলুপ্ত হইয়াছে, তবে কেন জন সমাজ, একজন ধনীর ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য, সহস্র সহস্র দরিদ্রের অনাহার-ক্লিষ্ট, মলিন দেহ প্রাণ অকাতরে উৎসর্গ করিতেছে? কেন আজ ধনীর উৎপীড়নে, দরিদ্রের হাহাকারে বায়ু কম্পিত? পুরুষের কঠোর শাসনে রমণীর অশ্রুপ্রবাহে ধরণী প্লাবিত? প্রবলের তাড়নে দুর্ব্বলের প্রাণ ভয়বিহ্বল হইয়া, তবে কেন আজ বিধাতার কাছে কাতরে আত্ম নিবেদন করিতেছে? শত শত বিড়ম্বনায়, সহস্র সহস্র জঘন্য পাপে সমাজ বক্ষ কেন আজিও ছিন্ন ভিন্ন? যদি নিন্দনীয় স্বার্থপরতা মানব হৃদয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিত, তাহা হইলে কি আর এই সমস্ত দারুণ ক্লেশকর ব্যাপারে আমাদের চক্ষু নিয়ত ব্যথিত হইত?

কত শত সমাজ সংস্কারক এই সমস্ত সামাজিক ব্যাধি অপনোদনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন, যথাসর্ব্বস্ব, সুখসম্পদ, ধনমান, বিদ্যা বুদ্ধি, আত্মীয় স্বজন, এমন কি প্রিয়-

তম প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া, সমাজ সংস্কার সাগরে ঝাঁপ দিয়া ইহজীবন কাটাইয়া গেলেন;—তথাপি সমাজ যাহা তাহাই রহিয়া গেল। তাঁহারা বাহিরের দু একটা ভগ্নশাখা ছিন্ন করিলেন মাত্র। বাহিরের দু চারিটী কুরীতি, কুসংস্কার দূর করিতেই হয়ত তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা পর্য্যবসিত হইল, সমগ্র মানব সমাজরূপ বিশাল তরুবরের রস ও মর্জ্জা শোষণকারী এই স্বার্থরূপ কণ্টকময় আগাছার কিছুই করিতে পারিলেন না। উহা সমাজকে একই ভাবে শ্রীভ্রষ্ট ও কদর্য্য করিয়া ফেলিতে লাগিল। বস্তুত এই স্বার্থের শাসন হইতে সমাজকে উদ্ধার করাই সকল সংস্কারকের একমাত্র লক্ষ্য চিরকাল হইয়া আসিতেছে। অথচ আজিও ইঁহারা কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই।

সর্ব্বপ্রকার সংস্কার কার্য্যেই প্রতিবন্ধক, এই স্বার্থপরতা। যে দিকে যাও, উন্নতি লাভ করিতে গেলে,নীচতা ছাড়িতে হইবেই হইবে। এই নীচতাটুকু ছাড়িয়া উঠিতে গেলেই স্বার্থ মানুষের হাত ধরিয়া টানে, ও জ্ঞান,বা ধর্ম্মবলে অধিকতর বলীয়ান্ না হইলে, অবশেষে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া তবে ছাড়ে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যে ঘোর শোচনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এবং ইহার সংস্কারের জন্ত যে জনসাধারণের সুশিক্ষা আবশুক, তাহাই বা কে না অবগত আছে? তথাপি বলুন দেখি, কয় জন লোক আপনাদের সুখ ও সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া এক প্রাণে এই মহাব্রতে ব্রতী হইতে প্রস্তুত? সেও ত অনেক দূরের কথা:— যদিও কোন লোক যথার্থ সরল প্রাণে, এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তথাপি কয়জন লোক নিজ নিজ উপার্জ্জিত বা উত্তরাধিকৃত অর্থরাশির শতাংশের একাংশ দিয়া এই শুভ কর্ম্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হন? সরল প্রাণে যে সকল যুবাপুরুষ পঠ্যাবস্থায় মহা উৎসাহপূর্ণ আস্ফালন ও বক্তৃতায় বিদ্যালয় গৃহ কম্পিত করিতেন, আজ তাঁহাদের কাহাকেও নিভৃতে লইয়া গিয়া, যদি জিজ্ঞাসা করি, "ভাই! তোমার সেই সমস্ত উন্নতির পরামর্শ এখন কে ভুলাইয়া দিল?"—তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দিবেন?—"স্ত্রী পুত্র, বৃদ্ধ পিতা মাতা, আর নিজের ও সুখ সুবিধা দেখিতে হয়; কাজেই আর সে সব যৌবন সুলভ উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত ও বন্ধুদিগের প্রশংসা লাভের প্রবল ইচ্ছাসম্ভূত বিষয়ে এখন আর মন প্রাণ তৃপ্ত হয় না। যা হবার তাই হবে, মাঝখান থেকে কেন বোকার মত আমি তুমি নিজের সুখটা নষ্ট করি।" এইরূপ কোন উত্তর নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। সহজ সরল কথায় বলিতে গেলে—স্বার্থই ইঁহার সেই সমস্ত উন্নত ও মহান্ ভাবের পথে অন্তরায়। এক সময়ে পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তখন এ সব ভাল ভাল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কামনা মনে হইত। আজ স্বার্থের মোহিনী শক্তিতে তাঁহার প্রাণ মুগ্ধ, ক্ষুধা তৃষ্ণার সময়ে নিজ গৃহের আদরের অন্ন জলের কথা মনে পড়িয়া, পর্য্যটকের পথক্লেশ তাঁহার চক্ষে ভীষণ প্রতীয়মান হইতেছে। যদি রোগ হয়, কে তখন পার্শ্বে বসিয়া প্রিয়তমা পত্নীর মত সেবা করিবে, এই চিন্তায় যাহার হৃদয় আকুল, সে কি কখন দেশ হিত ব্রতে ব্রতী

হইতে পারে? নিজের সুখ স্বচ্ছন্দে আহার বিহারই যাহার চিন্তার একমাত্র বিষয়, সে কিরূপে বুঝিবে যে, স্বার্থত্যাগেই পরম সুখ? তাই আজ শত সহস্র তেজস্বিনী বক্তৃতাও স্বার্থ মোহ-নিদ্রিত ভারত সন্তানদিগকে জাগরিত করিতে পারিতেছে না। উপদেশ শুনিয়া বা দিয়া কেহ কখনও দেশহিতৈষী হয় নাই, স্বার্থপরতাকে প্রাণ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে,শত শত বক্তৃতা ও উপদেশের মূল্য এক কপর্দ্দকও নহে।

সত্য কথা—মনুষ্যসমাজ আজিও স্বার্থপরতাশূন্য হইতে পারে নাই। তাই সমাজের এত দুর্গতি। তবে, এই টুকু হইয়াছে, স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির গুণে এই টুকু শুভলক্ষণ দেখা দিয়াছে যে, মানব এখন ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, দশ জন ভদ্র লোক একত্র হইলে, যদি তন্মধ্যে কেহ নিজের সুবিধা অগ্রে চায়, তবে নিশ্চয়ই সে নিন্দিত হইবে। ব্যক্তিগত চরিত্রে স্বার্থ নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে,ইহা একটী পরম শুভলক্ষণ, এজন্য অবশ্যই মানবজাতির প্রশংসা ও গৌরব করা যায়। কিন্তু তাহাতেই নিশ্চিন্ত থাকা কোনক্রমে বিধেয় নহে। এখনও সামাজিক বা জাতিগত জীবনে মানুষ যথেষ্ট স্বার্থপর আছে, দেখা যায়। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহ, মনান্তর ও বিরোধ কি লইয়া হয়? অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, সে সমুদায়েরই মূলে সামাজিক বা জাতিগত স্বার্থ বর্ত্তমান। একই সমাজে আবার, প্লীবিয়ান্ প্যেট্রিশীয়ান্দের ন্যায় লর্ডস্ ও কমন্স্, ধনী দরিদ্র,ব্রাহ্মণ শূদ্র,সবল দুর্ব্বল প্রভৃতির কতই পার্থক্য! বিশেষত পুরুষ ও রমণীর মধ্যে সুখ ও সুবিধা বিষয়ে আজিও কি ভয়ানক বৈষম্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে মানব সমাজকে ঘোর পক্ষপাতী ও স্বার্থপর দানবদল বলিয়া ভ্রম হয়।

স্বার্থ যদি মানবের স্বভাব ধর্ম্মের বিরোধী, তবে আজিও, এই সভ্যতাভিমানী ও জ্ঞানস্পর্দ্ধান্বিত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও উহার এত প্রাধান্য কেন? এই কঠিন সমস্যার মীমাংসা করা আবশ্যক। এক দলের লোক আছেন, তাঁহাদের মতে স্বার্থ মানব মাত্রের জীবনে নিন্দার্হ হইলেও, সমাজে নিন্দা বা লজ্জার বিষয় নহে। তাঁহারা গৌরবের সহিত বলেন, ঘরের মধ্যে আমরা পরস্পর সাহায্য করিব, এক জন আর এক জনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিব, কিন্তু জাতীয় গৌরব রক্ষা বা জাতীয় সম্মান ও তেজ পরিবর্দ্ধনের জন্য যদি অপর জাতির সর্ব্বনাশ করিতে হয়, তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া, কখনও কাপুরুষতা দেখাইব না। তোমার অঙ্গাবরণের অভাব হইলে, আমার বৃহৎ কোট অম্লানবদনে খুলিয়া তোমাকে দিব, কিন্তু পার্শ্বস্থ ব্রহ্মদেশ দুর্ব্বল জানিতে পারিলেই, সামান্য কারণে বা অকারণেই কোন নিরর্থক সূত্র অবলম্বনে, তাহার সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। একজন দস্যুকে ধরিতে পারিলে, তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান করিয়া তাহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু দস্যুরাজাগ্রগণ্য আলেক্জাণ্ডারকে "দিগ্রেট" উপাধিদ্বারা ভূষিত করিয়া, ইতিহাসের বরণীয় করিয়া তুলিব। এক জাতি স্বার্থসাধনোদ্দেশে অপর জাতির সর্ব্বস্বাপহরণ

করিতে হয় করুক, সে ন্যায্য, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষ অপর কাহারও অনিষ্ট করিয়া সুখী হইলে অপরাধী। তাঁহাদের মতে এক প্রজা অপর প্রজার একটী কদলী বৃক্ষ অধিকার করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হউক, কিন্তু জমীদার মহাশয় তাহার মত শত শত প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আপনার অশ্বশালা ও হস্তিশালার ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেও উহা ন্যায় সঙ্গত। এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন যে, ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনে কোন সম্বন্ধ নাই, একটী অপরটীর উপর একটুও নির্ভর করে না। ইহার মত ভ্রান্ত মত আর কি হইতে পারে? বাড়ীটী পাকা হওয়া চাই, অথচ এক এক খানি ইষ্টক পাকা হউক না হউক, এ কথা বলা যেমন অসঙ্গত, উপরোক্ত মতও তেমনি। তাঁহারা সমাজকে মন্দ করিয়া, ব্যক্তিকে ভাল রাখিতে চান;—জানেন না যে, এরূপ করা অসম্ভব। ব্যক্তি মাত্রে মন্দ হইলে সমাজ যেমন মন্দ না হইয়া, থাকিতে পারে না, ব্যক্তিগণ সেইরূপ ভাল থাকিলে, সমাজ ও কখন স্বার্থপর হইতে পারে না। কেন না, সমাজ ব্যক্তি সমূহের সমষ্টি বৈত নয়? সুতরাং ঐ শ্রেণীর লোকদিগের মত যে ভ্রান্ত তাহাতে আর সংশয় নাই। তথাপি ইহা নিশ্চয়ই সত্য কথা যে, ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থপরতা নিন্দনীয় হইলেও জাতীয় জীবনে তাহার নিন্দনীয়তা তাদৃশ স্পষ্ট অনুভূত হয় না।

ইহার কারণ তবে কি? একটু ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহার মধ্যে শুভলক্ষণই দেখা যাইতেছে। এক সময়ে মানুষ ঘোর স্বার্থপর ছিল, মনুষ্যসমাজও তখন ভয়ানক স্বার্থপর ছিল। ভিন্নদলের লোককে বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করাই তদানীন্তন সামাজিক নীতি ছিল। আজিও আফ্রিকা মহাদেশের তিমিরাচ্ছন্ন অসভ্য জাতিদের মধ্যে এ বীভৎস প্রথা বিরল নহে। সেই ঘোর অন্ধকারময় স্বার্থের গহ্বর হইতে, মানুষ যে এতাদৃশ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা কি কম আনন্দের বিষয়? আমাদের পূজনীয় আর্য্যজাতির মধ্যেও সেকালে স্বার্থপরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সকল এখন নাই। তদ্ভিন্ন শ্রমবিভাগ, বিনিময় প্রভৃতি কত সুপ্রথা এখন প্রচলিত হইয়াছে। তাহাদের দ্বারা কি সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে, প্রাথমিক অবস্থা অপেক্ষা বর্ত্তমান কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যে "স্বার্থ" শব্দটী ক্রমশ নিন্দার্হ হইয়া পড়িয়াছে, এবং পরস্পরকে জীবন ধারণে ও সুখবর্দ্ধনে সহায়তা করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অধিকার বলিয়া পরিচিত হইয়াছে? ইহা নিতান্তই সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই। যাহারা জগতে কেবল দুঃখের জিনিষ ও শোকের কারণ দেখিয়া নিয়ত অন্ধকার গৃহে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নাই। যাঁহারা অতীতের অপরিজ্ঞাত তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে কল্পিত সত্যযুগ দর্শন করিয়া ক্ষোভ করেন যে, কেন তাঁহারা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের মতের সহিতও আমাদের কোন সহানুভূতি নাই। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, মানবজাতিকে, কে যেন হাতে ধরিয়া তুলিতেছে। তথাপি কেন ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সামাজিক ব্যাধি দূর হয় না? ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থপরতা দূষণীয় হইলেও সামা-

জিক দোষ ধরা হয়না কেন? তাহার উত্তর এই যে, অগ্রে ব্যক্তি, পরে ক্রমশ সমাজ। আগে ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কার আরম্ভ হয়। পরে ঐ উন্নতি ক্রমে সংক্রামিত হইয়া সমাজের গঠন পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। এই কারণেই অনেক স্থলে দেখা যায় যে, সমাজ আজিও যে মত গ্রহণ করে নাই, ব্যক্তিগণের মধ্যে হয়ত অনেকেই সেই মত অবলম্বন করিয়া জীবন গঠনে নিযুক্ত হইয়াছেন। অবশেষে তাঁহাদের দলপুষ্টি হইলে পর সমাজ সংস্কার আরম্ভ হয়।

সুতরাং মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ভীত হইবার কোন কারণ নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, নিজ নিজ জীবনকে স্বার্থের গ্রাস হইতে মুক্ত রাখেন। তাহা-হইলে সমাজ আপনিই ক্রমশ কালে স্বার্থ-পরতাশূন্য হইয়া, কাজেকাজেই নিজেও নিঃ-স্বার্থ হইবে।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন একদিকে স্বার্থের লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তেমনি কিন্তু অপর দিকে দেখিতে পাই, আর একটী কথার সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। সেটী যদিও "স্বার্থ" কথাটীর মত নিন্দিত নয়, যদি ও উহা এ পর্য্যন্ত জনসাধারণের আদর ও আশ্রয় লাভ করিয়া আসিতেছে,—তথাপি যে সমস্ত নিয়মের বলে প্রাচীনতম রাজা (স্বার্থ) আজ রাজ্যচ্যুত হইতেছেন, আমরা দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি যে,সেই অখণ্ড ক্রমোন্নতির নিয়মেই এই অভিনব প্রভুও মানবহৃদয়ের অধিকারচ্যুত হইবেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ করিনা। ইহার নাম "স্বত্ব" (Right)। ইহা নামে স্বতন্ত্র হইলেও বস্তুত স্বার্থেরই সুসভ্য নামান্তর মাত্র। তবে একটু প্রভেদ এই যে, ইহার সিংহাসন নীতির ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। নীতির উপর স্থাপিত যে স্বার্থ, তাহারই নাম "স্বত্ব"। এই স্বত্ব কথাটী স্বার্থের উপর যত জয়লাভ করিতেছে, ততই পৃথিবী হইতে অত্যাচার ও উৎপীড়ন দূর হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। স্বার্থ এখন কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতির সভাগৃহে আদর পাইতেছে, কিন্তু সমাজের নিম্নের স্তর সমূহে বর্ত্তমান সময়ে স্বত্বের অধিকার ক্রমশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলি-য়াছে। স্বাধীনতার ভাব চারি দিকে যতই বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ততই স্বার্থের মস্তকোপরি পদাঘাত করিয়া হাউয়ার্ড, রোমিলী, হ্যামডেন্ ও ওয়াসিংটন্ আবির্ভূত হইয়া স্বত্বের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দুর্ব্বলকে বল দিতেছেন, ভীরুকে সাহসী করিতেছেন, এবং উৎপীড়িতকে আশ্বস্ত ও অত্যাচারিকে সান্ত্বনা করিতে-ছেন। মানবের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব যতই প্রকাশিত হইতেছে, ততই দিন দিন নব নব উৎসাহে মাতিয়া জগৎবাসীগণ স্বার্থের প্রাচীন বন্ধনরজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। এমন কি, ক্রমশ রমনীগণও তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার লাভে দণ্ডায়মানা হইয়া, "স্বত্ব স্বত্ব" বলিয়া ঘোর কোলাহল উত্থিত করিতেছেন। কেহই আর নিদ্রিত নাই। স্বার্থের মোহ, স্বাধীনভাবের পদাঘাতে দূর হইয়াছে, এখন তাই চারিদিকে কেবল "স্বত্ব" ও অধিকার লাভের ঘোর কোলাহল-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। ইতিমধ্যেই সমাজের দ্বারে পর্য্যন্ত গিয়া আঘাত পঁহুছিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের বিভীষিকাময় লোমহর্ষণ ব্যাপারে জাতি ও সমাজ সমূহেরও চেতনা

হইয়াছে। একটু একটু করিয়া তাহারাও ভয়ে ভয়ে স্বার্থের পরিবর্ত্তে "স্বত্ব" নাম গ্রহণ করিয়া চলিতেছে। ফলত, উহা কার্য্যে সে পরিমাণে পরিমিত হয় নাই। তথাপি, নামটীও যে একটু শুভচিহ্ন, তাহার সন্দেহ কি?

আমরা দেখিলাম যে, এক্ষণে স্বার্থ নামের পরিবর্ত্তে "স্বত্ব" এই নামটীই অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এ উভয়ই যে কার্য্যত প্রায় অভিন্নাত্মক তাহা প্রমাণ করিতেই হইবে না। "স্বত্ব" এই নৈতিক নাম গৃহীত হইয়া অবধি, কয়টী কার্য্য বাস্তবিক নৈতিক সুনিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে? নিতান্তই অল্প। প্রায়ই দেখা যায়, যাহা আমার স্বার্থ, তাহাই কোন না কোনও প্রকারে কুতর্কে বা অন্য উপায়ে আমার স্বত্ব রূপ বা নাম ধারণ করিয়া থাকে। ঠিক যেন সভ্যতার ভয়ে ও স্বাধীনতার আশঙ্কায় স্বার্থ আপনার নামটী পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু বস্তুত আভ্যন্তরিক কোন বিশেষ বা ব্যাপী পরিবর্ত্তন যে হইয়াছে, এ রূপ ত বোধ হয় না। নামে মাত্র উহার ভিত্তি নীতি, কিন্তু এই নীতি আবার তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই তর্কের স্পর্শমণি যাহাতে লাগে, তাহাই নীতির কাঞ্চন বর্ণে শোভিত হয়। এই রূপে স্বত্বেরও বিলক্ষণ বিড়ম্বনা হইতেছে। এমন কিছুই নাই, যাহা স্বত্বের নামে গৃহীত হইতেছে না। ঘোর স্বার্থপরতা, ভয়ানক নীচতা পর্য্যন্ত, স্বত্বের মহৎ নাম ধারণ করিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইতিহাসের পত্র এই বিড়ম্বনায় পূর্ণ।

তবে আমাদের আশা কোথায়? মানবের ভাবী কল্যাণ কাহার হস্তে? এই নীতিকে স্বার্থানুসারী কুতর্কের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সত্য ও ধর্ম্মের সংলগ্ন করিয়া দিবে কে? জনসমাজের এই দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণা দূর করিয়া শান্তির অমৃত সিঞ্চন করিবে কে? এই স্বার্থপর পশুসমাজকে মানবসমাজ করিবে কে? আজ যে কত লোক বলিতেছে, নারী জাতির প্রকৃতি দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, পুরুষের সমান অধিকার লাভে তাঁহাদের স্বত্ব নাই, সেই হতভাগ্যদের মুখে হস্ত দিয়া, কে আবার বীণাস্বরে প্রচার করিবে যে, নরনারী উভয়েই ঈশ্বরের প্রিয় সন্ততি; তাঁহার ইচ্ছানুসারে জীবনগতি নির্ণয় ও পরিচালন করিয়া সুখী হইতে উভয়েই সমান অধিকারী? এই যে কত লোক নীতির পবিত্র নাম কলঙ্কিত করিয়া জমীদার ও প্রজার মধ্যে স্বার্থান্ধ সম্বন্ধ বৰ্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বত্ব বিষয়ে নানা তর্ক বিতর্কে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির অপবিত্র বায়ুতে পরিপূর্ণ করিতেছে, কে তাহাদের কপট প্রাণকে লজ্জায় অবনত ও মলিন করিয়া দিবে? এই যে জ্ঞান-দৃপ্ত সভ্যতার নামে গর্ব্বিত ও বীরত্বাভিমানী ইংরাজ সুশাসন ও সুনীতির স্বর্গীয় নামে কলঙ্ক দিয়া, নিরপরাধী সরলপ্রাণ একটী জাতির স্বাভাবিক স্বাধীনতাধন চিরদিনের মত অপহরণ করিয়া, ঘোর স্বার্থান্ধতাকেও স্বত্ব ও নীতির পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিতেও সাহসী হইল, ইহার প্রতিকার করিয়া সংসারে শান্তি ও সৌহার্দ্দ, সুখ ও স্বাধীনতা নীতি ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিবে কে?—**প্রেম।**

প্রেমের উদয় না হইলে, স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে মানব-প্রাণ হইতে উন্মূলিত হইবে না। প্রেমে হৃদয় সজীব না হইলে, স্বত্ব-নামধারী স্বার্থপরতা মানবকে চিরকাল

প্রতারিত করিতে বিরত হইবে না। প্রেমের অমৃত-বারি সিঞ্চনে স্বার্থানল দগ্ধ মনুজ সন্তান নব জীবন লাভ না করিলে, তাহার সকল কার্য্যের মূল যে নীতি, তাহা কখনও বিশুদ্ধ হইবে না; কদাচ কাহার কি ন্যায্য অধিকার, তাহা নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবে না; এবং কখনই ন্যায়ানুসারিণী ইচ্ছা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মানবকে উক্ত অধিকার সমূহ নির্দ্দিষ্ট ও উপযুক্ত পাত্রে নির্ব্বিবাদে সমর্পণ করিতে প্রণোদিত করিবে না। প্রেমই মানবকে যথার্থ আত্মবিস্মৃত করিতে পারে, প্রেমের উদয় হইলেই, তাহার পাশবপ্রকৃতি অদৃশ্য হয় এবং তখনই সে অপরকে সুখী করিয়া ও সুখী দেখিয়া নিজে সুখানুভব করিতে আরম্ভ করে। প্রেমেই মানুষের "স্ব"টীকে ছাড়াইয়া আত্মীয় বন্ধু, প্রতিবেশী, ক্রমে দেশবাসী ও অবশেষে জগৎবাসী নর-নারীর "স্ব" র সহিত মিশাইয়া দেয়। কাজেই তখন তাহার "স্বার্থ" আর সকল মানুষের স্বার্থ এক হইয়া যায়। তখন আবার আনন্দের সহিত, সে আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র, কি কোটী গুণে অধিকতর স্বার্থপর দেখিয়া অবাক্ হইয়া প্রেমের জয় ঘোষণা করে। এই প্রেমেই মানুষের প্রকৃত সুখ। সুখ আর প্রেম, প্রেম আর সুখ—এই দুইটী কথা প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। দুইই এক বস্তু। পবিত্র আনন্দ, বিমল সুখ ত প্রেমে বৈ আর কিছুতে নাই। আর এমন সর্ব্বগ্রাসী জিনিষ প্রেমের মত কিছুই নাই। নীতি বল, সভ্যতা বল, সুখ বল, স্বাধীনতা বল,—যত কিছু ভাল ও মহৎ, যাহা কিছু উন্নত ও ন্যায়সঙ্গত, সমুদায়ই এই প্রেমের অভিধানে লক্ষিত হয়। সকল প্রকার স্বাধীনতাতেই স্বাধীন একক, স্ব-অধীন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রেমের মহিমা—ইহাতে 'পরাধীনতাই স্বাধীনতার চরমসীমা! আত্মসমর্পণই স্বাবলম্বনের পরাকাষ্ঠা! আত্মবিস্মৃতিই স্বার্থপরতার বার্দ্ধক্যের পূর্ণবেশ! প্রেমের সকলই অদ্ভুত। এক প্রেমিক মহাত্মা বলিয়াছেন "আমার গণিতই স্বতন্ত্রঃ—এখানে তোমার আছে তিন, খরচ কর সাত, হাতে থাকিবে তের।" কি সুন্দর কথা! এ রাজ্যে বস্তুতই তাই।

প্রকৃতই, প্রেম যখন মানবসমাজের রাজা হইবেন, তখনকার কি চমৎকার ভাব! কল্পনায়ও অতুল আনন্দ। প্রেমের প্রজারা একটুও নিজেদের দিকে চাহিবে না। সকলেই অপরের সুখ, অন্যের স্বার্থ ও আর সকলের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবে, এবং নিজেকে বিস্মৃত হইয়া পরের জন্যই জীবন ধারণ করিবে। আজ যেমন নিজের লইয়াই সকলে ঘুরিতেছে, প্রেমের সংসারে সকলেই পরের জন্য ব্যস্ত হইবে। কাজেই কেহও কষ্ট পাইবে না। সে সুখের সংসার কল্পনা করিয়াও সুখ।

কেহ যেন ইহা স্বপ্ন মনে না করেন। প্রেম মানব প্রাণের স্বাভাবিক ধন, ঈশ্বরের স্বহস্তনিহিত অমূল্য রত্ন। মাতৃগর্ভে কোন্ স্বার্থ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল? ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও অন্ততঃ দুইটী সুদীর্ঘ বৎসর কোন্ স্বার্থপরতা বা স্বত্ব-বলে আমাদের স্পন্দহীন, জড়পিণ্ডবৎ দেহ ও তন্নিহিত প্রাণ রক্ষিত হইয়াছিল? প্রেমের অমৃতরসেই প্রথম হইতে শেষ মানবাত্মা পর্য্যন্ত সকলেরই জন্ম, বর্দ্ধন ও জীবন। প্রেম বস্তুতই আমাদের প্রকৃত ও স্বাভাবিক রাজা। তাহার বীজ তন্মধ্যেই নিহিত রহি-

গিয়াছে। ক্রমে অপরাপর বহিরাবরণ স্খলিত হইলে, আপনিই প্রেম স্বরাজ্য অধিকার করিবে। আরও বলি, ইতিমধ্যেই প্রেমের রাজত্ব জগতে স্থলে-স্থলে দেখা দিতেছে। যখন স্বার্থের উপর সত্যের জয় হইয়াছে, তখন যে এ উভয়ের উপর প্রেমের জয়লাভ হইবেই হইবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বর্ত্তমান সময়েই তাহার কত চিহ্ন দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। এক মহাত্মা সংসারকে "বারমেসে আম্র বৃক্ষের" সহিত তুলনা করিয়াছেন, কেননা এখানে সবই একত্রে আছে। কুঁড়ি বৌল, কাঁচা ফল, পাকা ফল, সবই এক সঙ্গে, এক বৃক্ষে দেখা যাইতেছে। ক্রমবিকাশের নিয়মই এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অধস্তন অবস্থার আবশ্যকতা জগতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা দেখা যায়। যখন উহার আবশ্যকতা আর থাকেনা, তখন উহা লোপ পায়। প্রেমের পূর্ণ বিকাশের জন্য আজিও নীচ স্বার্থ ও অস্ফুট নীতির উপর দণ্ডায়মান মনুষ্যের আবশ্যকতা আছে। তাই তাহারাও আছে। পূর্ণ প্রেমের বিকাশ হইলেই তাহারা বিলুপ্ত হইবে। এক্ষণে পাঠক! এস, দেখি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কিসে স্বার্থ ও স্বত্বকে পরাজিত করিয়া প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

সোণার পাথর-বাটী।

আমরা কি ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছি, তত্ত্বকৌমুদী অথবা মন্মথ বাবু কেহই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, অথবা বুঝিয়াও তাহা আক্রমণ করিতেছেন না। তত্ত্বকৌমুদী পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন (১) "গাছকে মাছ মনে করিলে যদি মিথ্যাচরণ হয়, তবে চিন্ময় বস্তুকে জড়রূপে ভাবাতে মিথ্যাচরণ হয়।" (২) "সাধক যদি মনে করে, এই বিশেষ মূর্ত্তিতে বিশেষ ভাবে ঐশী শক্তি বর্ত্তমান্, তাহা হইলেই ইত্যাদি" (৩) "তাহারা সেই সকল দেব মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বরের আকারই সেইরূপ মনে করিয়া থাকেন।" (৪) "আমার কোন বন্ধুর ফটোগ্রাফ দেখিয়া বন্ধুকে মনে করা, আর সেই ফটোগ্রাফকেই বন্ধু বলিয়া মনে করা কখনও এক নহে।" (৫) "পৌত্তলিকতা এই জন্যই দোষের। ঈশ্বর যাহা নহেন, তাহারা ঈশ্বরকে তাহাই বলিয়া থাকে।"

আমাদের "পৌত্তলিক কে?" নামক প্রথম প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম "একই সময়ে, একই বস্তুকে জড়, পূজা গ্রহণে অসমর্থ জানিয়া, আবার তাহাকে অজড়, পূজা গ্রহণে সমর্থ বলিয়া ধারণা করা যায় না। অর্থাৎ মূর্ত্তি মনে করিলে ঈশ্বর মনে করা যায় না, ঈশ্বর মনে করিলে মূর্ত্তি মনে করা যায় না।" (৪ পৃ)। আবার "হয় সে (পৌত্তলিক) ঈশ্বরকে জানে, না হয় সে জানে না। যদি বল জানে না, তবে সে সৃষ্ট কোন জীবকেও ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারে না। যে যাহা জানে না, সে আবার তাহা মনে করিবে কি রূপে? যদি বল, কিছু কিছু জানে, তবে যতটুকু জানে ততটুকু জীবকে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরকে জীব বলিয়া ভাবিতে পারে না। আর

যতটুকু না জানে, ততকুটুও ভাবিতে পারে না।” আমাদের সমালোচকদের মধ্যে কেহই আমাদের এ সকল কথার ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন না। অথচ তত্ত্বকৌমুদী বারম্বার বলিতেছেন “পৌত্তলিক গাছকে মাছ, দেব মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর” ইত্যাদি মনে করে। আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ঈশ্বর অল্প কি অধিক পরিমানে মানুষ মাত্রেরই নিত্য প্রত্যক্ষ। তাহা হইলে পৌত্তলিক কেহ হইতে পারে না।

ঈশ্বর নিত্যপ্রত্যক্ষ হউন আর না হউন, মূর্ত্তিকে ঈশ্বর মনে করিতে হইলে, হয় মূর্ত্তি, না হয় ঈশ্বরকে ভুলিতেই হইবে। পূজা গ্রহণে অসমর্থ জ্ঞানে কেহ কাহাকেও পূজা করিতে পারে না, অতএব মূর্ত্তি ঈশ্বর নয়, ঈশ্বর মূর্ত্তি নয়, এই বোধ ভিন্ন পূজা অসম্ভব। ‘মূর্ত্তিতে ঐশী শক্তি’ কথাই বিরুদ্ধ, অর্থ শূন্য। সোনার পাথর বাটি হয় না, কাঁটালের আমসত্ব হয় না, জড়ের মূর্ত্তির ঐশী শক্তি হয় না। মূর্ত্তিতে ঐশীশক্তি ধারণা করিতে হইলেই, হয় জড়াত্মক মূর্ত্তি, না হয় চিদাত্মক ঐশীশক্তি ভুলিতেই হইবে। যে সরল ভক্তির সহিত মূর্ত্তিরপূজা করে, যদি তাহাকে চিদাত্মক ঐশী শক্তি ভুলিতে হয়, তবে তাহার পূজা করাই হয় না, সরল ভক্তিরই উদ্রেক হয় না। পূজা বা ভক্তির পাত্র যদি তাহা গ্রহণে অক্ষম জানা যায়, তবে আর তাহাকে মানুষ ভক্তি দিতে পারে না। পৌত্তলিক যাহার পূজা করে, তাহাকে অবশ্য পূজা গ্রহণে সমর্থ জানিয়াই পূজা করে, মূর্ত্তিতে যদি কিছু চেতন আবির্ভূত থাকে, তাহারই পূজা করে। ঐশী শক্তির ধারণা ভিন্ন পূজা হয় না, জড় মূর্ত্তিতে তাহা ধারণা করাতে স্থিতি ব্যাঘাত দোষ ঘটে, অতএব পৌত্তলিক ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও পূজা করে না।

আবার তত্ত্বকৌমুদীর কথা মত “দেব মূর্ত্তিকে ঈশ্বর মনে করা” আর “ঈশ্বরের আকারই সেইরূপ” মনে করা, এক কথা। বস্তুত দুই কথা সম্পূর্ণ বিপরীত, আমার হাত বলিতে যেমন হাত হইতে আমাকে ভিন্ন বুঝায়। ঈশ্বরের আকার বলিলেই আকার অথবা মূর্ত্তি হইতে ঈশ্বরকে ভিন্ন বুঝায়।

আমাদের শ্রদ্ধের ভ্রাতা মন্মথ বাবুও সেই তত্ত্বকৌমুদীর ভুলেই পড়িয়াছেন। ‘ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া তাঁহার পিতৃকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস করিয়া যে বলে, “মা গঙ্গা উদ্ধার কর’, সেই তাঁহার মতে পৌত্তলিক। যে কথার বাক্যার্থ হয় না, তাহা কেহ ধারণাও করে না, বিশ্বাসও করে না। “গঙ্গা” বলিতে জড় বস্তু বুঝায়, “উদ্ধার কর” বলিতে চেতন বস্তু বুঝায়। গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করা, আর জড়কে অজড় ধারণা করা, এক কথা। কিন্তু তাহা বিরুদ্ধ, ধারণা হয় না; তবে কি পৌত্তলিক অর্থশূন্য বাক্য মনে উচ্চারণ করে, আর তাহার চক্ষু দিয়া কপট “ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়?” একথা বলিলে পৌত্তলিকের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়। তবে কি, আমরা যে ব্যাঘাতদোষ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছি, সে ভিত্তিতেই দোষ, অথবা এস্থলে তাহার প্রয়োগ হয় না। মন্মথ বাবু বা তত্ত্বকৌমুদী অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা দেখাইলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। আমরা বলি, পৌত্তলিক গঙ্গা বলিতে নদী বুঝিলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আরও কিছু বুঝে,

যাহা গঙ্গা শব্দে তুমি, কি আমি বুঝি না; তাঁহার কাছে গঙ্গাজল শুধুজল নয়, যিনি পতিতপাবনী, যিনি উদ্ধার করেন, গঙ্গা জলের সংস্পর্শে সে আত্মাতে তাঁহারই স্পর্শ-সুখ অনুভব করে, করে বলিয়াই চক্ষু দিয়া ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়। আমাদের মতে পৌত্তলিকের মধ্যে কোন পৌত্তলিকতা নাই। কিন্তু তুমি আমি, আমাদের গঙ্গাজলের ধারণা জড়; সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত জলের ভাব পৌত্তলিকের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকি, এবং চাপাইয়া তাহাকে ধর্ম্ম জগতের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করি, আপনারা উদ্ভিদের স্থান অধিকার করিয়া, তাহাকে জড়ের স্থান প্রদান করি, অথবা আমরা জন্তু সাজিয়া তাহাকে উদ্ভিদ শ্রেণীতে ভুক্ত করি, বলি সে পৌত্তলিক, সে জড়, নিরবচ্ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত কতকগুলি জলকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। পাদরি সাহেবও বক্তৃতা করেন "গঙ্গাটে ষ্টান করিলে, যডি পরিট্রান হয়, টবে কুম্ভীর কেন পরিট্রান হয়না।" সাহেব যেখানে জল মাত্র দেখিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, পৌত্তলিকের বাহ্য চক্ষুহস্ত সেখানে জল দেখিতেছে, স্পর্শ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের চক্ষুহস্ত সেখানে ঈশ্বর দেখিতেছে ও স্পর্শ করিতেছে।

'মা গঙ্গা, উদ্ধার কর'—হয় এই বাক্যের অর্থ নাই, না হয়, আছে। যদি অর্থ না থাকে, যদি পৌত্তলিকের ভক্তি স্রোত কপটই হয়, তবেও সে সাধারণ সংজ্ঞামতই পৌত্তলিক নয়, কারণ যে কথার অর্থ হয় না, সে কথার দ্বারা ঈশ্বরকে পুত্তল, অথবা পুত্তলকে ঈশ্বরও মনে করা হয় না। আবার এইরূপ অর্থশূন্য বাক্য বলিবারই বা কারণ কি? যদি বল, দেখা দেখি সকলে এইরূপ করে, তবু জিজ্ঞাস্য এই, প্রথম হইতেই কি এই ব্যবহার অর্থশূন্য হইয়াছে। প্রথম হইতে বলা যায় না, যে হেতু দেখাদেখি অর্থশূন্য কার্য্য করিবার কারণ, তখন ছিল না। যদি কালক্রমে মাত্র অর্থশূন্য হইয়া থাকে, তবে প্রথমে কি অর্থ ছিল, এবং এখনও যে পৌত্তলিক মাত্রেই সেই অর্থ ভুলিবে, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়।

কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে বিচার করিতে হইলে, তাহাদের আদর্শ দ্বারাই বিচার করা ঠিক। যদি একথা সত্যও হয় ব্রাহ্মনামধারীদিগের অধিকাংশই ধর্ম্ম অপেক্ষা বৈষয়িক উন্নতি সাধনে রত, তথাপি একথা বলা ঠিক হইবে না, বৈষয়িক উন্নতি সাধনই ব্রাহ্মধর্ম্ম। পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ অর্থশূন্য বলাও ঠিক হইবে না, যতক্ষণ না জানিয়াছি, অর্থশূন্য ভাবশূন্য বাক্য উচ্চারণ করাই পৌত্তলিকদিগের আদর্শ, পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। পৌত্তলিকও যখন পশ্চিমবঙ্গে সাধুভক্ত চৈতন্য, রামপ্রসাদ, এবং পূর্ব্ববঙ্গে সিদ্ধবিদ্যা, রামদুলালকে আদর্শ চরিত্র বলিয়া সম্মান করে, তখন আর কি করিয়া বলিব, অর্থশূন্য বাক্য উচ্চারণ করাই পৌত্তলিকতা। যখন দেখিতেছি, পৌত্তলিকতার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, যবনভক্তেরাও লজ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়া, কৃতার্থ হইয়াছেন, উৎসাহের সহিত বলিয়াছেন, "কহে মুজাহোসেন আলি, যা করে মা জয়কালী"—কি করিয়া বলিব, অর্থশূন্য বাক্যমাত্র উচ্চারণ করাই পৌত্তলিকতা।

তবে 'মা গঙ্গা, উদ্ধার কর, একথার অর্থ কি, কাহাকেই বা সম্বোধন করিতেছে; অচেতন জলের সম্বোধন হয় না, বুঝিতে

পারে না, জানিয়া সম্বোধন করিলে, সে সম্বোধনও অর্থশূন্য. অতএব পূর্ব্বেরই প্রশ্ন ফিরিয়া আসিতেছে। "মা গঙ্গা," এই বাক্য যদি অর্থশূন্য না হয়, সার্থক হয়, তবে জড় জল রাশিকে লক্ষ্য করে না। "উদ্ধার কর" একথাই বা কাহাকে বলা হইতেছে? চেষ্টা করিতে অক্ষম জানিয়া, কেহ বলিতে পারে না, "আমাকে উদ্ধার কর, হে রক্ষণে অক্ষম, রক্ষা কর।" সে ইহুদীদের মত "He came to save others, himself he can not save. বলা বরং উপহাসেরই কথা; কিন্তু যখন বলা হইতেছে "চক্ষু হইতে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হয়," তখন আর উপহাসের সম্ভাবনা কি?

ভক্তি, বিশ্বাস এবং বিচারশক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও আমরা এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা নিজের নামটীও লিখিতে জানেন না। তর্ক করিয়া নিজের ভক্তিবিশ্বাসের ভিত্তি বুঝাইতেও পারেন না। বালেশ্বরে লক্ষণদাস নামে একজন নিরক্ষর পরম সাধু ব্রাহ্ম আছেন; ত্রিপুরাতে চরণদাস নামে একজন পরমবিশ্বাসী নিরক্ষর মৎস্য জীবি ব্রাহ্ম আছেন; ভক্তি বিশ্বাসে ইঁহারা দেবতুল্য লোক। কিন্তু ইঁহারা হয়ত, সদ্যুক্তি যুক্ত ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝাইতে পারিবেন না, অথবা বুঝাইতে ভুল করিবেন। তাহা বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে অন্ধ-বিশ্বাস, অথবা অর্থশূন্য কতকগুলিন কথা মাত্র বলা অন্যায় হইবে। কালক্রমে যদি এমন দিন হয় যে, হিন্দু, মুসলমান, বা খৃষ্টান ধর্ম্মের মত ব্রাহ্মধর্ম্মেরও বিস্তার হয়, তখন এই প্রকার নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই অধিক হইবে। হয়ত তাঁহাদের মধ্যেই অনেকে ভক্তিবিশ্বাসে দেবতুল্য লোক হইবেন। আবার অনেক লোক হইবে, যাহারা এক দিকে যেমন মূর্খ, আর এক দিকেও তেমনি ভক্তিবিশ্বাস বিহীন। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিচার করিতে হইলে, ভক্ত বিশ্বাসী ব্রাহ্মদিগের জীবন দ্বারাই বিচার করিতে হইবে; যদি তাঁহারা নিজের ধর্ম্মজীবনের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হন, তবে তাহাদের কথার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে না; ধর্ম্মজীবনবিহীন, মূর্খদিগের কথামত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলে, আর প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম পাওয়া যাইবে না। পৌত্তলিকের ধর্ম্মেরও বিচার করিতে হইলে অসার, ভক্তিবিহীন, শুষ্ক, অনুষ্ঠাননিরত, মূর্খ লোকদিগের কার্য্য দেখিয়া অথবা কথা শুনিয়া ব্যাখ্যা করিলে অবিচার করা হয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা সারগ্রাহী, ভক্ত, সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহাদেরই জীবন দেখিয়া পৌত্ত-লিকতার বিচার করিতে হইবে; যদি তাঁহারা অশিক্ষিত, নিজের ধর্ম্ম জীবনের মর্ম্ম ব্যাখ্যানে অসমর্থ হন, তাঁহাদের কথারদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে না। এরূপ লোক যখন বলে 'মা গঙ্গা, আমাকে উদ্ধার কর,' তখন কি মনে করিতে হইবে? কাহাকে সম্বোধন করিয়া, সে প্রেমভক্তিতে অশ্রুজল বর্ষণ করিতেছে? গঙ্গা বলিতে যদি সে কিছু জড় বুঝে, তাহাকে সে ডাকে না, তাহার নিকট সে উদ্ধার প্রার্থনাও করে না। যাহাকে প্রেমভক্তি গ্রহণে অসমর্থ জানা যায়, ঘোর কপটি না হইলে, কে তাহার প্রেমে অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে? এ জন্যই বলিতেছি; যদি সে সরল ভক্ত হয়, তবে সে গঙ্গার. গঙ্গাত্ব ভুলিয়া যায়; তুমি যে নামে, যে স্থানে, জল মাত্র দর্শন

কর, সে সেই স্থানে জলের জল, সকলের সার, একমাত্র চিন্ময় উদ্ধার কর্ত্তাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া, প্রেমবারি বিসর্জ্জন করে।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

অপরিজ্ঞেয় ধর্ম্মতত্ত্ব।

যে ধর্ম্মে ভগবৎ প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন ভাব প্রতিফলিত না হয়, তাহা আংশিক, এক-দেশদর্শী; সুতরাং পূর্ণ, সত্যধর্ম্ম নহে। ঈশ্বরের স্বভাবকেই ধর্ম্ম বলা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং ধর্ম্মচরিত্রে যখন তাঁহার স্বভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তখন ধর্ম্ম বাহিরে একটী দৃশ্যমান আকার ধারণ করে। তখন ভগবানই স্বয়ং আপনাকে মনুষ্যচরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। অবশ্য পূর্ণমাত্রায় নহে—অপূর্ণ মাত্রায়, সীমাবদ্ধ ভাবে তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে পরিমাণে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানসকলে ঈশ্বরস্বভাব ব্যক্ত হয়,সেই পরিমাণে তাহা ঐশ্বরিক ধর্ম্ম। যদি তাহার মধ্যে ভগবৎসত্তার কোন অঙ্গবিশেষ অপ্রকাশিত থাকে,তবে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। যতই কেন বিজ্ঞান, যুক্তি, বিচারচাতুর্য্য তুমি তাহার ভিতর আন না, যদি ব্রহ্মের বিচিত্র স্বরূপের সুসামঞ্জস্য তুমি না দেখাইতে পার এবং তোমার ধর্ম্মের মধ্যে যদি ব্রহ্মস্বভাবের বিচিত্র শোভা নয়নগোচর না হয়, তাহা হইলে, ভক্তপ্রকৃতি তাহা কখনই গ্রহণ করিবে না।

বাস্তবিক ধর্ম্ম যেমন একদিকে গণিতশাস্ত্রবিৎ প্রত্যক্ষবিজ্ঞানবাদীর গণিতসিদ্ধান্ত এবং পুরাতত্ত্বপিপাসু পৌরাণিকের ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি ইহা ভাবরসজ্ঞ কবিকল্পনার পূর্ণ চরিতার্থতা। বিশ্বাসী, ভক্ত আত্মা যেমন দেবক্রিয়াকে হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ গোচর করে, তেমনি অনন্ত তত্ত্বের ঘোর রহস্যময়, অতলস্পর্শ,অপরিমেয়,গভীর, অব্যক্ত ভাণ্ডারের দিকে বালকের ন্যায় কৌতূহল চিত্তে প্রধাবিত হয়। জ্ঞাত অপেক্ষা অজ্ঞাত বিষয়ের প্রতি তাহার প্রাণের টান অত্যন্ত অধিক। ভাবুক ভক্তশিশু বিচিত্র গুণসম্পন্না নিত্যানন্দময়ী জননীর স্নেহের আকর্ষণে অপরিচিত অজ্ঞাত পথে মহারণ্য মধ্যে প্রবেশ করে। সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনন্তের অনাবিষ্কৃত রাজ্যের দিকে নির্ভয়ে চলিয়া যায়। কিন্তু যাহাদের ধর্ম্ম গণিত এবং ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাদের অনন্ত জীবন এবং অনন্ত উন্নতি নাই। তাহারা অদ্ভুত ব্রহ্মতত্ত্বের দুর্ব্বোধ্য রহস্যরস পানে বঞ্চিত। তাহারা সমস্তই বুঝিয়া লইয়া একটী তালিকা করিয়া রাখিতে চায়; এক কটাক্ষপাতে মহাসমুদ্রের আদি, অন্ত এবং গভীরতার সীমা নির্দ্দেশ করত, ধর্ম্মজ্ঞানী হইবার চেষ্টা করে। সেরূপ জ্ঞানীর নিকট সকলই পুরাতন। তাহার নিকট, যে কোন অভিনব তত্ত্ব তুমি ব্যাখ্যা করিবে, তাহাকেই সে পুরাতন বলিয়া উড়াইয়া দিবে। অথচ যাহাকে সে পুরাতন বলিয়া উপেক্ষা করে, তাহারই অভ্যন্তরে অনন্ত নবভাব অবস্থিতি করিতেছে। বাহ্যদর্শী ভক্তিরসানভিজ্ঞ পণ্ডিতের ধর্ম্মতত্ত্ব কাষ্ঠ, পাষাণবৎ নীরস, তাহার ভিতর কোন রহস্য নাই; সুতরাং তাঁহার নিকট পার্থিব পদার্থ সমূহ যেমন কাল সহকারে চর্ব্বিত চর্ব্বণ, পুরাতন, রসহীন বলিয়া প্রতীত হয়, ধর্ম্মও তেমনি পরিত্যাজ্য হইয়া পড়ে। তিনি সঙ্গীত

শ্রবণ করিতে গিয়াও তৎসম্বন্ধে বুদ্ধি বিজ্ঞানের কঠোর বিচারপথ অবলম্বন করত, শেষে নিরাশ মনে ফিরিয়া আসিয়া বলেন, "এক দিন রাগ রাগিণীর বিভিন্ন যোগক্রিয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, তখন আর ইহার ভিতর নূতন কিছুই থাকিবে না।" প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের অভক্ত একেশ্বরবাদী ধর্ম্মজ্ঞানীরা ধর্ম্মসম্বন্ধেও এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া পরিণামে কেবল শূন্য অন্ধকার মরুভূমি দেখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বিশ্বাসীর শান্তির পন্থা অন্যরূপ। তিনি, না বুঝিয়া ঈশ্বরকে ভাল বাসেন এবং না দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করেন। শিশুসন্তান যদি মাতার মাতৃত্বে বিজ্ঞান বিচার দ্বারা আকৃষ্ট হইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে মাতৃস্নেহের মাধুর্য্য সে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। মাতা কি পদার্থ, তাঁহার সমগ্র তত্ত্ব না বুঝিয়া, কেবল তাঁহাকে ভালবাসিতেই সে ভালবাসে। সন্তানের প্রতি জননীরও তেমনি আকর্ষণ। তিনি সন্তানতত্ত্ব কি কিছু বুঝিতে পারেন? তথাপি না বুঝিয়াই তৎপ্রতি তিনি আসক্ত হন। যদি বল, এখানে জ্ঞান নাই, কেবলই অন্ধ ভাবের প্রাদুর্ভাব। বাস্তবিক তাহা নহে, ভাবের পথ দিয়া সহজে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হয়। স্বভাব স্বভাবকে যেমন স্বভাবত বুঝিতে পারে, জ্ঞান বিচারে তেমন পারা যায় না। প্রাণের নিগূঢ় টানে মানুষ আপনার ব্যথার ব্যথীর নিকটে অন্ধের ন্যায় গমন করে। তাহাতে সে কখন ঠকে না। ভগবৎতত্ত্বের দুর্ব্বোধ্য রহস্য মধ্যে তেমনি ভক্ত অবতরণ করিতে চায়। যেখানে সেরূপ অবতরণের পন্থা বুদ্ধির প্রাচীরে অবরোধ করিয়া দিয়াছে, সেখানে মৃত্যু ভিন্ন আর কিছু নাই। তাই বলি, জ্ঞানের অগম্য প্রদেশে, ভক্ত কবির কল্পনারই মহাসাগরে ডুবিতে না পারিলে, শান্তির আশা থাকে না। যে ধর্ম্ম কবিকল্পনা এবং রহস্যবর্জ্জিত, তাহা মূলহীন বৃক্ষের ন্যায় নীরস। গভীর চিন্তাশীল ভাবুক লোকেরা, তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না। যাহারা কেবল মুখে ঈশ্বরকে অনন্ত বলে, কাজে তাঁহাকে অন্তবৎ, সীমাবিশিষ্ট পদার্থের ন্যায় মনে করে, তাহাদের ধর্ম্মের কোন আকর্ষণ নাই। অপরিজ্ঞেয়ত্বই শান্তির উৎস।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

দেওঁয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

প্রথম অধ্যায়।

অবতরণিকা।

১৭৭২ সালের পাঁচ সনা বন্দোবস্তের মিয়াদ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দেশের জমিদার তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের এখন কণ্ঠাগত প্রাণ। তাঁহারা সকলেই চিন্তা করিতেছেন, নাজানি এবার আবার কি নূতন নিয়ম জারি হয়। হয়তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবার সকল জমিদারকেই উৎখাৎ করিয়া, নূতন লোকের সহিত জমির বন্দোবস্ত করিবেন।

দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ওয়ারেণ হেষ্টিংস। ভূমিতে জমিদারদিগের কোন চিরস্থায়ী স্বত্ব আছে বলিয়া, তিনি স্বীকার

করেন না। তাঁহার অনুগ্রহ ক্রয় করিতে না পারিলে, কাহারও আপন জমিদারী ভোগ করিবার সাধ্য নাই।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস অত্যন্ত জবরদস্ত লোক। তিনি দেশের আচার ব্যবহার আইন কানুন মতে চলেন না; কোর্ট অব ডিরেক্টরের হুকুমও বড় মান্য করেন না; আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন। তবে দশ বিশ হাজার টাকা উৎকোচ দিতে পারিলে, তাঁহার অনুগ্রহের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর তাঁহার বিপক্ষ ছিল। সুতরাং অধিকাংশ মেম্বরের মতানুসারে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু বিপক্ষ দলের মধ্যে কর্ণেল মনসনের মৃত্যু হইয়াছে। এখন কেবল ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ এবং জেনেরেল ক্লেবারিং তাঁহার বিপক্ষ। এদিকে রিচার্ড বারওয়েল ছায়ার ন্যায় তাঁহার পদানুসরণ করিতেছেন; সর্ব্বদাই তাঁহার মত সমর্থন করেন। কৌন্সিলে কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলে, এখন এ পক্ষেও দুই জন, ওপক্ষেও দুই জন। সুতরাং গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে পক্ষে আছেন, সেই পক্ষের মতানুসারেই কার্য্য হয়। কৌন্সিলের মধ্যে হেষ্টিংসের অপ্রতিহত প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী লর্ড নর্থ। হেষ্টিংসের অসদাচরণ, কুক্রিয়া, এবং নৃশংস ব্যবহার লর্ড নর্থের কর্ণগোচর হইল। নিরাশ্রয়া রুহিলা রমণীদিগের ক্রন্দনধ্বনি এবং আর্ত্তনাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিল। লর্ড নর্থ কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ সুসভ্য ইংরাজ নাম কলঙ্কিত করিয়াছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যগণ নিরপরাধিনী রুহিলা রমণীদিগের নাসিকা কর্ণ ছিন্ন করিয়া, তাহাদিগের স্বর্ণাভরণ অপহরণ করিয়াছে। অবশেষে, তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত কাড়িয়া নিয়া বিবস্ত্রাবস্থায় বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুজা উদ্দৌলার তাঁবুতে ধরিয়া নিয়াছে। অর্থগৃধ্নু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে দেশশাসনের ক্ষমতা উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত বড় দিনের (Christmas) পূর্ব্বেই পার্লিয়ামেণ্ট সভা আহ্বান করিতে হইবে।"

হেষ্টিংসের ইংলণ্ডস্থিত এজেণ্ট (আম মোক্তার) ম্যাকলিন সাহেব দেখিলেন যে মহা বিপদ উপস্থিত। হেষ্টিংস পূর্ব্বেই তাঁহার এজেণ্ট ম্যাকলিন সাহেবকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন "বড় আঁটা আঁটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ আমার পক্ষ হইতে পদত্যাগের এস্তফা পত্র দাখিল করিবে।"

ম্যাকলিন সাহেব হেষ্টিংসের পক্ষ হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট তাঁহার পদত্যাগের এস্তফা পত্র দাখিল করিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরও অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, হেষ্টিংসের অসদাচরণ নিবন্ধন হয় তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যশাসনের ক্ষমতা একেবারে বিলোপ হইবে। সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ হেষ্টিংসের এস্তফা মঞ্জুর করিলেন; তাঁহাদের মধ্যের হুইলার সাহেবকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদে মনোনীত করিলেন; এবং হুইলার সাহেবের ভারতে পৌঁছা পর্য্যন্ত জেনেরেল ক্লেবারিংকে গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে লিখিলেন।

কোর্ট অব ডিরেক্টরের পত্র ভারতবর্ষে পৌঁছিল। হেষ্টিংস অসন্তোপায় হইয়া পড়িলেন। এখন নূতন বন্দোবস্তের সময়। এ সময়ে বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় হইতে পারে। বিশেষত কর্ণেল মন্সনের মৃত্যুর পর, এখন তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। এ সময় কি পদত্যাগ করা যাইতে পারে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হেষ্টিংস বলিলেন, "আমি আমার আমমোক্তার ম্যাকলিন সাহেবকে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিবার ক্ষমতা প্রদান করি নাই। আমি গবর্ণর জেনেরেলের পদ পরিত্যাগ করিব না।"

জেনেরেল ক্লেবারিং হেষ্টিংসের কথায় কোন কর্ণপাত করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ হেষ্টিংসের নিকট মালখানার এবং দুর্গের চাবী চাহিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহাকে চাবী প্রদান করিলেন না। উভয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। জেনেরেল ক্লেবারিং আইনানুসারে আপনাকে গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত মনে করিয়া, ফিলিপ ফ্রান্সিস্‌কে লইয়া কৌন্সিলগৃহের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া কৌন্সিলের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এদিকে হেষ্টিংস বারওয়েল সাহেবকে লইয়া অপর প্রকোষ্ঠে বসিয়া কৌন্সিলের কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং সমুদয় লোককে জেনেরেল ক্লেবারিংয়ের হুকুম অমান্য করিতে অনুরোধ করিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যান্য কর্ম্মচারি হেষ্টিংসের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহারা জানিতেন, জেনেরেল ক্লেবারিং গবর্ণর জেনেরেল হইলে উৎকোচ গ্রহণের সুবিধা থাকিবে না; দেশীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমুদায় স্বার্থপর ইংরাজ কর্ম্মচারি এবং অনেকানেক দেশীয় কুলাঙ্গার জেনেরেল ক্লেবারিংয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। অবশেষে হেষ্টিংসের প্রস্তাবানুসারে জেনেরেল ক্লেবারিং এবং হেষ্টিংস উভয়েই তাঁহাদের মধ্যের এই বিবাদ মীমাংসার ভার সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের প্রতি অর্পণ করিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পি। তিনি হেষ্টিংসের প্রিয় বন্ধু। তাঁহার বিচারে হেষ্টিংসেরই জয় লাভ হইল। তিনি বলিলেন হেষ্টিংসের আমমোক্তারের প্রদত্ত পদত্যাগপত্র কোর্ট অব ডিরেক্টর গ্রহণ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। সুতরাং হেষ্টিংস আইনানুসারে পদচ্যুত হয়েন নাই।"

এই রূপে হেষ্টিংসের পদ বহাল রহিল। এবং তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে জেনেরেল ক্লেবারিং পরলোকে গমন করিলেন। সুতরাং হেষ্টিংসের একাধিপত্য আরও দৃঢ়ীভূত হইল। এদিকে ভূমি সম্বন্ধীয় নূতন বন্দোবস্তের সময়ও সমুপস্থিত হইল।

দেশের প্রধান প্রধান জমিদার তালুকদার আপন আপন নায়েব গোমস্তা এবং আমমোক্তারদিগকে দরবার করিবার নিমিত্ত কলিকাতা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা রাজস্ব কমিটীর আমলাদিগের বাড়ী প্রত্যহই লোকারণ্যে পরিপূর্ণ। খাল্‌সা ডিপার্টমেণ্টের রায়রাঁইয়ার বাড়ীতে অহর্নিশ লোক যাতায়াত করিতে লাগিল।

কিন্তু জমিদারদিগের প্রেরিত লোকেরা অত্যল্প কাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে,

সমুদয় বন্দোবস্তের ভার হেষ্টিংসের হাতে। সুতরাং হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্রদিগকে বশীভূত করিতে না পারিলে, কোন কার্য্যই সাধন হইবে না। কিন্তু হেষ্টিংসের বিশেষ প্রিয়-পাত্র কে?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হেষ্টিংসের প্রিয় পাত্র কে?

১৭৭৮ খ্রীষ্টীয় অব্দের জুলাই মাসে, এক দিন প্রাতে, এক জন উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে বসিয়া নানা-বিধ বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। নজরের টাকা হস্তে করিয়া শত শত জমিদার, তালুকদার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অনেকানেক জমিদারের গোমস্তা আপন আপন প্রভুর পত্র ও নজর-সহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষের সাক্ষাতে কেহ বসিতেও সাহস করেন না। এই সকল লোকের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেরিত এক জন ব্রাহ্মণ এক খানি পত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া পত্র খানি এই উচ্চপদস্থ রাজ পুরুষের হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রের শিরোভাগে লিখিত রহিয়াছে।

"দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য"
"কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ"

এই উচ্চ পদস্থ রাজ পুরুষের নাম দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। রাজস্ব আদায়ের প্রবিন্সিয়েল কৌন্সিল অর্থাৎ প্রদেশীয় রাজস্ব সমিতি বা রাজস্ব কমিটী সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই ইনি গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে প্রবিন্সিয়েল কৌন্সিল সংস্থাপিত হইলে, কলিকাতাস্থ রাজস্ব কমিটীর দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হয়েন। বৎসরাধিক হইল ইনি হেষ্টিংসের বিপক্ষদল কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছেন। কিন্তু পদচ্যুত হইলেও হেষ্টিংসের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই। এখন হেষ্টিংসের বিপক্ষদিগের মধ্যে দুই জনেরই মৃত্যু হইয়াছে। বিশেষত রাজস্ব বিভাগের কার্য্যে হেষ্টিংসের একাধিপত্য রহিয়াছে। সুতরাং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বরখাস্ত হইলেও রাজস্ব সম্বন্ধে তাঁহাকেই সমুদয় কার্য্যকলাপ করিতে হয়।

উপস্থিত জমিদারগণ ক্রমে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর, প্রায় বিশ পঁচিশজন পারিষদে পরিবেষ্টিত, অতিশয় মূল্যবান এবং সুচারু পরিচ্ছদে সুসজ্জিত একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া, সাদর সম্ভাষণে, তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন; তাঁহার সহিত নানা প্রকার বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের পরস্পরের কথোপকথন আরম্ভ হইলে পর, অন্যান্য লোক ক্রমে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

অনেক কথা বার্ত্তার পর এই নবাগত কৃষ্ণকায় পুরুষ বলিলেন—"মহাশয় আপনার দ্বারা যে আমার অনিষ্ট হইবে, তাহা আমি কখন মনে করিতাম না। আপনি আমার একমাত্র বল, ভরসা।"

গঙ্গাগোবিন্দ। আমার দ্বারা আপনার অনিষ্ট হইয়াছে! সে কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। পদচ্যুত হইলাম। এও কি অনিষ্ট নহে?

গঙ্গাগোবিন্দ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) পদচ্যুতির পর আবার তো বহাল হইয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আবার মকরর হইয়াছি বটে; কিন্তু দাগীলোক হইয়া রহিয়াছি। নামের উপর কলঙ্ক পড়িয়াছে।

গঙ্গাগোবিন্দ। মহাশয়, দাগী হওয়াই ভাল। আবশ্যক মতে সেই দাগ দেখিয়াই লোক বাছিয়া লইতে হয়। সেই দাগ ছিল বলিয়া, মুরশিদাবাদের রাজস্ব কমিটীর দেওয়ান হইয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনি বলেন, দাগ থাকা ভাল। কিন্তু এখন তো রাজস্বকমিটী, পূর্ব্বে একবার বরখাস্ত হইয়াছিলাম বলিয়া, আমাকে আবার বরখাস্ত করিতে চাহে।

গঙ্গাগোবিন্দ। প্রদেশীয় রাজস্ব কমিটী (Provincial council) সত্বরই এবালিস্ হইবে। আপনার সে বিষয় কোন চিন্তা নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কমিটী এবালিস্ হইলেই, তাহাতে আমার কি উপকার হইবে।

গঙ্গাগোবিন্দ। নূতন যে বন্দোবস্ত হইবে, তাহাতে আপনার অবশ্যই একটা না একটা সুবিধা হইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমার যে কোন সুবিধা হইবে, তাহা কিরূপে জানিতে পারিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ। আপনি এখন চিহ্নিত লোক। ওয়ারেণ হেষ্টিংস নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, আপনি অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারী। আপনাকে তিনি কখন ছাড়িবেননা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনার এই সকল কথার কিছু অর্থই আমি বুঝিনা। গবর্ণর জেনেরল যদি আমাকে কার্য্যদক্ষ বলিয়া মনে করিতেন, তবে ১৭৭২ সনের পরিদর্শন কালে আমাকে পদচ্যুত করিলেন কেন? আমি তো প্রাণপণে সরকারি কার্য্য সাধন করিয়াছি। ১৭৭০ সনের ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়ও রাজস্ব আদায় করিতে কোন ক্রটী করি নাই।

গঙ্গাগোবিন্দ। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে আপনার ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোক যে পাওয়া যায় না, তাহা গবর্ণর জেনেরেল বিলক্ষণ জানেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাহা জানেন, তবে বরখাস্ত করিলেন কেন?

গঙ্গাগোবিন্দ। তিনি কি আর ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। বিলাতি সভ্যতার অনুরোধে—খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুরোধে,—আপনাকে তখন বরখাস্ত না করিলে চলে না, তাই আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝি না। বিলাতি সভ্যতার অনুরোধ কি—খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুরোধই বা কি—বুঝাইয়া বলুন দেখি।

গঙ্গাগোবিন্দ। পূর্ণিয়ার লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত কত কত জমিদার, তালুকদারের স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত আপনি মালের কাছারিতে আনিয়া বিবস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে প্রহার করা কিম্বা তাহাদিগকে বিবস্ত্র করা, বিলাতের লোকেরা বড় অন্যায় বলিয়া মনে করে। এই সকল বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে পর, হেষ্টিংস সাহেব আপনাকে বরখাস্ত না করিলে, তাঁহার নিজের উপর দোষ পড়িত। সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া আপনাকে তখন বরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, আপনি তাঁহার একজন বিশেষ প্রিয়-

পাত্র। আপনার নাম তিনি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে বৎসর জমীদার তালুকদারের স্ত্রীলোকদিগকে এইরূপে ধরিয়া না আনিলে, এক পয়সাও আদায় হইত না। তখন তো আপনাদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার ছিলনা। মহম্মদ রেজার্খাই নায়েব সুবাদার ছিলেন। তিনি বারম্বার আমার নিকট হুকুম পাঠাইতে লাগিলেন— "যেরূপে পার, পূর্ণিয়ার সমুদয় রাজস্ব আদায় করিতে হইবে"—এদিকে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। জমিদার তালুকদার প্রজার নিকট হইতে এক পয়সাও কর আদায় করিতে পারে নাই। তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত টাকা হইতে রাজস্ব দিতে হইল। কিন্তু ঘরের টাকা কি লোকে সহজে ছাড়িতে চাহে। তাহাতেই বিশেষ কষ্ট করিয়া, আমাকে রাজস্ব আদায় করিতে হইয়াছিল।

গঙ্গাগোবিন্দ। কিন্তু পূর্ণিয়া সেই বৎসরই লোকশূন্য হইয়াছে। পূর্ণিয়ার রাজস্বও সেই হইতেই কমিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। এখন পূর্ণিয়া লোকশূন্য হইলে, আমি কি করিব। আমি তো আর সকল লোকের প্রাণ বিনাশ করি নাই। অনেকানেক জমিদার তালুকদারের স্ত্রীলোক দিগকে মাল-কাছারিতে আনিয়াছিলাম বলিয়া, তাহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। সুতরাং তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। প্রহারে আর কয়জন লোক বা মরিয়াছে। আমার বোধ হয় না যে, দুই এক শত লোকের অধিক মরিয়াছে। তাহাতেও আমার কোন দোষ নাই। এই সকল লোক শত শত বেত্রাঘাতেও টাকা দিতে সম্মত হইল না। তখন কাঁটাগুদ্ধ বেলগাছের ডাল দ্বারা ইহাদিগকে প্রহার করিতে আদেশ করিলাম। তাহাতেই অনেকের মৃত্যু হইল। কিন্তু এইরূপ না করিলে কি আর রাজস্ব আদায় হইত ?

গঙ্গাগোবিন্দ। সে গত বিষয় লইয়া এখন তর্ক করিলে কি হইবে। আপনার ভয় নাই। হেষ্টিংস সাহেব আপনার ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোককে ছাড়িবেন না। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের মেম্বরগণ শত চেষ্টা করিয়াও আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল এবালিশ করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনেরেল কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টর ১৭৭৭ সনের ৪ঠা জুলাইর পত্রে হেষ্টিংস সাহেবের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা নূতন কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচনা করেন না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কোর্ট অব ডিরেক্টর গবর্ণর জেনেরেলের উপর বিরক্ত হইয়াছেন কেন ?

গঙ্গাগোবিন্দ। তাঁহারা অনেক বিষয়েই বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমত আমি বরখাস্ত হইয়াছি পর, হেষ্টিংস এখনও আমার হাতে রাজস্ব বিভাগের কার্য্য কর্ম্মের ভার দিতেছেন বলিয়া, বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত হেষ্টিংসসাহেব আণ্ডারসন, ক্রফ্‌ট এবং বোগেল সাহেবকে পুনর্ব্বার মফস্বল তদন্তের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। তার পর সেই মুঙ্গেরের মনোহর মুখোপাধ্যায়ের মোকর্দ্দমার এবং শ্রীহট্টের থেকারে (Thackeray) সাহেবের মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিয়া হেষ্টিংস এবং বারওয়েল উভয়কে যার পর নাই তিরস্কার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—মনোহর মুখোপাধ্যায়ের কি মোকদ্দমা হইয়াছে?

গঙ্গাগোবিন্দ।—মনোহর মুখোপাধ্যায় বেটম্যান (Bateman) সাহেবের গোমস্তা ছিল। বেটম্যান সাহেব তখন মুঙ্গেরের কলেক্টর ছিলেন। মুঙ্গের এবং কারিকপুর এই দুই মহাল বেটম্যান সাহেব ধান্দু বাহাদুর এবং কৃপারাম এই দুই নামে নিজে ইজারা নিয়াছিলেন। ধান্দু বাহাদুর নামে কোন লোক ছিল না। বেটম্যানের আদেশানুসারে মনোহর ধান্দু বাহাদুর এবং কৃপারামের জামিন হইয়াছিল। বেটমান ঐ দুই মহালের জমিদারদিগকে উৎখাৎ করিয়া নিজেই মহাল ইজারা লইলেন। কিন্তু মহালের যাহা কিছু রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই তিনি নিজে আত্মসাৎ করিলেন। কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব ১৩০০০ টাকা বাকী পড়িয়া রহিল। স্নায় রাইয়া ১৩০০০ টাকা বাকী থাকা রিপোর্ট করিলে পরী তদন্ত আরম্ভ হয়। তখন মনোহরকে টাকার নিমিত্ত ধৃত করিলে, সে দরখাস্ত করে যে, ধান্দু বাহাদুর নামে কোন লোক নাই। ধান্দু বাহাদুর এবং কৃপারামের নামের মহর বেটম্যান সাহেব প্রস্তুত করাইয়া, তাহার নিজের কাছে রাখিতেন। বেটম্যানই ঐ দুই মহালের ইজারদার ছিলেন। এবং তাঁহার কথানুসারে, সে জামিন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—এ আর একটা বিষয়ই বা কি। এই রূপ তো সর্ব্বত্র হইতেছে। তবে শ্রীহট্টে কি হইয়াছে?

গঙ্গাগোবিন্দ।—শ্রীহট্টের গোলমালে স্বয়ং বারওয়েল সাহেব পর্য্যন্ত লিপ্ত আছেন বলিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরের সন্দেহ হইয়াছে। রাজস্ব পরিদর্শন সমিতি (Committee of circuit) শ্রীহট্টের জমিদারী যে ব্যক্তির নিকট ইজারা দিয়াছিল, সে রাজস্বের পরিবর্ত্তে ৬১ টা হাতি দিবে বলিয়া, কবুলতি লিখিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির নামে ইজারাদারি পাট্টা কবুলতি লেখা পড়া হইয়াছিল, সে নামে কোন লোক শ্রীহট্টে নাই। শ্রীহট্টের রেসিডেণ্ট থেকারে সাহেবই একটা কল্পিত নামে ঐ সকল মহাল ইজারা লইয়াছিলেন। তিনি হাতির মূল্যের বাবত রাজস্বের টাকা ভিন্ন পরিদর্শন সমিতি হইতে আর ৩৩০০০ টাকা অগ্রিম নিয়াছিলেন। পরে যে কয়েকটা হাতি পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রায় সমুদয়ই পথে মরিয়া গিয়াছে। কেবল ১৬ টী হাতি পাটনায় পৌঁছিয়াছে। এই শ্রীহট্টের গোলমাল সম্বন্ধে হেষ্টিংস, বারওয়েল উভয়কে কোর্ট অব ডিরেক্টর যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—এ সকল গোলমাল সত্বরই মিটিয়া যাইবে। ইংরাজদিগের সাত-খুন মাপ। কিন্তু আমি আপনার নিকট একটা কথা বলিতে আসিয়াছি। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনি আমার কোন অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন না। আর আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আপনার কোন অনিষ্ট করিব না।

গঙ্গাগোবিন্দ।—আমি কখন আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। এখন প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল উঠিয়া গেলেই ভাল হয়। দুই তিন বৎসর পরে এক একটা পরিবর্ত্তন না হইলে, এক একটা নূতন আইন জারি না হইলে, সরকারি কার্য্যকারকদিগের কোন কাজ হয় না। যাহাতে পুনর্ব্বার মফস্বল তদন্ত

হয়, তাহারই চেষ্টা করিব। আপনি কিছুকাল এখানেই অবস্থান করুন। দেখুন আগামী কল্য কৌন্সিলে কি নিয়ম অবধারিত হয়। তারপর, যাহা হয় আমরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিব।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—তবে আজ বিদায় হইলাম। আজ হইতে আপনার সঙ্গে এই কথা রহিল যে, আপনিও আমার অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন না, আমিও আপনার কোন অনিষ্টের চেষ্টা করিব না।

এই বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম, রাজা দেবী সিংহ। যখন মহম্মদ রেজার্খা নায়েব সুবাদার ছিলেন, তখন রাজা দেবী সিংহ পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইহার অত্যাচারে পূর্ণিয়া প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। সুতরাং ১৭৭২ সালে যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস পরিদর্শন সমিতির (committee of circuit) সভাপতি হইয়াছিলেন, তখন তিনি রাজা দেবী সিংহকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু ১৭৭৩ সালে যখন কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান, ঢাকা, পাটনা এবং দিনাজপুরে রাজস্ব আদায় নিমিত্ত এক একটী প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল সংস্থাপিত হইল, তখন আবার হেষ্টিংস সাহেবই রাজা দেবী সিংহকে মুরশিদাবাদ কৌন্সিলের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের মেম্বরগণ এদেশের রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় নিয়ম কিছুই বুঝিতেন না। মুরশিদাবাদ কৌন্সিলের সমুদয় কার্য্যই দেবী সিংহ আপন ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করিতেন। অনেকানেক জমিদারকে তাহাদের মহাল হইতে উৎখাৎ করিয়া নিজে বিনামিতে সেই সকল মহাল ইজারা লইতেন। এতদ্ভিন্ন দেবী সিংহ ইংরাজদিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আর একটী কৌশল করিলেন। তিনি সর্ব্বদাই দশ বারটী স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের প্রয়োজন হইলেই, ইহার দুই একটী স্ত্রীলোক তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ইহাতে দেবী সিংহের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন।

কিন্তু চিরকাল কাহারও সমভাবে অতিবাহিত হয় না। ১৭৭৮ সালের কিছু পূর্ব্বে মুরশিদাবাদের প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল দেবী সিংহের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে বরখাস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। দেবী সিংহ আর কোন প্রকারেই তাহাদিগের মনস্তুষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং এখন হেষ্টিংস সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন বলিয়া, কলিকাতা আসিয়াছেন এবং হেষ্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শরণাগত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

কৌন্সিলের অধিবেশন

২২ জুলাই ১৭৭৮।

উপস্থিত।

মহামান্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরেল, সভাপতি

মেষ্টর বারওয়েল
ফ্রান্সিস্
হুইলার } মেম্বরগণ

কৌন্সিলের অধিবেশন হইল। অদ্যকার

কৌন্সিলে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় নিয়ম পর্য্যালোচিত হইবে বলিয়া, পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। কৌন্সিলের সভাপতি গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস কৌন্সিলের কার্য্যারম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"মহামান্য কোর্ট অব ডিরেক্টর তাঁহাদের ১৭৭১ সালের ২৮ আগষ্টের পত্রে নবাব মহম্মদ রেজা খাঁকে বরখাস্ত করিয়া, কোম্পানির ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভারার্পণ করিতে লিখিয়াছিলেন। আমরা ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞাধীন। সর্ব্বদাই তাঁহাদের আদেশানুসারে কার্য্য করিতেছি। তাঁহাদের প্রাগুক্ত আদেশানুসারে, মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া ১৭৭২ সালের ঘোষণা পত্র দ্বারা কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার এবং পাটনা ও মুরশিদাবাদের ফেক্টরির কৌন্সিলের হস্তে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তৎপর ১৭৭২ সালের ১৪ মে তারিখের রেগুলেসন (Regulation) দ্বারা পাঁচ সন মিয়াদে দেশের সমুদয় জমি বন্দোবস্ত করা হয়। বাঙ্গলা ১১৭৯ সনের বৈশাখ মাস হইতে এই বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। কোম্পানির রাজস্বের কোন ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য আমি স্বয়ং পরিদর্শন কমিটীর (Committee of circuit) অধ্যক্ষ হইয়া সর্ব্বোচ্চ ডাকে জমি পত্তন করিয়াছিলাম। পুরাতন জমিদারগণ পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর নিরিখে রাজস্ব দিতে অসম্মত হইয়াছিল বলিয়াই, সর্ব্বোচ্চ ডাকে ভিন্ন ভিন্ন পরগণা নূতন ইজারাদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

"এই বন্দোবস্তের সময় আমাদের সুযোগ্য, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ দেওয়ান মহাত্মা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তিনি সাধ্যানুসারে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং দেশীয় লোকের হিত সাধনে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সৎপরামর্শ এবং সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে, ঈদৃশ উচ্চ নিরিখে জমি পত্তন করিবার সুবিধা হইতনা।

এই প্রকারে পাঁচসন মিয়াদে জমির বন্দোবস্ত করিয়া, প্রত্যেক জিলার এক এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারিকে কলেক্টর উপাধি প্রদান পূর্ব্বক রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন কোন জিলার কলেক্টর আদায় উসুলের হিসাব পত্র রাখিতে কিঞ্চিৎ ক্রটী করিয়াছেন। আর কোন কোন কলেক্টর পুরাতন জমিদারদিগকে উৎখাৎ করিয়া কল্পিত নামে ভূমি নিজ নামে ইজারা লইয়াছিলেন বলিয়া, তাহাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোর্ট অব ডিরেক্টর তন্নিবন্ধন এই সকল কলেক্টরের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছিলেন। সুতরাং অনতিবিলম্বে আমি ইংরাজ কলেক্টরের পদ উঠাইয়া দিয়া, প্রত্যেক জিলার রাজস্ব আদায়ের ভার আবার বাঙ্গালিদিগের হস্তেই অর্পণ করিয়াছি। এবং এই সকল বাঙ্গালিদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণার্থ পাটনা, মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, ঢাকা এবং কলিকাতা; এই ছয় জিলায় ছয়টী প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল সংস্থাপন করা হইয়াছে।

"কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের দ্বারাও সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না। এই প্রবি-

ন্সিয়াল কৌন্সিলের ত্রুটী প্রযুক্তই আমরা বিগত ১৭৭৬ সনে অণ্ডারসন্, বোগেল এবং ক্রফ্ট সাহেবকে পুনর্ব্বার পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে এখন অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সমুদয় রাজস্ব আদায় হইতেছে না। প্রত্যেক বৎসরই অনেক রাজস্ব বাকী পড়িতেছে। এই সকল বিশৃঙ্খলা নিবারণার্থ আমি এখন প্রস্তাব করিতেছি যে, প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কলিকাতা নগরে একটী রাজস্ব কমিটী (Revenue Committee) সংস্থাপন করা হউক। মহাত্মা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে এই রাজস্ব কমিটীর দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলে সমুদয় কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে। সমুদয় বঙ্গদেশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যকর্ম্মের ভার গঙ্গাগোবিন্দের হস্তে অর্পণ না করিলে, কোন প্রকার সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনের সম্ভব নাই। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে আমি কখন বিশেষ কোন অভিযোগ শ্রবণ করি নাই। তিনি একবার পদচ্যুত হইলেও তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিকে অবশ্যই পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিতে হইবে।”

গবর্ণর জেনেরেল হেষ্টিংস সাহেবের বাক্যাবসানে কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর ফিলিপ ফ্রান্সিস্ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন।

“সভাপতি মহাশয় পূর্ব্ব বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সমুদয় বন্দোবস্ত আমরা করিয়াছি। কিন্তু এই সকল বন্দোবস্ত আমি করিয়াছি, এই কথা বলিলে আর সত্যের অপলাপ হইত না। পূর্ব্বের সমুদয় বন্দোবস্তই তিনি একক করিয়াছেন; তৎসমুদয় বন্দোবস্তের মধ্যেই সভাপতি মহাশয় এবং তাঁহার পারিষদবর্গের অবৈধরূপে অর্থ সঞ্চয়ের অভিসন্ধি ছিল।*

১৭৭২ সালের রেগুলেসন্ (Regulation) দ্বারা নিয়ম করা হইয়াছিল যে, ইংরাজ কলেক্টরগণ কিম্বা তাহাদের অধীনস্থ বেনিয়ান কিম্বা মুচ্ছুদ্দিগণ কোন জমি ইজারা লইতে পারিবেন না। কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের বেনিয়ান কান্ত পোদ্দার অন্যূন উনবিংশতিটী পরগণা ইজারা লইয়াছে। এই সকল পরগণার পূর্ব্বের জমিদারগণকে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের জমি হইতে উৎখাৎ করা হইয়াছে। এদিকে মুঙ্গেরের কলেক্টর বেটম্যান সাহেব ধান্দু বাহাদুর নামক এক জন কল্পিত লোকের নামে মুঙ্গের এবং খাবিকপুর পরগণার জমি ইজারা লইয়াছিলেন। এই দুই পরগণার জমিদার অন্যায়রূপে পৈত্রিক জমি হইতে বেদখল হইয়াছে। শ্রীহট্টের থেকারে সাহেব যেরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া, কোম্পানির টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা কোর্ট অব ডিরেক্টরের পত্রেই বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের সহোদরসদৃশ কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর মেস্তর বারওয়েল বেট্ম্যান এবং থেকারে সাহেবের কুক্রিয়া সকল গোপন করিবার নিমিত্ত যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও ডিরেক্টরদিগের প্রাগুপ্ত পত্রে সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয় অধিক সমালোচনার প্রয়োজন নাই।

* "In the late proceedings of the Revenue Board there is no species of speculation from which the Honourable Governor-General has thought it right to abstain."

"সভাপতি মহাশয়! ১৭৭২ সালের বন্দোবস্তের সময় দেশীয় জমিদারদিগের নিকট হইতে যেরূপ উচ্চ নিরিখে রাজস্ব চাহিয়াছিলেন, তাহা তাহাদিগের দিবার সাধ্য ছিল না। সুতরাং তাহারা অগত্যা আপন আপন পৈত্রিক জমিদারি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। কলিকাতা সহরে যত অসচ্চরিত্র বেনিয়ান ছিল, তাহারাই এই সকল জমিদারের জমি ইজারা লইয়াছে। এই সকল পুরাতন জমিদার কৃষকদিগের প্রতি কখন অত্যাচার করিত না। কিন্তু নূতন ইজারাদারগণ এই সকল ভদ্রবংশীয় জমিদারদিগের স্থলাভিষিক্ত হইয়া, ঘোর প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে; কোন কোন পরগণা একেবারে জনশূন্য করিয়াছে; প্রজার নিকট হইতে যাহা কিছু আদায় করে, তৎসমুদয় আত্মসাৎ করিতেছে; কোম্পানির রাজস্ব একেবারেই আদায় করে না। ইহাঁদিগের অত্যাচারে দেশ প্রায় কৃষক শূন্য হইয়া উঠিয়াছে; এবং প্রত্যেক বৎসর কোম্পানির রাজস্ব বাকী পড়িতেছে।

"দিন দিন নূতন নিয়ম প্রচার করিলে, দিন দিন নূতন আইন জারি করিলেই যে শাসন কার্য্যের সমুদয় দোষ নিরাকরণ হইবে, তাহা আমি মনে করি না। এই রূপ নূতন নূতন পরিবর্ত্তনের দ্বারা কোম্পানির অর্থলোভী কর্ম্মচারিদিগকে কেবল দেশ লুণ্ঠনের সুযোগ প্রদান করা হইতেছে। আমি বোধ করি যে, পুরাতন জমিদারদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে, সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে।"

কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর মেস্তর বারওয়েল বলিলেন, "জমিদারদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে জমিদারগণ প্রজাপীড়ন করিবে। দেশীয় জমিদারদিগের চরিত্র বড় ভাল নহে। বর্দ্ধমানের রাণী কিরূপ আচরণ করিতেছেন, তাহা কি মেস্তর ফ্রান্সিস্ জানেন না।"

ফ্রান্সিস্।—দেশের ভদ্রবংশ জাত পুরাতন জমিদারগণ বোধ হয় তত প্রজা পীড়ন করে না। কিন্তু আপনাদিগের বেনিয়ানদিগকে জমিদার করিলে নিশ্চয়ই প্রজাপীড়ন হইবে। কেবল প্রজা পীড়ন কেন? দেশ উৎসন্ন যাইবে, কোম্পানির রাজস্ব ক্রমেই বাকী পড়িবে। মেস্তর বারওয়েল বর্দ্ধমানের রাণীর চরিত্রে দোষারোপ করিতেছেন। এক সময় তিনি বর্দ্ধমানের মহারাণীকে "Vile prostitute" (ঘৃণিত বেশ্যা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ঈদৃশ আচরণ ভদ্রোচিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বর্দ্ধমানের মহারাণী যে, অতি উচ্চ বংশজাতা ভদ্রমহিলা তাহার কোন সন্দেহ নাই। "সভাপতি মহাশয় যে প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল এবালিশ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমি কখন অনুমোদন করিনা এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে পুনর্ব্বার কোম্পানির কার্য্যে বহাল করা, আমি নিতান্ত অন্যায় মনে করি। বিশেষত কোর্ট অব ডিরেক্টর গঙ্গাগোবিন্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—

(The Roy Royan was the regular channel of such communications as require the interposition of a native, and not Ganga Govinda Singh, whose dismission from Calcutta committee had rendered him an improper person to transact affairs of such moment to the company) যাহাদিগের

দ্বারা যে সকল কার্য্য করাইতে হইবে, তাহা রায়রাইয়া করিবেন। সে সকল কার্য্যের ভার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হাতে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। কারণ সে পদচ্যুত হইয়াছে।

ঈদৃশ তর্ক বিতর্কের পর গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস দেখিলেন যে, কৌন্সিলের দুইজন মেম্বর ফিলিপ ফ্রানসিস্ এবং হুইলার সাহেব তাহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। হুইলার সাহেব অল্পদিন হইল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস পদ ত্যাগ করিলেন না। সুতরাং হুইলারকে কৌন্সিলের একজন মেম্বর হইয়া এখন থাকিতে হইল।

হেষ্টিংস ইচ্ছা করিলে তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন। কিন্তু আজ কাল কোর্ট অব ডিরেক্টর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল এবালিশ করিয়া কলিকাতা রাজস্ব কমিটী স্থাপন পূর্ব্বক গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে নিযুক্ত করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর কৌন্সিল ভঙ্গ হইল। হেষ্টিংস এবং বারওয়েল একত্র হইয়া হেষ্টিংসের গৃহে চলিয়া গেলেন। ফ্রান্সিস্ এবং হুইলার সাহেব আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন।

মাঘি সপ্তমী নিশি।

(১)

কুহেলিকা-অন্ধকার,
ঘিরিয়াছে চারিধার;
শুক্লা সপ্তমীর নিশি আজি মসিময়;
অর্দ্ধনিশি যায় যায়,
মলিন প্রতীচী গায়
মলিন অরধচন্দ্র পাইতেছে লয়।
নিবিড় অরণ্যে ঢাকা,
মৃত-চন্দ্রালোকেমাখা,
আকাশের গায় আঁকা, কৃষ্ণ শৈলকায়া,
ক্ষীণালোকে দেখা যায়
ভীম বৃত্রাসুর প্রায়,
আছে ঊর্দ্ধে বিস্তারিয়া ভীমরূপীছায়া।

(২)

মরণের সর্ব্বক্ষম
পরশ-ভীষণতম—
পাইয়ে, শীতল, স্তব্ধ, হয়েছে সকলি;
পুষ্পপত্রে অগণন,
ম'রে আছে সমীরণ;
শাখায় শাখায় মৃত বিহগকাকলি;
শব শত রাখিবুকে,
ধরণী নিস্তব্ধ দুখে;
এমনি নিস্তব্ধ ওরে পরাণ(ও) আমার!
আজি তার আশে পাশে,
কঠোর মৃত্যুর ফাঁসে,
জড়িয়ে পড়িয়ে শত শব আকাঙ্ক্ষার।
শুকান পত্রের প্রায়,
পড়িছে সে শবগায়
প্রফুল্ল নবীন প্রেম, নীরবে কাঁদিয়া;
আর বুঝি ফুটিবেনা,
আর বুঝি ছুটিবেনা,
আর বুঝি মধুময় করিবেনা হিয়া!

(৩)

ঊষার আলোক ভরা,

স্বপ্নময় গীতে গড়া,
জীবন্ত আনন্দময়ী মূরতি তাহার,
শুকায়েছে অনাদরে;
কে তারে যতন করে?
কে ঢালে শুকান বুকে স্নেহের আসার?
ক্রীড়াশীল চক্ষু তার,
প্রতিমূর্ত্তি নিরাশার;
দারুণ বিষাদ শ্বাসে কাঁপে বিম্বাধর;
জ্যোছনা নিবায়ে তার
খেলা করে অন্ধকার;
সুবর্ণ মন্দিরে চর্ম্মচটিকার ঘর।
প্রেমের আশায় পূর্ণ
হৃদয়ে, অনন্ত শূন্য;
যারে চায় তারে হায় পায়না,—পাবেনা;
শুকাবে সে প্রাণ তার,
ইচ্ছা বুঝি বিধাতার;
দরিদ্রের ঘরে রত্ন রহেনা,—রবেনা!

(৪)

আহা সে নবীন আশা,
প্রাণপূর্ণ ভালবাসা,
কি সুখ তোমার বিধি, দিতে নিবাইয়া?
সেই তার রূপরাশি,
সে কটাক্ষ, সেই হাসি,
ছিঁড়ি হৃদয়ের পিণ্ড, দিতে ভাসাইয়া?

(৫)

ডুবিল চন্দ্রমা ধীরে;
তুমিও প্রেয়সি কিরে,
নিঃশব্দে অমনি ধীরে যাবে গো ডুবিয়া?
ভুলিবে এ দরিদ্রের
শত যত্ন আদরের,
বিস্মৃতির বিষরাশি চুমিয়া চুমিয়া?
ছিঁড়িয়া মায়ার বাধা,
ভাঙ্গিয়া স্বপ্নের ধাঁধা।
পায়ে দলি, হায় হায়, বাসনা আমার,
ওই মৃত প্রকৃতির
স্তব্ধ কোলে রাখি শির,
ঘুমাবে? ঘুমাবে তুমি প্রেয়সি আমার?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জীবন-গান।

জীবন একটী গান,
বিষাদ একটী তান,
আনন্দ একটী তান,
হাসি আর অশ্রুমাখা
স্বপন-রচিত গীত,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডযোড়া
অনন্ত সঙ্গীত।

১

সন্ধ্যার আকাশ-গায়
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি
সিঁদুরে মাখিয়াছিল,
বাতাসে উড়িয়া গেল!
আঁধার ঢাকিল তায়!
রামধনু আঁকা ছিল
নীলিমার কোল যুড়ে,
দিগঙ্গনা-মুখে হাসি
এই ছিল রাশি রাশি
তাও যে মিশিয়া গেল!
সুখের স্বপন গুলি
ঘুমাইয়াছিল প্রাণে,
ভে'বেছিনু ধরি ধরি
মরমে রাখিব ভরি,
উ'ড়ে গেল পাখা তুলি!

ওই যায়! ওই তারা!
সারি সারি যায় চো'লে!
অনন্ত আকাশ ছে'য়ে
কি যেন কি গে'য়ে গে'য়ে;
এখনও পেতেছি সাড়া!
অনন্ত আকাশে লিখা
অনন্ত গানের ধারা!

২

বিষাদ আঁধার কো'রে
ঝটিকার আগে আগে
দুখের কাহিনী গে'য়ে
শোক শিঙ্গা বাজাইয়ে
আসিল! আসিল ওই!
মরম ফেলিল ভো'রে!
আয় শোক দুঃখ গুলি,
ভাঙ্গাচুরা প্রাণ খানি
রাখি (স্) নে একটু খানি!
ঢে'লে দেনা তপ্ত বালি,
সাজানা অনন্ত মরু?
আয় উ'ড়ে পাখা তুলি!
খু'লেছি মরম দ্বার
আগুন, গরল, ব্যথা,
অপমান, নির্যাতন,
অবহেলা, দুর্ব্বচন,
পদাঘাত রাশি রাশি
কো'রে রাখ্ স্তুপাকার!
নীরব হবেনা প্রাণ,
গাইবে নির্ভয়ে তবু,
আছি সুখে আছি ভাল
আঁধারে মধুর আলো
নিভৃত মরম-তলে
জ্বলে নিশা-দিনমান,
অনন্ত আকাশময়
অনন্ত আনন্দ গান!

কে যেন বাজা'রে বাঁশী
ফুলের বাগানে একা
জোছনায় বো'সে বো'সে
গাইল নিশীথ-গান।
তান গুলি খো'সে খো'সে,
জোছনায় মি'শে গিয়া
ভরিয়া ফেলিল প্রাণ!
গান গুলি দূরে দূরে
বসন্ত অনিলে উড়ে
স্তব্ধ জগত বুকে
ঘু'রে ঘু'রে, ফি'রে ফি'রে,
গুম্‌রে, গুম্‌রে কত
কেঁদে কেঁদে ছু'টে গেল!
কত যে হিয়ার দ্বারে
আঘাত করিল জোরে।
সকলি ঘুমা'য়ে ছিল
স্বপন বুকেতে চেপে
গলা ধো'রে চু'মে চু'মে,
অনন্ত মরণ-কোলে।

আকাশে সুন্দর চাঁদ
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ
জোছনা রূপসীসনে
ঘুমে ছিল বিছানায়,
ছানা ছানা শিশুগুলি
কিরণের ফুল গুলি
তারা গুলি ঘিরে ঘিরে
শুয়ে ছিল নীলিমায়।
পবিত্র প্রেমের আভা
জগতে ঘুমন্ত শোভা
ছড়ায়ে ভিজিতেছিল
ফোঁটা ফোঁটা নিশাজলে।

গান গুলি কেঁদে কেঁদে
কত কি বলিল চাঁদে
কত কি বলিল যেন
জোছনায়, ফু'লে ফু'লে

শুনেছি সে গান গুলি
একাকী সংসার ভুলি
স্তবধ নিশীথ-কোলে
ভাঙ্গা ঘরে শু'য়ে শু'য়ে!

ছিল না ঘুমের ঘোর
ছিনুনা স্বপনে ভোর
কত কি মধুর গাথা
গেল দূরে গে'য়ে গে'য়ে!

আজিও জোছনা হো'লে
দেখি তার বুকে দোলে
স্তবধ নিশ্বাস সেই
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তান গুলি!

এখন ও মরম তলে
থেকে থেকে উঠে ফু'লে
কত কি আনন্দ-গাথা
কত কি সুখের বুলি!

মধুর স্বপন মাখা
সে সুধাতরঙ্গ গুলি!

৬

"জীবন সঙ্গীত নহে
বিষাদের গান
সুধায় গরলে মাখা
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তান!
আনন্দ কাহিনী শুধু
শুধু মাখা প্রাণ
অপার অনন্ত গীতি
সুধার সমান
প্রেমের সাগর বক্ষে
অমৃতের বাণ!"

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আকাশ-বাণী।

(১)

অনন্ত আকাশ পথে, কে যেন ডাকিয়া যায়,
"আয়, আয়, আয়!"
শুনিয়া পরাণ কাঁদে,
পড়িয়া রহিনু ফাঁদে,
প্রাণের বাসনা, আমি বারেক উড়িয়া যাই!
অবিরাম কালস্রোতে মিশিয়া মিশিয়া ধাই!

(২)

আবার অনন্ত-পথে কে ওই ডাকিয়া যায়,
"আয়, আয়, আয়!"
উড়ুং প্রাণ-পাখী,
শিশির ঝরিছে আঁখী।
ভবসিন্ধু উপকূলে,
একেলা মরম ভুলে;
উড়ুং প্রাণ পাখী! কেমনে উড়িয়া যাই!
জনম শৃঙ্খলে বাঁধা, যাইব কেমনে ভাই!!

(৩)

কে তুমিগো! কে তুমিগো!
কে আজি এদীনে ডাকো!
অভাগার কেউ নাই,
ডাকিতে, আপনা ভাই!
আজিওআকাশ-মুখে কে ডাকিল, "আয়, আয়।"
আশার বাতাসে প্রাণ, উড়িয়া যাইতে চায়!

(৪)

সুমিত্র মহাত্মাগণ, ওপার হইতে ডাকে,
সে মহা আশ্বাস বাণী, পরশিল শ্রুতি পথে।
"মাভৈঃ মাভৈঃ" রব সুদূরে উঠিছে ওই।

ত্যজি মোহ,মায়া ভয়,আমি যাই! আমি যাই!
অনন্ত বিমান পথে এখনো ডাকিয়া যায়,
"আয়, আয়, আয়!"
শুনিয়া পরাণ কাঁদে!
কাটিলাম মোহ ফাঁদে,
প্রাণের বাসনা, আমি বারেক উঠিয়া যাই!
অবিরাম কালস্রোতে মিশিয়া মিলিয়া ধাই!

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

বাঙ্গালার বর্ব্বর জাতি।

নাগা।—বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগে "মণিপুর" পর্ব্বতে হোদিগের বাস। আমরা ইহাদিগকে নাগা ও কুকি দুই দলে বিভক্ত করি। মণিপুরিয়া ইহাদিগকে কুপুই, কোইরেং, কংসোল, খোংহৈ, কোং, চিরু, চোট, পুরু, মুণ্টুক, কারুং, মুরিং, টাঙ্কুল, লুহুপ, মৌ, মুরাং, মিরাংথাং, নামে প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে। পাহাড়িয়ারা এ সকল নাম ব্যবহার করে না। তাহারা আপনাদিগকে অন্য নামে অভিহিত করে। এই সকল জাতি দিন দিন ধ্বংস হইতেছে। পূর্ব্বে যাহারা বিস্তৃত বনভূমের অধিকারী ছিল, এখন দু তিন খানি গ্রামেই তাহাদের সঙ্কুলান হইতেছে। সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাদের প্রত্যেকের ভাষা স্বতন্ত্র এবং আচার ব্যবহার ভিন্ন।

কাছাড় ও মণিপুরের মধ্যগত পাহাড় সকলে কুপুইরা বাস করে। ইহারা বড় জীঘাংসা প্রিয়। যে জাতির সহিত বিবাদ থাকে, পার্ব্বতীয় কোন নদী তাহাদেরদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে, ইহারা সে নদীর জল স্পর্শ করেনা। অন্যান্য বর্ব্বরদিগের ন্যায়, ইহারাও জাতিবর্গ মিলিয়া এক এক গ্রামে বাস করে, গ্রামগুলি এত নিকটে থাকে যে, আবশ্যক হইলে একটা প্রাচীর দ্বারা সকল গুলিকে সহজে বেষ্টন করা যাইতে পারে। পৈতৃক বাস্ত ও জন্মভূমি বলিয়া ইহারা গ্রাম গুলিকে বড় ভালবাসে। কোন কারণে গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে, গ্রামে ফিরিয়া যাইতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করে। পাহাড়ে জায়গায় উঠা নামা দুষ্কর, একটী ঝরণার জল অনেক গুলি গ্রামের লোক ব্যবহার করে, সুতরাং দূরস্থ গ্রামের স্ত্রীলোকেরা বড় কষ্টে জলসঞ্চয় করে, তথাপি পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিয়া, কেহ ঝরণার নিকটে উঠিয়া যাইবেনা। সোজাপথ দুর্গম হইলেও তাহা ছাড়িয়া, ইহারা সুগম বাঁকা পথে চলেনা। ইহা পৈতৃক ব্যবস্থা-প্রিয়তা-জাত, কি উত্তরাধিকৃত প্রাচীন অভ্যাস-মূলক, বলা যায় না। যাহাই হউক অন্যান্য বর্ব্বরদিগের ন্যায় ইহারাও যে বড় স্থিতিশীল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহারা ধানের চাস করে; কিন্তু জমীতে সার এত অল্প যে, যে জমিতে একবার চাস হয়, দশবৎসর আর সেখানে কিছু হয় না। দশবৎসরে গাছের সারে জমী সারবান হইলে, আবার তাহাতে চাস করে। জঙ্গল কাটিয়া কিছুদিন শুখাইয়া, ইহারা তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দেয়; গাছের ক্ষার পাহাড়ে জমীর প্রধান সার। চাসে ধানও অধিক হয়না। বন্যা, ঝটিকা, পর্ব্বত-জাত পশু, পক্ষীর অত্যাচার ইহাদের চাসের নানা অন্তরায়। পালে পালে ইন্দুর আসিয়া মাঠ আক্রমণ করে। জলে কি আগুণে কিছুতেই তাহাদের আক্রমণ নিবারণ করা যায়

না। ইহারা লাঙ্গল চালাইতে জানেনা। কোদালি দিয়া লাঙ্গলের কাজ করে। ইহারা বলে, ইন্দুরগুলি কখন কখন পাখী হইয়া পড়ে। বন্যকচু ইহাদের প্রধান আহার। মণিপুর পাহাড়ে কচু অপর্য্যাপ্ত জন্মে। ইহারা চালা ঘরে বাস করে। খুঁটি গুলি এত শক্ত যে, ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরেও বদলাইতে হয় না। এবং ঘাস দিয়া এমন ছাইতে পারে যে, একবার ছাইলে দশ বার বৎসর চলিয়া যাইতে পারে। প্রায় সকল গৃহস্থেরই এক একটী গোলা আছে। বাড়ী হইতে গোলাঘর কিছু দূরে। কিন্তু গোলা ঘরে কখনও চুরী হয় না। ইহারা শূকর ও মুরগী পুষে। সকালে উঠিয়া কুপুই-রমণী ধান ভানে, তার পর রন্ধন করে। সূর্য্যোদয়ের সময়েই প্রাতর্ভোজ সমাধা হয়। তাহার পর রমণীরা বাঁশের চোঙা লইয়া ঝরণা হইতে জল আনিতে যায়। জল আনা হইলে, কাঠ সংগ্রহ করে। তাহার পর সুতা কাটিতে, কাপড় বুনিতে, মদ চোয়াইতে বা অন্যান্য গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ঘরটী ঝাট দিয়া পরিষ্কার করা, কুপুই রমণীর কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত নহে। ইহারা বড় অপরিষ্কার। যে ঘরে রাঁধে, সেই ঘরে শোয়। সম্মুখের ঘরে শূকর, মুরগী, তুষ ও ময়লায় পরিপূর্ণ থাকে। শয়ন ঘরের বাহিরের চালাখানী বসিবার ঘর। তাহার দুই পার্শ্বে বসিবার বা শুইবার জন্য দুইটা মাচা থাকে। মাঠে কাজ না থাকিলে, পুরুষেরা মদ খায় ও গল্প করে। বাড়ীর পার্শ্বে ইহারা আত্মীয় স্বজনের কবর্ দেয়। সেই কবরের উপর বসিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় ইহারা গল্প করে। গল্পের সময় এত চিৎকার করে যে, ঝগড়া হইতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। তামাক ইহাদের প্রধান নেশা। তামাক খাইতে এত জোরে টান মারে যে, হুঁকার সব জল টুকু মুখের ভিতর আশ্রয় লয়।

ইহারা পঞ্চায়ৎ দ্বারা সকল মোকর্দ্দমার মিমাংসা করে। বিবাহিত ব্যক্তি চুরী করিলে বড় শাস্তি পায়। কিন্তু অবিবাহিত লোকে মাঠ হইতে ধান চুরী করিলে, কোন সাজা হয় না। অবিবাহিত লোকের অনেক অপরাধ ক্ষমা করা হয়। অবিবাহিত যুবক যুবতীরা বাড়ীতে নিদ্রা যায় না। গ্রামের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ঘরে, গ্রামের সকল যুবক, ও আর একটা ঘরে সকল যুবতী রাত্রিকালে একত্রে থাকে। একটা ঘরে না কুলাইলে দুই তিনটাতে থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠ এই ঘরের কর্ত্তা। তাহার হুকুম সকলকে মানিতে হয়। যুবক ও যুবতীদিগের মধ্যে নৃত্যগীত যথেষ্ট চলে। কিন্তু ব্যভিচার হয় না। কুপুইরা চারি-গোত্রে বিভক্ত। আপন গোত্রে বিবাহ হয় না। একত্র আমোদ আহ্লাদে যুবক যুবতীর প্রণয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু বিবাহকালে কর্ত্তৃপক্ষ আপন পছন্দ মত বিবাহ দিয়া থাকে। এক একটী বধূর মূল্য সাতটী মহিষ, দুখানি দা, দুখানি কোদালি, দুখানি বর্শা, দুছড়া কড়ির মালা, দুটী কান ফুল, দুখানী কাপড়, দুখানী থালা এবং কিছু যৌতুক। দরিদ্র লোকে ইহা অপেক্ষা অল্প দেয়। কিন্তু যে পুরা মূল্য দিতে পারে, তার বড় গৌরব হয়। আর কিছু দেওয়া হোক বা না হোক, যৌতুক না দিলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। এদেশে যৌতুকের নাম "মিলক"। বিবাহ মনোমত না হইলেও ব্যভিচার

ক্বচিৎ ঘটে। কখন কখন যুবক যুবতী মনোমতকে লইয়া, কোন বন্ধুর গৃহে পলায়ন করে। কিছু ধমক ধামকের পর, সব গোল মিটিয়া যায়। ব্যভিচারীর প্রাণদণ্ড হয়।" ব্যভিচারী প্রাণ ভয়ে প্রায়ই পলায়ন করে, তখন অত্যাচারিত স্বামী তাহার গৃহসম্পত্তি লুণ্ঠন বা ধ্বংস করে। ব্যভিচারিণীর আত্মীয় স্বজন বিবাহপ্রদত্ত মূল্য ফিরাইয়া দিতে এবং তাহার দেনা শোধ করিতে বাধ্য। স্ত্রীর বা পুত্র কন্যার মৃত্যু হইলে, শ্বশুর-বংশের ক্ষতি পূরণার্থ স্বামীকে অস্থি মূল্য বলিয়া "মুণ্ডু" দিতে হয়। "মুণ্ডু" একটী মহিষের দাম। বিসূচিকা, বসন্ত ও বাত রোগে মৃত্যু হইলে এবং শত্রুহস্তে বা কোন পশু কর্তৃক হত হইলে, "মুণ্ডু" দিতে হয় না। প্রসবকালে মৃত্যু হইলে জীবিত সন্তানকে প্রসূতির সহিত কবর দিতে হয়। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে দেবর গ্রহণ করে। স্বামীর বংশে কোন পুরুষ থাকিতে রমণী পিতৃ গৃহে ফিরিতে পায় না। ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। প্রথম পুত্রের জন্মোপলক্ষে নৃত্যগীতের ঘটা পড়িয়া যায়। ঢোল ভিন্ন ইহাদের অন্য বাজনা নাই। ইহারা বড় প্রফুল্ল প্রকৃতি। গান মুখে লাগিয়াই আছে; যখন যে কাজে থাকুক, গান চলিয়াছেই। কাজের ব্যস্ততা যত অধিক হয়, গানের হাউ হাউ রব তত উচ্চ হইতে থাকে। ইহাদের রমণীরা পূর্ণবসনা, কিন্তু পুরুষ দিগের কোমরে কেবল একটু কাপড় জড়ান থাকে, তাহার একাগ্র সম্মুখ ভাগে একটু ঝুলিয়া থাকে। ইহারা বড় অলঙ্কার-প্রিয়। কুমারীরা স্ফটিকমালা ও কাঁশার গহনায় সর্ব্বদা সজ্জিত থাকে। উৎসবের সময় পুরুষেরা গলায় রাঙ্গা পাথরের মালা পরে। এই মালা বংশানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত হয়। পুরুষেরা খুব ছোট করিয়া চুল ছাটে, যার চুল যত দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার তত গৌরব।

বড় মানুষের মৃত্যু হইলে, মহিষ মারিয়া আত্মীয় স্বজনকে ভোজন করাইতে হয়। গরিবে ছাগল বা শূকর মারিয়া শ্রাদ্ধ করে। ইহারা মৃতদেহ কবর দেয়। জামাতা বা আত্মীয় স্বজন দিগকে কবর খনন করিতে হয়। যাহারা এই কার্য্য করে, মৃতের উৎকৃষ্ট অস্ত্র (দা ও বর্শা) তাহাদিগকে দিতে হয়। মৃতদেহের সহিত একখানি কোদালি ও কিছু অস্ত্র শস্ত্র কবরে দিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে নানাপ্রকার পর্ব্ব আছে। অগ্রহায়ণ মাসে ইহাদের বড় দিন। সকলে নূতন পোষাক পরে এবং নৃত্য গীত ও পান ভোজনে পাঁচ দিন আনন্দে অতিবাহিত করে। এই সময়ে গ্রামের চারি দিকে দুর্গের ন্যায়, যে গড় থাকে তাহার মেরামত করা হয় এবং এই সময়ে দুই প্রহর রাত্রিতে একজন গ্রামের সিংহদ্বারে যাইয়া দৈব পরীক্ষা করে। যদি কাঠ টানিবার শব্দ শুনা যায়, বুঝিতে হইবে নূতন বৎসরে বাঘে বড় দৌরাত্ম্য করিবে; যদি পাত্তা করিবার শব্দ পাওয়া যায়, বুঝিও মড়ক হইবার সম্ভাবনা। পৌষ মাসে বিঙ্গনৈ পর্ব্ব, ইহা তিন দিন ব্যাপী। ইহারা এইদিন স্ত্রী পুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক হয়। প্রত্যেকে আপন আপন জল আনে, আপন আপন রন্ধন করে এবং স্বতন্ত্র ভাবে ভোজন করে। একটী কদলিতে মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, গাছে ঝুলাইয়া দিয়া তীর, বর্শা ও লাঠি আঘাত করিতে হয়। মাথায় আঘাত করিতে

পারিলে বুঝা যায়, হননকারী নববৎসরে একজন শত্রু বিনাশ করিবে; উদরে আঘাত করিলে, অপর্যাপ্ত আহার্য্য মিলিবার সম্ভাবনা। এই সময়ে পিতৃলোকের কবরে মদ্যাদি পানীয় সিঞ্চন করিতে হয়।

পীড়া হইলে কুপুইরা ঔষধ সেবন করে না। দেবতার নিগ্রহে পীড়ার উৎপত্তি। শরীরে ঔষধ দিয়া শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? এজন্য ওঝা ডাকাইয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে হয়। দেবতার কোপশান্তি সহজ নহে। স্বস্ত্যয়নে ও পুরোহিত সেবায় কাহাকে কাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে বিক্রয় করিয়া, পুরোহিতের আদেশ প্রতিপালন করিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং কুপুইর পীড়া হইলে আশু আরোগ্য বা আশুমৃত্যু একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কুপুইরা নানাবিধ দেবতায় বিশ্বাস করে। প্রত্যেক অগম্য বন, জঙ্গল, পর্ব্বতশৃঙ্গ ও গিরিগুহায় একএকটী দেবতা বাস করে। ছাগ, কুক্কুট ডিম্ব, আর্দ্রক, কার্পাস বা পল্লব পত্র উপহার দিয়া দেবতার মনোরঞ্জন করিতে হয়। ইহারা জাতি ভেদ মানে না, এবং ছাগ, কুক্কুট, শূকর, গাভী সকলই আহার করে। কিন্তু দুগ্ধ পান করে না। দুগ্ধ ইহাদিগের অখাদ্য।

কুকী।—পৈ, সুতী, তাউতী, লুসাই প্রভৃতি জাতীর সংখ্যা অতি অল্প। কুকী বা খোঙ্গাইরা সংখ্যায় অনেক। কুকীরা বলে, তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পাতালে বাস করিত। একদিন তাহাদিগের রাজার ভ্রাতা বনে সজারু শীকার করিতেছিল। একটী সজারুর পশ্চাতে ছুটিয়া তাঁহার কুকুর একটি গহ্বরে প্রবেশ করে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, কুকুরের সন্ধান না পাইয়া, তিনি তাহার অনুসরণ করেন, এবং দৈবক্রমে ভূপৃষ্ঠে উপস্থিত হন। প্রত্যাগত হইয়া, তিনি রাজাকে এই সকল কথা বিদিত করেন এবং দলে বলে নূতন রাজ্যে উঠিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ মত রাজা প্রজাদিগকে লইয়া মহাপ্রস্থান অবলম্বন করেন। ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহারা দেখিল, এক বিশালকায় বাসুকী তাহাদের পথ অবরোধ করিয়া শুইয়া আছে এবং সুড়ঙ্গের বহির্মুখে এক বৃহৎ পক্ষী নখপুটে এক বৃহৎ উপলখণ্ড ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। রাজার ভ্রাতা সর্পকে হত্যা করিলে, প্রজাদিগের অনেকে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। এই সময় রাজার স্মরণ হইল যে, কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান পদার্থ তিনি ছাড়িয়া আসিয়াছেন। সে গুলি আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, পক্ষী নখপুটে লম্বমান উপলখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাজদম্পতি বাহির হইতে পারিল না। রাজমহিষী ভাবিয়াছিলেন, দেবর আপনি রাজা হইবার লোভে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, এজন্য তিনি তাহাকে অভিসম্পাত করেন। সেই পাপে কুকীরা রোগ যন্ত্রনা অদ্যাবধি সহ্য করে এবং রাজমহিষীর পূজা দিয়া যন্ত্রণার উপশম করিতে চেষ্টা পায়।

কুকীরা এখন যেখানে বাস করিতেছে, পূর্ব্বে কুপুইরা সেখানে বাস করিত। কুকীরা নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে, যথা;—থুমুঙ্গুম, চাংসেল, থাডো, ধিংসোল, চোংলী, হাংকিন, কিপগেন, হাংকিপ, চোংকুট, ভেকলোক, হোলটাং বাৰ্ড্ং, ফুটুং ইত্যাদী। কুকীগ্রাম নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, কিন্তু এক

এক গ্রামের অধিবাসী কয়েকঘর মাত্র। ইহারা পূর্ব্বে একস্থানে স্থির হইয়া বাস করিত, এখন নানা কারণে নানাস্থানে, বেদিয়া ব্যাধের মত ঘুরিয়া বেড়ায়, এজন্য তাহাদের গৃহ কুপুইদের মত বৃহৎ বা দৃঢ় নহে। ইহারা অনাবৃত ক্ষেত্রে বাস করিতে ভালবাসে না। বাঁশের দরমার বেড়া দিয়া এবং বাঁশের মাচা প্রস্তত করিয়া, তাহার উপর চাল তুলিয়া দিলেই একখানি ঘর হইল। কেবল রাজার বাড়ী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এবং তাহার সম্মুখে একখণ্ড নির্বৃক্ষ ক্ষেত্র অবস্থিত থাকে। সকলেরই বাড়ীর চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে।

কুকী-রাজার ক্ষমতা সামান্য নহে বা অন্য অসভ্য রাজার ন্যায়, তিনি নাম মাত্র রাজা নহেন। প্রত্যেক গৃহস্থ বৎসরে তাঁহাকে এক সলি ধান্য দেয় এবং কোন কোন গ্রাম হইতে, তাঁহাকে শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি কর স্বরূপ দিতে হয়। বিবাহ করিতে বা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে, রাজাকে ট্যাক্স দিতে হয়; এতদ্ভিন্ন মৃগয়ালব্ধ সম্পত্তির রাজা এক অংশীদার। রাজার চাস-বাস,গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে প্রজাদিগকে নিয়মমত বেগার দিতে হয়।

আমাদের মত কুকীদিগের চূড়াকরণ ও বিবাহের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পুত্র পাঁচ দিন পরে, ও কন্যা জন্মের তিন দিন পরে, তাহার নামকরণ কর্ণবেধ ও মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। বিবাহ স্থির হইলে, উভয়পক্ষে একত্র সুরাপান করিয়া পত্র করিতে হয়। এবং কন্যার পিতাকে যৌতুক দিতে হয়। যৌতুকের পণ স্থির হইলে আত্মীয় স্বজন কন্যাকে লইয়া পাত্রের গ্রামে উপস্থিত হয়। পাত্রের আত্মীয় স্বজনের সহিত কন্যার আত্মীয় স্বজনের একটা আপোষলড়াই হইয়া থাকে। তাহার পর কন্যা কিছু খাদ্য দ্রব্য লইয়া স্বামী গৃহে উপস্থিত হয়। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, অন্যান্য পুত্রদিগকে পিতা রাজ্যের কিয়দংশ ভাগ করিয়া দেন। স্ত্রীলোক কখন সিংহাসনে বসিতে পারে না। তাই বলিয়া, কুকীরাজ্যে নারীজাতির আধিপত্য সামান্য নহে। সাধারণত রাজমহিষী রাজকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে এবং পুত্রের নাবালক অবস্থায়, তাহার বিধবা মাতাকে তত্ত্বাবধারণ করিতে দেখা যায়।

কুকীরা ক্ষুদ্রকায়, বলিষ্ঠ ও শিরাল। পা দুখানি ছোট ছোট কিন্তু হাত দুখানি দীর্ঘতর। বর্ণ বাঙ্গালীদিগের মত। মুখ ঘোরাল, দীর্ঘে প্রস্থে সমান, চিবুক উচ্চ, চোখ ছোট ও নাক চাপা। কুকীরমণী নাগা বা কুপুনি রমণীর মত স্থূলকায় ও কর্ম্মিষ্ঠা। কুকী পুরুষেরা নাগা পুরুষদিগের মত অলস প্রকৃতি, তবে নাগারা অলসতর। কুকী পুরুষ, রমণী, বালক, সকলেই বড় তামাকুপ্রিয়। মাচায় বসিয়া, তামাক খাইতে ও গল্প করিতে পুরুষদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। সর্ব্বদাই ইহাদিগকে তামাকু সেবন করিতে দেখা যায়। কত ছিলিম তামাক খাইয়াছে, গণনা করিয়া ইহারা সময় নিরূপণ করে। ইহারা হুঁকার জল ফেলিয়া দেয় না, বাঁশের চোঙ্গায় রাখিয়া দেয় এবং মধ্যে মধ্যে কুল্লি করে এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, অর্ঘ্য স্বরূপ তাহাকেও উহার কিঞ্চিৎ উপহার দেয়। ধূমপান ভিন্ন, ইহারা তামাকু চর্ব্বণ করিয়া থাকে।

কুকীরা বড় অপরিষ্কার, বেশভূষা প্রায় নাগাদের মত। তবে কৌপীন ছাড়িয়া একটী কাপড় গায় জড়াইয়া থাকিতে ইহারা ভালবাসে এবং সাধারণত ঐরূপ করিয়া থাকে। কুকীরমণীরা কোমরে একখান ছোট কাপড় জড়াইয়া রাখে, যুবতীরা বুকেও একখান জড়াইয়া থাকে। ইহাদের কেশরাশী ইহারা সম্মুখে খোপা বাঁধিয়া রাখে। আচার, ব্যবহার ও চিকিৎসাব্যবস্থা কুকী ও নাগাদিগের প্রায় একরূপ। নাগাদিগের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও মুণ্ডু দিবার নিয়ম আছে। ইহারা মুণ্ডুকে লংমূল বলে। নাগাদিগকে কুকীদের অপেক্ষা প্রফুল্লতর বোধ হয়। নৃত্য বিদ্যায় নাগা, ও সঙ্গীতে কুকীরা শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধের নিম্নেই কুকীরা মৃগয়াকে পুরুষোচিত কর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যান করে। শীকারে ইহাদের বড় আমোদ। বিষাক্ত তীর সংযোগে ইহারা ব্যাঘ্র হরিণাদি শীকার করে। বংশখণ্ডে বৃক্ষ বল্কলের ছিলা দিয়া, ইহারা ধনুক নির্ম্মাণ করে। তীর গুলি একহাত লম্বা। অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহারা ছিলাটীকে "আকর্ণ" আকর্ষণ করেনা, "আবক্ষ" করিয়া থাকে। সুতরাং তীরের বেগ অধিক হয় না। বেগের হ্রস্বতা, ইহারা তীরাগ্রস্থ বিষের তীব্রতায় পূর্ণ করে। বনমধ্যে মৃগের পদ-চিহ্ন অনুসরণে ইহাদিগের অদ্ভুত ক্ষমতা এবং এমন নিঃশব্দে গতায়াত করিতে পারে যে, ব্যাঘ্র, বিড়ালেরও বিস্ময়কর। হস্তী মারিতে ইহারা বিষাক্ত বর্শা ব্যবহার করে। আজকাল বন্দুক ব্যবহার করিতেও শিখিয়াছে। কোন জন্তু বধ করিলে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিয়া, তবে আত্মসাৎ করে এবং সমাজ দরবারে উপাধি পায়। ইহাদিগের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নাগাদিগের মত। রাজা কি অন্য কোন বড় লোকের মৃত্যু হইলে, ইহারা তাহার মৃতদেহ আগুনে ভাজিয়া, দু এক মাস ঘরে রাখিয়া, তাহার পর কবরসাৎ করে। এই সময় মধ্যে বিস্তর মিথুন, গাভী, মহিষ, ঘোটক শূকর, ছাগ ও কুকুরেরও শ্রাদ্ধ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে তৃপ্ত করিতে হয়। হত জন্তুর মাথা গুলি মৃতদেহের নিকট জমা করিয়া দেয়। মৃত ব্যক্তি সে গুলি পরলোকে ব্যবহার করে। ইহারা বসন্ত রোগকে বড় ভয় করে। কাহারও বসন্ত হইলে, ইহারা তাহাকে কিছু আহার্য্য ও পানীয় দিয়া বনের মধ্যে ফেলিয়া আসে। কুকীদিগের মধ্যে বংশমর্য্যাদার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমরা হীনতর জাতীকে হুঁকা দেই না, ইহারা চিরুণী দেয় না। হিন্দুদিগের কে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, কপালে টীকা দেখিয়া অনুমান করা যায়, কুকীদিগের মধ্যে খোপার অবস্থান দেখিয়া সম্প্রদায় নির্ণয় করিতে হয়। মুরিঙ্গ সম্প্রদায় শৃঙ্গের মত করিয়া চুল বাঁধে। মণিপুরের সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা শিঙ্গের মত করিয়া মাথার পাগ বাঁধে। রাজদরবারে দেখিয়াছি, উড়িষ্যার রাজারা রাজবেশ করিবার সময় কাপড় দিয়া লাঙ্গুল প্রস্তুত করে। যাহার লাঙ্গুল যত দীর্ঘ, সে তত সম্ভ্রান্ত। মণিপুরী মুরিঙ্গ জাতীর মধ্যে পাকা প্রাচীর, কি চুনদেওয়া সদর, বড় সম্ভ্রান্তের চিহ্ন। কারণ অন্তত ছয়টা মিথুন মারিয়া আত্মীয় স্বজনকে ভোজন করাইতে না পারিলে, এমন মহৎ কার্য্যের কেহ অধিকারী হয় না। টাবুল পুরুষের কৌপীনের সম্মুখ ভাগে একটা হাতীদাঁতের

ল্যাঙটী বাঁধা না থাকিলে, সে উলঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। লুহুপা জাতী অসমসাহসী ও বড় বিবাদপ্রিয়। ইহারা স্ত্রীপুত্রহত্যা, পুরুষহত্যা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক মনে করে। রাগ চড়িলে ইহারা শত্রুকে যেখানে পায় হত্যা করে। কিন্তু সাধারণত একটা স্থান আপোষে ঠিক করিয়া রাখে। সে স্থান ভিন্ন অন্যত্র শত্রু হত্যা নিন্দাজনক। টাঙ্কুল জাতী ঢাল, বর্শা ও তীর, ধনুক ব্যবহার করে। কিন্তু লুহুপাদের ঢাল ও বর্শা ভিন্ন অস্ত্র নাই। এই অস্ত্রদ্বয়ে নির্ভর করিয়া ইহারা টাঙ্কুলদিগকে পদানত করিয়াছে। ব্রহ্মবাসীরা লুহুপাদিগকে বর্গীর ন্যায় ভয় করে। ইহারা মস্তক ক্ষৌর করিয়া সম্মুখ ভাগে একটী শিখা রাখিয়া দেয়। ইহারা যে সকল স্ত্রীহত্যা করে, তাহাদের কেশ বিনাইয়া যুদ্ধকালে পাগড়ী বাঁধে। লুহুপার বিবাহ হইলে, তাহার পিতা মাতা, প্রাচীন গৃহ পুত্র ও পুত্রবধূকে দান করিয়া, স্থানান্তরে যাইয়া নূতন গৃহ বাঁধে। আবার আর একটী ছেলের বিবাহ হয়, সে গৃহও তাহাকে দিয়া আবার অন্য আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে হয়। মৃগয়াহত পশু পক্ষী, মৎস্যের মুণ্ডে ইহারা গৃহ সজ্জিত করে। যে গৃহে নরমুণ্ড নাই, সে গৃহের শোভাই হয় না। ইহাদেরও পুরুষেরা কৌপীনের সম্মুখে হাতীদাঁতের অঙ্গুরী রাখে এবং রমণীরা উল্কী পরে। ইহারা গোলামী করিতে ঘৃণা করে। অর্থ দ্বারা পুত্রদিগকে দাসত্বমুক্ত করিতে সক্ষম না হইলে, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া যায়। লুহুপারমণীকে অপমান করিতে কেহ সাহস করে না। কারণ নৃশংস লুহুপার হস্তে অপরাধকারীর নির্ব্বংশ হইবার সম্ভাবনা আছে।

ময়াম জাতীয় যুবক ও যুবতীরা অন্যান্য অসভ্য জাতীর ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহে শয়ন করে। বিবাহিত পুরুষেরাও অবিবাহিতদিগের সহিত এক মণ্ডপে রাত্রি কাটায়। লুহুপা ও মুরামদিগের মধ্যে চৌর্য্যাপবাদ নিন্দনীয় নহে। চোরামাল ধরা পড়িলে, অধিস্বামী ফিরিয়া পায়, কিন্তু কাহাকেও চোর বলিয়া অপবাদ দেওয়া প্রাণান্তকর হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে দুই জন রাজা যুগপৎ রাজ্য করে। কুপুইসমাজের ন্যায় মুরামদিগের মধ্যে পুরোহিতের একাধিপত্য নাই। কাহারও পীড়া হইলে, ইহারা ঠাকুরপূজা করে বা কাঙ্গালী ভোজন করায়।

আঙ্গামী নাগারা বড় নৃশংস ও কলহপ্রিয়। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারে ইহারা সদাই ব্যস্ত। ইহাদের মধ্যে কোন রাজা নাই। আবশ্যকমত ইহারা একজনকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া থাকে। কিন্তু মোক্তার মুখপাত্র মাত্র, তাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। আঙ্গামীরা ব্যবসা বাণিজ্যেও সুদক্ষ, ব্যবসায় উপলক্ষে ইহারা কাছাড়, আসাম, শ্রীহট্ট, ঢাকা ও কলিকাতা পর্য্যন্ত গতায়াত করে। ইহারা হাতীদাঁত ও মোম বিক্রয় করিয়া লবণ, বাসন, কড়ি ও বারুদ প্রভৃতি ক্রয় করে। ইহারা বন্দুক ব্যবহার করে। ইহারা মাথার পশ্চাৎ ভাগে দড়ি দিয়া খোপা বাঁধে।

এই সকল বন্যজাতী মহিষ, গাভী, মিথুন, ছাগল, শূকর, বিড়াল, কুকুর, মুরগী পোষে। লুহুপা কুকুর বিখ্যাত। ইহারা কুকুর খায়। খোঙ্গায়েরা ব্যাঘ্র, ভেক ও টিকটিকী পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

দুই চারিটী প্রাণের কথা।

ছোট মুখে বড় কথা বলিতে গেলে, লোকের নিকট বড় প্রীতিকর বোধ হয় না বটে; কিন্তু হৃদয়ের উত্তেজনায় সময়ে সময়ে না বলিয়াও থাকা যায় না। বিশেষত লোকের চিন্তার স্রোত যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া কোন কথা বলা বড়ই দুঃসাহসের কার্য্য। এইরূপ স্থলে লোকের বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠিতে হয়। কিন্তু তাহা ভাবিয়া কে কর্ত্তব্য ভুলিতে পারে? ঈশ্বর অনন্ত,—অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত ভাব হইতে চিরবঞ্চিত সসীম মানুষ কেমনে ঈশ্বরের কথা বলিবে? বলিতে পারে না, তবুও বলে। অনন্ত বুঝে না, মানুষ তবুও অনন্তের গানই গায়। কেন গায়, কেন বলে, তাহার উত্তর সকল সময়ে পাওয়া যায় না। না গাইয়া পারে না, না বলিয়া পারে না, তাই গায়, তাই বলে। সমাজ এক গম্ভীর অতলস্পর্শ সমুদ্র বিশেষ, অনন্তকাল ধরিয়া ইহার রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিলেও কাহারও সাধ্য নাই যে, সমাজ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া শেষ করিবে। কেহ পারে নাই, কেহ পারিবে না। আমরাও পারিব না, বুঝি, তবুও যাহা ভাবি, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিনা। হৃদয়ের উত্তেজনার হাত এড়ান বড়ই কঠিন।

আর্য্যভূমি ধর্ম্ম ভাবে চিরদিনই মাতোয়ারা। এত প্রেমভক্তিও কোন দেশে নাই, এত চিন্তাও কোথাও নাই। অন্য কোন কথা বলিব না, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতে যে সকল গভীর চিন্তার কথা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম উদ্ভেদ করিতে এখনও বহুশতাব্দী লাগিবে। চিন্তা সম্বন্ধে আর্য্যভূমির সমকক্ষ কোন দেশ আজও হয় নাই। মহান্ ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞানে তেত্রিশকোটী দেবতা বিভিন্নাবয়বে এই আর্য্যভূমিতেই পূজিত। অদ্বৈতবাদ এই ভূখণ্ডেই এক দিন রাজত্ব করিয়াছে। ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও মানবের ক্ষুদ্রত্ব;—আত্মা ও পরমাত্মার দ্বৈতভাব মূলক গভীর রহস্য ভারতেই একদিন মীমাংসিত হইয়াছিল। যোগ বল, তপস্যা বল, ব্রত বল আর অনুষ্ঠান বল, ভক্তি বল আর প্রেম বল, এ সকলেরই চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এই পুণ্যধাম আর্য্যাবর্ত্তে। কিন্তু কি ছিল, কি হইয়াছে। এক হিন্দুধর্ম্মে আজ কত সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। সেই সকল সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কতই বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে! কত ঘৃণা বিদ্বেষের রাজত্ব লীলা করিতেছে! অজ্ঞানমূলক মতবাদ কতই প্রশ্রয় পাইতেছে! ধর্ম্ম চিরকাল একই রূপ রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের দোষে, দেখ, কতই অনর্থ ঘটিতেছে! পাত্রের দোষে স্বর্গীয় ভাব সকল মলিন হইয়া যাইতেছে! মানবের যোগ্যতার অভাবে ভারতে ধর্ম্মের অপরাজিত দেবভাব চিরকাল একভাবে থাকিতে পারে নাই, তাহারই অভাবে আজও বিপর্য্যয়ের উপর বিপর্য্যয় চলিতেছে। পরিবর্ত্তন উন্নতির চিরলক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু উন্নতির পরে অবনতি, অবনতির পরে আবার উন্নতি, আবার অবনতি, এই প্রকার পরিবর্ত্তন কখনই উন্নতির লক্ষণ হইতে পারে না। ভারতে কিন্তু তাহাই হইয়া আসিতেছে। একবার

ভারত জাগিতেছে, আবার ডুবিতেছে। আবার জাগিতেছে, আবার ডুবিতেছে। এত উন্নতিও কোন দেশে হয় নাই; এত অবনতিও কোন দেশে হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ—(Harmonious development of all the faculties) এখানে মানবের সমস্ত শক্তির সমগ্রসীভূত উন্নতি কখনও হয় নাই। কেবল হয় নাই, তাহা নহে; সমগ্রসীভূত উন্নতির চেষ্টা করাও হয় নাই। কোথাও জ্ঞান, কোথাও প্রেম, কোথাও বুদ্ধি, কোথাও বিবেক চিরকাল বিচ্ছিন্ন ভাবে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে, একস্থানে এক সময়ে সকল মিলিয়া কখনই রাজত্ব করে নাই। ইহার ফল ভারতে এই হইয়াছে,—প্রেমিক জ্ঞানীকে চিরকাল ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, জ্ঞানী প্রেমিককে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ করিয়াই সময় কাটিয়া গিয়াছে। মত লইয়া ঝগড়া বিবাদ, মারামারী কাটাকাটী ধর্ম্ম-প্রধান ভারতে কত হইয়া গিয়াছে, কে গণনা করিয়া বলিতে পারে? মানুষ, মানুষের ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়া শোণিত-পিপাসা চরিতার্থ করিতে একটুও সঙ্কুচিত হয় নাই। একতা, আর্য্যভূমির কল্পনার জিনিস। বিবাদ বিসম্বাদের যে অভিনয় ভারিতে দেখা যায়, অন্য দেশেও তাহারই প্রতিকৃতি। আদি সময় হইতে ধর্ম্ম জগতের যে বিশদৃশচিত্র দেখিতে পাই, আজও তাহা সমতা লাভ করিল না। কখনও করিবে কি না, কে জানে? যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই সম্প্রদায় হইয়াছে। মত বজায় রাখিতে যাইয়া, মানুষ, চিরকাল ঘৃণা বিদ্বেষের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। বুদ্ধের সাম্যবাদ বৈষম্যবাদে পরিণত হইয়াছে, চৈতন্যের অলৌকিক প্রেমতত্ত্ব রূপান্তরিত হইয়া মলিন হইয়া গিয়াছে—খ্রীষ্টের স্বর্গীয় ভ্রাতৃত্ববাদ পশুত্ববাদে পরিণত হইয়া আকাশের নীলিমায় মিলিয়া গিয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম-জগতের চিত্রে যে মলিন অমঙ্গলের চিহ্ন, সমস্ত পৃথিবীময় তাহারই ছায়া। ধর্ম্মভাবের তারতম্যানুসারে সেচিত্র অন্যত্র আরো মসীময়। জগতের আর আশা কোথায়? পরস্পরের ভাল ভাব উপার্জ্জন করিয়া, পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া, মানুষ কখনই এক পরিবার ভুক্ত হইতে পারিল না।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার ধর্ম্ম জগতের এই গভীর দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া ইহার মূল কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, সমগ্রসীভূত উন্নতি লাভ না করিলে আর মানুষের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, একতার আশা নাই। কিন্তু সমগ্রসীভূত উন্নতি লাভ করার অপেক্ষা কঠিন কাজ আর কিছুই নাই। জ্ঞান, প্রেম, বুদ্ধি আর বিবেক, এসকলেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। জ্ঞান আর প্রেম, শিক্ষা আর ভাব, শুষ্কত্ব আর সরসত্ব, ন্যায় আর পুণ্য, এ সকল পাশাপাশী থাকিবে। কোন দিকে টলিলেই বিপদ। এই গভীর সত্য সাধনায় যখন মানুষ জয়ী হয়, তখন আর ঘৃণা বিদ্বেষ কিছুই থাকে না। তখন মানুষ দেখে, জ্ঞানীও পূজ্য, প্রেমিকও পূজ্য, ন্যায়বানও পূজ্য, পুণ্যবানও পূজ্য। বৈষম্যের অনাদর ঘুচিয়া যায়, পরস্পরের মহিমা পরস্পরে বুঝিতে পারে। বিধাতার সৃষ্টির অলৌকিকত্ব হৃদ-বোধ হয়। হয় বটে, কিন্তু মানুষ কি সহজে এই সাধনায় জয়ী হইতে পারে? বিধাতার সৃষ্টি

যে বৈচিত্র্যপূর্ণ, সে কেবল এই জন্য যে, মানুষ এই কঠোর সাধনার সময়ে পরস্পরের সাহায্য পাইবে। জ্ঞানী, প্রেমিককে ধরিবেন; প্রেমিক, জ্ঞানীকে ধরিবেন। শিক্ষার শুষ্কত্বে ভাব-কোমলত্ব দিবেন, এক জন; আর কোমলত্বে শুষ্কত্ব দিবেন আর একজন। এ বিধানের ভিতরে কেমন আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম সত্য নিহিত। জ্ঞান অভাবে প্রেম চিরস্থায়ী হয় না—বিশ্ব বিস্তৃতি পায় না। প্রেম অভাবেও জ্ঞান লাভ অসম্ভব। দুই পাশাপাশী না থাকিলেই বিপদ। গোলাপের সৌন্দর্য্যে যে মুগ্ধ না হয়, সে গোলাপতত্ত্বান্বেষণ করে না; আবার যে গোলাপের গুণ জানে না, সেও গোলাপকে ভালবাসে না। তোমার গুণ আমি যত জানিব, ততই ভালবাসিব; আবার যত তোমার নিকটস্থ হইব, ততই তোমার গুণ জানিব। জানা আর ধরা, ধরা আর জানা—এত নিকটের জিনিস যে, কোন্‌টী অগ্রে, কোনটী পশ্চাতে, তাহা বুঝাও কঠিন। এই প্রকার অন্যান্য সকলই কাছাকাছী, ঘেসা ঘেসি। একের ভিতরে অপর, অপরের ভিতরে এককে ডুবিতেই হইবে। কিন্তু মানুষ অহং-পূজক, সে ডুবিতে যায়, আবার ফেরে। গুপ্তসৌন্দর্য্যের টানে মানুষের নিকটবর্ত্তী হয়, আবার আপন ভাবে বিভোর হইয়া পশ্চাতে ধায়। ধরে আবার ছাড়ে। পায় আবার পরিত্যাগ করে। পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন, মানুষ, সংসারের কথাই বল আর আধ্যাত্মিক জগতের কথাই বল, কোন কিছুরই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু সে সাহায্য মানুষ লইবে না। আপনাকে লইয়াই মানুষ মজিবে। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য মানুষ বুঝিবে না; ব্রহ্মাণ্ডপতির ইঙ্গিত মানুষ শুনিবেনা। এই জন্যই প্রেমিক জ্ঞান না পাইয়া সঙ্কীর্ণ মত্ততাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেছেন, জ্ঞানীও প্রমাভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইতেছেন। উদারতা—বিশ্ববিস্তৃতভাব মানুষের হৃদয়ে আর স্থান পাইতেছে না। সমঞ্জসীভূত উন্নতি কেবল শুষ্ক মতেই থাকিয়া যাইতেছে। উন্নতির অভয় বাণী মরুভূমিতে পড়িয়া শুকাইয়া যাইতেছে। একতা, সাম্য, এসকল কবির কল্পনার বস্তু হইয়া উঠিতেছে।

আর্য্যভূমির বড় সৌভাগ্য যে, এখানে আবার পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রদায় থাকিবে না, ঘৃণা বিদ্বেষমূলক বিচ্ছেদ ঘুচিবে, সব নর নারী এক সার্ব্বভৌম প্রেমে বদ্ধ হইবে। শাস্ত্র তন্ত্র, বেদ পুরাণ, বাইবেল কোরাণ, সকল সত্য মিলিয়া একাকার হইবে। মানব সমাজের অর্জ্জিত অতীত সত্যমূলক কীর্ত্তিকলাপকে ভিত্তি করিয়া, অনন্ত কালের অনন্ত উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া অভিনব মানব-পরিবার সংগঠিত হইবে। অসাধ্য সাধিত হইবে, বহু একত্বে মিলিবে। কি মনোমোহন বংশিধ্বনিই আকাশে উঠিয়াছিল,—কি আশার বিজয় ভেরিই চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইয়াছিল। স্মরণ করিলেও প্রাণ শীতল হয়। বড় আশা ছিল, ব্রাহ্মসমাজে এক স্বর্গের চিত্র দেখিব। ব্রাহ্মধর্ম্ম—আর্য্য এবং অনার্য্য, পাপী এবং পুণ্যাত্মা, পৃথিবীর সকল সন্তানের সকল ভাব, সকল সত্য লইয়া। যাহা কিছু সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও এই ধর্ম্মের অবলম্বন, যাহা অনন্তকালে আবিষ্কৃত হইবে, তাহাও ইহারই অধিকৃত। কত উদার ভাব! কেবল মতে নহে, সত্য সত্যই আশা ছিল, পার্কারের সমঞ্জসীভূত উন্নতি সাধন

যতই কঠিন হউক না কেন, সোণার ভারতে সে সাধনা জয়লাভ করিবে। আশা ছিল, যাহা পৃথিবীতে হয় নাই, তাহাই এই আর্য্যভূমিতে এক সময়ে হইয়াছিল; আবারও হইবে। জগতে আর্য্যের নাম আবার উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু সত্য কথায় বলিতে গেলে, ইহাই বলিতে হইবে, মতে আজও "সমঞ্জসীভূত উন্নতি" অনেকেরই সম্বল বটে, কিন্তু জীবন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কি কুক্ষণে জানি না, ভারতের [illegible] মাটীতে অমৃত ফলিল না! আড়ম্বরময় জীবনে মতবাদেরই আদর বাড়িল, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্কুর জন্মিল না। সম্প্রদায় ভাঙ্গিবার জন্য যাহার সৃষ্টি, দেখিতে দেখিতে সে আর একটী নূতন সম্প্রদায়ের রূপ ধরিয়া বসিল। আবার অহং পূজা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। আবার ঘৃণা বিদ্বেষের আগুণ জ্বলিল। মতবাদ কখনও উন্নতিলাভ করে নাই, কখনও করিবে না।

নাম লইয়া গোলযোগ করাতেই নানা-প্রকার বিপদ ঘটিয়াছে। নামের পূজা করিতে যাইয়াই মানুষ বাহিরে মজিতেছে। আর্য্যধর্ম্মের পরিণতিই ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিন্দু-ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষই ব্রহ্মপূজা। হিন্দু-ধর্ম্ম উন্নতির অবস্থায় যাহা ছিল, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ভবিষ্যতে যাহা হইত, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যিনি যতই তর্ক বিতর্ক করুন না কেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন হিন্দুর আর উপাস্য দেবতা নাই *। পৃথিবী চিরকাল একভাবে থাকে না। উন্নতি লাভ করিতে হইবেই হইবে। আর্য্যধর্ম্ম একভাবে থাকে নাই, থাকিতেও পারে না। কালের ফেরে ইংরাজি শিক্ষা ভারতে বিস্তৃত হইতেছে; সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের আদর্শও উপরে উঠিতেছে। হিন্দুসমাজ সেই আদর্শ ধরিয়া ক্রমে অলক্ষিত ভাবে চলিতেছে। সত্য কথা বলিতে হইলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জাতিভেদের মূল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, পৌত্তলিকতার প্রতি লোকের গভীর অনাস্থা জন্মিয়াছে! ইহা সময়েরই ফল, না হইয়াই পারে না। কিন্তু অনাস্থা হইয়াছে বলিয়াই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ধর্ম্ম, জীবনের,—প্রাণের জিনিস। ধর্ম্মকে [illegible] জিনিস করিয়া দেখাইতে যাইয়া অনেকে ক্রমেই সীমাবদ্ধ ভাবে সরিতেছেন। সরিতে সরিতে এখন বড় সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। হিন্দুসমাজ আর সে আদর্শ ধরিতে পারিতেছে না। পারিতেছে না বলিয়া ঘৃণা কটাক্ষপাত করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজও নীরবে তাহা সহ্য করিতে পারিতেছে না। ক্ষমা নামে যে একটা দেবদুর্লভ কথা আছে, তাহা কাহারও জীবনে দেখা যায় না। বড়ই বিপদ উপস্থিত। ব্রাহ্ম কথাটা লইয়া একদিকে ঘৃণা চলিতেছে, একদিকে সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। কথা লইয়া মারামারী করিতে যাইয়া সকলেই আদর্শ চ্যুত হইতেছেন। বাস্তবিক ব্রাহ্ম কথাটা বড়ই আপত্তি-জনক। ব্রাহ্ম কথাটার অর্থ বড়ই গভীর। এত গভীর অর্থপূর্ণ কথা লইয়া নাড়াচাড়া না করিলেই ভাল ছিল। ব্রহ্মেতে জীবিত সকলেই—পৃথিবীর সকলেই ব্রহ্মকৃপার অধিকারী—সকলেই তাঁহার সন্তান, তাঁহার নিকট বড় ছোট ভেদাভেদ নাই, এ হিসাবে সকলেই ব্রাহ্ম। কিন্তু ব্রাহ্ম শব্দে এখানে তাহা বুঝায় নাই। ব্রহ্মগত-জীবনই ব্রাহ্মের লক্ষণ। বড়ই শক্ত কথা। সমঞ্জসীভূত

* ১২৯২ সালের মাঘ মাসের প্রচার দেখ।

উন্নতি—অনন্ত উন্নতি ভিন্ন ব্রহ্মগত জীবন হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বরকে আমি একটু জানিলাম, একটু ভাল বাসিলাম, তাহাতেই ত সমস্ত জানা হইল না। না জানিলে ধরিব কি? যাঁহাকে বুঝাই হইল না, ধরাই গেল না, তাঁহা-গত জীবন কেমনে হইবে? যদি বল, তাঁহাকে অবলম্বন না করিয়া মানুষ বাঁচিতেই পারে না। সে হিসাবে অংশত সকলেই ব্রাহ্ম। সকলে যাহা, তাহা লইয়াই কত বিষম অনর্থ ঘটিতেছে। এই নাম লইয়াই কত বড়াই করিতেছি। আমি ব্রাহ্ম, সুতরাং আমি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের অপেক্ষা উন্নত!! আমি ব্রাহ্ম, সুতরাং আমি পৌত্তলিক অপেক্ষা পবিত্র!! আমি ব্রাহ্ম, সুতরাং আমি পৃথিবীর মধ্যে সকলের বড়!! আমার জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, বিবেক নাই, তাতে কি, আমি ঈশ্বর-প্রেমিক—আমি ব্রাহ্ম, ঈশ্বরের কৃপা আমার একচেটিয়া সম্বল!! আমি কাহাকেও গণিব না, আমি অহং লইয়াই থাকিব। আমার এতই অহঙ্কার! তুমি কি ছাই বুঝ, আমার নিকট উহা হিজিবিজি মাথামুণ্ড। এই অহংজ্ঞানময় জীবন হইতে ব্রহ্ম-কৃপাকণা উড়িয়া গিয়াছে। যে আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইতে যায়, ধর্ম্ম জগতে তাহার পতন অনিবার্য্য। ব্রাহ্মজীবনে তাই কত হীনতা, কত নীচতা দেখিতে পাওয়া যায়! ব্রাহ্মসমাজ, দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে! একদল আর এক দলকে ঘৃণা করে, অপর দল আর এক দলের বিরুদ্ধে কত কথাই বলে। ঈশ্বর-প্রেমিকের ভাব দেখ! কোথায় ঈশ্বর-ভক্ত পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে একপ্রেমে বাঁধিবে, না নিজেরাই কাটা কাটী করিয়া মরিতেছে! জগৎ, ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে কত কালিমাময় নিরাশার চিত্র দেখিয়া ব্যথিত হইতেছেন! গালাগালির পরিবর্ত্তে গালাগালি, শত্রুতার পরিবর্ত্তে শত্রুতারই আদান প্রদান চলিতেছে। মায়ের সন্তান, মায়ের সন্তানের আদর বুঝিল না। মাতা যেরূপ অপরাজিত স্নেহে পাপীকে ক্ষমা করেন, ভাই, ভাইকে সেরূপ ক্ষমা করিতে পারিল না। আর্য্য, আর্য্যের সম্মান বুঝিল না। কোথায় বা প্রেম, কোথায় বা সাম্য, কোথায় বা একতা!! কোথায় বা জ্ঞান, প্রেম, বিবেক ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য!! এক ঈশ্বরের উপাসক, অথচ মত লইয়া কাটাকাটী মারামারী ক্রমাগতই চলিতেছে। এক ধর্ম্মে দীক্ষিত, অথচ পরস্পরকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেছি। তুমি হিন্দু, তুমি মুসলমান, তুমি খ্রীষ্টান, শরীরগত বা মতগত পার্থক্যে কি আসিয়া যায়, তোমরা আমাদের প্রাণের ভাই। কিন্তু আমরা আর তাহা জীবনে দেখাইতে পারিতেছি না। তোমরা আমাদিগকে ঘৃণা করিতেছ, আমরাও করিতেছি। মহত্ত্ব কোথায়? ক্ষমা কোথায়? ধর্ম্ম কোথায়? "সত্য জয় যুক্ত হইবেই" তোমাদিগকে একথা বলিতে আর সাহস হইতেছে না। সন্দেহ-মেঘ হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তোমার সত্য তুমি যখন বল, আমার তাহা সহ্য হয় না; আমার বিশেষ সত্য বলিবার সময় তোমার সহ্য হয় না। সত্যে বিশ্বাস থাকিলে এরূপ হয় না। সত্য সত্যই আমরা পরস্পরকে সকলেই দারুণ বিদ্বেষের কটাক্ষে দেখিতেছি। তোমরা ও আমরা একের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই। তোমাদের ভিতরে শিক্ষার জিনিস আছে, আমাদের

নিকটও অনেক আছে, আমরা আর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা—আমাদিকে চির-অন্ধ করিয়া ফেলিতেছে। আপন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর করিতে যাইয়া, আমরা অন্যের স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারিতেছি না। এমনই ইচ্ছা হয়, শক্তি থাকিলে বুঝি বা পরস্পরের মুখে বিষ তুলিয়া দিতাম। এমন সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে ধরিয়াছে! আমি এ সকল জঘন্যতা আর হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতেছি না। আমি বুঝিতেছি—যতদিন উদারতার রাজ্যে না পৌছিব, যত দিন জগতের সমস্ত ভাই ভগ্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বিশ্বেশ্বরের প্রদত্ত অমোঘ লুকায়িত সত্য তাঁহাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া পান করিয়া তাপিত হৃদয়কে শীতল না করিব,—যত দিন সকল ঘটে মাতার জলন্ত প্রত্যক্ষছবি না দেখিতে পাইব, ততদিন আমার পরিত্রাণ নাই। আর এই যে ব্রাহ্মসমাজ, এই সমাজ হইতে যত দিন সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া না যাইবে, —সকলের ভিতরে মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ ভাব দেখিয়া যতদিন ব্রাহ্মগণ জাতি-নির্ব্বিশেষে জগতের সকল সম্প্রদায়ের ভাই ভগ্নীদিগকে ক্ষমা করিয়া প্রাণের সহিত ভালবাসিতে না পারিবেন, ততদিন সমঞ্জসীভূত উন্নতি কল্পনাতেই বদ্ধ থাকিবে; ততদিন আর ইহার মঙ্গল নাই। 'ব্রাহ্ম' কথা ততদিন উপহাসের থাকিবে। তত দিন ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ছিন্ন ভিন্ন হইবে।

ব্রহ্মগত জীবন হইলে আর ঘৃণা বিদ্বেষ থাকে না। কাহাকে কে ঘৃণা করিবে? সকলেই মায়ের সন্তান। যাহাকে মা ক্ষমা করেন, সন্তান তাহাকে কি ঘৃণা করিবে! তুমি যাঁহার, আমিও তাঁহারই। মাতাই সকল ভাবে, সকল ছবিতে বিকশিত! এক রূপ জগন্ময়,একরূপ ব্রহ্মাণ্ডময়! সমস্ত বিশেষত্বের মধ্যেই একত্ব। জাতীয় ধর্ম্ম পৃথক হউক,—মানুষের আকারগত বা মতগত পার্থক্য থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আত্মায় আত্মায়, প্রাণে প্রাণের ঘনীভূত যোগ। একেই সকল স্থিতি করিতেছে। সকলেরই লক্ষ্য এক অনন্ত অপরাজিত স্নেহময় দেবতায়;—পৃথিবীতে সেই দেবতার পূর্ণ বিকাশ প্রেম। প্রেমই সুন্দর, প্রেমই মহান,—প্রেমেই জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি মজিয়া একীভূত। পরস্পরকে ক্ষমা কর, ভালবাস, আর হৃদয়ে হৃদয়ে ডুবিয়া যাও। বিশ্বেশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখ,—প্রেমতত্ত্ব জীবনগত কর। মরিবে কেন? ভুলিবে কেন? এস সকলে প্রাণে প্রাণে মিলি। এস সকলে এক হই। বিদ্বেষ পরিহার করি—সংসার-কূটবুদ্ধি ছাড়ি। মাকে ডাকি, আর মায়ে মজি। মায়ে মজি আর মায়ের ন্যায় সকলকে ক্ষমা করি। ক্ষমা করি আর ভালবাসি। হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব, খ্রীষ্টানত্ব, বৌদ্ধত্ব,—সকলত্ব না মিলিলে আর রক্ষা নাই। পবিত্র যোগী হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, উদ্যমশীল মুসলমানের শক্তিবাদের জাগ্রত জীবন্তভাব, আর বিনয়ী খ্রীষ্টানের দয়া ও ক্ষমা, এবং বৌদ্ধের সংসার অনাসক্তি বা নির্ব্বাণ ভিন্ন জগতের কল্যাণ হইবে না। আপনাকে না ভুলিলে আর রক্ষা নাই। ভাই ইতিহাস পড়, সময়ের ভাব বুঝ—তারপর এই কঠোর সাধনায় রত হও। আর্য্যভূমিকে ধর্ম্মে মাতাও—নচেৎ আর আর্য্যভূমি টিকে না। কঠোর সাধনায় ডুবিয়া যাও। যশ, মান ভুলিয়া, বাহিরের আড়ম্বর ভুলিয়া জীবনে

জীবন্ত দেবতাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর। নচেৎ তোমার আমার অন্তঃসার শূন্য কথা কে শুনিবে? জীবন চাই। সমগ্রসীভূত উন্নতি চাই। চরিত্র চাই। মাকে চাই, মায়ের সকল সন্তানকে চাই। ঘৃণা বিদ্বেষ পুষিতেছ, অথচ মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছ?—ভণ্ড, দূর হও। মায়ের আদর্শে জীবনকে গঠন কর, নচেৎ সকল শ্রম বৃথা হইবে। দলাদলিই সার হইবে। ধর্ম্মহীনতায় আর্য্যত্ব রক্ষা পাইবে না। সকলে ঘৃণা বিদ্বেষ পরিহার কর। যশমান লইয়া, মৃত লইয়া কাটাকাটী করিলে কি হইবে? যে যেখানে যেভাবে থাক, সমগ্রসীভূত উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হও। জ্ঞানী—জ্ঞান দেও, প্রেমিক প্রেম বিলাও। উপহাস, নিন্দা, ঘৃণা বিদ্বেষ—অহং-জ্ঞানমূলক সকল সঙ্কীর্ণতা দূর কর। আর্য্যভূমি আবার মাতিবে, আবার জাগিবে। নচেৎ আর্য্যভূমির নাম অচিরাৎকালের মধ্যে বিস্মৃতির অনন্ত গর্ভে ডুবিয়া যাইবে। অসংখ্য দেবালয় মৃত-জীবের আশ্রয় হইবে—ধর্ম্মমন্দির সকল পিশাচের নৃত্যশালা হইবে। জীবন্ত ধর্ম্মসাধন কথার কথা নহে। প্রতারণায় চলিবে না, ছলনায় হইবে না। প্রাণ চাও ত প্রাণেশ্বরের স্মরণ লও। মান অভিমান ভুলিয়া মাতার চরণে পড়। মা দয়াময়ী অবশ্য দয়া করিবেন।

সামাজিক ব্যাধি। (৩)

চিকিৎসার ব্যবস্থা—পারিবারিক শিক্ষা।

পারিবারিক অবস্থার উপরে সামাজিক নীতি কতদূর নির্ভর করে, তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। যে স্থানে আমাদিগকে দিবসের অধিক ক্ষণ বাস করিতে হয়, সে স্থানটী যদি সুখের স্থান না হয়, তাহা হইলে মানব মন পরিতৃপ্ত ভাবে সেখানে থাকিতে পারে না, সুখের অন্বেষণে অন্যত্র গমন করিতে হয়। তাহাতে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয় এবং বিবিধ দুর্গতির সূত্রপাত হয়। আমরা যতক্ষণ পরিবার মধ্যে থাকি, ততক্ষণ পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইঁহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি। ইঁহারা যেমন প্রীতির দ্বারা আমাদের হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করেন, তেমনি অজ্ঞাতসারে প্রহরী স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমরা পরিবার মধ্যে পরস্পরের দৃষ্টি দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বাস করি। ইঁহাদের সমক্ষে আমরা এমন কিছু করিতে পারি না, যাহা লজ্জাজনক বা অবিশুদ্ধ। সুতরাং যুবকগণের নীতি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই এই মূল সত্যটী স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যুবক যুবতী যতই পরিবার মধ্যে আত্মীয় স্বজনের ও গুরুজনের চক্ষের নিকটে নিকটে থাকে, ততই তাহাদের নীতির পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু পরিবারটীকে যদি সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের চিত্তের তৃপ্তিদায়ক করিতে না পারা যায়, যদি গৃহ তাহাদিগের পক্ষে আকর্ষণের বস্তু না হয়, তাহা হইলে কদাপি আমরা তাহাদিগকে পরিবার মধ্যে রাখিতে পারিব না। এই কারণে আমাদিগকে স্থির চিত্তে এই প্রশ্নের বিচার

করিতে হইবে যে, কি হইলে পরিবারটী আমাদের পুত্র কন্যার নিকট আকর্ষণের পদার্থ হইতে পারে?

সাধারণ ভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে মানব মন সুখে থাকিবার জন্য যে যে বিষয় চায়, এবং যাহার অভাবে সুখী হইতে পারে না, সে সমুদায় গুলি পরিবার মধ্যে থাকা চাই। বিশেষত আমাদিগকে আর একটী বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে: সেটী এই;—যৌবন কালে বালক বালিকার মন স্বভাবত সতেজ হয়। তাঁহাদের সতেজ হৃদয় মনের পরিতৃপ্তির জন্য এমন অনেক বিষয়ের প্রয়োজন হয়, যাহা একজন বৃদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে। অতএব আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের সুখের জন্য পরিবার মধ্যে, কি কি বিষয় থাকা কর্ত্তব্য, তাহা একবার স্থির চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্ব প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিবার মধ্যে সন্তানগণ যদি স্বাধীন ভাবে ও অসংকোচে বাস করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। যে স্থানে মানবকে সংকোচে সংকোচে, ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়, তাহা তাঁহার পক্ষে সুখের স্থান হইতে পারে না। সন্দেহ ও ভয়ের অবস্থার ন্যায় কষ্টের অবস্থা মানবের পক্ষে অতি অল্পই আছে। কোন সসর্প গৃহে যদি এক রাত্রি বাস করিতে হয়, সেই এক রাত্রি এক যুগের ন্যায় বোধ হয়। যে ভৃত্যকে বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহাকে লইয়া কাজ করিতে সর্ব্বদাই মনের অসুখে বাস করিতে হয়, ইহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। সেইরূপ পরিবার মধ্যে যদি নরনারীকে সন্দেহ ও ভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা বাস করিতে হয়, তাহা হইলে সে পরিবার মধ্যে সর্ব্বদা নরকাগ্নি জ্বলিতে থাকে, কেহই সেখানে থাকিয়া সুখী হয় না; এবং সেখানে থাকিয়া সকলের আত্মার অধোগতি হয়। এই কারণে পারিবারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রেই দেখিতে হইবে যে, কিসে সন্তানগণ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ও নির্ভয়ে বাস করিতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, পিতা মাতার সহিত তাহাদের এরূপ সম্বন্ধ ও এরূপ ভাব হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মানসিক ভাব সম্বন্ধে তাহাদের কোন সন্দেহ না থাকে, এবং তাহাদের বিরাগ ভয়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকিতে না হয়। যদি এসংসারে হৃদয় খুলিয়া কথা কহিবার ও শুনিবার কোথাও প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা পরিবার মধ্যে। পিতা মাতা প্রাণ খুলিয়া সন্তানদিগকে সমুদয় মনের ভাব জানাইবেন ও তাহাদিগকে অসংকোচে সমুদয় মনের ভাব গোচর করিতে দিবেন। অনেক সময়ে বালক বালিকারা এমন অনেক কথা বলে, যাহা নিতান্ত অযুক্ত ও উপহাসের উপযুক্ত। তাহাদের সে কথা গুলিও আদর পূর্ব্বক শুনিতে হইবে ও প্রসন্ন চিত্তে বিচার করিতে হইবে। যদি ক্রোধের বাত্যার দ্বারা তাহাদের প্রাণের প্রজ্জ্বলিত উৎসাহাগ্নি নির্ব্বাণ করা যায়, তাহা হইলে পরিবার মধ্যে দ্বরায় ভয়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের শাসন অন্তর্হিত হইতে থাকে। সেই পিতা মাতা প্রকৃত বুদ্ধিমান, যাঁহারা সন্তান-

দিগকে অসংকোচে ও স্বাধীন ভাবে সমুদয় মনের কথা বলিতে দিয়া থাকেন। এমন কি, আমাদের ব্যবহারে তাহারা যে দিন যে কিছু অন্যায় দেখিবে, তাহাও অসংকোচে বলিবে। তাহাদের মতে ভ্রম থাকিলে দেখাইয়া দিব, সত্য থাকিলে নিজ নিজ ক্রটী স্বীকার করিব। পরিবার মধ্যে সন্তানদিগের স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের ভাব গোচর করিবার স্বাধীনতা থাকা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ স্বীয় স্বীয় রুচি ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা থাকাও তেমনি প্রয়োজনীয়। যেখানে মানব নিজ রুচি ও বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে পারে না, সেস্থান তাহার নিজের স্থান নহে। অতএব সন্তানগণ যদি অনুভব করে যে, পিতা মাতার অনুদারতা নিবন্ধন তাহারা স্বীয় স্বীয় বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে, সে পরিবার ত্বরায় তাহাদের পক্ষে অসুখের আলয় হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পরিবার মধ্যে পিতা মাতার সহিত পুত্র কন্যার মানসিক চিন্তা ও ভাবের বিনিময় দেখা যায় না। অনেক পরিবারে পুত্র কন্যাগণ পিতাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহারা তাহার নিকট মন খুলিতে সাহসী হয় না। পুত্র কন্যার হৃদয় অনেক পিতা মাতার পক্ষে দুরবগাহ সাগরের গভীর গর্ব্তের ন্যায়, তন্মধ্যে কি আছে তাহা তাঁহারা জানেন না। তাহারা কি ভাবিতেছে, কি তাহাদের সুখ দুঃখ, কি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, তাহাও তাঁহারা অনেক সময় জানিতে পারেন না। এই কারণে পারিবারিক সম্বন্ধের যে মিষ্টতা, তাহা উভয় পক্ষের কেহই অনুভব করিতে পারেন না। এই দূরত্ব ভাব বিদূরিত না হইলে পরিবার আমাদের পুত্র কন্যার পক্ষে আকর্ষণের পদার্থ হইবে না।

পরিবার মধ্যে পুত্র কন্যাগণ স্বাধীন ভাবে বসিবে দাঁড়াইবে, অসংকোচে হাসিবে খেলিবে, অসংকোচে সকলের সহিত মিশিবে অথচ ধর্ম্ম ও নীতির অব্যক্ত শাসন দ্বারা সুরক্ষিত হইবে। এই কারণে এক দিকে যেমন স্বাধীনতা থাকিবে, অপর দিকে তেমনি চরিত্র ও ধর্ম্মের শাসন থাকিবে, কারণ যে স্বাধীনতা ধর্ম্ম ও পবিত্রতা দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে, তাহা সচরাচর উচ্ছৃঙ্খলতার আকার ধারণ করে। ধর্ম্ম-চর্চ্চাকে পারিবারিক সুখের ভিত্তি-স্বরূপ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পরিবার মধ্যে সুনীতি ও সাধুতার বায়ু প্রবাহিত থাকিবে। শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার বিষয়ে একটী পাকা কথা আমরা অনেক দিন শুনিয়াছি, সেটী এই, এরূপ ভাবে শিশুদিগকে শিক্ষা দেও, যাহাতে তাহারা জানিতে না পারে যে শিক্ষা দিতেছ। পারিবারিক শাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। পুত্র কন্যাকে এরূপ ভাবে ধর্ম্মের শাসনের মধ্যে রাখ, যাহাতে তাহারা জানিতে না পারে যে তাহাদিগকে শাসনের মধ্যে রাখিতেছ। পিতামাতার স্নেহ ও দৃষ্টির মধ্যে থাকিলেই এই শাসন আপনাপনি ঘটিয়া থাকে। সন্তানদিগকে সকল প্রকার বিশুদ্ধ আমোদ ভোগ করিতে দেও, নিজে তাহার সঙ্গে থাক, ও সেই আমোদে যোগ দেও, তদ্দারা তাহাদের সুখ দশগুণ বর্দ্ধিত হইবে, অথচ তোমার দৃষ্টির দ্বারা তাহারা সুরক্ষিত হইবে; যদি সে পথে

কোন বিপদ থাকে, তাহাতে তাহারা পতিত হইবে না।

বিশুদ্ধ আমোদের উল্লেখ করাতে, পারিবারিক সুখের উপযোগী আর একটী উপকরণের উল্লেখ করা হইয়াছে। মানবমনের তৃপ্তির জন্য বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে গৃহে তাহা থাকে না, সে গৃহে যুবক যুবতীগণ থাকিয়া সুখী হইতে পারে না। গুরুতর শ্রমে মন যখন অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়, তখন যদি পরিবার মধ্যে বিনোদনের উপায় কিছু না থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে অন্যত্র গমন করিতে হয়। বিশেষতঃ যে চিত্তে কেবল শ্রম ও আমোদের একান্ত অভাব সে চিত্ত ত্বরায় নিরস হইয়া পড়ে, তাহা আর সংসারের কোন ঘটনাকে প্রসন্ন নয়নে দেখিতে পারে না। কোন প্রকার ভাল বিষয়ে আর তাহার উৎসাহ থাকে না। মনের এরূপ অবস্থা কোন প্রকার উন্নতির অনুকূল নহে। এ কারণেও পরিবার মধ্যে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। নৃত্য, গীত, বাদ্য বালক বালিকার পক্ষে এসকল অনিন্দনীয় বলিয়া গৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহারা অসংকোচে পিতামাতার সমক্ষে নাচিবে গাইবে, হাসিবে এবং জনক জননী সেই সকল আমোদে যোগ দিবেন। [illegible] আমোদে অংশী হইবেন, তাহা [illegible] অনেকগুণে অধিক মিষ্ট লাগিবে।

[illegible] হিন্দু গৃহস্থের গৃহে এবিষয়টীর [illegible] অভাব। নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি [illegible] আমোদে অতিশয় নিন্দনীয়, বয়ঃপ্রাপ্ত [illegible]দিগের পক্ষে পিতা মাতার সমক্ষে এরূপ আমোদ করার ন্যায় ভয়ানক কথা আর কিছু হইতে পারে না। যে বালক বালিকা গীতবাদ্যে অনুরক্ত, তাহারা সর্ব্বনাশের পথে পদার্পণ করিয়াছে, লোকে এইরূপ ভাবিয়া থাকে। সমাজের লোকের এইরূপ ভাব থাকাতে দেশের সমূহ অকল্যাণ হইতেছে। আমাদিগের যুবকদিগকে আমোদ প্রমোদের লোভে সমবয়স্ক যুবকদিগের সহিত মিশিয়া অন্যত্র যাইতে হইতেছে। যেখানে পিতা মাতার চক্ষু নাই, নিষেধ বা তিরস্কার করিবার কেহ নাই, তাহাদিগকে নীতির শাসনের মধ্যে রাখিবার জন্য কেহ নাই, সেখানে যে তাহারা বিশুদ্ধ আমোদই করিবে, তাহা কে বলিবে। এই সকল দলে পড়িয়াই অনেক যুবক সর্ব্বনাশের পথে পদার্পণ করে। ত্বরায় হিন্দু গৃহস্থের গৃহে বিশুদ্ধ আমোদের উপযোগী বিষয় সকল প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত।

পারিবারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে এতদ্দেশে আর একটী অভাব দৃষ্ট হয়। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ যতই পরস্পরের সহিত মিশিবেন, সকল প্রকার আমোদ প্রমোদে যোগ দিবেন, প্রাণখুলিয়া পরস্পরকে মনের কথা বলিবেন ও শুনিবেন, সুখে দুঃখে পরস্পরের সাহায্য করিবেন, পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার অংশী হইবেন, ততই তাঁহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রীতি বন্ধন দৃঢ় হইবে, ও সে গৃহস্থের গৃহটী সুখের আলয় হইবে। একটী যুবকের স্বাভাবিক প্রতিভা আছে; তিনি সুকবি। তাঁহার একটী ভগিনী আছেন। দুই ভ্রাতা ভগিনীতে বড় ভাব। ভগিনী ভাইএর প্রতিভা দেখিয়া একেবারে [illegible] ভাই যাহা কিছু রচনা করেন, ত[illegible] সর্ব্বাগ্রে ভগিনীর নিকট পঠিত [illegible]

। অনুরাগ-পূর্ণ প্রাণে সেই কবিতা মিষ্ট লাগে, তাহার বর্ণনা হয় না। মিলিয়া কবিতাটী সংশোধন করা হয় দোষগুণ বিচার করা হয়; পরে জগতের নিকট প্রকাশ করা হয়। তাঁহার পিতা মাতাও আদর পূর্ব্বক তাঁহার রচিত প্রত্যেক কবিতা পাঠ করিয়া থাকেন ও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকেন। যুবক পাঠক মনে মনে কল্পনা করিতে পারেন যে, সেই পরিবার মধ্যে থাকা সেই প্রতিভাশালী যুবকের পক্ষে কেমন আনন্দকর। সুখে যোগ, দুঃখে যোগ, আশাতে যোগ, আনন্দে যোগ, যতই এইরূপ পরিবারস্থ প্রত্যেক নরনারীর যোগ হইবে, ততই সে পরিবার সুখের স্থান হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে নারীর অবরোধ প্রথা থাকাতে, ও নারীগণের শিক্ষার অভাব নিবন্ধন এই বিশুদ্ধ ও হৃদয়দ্রবকারী আনন্দের বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত রমণীগণ বাটীর একদিক অধিকার করিয়া থাকেন, পুরুষগণ অপর ভাগে অবস্থিতি করেন। পরস্পরে একত্র আহার বিহার, আমোদ প্রমোদের নিয়ম নাই। ভিতর বাড়ীতে স্ত্রীলোকদিগের তাসের খেলা ও আমোদ প্রমোদ চলিতেছে, বাহির বাড়ীতে বৈঠকখানায় বাবুদের দাবা খেলা, ও নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিতেছে। পরস্পর পরস্পরের আমোদ প্রমোদের সঙ্গী নহেন। ইহার ফল এই হয় যে, পুরুষেরা আপনাদের মধ্যে যে আমোদ প্রমোদ করেন, [illegible] নারীদিগের অনুপস্থিতি নিবন্ধন [illegible] থাকে না, এবং নারী[illegible] যে আমোদ প্রমোদ করেন, তাহা [illegible]দিগের অনুপস্থিতি নিবন্ধন বিশুদ্ধ থাকে না। অথচ উভয়ে উভয়ের সঙ্গী হইলে যে পরিমাণে সুখী হইতে পারিতেন, তাহাও হইতে পারেন না। আমাদের দেশে দেশাচার বশতঃ এক পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়া রহিয়াছে। শ্বশুরের পক্ষে পুত্রবধূটীর প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত মুখখানির দিকে সস্নেহ নয়নে দেখা: তাঁহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে স্নেহ ও আদর করার ন্যায় স্বাভাবিক ব্যাপার কি আছে? কিন্তু দেশাচার তাহার বিরোধী। পুত্রবধূকে সেই সুন্দর মুখখানি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। একজন যুবকের পক্ষে স্বীয় সহোদরদিগের পত্নীদিগকে ভগিনী নির্ব্বিশেষে স্নেহ ও আদর করার ন্যায় স্বাভাবিক কি আছে? কিন্তু দেশাচার সে পথে কঠিন অর্গল ফেলিয়া রাখিয়াছে। হায়! আমাদের বধূগণ যদি অসঙ্কোচে শ্বশুর, ভাশুর, দেবর প্রভৃতি সকলের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে পারিত, ও সকলের স্নেহ, আদর, ভালবাসা পাইত, তাহা হইলে শ্বশুরবাড়ী তাহাদের পক্ষে এত যমের বাড়ীর ন্যায় বোধ হইত না। যৌবনকালে একটী নিরপরাধা সরল-হৃদয়া বালিকার প্রাণ কিরূপে অসুখী করিতে হয়, ইহা যাঁহারা দেখিতে চান, তাঁহারা আসিয়া বঙ্গদেশের গৃহস্থ গৃহের কুলবধূদিগের অবস্থা পরিদর্শন করুন। নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ভিন্ন বিশুদ্ধ পারিবারিক সুখ কখনই লাভ করিতে পারা যাইবে না। এবিষয়ে আরও বক্তব্য রহিল।

প্রেমের শাসন, নির্দ্দোষ আমোদ, ও নারীর স্বাধীনতা—এই ত্রিবিধ উপকরণ ভিন্ন আর একটী প্রধান উপকরণ আছে, যাহা না থাকিলে গৃহস্থের গৃহ যুবক যুবতীদিগের

সুনীতি শিক্ষার অনুকূল হইবে না। পরিবার মধ্যে হৃদয় মনের উন্নতিকর সকল বিষয়ের চর্চাকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। বাহিরের জগতে যত ভাল বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে, সেই আন্দোলনের তরঙ্গ পরিবার মধ্যে যাওয়া চাই; পুত্রকন্যাদিগকে সেই সকল বিষয়ে মনোযোগী করিতে হইবে, গৃহ মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির উপায় থাকিবে; পুস্তকালয়, পাঠাগার, প্রভৃতি রাখিতে হইবে। পিতা মাতা সকল দেশহিতকর ও আত্মার উন্নতিকর বিষয়ে সন্তানদিগের সহিত তর্ক বিতর্ক করিবেন; সর্ব্বদাই প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে তাহাদের সহায়তা করিবেন; নিত্য নিত্য নূতন জ্ঞান তাহাদের মনের দ্বারে আনিয়া দিবেন; যেখানে গেলে কিছু শিক্ষা করা যায়, সেখানে যাইতে উৎসাহিত করিবেন; সংক্ষেপে বলিতে গেলে সর্ব্বদাই তাহাদিগের মানসিক আহার যোগাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

সর্ব্বোপরি তাহাদের জীবনকে ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সাধুতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইবেন। যে চরিত্র ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহার স্থিরতা বিষয়ে কোন ভরসা নাই। সৎসঙ্গে ও সৎ পরিবারে থাকিয়া অনেক বালক বালিকা [illegible] বর্দ্ধিত হয় [illegible] দের স্বভাব মিষ্ট [illegible] তাহাদের ভক্তি নাই। [illegible] দেখে [illegible] বাসে, সকলেই প্রশংসা করে [illegible] স্বাভাবিক সাধুতা দেখিয়া পিতা [illegible] সন্তুষ্ট থাকিবেন না। এমন অনেক সাধু[illegible] দেখিলাম, জীবন সংগ্রামে তাহা টেকি[illegible] না। প্রবৃত্তিকুলের প্রবল আঘাতে [illegible] চূর্ণ হইয়া গেল। প্রলোভনে পড়িয়া [illegible] [illegible] বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। [illegible] বলিয়াছেন — "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি", অর্থাৎ বলবান ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে। ইহা সত্য কথা। যখন জ্ঞানী ব্যক্তি প্রবৃত্তির প্রবল আঘাতে সুস্থির হইতে পারেন না, তখন কেবল মাত্র বালির "ভাল মানুষীর" উপরে যুবকদিগকে দাঁড়াইতে দিও না। [illegible] তাহাদের [illegible] ধরিয়া [illegible] তাহার পরমতত্ত্ব একবার দর্শন [illegible], ধর্ম্মের [illegible] সাধুতার ভিত্তি ভূমি একবার দেখিয়া লউক; তৎপরে সংগ্রাম [illegible] তাহার ঈশ্বরের দ্বারা রক্ষিত হইবে [illegible] পরিবার মধ্যে এই উপকরণ [illegible] সেই পরিবারই যুবক যুবতীদিগের [illegible] শিক্ষার অনুকূল।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

সমাপ্ত।